...সাহিত্য-পরিষৎ...
সংখ্যা ৫৫৬/২০
কলিকাতা
189
৭৫২৫

ভারতী।

নব বর্ষের আগমন-উক্তি।

১

এসেছি, এসেছি—
দের আবাহন শুনেছি, শুনেছি!
করবি-কুঞ্জে শুইয়াছিনু,
র ঘন ডাকে জাগিয়া উঠিনু!
ব ফুলের বাস, ফুলের রেণু,
কি মুরলী, বীণা, মোহন বেণু,
এনেছি—
) আমি এসেছি, এসেছি
াদের আবাহন শুনিতে পেয়েছি!

২

, স্বস্তি, শান্তি, শান্তি;
র সুতীব্র রৌদ্রে, ঘুচে যাক্, ঘুচে যাক্
মাদের অন্ধকার ভ্রান্তি!
দ নাচুক, ভরসা হাসুক,
-নির্ভরের হেরি অনিন্দ্য আনন-কান্তি,
পেয়ে, সরে যাক্ অবসাদ ক্লান্তি!
কুল ব্যাকুল বাণী; মর্ম্মের চীৎকার-রোল,
শুনেছি ... ছি;
...ই আমি পার হয়ে,

৩

কামধেনু-কল্পনারে এনেছি সাথে;
(ওগো) দুহিও তাহার দুগ্ধ, কি দিবা রাতে!
বিস্মৃতির শান্তি-জল ভয়-নিবারী,
(আমি) এনেছি কলসী ভরি শিবানী-বারি!
সদা-হাসি লতিকাটি দুলি উঠিল,
সোনালি গোলাপি-আশা-ফুল ফুটিল!
(ওগো) আমি এসেছি, এসেছি;
আকুল ব্যাকুল ডাক শুনিতে পেয়েছি!

৪

আমি এসেছি, এসেছি,
অলকার সুখৈশ্বর্য্য সঙ্গে এনেছি!
বিবাহেতে "ফুল-শয্যা," বরের ঘরে,
যায় যথা সারি সারি থরে বিথরে,
ছয় ঋতু, বার মাস, আমার সাথে
এনেছে সামগ্রী কত, বহিয়া মাথে!
(ওগো) আমি এসেছি এসেছি;
আকুলি ব্যাকুলি তব বুঝিতে পেরেছি!

৫

... —হোরা—পল!

ওঃ। কনক-উৎপল !
ভাণ্ডার কি খালি রাখিব ?
মেষে তাহা ভরিয়া দিব !
ভারতীরে কনক-থালে,
সচন্দন পুষ্প-মালে,
আমি এসেছি, এসেছি,
পারিজাত-গুচ্ছ এনেছি !

৬

মণি মুক্তা রাশি,
বে যেন ইন্দিরার হাসি !
কার, বল, বুক খালি কার ?
কহিনুর ভাতিছে "পরার্থ-ব্রত ;"
সই রত্ন, কামনার সার ;
। ভাণ্ডার
এ জগতে, নাহি পাবে আর !
সংসার
মার অঙ্গে শাণিত কুঠার,
র মত, কুঠারের মুখে বুকে
ঢেলে দিও, কুসুম-সম্ভার !
মত, সৌরভে ভরিয়া দিও
ার !

*   *   *

কার ? জান, দূত আমি কার ?
দ্রের চেলি, অঙ্গে মম ঝল্‌মলে,
ন-ফোঁটা ললাটে আমার !
ঙ্গল-আধার,
সেই সর্ব্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার !
তামাদের ভেটিতে, মণ্ডিতে,
মহীতে,
ছি, এসেছি ;
কত দেশ, দেখিতে দেখি
লর তরী সৈকতে নেমে

৭

আমার এ মোহন অঞ্চল ;
এস এস কাছে এস, মুছাইয়া দিব
তোমাদের নয়ন সেজল !
বিপত্নীক, এই লও তব হারা-নারী,
পতিহীনা হের তাঁরে নয়ন বিস্ফারি !
ক্রোড় খালি কার ? বল ক্রোড় খালি
স্মৃতির হিন্দোলা-পরে শুয়ে আছে অব
আহা ওযে কোল-ভরা, "খোকা" সুবু
তুলে লও উৎসঙ্গে তোমার !
আজি মর্ম্ম আনন্দ অপার—
খুলিলাম ভবিষ্যের দ্বার ;
কাছে এস, কাছে এস, অবাক্ স্তম্ভিত
হের দেখ রহস্য অপার !
যাহাদের ভেবেছিলে হয়ে গেছে ধূলির
চন্দ্রলোকে, বুধলোকে, ধরি দিব্য দে
হাসে তারা কি মধুর হাসি !
বাজিছে এস্রাজ, বীণা, মধুর; মধুর,
কারো গলে পারিজাত, কারো হাতে ব
সবে তারা আনন্দ-আতুর !
কারো ভুজে কঙ্কণ-কেয়ূর,
কারো দুই চরণেতে চঞ্চল নূপুর !

*   *   *

তাই বলি, ফেলে দাও শোক হলাহল,
মুছ সবে নয়নের জল ;
বল সবে "কি ভয় কি ভয়, কি ভয় !"
গাও সবে "জয় ব্রহ্ম, জয় !
শান্তি, শান্তি, স্বস্তি, স্বস্তি, সবে কর উচ্চ
আমি এসেছি, এসেছি—
নব-রঙ্গে, নব হর্ষে, নব বঙ্গে নব বর্ষে,
মধুর, মধুর বার্ত্তা বহিয়া

সে লের পাঠশালার কাহিনী।

আর কতদিন র বেশী হয়ত বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই খিতে পাই আমাদের রুদ্রনগরের নব-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ইংরেজী ইস্কুলে ছেলে ধরি- বাজিতে না বাজিতে ছেলের দল গরম গরম ভাত খাইয়া জুতা জামাজোড়া য় মণ্ডিত হইয়া বইগুলি হাতে লইয়া ইস্কুলে ছুটিয়াছে, বছর বছর আট দশজন ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় এলে পড়িতে যাইতেছে এবং বছর চারির মধ্যে ত্ব লাভ করিয়া বিদ্যার জাহাজ মাথায় পুরিয়া দাড়ি গোঁপ চসমার গুরু গাম্ভীর্য্যে র ক্ষুদ্র গ্রামখানি ঢাকিয়া ফেলিতেছে, তখন আমার কাছে এই বিশ পঁচিশ বৎসর ঘকাল বলিয়াই মনে হয়; এই যে পরিবর্ত্তন, কালের গজে ইহার মাপ লই ওয়া লিয়া বোধ হয় না।

ই যখন তখন সেকালের পাঠশালার কথা মনে পড়িয়া যায়। তখন রুদ্রনগরে ইংরেজী াপিত হয় নাই, আজ যেখানে ইস্কুলের বৃহৎ অট্টালিকা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে সখানে জয়রাম ঘোষের হলুদের ক্ষেত ছিল, আর যেখানে ঐ ইস্কুল সংলগ্ন বাগানে পাতা বিশিষ্ট ক্রোটনের গাছ শোভা পাইতেছে ও চামেলী কুঞ্জে ছোট ছোট সাদা ামেলী ফুল ফুটিয়া চারিদিকে সুগন্ধ উড়াইতেছে, ঠিক ঐ জায়গাটিতে একটা ইটের ভগ্নাবশেষ পড়িয়াছিল, তাহার উপর রাজ্যের লাল ভেরেন্দা এবং কালকাসিন্দা জাইয়া উঠিয়াছিল।

ন গ্রামের এক প্রান্তে একটা বাঙ্গলা ইস্কুল এবং গ্রামের মধ্যে একখান পাঠশালা আমরা তখনো ইস্কুল কি পাঠশালায় ভর্ত্তি হই নাই, কিন্তু আমাদের কয়েক বন্ধুর লাষ ছিল যে পাঠশালা ডিঙ্গাইয়া আমরা একেবারে বাঙ্গলা ইস্কুলে ভর্ত্তি হইব। এত- র এখন যে সেই উচ্চাভিলাষের বিশেষ কোন কারণ দেখাইতে পারিব, সে আশা ই, তবে প্রধানতঃ দুইটি কারণে ইস্কুলের উপর আমাদের অনুরাগ জন্মিয়াছিল, প্রথম ইস্কুলের ছেলেরা পাঠশালার ছেলেদের কাছে প্রায়ই গল্প করিত যে তাহারা আখ্যান- সীতার বনবাস প্রভৃতি বড় বড় বই পড়ে আর বেঞ্চির উপর বসিতে পায়, দ্বিতীয় বাঙ্গলা ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদের দিয়া তামাক সাজাইয়া লন না এবং রাম- নামক গুরুমহাশয়টির পোড়োদের উপর যে বত্রিশ রকম দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ছিল ছেলেদের সেই পিনাল কোডের আমলে আসিতে হইত না।

নে চন্দুরে খেঁড়া ওরফে গুরুমহাশয়রূপী চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর একটা বর্ণনা দেওয়া বোধ করিতেছি না। ব্যক্তিটি পরিণত বয়স্ক, বেঁটে, কাল, পরিপুষ্ট গোঁফ জোড়াটা এবং ঝাঁটার মত সোজা ; দাড়ি কামানো, মাথার অনেক খানি জায়গা কেশসম্পর্ক-শূন্য

DAMAGE PAGES.

বাঁকি অংশটায় খাট চুলগুলি কদম্ব কেশরের ন্যায় সরল। ব
শুনিতে পাওয়া যায় চন্দ্রকান্ত মা বাপের আদরের ছেলে ছিলেন
সঙ্গে বিরোধ করিয়া পিতৃ-পিতামহের ব্যবসায় কবিরাজী শিখিতে
বিদ্যায় কতদূর পরিপক্ক হইয়াছিলেন জানি না, কিন্তু একবার
তাঁহার প্রণয় ব্যাধি ঘটিয়াছিল, লোকে তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহ
মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার বাঁ পা খানি এ বারে ভ
শুনিয়াছি সেই হইতে তাঁহার সে রোগও আরোগ্য হইয়া গিয় ছে। সঙ্গে সঙ্গে
মারাত্মক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া এক পাঠশালা খুলিলেন, ইহাতে তিনি মা
শিকেটা দক্ষিণা পাইতেন, ছেলেরা প্রায়ই তামাক টিকে হইতে আরম্ভ করিয়া চ
পর্য্যন্ত 'সিধা' যোগাইত এবং গ্রামের মধ্যে কোন বাড়ীতে ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ
উৎসব হইলে প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ জুটিত। এই রকম করিয়া কোন
তাঁহার দিনপাত হইত।

পাঠশালার ছেলেরা গুরুমহাশয়কে যমের মত ভয় করিত; কিন্তু তাঁহাকে খোঁ
দেখিয়া বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না, গুরুমহাশয় কিছুদূরে
মাত্র তাহারা নাচিতে নাচিতে অনুচ্চস্বরে সুর করিয়া বলিতঃ—

"খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং
কার হাঁড়িতে ফ্যান খেয়েছিস্ কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং।"

দৈবাৎ কোনদিন বাল-মুখোচ্চারিত এই কবিতা গুরুমহাশয়ের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ
তিনি বিকটভ্রূভঙ্গী করিয়া রোষকষায়িত লোচনে ফিরিয়া চাহিতেন, ছেলেরা তৎ
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া যে যেখানে পারিত অদৃশ্য হইত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় সবুজ ঘাসের উপর আট দ
মিলিয়া 'হাডুডুডু' খেলিতেছি, আমাদের 'খেঁড়ের' দুজন মরিয়া বসিয়া আছে, আমি স
'ডুডু' ধরিয়া বিপক্ষদের 'কোর্টে' পা দিয়াছি এমন সময় যে দুজন মরিয়া বসিয়াছিল ত
চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, বিপক্ষ দলের একজন চীৎকার করিয়া বলিল "ওকি
তোমরা মরেছ, তবে উঠ্‌চো যে।"—তাহারা কোন উত্তর না করিয়া পথের দিকে
নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদের বাড়ীর মধ্যে পলায়ন করিল,—আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দে
গুরুমহাশয় তাঁহার তোকরা চাদর খানি মাজায় জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আ
বাড়ীর দিকে আসিতেছেন। তাই তাঁহাকে দেখিবামাত্র যে যেখানে ছিল, (বলা আ
আমি বাদে আমাদের দলের সকলকটিই তাঁহার ছাত্র,) সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে
করিয়াছিল। কেবল আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুমহাশয় আমার
আসিয়া ঠাকুরদা মহাশয়ের খোঁজ করিলেন। ঠাকুরদা তখন একটি নিড়ানী লইয়া ব
বেগুণের চারাগুলির পরিচর্য্যা করিতেছিলেন; গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া চণ্ডী

র্ত্তুল উদরের পরিধি বিপুল;
লিয়া শৈশবে মা সরস্বতীর
আরম্ভ করেন। তিনি সে
কি কবিরাজী সূত্রে
র প্রতি এমন শক্ত
গিয়াছিল।
তিনি এই
দ টাকাটা
'ল ডাল
প্রভৃতি
প্রকারে
াইতে
াইবা-
রিলে,
ক্ষণাৎ
শজনে
বমাত্র
তাহারা
ভাই,
অঙ্গুলি
খিলাম
মাদের
বশ্যক
লায়ন
কাছে
াগানে
মণ্ডপে

উঠিয়া আসিলেন। এক-সিলিম তামাকের শ্রাদ্ধ করিয়া গুরুমহাশয় তাঁহাকে আমার পড়া শুনার ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং লেখাপড়া শিখানো অতি কর্ত্তব্য একথা প্রমাণের জন্য 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষানি—দশবর্ষানি তাড়য়েৎ'—এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেও ভুলিলেন না।

আমি নিতান্ত অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম, ঠাকুরদা বলিলেন, আমাকে দুই একদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। শুনিয়া গুরুমহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন, গম্ভীর মুখে উত্তর করিলেন, তাহা হইলে আমার উচ্ছিন্ন যাইবার পথ প্রশস্ত হইবেমাত্র, লেখাপড়া কিছুই হইবে না। আগে নামতা, কড়া-গণ্ডাবুড়ী, পোনে এস্তমাল হওয়া দরকার, তালপাতে কলাপাতে 'মক্সো' করিয়া আগে হাতের লেখাটা দুরস্ত করা ভাল, নতুবা লেখা একেবারে খারাপ হইয়া যায়। তাঁহার যুক্তি এই যে বনিয়াদ কাঁচা রাখিয়া যদি তাহার উপর পাকা গাঁথনি গাঁথা যায় তাহা হইলে তাহা কখনই তেমন 'পোক্ত' হয় না। দাদামহাশয় সেকালের মানুষ, গুরুমহাশয়ের কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল—ইস্কুলের পরিবর্ত্তে আমার পাঠশালাতে ভর্ত্তি হওয়াই কর্ত্তব্য। আমার বনিয়াদ পাকা করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত করিয়া গুরুমহাশয় প্রফুল্লচিত্তে গৃহে চলিলেন। পরদিন আমার পাঠশালে ভর্ত্তি হওয়াই স্থির হইয়া গেল। তদবধি গুরুমহাশয় আমার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, কতদূর কার্য্য হইয়াছিলেন ঠিক বলা যায় না, তবে পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতে তাঁহার আবিষ্কৃত বত্রিশ রকম দণ্ডের কোনটিই আমার ফাঁক যায় নাই। পাকা বনিয়াদ গাঁথিতে হইলে তাহার উপর সবলে দুরমুসের আঘাত করা প্রয়োজন, এই কথা স্মরণ করিয়াই হয়ত গুরুমহাশয় আমার উপর অজস্রধারে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত প্রয়োগ করিতেন এবং অগত্যা সেগুলি নিতান্ত সহিষ্ণু ভাবেই সহ্য করিতে হইত।

প্রথম দিন সকাল বেলা উঠিয়া রাত্রের ভাজারুটীতে উদর পরিতৃপ্ত করিয়া আমার কথামালা খানা, একখানি সেলেট ও দেশী হল্‌দে কাগজের খাতাখানি হাতে লইয়া পাঠশালায় চলিলাম। তখন আমাদের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বালীর কাগজের আমদানী বেশী ছিল না এবং আমাদের শ্রীহস্তের 'কাকের ছা বকের ছা' লেখাতে সেই মূল্যবান কাগজ নষ্ট করা কাহারো মতে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। তখন একরকম হল্‌দে, পুরু, খস্‌খসে দেশী কাগজ মধ্যে মধ্যে ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করিতে আনিত, পল্লীগ্রামের দোকানদারেরা এখনো এই কাগজের খাতা বাঁধিয়া হিসাব পত্র লেখে। আমরা প্রায় পয়সা দিয়া এই কাগজ কিনিতাম না, ফেরিওয়ালারা আসিলেই পুরানো কাগজ, ছেঁড়াকাঁথা, কাপড় প্রভৃতির পরিবর্ত্তে নূতন কাগজ লইতাম। পাঠশালায় যখন এই কাগজের খাতা লইয়া উপস্থিত হইলাম, তখন ছেলেদের মধ্যে ভারি বিস্ময়ের সঞ্চার হইল, কারণ হাত না পাকিলে কাহারো কলাপাতেই লিখিবার অধিকার ছিল না, আমি যে তালপাতা কলাপাতা ছাড়িয়া একেবারে

DAMAGE PAGES,

কাগজ ধরিয়াছি এমন অসম্ভব ব্যাপার তাহারা আর কখন দেখে নাই। গুরুমহাশয় আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার বই, সেলেট, খাতা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বলিলেন "কথামালা পড়্লে চল্‌বে না, এতে খালি শালিক শুয়োর, বাঘ আর বকের কথা, ঠাকুর দেবতাদের কথা পড়তে হবে। বাঙ্গালা ইস্কুলে ছেলেগুলো এইসব ছাইভস্ম পড়ছে, আর তাদের মধ্যে খৃষ্টানী মত বাড়চে, তুমি বাড়ী গিয়ে একখান শিশুবোধক কিনবে।" আমার খাতা দেখিয়া বলিলেন "আঃ—সর্ব্বনাশ, তুমি এখনই কাগজে লেখা ধরেছ!"—কাজটা সাংঘাতিক গুরুতর বলিয়া মনে হইল না, গুরুমহাশয় বলিতে লাগিলেন "ও হচ্ছে না, প্রথমে রাম খড়ি দিয়ে মাটীতে দাগা বুলানোর নিয়ম, তারপর তালপাতে লেখা পাকালে কলাপাতা ধরার ব্যবস্থা, কাগজে লেখার এখনি কি?"—বাড়ী গিয়া তালপাতা যোগাড় করিবার জন্য আদিষ্ট হইলাম।

সেই দিন আমার উপর আর একটা নূতন আদেশ জারী হইল। গুরুমহাশয় বলিয়া দিলেন, অন্যান্য পড়োর মত আমাকে বসিবার জন্য একখান আসন বাড়ী হইতে আনিতে হইবে। এবং আমার স্বতন্ত্র দোয়াত কলম থাকাও আবশ্যক।

সে দিনের মত আমি সর্দ্দার পোড়ো শিবুর আসনের একপাশে বসিতে পাইলাম। অধিকারীদের দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালা; দোল, রাস বা ঝুলনের সময় অধিকারীদের গৃহবিগ্রহ রাধাকান্ত দেব সিংহাসন সমেত এই ঘরে উপস্থিত হন, আবার উৎসব ফুরাইলে তিনি তাঁহার অন্তঃপুরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। উৎসবের কয়দিন পাঠশালা বন্ধ থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গনে উৎসবমগ্ন ছেলেপিলের অভাব হয় না।

এই চণ্ডীমণ্ডপ খানি আটচালা, তিনদিকে মাটীর দেওয়াল, সম্মুখে চাটায়ের ঝাঁ ঙ্কাপ পাঠশালার পশ্চাদ্ভাগ দিয়া একটা ছোট রাস্তা নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তাটি অপ্রশ স্তু, দুইধারে নর্দ্দামা, বর্ষাকালে এই নর্দ্দামার মধ্যে বানের জল প্রবেশ করে, এবং ছোট ছোট ছেলেরা কঞ্চির আগায় সুতা জড়াইয়া ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরাধরি খেলা করে। সম্মুখে আঙ্গিনা, সেখানে পাড়ার বৃদ্ধারা আসিয়া গোময় ছড়াইয়া ঘুঁটে শুকাইতে দেয়। এই আঙ্গিনার উপর দিয়া পাড়ার মধ্যে যাইবার একটা সরু পথ। ডাহিনে বাগচীদের কলাবাগান, অধিকারীদের গোয়াল ঘর, মণ্ডলদের তালগাছ, পাঠশালের ছেলেদের পাততাড়ীর উৎপাতে বৃক্ষটি প্রায় পত্রশূন্য। বাঁ ধারে একটা গর্ত্ত, গর্ত্তের উপরে একটা বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বাঁশঝাড়ের পাশেই একটা ছোট আমবাগান।

এই সকল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত পাঠশালাখানি এই ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধ বিহঙ্গনীড়ের ন্যায় বালকবৃন্দের কোলাহল-ধ্বনিতে সকালে বিকালে চঞ্চল হইয়া উঠিত, কিন্তু স্তব্ধ মধ্যাহ্নে চারিদিক রৌদ্রে যখন ঝাঁ ঝাঁ করিত, চারিদিকে জনমানবের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইত না এবং বাঁশবনের মধ্য হইতে একটা শ্যামা থাকিয়া থাকিয়া শিষ্ দিয়া উঠিত, তখন গুরুমহাশয়রূপী চন্দ্রকান্ত শর্ম্মা গামছাখানি কাঁধে রাখিয়া তাঁহার সিংহাসন স্বরূপ

টুলের উপর বসিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া ও মুখগহ্বর ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত-নেত্রে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে করিতে বিকট নাশিকা গর্জ্জন করিতেন, এবং তাঁহার ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে অতি অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিত। বৈশাখমাসের প্রভাতে তরুণ সূর্য্য পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া উদয় হইলে তাহার দুই একটি বিক্ষিপ্ত রশ্মি বংশপত্রের অন্তরালপথে পাঠশালার দেওয়ালে, ঝাঁপের গায়ে, শিশিরসিক্ত চণ্ডীমণ্ডপের চালে এবং অঙ্গনন্যস্ত ঘুঁটের উপর আসিয়া পড়িত। ছেলেরা কুশাসনে পাততাড়ি জড়াইয়া কেহ মাটীর কেহ চিনেমাটীর দোয়াতের গলায় দড়ি ঝুলাইয়া, কোঁচড় ভরা মুড়িমুড়কী চিবাইতে চিবাইতে পাঠশালার দিকে ছুটিত। সকলেই খুব সকালে পাঠশালায় আসিত বটে, কিন্তু গুরুমহাশয়ের আসিতে একটু বিলম্ব হইত, তিনি যতক্ষণ পাঠশালার আঙ্গিনায় পা না দিতেন ততক্ষণ কেহ পড়াশুনা আরম্ভ করিত না—আঙ্গিনায় 'ড়ুডু' বা 'চাম্‌চু' খেলা, ঘরের কানাচে ও বাগচীদের কলাবাগানে লুকাইয়া লুকোচুরি খেলা চলিত, তাহার পর পথের অপর প্রান্তে যেই গুরুমহাশয়ের সাদা ছাতাটার অগ্রভাগ দেখা যাইত, অমনি সকলে অতি শান্ত সুবুদ্ধি ছেলের মত নিজ নিজ পাঠে বসিত, কিন্তু তাহাদের মন কোথায় ছুটিয়া বেড়াইত তাহা তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারিত না। তথাপি কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী হইত না, সর্দ্দার পড়োরা লম্বা লম্বা রামখড়ি দিয়া মাটীর উপরে মোটা মোটা অক্ষরে ক, খ, গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি হরফ দাগিয়া দিত, আর যে সকল ছেলে সবেমাত্র হাতে খড়ি দিয়া পাঠশালায় আসিয়াছে তাহারা সেই লেখার উপরে 'মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা' র মত জোরে জোরে দাগা বুলাইত। অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ছেলেরা তালপাতের উপর 'সেবক শ্রী' ও কড়াগণ্ডা লিখিত, এবং আরো বড় ছেলেরা কলারপাতে 'শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ চক্রবর্ত্তী' আদিত্যনন্দন ভঞ্জ, 'বাঞ্ছারাম চতুর্ধুরীন' প্রভৃতি উৎকট উৎকট বানানবিশিষ্ট নামগুলি লিখিয়া আপনাদিগের হস্তাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে কলাবাগান দুরস্ত করিত। সর্দ্দার পড়োরা প্রায় সকলেই কলাপাতা ছাড়িয়া কাগজের ক্লাশে উঠিয়াছিল। তাহারা কাগজের বড় বড় 'মক্‌স' সম্মুখে রাখিয়া মোটা মোটা থাকের কলমে কেহ 'মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু অমুক, লিখিতং শ্রী অমুক, কস্য কর্জ্জ খত পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে' প্রভৃতি লিখিয়া উক্ত মহামহিমের নিকট হইতে অম্লানভাবে বিশ পঁচিশ লাখটাকা কর্জ্জ লইত, কেহ 'আজ্ঞাকারী প্রতিপাল্য সেবক শ্রীঅমুক সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রী৺ বিরাজ করিতেছেন তাহাতে অত্রানন্দ পরং' প্রভৃতি লিখিয়া পত্র লিখিবার অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শের 'মুসোবিদা' অভ্যাস করিত।

গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিয়া টুলে বসিয়াই বলিলেন এখনো গোবিন্দকে দেখ্‌চিনে কেন? নদের চাঁদ গোবিন্দোর খবর কিরে?" শ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র উত্তর করিল "আমি আসবার সময় তাকে ডাকলাম, কোন উদ্দিশ পেলাম না, হয়ত সে তখন ঘুমুচ্ছিল।" শুনিয়া গুরুমহাশয় মহাগর্জ্জনে বলিলেন "আজ বেতের চোটে তার একপহর বেলা পর্য্যন্ত ঘুমনো

ভাল করবো।”—ইতিমধ্যে গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত। গুরুমহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন “হাঁরে গোবিন্দে, তুইত ভারি নবাব হয়ে উঠেছিস্ দেখচি, যাতে তোর সকালে ঘুম ভাঙ্গে তাই কচ্ছি”—অনন্তর ছাত্রবর্গের দিকে তাকাইয়া আদেশ করিলেন “নিয়ে আয়তো একখান কচার ডাল ভেঙ্গে, ওর পিঠে ঘা কত দিই।”—পাঁচ ছয়জন কচার ডাল ভাঙ্গিতে ছুটিল।

ভয়ে গোবিন্দের পা দুখানি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কপাল ঘামিয়া উঠিল, মুখখানি শুকাইয়া গেল। দোয়াত এবং পাততাড়ি হাত হইতে না নামাইয়াই বলিল “আজ্ঞে, আপনি কাল বাবার মসলা দেওয়া ভাল অম্বুরী তামাক চুরী ক’রে আনতে বলেছিলেন, তা বাবা কাছারী না বেরুলেত আন্‌তে পারিনে, সেইজন্যে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে, আমি ত রোদ না উঠ্‌তে উঠেছি।”

গুরুমহাশয়ের মুখ কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; একটু শান্তভাবে বলিলেন “তামাক এনেছিস্ তো”—গোবিন্দ কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল “অনেক খানি এনেছি—এই দেখুন।”—কলাপাতে জড়ান একদলা তামাক সে গুরুমহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। গুরুমহাশয় তাহা হইতে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া লইয়া বলিলেন “মধো, একসিলিম তামাক সেজে আন্‌তো, দেখিস্ যেন কস্‌কেটাতে ঠিক্‌রে দিতে ভুলিস্ নে। ওর বাপ যে তামাক খায় —এ সেই তামাক না হলে ওর পিঠ আস্ত রাখ্‌বো না।”

মধো তামাক সাজিয়া সন্নিকটস্থ গাঁড়ার বাড়ীতে আগুণ আনিতে চলিল। সোনা গাঁড়ারের স্ত্রী পদ্মমণি তখন ছেলে কোলে লইয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে দক্ষিণ হস্তে ঢেঁকির ‘নোটে’ চিড়া এবং বাম হস্তে উননস্থিত হাঁড়িতে ‘কুচি’ দিয়া চিড়া কুটিবার ধান নাড়িয়া দিতেছিল। উননে ঘুঁটোর আগুণ, তাহার উপর তুষের জাল। গাঁড়ার বৌ তিন কাজে ব্যস্ত, হাতের কিছুমাত্র অবসর নাই, কিন্তু শ্রীমান মধুসূদনও ছাড়িবার পাত্র নহে, বলিল, “গাঁড়ার বৌ তোমার পায়ে পড়ি, একখান ‘ঘসি’ তুলেদাও—না হলে গুরুমশায়ের তামাক খাওয়া হয় না।”—অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই গণ্ডক রমণী একখানি ঘুঁটে তুলিয়া দিল। তখন মধো ওত হইতে কলিকাতে দুই চারিটা টান দিয়া, আগুণটুকু জমকাইয়া, পাঠশালায় ফিরিয়া আসিল, এবং কলিকাটী গুরুমহাশয়ের হুঁকার উপর বসাইয়া দিল।

গুরুমহাশয় হুকাতে একটা টান দিয়াই মধোর পিঠে এক বেত বসাইয়া দিলেন, মধো এ জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না, তাহার কি অপরাধ বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, গুরুমহাশয় বলিলেন “হুকোতে ক বছর জল ফিরেনো হয়নি রে?—যা এখনি জল ফিরিয়ে অ্যান্।”

হুকার জল ফিরান হইলে, গুরুমহাশয় পরিতোষ পূর্ব্বক তামাক সিলিমটি পরিপাক করিয়া বলিলেন “দেখ্ আজ একাদশী, কাল দ্বাদশীর পারণ কর্ত্তে হবে বুঝেছিস্ কি না,

সিধে যেন ভালরকম হয়। গুরুকে সিধে ফাঁকি দেওয়া আর কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়া সমান তা জানিস তো। এখন তোরা সব পড়।”

তখন আবার নূতন করিয়া পাঠ আরম্ভ হইল। কেহ তালপাতায় থাকের কলমে সুর করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল ‘গনসাঁকিড়ি “ক” লেখ’, ‘মাথায় পাকড়ী “ঙ” লেখ’, ‘ছেলে কাঁকালে “ঝ” লেখ’, ‘পালানপিঠে “ঞ” লেখ’, ‘হেঁট ভাঙ্গা “দ” লেখ’, ‘কাণ মোচড়ান “ধ” লেখ’ ইত্যাদি। কেহ ত্রিপদীছন্দ আওড়াইয়া পড়িতে লাগিলঃ—

“বন্দ মাতা সুরধনী, পুরাণে মহিমা শুনি
পতিত পাবনী পুরাতনী
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রবময়ী তব নাম
সুরাসুর নরের জননী।”

কেহ কেহবা সমস্বরে পয়ার পাঠে মনোনিবেশ করিলঃ—

“মুনি বলে শুন অভিমন্যুর নন্দন
কহিব শ্রীকৃষ্ণ লীলা অপূর্ব্ব কথন
ভক্তি করি ভজ রাজা মদন গোপাল
যাঁহার কৃপায় ঘুচে সকল জঞ্জাল।”

শিশুবোধক হইতে এইরূপে ‘কলঙ্ক ভঞ্জন’ পাঠ চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুমহাশয় কয়েকটি ছেলেকে ডাকিয়া শিশুবোধ ব্যাকরণের পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যতম ছাত্র ভজহরি পাঁচ সাতদিনে বর্ত্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিতে না পারাতে গুরু মহাশয় তাহার উপর বিশেষ কুপিত ছিলেন, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন “ভজা একটা অতীত কালের দৃষ্টান্ত দে তো”; ভজহরি অবলীলাক্রমে বলিল “আমি ভাত খাইতেছি,” সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ভয়ে কেহ শব্দ করিয়া হাসিতে পারিল না, গুরুমহাশয় বলিলেন “হাঁ চমৎকার হয়েছে, তোকে আমি ভাল ক’রে ভাত খাওয়াচ্ছি—আচ্ছা একটা বর্ত্তমান কালের দৃষ্টান্ত বল”— ভজহরি বুঝিল আগের উত্তরটার মধ্যে হয়ত কিছু গোলমাল আছে সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল “কাল হরি আসিবে”—শুনিয়া গুরুমহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; প্রমাদ গণিয়া ভজহরি দুই হাত পিছাইয়া গেল, গুরুমহাশয় তাহার দক্ষিণ কাণ ধরিয়া সবেগে নাড়া দিয়া বলিলেন “একশ দিন হতে বুঝোচ্ছি তবু যদি হতভাগা কিছুতে বুঝতে পারবে, এই দেখ এরই নাম বর্ত্তমান।” তাহার কাণ লাল হইয়া উঠিল, তাহার পর ভজহরির বাম কর্ণ নিষ্পীড়িত করিয়া বলিলেন “এই অতীত”—এবং তাহার মাথার চুল ধরিয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া পিঠে একটি সুগুরু মুষ্ট্যাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন “ইহাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে।” তাহার পর তাঁহাকে হাঁটু পাতিয়া রোদের

DAMAGE PAGES,

মধ্যে 'লাড়গোপাল' করিয়া রাখিলেন, কিন্তু লাড়ুর পরিবর্ত্তে দুই হাত একত্র করিয়া তাহার উপর একখান এগার ইঞ্চি লম্বা থান ইট চাপান হইল। দুই ঘণ্টা এইরূপে বসিয়া থাকিয়া বেলা দশটার সময় যখন সটকে ও কড়া গণ্ডা পড়া আরম্ভ হইল তখন সে উঠিয়া আসিতে পাইল।

কড়াগণ্ডা পড়িবার সময় সকলে একত্র সারি দিয়া দাঁড়াইল। প্রথমেই সর্দ্দার পোড়ো আরম্ভ করিল "এক কড়া পোয়া গণ্ডা, দু কড়া আদ গণ্ডা; তিনকড়া পোনে এক গণ্ডা, চার কড়ায় এক গণ্ডা," এইরূপে কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পন সমস্ত পড়া হইলে, সর্দ্দার পোড়ো তারস্বরে নামতা আরম্ভ করিল—'দুই এক্কে দুই, দুই দুগুণে চার, কুড়ি ঘর নামতা পড়া শেষ হইলে পাঠশালার ছুটি হইল। পাততাড়ি বগলে, দোয়াত হাতে হুড়ামুড়ি করিয়া সকলে পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন বেলা প্রায় এগারটা। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা কেহ স্নান করিতে যাইতেছে, কেহ কলসীকক্ষে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, এবং পাঠশালার কাছে বড় বট গাছের তলায় আসিয়া কলসী হইতে ছোট তেলমাখা বাটির একবাটি জল লইয়া বট গাছের গোড়ায় ছড়াইয়া দিয়া প্রণাম করিতেছে। মাছের টুকুই হাতে ও ছোট ছোট চুপড়ী লইয়া কেহ বাজারে যাইতেছে, মেছনীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝোড়াতে মাছ বোঝাই করিয়া বাজারের দিকে ছুটিতেছে, কোন গৃহস্থ তাহাকে ঝোড়া নামাইয়া দুই পয়সার মাছ দিবার জন্য অনুরোধ করিলে সে নথ নাড়িয়া বলিতেছে "এখানে নামাবার সময় নেই, মাছ কিনতে হয়ত বাজারে এস।" —বাজারের কাছে সদর রাস্তার ধারে বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায় তিন চারি খানি খালি গরুর গাড়ি—গাড়োয়ানেরা কেহ বিচালী কাটিতেছে, কেহ দীঘির ঘাট হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া টোকরা বোঝাই করিতেছে, কেহ গাছতলায় 'তিউড়ি খুঁড়িয়া তাহাতে ভাত রাঁধিবার যোগাড় দেখিতেছে। কাপড়ের উপর সাদা চাপকান পরিহিত মুন্সেফী আদালতের আমলারা ছাতামুড়ি দিয়া কাছারী যাইতেছেন।

বাড়ী আসিয়া তেল মাখিয়া কোমরে গামছা জড়াইয়া আমার প্রিয়বন্ধু বোসেদের উপিনের কাছে চলিতাম, আরও কয়েকটি সমপাঠী সেখানে উপস্থিত হইলে দত্তদের আমবাগানে প্রবেশ করা যাইত। নদীর ধারেই দত্তদের বাগান, এই বাগানে একটা কাঁচামিঠে আমগাছ ছিল; এক কোঁচড় আম পাড়িয়া তাহা খাইতে খাইতে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া কত গল্প চলিত তাহার আর অন্ত নাই, উচ্চহাস্যে বাগান পুরিয়া উঠিত, গায়ের তেল শুকাইয়া যাইত, সূর্য্য ঠিক মাথার উপর আসিত, এবং বাড়ীতে ভাত শুকাইয়া জগন্নাথের প্রসাদ হইত কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকিত না। শেষে গোটাকত আশ্শ্যাওড়ার ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন করিতে করিতে জলে ঝাঁপাঝাঁপি, ডুব দিয়া পরস্পরকে ধরিবার চেষ্টা, গামছা ছাকা দিয়া চেলা মাছ ধরা, কোন স্ত্রীলোকের কলসী লইয়া দূরে সাঁতার দিয়া যাওয়া এবং কেহ একটু আগে স্নান করিয়া উঠিলে তাহার গায়ে কাদা ছুড়িয়া মারা এই রূপে বহুক্ষণ কাটিয়া

যাইত। ক্রমাগত ডুব পাড়িয়া চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে এবং আঙ্গুলের ডগাগুলি চুপসিয়া গেলে আমরা আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিতাম।

আমার তালপাতা ছিল না। গুরুমহাশয়ের তাড়ায় আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া সর্দ্দার পোড়ো শিবুকে ধরিলাম, কিন্তু শিবু কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে তাহাকে লোভ দেখাইলাম কাকা কলিকাতা হইতে আমার জন্য লজঞ্জুস আনিলে তাহার অর্দ্ধেক সে ভাগ পাইবে। আহারাদির পর দুপুরের সময় শিবু হেঁসো হাতে লইয়া মণ্ডলদের তালগাছে উঠিল, তিন চারিটা 'ডেগড়ো' কাটিয়া ফেলিল। চাঁচিয়া ছুলিয়া সেগুলি সমান করা হইলে শিবু বলিল এখন ওতে লেখা যাবে না, আগে পচান দিতে হইবে। তদনুসারে আমাদের বাড়ীর কাছে গর্ত্তে পাঁকের মধ্যে সেগুলি পুঁতিয়া রাখা গেল। তিনদিন পরে তুলিয়া দেখা গেল পাতাগুলির বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তখন সেগুলি ধুইয়া রোদে শুকাইয়া লইলাম। এরূপ করিলে তালপাতাগুলি দীর্ঘ ব্যবহারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যায় না, ইহাতে তাহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ বাড়ে।

কিন্তু আর একবিপদ হইল। আমাদের বাড়ীতে যে ইংরেজী কষকালী ছিল তাহাই একটা ছোট আধ পয়সা দামের মাটির দোয়াতে পুরিয়া পাঠশালায় লইয়া যাইতাম; তাল পাতের উপর তাহাতে তেমন দাগ বসিত না, তথাপি কড়াগণ্ডা ও সেবক শ্রী লিখিয়া তালপাতগুলি ভরিয়া গেলে গুরুমহাশয় দীঘির ঘাট হইতে সেগুলি ধুইয়া আনিবার আদেশ করিলেন। আরও অনেকে আমার সঙ্গে চলিল, সকলের তালপাতা ধুইবামাত্র কালী উঠিয়া গেল কিন্তু আমার তালপাতের কালী ওঠে না। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে গুরু মহাশয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইল, শুনিয়া তিনি আমার বুদ্ধি বৃত্তির উপর দোষারোপ করিয়া এবং এক নির্ব্বোধ চতুষ্পদ জন্তুর সহিত আমার উপমা দিয়া আমাকে ইংরেজী কালী ফেলিয়া ঝিউনী দিয়া ভুষার কালী করিতে বলিলেন।

ঝিউনীর কালী তৈয়েরী করা যাহার অভ্যাস আছে তাহার কাছেই কালী ভাল হয়। গদাধর এ বিষয়ে ভারি ওস্তাদ। স্নানযাত্রার দিন রাধাকান্ত দেব আমাদের পাঠশালায় দুধগঙ্গাজলে স্নান করিয়াছিলেন, তাই আমাদের সে দিন পাঠশালা বন্ধ ছিল। বৈকালে আমি ও গদাধর পাড়ার তিন চার বাড়ীতে ঘুরিয়া তাহাদের খোলাহাঁড়ির গা চুল দিয়া ঝাড়িয়া ভুষো সংগ্রহ করিলাম। গদাধরের মা সে সময় চাউল ভাজিবার জন্য খোলা জ্বালিয়াছিলেন, তিনি আমাদের এক খোলা 'ঝিউনী' ভাজিয়া দিলেন; ঝিউনী কাটখোলায় ভাজিতে হয়, অর্থাৎ ইহা ভাজিবার সময় খোলা হাঁড়িতে বালি দেওয়া হয় না। ভাজিতে ভাজিতে চাউল হাঁড়ির মধ্যে ক্রমে পুড়িয়া উঠে, খুব ধূম উঠিতে থাকে, অবশেষে অনেকক্ষণ ভাজিবার পর তাহা পুড়িয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, ইহাই ঝিউনী। ঝিউনীগুলি একখান নেকড়ায় বাঁধিয়া একটা বড় পাথরের বাটিতে জলে ভিজাইয়া রাখা গেল।

পরদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া সেই ঝিউনী জলে ভুষোটুকু খুব করিয়া ঘুটিয়া কালী

DAMAGE PAGES,

তৈয়ারী করিলাম, কালী বেশী চক্‌চকে করিবার জন্য গদাধর তাহাতে খানিক বাবলার আটা ও কলাগাছের রস দিল। এই কালী দোয়াতে পুরিয়া তাহাতে খানিক "কেটো" অর্থাৎ ছেড়া নেকড়া দিবার নিয়ম ছিল, হঠাৎ দোয়াত উল্‌টাইয়া কালীটা পড়িয়া যাইতে পারে এই ভয়েই বোধ হয় এরূপ করা হইত। একালে সে রকম আদ পয়সা দামের মাটীর দোয়াত দেখা যায় না, এবং দোয়াতে 'কেটো' পুরিবার প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে।

দুপুরের পর আবার পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিয়া একসিলিম তামাক টানিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেন, কখন নিজে দুই চারিবার তালপাতার পাখা ঘুরাইয়া শেষে পাখাখানি কোন পোড়োর হাতে দিয়া বাতাস করিতে বলিতেন। যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র তাঁহারই গুরুমহাশয়কে বাতাস করিবার অধিকার ছিল; আর একরকমে গুরুমহাশয় পোড়োদিগের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন, যাহার প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় হইতেন তাহাকে দিয়া মাথার পাকাচুল তুলাইয়া লইতেন, কিন্তু কখন কখন এই অনুগ্রহ নিগ্রহে পরিণত হইত, পাকাচুল তুলিতে তুলিতে সেই সঙ্গে যদি একটা কাঁচা চুল উঠিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না, গুরুমহাশয় তাহাকে পাঠশালার এক কোণে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক পা উঁচু করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিতেন।

অনন্তর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে গুরুমহাশয় একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, সকল পোড়ো হাজির হইয়াছে কি না। একদিন বৈকালে গুরুমহাশয় দেখিলেন দত্তদের কৃষ্ণ পাঠশালায় আসে নাই, গলা চড়াইয়া বলিলেন "কেষ্টা আজ তিন চারদিন পাঠশালায় আসে নি, তাকে ধরে আনতো।"—গুরুমহাশয়ের আদেশে চারিজন সবলকায় ছাত্র কৃষ্ণকে ধরিতে তাহাদের বাড়ী চলিল। কৃষ্ণ বাড়ীতেই ছিল, পোড়োদের পদশব্দ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি মাটকোঠার ভিতরে গিয়া লুকাইয়া রহিল, ছেলেরা তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। কৃষ্ণ দেখিল বিপদ, যদি মাটির কোঠার ভিতর আসিয়া তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করে তবে আর পলাইবার পথ নাই, সুতরাং সে অপরের অসাক্ষাতে ধীরে ধীরে নামিয়া খিড়কী দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল। হঠাৎ একজন দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া হাঁকিল "ঐ কেষ্টা পালায়।"—তৎক্ষণাৎ তাহারা সকলে তাহার পশ্চাতে ছুটিল, কৃষ্ণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল, শেষে বাঁশতলা দিয়া, জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, ডোবা ডিঙ্গাইয়া বাগানের মধ্যে ঢুকিল, ছেলেরা তাহাকে বাগান পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া আসিল, কিন্তু এখানে আসিয়া কৃষ্ণের আর কোন সন্ধান করিতে পারিল না। বাগানের নীচেই নদী, ভগ্নমনোরথ হইয়া নদীর ধার দিয়া তাহারা পাঠশালায় ফিরিয়া চলিল। শুনিতে পাওয়া যাইত কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে শেয়াল ফাঁকি দিয়া পলাইয়া জলে নামিয়া হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসিয়া থাকে; চলিতে চলিতে জলে একটা হাঁড়ি দেখিতে পাইয়া একজন বলিল "ঐ একটা হাঁড়ি ভাস্‌চে, কেষ্টা ঐটে মাথায় দিয়া বসে নেই ত।"—বলিবামাত্র হাঁড়ি তাড়াতাড়ি ভাসিয়া নদীর অপর পারে চলিল, নদীতে বেশী জল নাই, খুব বেশী হইলেও একবুক, সকলেই বুঝিল শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র

হাঁড়িতে মাথা ঢাকিয়া পলায়ন করিতেছেন, ছেলেরা জলে নামিয়া পড়িল। তখন কৃষ্ণ অগত্যা হাঁড়ি ফেলিয়া অপর পারে উঠিল, একজন হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কি কেষ্টো যাওয়া হচ্চে কোথা ?

'তেলও মাখিনে মাছও খাইনে ধর্ম্মে দিয়েছি মন
তুলসী মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।'

মথুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে যাচ্ছ, কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে আর যমুনাপার হতে হবে না।"

বাস্তবিকই নদীতীরে বড় বড় শ্যাওলার নীচে অত্যন্ত পাঁক ছিল, কৃষ্ণ পাঁক ছাড়াইয়া তীরে উঠিতে না উঠিতে গুরুমহাশয়ের দূত চতুষ্টয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অবশেষে কাদা মাখিয়া ভিজে কাপড় সমেত তাহাকে গুরুমহাশয়ের কাছে হাজির করিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, আমাদের পাঠশালার পশ্চাতে ঘাটের রাস্তায় গ্রাম্য যুবতীগণ ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজাইতে বাজাইতে নদীতে গা ধুইতে যাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে তাহাদের হাস্যধ্বনি পাঠশালা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এবং পাঠশালার ছেলেরা দল বাঁধিয়া সুর করিয়া "চার ধানে রতি হয় আট রতিতে মাষা, বারো মাষায় তোলা হয় বলে সর্ব্ব ভাষা।" এই সকল অতি প্রয়োজনীয় ফরমুলা মুখস্থ করিতেছিল। কৃষ্ণকে লইয়া হাজির করিবামাত্র এই পয়ারস্রোত বন্ধ হইয়া গেল, গুরুমহাশয় তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার পিঠে ঘা পনের বেত লাগাইলেন, পরে বলিলেন আজ সমস্ত রাত্রি সে পাঠশালায় বন্ধ থাকিবে, পরদিন সকালে তাহাকে আড়ায় টাঙ্গাইয়া গায়ে জলবিছুতি লাগান হইবে। বেত খাইয়াও কৃষ্ণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই কিন্তু আড়ায় টাঙ্গান ও জলবিছুতির কথা শুনিয়া সে কিছু অধিক কাতর হইয়া পড়িল এবং মাঠিতে পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল, আর ষাঁড়ের মত চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় বেত উছাইয়া বলিলেন "ফের কাঁদবি ? চুপ, নয়ত এখনি জলবিছুতি দেব।" কৃষ্ণ দেখিল এ বড় কঠিন স্থান, কাঁদিয়া বাঁচিবার উপায় নাই, তখন সে গুরুমহাশয়ের পা ধরিয়া বলিল "আজ আমাকে মাপ করুন আমি আর কখন এমন কাজ করবো না।" অনেক কাঁদাকাটির পর গুরুমহাশয় বলিলেন "তবে চোদ্দ হাত মেপে নাকেখত দে, আর পঁচিশ বার নিজের হাতে কাণমলা খা।"—বিশেষ লজ্জাস্কর কাজ হইলেও সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে কৃষ্ণ তাহাই করিতে বাধ্য হইল।

সন্ধ্যাবেলা পাঠশালা ছুটি হইল। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, পাড়ার বৌঝিরা আঁচলের কাপড়ে প্রদীপ ঢাকিয়া এ বাড়ী হইতে ওবাড়ী যাইতেছে, বাজারের মধ্যে দোকানশ্রেণী হইতে যুগপৎ হরিবোলধ্বনি এবং ধূপের গন্ধ উত্থিত হইতেছে, আর অদূরে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিতেছে।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে এ পথ সে পথ ঘুরিয়া, পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে কতক্ষণ বসিয়া, শেষে

DAMAGE PAGES,

পুষ্কর্ণীর অপর পারে জঙ্গলের মধ্যে হইতে শিয়ালের দল 'হুয়া হুয়া' করিয়া ডাকিয়া উঠিলে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। আকাশে হীরকখণ্ডের মত অসংখ্য তারা জ্বলিত, অদূরে তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায় জোনাকীপোকা, ঝোপে ঝোপে অন্ধকারের স্তূপ, মনে পড়িত যখন খুব শিশু ছিলাম তখন দিদিমা ঐ অন্ধকারের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেন 'ঐখানে লেজঝোলা বসিয়া আছে, যে ছেলে কাঁদে তাকেই ঝোলার মধ্যে পুরিয়া লয়,—শুনিয়া রোদন এবং চাঞ্চল্য দুই-ই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইত, ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিত, দিদিমার হরিনামের ঝোলার নীচে মাথা দিয়া তাঁহার কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকাইতাম। এখন বড় হইয়াছি, পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এখনো কিন্তু দিদিমা তেমনি করিয়া আমার ছোট ভাইটিকে কোলের কাছে বসাইয়া কত কি গল্প বলিতেছেন, আকাশের তারা দেখাইয়া কোনটি কোন দেবতা তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন, যেন তিনি আমাদের সকলেরই বাল্যকালের পালয়িত্রী, স্নেহ আদর যত্ন প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার সংসারের কেন্দ্রস্বরূপিনী দেবী; বালক তাঁহার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেছে না, বিনা প্রতিবাদে সকল কথা শুনিয়া যাইতেছে, তখন বালকের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া আমার হাসিবার বয়স হইয়াছিল।

ঠাকুরমার এ সকল কথা অসম্ভব ভাবিয়া হাসিতাম বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া দীপগাছাস্থিত মৃৎপ্রদীপের আলোতে শিশুবোধকের "সান্দিপনীমুনির পাঠশালার" ছবিখানি বাহির করিয়া রামকৃষ্ণের গুরুগৃহবাসের বিবরণ পাঠ করিতাম, তখন গুরুপত্নীর সেই স্নেহের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের এক অপার্থিব সুধা-সমুদ্র নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইতাম। তাহার পর "সেই পুত্রহারা জননী রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে বহুকাল পরে যমের হাত হইতে মৃতপুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন, বৃদ্ধ শোককাতর পিতামাতার সেই আনন্দ-কাহিনী পড়িতে পড়িতে অপূর্ব্ব পুলকে হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিত! এক একবার দ্বাপরের সেই দেবচরিত্র স্নেহময় গুরুর পাঠশালায় যাইতে ইচ্ছা হইত, এবং আহার সারিয়া যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িতাম, ততক্ষণ সেই দেব-শিশুদ্বয়, তাহাদের সখাবৃন্দ, সেই স্নেহ এবং আনন্দ, বৃন্দাবনের তৃণ শ্যামল বিস্তীর্ণ গোচারণ ক্ষেত্র, সুপরিচ্ছন্ন আভীর পল্লীর সমুজ্জ্বল দৃশ্য, পত্রপুষ্পসজ্জিত শোভান্বিত নিভৃত নিকুঞ্জ, পিককুহরিত জ্যোৎস্নাস্নাত অমলসুন্দর শুভ্র রাত্রি এবং কলস্বনা যমুনার জলকল্লোল মনের মধ্যে চিত্রবৎ ফুটিয়া থাকিত। এতদিন পরে এখনো সেই অতীত দৃশ্যের কথা মনে হইলে অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া উঠে এবং এ কালের অনেক আনন্দ অপেক্ষা এই লুপ্তপ্রায় শৈশবস্মৃতি প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়।

কলবেদনা।

তোমাদের মনের কথার যেমন অন্ত নাই, আমার কল্লোলকাহিনীরও সেইরূপ কোথাও ছেদ নাই। সেইজন্য কলসীকক্ষে ঘাটের ভাঙ্গা ধাপগুলি দিয়া পদে পদে তোমাদিগকে যখন নামিয়া আসিতে দেখি উৎসাহে ও আনন্দে আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে—মনে হয়, এই কয়টি ধাপ নামা হইয়া গেলে একেবারে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে ছলছল কলকণ্ঠে সমস্ত কথাগুলি যদি বলিয়া ফেলিতে পারি! কিন্তু মনের কথা বলা আর হয় না। কাঁখ হইতে কলসীটি নামাইয়া তোমরা যেই আমার জলে পদার্পণ কর, তোমাদের কোমল পদপল্লবতলে আমার সমস্ত মনের কথা যেন আবর্ত্তিত হইয়া উঠে। তখন ছলছল কলকল করিয়া একটি কথাও আর খুঁজিয়া পাই না—উৎসাহভরে গণ্ড বাহিয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত ছলাৎ ছলন্ করিয়া উঠি, কিন্তু কি বলিতে আসিয়াছিলাম ভুলিয়া গিয়া লজ্জায় তোমাদের চঞ্চল বাহুমূলে, সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে, তপ্ত বক্ষতলে কোথায় যে মিশিয়া যাইব ভাবিয়া পাই না।

প্রতিদিন এমনি করিয়া বেলা অবসানসময়ে মন বাঁধিয়া আসি, আর তোমাদের মসৃণ চিক্কণ চারু দেহলতার উপর দিয়া মন যেন স্রস্ত হইয়া পড়ে—ঐ কুসুমপেলব যৌবনের পুলকাবেগে তোমাদের নীবীবন্ধের সহিত আমার হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন নিমেষে শিথিল ও বিবশ হইয়া আসে। তখন সুখে সুখবোধ থাকে না, দুঃখে দুঃখবোধ থাকে না, হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরে না, যৌবনে আবেগ রোধ মানে না—সর্ব্বাঙ্গে ছলিত ও কলিত হইয়া উঠিয়া আমি যেন কোথায় ভাসিয়া চলি। তোমরা কি মনে কর জানি না, এবং বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গীতে যখন কম্বুবিনিন্দিত গ্রীবাদেশ মার্জ্জন করিতে করিতে কলকণ্ঠে হাস্যালাপ ও সুখদুঃখের কথা কহিতে থাক তখন আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপের অবসর পাও কি না তাহাও বুঝিতে পারি না;— কিন্তু উহারই মধ্যে এক একবার আগ্রীব আমার নীল তরঙ্গভঙ্গমধ্যে যখন নিমজ্জিত করিয়া দিয়া আমার বক্ষ চুম্বন করতঃ দুইখানি সরল অধরপুট প্রান্ত হইতে তরল জলসেকে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া দাও—বদ্ধ অঞ্জলির কোমল করতল ও চারু আননের নিরুপম সুখস্পর্শমধ্যে আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোল তখন—আমি কি আর বলিব—শুধু কুলুকুলুকলধ্বনি।

সেই জন্যই মনের কথা এ পর্য্যন্ত বলিয়া উঠা হইল না। তোমাদের কথাও যে স্থির হইয়া দুইদণ্ড কাণ পাতিয়া শুনিব তাহাও ঘটিয়া উঠে না। আমার এই চির-আবাহমান কলস্রোতে সকলই যেন ভাসিয়া যায়। একবার যদি তোমাদের মত, হে বন্ধুরগাত্রি সুন্দরিগণ, দুইদণ্ড স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি! একবার যদি অমনি করিয়া একখানি চারু লঘু সূক্ষ্ম বসনবেষ্টনের মধ্যে এই চঞ্চল কলপ্রবাহকে মুহূর্ত্তের জন্য সম্বৃত করিয়া

তুলিতে পারি! হে মানববধূ, তোমার ঐ দেহভঙ্গী ত আমার তরঙ্গভঙ্গেরই মত চঞ্চল, ঐ সর্ব্বাঙ্গসমাচ্ছন্ন রূপযৌবন ত আমারই জলের মত তরল,—তরল লাবণ্যরাশি সিক্ত স্বচ্ছাম্বরের মধ্য দিয়া যেন শতধারে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে—কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে, হে সুনিপুণে, ঐ সূক্ষ্ম এলায়িত বসনলূতাতন্তুজালে ইহাকে এমন ঘেরিয়া রাখিয়াছ? আমাকে একবার সেই মহামায়াবিদ্যায় দীক্ষিত কর—তাহা হইলে বোধ করি আমি একদিন তোমাদের কলভাষণে সম্যক্ যোগ দিয়া তোমাদের সুখেদুঃখে, তোমাদের বিচিত্র বিরহ বেদনা আশা উৎসাহে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারি। আমার কলকল আছে, মনের কথা আছে, কেবল আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়া আমি বলিতে পারিতেছি না বলিয়াই চিরদিন ভাসিয়া চলিয়াছি। এ নিত্য অভিসারযাত্রা আমার আর ভাল লাগে না।

হে বিধি, জন্মান্তরের কত পুণ্যফলেই না জানি এই চিরকাঙ্ক্ষিত মানবীজন্ম লাভ হয়? অমনি করিয়া কলসীকক্ষে সোনার গ্রাম্যপথ দিয়া নিত্য জল সহিতে আসা—পায়ে নূপুর রুণুঝুণু এবং কক্ষের কলসীতে আহত কঙ্কণের মৃদু কিঙ্কিণীধ্বনি; অমনি লুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তে পথের দুইধারের পুষ্পিত সরিষাক্ষেত্রের সুরভি চয়ন করিতে করিতে মৃদু অভিসরণ—পশ্চাতে শুধু গন্ধ এবং আমোদ এবং কনক রেণুকণা; অমনি নিরন্তর কলভাষণে ধাপে ধাপে—যেন ছন্দে ছন্দে—কোমল পদক্ষেপে চারু অবতরণ; এবং অমনি অঞ্চল ভাসাইয়া দিয়া আবক্ষ জলে চঞ্চল গাহনলীলা—তনু অঙ্গসঞ্চালনে, মার্জ্জনে, প্রক্ষালনে শতধারে উচ্ছ্বসিত বিচিত্র বিভঙ্গিমা; আহা, এ সুখ যদি নিমেষের মতও ভোগ করিতে পারিতাম!

আমার এই অনন্ত প্রবাহ তোমরা যদি বারণ করিতে পার—আমার ইচ্ছা করে, তোমাদের পদতলে এইখানে চিরদিন পড়িয়া থাকি। আমার জীবনের যে শুভ মুহূর্ত্তগুলি চিরদিন শুধু খেলাচ্ছলে ভাসিয়া যায় সেইগুলিকে তাহা হইলে বুকের মধ্যে একবার প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ধরি। তোমাদের মত স্বল্পপরিসরমধ্যে একবার এই অনাদি নিরুদ্দেশ চাঞ্চল্যকে অগাধ হৃদয়তলে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া লই।—বিধাতা বোধ করি সুখ দিবে বলিয়াই তোমাদিগকে এমন স্বল্পের মধ্যে সুসঙ্গত করিয়া গড়িয়াছে।—কিন্তু হে মহাদেবতা, আমাকে সুখ নাহি দিতে, বেদনাও ত আমি বুকে করিয়া রাখিতে পারিতাম। এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, আজন্ম ব্যাপিয়া যে বহু সুখদুঃখ বেদনা আশা জীবনে যৌবনে এই নীল বক্ষপরে তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে, তিল তিল করিয়া আজন্মের সেই সমস্ত সঞ্চয় ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু প্রাণপণ করিয়াও তাহার ক্ষীণতম স্মৃতিটুকুমাত্রকেও অন্তরের মধ্যে পোষণ করিতে পারি না!

তাই ত আমার অগাধ জলের মধ্যে তোমাদের পরিপূর্ণ বক্ষতলের প্রগাঢ় পরিরম্ভ যখন অনুভব করি, এক একবার মনে হয় দুইটি কনককপাট উদ্‌ঘাটন করিয়া একবার ঐ বুকের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখি। সাধ যায়, একবার ঐ কূলে কূলে উচ্ছ্বলিত স্ফটিকস্বচ্ছ যৌবনসরসীর মধ্যে তোমাদের মত এমনি মনের সাধে গাহন করিয়া আসি—যেমন করিয়া আমার

বুকের মাঝে তোমাদের তরুণ তনুখানি আগ্রীব আপনাকে দিয়া ঢাকিয়া রাখি, তেমনি করিয়া একবার তোমাদের তরল যৌবনে সর্ব্বাঙ্গসমাচ্ছন্ন হইয়া ঐখানে সম্যক্ সমাহিত হইয়া থাকি; আর যদি, যেমন করিয়া আমার মর্ম্মের কাছে দুইখানি কোমল পদতল কনক নূপুরশিঞ্জিতে একটি রিণিরিণি বেদনা সঞ্জাত করিয়া তোলে, তেমনি করিয়া, আহা, একবারমাত্র—হায় মত্ত আশা, এ দুঃস্বপ্নের কি কোথাও অন্ত নাই!

কুলুকুলু ছলছল। আমি আর বলিতে পারি না—যে কথা বলিতে যাই, বলা শেষ না হইতে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়—বলা আর হয় না। আমি তোমাদের আর্দ্র বসনপ্রান্তে সন্নদ্ধ হইয়া থাকি—বসনের সহিত আমাকেও এই শুষ্ক সৈকতশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া চল। নয়ত, নীবীবন্ধের সহিত আমাকে বাঁধিয়া লও—হে ক্ষীণমধ্যা, আমি তোমাদের ত্রিবলিলাঞ্ছিত কটিতটে সম্বদ্ধ হইয়া এই শূন্য মনোভারের পরপারে উপনীত হই,—যেখানে তোমাদের সহস্র চিরন্তন সুখদুঃখে, অবিরত গল্পগুঞ্জনে, স্নেহে প্রেমে আনন্দে জীবনের শেষাঙ্ক সমাপন করিতে পারি।—ঐ কলসীর কঠিন কনকনে আমাকে কাণায় কাণায় আর বিড়ম্বিত করিয়ো না। ছল ছল ছল ছলাৎ ছলন্।

প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি।

সুবিশাল শব্দসমুদ্র মন্থন করিয়া দেখিলে, ব্যাকরণের উৎপত্তি এবং তাহার নিয়মবদ্ধ প্রণালীপুঞ্জের প্রকৃষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিলে অথবা ভাষা সমূহের ক্রমোন্নতি, আবর্ত্তন, বিপ্রকর্ষণ এবং সম্প্রসারণের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত মনোনিবেশ করিলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, জগতের সভ্যজাতির সাহিত্য সমূহ তদ্দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর যে সকল জাতি সভ্যতার উন্নত, পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া মানব সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহিত্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অপত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন মিসর, চীন, আরব্য, পারস্য, হিন্দু ও হিব্রু জাতির সাহিত্য ইহার উত্তম ও উজ্জ্বল উদাহরণ। হিমালয়ের হিম নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের বিপুল বক্ষ অতিক্রম করতঃ "সনাতন হিন্দু আর্য্য পিতামহ" যখন পঞ্জাব প্রদেশে পদার্পণ করেন, তখন "সাহিত্য" বলিয়া গৌরব করিবার হিন্দুর কোনও বস্তুই ছিল না। বেদের ঋক ও সামভাগ—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অংশ—তাঁহারা বিদেশ হইতেই লইয়া আসিয়াছিলেন, মধ্যআসিয়ার স্থান বিশেষ ইহার প্রণয়ণ বা সংগ্রহক্ষেত্র; যজুঃ (কর্ম্মকাণ্ড) এবং অথর্ব্ব বেদ (চিকিৎসা, সমর, চিত্র, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ) ভারতেই প্রণীত হয়।* বেদের ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা

* Max Muller's "Science of Language," Muir's "Sanskrit Text," Bopp's "Comparative Grammar" এবং Goldstucker's "Panini."

নহে, বেদের ব্যাকরণ অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ নহে। নিরুক্ত মধ্যে বেদ সম্বন্ধীয় যে অতি প্রাচীন বৈয়াকরণিক নিয়মপ্রণালী আছে, তাহা এখনকার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রয়োজিত হইতে পারে না। বেদের ভাষাকে পণ্ডিতেরা "ব্রহ্মভাষা" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; এই প্রাচীন, কঠোর ও কর্কশ, ভাষা ক্রমে সংস্কার * প্রাপ্ত হইয়া "সংস্কৃত" নামে অভিহিত হইয়াছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমোন্নতির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুশত বৎসরে, না জানি বহু সহস্র বৎসরের পরে, ব্রহ্মভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে হিন্দুর জাতীয় ভাষা (সংস্কৃত) ধীরে ধীরে অথচ এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি সহযোগে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার এই পূর্ণাবস্থার নাম "পরিষ্কৃত" বা "পরিশুদ্ধ" অর্থাৎ সংস্কৃত। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলে, প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মচিন্তা প্রশস্ত ও প্রত্যন্ত ভাব ধারণ না করিলে, হিন্দুর সাহিত্য যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না ইহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধির ন্যায় স্বয়ং প্রামাণিক বাক্য। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রই হিন্দুর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসূতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতি এই প্রকাণ্ড সংস্কৃত সাহিত্য-প্রাসাদের "কারিগর" এবং পাণিনি প্রভৃতি ইহার ভিত্তিভূকার †। প্রাচীন ইহুদী জাতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। মহাত্মা খৃষ্ট ইহুদী কুল হইতেই উদ্ভূত। ইহুদী বংশের শাখা হইতেই হজ্‌রৎ পলুশ (St. Paul), হজ্‌রৎ পৎরুষ (St. Peter), হজ্‌রৎ যোহন্না (St. John) প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিম, দায়ূদ, হোশিয়া, দানিয়েল প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য ইহুদীর সন্তান। ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন যদি ইহুদী দেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রগাঢ়রূপে না চলিত, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও প্রকাণ্ডরূপে পরিণত হইত না এবং হিব্রু সাহিত্যও ভাবের গাম্ভীর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি প্রভৃতির জন্য সাহিত্য সুন্দরীর অন্যতম অনান্য সাধারণ অলঙ্কার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। খৃষ্টের মৃত্যুর পরে ইহুদীরা ধর্ম্মালোচনা করে নাই; ধর্ম্মচিন্তায় ইহুদী জাতি প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর হইতে নিশ্চেষ্ট; সুতরাং ইহুদী-সাহিত্য সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র সরোবরের জলরাশির ন্যায় এখন স্থির ও নির্দ্দিষ্ট গতিরই অনুসরণ করিতেছে; চৈনিকের হৃদয়ের ন্যায় একই স্থানে ও একই ভাবে স্থির হইয়া রহিয়াছে। প্রায় সার্দ্ধ তিনবৎসর কাল "আসিয়ামাইনরের" সুবিস্তৃত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ

* "The Sanskrit of the four vedas, the sacred books of the Brahmin religion, is more ancient than the common or classical Sanskrit. Even the latter had ceased to be the language of common life as early as the third Century before Christ..'—Brief History of the English language by James Hadley, L. L. D. (Vide Preface to Webster's Dictionary, 1890).

† এখানে একটি অতীব প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে। ভিত্তিভূকার সংস্কৃত শব্দ, অর্থ—বুনিয়াদ বা ভিত্তির যিনি বন্দোবস্ত করেন।

রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলাম, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি, প্রচার ও উন্নতির ইতিবৃত্ত বিশেষ চিন্তার সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্রই য়িহুদী জাতির সাহিত্যের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান! য়িহুদীদের "তালমুদ" এবং "ইঞ্জিল" (বাইবেল) বোধ হয় একবিংশতিবার পড়িয়াছি; কে বলিবে ধর্ম্মশাস্ত্র সাহিত্যের প্রসূতি নহে? পৃথিবীর যত বড় বড় মহাত্মা "ভবিষ্যদ্বক্তা," "অবতার" অথবা "ঈশ্বরাংশ" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই আসিয়ায় জন্মস্থান। মুশা, ইশা, মহম্মদ, রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই আসিয়াবাসী। য়িহুদীর মুশা হইতে ঈশা পর্য্যন্ত, মুসলমানের মহম্মদ হইতে খোয়াজা নেওয়াজ পর্য্যন্ত এবং হিন্দুর মীনাবতার হইতে মুনিগণ পর্য্যন্ত কেহই আসিয়ার বহির্দ্দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই; আসিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া কাহারও আবির্ভাব হয় নাই। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আসিয়ার লোকের যেন "ইজারা" বা "একচেটিয়া"। ইউরোপ বা আমেরিকায় ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, তথায় ধর্ম্মশাস্ত্র কখনও ছিল না। ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র য়িহুদীরই ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষান্তর, ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্মোপদেষ্টা য়িহুদীরই হজ্‌রৎ ঈশামষি বা "মেশায়া খৃষ্ট"। সুতরাং ইউরোপ ও আমেরিকার আদি ও প্রাচীন সাহিত্য নাই।* সংস্কৃত ভাষাকে আদর্শ এবং আধার করিয়া, প্রসূতিস্থানে বরণ করিয়া, যেমন তাহা হইতে বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, হিব্রু ভাষা হইতে যেমন অন্ততঃ ৫।৭টি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, ইউরোপীয় কোনও আদি ভাষা হইতে অপর ভাষার উৎপত্তি নাই। অনেকে লাটিন, কেল্‌টিক্, চ্যাল্‌ডিক্ প্রভৃতি ভাষার নামোল্লেখ করিয়া বলিতে পারেন, ইহারা আদি ভাষা এবং বহুভাষার প্রসূতি। নব্য শিক্ষিত অদূরদর্শী যুবকে এ কথা বলিলে শুনা যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যাঁহারা বিশেষ অধিকার রাখেন, প্রত্নতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করেন, শব্দসমুদ্র মন্থন করিবার যাঁহাদের সামর্থ আছে, হিব্রু ভাষায় যাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এ নূতন অভিমতি অর্থশূন্য প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপে আদি (original) ভাষা নাই, তথাকার সমুদয় ভাষাই অন্য ভাষার সন্ততি। ইউরোপে (classical) প্রাচীন ভাষা আছে স্বীকার করি; প্রতিভা ও পারদর্শীতাবলে ভাষার মহাসংস্কার হইয়াছে স্বীকার করি; কিন্তু ইউরোপের কোনও ভাষাই "আদি" (original) বলিয়া গৌরব করিতে পারে না। ইউরোপের ধর্ম্ম ও ইউরোপের ভাষা "ইম্‌দাদী চিজ্" অর্থাৎ অন্যজাতির সংগৃহীত ভাণ্ডারের অংশবিশেষ অথবা প্রসাদী নৈবিদ্য। এই জন্য বলিতেছি, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহা সাহিত্য বলিয়া পরিচিত, সাহিত্য বলিয়া যাহা তাঁহারা গৌরব করেন তাহা "আদি" নহে, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের অপত্য নহে, তাহা কেবল "খিচ়ড়ি"

* এস্থলে "আদি" অর্থে original এবং classical বুঝিতে হইবে "The European nations have borrowed their religion and literature from the Asiatics."—Whitney's *Beauties of Language and Literature.* (Trubner & Co.) 2nd ed. p. 62-63.

বা হজ্‌পজ্‌। যে সাহিত্য, স্বদেশীয় বা স্বধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমোন্নতি সহকারে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রণালীর অনুসরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হয় নাই, তাহাকে সাহিত্য বলিয়া কেমনে সম্বোধন করিব? তাহাকে "মধুর" "সুন্দর" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কর ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা সাহিত্য নহে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে দেশে অবতার হয় নাই, যে দেশে "আদি ধর্ম্ম" নাই, সে দেশে আদি সাহিত্যও নাই, সে দেশের সাহিত্য বিমিশ্র এবং অশ্বতরশাবকের ন্যায় আদিত্ব রহিত। আমরা সকলেই এখন প্রায়ই ইংরাজী পড়িতেছি কিন্তু ইংরাজী ব্যাকরণটা কি তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ইংরাজীতে But বি, ইউ, টি = বট্‌ হয়, Put পি, ইউ, টি = পুট্‌ হয়!! Butএর বেলায় কেন বট্‌ হয় আর Putএর বেলায় পট্‌ না হইয়া পুট্‌ কেন হয়, লেনি হইতে আরম্ভ করিয়া হাইলি ও আংগশ্‌ পর্য্যন্ত কোনও ব্যাকরণে তাহার নিয়ম দেখিতে পাই না। হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষায় এমন কদাকার অনিয়ম কোনও স্থানেই নাই। আরব্য ও পারস্য ভাষাতেও কোথাও দেখি নাই। ব্যাকরণ, সাহিত্যের মূল। ব্যাকরণ সাহিত্যাট্টালিকার সুদৃঢ় মহাস্তম্ভ। যাহার ব্যাকরণ এমন, তাহার ভাষাও যে "মূল" নহে একথা ঠিক। ইংরাজেরা পারস্য ভাষার ব্যাকরণকে ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণ অপেক্ষা হীনতর বলিয়া বিবেচনা করেন কিন্তু পারস্য ব্যাকরণ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, ইংরাজী ব্যাকরণ অপেক্ষা শতগুণেরও অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পারস্য ভাষায় মিম্‌, য়োয়াও, বে এই তিন অক্ষর মিলিয়া "মোব্‌" হয়; রে, য়োয়াও, বে এই তিন অক্ষর মিরিয়া "রোব্‌" হয়—রুব্‌ বা রব্‌ কখনই হইতে পারে না।*

* "The Europeans have no literature of their own. * * The languages they talk are of Assiatic origin." Nineteenth Century. vol. XXIV. Page 36. "Methinks, the modern languages of Europe, all put together, will prove a mere synthetical compound of generalised literabecilli of Central Asia from which the antique Aryans have all sprung out." M. Guiotz. (Translation from a "German's view of European languages" published in the "Times of India." Vol. L. dated the 13th June, 1887). "Sanskrit is more ancient than the Hebrew language. * * All Aryan languages have derived from Sanskrit and the latest philological researches have proved that most of the European languages are in the direct line of descent from the ancient Sanskrit to which Chaldean tongue is of other day's origin." Vide Alexander Melville Bell's "Synopsis and synoptical grammar," quoted by Messrs. T. Webb and Rowe of the Calcutta University. "Trace each word to its origin whether as belonging to the oldest or newest forms of languages, or introduced from any of the contemporary speeches or borrowed from the classical tongues, either directly, or through any mixed dialect, you will wonder to see how light is thrown on the primary sense of the word and how every word has a life of its own and is the result of laws of historic growth. * * * It will be seen also that words throw no little light on the history of the men that formed and used them. * * * The labours of the school of philologists, who have done so much during last twenty years to promote the historic and scientific study of languages

গৌরচন্দ্রিমা লিখিতে লিখিতে দেখিতেছি বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে বহুদূরে আসিয়া পড়ি নাই, প্রস্তাবটিকে কিছু বাড়াইয়া ফেলিয়াছি। গৌরচন্দ্রিমা না বাড়াইলে প্রকৃত কথার আলোচনায় অনেক ব্যাঘাত পড়িত এইজন্য গৌরচন্দ্রিমাটিকে একটু বাড়াইতে হইয়াছে, স্বীকার করি। ভাষার সহিত সাহিত্যের এবং সাহিত্যের সহিত অন্যান্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইতে গেলে প্রস্তাবের প্রথমেই নানা কথার অবতারণা করিতে হয়, সংস্কৃতে ইহাকে "নান্দীমুখ" বলে। এই প্রস্তাবের গৌরচন্দ্রিমা ইহার নান্দীমুখ। এই নান্দীমুখ পাঠ করিয়া অনেক পাঠক মতবিভিন্ন হইতে পারেন, অনেক নূতন কথা দেখিয়া বিভিন্ন অভিমতি প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু যাহা আমার বিশ্বাস ও ধারণা আমি তাহারই রটনা করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজী শিক্ষিত নব্য পাঠক ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অভিমতির অনেক প্রতিবাদ করিবেন, এ কথা জানি, কিন্তু তাঁহাদেরই মহাগুরু মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেন স্মরণ থাকে। মিল বলেন "সমগ্র জগৎ যদি একাধারে হয় আর আমি যদি একদিকে কেবল একাকী থাকি, তাহা হইলেও আপনার বিশ্বাস ও অভিমতি প্রচার করিতে জগৎ যেমন অধিকারী, আমিও সেইরূপ অধিকারের ভোগী।"* সে যাহাহউক, সংস্কৃত যেমন অতি প্রাচীন ভাষা, হিব্রুও তেমতি অন্যতম প্রাচীন ভাষা বলিয়া সাহিত্যসমাজে পরিগণিতা ও প্রসিদ্ধা। পুরাকালের লোকেরা আপনাপন ভাষা ও সাহিত্যের মূলে ধর্ম্মশাস্ত্রকে আদর্শ দেখিয়া ভাষা ও সাহিত্যকে বড়ই পবিত্র বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন, এইজন্যই সংস্কৃতের "সংস্কৃত" "দৈববাণী" "দেবভাষা" "ব্রহ্মভাষা" "সনাতন" প্রভৃতি নামাবলী দেখা যায় এবং এইজন্যই ইহুদীদিগের জাতীয় ভাষা "হিব্রু" বা "হবর্‌ অথবা "ইব্রিয়" বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; অর্থ—"প্রাপ্ত" (ঈশ্বরাদেশে বা প্রত্যাদেশে প্রকাশিত বা প্রাপ্ত)। এই হিব্রুভাষা আরবী ভাষার প্রসূতি, আরব্য ভাষার ইহাই প্রত্যক্ষ মূল। আরব্য "আদি" (original) ভাষা নহে, হিব্রু ভাষা হইতেই তাহা সমুৎপন্ন। সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষা ভিন্ন জগতের আর কোনও ভাষাই আদি বা সনাতন অথবা অমিশ্র নহে। এই হিব্রু ভাষা হইতে আরব্য ভাষা উৎপন্ন হইয়া কোরাণে ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা প্রাপ্তি হইয়াছে। আরব্য ভাষা কঠিন ও কর্কশ কিন্তু হিব্রু ও সংস্কৃত ভিন্ন আর কোনও ভাষার ব্যাকরণ আরব্য ব্যাকরণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে। আরব্য

have not been fruitless; * * * the latest discovery that Sanskrit is the mother of all aryan languages holds still good." Philological Essays by Professor Edward S. Sheldon (Harvard University.) য়োয়েবেষ্টার সাহেবের প্রকাণ্ড ইংরাজী শব্দাম্বুধিতে (নূতন সংস্করণে) ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত ভাষা ইউরোপীয় "মিশ্রিত" ভাষা সমূহের মূল।

* "If the whole world were on one side and I on another, I would be as much justified to hold my own as the other." I. S. Mill.

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি, অনুকরণ ও অনুবাদে; সংস্কৃত ও হিব্রু সাহিত্যের পূর্ণতা—আদিমত্বে। হরণ্-উল্-রসিদ নামক সুবিখ্যাত সম্রাটের শাসনকালে নানা দেশীয় ভাষা হইতে নানা জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ আরব্য ভাষায় প্রচুররূপে প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি আরব্য সাহিত্য মধুরতা প্রাপ্ত হয় নাই। কোরাণে আরব্য ভাষা এক আশ্চর্য্য মধুরতা প্রাপ্ত হইয়া জগতকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। ভাষার লালিত্য, শব্দবিন্যাসের অসাধারণ চাতুরী, ভাবের গাম্ভীর্য্য, ভক্তির উচ্ছলতা প্রভৃতি লইয়া বিচার করিলে কোরাণসরিফ জগতের এক অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই গ্রন্থে এমন এক অসাধারণ চাতুরী ও মধুরতার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় যেন গ্রন্থের সর্ব্বত্র "উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে"। সমগ্র কোরাণ গদ্যে বিরচিত, ইহা ত্রিশভাগে বিভক্ত, এক এক ভাগের নাম "সেপারা"। এক এক সেপারা আবার নানা অংশে বিভক্ত, এক এক অংশের নাম সুরৎ। এই কোরাণ গদ্যে বিরচিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা পাঠকালে ইহাকে পদ্যগ্রন্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে। এমন আশ্চর্য্য গদ্যগ্রন্থ জগতে বিরল; পদ্যের প্রণালীতে গদ্য লেখা কতদূর বাহাদুরীর কর্ম্ম, তাহা সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সহজেই বুঝিতে পারেন। ব্যাকরণের নিয়মবদ্ধ প্রণালীর বিন্দুমাত্র বিরোধী না হইয়া, শব্দালঙ্কারের নিয়ম সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রক্ষা করিয়া, গদ্যময়গ্রন্থকে এমন আশ্চর্য্য পদ্যপ্রণালীতে পরিণত করিবার ক্ষমতা পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় বা সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা এস্থলে কোরাণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দুইটি অংশের পংক্তিগুলি মূল আরব্য ভাষায় এবং বাঙ্গালা অক্ষরে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উচ্চারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে; পাঠক সহজেই এই রচনার "বাহাদুরী" বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

মূল কোরাণ।

প্রথম সেপারা।

(সুরৎ উল্ বকর্ বা আল্‌হাম্‌দো।)

১। আল্ হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিউল্ আল্‌মীন।
বিস্‌মিল্লা আর্ রহমা নীর্ রহিম্॥
মালিকে ইয়া মুদ্দীন।
ইয়াকা নবুদো ও ইয়াকা নস্তাইন।
ইহদিনস্ সরাতিল মুস্‌ত কিমা।
সরাতীল লজিনা আনে আম্‌তা আলেহিম্॥
গয়ের ইল মকৃদবে আলেহিম্॥
য়লদ্ দোয়াল্লিন॥

প্রথম সেপারা।

(সুরৎ উলনাস।)

২। কুলা উজো বে রব্বিল নাস।
মালিকীন্নাস।
ইলাহিন্নাস।
মীন সর্‌রীল্ বসোয়াসীল খন্নাস॥
আল্লাউজো, বস্‌বেশো,
ইসফদ্দূ রন্নাশ।
মীনল্ জিন্নতে উন্নাস॥

এ সকল খাস আরব্য গদ্য, কিন্তু গদ্য কে বলিবে? সাশ্রুলোচনে প্রেমভরা কণ্ঠে, ভক্তির আসনে বসিয়া বৃদ্ধ মৌলবী মহাশয় মস্‌জিদের মজারায় হাত রাখিয়া যখন কোরাণ পাঠ করিতে থাকেন তখন প্রস্তর-কঠোর হৃদয়ও ক্রমে বিগলিত হয়, গ্রন্থের মর্ম্ম না বুঝিয়াও চক্ষুর জলে কপোলকে সিক্ত করিয়া দেয়। অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস এই যে, "কোরাণ কিছুই নয়।"* ইহা মূর্খের কথা। কোরাণ জগতে এক মহামূল্য রত্ন; সাহিত্য সুন্দরীর ইহা এক অপূর্ব্ব অলঙ্কার; সদ্বিদ্বানের ইহা এক আলোচ্য গ্রন্থ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদের ইহা এক মহা সহায়। এই কোরাণ মুসলমানদিগের একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহারই বলে মুসলমানের বল, ইহারই নামে মুসলমানের মুসলমানত্ব। কোরাণের নামে মুসলমানের দেহস্থ শোণিত খরতর বেগে ছুটে, কোরাণের নামে জেহাদ রটে, কোরাণের বলে মুসলমান কাফের বিনাসে দৌড়ে এবং কোরাণের দর্পণে তাহারা দেবদুর্লভ "হুর" পরিবৃত স্বর্গের হিরণ্ময় দ্বারকে উন্মুক্ত দেখে। এই ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ পারস্যসাহিত্যের পিতা, পারস্যসাহিত্যের স্রষ্টা। পুরাকালে সংস্কৃত ভাষা যখন ব্রাহ্মণের কথোপকথন ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল, তখন

পৃথিবীর বহুসংখ্যক ভাষায় কোরাণ অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজীতে সেকেল, হুইট্‌নী এবং
মারের অনুবাদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ফরাসী ভাষায় জোলেফিয়া, পর্টুগীজ ভাষায় জারুবা, ডচ্ ভাষায়
কা, জর্ম্মণ ভাষায় জোষ্ট, তুর্ক ভাষায় হাম্‌দিন, হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত শঙ্করলাল এবং উর্দ্দু ভাষায় মৌলবী
জুদ্দীন, হাজি সমস্‌উল্ মিয়া এবং লক্ষৌ মেথডীষ্ট পাদ্রীদিগের কর্ত্তৃক অনুবাদ বেশ সরল সুন্দর ও
ক্ষপাতী হইয়াছে। ইংরাজীতে সেল সাহেবের (George Sale) অনুবাদিত কোরাণ বিশেষ প্রসিদ্ধ,
এই অনুবাদ পক্ষপাতদোষভ্রষ্ট নহে। আমরা এই অনুবাদের পক্ষপাতী নহি। বাঙ্গালায় কোরাণের
নটি অনুবাদ আছে। বর্দ্ধমান জেলার বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কোরাণের সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা অনুবাদ করেন,
ন্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ইহার অনুবাদ আরম্ভ হয়। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল নিবাসী
শিক্ষিত মুসলমান যুবক কোরাণের উত্তম বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের
জাম সাহেবের ব্যয়ে ও আদেশে সমগ্র কোরাণের উর্দ্দু ও ইংরাজী তরজমা হইতেছে। পারস্য ভাষায়
কারাণের তিনটি অনুবাদ আছে, ইহাদের একটি মাত্র এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

এই ভাষার মধুরতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল ; অশোকবনে সীতান্বেষণে প্রেরিত হনুমান বলিয়াছেন "যদি বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতম্।" ইহাতেই বোধ হইতেছে ব্রাহ্মণের এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা সাধারণ কথোপকথনীয় ভাষা ছিল, আরব্য ভাষাও এক সময়ে কোরাণে অত্যন্ত মধুরত্ব প্রাপ্ত হইয়া "উলেমা" (পণ্ডিত) দিগের কথনীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।* আরব্য ভাষার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ইহুদী দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন ইউরোপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে উৎপন্ন হইয়া ভারতের বহির্দ্দেশে (চীন, তিব্বত, জাপান, সিংহল, সায়াম প্রভৃতি দেশে) যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আরব্য ভাষা অনুর্ব্বর আরব্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তেমনি আরব্য দেশে উন্নতি প্রাপ্ত না হইয়া বিদেশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। "কোরাণ" আরব্য সাহিত্য নহে, ইহা আরব্য ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র। আরব্য দেশ স্বভাবতঃ অনুর্ব্বরা জলবিহীন, পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত এবং তরুলতার জন্য প্রশস্ত নহে। ইহার অধিবাসীরা সবল ও সাহসী কিন্তু চিরকালই দরিদ্র, চিরকালই অসভ্যাবস্থাতেও স্বাধীন। আরব্য দেশ কেহ কখন আক্রমণ করে নাই, কেহ কখন ইহার অধিবাসীদিগকে যুদ্ধে বিজিত করে নাই। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় আরবই একমাত্র দেশ যথায় অন্য দেশীয় রাজা যুদ্ধার্থে কখনও প্রবেশ করে নাই। এইজন্য আরবের স্বাধীনতা এখনও অটুটভাবে বর্ত্তমান। আরবের ষোল আনা লোকের মধ্যে দশ আনা লোক এখনও ভ্রমণ বা ডাকাইতের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এইজন্য অন্য স্থানে আরব্য ভাষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, খাস আরবীয়ের ভাষা আদিতে যেমন কঠোর, কর্কশ ও কায়দাবিহীন ছিল, এখনও সেইভাবেই বর্ত্তমান। আরব্য ভাষা মুসলমান সাহিত্যের জননী, ইহা হইতে পারস্য এবং পারস্য হইতে উর্দ্দূ, তুর্ক, পস্ত, কুর্দ্দীস্তানী প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। পারস্য অতি প্রাচীন দেশ, ইহার ভাষা অতি মনোহারিণী এবং ইহার উন্নতি চমৎকারিণী। এই ভাষা (আরব্য হইতে উৎপন্না বলিয়া) ফারস, পারস, ইরিণ, ইরাণী অর্থাৎ "শুদ্ধ" "পরিষ্কৃত" প্রভৃতি না[illegible] প্রসিদ্ধা। পারস্যের ইতিহাস আছে, আরবের ইতিহাস নাই। মহম্মদকে বাদ দিলে, আরব পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বাদ দেওয়া যায়। পারস্য ধন, মান, সাহিত্য শিল্প, রাজনী[illegible] প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহা জগতের অন্যতম প্রাচীন সভ্য জনপ[illegible] পূর্ব্বে পারস্য ও আরব দেশের মধ্যদেশে ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহে "কোরেশ্" নামে অ[illegible] প্রাচীন মানব সম্প্রদায় বাস করিত, তাহারা সাহসী, স্বাধীনপ্রকৃতিক এবং মূর্ত্তিউপাস[illegible] ছিল। এই বংশ হইতেই মহম্মদের জন্ম। পারস্যে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে আরব ভাষার চর্চ্চা ছিল, কিন্তু সে চর্চ্চা অতি সামান্য—নাম মাত্র। এই সময়ে গ্রীসের অনে[illegible] অংশেও আরব্য ভাষা প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। বাইবেল পাঠ করিলে ইহার বিশে[illegible]

* এস্থলে বলা বাহুল্য আরব্যদেশের অসভ্য অধিবাসীর কথনীয় ককশ ভাষা এবং আরব্য গ্রন্থের ভাষ[illegible] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।* পারস্য ভাষা এখন যে আকার ও ভাবে বর্ত্তমান, পুরাকালে তাহা ছিল না। জেম্স্ হাড্‌লি সাহেব লিখিয়াছেন † "পারস্য সাহিত্যের আদিমত্ব জেন্দ ভাষায় বর্ত্তমান," এই ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ জেন্দাবস্তা গ্রন্থ বিরচিত। জেন্দ ভাষা এখন অপ্রচলিত ; সংস্কৃতভাষা যেমন আর পৃথিবীর কোনও স্থানেই কথোপকথনীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় না, জেন্দ ভাষার অবস্থাও ঠিক তাহাই। আরব্য ভাষার সংস্রবে আধুনিক পারস্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ; জেন্দ ভাষার পূর্ণতা হয় নাই ; আরব্য ভাষা হইতেই আধুনিক ফার্শীর পূর্ণোন্নতি। ডাক্তার হল ‡ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন, "একদিকে মুসলমান ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার, প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রথার লোপের নিষ্ঠুর চেষ্টা, অন্য দিকে বহ্নিপূজা সমর্থনের জন্য পরিশ্রম, ইত্যাদি কারণে পারস্যে কেবল হাতে হাতে লড়াই করিয়াই লোকেরা ক্ষান্ত হয় নাই, কলমের লড়াইও বেশ চলিয়াছিল। * * ক্রমোন্নতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন, আরব্য ভাষার চর্চ্চায় আধুনিক পারস্যের শ্রীবৃদ্ধি।" এই পারস্য সাহিত্য, নিজামুদ্দীন, দেওয়ান হাফেজ, জামি, আবল্‌ফজ্‌ল, মীর খস্‌রো, ফর্দ্দোশী, সেখ সাদি প্রভৃতির হস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পারস্য ভাষা মধুময়ী এবং শিক্ষার্থীর নিকটে সহজ ও সরল। সেখ সাদি এখনকার ফার্শী সাহিত্যের রাজা, তিনিই অধুনাতন ফার্শীর "কবি চূড়ামণি" (Poet Laureate)। মোলানা সেখসাদি মৃত হইয়াও জীবিত, আধুনিক পারস্যসাহিত্যের পিতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। সেখ সাদির গোলেস্তা, বোস্তা, পন্দ্‌নামা প্রভৃতি পারস্যের প্রশস্ত সাহিত্যোদ্যানের অত্যুত্তম প্রসূন। সেখ সাদি ফার্শীতে বোধ হয় অনুপ্রাসের প্রথম সূত্রপাত করেন। অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া ফার্শীভাষাকে তিনি বড়ই মধুময়ী করিয়া

* Vide Acts of the Apostles in the N. Testament.

† "To the Iranian branch belong—First, The Zend, which is believed to have [illegible]he language of ancient Bactria, and is preserved in the Avesta, or sacred writings [illegible] Parsees. Secondly, The old Persian, which is seen in the cuneiform (or arrow-[illegible]d) inscriptions of Darius and Xerxes. The modern Persian has lost nearly all [illegible]cient inflection, and with tha Mahomedan religion has adopted a multitude of [illegible] from the Arabic. Other languages belonging to this branch are those of the [illegible], the Afghans, and the Ossetes (in the mount Caucasus). The Armenian, ancient [illegible]modern, formerly regarded as belonging to the Iranian family, is now recognised [illegible] independent branch of the Indo-European stock. The Indian and Iranian are classed together as forming the Indo-Persian, or Aryan, branch of the Great [illegible]ly." Brief History of the English Language. By James Hadley, L.L.D. (Vide [illegible]ster's Dictionary, 1890 Introduction).

‡ Dr. Haul's "Zendavesta ;" Dr. Haul's "History of the Ancient Parsis ;" Green's [illegible]tory of Persia and Greece ;" Jonathan's "English Translation of Shahanama," [illegible]le intro. pp. 39-43) ; Dr. Rajendra Lal Mitter's "All about the Parsis ;" এবং [illegible]ndian Antiquary' Vol. IX. মধ্যে Vide "The Persian colonists in India." By Pro-[illegible]essor Cowasjee S. Dádur.

তুলিয়াছেন। কিন্তু এহ নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসের আড়ম্বরে তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের শ্রাদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

"মকুণ এল্‌তফাতে বমালে বখিল;
মবর্ নামে মালো মনালে বখিল ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে ছন্দ ও ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। সেখ সাদির অনুপ্রাস লিখিবার প্রথাটা, কবি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত অনেকটা মিলে। গুপ্তকবি অনেক সময়ে অনুপ্রাসের কুহকে পড়িয়া অর্থশূন্য প্রলাপ লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্‌যথা—

"গড়ের মাঠে গরুর গাড়ি গড়্‌গড়িয়ে যায়।
মনের সুখে মৌ-মাছি মধুচাক্ খায় ॥
নাপিত ভায়ার নায়ে কড়ি ন কড়া বৈ নাই।
ডিঙ্গি মাঝি রইল বোসে, ডিক্রী দিলেন রাই ॥"

ইহার কোনও অর্থ আছে কি? ইহা শুনিয়া বাঁকুড়া বনবিষ্ণুপুরের ভাষায় এক গ্রাম্য "কবিওয়ালা"র এক হাসির কবিতা মনে পড়িল।

"হাঁড়ি কোণে মেঘ নেমেছে, উড়ে যায় গরু।
বাগান বাড়ীতে ফুল ফোটে নাই, মুখটা কেন সরু?
হাঁড়ি কোণে মেঘ নেমেছে, মামীর মামা পিশে।
কাপড় খানা কেড়ে নেবো, ঘাসংকাট্‌বি কিসে?"

ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন "খানপুরের খাঁ সাহেব খাঁসি রোগে খক্ খক্ খক্ খক্ খাঁসিতে খাঁসিতে বলিলেন, আজ খাসী খাইব; অমনি খাঁড়া লয়ে খাড়া হোয়ে খাগরা বনের পিছে খাঁ সাহেবের খয়েরখায়ী নোকীব খাস্তা খাঁ খাসী কাট্‌তে ক্ষিপ্র হলো।" সেখ সা... অনুপ্রাসের অনেকস্থলে এরূপ দেখা যায়। আমরা সাহিত্যের অনুপ্রাসের পক্ষ... বিরোধী নহি। ঘনরাম, ভারতচন্দ্র, বাসবদত্তার গ্রন্থকার, রামনারায়ণ, কাদম্বরী অ... কার প্রভৃতি মহাত্মারা যে অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে মনোহারিণী, ম... ও ওজস্বিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইয়া আসি... কিন্তু সংস্কৃত হইতে নিঃসৃত ভাষাপুঞ্জে অনুপ্রাস যেমন খাটে, যেমন শোভা পায়, ... শুনিতে ভাল লাগে, আরব্য বা হিব্রু ভাষা হইতে নিঃসৃত ভাষাসমূহে তেমন মধু... "মজাদার" বলিয়া বোধ হয় না।

এইরূপে অতি প্রাচীনতম "আদি" ভাষাসমূহ ক্রমোন্নতি সহকারে, দেশকাল ভেদে, নানা কারণে নানা প্রকার সংস্পর্শে পরিশেষে পূর্ণোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মানব সমা... শিক্ষা, শক্তি, সভ্যতা ও চরিত্রের আধার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্য, মানবজাতি... মহাশক্তি; সাহিত্য, মানব সমাজের মহা সহায়। স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যে...

আলোচনা ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পৃথিবীর কোনও জাতিই সভ্যতার উন্নত, পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই—No nation can attain to greatness without literature of its own—ইতিহাসের এই মহাজ্ঞানগর্ভ বাক্য, সভ্যতম জনপদের এই প্রাচীন প্রবাদ, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর সততই স্মরণ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অধঃপতিত বঙ্গ সন্তানের যদি কখনও আবার পূর্ণোন্নতি হয়, যদি বঙ্গসমাজ কখনও সভ্যজাতির অত্যুন্নত সমাজের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহা হইলে বঙ্গভাষার আলোচনা ও বঙ্গভাষার পূর্ণোন্নতিতে তাহা হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস, ইহাই আমার ধারণা। জননী বঙ্গভূমির ভাষা ও সাহিত্যের যিনি পোষক, যিনি মাতৃভাষার সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি নরাকারেও দেবতা, তিনি বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পূজ্যপুরুষ।

কাহাকে?

Man's love is of man's life a thing apart.
'Tis woman's whole existence.

এ কথা যিনি বলিয়াছেন তিনি একজন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীর অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারী আশ্চর্য্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া অক্ষরে অক্ষরে এ কথার সত্যতা অনুভব করি। যত দূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন স... জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি তখন হইতে দেখিতে পাই—কেবল ভালবাসিয়াই ...দি ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা; সে পদার্থটাকে আমা হইতে ...লে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে—আমার আমিত্বই লোপ ...বা!

...আমার বয়স কত? সাল তারিখ ধরিয়া এখনি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে ... না। আমাদের দুইবোনের কাহারো জন্মকোষ্ঠি বা ঠিকুজি নাই তাই ...সময়ে অসময়ে এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে ...নিতে পাই, কিন্তু এতবার এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে আবার করিতে লজ্জাও করে, তাহা ছাড়া এ মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসার সুবিধাও নাই; আপাততঃ ...দূরে আছি। একবার একখানা গানের খাতার কোণে তারিখটা লিখিয়াও ...ছিলাম কিন্তু খাতাখানা খুঁজিতে গিয়া শৈশবের বড় বড় মক্সওয়ালা ক খ লেখা ...গজপত্রের কাঁড়িগুলা পর্য্যন্ত মিলিল; কেবল সেইখানাই পাওয়া গেল না। পুরুষে সম্ভবতঃ আমার সারল্যে অবিশ্বাস করিয়া ইহার মধ্য হইতে গূঢ় অভিপ্রায় টানিয়া বাহির

DAMAGE PAGES,

করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোকে বুঝিবেন, বাস্তবিক পক্ষে সাল তারিখ মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কিরূপ বৃহৎ ব্যাপার। বরঞ্চ ঘটনার ছবি হইতে তাহার আনুষঙ্গিক বার তিথি আমরা ঠিক ধরিতে পারি কিন্তু তিথি নক্ষত্র আগে মনে করিয়া যদি ঘটনা মনে করিতে হয় তাহা হইলে ঘটনাটির কালাশুদ্ধি হইবার ষোল আনাই সম্ভাবনা। কথাটি দেখিতেছি স্পষ্ট হইল না—অন্য রকমে বলিতে চেষ্টা করি। এই আমার দিদির বিবাহ-রূপ একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে—পূর্ণিমা নিশিতে তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল চোখের উপর এখনো জলজীবন্ত দেখিতেছি,—তাই এ বিবাহের কথা মনে পড়িলেই আমার সেই সময়টাও ঠিক মনে পড়ে। আর কখনো যে তাহা ভুলিব এমন সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না। উক্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি সেই সালটাও বলিতে পারি,—তবে ফাল্গুন মাস ও পূর্ণিমা তিথির মত, বসন্ত বাতাস জ্যোৎস্নালোক বা অন্য কোন কিছুতে যেহেতু সালটা চিহ্ন যুক্ত, উপরঞ্জিত নহে, কেবল অঙ্কের সাঙ্গেতিক চিহ্নে ব্যতীত—ছবিগত বা আকারগত সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যে একসাল হইতে অন্য সাল যেহেতু তফাৎ করিতে পারা যায় না—কালের নিকট সকল সালের চেহারা সমানই, সেই-জন্য সাকার পূজা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বর ধ্যানের ন্যায় মাস তিথি অপেক্ষা সালটাকে মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। তবে দিদির বিবাহ যেন দেখিয়াছি এখনকার সালটা ধরিয়া ১০ বৎসর পূর্ব্বের সালটা তাই সহজেই গণনা করিয়া লইতে পারি, কিন্তু এ নিয়মে ত আর নিজের জন্মসালও ঠিক করা যায় না, বিধাতা পুরুষ তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। সৃষ্টির একি এক অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিতে পারি না—মানব জন্মগ্রহণ করে ধরাতলে অমনি আকাশের তারা নক্ষত্ররাশি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া তাহার ভাগ্য রচনা করিতে বসে, আর সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আত্মীয় যে স্মৃতি তাহাকে সে তখন একেবারে হারাইয়া অন্ততঃ সে সময় স্মৃতির সহিত মানুষের কোন সম্পর্কই থাকে না। এখানে তাই অঙ্কের সঙ্কেতে অর্থাৎ সালের খাতিরে সালটা মনে রাখিতে গিয়াই যত মুস্কিল বাধিয়াছে; তাহা ১২৮২ বা ৮৩ ক্রমাগতই ভুল হইয়া যায়। কিন্তু অকস্মাৎ বুদ্ধি জোগাইল এ ভুলে ক্ষতি কাহার? আমারো নহে পাঠকেরো নহে। অবশ্য এ রকম একটা ভুলে জীবনে যদি সুদীর্ঘ তিনশত চৌষট্টি দিন ও বারটা মাসওয়ালা একটা বৃহৎ সম্বৎসরের ব্যবধান পড়িত তাহা হইলে ক্ষুদ্রজীব একজন মনুষ্যের পক্ষে তাহাতে বিস্তর তফাৎ করিয়া তুলিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হাজার ভুলি না কেন, কাল আমাকে কিছুতেই ভুলিবে না, বয়স আমার সর্ব্ব অবস্থাতেই কড়ায় গণ্ডায় ঠিকটি থাকিয়া যাইবে—আর পাঠকের পক্ষে—আমি উনিশ না হইয়া যদি বিশ হই, কিম্বা বিশ না হইয়া যদি একুশই হই—সবই সমান কথা। যতদূর বুঝিতেছি তিনি কেবল বিষয়টার একটা শেষ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারিলেই বরঞ্চ অধিকতর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, নিষ্পত্তিটা ঠিক বা বেঠিক হউক

তাহাতে কি এত আসিয়া যায়? এ প্রকৃতি পুরাতত্ত্ববিদেরই একচেটিয়া নহে। তবে ধরিয়া লওয়া যাক, আমার বয়স তখন 'সতের' আঠার। আমি এখনো অবিবাহিত।—শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য্য হইতেছেন? কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কি আছে? আজকাল ত এমন অনেকেই ইহার চেয়েও অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকেন—আমিও না হয় আছি। ইহাই যদি বিস্ময়জনক হয় তবে অধিকতর বিস্ময়ের কথা পরে আসিতেছে। আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্ব্বেই ভালবাসি; তিনি যে স্বামী হইবেন এমন তর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই—কেবল তাহাই নহে, ইনিই আমার একমাত্র প্রথম এবং শেষ ভালবাসা নহেন। ইহাকে ভাল বাসিবার পূর্ব্বে আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। মেয়ে আবার বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া এতদিন অবিবাহিত আছি—অবিবাহিত অবস্থায় ভালও বাসিয়াছি—আবার কথোকথা উপকথা উপন্যাসের গণ্ডি ছাড়াইয়া একবারের অধিক দুই-বারো ভালবাসিয়াছি—(ভগ্ন হৃদয়ে না মরিয়া) এরূপ সমাজ ছাড়া বেপরোয়া মুক্তকণ্ঠতায় যাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইবে—তিনি যেন এইখানেই মলাট বন্ধ করেন। সেই ক্ষুদ্রদৃষ্টি সত্যাসহিষ্ণু সমাজ কীটের জন্য আমার এ ইতিহাস লিখিত হইতেছে না। যাঁহার সহানুভূতি সমাজের পূঁতিগন্ধময় রুদ্ধ বায়ুর বাহিরে বিস্তৃত, স্ত্রীপুরুষ বা সমাজ অসমাজ নির্ব্বিভেদে মনুষ্য হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত স্বাভাবিক ভাব তরঙ্গের মধ্যে মগ্ন হইয়া যিনি জ্ঞানানন্দ লাভ করিতে পারেন, উদার সহৃদয়তায় যিনি মানুষের সুখ দুঃখের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করিতে সক্ষম, সত্য ন্যায় প্রেমের যিনি প্রকৃত রসগ্রাহী আমার এ মনের কথা তাঁহারই জন্য।—তিনি যদি আমার স্বজাতি রমণী হন ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—স্বজনি তোমার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া সত্য কথা বল দেখি—আমি যাহা বলিতেছি তাহা তোমার পক্ষেও সত্য কি না? আমারই মতন তুমিও চিরকাল ভালবাসিয়াই আসিতেছ কি না। তবে যদি তোমার বলিতে কোন বাধা থাকে ত, বলিয়া কাজ নাই আমার কথাই শুনিয়া যাও, শুনিয়া আমারই ভালবাসার সম্বন্ধে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য মন্তব্য টীকা টিপ্পনী সমস্ত অসঙ্কোচে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ কর—তাহা শুনিবার জন্যই আমার এ ইতিহাস লেখা। আমি তোমাকে অসঙ্কোচে বলিতেছি, আগেও বলিয়াছি এখনো বলিতেছি—ভালবাসাই আমার জীবন। আমি ইহাকে যখন ভালবাসি নাই, তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম—আর তাহাকে যখন বাসি নাই তখনো আমার হৃদয় শূন্য ছিল না। মাকে মনে পড়ে না, শিশুকালেই আমি মাতৃহারা, কিন্তু শৈশবে বাবাকে যেমন ভালবাসিতাম কোন সন্তান মাকে যে তাহার অধিক ভালবাসিতে পারে এরূপ আমি কল্পনাও করিতে পারি না। অনেকেরই সংস্কার আছে পিতৃমাতৃপ্রেম ও দাম্পত্যপ্রেম পরস্পর নির্লিপ্ত পৃথক দুইবস্তু, একের সহিত অন্যের তুলনাই অসঙ্গত অসম্ভব। তুমি আমার সহিত মিলিবে কি না জানি না—আমার কিন্তু ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার অভিজ্ঞতায় শৈশবের মাতৃপ্রেমে ও যৌবনের দাম্পত্যপ্রেমে অল্পই তফাৎ। যৌবনে প্রণয়ীরই মত, শৈশবে পিতামাতা

আমাদের একমাত্র নির্ভরের সামগ্রী, পূজার সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী, পিতামাতা রক্ষক দেবতা প্রণয়ী, একাধারে সর্ব্বস্ব। উভয় প্রেমেই—সেই আসঙ্গলিপ্সা, সারাদিন চোখে চোখে রাখিতে সাধ, প্রাণে প্রাণে আপনার করিবার ইচ্ছা, সম্পূর্ণভাবে নিজে দখল করিয়া রাখিবার বাসনা, না পাইলে পরম অতৃপ্তি, তাহার সুখে সুখ, তাহার সুখের জন্য কষ্ট স্বীকারে আনন্দ, এ সমস্ত একই রকম।

আমরা দুই বোন, কিন্তু দিদির সঙ্গে আমার তেমন ভাব হইতে পারে নাই কেননা তিনি বেশীর ভাগ পিসিমার কাছে কলিকাতায় থাকিতেন। তবুও দিদিকে খুব ভাল বাসিতাম; তিনি বাড়ী আসিলে আনন্দ হইত; কিন্তু বাড়ী আসিয়া দিদি যদি বাবাকে দখল করিতেন বা তাঁহার কোন কাজ করিয়া দিতেন আমার ভাল লাগিত না। সন্ধ্যাবেলা আহারান্তে বাবা বিছানায় শুইয়া গুড়গুড়ি টানিতেন; দিদি যখন থাকিতেন তখন আমরা দুই বোনে দুই পাশে গিয়া শুইতাম, কিন্তু বাবার গলা জড়াইয়া থাকা আমারি একচেটিয়া ছিল। দুই হাতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কাণে কাণে কথা হইত—বাবা তুমি কাকে ভালবাস? মনের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস আমাকেই ভালবাসেন, কিন্তু তিনি তাহা বলিতেন না, বলিতেন দুজনকেই ভালবাসি। উত্তরে সন্তুষ্ট হইতাম না, অসন্তুষ্টও হইতাম না; কেননা না বলিলেও আমার মনে হইত আমাকেই ভালবাসেন। আমি কাণে কাণে বলিতাম—"দিদি রাগ করবেন বুঝি?" বাবা হাসিতেন, আমার বিশ্বাস মনে আরো দৃঢ় হইয়া আঁটিয়া বসিত। তখন আমার বয়স কত জানি না—বোধ হয় ৫।৬ বৎসর হইবে। শীতকালে বাবার গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকিলেও আমার গায়ের ছোট রুমাল খানি দিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে না ঢাকিতাম, ততক্ষণ মনে হইত তাঁহার শীত ভাঙ্গিতেছে না। গরমী কালে টানাপাখা যতই হউক না কেন, মাঝে মাঝে হাতপাখা না করিলে আমার তৃপ্তি হইত না। দাসদাসীর অভাব নাই কিন্তু আমি সুবিধা পাইলেই কুটনা কুটিবার আড্ডায় গিয়া বঁটি একখানা টানিয়া আলুটা পটলটা সমুখে যাহা পাইতাম তাহার উপরেই আঁচড় পাড়িবার অভিপ্রায়ে আঙ্গুলে আঁচড় পাড়িয়া বসিতাম, আর রান্না-ঘরে গিয়া বামুনদিদির ভাতের কাটি কাড়িয়া লইয়া ভাত ডাল মাছের ঝোল অম্বল নির্ব্বিচারে সবই ঘুঁটিবার প্রয়াস পাইতাম, কখনো বা ব্রাহ্মণীকে স্তুতি মিনতিতে বশ করিতে পারিলে তাহার হাতের নুন মসলাটা নিজের হাতে করিয়া হাঁড়িতে ফেলিবার মহানন্দলাভও অদৃষ্টে ঘটিত। এইরূপে রান্নাঘরে কতদিন যে হাত পা পুড়াইয়াছি তাহার ঠিক নাই। হইলে কি হয়,—আমার বিশ্বাস ছিল অন্ন ব্যঞ্জনে আমি কাটি দিলেই বাবার পক্ষে তাহা সুখাদ্য হইবে, কেননা রান্নাটা তবেই আমার হইল। পান করিবার সময় বাবার পানে মসলা দিতে আমাকে না ডাকিলে আমি আর সেদিন রক্ষা রাখিতাম না। বাবা ত ভাত খাইয়া তাড়া-তাড়ি আফিস চলিয়া যাইতেন, তাহার পর সেদিন আমাকে সাধিয়া ভাত খাওয়ান অন্য কাহারো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।—বাগানের ফুলে আর কাহারো অধিকার ছিল না—ভোর

না হইতেই যত ভাল ভাল ফুল তুলিয়া আনিয়া বাবার কাছে হাজির করিতাম। জ্যেঠাইমার পূজার ফুল অল্পই অবশিষ্ট থাকিত, কোনদিন বা মোটেই থাকিত না; সেদিন তিনি বাবার কাছে নালিস করিতে আসিয়া তাঁহার ফুলগুলি সব লইয়া যাইতেন। আমার এমন রাগ ধরিত! একবার আমার অসুখ করিয়াছিল দিদি তখন বাড়ী ছিলেন, তিনি আমার বদলে বাবাকে ফুল তুলিয়া দিতেন, অসুখের কষ্ট তেমন অনুভব করিতাম না—যেমন সেই কষ্ট! আমি দুষ্টামি করিলে আমাকে জব্দ করিবার অন্য তেমন কোন সহজ উপায় ছিল না; যেমন "আজ সন্ধ্যাবেলা তোকে চাবি দিয়ে রাখব বাবার কাছে শুতে দেব না" এই কথা। সহস্র দুষ্টামি এই শাসনে তখনকার মত আমার রুদ্ধ হইয়া যাইত। এক কথায় আমার সেই ক্ষুদ্র শৈশবজীবন কূলে কূলে তখন তাঁহাতেই পরিপূর্ণ ওতপ্রোত ছিল। তাই বলিয়াছি শৈশব ও যৌবন প্রেমে তফাৎ অল্পই। বস্তুতঃ আমার মনে হয় কি মাতৃপ্রেম কি ভাই বোনের ভালবাসা কি বন্ধুত্ব কি দাম্পত্যপ্রেম সকলরূপ গভীর ভালবাসারই মূলগত ভাব একই। একের সহিত অন্যের পার্থক্য কেবল সে ভাবের স্থায়ীত্ব ও প্রবলতার তারতম্যে। যাহাকে ভালবাসি তাহার সুখে সুখবোধ ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিবার ইচ্ছা প্রেমের এই যে নিঃস্বার্থ অথচ সর্ব্বেসর্ব্বা ভাব পিতামাতার স্নেহেই ইহার প্রথম স্ফূর্ত্তি এবং ভ্রাতাভগিনী সখাসখীর ভালবাসার মধ্য দিয়া প্রণয়ে ইহার চরম পরিণতি। আসলে প্রেম মাত্রে একই বস্তু কেবল বিকশনে ও ভিন্নাধারে ভিন্নাকার।

আমি যেমন শিশুকালে যে আমি ছিলাম এখনও সেই আমি আছি, তথাপি দেহ জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশে স্বতন্ত্র আকারও হইয়া পড়িয়াছি, সেইরূপ শৈশব প্রেমই যখন যৌবনে মহাকারে বর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে তখন আর পূর্ব্বের পরিমিত ক্ষুদ্র ভাব গুলিতে তাহার পরিধি পূর্ণ করিতে পারে না, সে তখনকার শিক্ষা জ্ঞান আকর্ষণ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ আধারে আপনাকে পরিব্যাপ্ত বিকশিত করিতে চাহে। তখন যাহা দেখিয়াছি জানিয়াছি পাইয়াছি তাহাতেই মন তৃপ্তি মানে না—কেননা যাহা দেখি নাই, জানি নাই এমন মহাসুন্দর ভাব কল্পনায় আমাদের মনে আবির্ভূত হইয়াছে, সেই জন্য তখন এই উভয় ভাবের সম্মিলনে সর্ব্বসুন্দর সর্ব্বপরিতৃপ্তিকর মানসদেবের আরাধনায় সাকারে নিরাকার পূজার জন্য মনোপ্রাণ ব্যগ্র আকুল হইয়া উঠে। সে রমণীই ধন্য—যে তাহার মনোদেবতার সন্ধান পাইয়া এই পরিপূর্ণ উথলিত আবেগময় প্রাণের পূজায় জীবন সার্থক করিতে পারে; আর সেই পুরুষই ধন্য যে এই পূজারতা হৃদয়ের দেবতারূপে বরিত হইয়া তাহার পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে, আর সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম যাহা এই উভয়ের আত্মহারা পূজায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবলভাবে চিরবিরাজমান।

আমি পিতাকে এখনও খুব ভালবাসি—তাঁহার সুখের জন্য আমি আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নহি—কিন্তু তিনি এখন আর আমার জীবনের একমাত্র সুখ দুঃখ আশ্রয় অবলম্বন, আকাঙ্ক্ষা কামনা পূজা আরাধনা, দেবতা সর্ব্বস্ব নহেন। অধিক দিন তাঁহাতে উক্ত সর্ব্বে-

সর্ব্বা প্রেমভাব স্থায়ী হয় নাই। এই খানেই প্রণয়ের সহিত ইহার মূলগত পার্থক্য। যৌবনের বহুপূর্ব্বে শৈশবেই বাবার এ ভালবাসার ভাগীদার জুটিয়াছিল।

এতক্ষণ বলি নাই আমাদের বাড়ী কোথায়। কথাটা না পাড়িয়া চলিলে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ঢাকা জেলার লোক, বাবার জমীদারী সম্পত্তিও কিছু আছে, কিন্তু প্রধান আয় চাকরীতে, তিনি একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। যতদিন বাড়ী বসিয়া কাজ পাইয়াছিলেন ততদিন সকল বিষয়ে আমাদের বেশ সুবিধা ছিল। কিন্তু আমার বয়স যখন আট নয় তখন আর এক সবডিভিসনে তাঁহার বদলি হইল। দিদির বয়স তখন ১১।১২, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাবা তাঁহাকে পিসিমার কাছে কলিকাতায় রাখিয়া আসিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেখানে থাকা তাঁহার অভ্যাস ছিল। আমি কিন্তু কখনও বাবাকে ছাড়িয়া থাকি নাই, এখনও থাকিতে পারিব না জানিয়া জ্যেঠাইমাকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া বাবা কর্ম্মস্থলে আসিলেন। এখানে সরকারী স্কুল বা বালিকা বিদ্যালয় কিছুই ছিল না, জমীদার কৃষ্ণমোহন বাবুর বাড়ী—তাঁহার বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল বসিত, পাড়ার শিশুগণও অনেকেই এখানে পড়িতে আসিত, আমিও আসিতাম। কলিকাতায় এরূপ প্রথা আছে কিনা জানি না; পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থলেই এক পাঠশালায় শিশুবালকবালিকাগণ একত্রে পড়ে। সেখানে সকলেরই সঙ্গে আমার খুব ভাব হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে ছোটুর সহিত। ছোটু কৃষ্ণমোহন বাবুর ভাগিনেয়; বাপ না থাকায় মামার বাড়ী প্রতিপালিত। ছোটুর সহিত বেশী ভাব হইবার প্রধান কারণ—সে স্কুলে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বোধ হয় বার হইবে। বাল্যকালে বয়স্যবয়স্যাদিগের অপেক্ষা বয়োধিকদিগের সহিত মিশিবার কিরূপ আকর্ষণ তাহার অভিজ্ঞতা বোধ হয় তোমারও আছে; দ্বিতীয়তঃ ইনি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রধান পড়ো, নিম্নক্লাশের ছাত্রছাত্রীগণের পড়া দেখিবার ভার ইহার উপর সমর্পণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব করিতেন। স্কুল বসিত কৃষ্ণমোহন বাবুর বাহিরের একখানা আটচালাঘরে প্রাতঃকাল সাড়ে সাতটার সময়, আর ভাঙ্গিত সাড়ে ১০টায়। কিন্তু আমরা সকলে সাড়ে ছয়টার মধ্যে স্কুলে গিয়া হাজির হইতাম আর এমন একদিনও হয় নাই যে আমরা গিয়া ছোটুকে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। পণ্ডিত মহাশয় আসিতেন ৭৷৷টায় কোনদিন বা আটটায়, ততক্ষণ ছোটু আমাদিগকে পড়া বলিয়া দিত, কপি বুকে অক্ষর লিখিয়া দিত, পকেট হইতে মুড়ি মুড়কি বিতরণ করিত (বোধ করি ইহা তাহার প্রাতরাশের অবশিষ্ট) আর বাকী সময় বই হাতে করিয়া মনে মনে নিজের পড়া মুখস্থ করিত ও মুখে গুণগুণ করিয়া গান করিয়া যাইত; এই তাহার এক বিশেষ অভ্যাস ছিল। আমরা কোন কোন সময় যদি ধরিয়া পড়িতাম, কি গাহিতেছ স্পষ্ট করিয়া গাও, ভাল করিয়া গাও, তা কখনও গাহিত না। একদিন কেবল আমরা তাহার গানের দু এক লাইন স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম। আটচালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছি, তাহার গুণগুণানি একটু স্পষ্টতর ভাবে কাণে গেল,

প্রভা বলিল—তাহার সকলের চেয়ে দুষ্ট বুদ্ধি যোগাইত—'ছোটু গান করছে এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি, তাপর শিখে গিয়ে বলব কেমন শুনে নিয়েছি'। দু একদিন আগে কৃষ্ণমোহন বাবুর ছেলের পৈতে উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে কলিকাতার নাচ আসিয়াছিল, (আমরা থিয়েটারকে নাচ বলিতাম)। আমরাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কি যে দেখিয়াছিলাম, কি যে অভিনয় হইয়াছিল তাহা যদিও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না। আমি সমস্ত ক্ষণই প্রায় জ্যেঠাইমার কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়াছিলাম, একবার কেবল একটা ভয়ঙ্কর চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিয়াছিলাম জরীর পোষাক পরা একজন রাজার ছেলে ভারী রাগিয়া গেছে, রাগিয়া জোরে জোরে তক্তার উপর ল্যাথি মারিতেছে আর তরবারী উঠাইয়া চীৎকার করিতেছে। দেখিয়া ভারী ভয় হইল, তাহার পর আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। আর একবার জ্যেঠাইমা আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিলেন; সেবার দেখিলাম কতকগুলি পরী শূন্যে ঝুলিতেছে। সে দৃশ্যটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেই থিয়েটারেই বুঝি ছোটু গান শিখিয়া থাকিবে, সে গাহিতেছিল—

হায়! মিলন হোলো,
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!
হাতে করে মালা গাছি সারা বেলা বসে আছি
কখন ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—

এইটুকু শুনিয়াই আমরা হাসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। পরে এমন আপশোষ হইয়াছে কেন গানটি শেষ পর্য্যন্ত শুনি নাই। অনেক উপন্যাস প্রহসন গীতিনাট্যে গানটি খুঁজিয়াছি কিন্তু পাই নাই। আমরা ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিলাম 'কেমন তোমার গান শুনে ফেলেছি।' ছোটু ভারি লজ্জিত হইল। গানটির সেই ক লাইন একবার শুনিয়াছিলাম কিন্তু কখনো আর ভুলি নাই, আর পরের ভাল করিয়া মুখস্থ করা গানও কত ভুলিয়াছি তাহার ঠিক নাই।

আগেই বলিয়াছি ছোটু আমাদের মুড়িমুড়কি দিত। মুড়িমুড়কি বাড়ীতে যে আমাদের কাহারো দুষ্প্রাপ্য ছিল তাহা নহে, কিন্তু হরিরলুটের বাতাসার মত তাহার হাত হইতে মুড়ি মুড়কি পাইতে আমাদের ভারী আমোদ হইত।

কথা ছিল, দুষ্টামি না করিলে, ভাল করিয়া পড়া বলিতে পারিলে ছোটু মুড়িমুড়কি দিবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। দুষ্টামি করিলে ছোটু যদি বকিত, আমার চোখও অমনি জলে ভরিয়া উঠিত, হাসিখুসী খেলাধূলা সমস্তই বন্ধ হইয়া পড়িত, ছোটু তখন আদর করিয়া আমাকে ঢের বেশী করিয়া মুড়িমুড়কি দিত। এই আদরের লোভে অথবা বেশী মুড়িমুড়কির লোভে জানি না, আমার দুষ্টুমিটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পড়া জানিলেও অনেক সময় ভুল উত্তর দিতাম—লেখা দেখিতে আসিলে কালীর ফোটা হাতে ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইতাম, বোর্ডে আঁক কষিয়া শিখাইতে গেলে খড়িমাটী মুছিয়া তাহার মাথায় ঘসিয়া দিয়া দূরে পলাইতাম, ইহাতে যদি সে রাগ করিত ত কাঁদিতে বসিতাম,—আর রাগ না করিয়া সেও যদি হাসিয়া খেলায় যোগ

দিত—ভুল পড়া বলিলে যদি হাসিয়া বলিত—চালাকি করা হচ্ছে,—হাতে কালী দিলে হাসি মুখে যদি কলমটা লইয়া আমাকে ফোঁটা পরাইয়া দিত কিম্বা আমার কপিবুকে নাম লিখিতে বসিত, খড়িমাটি রঞ্জিত হইলে ফুল ছিঁড়িয়া যদি আমাদের মাথায় বর্ষণ করিত, তাহা হইলে আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। তাহার এরূপ খেলার ভাব দেখিলে সেদিন কেবল একা আমি কেন—আমরা স্কুলের যত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকলে মিলিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম।

বাবা আর একলাই বাগানের ভাল ভাল ফুল পাইতেন না, ছোটুর মুড়িমুড়কির বদলে তাহাকে আমি রোজ ফুল আনিয়া দিতাম। কাহাকে ফুল দিতে বেশী ভাল লাগিত—বাবাকে বা তাহাকে, আর কাহার সঙ্গই বা বেশী ভাল লাগিত—বাবার বা তাহার, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। কোন একটি ভাল ফুল দেখিলে একবার মনে হইত বাবাকে দিই, একবার মনে হইত তাহার জন্য লইয়া যাই; যেদিন দেখিতাম বাবা উঠিয়াছেন সেদিন ফুলটি তাঁহাকেই দিতাম, আর যেদিন দেখিতাম তিনি উঠেন নাই সেদিন ছোটুর জন্য লইয়া যাইতাম। সকালে যেমন ছোটুর কাছে যাইতে ব্যগ্র হইতাম, সন্ধ্যাবেলা তেমনি আগ্রহে বাবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, যাহার কাছে যখন থাকিতাম তাহাকেই তখন বেশী ভাল-বাসি বলিয়া মনে হইত। ছোটুর কাছ হইতে বাবার কাছে আসিয়া প্রায়ই তাঁহাকে বলিতাম—"বাবা তোমাকে খুব ভালবাসি"; বাবা যেন সন্দেহ করিয়াছেন!

তিনি বলিতেন "সত্যি"?

আমি বলিতাম—"হ্যাঁ সত্যি বলছি"।

বাবা হাসিয়া চুম্বন করিতেন; আমিও করিতাম—ভাবিতাম ছোটু ত আমাকে চুম্বন করে না; তবে বাবার মত আমাকে ভালবাসে না, আমি কেন তবে ভালবাসিব? কে বলে ভালবাসা ভালবাসা প্রত্যাশা করে না? ছেলেবেলাও এই ভাব! ইহাত আমাকে কেহ শিখায় নাই!

দুইবৎসর আমরা একত্র পড়িয়াছিলাম, তাহার পর অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া নিজ ঢাকাতেই বাবা বদলী হইলেন। এই দুইবৎসরের প্রতি প্রাতঃকাল কিরূপ আনন্দে কাটিয়াছিল মনে করিতে হৃদয় এখনো আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর ১০।১২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পর আমি ভালও বাসিয়াছি— শৈশবের স্নিগ্ধ-কোমল ভালবাসা নহে, যাহাকে লোকে বলে প্রেম—যৌবনের সেই জ্বলন্ত অনুরাগ—তাহারো অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে; জীবনে কত বড় বড় আশা ভাঙ্গিয়াছে গড়িয়াছে, কত প্রবল আনন্দ নিরানন্দ জীবনের গ্রন্থিগুলি যেন দলিয়া পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু শৈশবের সেই অপরিণত ক্ষুদ্র প্রেমে কি ইহা অপেক্ষাও কম সুখ কম নিঃস্বার্থ ভাব ছিল? তখনকার সেই ছোট খাট সুখ দুঃখ আশা নিরাশার প্রতি আমার মমতা, আকর্ষণ কি এখনো কিছু কম! তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে কি—কে জানে কি! তুমি হয়ত শুনিলে ঠিক বুঝিতে পারিবে কি আমার নিজের নিকট ত নিজের জীবন প্রকাণ্ড একটা প্রহেলিকা।

স্বরলিপি।

সংকেতের ব্যাখ্যা।

স, র, গ, ম, প, ধ, ন = শুদ্ধ সুর।

রো, গো, ধো, নো = কোমল সুর।

মী = কড়ি মধ্যম।

মধ্য সপ্তকের সুরে কোন চিহ্ন থাকে না। উপরের সপ্তকের সুরের মাথায় রেফ্ এবং নিম্ন সপ্তকের সুরের নীচে হসন্ত থাকে যথা, স, র্স, স্।

সহজে একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহাকে একমাত্রা কাল কহে। একটি সুর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে, তাহার মাথার উপর সেই চিহ্নিত অঙ্ক দেওয়া যাইবে। যথা:—স^{১} এই সুরটী একমাত্রা কাল স্থায়ী অর্থাৎ শুদ্ধ সা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত সুরটী স্থায়ী।

স^{২}—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর এক আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা, সা—আ।

স^{৩}—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর দুই আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা সা—আ—আ—ইত্যাদি।

আবার কোন মাত্রা চিহ্নিত সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সুরে কিম্বা সুরগুলিতে যদি মাত্রাচিহ্ন না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাত্রা চিহ্নিত স্বরের কাল-মধ্যেই ঐ সব সুরগুলি উচ্চারিত হইবে। যথা:—

সর^{১}।—এখানে একমাত্রাকালের মধ্যে দুটি সুরই বাজাইতে হইবে।

সরগ^{১}।—একমাত্রা কালের মধ্যে তিন সুরই বাজাইতে হইবে।

আবার সর-গ^{১}, ও সরগ^{১}এ বিশেষত্ব আছে। সর-গ^{১}, এ স্থলে কশির বাম পার্শ্বস্থিত সুরের মাত্রা কাল তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সুরের মাত্রা কালের সমান, অর্থাৎ 'সর' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী এবং 'গ' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী। কিন্তু সরগ^{১} এর প্রত্যেক সুরের মাত্রাকাল সমান, স একতৃতীয়াংশমাত্রিক, র একতৃতীয়াংশমাত্রিক, ও গ একতৃতীয়াংশমাত্রিক, তিনে মিলিয়া পূর্ণ এক মাত্রা সম্পন্ন।

সর^{১}—এ স্থলে বাম পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র 'স'কে ভূষিকা বলা যায়, তাহা মীড়ের কাজ করে। সর^{১} ও সর^{১} ইহাদের প্রভেদ এই যে সর^{১}র প্রত্যেক অক্ষরের মূল্য আছে 'স^{১}'-র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা ও 'র' মূল্য অর্দ্ধমাত্রা, উভয়ে মিলিয়া একমাত্রা। কিন্তু সর^{১}র 'স'কের কোন মূল্য নাই, এখানে শুধু 'র^{১}'ই পূর্ণ একমাত্রা। 'স'কে শুধু কোনমতে তাড়াতাড়ি স্পর্শমাত্র করিয়া প্রধান সুর র^{১} বাজাইতে হয়।

দেড়মাত্রা নিম্নলিখিত উপায়ে বুঝাইতে হয় ; প|পম১ । এখানে প্রথম ‘প’র মূল্য একমাত্রা দ্বিতীয় ‘প’র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা, উভয়কে বন্ধনীতে আটক করাতে উহারা বিভিন্ন ‘প’ না হইয়া একটী দেড়মাত্রা কাল স্থায়ী ‘প’ হইব। বন্ধনী না থাকিলে উহারা দুই স্বতন্ত্র ‘প’ হইত, একটীর মূল্য একমাত্রা অপরটীর মূল্য অর্দ্ধমাত্রা। এখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে দুইবার করিয়া না বাজাইয়া শুধু প্রথম প বাজাইয়া দেড়মাত্রা পর্য্যন্ত তাহাকে টানিয়া রাখিতে হয়।

[ ] এই ব্র্যাকেট পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, যে অংশ ইহার অন্তর্ভূক্ত থাকিবে তাহা দুইবার বাজাইতে হইবে।

{ } দ্বিতীয়বার আবৃত্তিকালে কতকগুলি সুর বাদ দিতে হইলে তাহারা এই বন্ধনীতে আটক থাকে, ইহার অন্তর্ভূক্ত সুরগুলিকে দ্বিতীয়বারের বেলা না বাজাইয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে।

কলির শেষে আ—প্র থাকিলে প্রথম কলির আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন বুঝায়।

শেষ = আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গান যেখানে শেষ করিতে হইবে।

আ—আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন কোন স্থলে প্রথম দুই একটী সুর বাদ দিয়া আরম্ভ করিতে হয় সেই স্থলে যে সুরের মাথার ‘আ’ থাকিবে সেই সুরে ধরিতে হইবে।

কখন কখন স্বরশ্রেণীর কোন সুরের মাথার উপর আর এক শ্রেণী স্বর থাকে। তথন বুঝিতে হইবে যে পুনরাবৃত্তির কালে গানের পদে নীচের সুরের বদলে সেই উপরের সুর সংযোজন করিতে হইবে। নিম্নে যে গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেক তাল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বিভক্ত যেমন কাওয়ালি চতুর্মাত্রিক, একতালা ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি। চতুর্মাত্রিক তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে প্রত্যেক চারিমাত্রা অন্তর এক একটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে। সেইরূপ অন্য কোন তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পর তালের পূর্ণ আবৃত্তি বুঝাইবার জন্য এক একটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে।

যে স্থলে মাত্রা চিহ্নিত কশির নীচে গানের পদের স্থানে কশি টানা থাকিবে সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সুরের রেশ চলিতেছে কিন্তু যে স্থলে নীচে কোন কশি নাই, সে স্থলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কাল পর্য্যন্ত বাজনা বা গলা ছাড়িয়া রাখিতে হইবে।

মগ১ । ম১ নো১ ধ১ । ধন১ ন১ র্স১ । নর্সর্র১ র্সন১ ন১ । র্স৩ । —১ র্স২ ।
শুধু ঝু রু ঝু রু বা য়ু ব — হে যায় তার্

ন১ র্স১ ন১ । র্সর্র১ র্স১ র্সনো১ । ধনো১ ধনোর্স১ নো১ । ধ৩ । —১ ধ২ ।
কা নে কা নে কি যে ক — হে যা য় তাই

“ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়” “কানে কানে কি যে কহে যায়” এই দুই স্থলে প্রথম “যায়” তিন মাত্রা কাল টানিয়া রাখিয়া তাহার পরে একমাত্রা কাল ছাড়িয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় “যায়” সে একমাত্রা কালও টানা থাকে।

চিত্রে যেমন আলো ও ছায়ার সমাবেশে চিত্রটী আরো ফুটিয়া উঠে, সুরের সেইরূপ মৃদু ও প্রবল আওয়াজের তারতম্য রক্ষা করিয়া গাহিলে গানের ভাবটী সম্যক্‌রূপে ফুটিয়া উঠিয়া গানকে আরও সুমিষ্টতর করে।

সুরের আওয়াজের চিহ্ন এইরূপ :—

প্রবল আওয়াজ	...	...	(ব)
মৃদু আওয়াজ	...	...	(মৃ)
অতি প্রবল আওয়াজ	...	...	(বব)
অতি মৃদু আওয়াজ	...	...	(মৃমৃ)
মধ্য বলের চিহ্ন	...	...	(ম)
আওয়াজ বৃদ্ধির ঐ	...	...	(বৃ)
হ্রাসের ঐ	...	...	(হ্র)
ক্রমশঃ বৃদ্ধির ঐ	...	...	(ক্র-বৃ)
ক্রমশঃ হ্রাসের ঐ	...	...	(ক্র-হ্র)

এই অক্ষরগুলি সুবিধা বুঝিয়া পদের নীচে কিম্বা সুরের মাথায় বসিবে।

কোন বিশেষ চিহ্নের পর যত দূর এইরূপ বিন্দুশ্রেণী.................থাকিবে তত দূর পর্য্যন্ত সেই চিহ্নের কার্য্য চলিবে।

গানের স্বরলিপির আরম্ভে গানটীর প্রত্যেক ঘরের মাত্রাসংখ্যা উভয় পার্শ্বে ডবল দাঁড়ির মধ্যে লিখিয়া দেওয়া যাইবে। যথা ॥৪॥, বা ॥৩॥, বা ॥২॥ ইত্যাদি।

মিশ্র বেল্যাওল—একতালা।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর—শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ।

সখি সে কেমনে চলে যায়!

আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখপানে চেয়ে প্রাণ উঠে উথলিয়ে,
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়,
সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়!
সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে,
মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায়!
আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি,
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়;
তবু সাধ যায়, সখি, একবার দেখি,
সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায়!
দেখিতে পাইনে বলে' হৃদয়ে বেদনা জ্বলে,
সখি, এ হেঁয়ালি বল কে বোঝায়!

আ

স১। [স১ স১ স১। রগর২ র১। গমগ১— র১ গ১। গম১। { —২ গর১।
স [খি সে কে ম নে চ —লে যা { — —

গ১ গর১ স১ }।] —৩। —২ স১। স১—প১ প১। প১ প২। পধ১—পধপ১
— য় স }] — য় আ মা—র্ ত দে খি লে —
শেষ।

ম১। মগ৩। —১ গ১ গ১। গ১ গ২। গমগ১— র১ গ১। গম৩।—১ মগ১ ম১।
তা হা য় শু ধু দে খি লে —তা হা য় শু ধু

প১ ন১ ন১। নধ১—ন১ ন১। র্স৩। —১ র্সন১ ন১। ন১ ন১ ন১। নর্স২ ন১। নধ১
মু খ পা নে —চে য়ে — প্রা ণ উ ঠে উ থ লি য়ে

প২।—৩। নর্স২ র্স১। র্স১ র্সনো১ ধ১। ধনো১ নো১ নো১। নো২—ধনোধ১।
— — শ ত বা — র হৃ দি মা ঝে —

ধপ২ ধ১। পধপ২ পম১। ম১ ম২। গমগ১—র১ গ১। গম৩। —২ গর১। গ১ গর১
বি দ্যু তে র ল হ রী —খে লা — — — য়

স১ ॥
স ॥

(আ—প্র)

—১ স১ প১। প১ প১ প১। প২ প১। প২—ধপ১।—ম১ প১ ধ১। নো১
স দা ভ য়ে ভ য়ে স রা — — বু ঝি প

নো১ নো১। নো১ নোধ১—প১। মপ১ ম১—পম১। গ৩।—২ গ১। ম১ প১
ড়ি লা ম — — ধ রা — — — হৃ দ য়ে

ন১। ন১ ন১ ন১। র্স৩।—১ ন১ র্স১। র্সর্গ১ র্র১ র্স১। নধ—১ ন১ ন১। নর্স৩।
র ভা ব বু ঝি — — ন য় নে প্র কা —শ পা

—৩।—১ র্স১ র্সন১। র্স১ র্স২ র্গ১। র্গর্র২ র্ম১। র্গ৩।—১ র্গ১ র্গ১। র্গর্ম৩। র্মর্গ১
— য় সে ত বু ঝি তে না পা রে — শু ধু যাই যা

র্র১ র্গ১। র্গর্র১ র্স২।—১ র্গ১ র্গ১। র্গর্ম১ র্মর্গ১ র্র১। র্স১ নর্স১— প১। প১ মপ১—
ই ক রে — — ম নে ম — ন না বু — ঝি লে

মপম১। গ৩।—৩। গ১ গ২। গমগ১—র১ গ১। গম৩।—২ গর১। গ১ গর১
— — — কে বু ঝা —বে কা — — — য়

স১ ॥
স ॥

(আ—প্র)

—১ গ১ ম১। প১ ন১ ন১। নধ১ ন১ ন১। নস৩।—২ ন১। র্সন১ ন১ ন১।
আ মি ব ড় ভা ল — বা সি — — সে মু খে

নর্স২ ন১। নধ—১ প২।—১মগ১ ম১। মপ—১ র্স১ র্স১। র্সনো১ নো১—ধ১।
র হা সি — — ম লি ন —দে খি লে —

প১ মপম২।—গ১ গ২। গমগ১—র১ গ১। গম৩।—২ গর১। গ১ গর১ স১॥
মু খ —বুক ফে —টে' যা — — — য় স ॥
(আ—প্র)

—১ স১ প১। প৩। প২ প১। পধপ৩।—১ প১ ধ১। ধনো১ নো২। —ধনোধ১
ত বু সাধ যায় স খি — এ ক বা র —

—প১ মপ১। ম২—পম১।—গ৩।—২ গ১। ম১ প১ ন১। ন১ ন১ ন১। নর্স৩।
— দে খি — — — সে প্রা ণে বে জে ছে ব্য থা

—১ ন১ র্স১। র্সর্গ১ র্র১ র্স১। নর্স১—নর্সন১—ধন১। র্স৩।—২ ন১। র্স১ র্স১
— — না দে খে আ মা — — — য় দে খি তে

র্গ১ । র্গ১ র্র১ র্ম১ । র্মর্গ৩ ।—১ র্গ১ র্গ১ । র্র১ র্ম১ র্ম১ । র্ম১—র্গর্র১ র্গ১ । র্গর্র১—
পা ই নে ব লে' — হৃ 'দ য় বে দ না — জ্ব লে

র্স২ ।—১ ন১ ন১ । নর্স১—প১ প১ । প১—মপমঃ গ১ । —১ গ১ গ১ । গমগ১—
— — স খি এ — হেঁ য়া — লি — ব ল কে

র১ গ১ । গম৩ ।—১ গর১ ।—গ১ গর১ স১ ॥
— বু ঝা — — — য় স ॥

(আ—প্র)

আলোক।

একবৎসরের শিশু, সে কি জানে বল ?
তার কাছে কিবা আলো, কিবা অন্ধকার ?
কিন্তু সে করিয়া উঠে বিষম চীৎকার
যদি দেখে ঘুম ভেঙ্গে চতুর্দ্দিক কালো।
জ্বলিলে প্রদীপ, তবে দেখি জননীর
স্নেহময় হাসিময় অভয় মুরতি,
স১ । র্স১ স১ স১ । রগর২ র১ । গমগ১— র১ গ১ । গম ।
স্তনামৃত পান করি, সে হয় সুস্থির।
কি কৌশলে গঠিয়াছ, জগতের পতি,
মানবহৃদয় খানি আলোক-আকুল ?
পাপের সমুদ্র গর্ভে হৃদি গুরুভার
যতদূর ডুবে যাক্, না হয় নির্ম্মূল
তবু ত বিবেকবুদ্ধি—আলোক-বিরহ !
বল কি বুঝিব দেব ইহা ছাড়া আর,
আপনি আলোক তুমি ;—অন্ধকার নহ।

একালে সেকাল।

নৈনিতালের প্রাচীন আর্য্যস্মৃতি-উদ্দীপক অপূর্ব্ব মোহের কথা বলিয়াছি। এবার যে দেশের কথা বলিব সে দেশেও একালে সেকাল বর্ত্তমান—অপেক্ষাকৃত পরন্তন সেকাল। যেকালে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, আদিম হিমনিবাস বিস্মৃত হইয়াছেন। যেকালে কালিদাস মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করেন, ভবভূতি মালতীমাধবকাহিনী গাহেন, দণ্ডী গোমিনী বৃত্তান্ত কহেন—সেই কাল এখানে বিরাজমান।

দাক্ষিণাত্য ! ভারতবর্ষের মানচিত্রের অধোভাগে যে সঙ্কীর্ণ পৃথিবীখণ্ডটুকু কোনমতে মুখ্যভূমিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—সেই বাঙ্গালীসাধারণের প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত দাক্ষিণাত্য ! ইতিহাসের প্রত্যূষে, দক্ষিণাভিমুখী প্রথম আর্য্যগণের চক্ষে দক্ষিণ যে রহস্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, আজ তাহার অপরাহ্ণে তিন সহস্র বৎসর পরেও আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আমার চক্ষে দক্ষিণ তেমনি রহস্যাধার ! আমি চলিয়াছি সেই পথে যে পথে রাম সীতার চিহ্নানুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই যে পর্ব্বত, অরণ্য, উপত্যকার অনন্তশ্রেণী, এই যে জনবিরল পাণ্ডুবর্ণ প্রান্তর, এই যে স্থানে স্থানে অনার্য্য মনুষ্যাকৃতি আমার নয়নগোচর হইতেছে, একদিন সীতাবিরহাকুলিত হৃদয়ের বাষ্পাকুল চক্ষেও এ দৃশ্য, এ মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল। এখনি কি ঐ বৃক্ষতলে সুহৃদ্-গতপ্রাণ বৃদ্ধজটায়ুর রক্তাপ্লুত দেহ লুণ্ঠিত দেখিব না ? সীতার প্রকোষ্ঠচ্যুত বলয় কি এ প্রান্তরের বৃক্ষশাখে আজিও পথিকহৃদয় শোক ও শ্লোকে প্লাবিত করিয়া বিরাজ করিতেছে না ?

আরও সুদূর অতীতে যেদিন মহাতপা অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যাদ্রি লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রথম দক্ষিণে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সহসা এমনি অনার্য্যবাক্ তাঁহারো শ্রুতিপথগোচর হইয়াছিল, এমনি বর্ব্বরভাষায় সে দিনো এ প্রান্তর ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই অতীতবর্ত্ম দিয়া সহস্র স্মৃতিতে সহস্র বিস্ময়ে হৃদয় আবিষ্ট করিয়া মন্দগামী যান গন্তব্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী বা মালতীমাধবের বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী হইতে যে অতীতের সমৃদ্ধিশালী এক একটি নগরী কল্পনায় সৃজন করিয়া লইতে হয়, সেই অস্পষ্ট কল্পনার স্পষ্ট সত্য পরিণতিস্বরূপিণী এক মহানগরীর কোলাহলের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলাম। যেন স্বপ্ন ! যেন ইন্দ্রজাল ! সন্ধ্যার আবছায়ায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল পরিচিত অথচ অপরিচিত বেশধারী নরনারী, পরিচিত অথচ অপরিচিত, বিচিত্র, প্রাকৃতানুরূপী ভাষায় ভা[illegible] যখন পথিক, মনে সন্দেহ উপস্থিত করিল বুঝি বর্ত্তমানের রাজ্যে, পিতৃগৃহে সুপ্তা ছিলাম, সহ[illegible]ান্ দৈত্য অতীতের এই নিভৃতাংশে আমায় স্থানান্তরিত করিয়াছে। সুপ্তোত্থিতার [illegible]ই সকলি নূতন !

৬

DAMAGE PAGES,

পরদিন, প্রভাত সূর্য্যালোকোদ্ভাসিতা এই নগরী দেখিলাম। সন্ধ্যার মোহ অতিরক্ত রহিল! বর্ত্তমান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; বিচিত্র, রহস্তমধুর, অচিন্তিতসুন্দর অতীত তাহার সমস্ত মাধুর্য্যে বিরাজ করিতেছে। ইহার অংশবিশেষে একটি বৃহৎ অট্টালিকার প্রান্তদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। "বালিকা পাঠশালা"। বালিকাগণের পরিচ্ছদ, ক্ষীণতটীতে রৌপ্য কটিবন্ধের মাধুরী, আলম্বিত বেণী, তাহার মূলে যূথিকাগুচ্ছ, সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত অপরিচিত ভাষা এ সকলি যেন সেই দীর্ঘ যবনিকাচ্ছন্ন গৃহ যত্নে অতীত হইতে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। মোহ সম্পূর্ণ হইল! দূর অতীতের অন্তরাল ভেদ করিয়া একটি আর্য্যতম সম্বোধনবাক্য কর্ণগোচর হইল। আমার সঙ্গী মহীসূরাধিপতির প্রধান সভাসদ পাঠশালার অধ্যাপকগণের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। মূর্ত্তিমান অতীত, ললাটে ত্রিনামাঙ্কিত সংস্কৃতাধ্যাপক "তত্রভবতি" বলিয়া অভিবাদন করিয়া আমার সহিত আলাপন আরম্ভ করিলেন। "তত্র ভবতি"? সত্যই কি শুনিয়াছি? আমি কি আধুনিক বাঙ্গালীর মেয়ে নহি? এতদিনকার শতাব্দী সংস্কার সভ্যতা সব বিলোপ করিয়া মুহূর্ত্তের ইন্দ্রজালে কি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের পৃষ্ঠাভুক্ত হইয়াছি? সত্যই কি আমিও অতীত-মানবের হৃদয়ফলকে রেখাঙ্কনশীল অতীত রমণী?

অথবা আমার গৌরব আমি এতদিন জানিতাম না। আমি কাহাদের ভগিনী কোন্ উচ্চকুলের কন্যা তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—এবং হায় পরিতাপ! কুলভাষাও আমার অনায়ত্ত হই ।য়াছে।

পণ্ডিত অনর্গল সংস্কৃতে আমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া চলিলেন, আর আমি প রের মেয়ের ন্যায় সসঙ্কোচে মাতামহী সংস্কৃতের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তাঁহার স হিত রক্তের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যবহারে তদুপযুক্ত ঘনিষ্ঠতা কোনদিন সম্বর্দ্ধিত হয় নাই; যেন তাঁহার কন্যা প্রাকৃতা বাঙ্গলা ম্লেচ্ছসম্পর্কিত ভাষাকে বরণ করিয়াছিল বলিয়া এ তদিন তাঁহার ত্যজ্যা ছিল, তাঁহার দৌহিত্রী আমি লোকমুখে এতদিন তাঁহার অতুল বৈভবে র কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। আমিই যে কালে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী তাহা জানিত ম না, তাঁহার স্নেহক্রোড় যে এতদিন আমারই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, অভিমানে প্রকাশ করে নাই তাহা জানিতাম না। তাই আজ যখন সহসা ডাক পড়িল এতদিনকার সঞ্চিত সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত দূরসম্পর্কীয় হইয়াও* বহু কালের বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত নির্ভয় বাক্যালাপের অভ্যাস দেখাইলেন।

পণ্ডিত বিদায় হইলেন! একজন তরুণী অধ্যাপয়িত্রী আসিলেন। কি বিপদ! আমার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতের ফলস্বরূপ ইনিও সংস্কৃতভাষিণী। তথাপি আমার সজাতীয়া দেখিয়া অপেক্ষাকৃত সাহস ও স্বাচ্ছন্দের সহিত আলাপনে প্রবৃত্ত হইলাম। কিছুক্ষণ কথা ব পর একবার প্রশংসা করিয়া, বলিলাম তিনি অতি সুন্দর সংস্কৃত কহেন। তিনি

* ইঁহারা ব্রাহ্মণ, আর্য্যবংশসম্ভূত হইলেও ইঁহাদের মাতৃভাষা অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা।

"তদেব অপঠম্"। তাহাই পড়িয়াছেন! বালিকার এই দুটী কথায় একটি সুন্দর সহজ ছবি ফুটিয়া উঠিল।

প্রশান্তমূর্ত্তি, ধীরা, বালবিধবা; পট্টবস্ত্র খানি সমস্ত অঙ্গ জড়াইয়া মাতার করুণার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আনতমুখে ধীরে ধীরে শুদ্ধ সংস্কৃতে আমার সহিত কত কথা কহিয়া গেলেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে কাহিনী অকথিত ছিল আজ ইনি তাহা পূর্ণ করিলেন। কত মানিনী ইরাবতী, কত প্রণয়ব্যথায় পরিম্লানা মালতী, কত প্রভাবান্বিতা প্রথমা পত্নীর কথা কবি বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই হাসিগান, মানাভিমান উৎসব জগতের অন্তরালে, জীবনের একাংশে ধরিত্রীর ন্যায় ধৈর্য্যশালিনী এই যে এক একটি বালবিধবা ছিলেন তাঁহারা সব কোথায়?

সে দিন চলিয়া গেল। তাহার কিছুদিন পরে সঙ্গীতগৃহে পাঠগ্রহণ করিতে আসিলাম। ঘরের মধ্যে পাঁচ ছয়টী বীণা পড়িয়া রহিয়াছে। যেন কত সরস্বতী, মলয়াবতী, মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বীণাধ্যাপক মুণ্ডিতশির, শিখাধারী ব্রাহ্মণ—সেই অতীত রাজগৃহের সঙ্গীতশালার গণদাস হরদাসের উত্তরাধিকারী। মাদুরের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, আমায় দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন। শিষ্ট সম্ভাষণের পর একটি বীণা ক্রোড়ে লইয়া পাঠগ্রহণে নিবিষ্ট হইলাম। প্রথম কথা যা' পণ্ডিতের মুখে উচ্চারিত হইল—"তন্ত্রী ত্রুটিতা"! সেই গৃহধ্বনিত করিয়া সেই বীণার অটুটতারে এবং আমার হৃদয়ে অনুরণন জাগাইয়া ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল—"তন্ত্রী ত্রুটিতা।" এই সেই বীণা, এই সেই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় প্রাত্যাহিক কথোপকথন, তবু বিশ্বাস করিতে হইবে এ সেকাল নয়।

অন্তঃপুরপ্রথাবিরহিত দেশে, রাস্তার দুইধারে, অগ্রহারের প্রত্যেক কুটীরে বৃদ্ধা, বালিকা, যুবতী সকলেই প্রভাতে গৃহকুট্টিম মার্জ্জনা করিতেছে, গৃহ-প্রাচীরে নানাবর্ণ সমাবেশে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম রঞ্জিত করিতেছে—পাঠক যক্ষের স্বগৃহ বর্ণনা স্মরণ কর—

"আমি যা বর্ণিনু সখা মনে রেখো সে সব লক্ষণ,
দ্বারদেশে শঙ্খপদ্ম আঁকা আর জেনো নিদর্শন"—

গৃহ প্রাঙ্গনে বিচিত্র আল্‌পনা কাটিতেছে। অপরাহ্নে রাজপথের সম্মুখে অলিন্দায় বসিয়া, শিশুকোলে গল্প করিতেছে, বায়ু সেবন করিতেছে, রাস্তা দিয়া পদব্রজে যাতায়াত করিতেছে—যেন সকলেই সংস্কৃতগ্রন্থের পৃষ্ঠা হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের অনাবৃতশিরে কেশকলাপের সমস্ত শোভা সুপ্রেক্ষ্য, বর্ষীয়সীরও পৃষ্ঠে বেণী বিলম্বিত, কখন কেতকীপত্রমণ্ডিত। এক একটি সুন্দরী দ্বাদশীকে দেখি আর মনে হয় দশকুমারচরিতে শ্রেষ্ঠীকুমার যে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যাকে দেখিয়াছিলেন সে বুঝি এই। বুঝি এখনি দেখিব বস্ত্রপ্রান্তে মুষ্টিমেয় ধান্য লইয়া দৈবজ্ঞবেশী কুমার ইহার ভাগ্যগণনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

যখন প্রথম এখানে আসি তাহার কিছুদিন পরেই দীপাবলীর উৎসব। আমার স্বদেশের ন্যায় আড়ম্বর নাই, কিন্তু এখানকার যে শোভা তাহা অন্যত্র দুর্লভ। পাহাড়ের উপর চামুণ্ডী মন্দিরের চূড়া দীপে ভরিয়া গিয়াছে, রাজপ্রাসাদের চূড়া আকাশের কতক অংশ পরিব্যাপ্ত

করিয়া জ্যোতিষ্মান, কাকচূড়াধারী বালকেরা রাস্তায় পট্‌কা ছুঁড়িতেছে, চতুর্দ্দিকে বাঁশী বাজিতেছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী দৃশ্য—গৃহস্থের মেয়েরা স্বহস্তে দীপ সাজাইতেছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া বৃক্ষপত্রের তোরণ রচনা করিয়া গৃহদ্বারের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সে কালের একখানি লুপ্তদৃশ্যপট যেন আজ আমার চোখের সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হইল।

“মালতী মাধবে” অমাত্য নন্দনের ভগিনী মদনিকা রাজপথে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, তাঁহার অঙ্গের সৌকুমার্য্যে মকরন্দ তাঁহার উচ্চকুলশীলত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। এমন কত অমাত্যের ভগিনী, কন্যা, স্ত্রী প্রতিদিন এখানে বিচরণ করিতেছেন, এমন কত মদনিকা আমার চক্ষুর গোচরের বিষয়। দুটি-বোনকে বাড়ীর চৌকাঠের নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। পশ্চাতে গৃহাভ্যন্তরের ও সম্মুখে সন্ধ্যার অন্ধকার, তার মধ্যে একটী মুখ দীপ্তিমান্। রোজই সেই পথে যাইবার সময় নয়ন একবার লোলুপ হইয়া সেই গৃহদ্বারে ধাবিত হয়, যদি সে মুখখানির দেখা পায় তবে ভারি একটা আনন্দে মন ভরে, নহিলে যেন মুহূর্ত্তের মত একটু নিরাশার ব্যথা পায়। রোজই গৃহে বসিয়া থাকিতে দেখি, একদিন হঠাৎ রাজপথে সাক্ষাৎ হইল। দুটি বোন ধীর পাদক্ষেপে আনত নয়নে চলিতেছে, একটি গৌরী, একটি শ্যামা, উভয়েরই তুল্যশ্রী, গাম্ভীর্য্যের সীমা নাই—কতকটা দূর ধরিয়া যেন রাজপথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। চলিতে ফিরিতে পথেঘাটে এমন কতদিন কত মিষ্ট মদনিকা-মুখ অন্তরে সুখের হিল্লোল তুলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পথাতীত হয়। আর

অনুসন্ধান করে কেবা সে মকরন্দ কেবা সে মাধব?

নয়ন মন ঔৎসুকে, ... হা উজ্জয়িনীর নামান্তর—আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন
মাধব দূরদেশ হইতে পদ্মাবতীনগর ... তনয় সম্মিলিত হয়, কেহ
করিতে আসিয়াছিলেন, এখানেও নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ তনয় সম্মিলিত হয়, কেহ
আন্বীক্ষিকী, কেহ বেদভাষ্য, কেহ সাংখ্য, কেহ কাব্যালঙ্কার অধ্যয়ন করে। সেদিনকার
সে দৃপ্ত শার্দ্দূল বুঝি আজও এখানে রাজ-গোশালায় পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আছে। পদ্মাবতীর
নাগরিকগণের যে বিনোদভূমি মকরন্দোদ্যান, সে বুঝি এখানকার এই মধুবন।
মৃচ্ছকটিকের উজ্জয়িনীও নয়নাগ্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রজা-হৃদয়ে রাজনৈতিক
জীবনের অন্তঃসলিল প্রবাহ, নগরের চির উৎসবময় ভাব, “গান্ধর্ব্ব” (কন্সার্ট), প্রমোদকানন,
নগররক্ষি, ধর্ম্মাধিকরণ, প্রবহণবলীবর্দ্দ, রাজশ্যালক ও নাগরিকগণের পুষ্পপ্রীতি—বিশেষতঃ
এই শেষোক্তের কথা কি আর বলিব। এখানে সেই যূথিবাসিত উত্তরীয় ধীর ললিত চারু দত্ত
যেন সত্য হইয়া উঠেন। চৈত্রমাস পড়িতেই সমস্ত নগরে ঘরে ঘরে ফুলের বিলাস। বালিকা-
পাঠশালা যেন পাঠশালা নহে, শিক্ষার রুদ্রমূর্ত্তি সেখানে নাই, সে শুধু ফুলের হাট, ফুলের মেলা।
দিনে দুপুরে কঠোর জীবনব্রতের মধ্যে কবিত্বের অধিষ্ঠান। অভিসারিকা নহে—প্রয়োজন
বশতঃ রাজপথসঞ্চারিণী কুলরমণীর বেণীমূলে যে পুষ্পন্যাসের মাদকতা তাহা কিরূপে বর্ণনা
করিব? দুদণ্ড তোমার সহিত কথা কহিতে আসিয়া যে সৌরভ ছড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া যায়
তাহার আবেশ কিরূপে বর্ণনা করিব? বসন্ত সেনার প্রতি বিটের উক্তি স্মরণ কর—

“কামং প্রদোষতিমিরেণ ন দৃশ্যসে ত্বং
সৌদামিনীব জলদোদর সন্ধিলীনা।
ত্বাং সূচয়িষ্যতি তু মাল্যসমুদ্ভবোয়ং
গন্ধশ্চ, ভীরু! মুখরাণি চ নূপুরাণি।”

এ দেশে একালে এই কবরীতে নিয়ত পুষ্পমাল্য ও “কটীতটনিবেশিতং তারাবিচিত্র-রুচিরং রশনাকলাপং” বাস্তবজীবনে যে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা তাহা না দেখিলে বোঝান যায় না।

পাঠকের স্মরণ আছে কি আর এক কবি উজ্জয়িনীর প্রতি প্রণয়াধিক্যে বক্রপথ হইলেও মেঘকে একবার তাঁহার সৌধছাদ হইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন?

“বক্রঃপন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়বিমুখো মাচভূরুজ্জয়িন্যাঃ
বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোসি।

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্ত নৃত্যোপহার
হর্ম্মেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখিন্নান্তরাত্মা
ত্যত্বাথেদং ললিতবণিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু”।

বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত পৌরাঙ্গনার যে লোলাপাঙ্গ তাহার মাধুর্য্যরসে কবির পাঠকগণ আজও সিঞ্চিত হইতেছেন, ঘরে ঘরে আজও উজ্জয়িনী বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কবি যে সেই অতীত উজ্জয়িনীর অতীত পৌরাঙ্গনার আর একটী মাধুর্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহাদের কুন্তল সংস্কার ধূপ কবিত্বের যে আভাষ দিয়াছেন তাহার সম্যক্ ধারণায়, তাহার সম্যক্ রসগ্রহণে কবির ভক্ত উদীচ্য পাঠক আজ বঞ্চিত। হায়! কবির সাধের উজ্জয়িনীও আজ আর তাহার সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। কিন্তু এই মহীশূরপুরী উজ্জয়িনীকে অনুজ্জয়িনী করিয়া তাহার সমস্ত অতীত মাধুর্য্য হরণ করিয়া নিজের বক্ষে পোষণ করিতেছে। তাই দেখিলাম এ পুরীর পুরবালার কুন্তলসংস্কারধূপে আজিও এদেশের মেঘকায় পুষ্ট!

এদেশে সপ্তাহে এক দিন পৌরাঙ্গনা কেশসংস্কার করেন। প্রথমে গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত নানা পদার্থে কেশ প্রক্ষালন করিয়া একটি প্রশস্ত মৃৎপাত্রে প্রজ্জলিত ধূপের উপর ছিদ্রযুক্ত আবরণ নিক্ষেপ করেন। অনন্তর সেই আবরণকে উপাধান করিয়া তাহার উপর সিক্তকেশরাশি ছড়াইয়া দিয়া রমণী শয়ন করেন। আবরণের ছিদ্রপথে অল্পে অল্পে ধূম নির্গত হইয়া তাঁহার আর্দ্রকেশকে অনতিবিলম্বে শুষ্ক করিয়া দেয় এবং সেইসঙ্গে তাহাতে ধূপের সুগন্ধ মাখাইয়া দিয়া যায়। কখন বা একটি ক্ষুদ্র পিত্তলের পাত্র ব্যবহার করেন। তাহার

করিয়া জ্যোতিষ্মান, কাকচূড়াধারী বালকেরা রাস্তায় পট্‌কা ছুঁড়িতেছে, চতুর্দ্দিকে বাঁশী বাজিতেছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী দৃশ্য—গৃহস্থের মেয়েরা স্বহস্তে দীপ সাজাইতেছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া বৃক্ষপত্রের তোরণ রচনা করিয়া গৃহদ্বারের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সে কালের একখানি লুপ্তদৃশ্যপট যেন আজ আমার চোখের সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হইল।

"মালতী মাধবে" অমাত্য নন্দনের ভগিনী মদনিকা রাজপথে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, তাঁহার অঙ্গের সৌকুমার্য্যে মকরন্দ তাঁহার উচ্চকুলশীলত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। এমন কত অমাত্যের ভগিনী, কন্যা, স্ত্রী প্রতিদিন এখানে বিচরণ করিতেছেন, এমন কত মদনিকা আমার চক্ষুর গোচরের বিষয়। দুটি-বোনকে বাড়ীর চৌকাঠের নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। পশ্চাতে গৃহাভ্যন্তরের ও সম্মুখে সন্ধ্যার অন্ধকার, তাঁর মধ্যে একটী মুখ দীপ্তিমান্। রোজই সেই পথে যাইবার সময় নয়ন একবার লোলুপ হইয়া সেই গৃহদ্বারে ধাবিত হয়, যদি সে মুখখানির দেখা পায় তবে ভারি একটা আনন্দে মন ভরে, নহিলে যেন মুহূর্ত্তের মত একটু নিরাশার ব্যথা পায়। রোজই গৃহে বসিয়া থাকিতে দেখি, একদিন হঠাৎ রাজপথে সাক্ষাৎ হইল। দুটি বোন ধীর পাদক্ষেপে আনত নয়নে চলিতেছে, একটি গৌরী, একটি শ্যামা, উভয়েরই তুল্যশ্রী, গাম্ভীর্য্যের সীমা নাই—কতকটা দূর ধরিয়া যেন রাজপথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। চলিতে ফিরিতে পথেঘাটে এমন কতদিন কত মিষ্ট মদনিকা-মুখ অন্তরে সুখের হিল্লোল তুলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পথাতীত হয়। আর

অনুসন্ধান করে কেবা সে মকরন্দ কেবা সে মাধব?

আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন
নয়ন মন ঔৎসুক্যে,
পদ্মাবতীনগর।—যাহা উজ্জয়িনীর নামান্তর—
মাধব দূরদেশ হইতে পদ্মাবতীনগর। ...—যাহা উজ্জয়িনীর নামান্তর—আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন
করিতে আসিয়াছিলেন, এখানেও নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ তনয় সম্মিলিত হয়, কেহ
আন্বীক্ষিকী, কেহ বেদভাষ্য, কেহ সাংখ্য, কেহ কাব্যালঙ্কার অধ্যয়ন করে। সেদিনকার
সে দৃপ্ত শার্দ্দূল বুঝি আজও এখানে রাজ-গোশালায় পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আছে। পদ্মাবতীর
নাগরিকগণের যে বিনোদভূমি মকরন্দোদ্যান, সে বুঝি এখানকার এই মধুবন।
মৃচ্ছকটিকের উজ্জয়িনীও নয়নাগ্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রজা-হৃদয়ে রাজনৈতিক
জীবনের অন্তঃসলিল প্রবাহ, নগরের চির উৎসবময় ভাব, "গান্ধর্ব্ব" (কন্সার্ট), প্রমোদকানন,
নগররক্ষি, ধর্ম্মাধিকরণ, প্রবহণবলীবর্দ্দ, রাজশ্যালক ও নাগরিকগণের পুষ্পপ্রীতি—বিশেষতঃ
এই শেষোক্তের কথা কি আর বলিব। এখানে সেই যূথিবাসিত উত্তরীয় ধীর ললিত চারু দত্ত
যেন সত্য হইয়া উঠেন। চৈত্রমাস পড়িতেই সমস্ত নগরে ঘরে ঘরে ফুলের বিলাস। বালিকা-
পাঠশালা যেন পাঠশালা নহে, শিক্ষার রুদ্রমূর্ত্তি সেখানে নাই, সে শুধু ফুলের হাট, ফুলের মেলা।
দিনে দুপুরে কঠোর জীবনব্রতের মধ্যে কবিত্বের অধিষ্ঠান। অভিসারিকা নহে—প্রয়োজন
বশতঃ রাজপথসঞ্চারিণী কুলরমণীর বেণীমূলে যে পুষ্পন্যাসের মাদকতা তাহা কিরূপে বর্ণনা
করিব? তদও তোমার সহিত কথা কহিতে আসিয়া যে সৌরভ ছড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া যায়
তাহার আবেশ কিরূপে বর্ণনা করিব? বসন্ত সেনার প্রতি বিটের উক্তি স্মরণ কর—

"কামং প্রদোষতিমিরেণ ন দৃশ্যসে ত্বং
সৌদামিনীব জলদোদর সন্ধিলীনা।
ত্বাং সূচয়িষ্যতি তু মাল্যসমুদ্ভবোয়ং
গন্ধশ্চ, ভীরু! মুখরাণি চ নূপুরাণি।"

এ দেশে একালে এই কবরীতে নিয়ত পুষ্পমাল্য ও "কটীতটনিবেশিতং তারাবিচিত্র-রুচিরং রশনাকলাপং" বাস্তবজীবনে যে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা তাহা না দেখিলে বোঝান যায় না।

পাঠকের স্মরণ আছে কি আর এক কবি উজ্জয়িনীর প্রতি প্রণয়াধিক্যে বক্রপথ হইলেও মেঘকে একবার তাঁহার সৌধছাদ হইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন?

"বক্রঃপন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়বিমুখো মাচভূরুজ্জয়িন্যাঃ
বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোসি।

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্ত নৃত্যোপহার
হর্ম্মেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখিন্নান্তরাত্মা
ত্যত্ত্বাখেদং ললিতবণিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু"।

বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত পৌরাঙ্গনার যে লোলাপাঙ্গ তাহার মাধুর্য্যরসে কবির পাঠকগণ আজও সিঞ্চিত হইতেছেন, ঘরে ঘরে আজও উজ্জয়িনী বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কবি যে সেই অতীত উজ্জয়িনীর অতীত পৌরাঙ্গনার আর একটী মাধুর্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহাদের কুন্তল সংস্কার ধূপকবিত্বের যে আভাষ দিয়াছেন তাহার সম্যক্ ধারণায়, তাহার সম্যক্ রসগ্রহণে কবির ভক্ত উদীচ্য পাঠক আজ বঞ্চিত। হায়! কবির সাধের উজ্জয়িনীও আজ আর তাহার সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। কিন্তু এই মহীসূরপুরী উজ্জয়িনীকে অনুজ্জয়িনী করিয়া তাহার সমস্ত অতীত মাধুর্য্য হরণ করিয়া নিজের বক্ষে পোষণ করিতেছে। তাই দেখিলাম এ পুরীর পুরবালার কুন্তলসংস্কারধূপে আজিও এদেশের মেঘকায় পুষ্ট!

এদেশে সপ্তাহে এক দিন পৌরাঙ্গনা কেশসংস্কার করেন। প্রথমে গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত নানা পদার্থে কেশ প্রক্ষালন করিয়া একটি প্রশস্ত মৃৎপাত্রে প্রজ্জলিত ধূপের উপর ছিদ্রযুক্ত আবরণ নিক্ষেপ করেন। অনন্তর সেই আবরণকে উপাধান করিয়া তাহার উপর সিক্তকেশরাশি ছড়াইয়া দিয়া রমণী শয়ন করেন। আবরণের ছিদ্রপথে অল্পে অল্পে ধূম নির্গত হইয়া তাঁহার আর্দ্রকেশকে অনতিবিলম্বে শুষ্ক করিয়া দেয় এবং সেইসঙ্গে তাহাতে ধূপের সুগন্ধ মাখাইয়া দিয়া যায়। কখন বা একটি ক্ষুদ্র পিত্তলের পাত্র ব্যবহার করেন। তাহার

এক প্রান্ত কৌটার আকারে গঠিত। কৌটার মধ্যে ধূপ রাখিয়া তাহার সছিদ্র মুখবন্ধ করিলে ধূপ নির্গত হইতে থাকে। রমণী এই পাত্রের এক প্রান্ত হাতে ধরিয়া গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইয়া ঘনকেশরাশির মধ্যে ইতস্ততঃ পরিচালন করেন—তাই অতীতের মেঘ কুন্তল-সংস্কারধূপৈরুপচিতবপুঃ!

আমি যথনই এদেশের অঙ্গনাকে এই কার্য্যে ব্যাপৃত দেখি তথনই সেদিন মনে পড়ে, যে দিন সেই এক বহু ভাগ্যবান আষাঢ়ের প্রথম দিবসে এক বহু ভাগ্যবান্ মেঘখণ্ড শৈলসানু আলিঙ্গন করিয়াছিল। সেদিনকার নবীন মেঘের বপ্রক্রীড়া, সেদিনকার বর্ষাপ্রারম্ভসূচনা, সেদিনকার যত দৃশ্য যত মাধুর্য্য কবির নয়ন সমক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছিল—গগনে বলাকাশ্রেণী, ওষ্ঠেধৃতকমল মানসযাত্রী মরাল, বর্ষাগমে কৃষিফল প্রত্যাশিনী কুলবধূগণ, কর্ষণ সুরভিত মালক্ষেত্র, বসুধার সুরভি আঘ্রাণ, শ্বেত শিলীন্ধ্র, কপিশ কদম্ব, প্রস্ফুটিত কেতকী, ফলপুঞ্জে শোভমান জম্বুকুঞ্জ, নবজলকণায় সিঞ্চিত যূথিকানিকর, শরভ সারঙ্গ ত্রাস, সারসের মদ কলকলরব, ভবনশিখীর নৃত্য! আর মনে পড়ে কবির বচন

"মেঘালোকেভবতি সুখিনোপ্যনথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনীজনে কিম্পুনর্দূরসংস্থে"

মনে হয় বুঝি সেদিন প্রেয়সী কবির বড় নিকটেই ছিলেন, বুঝি তাঁর কণ্ঠালিঙ্গনে কবির হৃদয়ে সুখের পূর্ণতা ছিল, বুঝি এমনো সময়ে সহসা সেই নবীন মেঘের সন্দর্শন কবিহৃদয়ে চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছিল, বুঝি অল্পে অল্পে সে হৃদয় অকারণ বিষাদ ও ব্যথায় আচ্ছন্ন হইতেছিল, তাই কবির মনে সহসা প্রতিভাত হইল, যদি

"সুখীও চঞ্চলচিত্ত মেঘদৃষ্টে প্রেয়সীর পাশে
না জানি কি দশা তার প্রিয়জন যার পরবাসে"

বুঝি তাই প্রিয়াসম্মিলিত কবির চিত্তচাঞ্চল্যে প্রিয়াবিরহিত যক্ষ ও তাহার মেঘদূত জন্ম লাভ করিল। মনে হয় "মেঘদূতে"র ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছি!

কবির আর একটী গৃহসম্বাদ এথানে লভ্য। যক্ষললনার নানা চিত্তহারী প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

"মাণিকের আলো দেখি চূর্ণমুষ্টি ফেলি তার পরে
নিভাইতে গিয়া ঠেকি কামিনী লজ্জায় যেন মরে।"

তাঁহার গৃহের ললনাদের যে চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রদীপ নিভাইতে দেখিতেন তাহাই কবি যক্ষললনায় অর্পণ করিয়াছেন। এথনও এথানে প্রদীপের উপর একমুষ্টি হরিদ্রাচূর্ণ নিক্ষেপই প্রদীপ নির্ব্বাণের প্রশস্ত বিধান। মাণিকের আলোকে প্রতারিত হওয়ার কল্পনায় কবি এই গার্হস্থ্য নিত্য ঘটনাকে কত সুন্দর করিয়াছেন।

একদিন রাজগৃহে নাটকদর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইলাম। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজার স্বীয় তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত নাট্যশালায় "রত্নাবলী"র অভিনয় হইবে। স্ত্রী-অভিনেত্রী নাই,

সেকালের ন্যায় পুরুষ অভিনেতা স্ত্রীলোকের সাজ সাজিয়া স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে রাজ নিমন্ত্রণে ইংরেজ মহিলারাও এথানে আসিয়া দেশীয় অভিনয় দেখিয়া যান। আজ তাঁহারা নাই, কেবল আমি নিমন্ত্রিত। আধুনিক রঙ্গগৃহ। দোতালায় পরদার অন্তরালে রাজমহিষী, রাজকন্যা ও অন্যান্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণ। নীচে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে প্রথম পংক্তিতে উত্তমাসনে মহীসূরাধিপতি, তৎপার্শ্বে আমি। পশ্চাতে সমস্ত আসন পূর্ণ করিয়া সমস্ত রাজসভাসদ ও রাজকর্ম্মচারী। আমার অস্তিত্ব আমি যেন ভুলিয়া গিয়াছি, আমি কেবলই অনুভব করিতেছি সূত্রধার বলিতেছে—

"অদ্যাহং বসন্তোৎসবে সবহুমানমাহূয় নানাদিগ্দেশাদাগতেন রাজ্ঞঃ শ্রীহর্ষদেবস্য পাদপদ্মোপজীবিনা রাজ-সমূহেনোক্তঃ। যথাস্মৎ স্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ব্ববস্তু রচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী নাম নাটিকা কৃতেত্যস্মাভিঃ শ্রোত্রপরম্পরয়া শ্রুতা, নতু প্রয়োগতো দৃষ্টা, তত্তস্যৈব রাজ্ঞঃ সকলজনহৃদয়াহ্লাদিনো বহুমানাদস্মাসু চানু-গ্রহবুদ্ধ্যা যথাবৎ প্রয়োগেন ত্বয়া নাটয়িতব্যেতি।"

মৎপার্শ্ববর্ত্তী এই ভূপতি যেন মূর্ত্তিমান্ অতীত-শ্রীহর্ষদেব; মৎনয়নাগ্রবর্ত্তী এই পরিষৎ যেন সেই অতীত বসন্তোৎসব-পরিষৎ, এই সূত্রধার এই নটী যেন সেই অতীত নটনটী। আজ যেন আদি রত্নাবলীর আদি অভিনয় আমার নয়ন সমক্ষে উপক্রান্ত হইল। অভিনয় সংস্কৃতে নহে, কর্ণাটক ভাষায়। তাহাতে মোহ আরও প্রশ্রয় পাইল। কেননা সংস্কৃত গ্রন্থে যে অংশ প্রাকৃত তাহা যেমন আমার নিকট অল্পবোধ্য ইহাও তদ্রূপ অনুভূত হইল। মনে কর—

"অজ্জ ণিচ্চিন্তো দাণিং সি তুমং; তা কীসুণ ণচ্চসি, মহ উণ মন্দভাআয়ে এক্কা জেব্ব দুহিদা, সাবি তুয়ে কহিং বিদেসন্তরে দিণ্ণা &c."

ইহা সংস্কৃতাভিজ্ঞ কিন্তু তাৎকালিক প্রাকৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত সুবোধ নহে। এ দুর্ব্বোধ্যতার মূলে কেবল সেকাল ও একালের ভাষা ভেদ। তেমনি সংস্কৃতশব্দ বহুলকর্ণা-টক ভাষায় সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের যতটুকু দুর্ব্বোধ্যতা তাহাও কেবল অতীত ও বর্ত্তমানের ভাষাভেদ ঘটিত বলিয়া প্রতীয়মাণ হইল, তাই তাহাতে অতীতানুভূতি মনে আরও নিবিড়তর হইল। আর সৌজন্যতার আধার রাজা স্বয়ং আমায় প্রত্যেক অংশ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, তাই অভিনয়ের রসগ্রহণে আমার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না।

যাঁহারা রত্নাবলী পড়িয়াছেন তাঁহাদের মনে পড়িবে প্রথমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যে রাজা ও বিদূষক বসন্তোৎসবে কৌশাম্বীর পৌরজনের আমোদাতিশয্য বর্ণনা করিতেছেন। অদ্যকার রাত্রির এই অভিনয়ে দেখিলাম রাজা ও বিদূষক প্রাসাদের উপরিভাগে দাঁড়াইয়া, নিম্নে পৌরবর্গের আমোদপ্রমোদ চলিতেছে রাজা তাহা সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যেথানে মূলগ্রন্থে কবিতা আছে রাজা সেথানে কবিতাংশ গান করিয়া বলিতেছেন। তাহাতে সৌন্দর্য্য ভারি বৃদ্ধি হইতেছে এবং মনে দৃঢ় ধারণা উৎপন্ন করিতেছে যে প্রাচীনকালে কবিতাংশ এইরূপে গাহিয়া বলিবার জন্যই অভিপ্রেত ছিল। গ্রন্থে যেথানে নির্দ্দেশ আছে "ততঃ প্রবিশতো মদনলীলাং নাটয়ন্ত্যৌ দ্বিপদীখণ্ডং গায়ন্ত্যৌ চেট্যৌ' সেথানে এক সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া

গেল। গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট দুটী চেটীর পরিবর্ত্তে সাত আটটি সুন্দরী যুবতী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল। তাহাদের কাপড়ের রঙের বাহারে, পরিবার ধরণের মাধুর্য্যে নয়নের প্রীতি অপরিসীম হইল, আর তাহাদের সে মধুর নৃত্য—অপরূপ, মধুর, কেননা অতীতাধিষ্টিত, অদৃষ্টপূর্ব্ব। দেখিলেই অনুভব হয় ইহা অসংস্কৃতকাল প্রবহমাণ স্থিতিশীল দক্ষিণ ভারতে সংরক্ষিত প্রাচীন নৃত্য, আধুনিক উত্তর ভারতের যাবনিকপ্রভাববিকৃত নব্যনৃত্য নহে।

অভিনয়সমাপ্তিকালে ভরতবাক্যে রত্নাবলী নাটিকার রাজাও অভিনেতৃগণের সম্মুখবর্ত্তী দর্শকাসনাধিষ্ঠিত বাস্তব রাজার একীকরণ হইল। ভরত বলিল না—"ইন্দ্র অভিষ্ট বৃষ্টি প্রদান করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করুন, ইত্যাদি" কিন্তু সে বলিল "কৃপানিধি নীলকণ্ঠ সোমার্দ্ধাঙ্গ, সৌমনস্যাকর, কামিতরবদ, কোমলসুপদ, সোমবংশবর্দ্ধিচন্দ্র, চামভূপতিকে শুভবিভব প্রদান করুন।"

রাজা যখন প্রতি প্রভাতে ও অপরাহ্নে স্বহস্তে চারঘোড়া হাঁকাইয়া পরিভ্রমণ করেন এবং অগ্রে ও পশ্চাতে শরীররক্ষক সৈন্য অনুগমন করে তখন চতুর্দ্দিকে প্রজাকণ্ঠে একটা অস্পষ্ট কাকলী সমুত্থিত হয়—"মহারাজ" "মহারাজ"। প্রাচীন বর্ণনানুযায়ী পুরললনার নয়ন কমলের তোরণ রচিত হয় এবং সে নয়ন ভক্তিতে ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। যতক্ষণ মহারাজা দৃষ্টিপথে থাকেন সকলে নিত্য নূতন প্রীতিতে সোগ্রীবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখে। মহারাজ অন্তর্ধান হন, সেদিনকার মত পুরবাসীর হৃদয় একটুখানি আনন্দরসসিক্ত হইয়া যায়।

মহারাণীর নামে যে বালিকাবিদ্যালয় সেখানকার শিক্ষনীয় প্রতিগানের শেষে মহারাজার নাম সংযুক্ত। প্রতিদিন তাঁহার রাজধানীর তিন চারি শত বালিকা কোমল শিশু-কণ্ঠে তাঁহার প্রতি দেবতার আশীষ আবাহন করে। মহীসুর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী চামুণ্ডীর মহারাজের প্রতি বড় স্নেহ তাহারা বর্ণনা করে। তিনি তাঁহার সমস্ত কামিতার্থদায়িনী, তিনি চামভূপপরিপালনমোদা, চামভূপালসদয়া, চামরাজেন্দ্রস্থিরলক্ষ্মী, নৃপমৌলিচামনৃপসৌখ্যদায়িনী। যিনি শ্যামলকিশলয়কোমলা, বিমলা, ভূরিকৃপারসপূরিতা, ললিতা তিনি চামরাজসংসেবিতা, চামভূপার্চ্চিতা। অরাজক পিতৃমাতৃহীন বাঙ্গালীর চোখে এ রাজভক্তি বড় দুর্লভ ধন। বাঙ্গালা দেশে রাজারাণী অনুভূতির বিষয় নহে, শুধু কল্পনার উপকথার উপন্যাসের বিষয়। শৈশবে বৃদ্ধা আত্মীয়ার আলাপনে অঙ্কুরিত, বয়োবৃদ্ধি সহকারে উপন্যাস পাঠে বর্দ্ধিত বাঙ্গালীর এ মানসী সৃষ্টি স্বদেশে বাহ্যসৃষ্টির সহিত একীকৃত হইতে পারে না। অথচ এখানে প্রতিদিন সেই রাজদর্শন সুলভ, প্রতিদিন রহস্যপূর্ণ রাজান্তঃপুরের সম্বাদ লভনীয়—তাই মনে হয় যেন প্রতিদিন প্রাচীন ভারতের নাটক দেখিতেছি।

এমনি অতীতের সহস্র কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিয়া এই মহীসুরপুরে বর্ত্তমানের দুহিতা আমি প্রীত, মোহিত, আত্মবিস্মৃত হই। ছবির ন্যায় মনোমুগ্ধকারী অথচ ছবির অপেক্ষা বাস্তব, তাই সমস্ত মহীসুর অভিনেতা, আমি একা দর্শক। অতীতের হৃদকোরক এখানে

নিহিত। তাহার একটি একটি পাপড়ি প্রতিদিন আমার চোখের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইতেছে; সৌন্দর্য্যে সুগন্ধে মাতোয়ারা করিতেছে। যদি আর কেহ ইহার মধু আহরণে অভিলাষী থাক, যদি বর্ত্তমানে থাকিয়াও অতীতানুভূতি সুখলাভ করিতে চাহ, তবে এ তীর্থ পরিদর্শন করিয়া যাও।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

বঙ্গেশ্বর ও বাঙ্গালী।

স্যর্ অ্যালেক্জেণ্ডর্ আদরে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং সে আদর-প্রবাহে এখনও প্রায় পুরা জোয়ার ছুটিয়াছে। আমন্ত্রণ, অভিনন্দন, এবং প্রীতিরসসিঞ্চিত মিষ্ট সম্ভাষণ স্যর্ অ্যালেক্জেণ্ডরকে অবিরত আপ্যায়িত করিতেছে। রাজা, রাইচ, বাবুলোক, রাজনৈতিক সভাসমিতি ও সংবাদপত্র-সম্পাদক, শতমুখে স্যর অ্যালেক্জেণ্ডর মেকেঞ্জির গুণগৌরবের কীর্ত্তন করিতেছেন। সে এত অধিক ও ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে উত্থিত যে, স্যর অ্যালেক্জেণ্ডার স্বয়ং তাহাতে বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। আদর আপ্যায়িতের এত উচ্ছ্বাসে উদ্বিগ্ন হইবার কথাই বটে। কারণ প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া অপেক্ষা প্রখরই হয়। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালী প্রকৃতি বিশেষতঃ রাজনৈতিক বঙ্গপ্রকৃতি বিষম ক্ষিপ্র। সুখ্যাতির স্বর্গ ও নিন্দার নরক উভয়ই উহার একস্থানে অবস্থিত;—উভয়ের মধ্যে চুলমাত্রও ব্যবধানাভাব। তিল কারণেই উভয়ের কোনও না কোন ঘটনা মুহূর্ত্তেই সম্ভব। যে স্যর অ্যালেক্জেণ্ডার এ মুহূর্ত্তে ভক্তি প্রীতির মহা কেন্দ্রস্থল, এমন কি, রাজনৈতিক বাঙ্গালীর সাধ সোহাগেরও সামগ্রী, পর মুহূর্ত্তে ইনিই আবার এই পোলিটিসিয়নদের নিকট ভীষণ বৈ[illegible]রূপে পরিণভ হইবেন না কে বলিল? নব বঙ্গেশ্বরের ভবিষ্য-ভাগ্যে যাহা ঘটিবে, গণিতে জানিলেও বলিতে চাহি না; কিন্তু, তাঁহার এই উপস্থিত প্রশংসা-উচ্ছ্বাসের আদৌ কারণাভাব। তিনি বৃটিশ রাজনীতি বঙ্গোপসাগরে বিসর্জ্জিয়া বাঙ্গালার মস্নদে বসেন নাই; বাঙ্গালী পোলিটিসিয়নের ইহা বুঝা উচিত। পরন্তু, ইহাও বুঝা উচিত যে, এলিয়ট-নীতির সহিত স্যর অ্যালেক্জেণ্ডার আত্মনীতির সম্পূর্ণ এক-তান্ত্রিকতা রক্ষা করিবেন, অগ্রেই অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং সেই অঙ্গীকারানুরূপই কার্য্য করিবেন। অতএব এই স্তুতিগানের তরঙ্গতুফান, কিছু অপেক্ষা করিয়া ও কিছু ধীরে ছুটাইলেই ভাল ছিল। সেটা উভয়তঃই মঙ্গলকর হইত। কিন্তু ততটা কি বিলম্ব সয়? বিশেষতঃ যে স্থলে বাক্য-প্রয়োগের অবসর! কাজেই প্রশংসাসঙ্গীতের পালার উপর পালা চলিয়াছে, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ উড়িতেছে! কিন্তু সুচতুর স্যর অ্যালেক্জাণ্ডার এ প্রশংসার মর্ম্ম ও মূল্য বুঝেন। সম্পাদকীয় বীণানিক্বণ যে কোনও মুহূর্ত্তে দারুণ-দংশনে পরিণত হইবে, ইহাতেও তিনি কৃতনিশ্চয়; কেননা প্রশংসাবাদে পথভ্রষ্ট ত আর তিনি হইবেন না। কাজেই অভিনন্দন-উচ্ছ্বাসে বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইয়াই তিনি বলিয়াছেন 'Woe unto thee when all men speak well of thee."

পান্তো পলিটিক্স্।

"আমি উত্তেজনা অসহিষ্ণু লোক হইলে আমার প্রতি বঙ্গসমাজের আদর অভ্যর্থনার এই "অমায়িকতায় ও একতান ধ্বনিতে", আমি বস্তুতঃই বিলক্ষণ বিরক্ত ও বিচলিত বোধ করিতে আরম্ভ করিতাম।"—উপর্য্যুপরি বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বরণগ্রহণ করিতে করিতে, নব বঙ্গেশ্বর, অতঃপর ঐ উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বরণে বিচলিত বা প্রশংসা-নিক্কণে পথভ্রষ্ট হইবার লোক নহেন। অতএব তিনি অগ্রেই এবং উপস্থিত আদর অর্চ্চনার অভ্যন্তরেই আত্মপ্রকাশ বা আপনার শাসননীতির আভাষ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের অধিনেতৃদিগের অভিনন্দনের উত্তরে সহৃদয়তার সহিত কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবেই তিনি বলিয়াছেন—"নিঃসন্দেহই, ভবিষ্যতে আপনাদের সহিত আমার ও আমার সহিত আপনাদের মতানৈক্য ও মন-কসাকসি হইবে।" অর্থ,— "আপনারা আমাকে প্রশংসা করিতেছেন বলিয়া আমার নিকট অধিক প্রত্যাশা করিবেন না, এবং যাহা অসম্ভব অর্থাৎ সাধারণ শাসননীতির অননুমোদিত তাহাও প্রত্যাশা করিবেন না। পূর্ব্বাবধি যাহা হইয়া আসিতেছে, আমিও তাই করিব, তাহাতে আপনারা যাহাই বলুন।"

ইহা সুস্পষ্ট ও সরল উক্তি। কিন্তু, "ভবিষ্যতে" উপস্থিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। বঙ্গেশ্বর উপরোক্ত উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই "অনৈক্যের" অপরিসীম উৎস উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। স্বায়াত্ত শাসন সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্তর চার্লসের স্বায়াত্ত শাসননীতি অপেক্ষা একবিন্দুও উচ্চ নহে; বরং দুইবিন্দু নিম্ন! শাসন ও বিচার-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে স্তর অ্যালেকজেণ্ডার স্তর চার্লস অপেক্ষা বরং অধিকতর অনুদার মত পোষণ করেন। তাঁহার বিবেচনায় শাসয়িতা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সুবিচারের যে নিন্দা রটনা করা হইয়া থাকে, তাহা অত্যুক্তিময়, অমূলক। অতএব দেখুন, শাসননীতি সম্বন্ধে অতীত ও বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বরে বিভিন্নতা কিসে! কিন্তু, বঙ্গীয় পোলিটিসিয়নগণ নীতি অপেক্ষা নরম কথারই পক্ষপাতী। বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বরের স্বর নরম, কণ্ঠ ললিত, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। অঞ্চল-বাতাসে অঙ্গুলী-পরশে বাঙ্গালীপ্রকৃতি বিমুগ্ধ ও বশীভূত হয়। তাই আজ আমাদের অধিনেতৃরা বলিতেছেন—"তা, আহা! ম্যাকেঞ্জী, যাহা বলিয়াছেন বলুন, কথাগুলি কেমন মোলায়েম, সুরখানি কেমন সুন্দর,—হাসিটুকু কেমন মিষ্ট! আমাদের বসালেন, কেমন হেসে হেসে কথা কহিলেন, কতবার বাবু বাবু বলে ডাক্‌লেন! আর আর—(স্বগত) আমার গিন্নকে একটী ডেপুটী কালেক্টরী,—"***

স্তর চার্লস কর্কশভাষী ছিলেন; স্তর অ্যালেকজেণ্ডার কোমলভাষী। অতএব আমাদের অধিনেতৃদিগকে পিট চাপড়াইয়া বেশ চরাইয়া লইয়া বেড়াইতে পারিবেন, আশা করা যায়। কিন্তু, তোমরা যে টাট্‌কা পোলিটিক্সের প্রত্যাশা করিতেছিলে, ইহা ত তাহা নয়; ইহা ত পান্তো পোলিটিক্স্।

বরোক্রেসী বনাম বাবুক্রেসী।

উচিত কথা, শত্রুর মারফতে আসিলে, মূল্য হারায় না। আমি উচিত কথার উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া, আক্রোশে উচিতবাদীর ঊর্দ্ধতন অষ্টবিংশতি পুরুষের প্রতি গালিগালাজ বর্ষণ করি, ইহা আমার কেবল অন্যায় নহে, বিলক্ষণ আহাম্মকিও বটে। আমি স্বার্থপর, নীচ কাপুরুষ কপট দেশহিতৈষী, তাই উচিত কথা শুনিয়া আত্মদোষ সংশোধন করিতে সর্ব্বথা অসম্মত। আমি আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিকার করিতে প্রস্তুত নহি; পাপ-প্রদর্শনকারীকে প্রহার করিতেই উদ্যত!! প্রেসিডেন্সী কমিশনর আমার ও শিক্ষিত বাঙ্গালী-ভ্রাতৃবর্গের পরমশত্রু হইলেও আমি তাঁহার উচিত কথা সহিষ্ণুতার সহিত শুনিতে বাধ্য। কমিশনর ওয়েষ্টমেকট্ মফঃস্বলের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া লেখেন;—

"In the allotment of their funds Municipal Commissioners are not sufficiently considerate of the welfare of the general body of the people and look exclusively to the wants of a certain class of the people generally, they are in no sense representative and with them, they have less sympathy than a European official would have. Municipal administration by the educated Babu class is in no sense Local Self-Government by the people whose interest it is necessary to safeguard by external control.

অল্লাধিক অতিরঞ্জিত হইলেও আমি মিঃ ওয়েষ্টমেকটের এ উক্তির অনেকই উচিত মনে করি; কেননা অভিজ্ঞতায় ও অনুসন্ধানে উহা উচিতই প্রতিপন্ন হইয়াছে ও হয়। পরন্তু মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের এই কলঙ্ক, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরদিগের উপরেও প্রযুক্ত হয়। প্রথমতঃ অধিকাংশস্থলেই কমিশনর ও মেম্বরগণ সর্ব্বসাধারণ ও জনসাধারণের অভাব মোচনার্থে সাধারণের অর্থব্যয় করা অপেক্ষা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থসাধন ও সুখসুবিধার জন্য উহা ব্যয় করিতে অধিকতর তৎপর। এ উক্তি আমি অযথার্থ বলিতে পারি না, বরং ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী দূরেও যাইতে প্রস্তুত আছি। "সম্প্রদায়" শব্দের স্থলে "ব্যক্তি" শব্দও বসান যাইতে পারে!! সাধারণের নামে ও সাধারণের অর্থে, মেম্বরের বা কমিশনরের ব্যক্তিগত কুটুম্বগত বা কণ্ট্রাক্টগত উন্নতি ও আরাম অভিজ্ঞের নিকট অবিরল। তবে কথা হইতে পারে (কেহ কেহ এ কথা বলিয়াছেনও) যে মেম্বর বা কমিশনর যখন বিনা বেতনে শ্রম করিয়া সাধারণের কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের নিকট লোকের কৃতজ্ঞই হওয়া উচিত; তাঁহাদের প্রতি কলঙ্ক নিক্ষেপ করা নিষ্ঠুরতা। তা নিশ্চয়; কিন্তু আমি বিনা বেতনে শ্রম করি বলিয়া আমার সাতখুন মাপ হইতে পারে না, সাধারণের অর্থ অপহরণ করার অধিকারও জন্মিতে পারে না। তাহা যদি জন্মে, তবে ইহাই বুঝিতে হয় যে,

উমেদারি করিয়া বিনা বেতনের চাকুরী করিতে যাওয়ার প্রচুর পরিমাণে আর্থিক প্রলোভন আছে। দ্বিতীয়তঃ ইয়ুরোপীয় তত্ত্বাবধানে স্বায়াত্ত-শাসন-তহবিলের অপব্যয়, অপচয় ও অপহরণ নিবারিত হয় এবং তাহার সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আছে, ইহা আমি স্বীকার করি না; কারণ ইহা অসত্য। কিন্তু, শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি নহেন, ইহা প্রকৃত কথা। তৃতীয়তঃ বাবু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিনিধিত্ব সম্যক স্বায়াত্ত শাসন নহে; ইহাও ঠিক। কিন্তু স্বায়াত্ত শাসনকে সাহেবরা করিতে চাহিতেছেন "বুরোক্রেসী,' আমরা না হয় উহাকে করিতেছি ""বাবুক্রেসী।" ফলতঃ প্রকৃত ডেমোক্রেসীর নিকট ঐ উভয়ই প্রায় একদ্রব্য। যে দেশে স্বয়ং কঙ্গ্রেস-প্রেসিডেণ্ট কৃষককে কুলি বলিয়া অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হন না, সেদেশে বুরোক্রেসী ছিল, বাবুক্রেসী হইতেছে,—ডেমোক্রেসী এখনও অনেক দূরে আছে।

বজেট্ ও বোর্ড।

বাঙ্গালীর গৃহে শনিগ্রহের গুরু প্রকোপ হইলেও, বেঙ্গল বজেটে লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। আমি ইহাতে অসন্তুষ্ট নহি। কেননা ইহা বঙ্গশাসয়িতাদের পুণ্যের পরিচায়ক। স্যর চার্লস ইলিয়ট এই পুণ্যের প্রতিষ্ঠালোভী ছিলেন; স্যর ম্যাকেঞ্জী মহোদয়ও উত্তরাধিকার সত্বে অবশ্য সে দাবি করিতে পারেন। কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্কের মত, কলঙ্কমূলক কল্যাণের মত পুণ্যেও পাপের প্রভা থাকিয়া থাকে। তা সেওয়ায়, লক্ষ্মীঠাকুরাণীটী নিজেও পেচকবাহিনী এবং একনয়নী বলিয়া কিছু অযশভাগিনী বটেন। বজেটের আয়ের অঙ্কে আমি "শোষণ" শব্দ প্রয়োগ করিতে উৎসুক নহি। কেননা শোষণাভ্যন্তরে "সিডিসন" সন্দেহ হইতে পারে। আমি ব্যয়ের অঙ্ক উল্লেখ করিয়াই কিছু বলিতে চাহি। কিন্তু, অগ্রেই বলিতেছি যে এক-ক্রান্তিও অসদ্ব্যয় আরোপ করি না। সরকার বাহাদুরের সবই সদ্ব্যয়। এক্শেচঞ্জ কম্প্যান্সেসনও অপব্যয় নয়। মুক্তহস্ততা মহাপুরুষেরই লক্ষণ। তা মাতৃশ্রাদ্ধেই হউক আর মদ্যপানেই হউক। বিলাতি সাহেবের বাটার ক্ষতিপূরণের, বেতনের বেতন, এদেশীয়দের দেহ আত্মা-একত্র-রক্ষণোপযোগী আয়ের কর, লবণ, অন্ন ও বস্ত্রের কর হইতে প্রদত্ত হইলেও, উহা ঐকান্তিক উন্মুক্তহস্ততা; অতএব সদ্ব্যয়। তবে আমি বলিতে চাই কি? বলিতে চাই, আপন উচিত ব্যয়ে আপনি হস্ত গুটাইয়া তাহা অক্ষম অপরের স্কন্ধে চাপাইবার কথা। যদি কোন হিন্দু গৃহস্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, দেবসেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ, রহিত করিয়া মাতাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া পুত্র কলত্র পোষণের ব্যয় অতিথি সেবার নির্দ্দিষ্ট আয় হইতে নির্ব্বাহিত করেন এবং নির্ব্বাসিত জননী এবং অভুক্ত বিগ্রহ অতিথী ব্রাহ্মণের অন্নে অগাধ অর্থসঞ্চয় করিয়া অচিরাৎ অসীম লক্ষ্মীবন্ত বলিয়া পরিচিত হন, তবে লোকে তাঁহার সে লক্ষ্মীকে কি বলে? প্রদেশীয় রাজকোষ হইতে ইতিপূর্ব্বে যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ব্যয় হইত, প্রদেশীয় বৃহৎ রাজপথ, শিক্ষা ও চিকিৎসা বাবদে যে ব্যয় হইত, সে সকল ব্যয়

এখন দরিদ্র ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডনিচয়ের স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আয়ের উপলক্ষ অতীব অল্প; কিন্তু ব্যয়ের বিষয়সংখ্যা অযুত, অযুতের উপর সম্প্রতি পুনঃ নিযুত কোটী চাপাইবার জন্য আইন হইতেছে। ইহা উত্তম। বাঙ্গালার মাটীতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যাহা এখন কিছু করণীয়, তাহা সমস্তই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তব্য কার্য্য! অতএব বেঙ্গল বজেটে উদ্বৃত্ত হওয়ার আর অসম্ভাবনা কি, তাহাতে আশ্চর্য্যই বা কি, পুণ্যই কি, বাহাদুরী বাহবাই বা কি? কিন্তু, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যে এত কার্য্য করিতে বাধ্য, তাহার আয় কি এবং সে আয় ঐ সকল কার্য্যে ব্যয় করার আইন কি? আইনের কথা ধরি না; আইন নাই, কথাই আইন—আর আইন করিতেই বা কতক্ষণ? কিন্তু আয় কি? আয় সেই "থোড় বোড়ী খাঁড়া, আর খাঁড়া বোড়ী থোড়"! খেওয়া, খোঁয়াড় আর সেস! খোঁয়াড় ও খেওয়ার আয় অনুপযুক্ত। প্রধান সম্বল রোডসেস। কিন্তু রোডসেসের সৃষ্টি শিক্ষা চিকিৎসার ব্যয়ার্থে বা প্রদেশীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ প্রস্তুতের ও পোষণের জন্য হয় নাই। সরকার বাহাদুর শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পথকরের কড়ি কেবল গ্রাম্যপথ, পুষ্করিণী, পয়োপ্রণালী প্রভৃতি গ্রামবাসীদের গ্রাম্য প্রয়োজনীয়তাতেই ব্যয় হইবে; উহার এককক্রান্তিও অন্যত্র নীত ও অন্য বিষয়ে ব্যয়িত হইবে না। কিন্তু হায়! এখন কোথায় বা সে প্রতিজ্ঞা, কোথায়ই বা সেই শপথ! এখন—যখন পথকরদাতা গ্রাম্য প্রজা জলাভাবে প্রাণে মরিতেছে!! এমত অবস্থায় বঙ্গীয় বজেটে যে লক্ষ্মীর দৃষ্টি, সে লক্ষ্মীকে আমি শঙ্কা করি,—তিনি কেবল কৃপণতাময়ী নহেন, কলঙ্কময়ী!!

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম অধ্যায়।

ইংরাজ-বণিকের উদ্ধত-স্বভাব।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে* নবাব মন্সুরোল্-মোল্ক-সিরাজদ্দৌলা-শাহকুলী খাঁ-মিরজা মোহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মস্নদে আরোহণ করেন। শত্রুদলের মনের ভাব যাহাই থাকুক, কেহ আর প্রকাশ্যে বাধা দিতে সাহস পাইল না;—যে যেখানে ছিল, সকলেই যথাযোগ্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিল না। ইউরোপীয় বণিকেরাও কার্য্যতঃ সিরাজদ্দৌলাকেই নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং যথাকালে স্বদেশে তৎসংবাদ প্রেরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যব্যাপারে নিযুক্ত রহিলেন।

* Stewart's History of Bengal.

সিরাজদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, কলিকাতার তখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা! একে ইংরাজদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তাহাতে প্রায় প্রতি বৎসরেই সহস্রাধিক ইংরাজ অকালে কালকবলে পতিত হইতেন ;—অনেকেই কলিকাতার জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে পারিতেন না। ইংরাজদিগের যত্নে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল ; তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য আগ্রহের অবধি ছিল না ;—কিন্তু যাঁহারা প্রাণের দায়ে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিবার অবসর পাইতেন না!*

বর্ষাসমাগমে জ্বরবিকারের প্রবল প্রতাপে অনেকেই শয্যাগত হইতেন্। যাঁহারা কোনরূপে ভালয় ভালয় বর্ষাকাল কাটাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহারা প্রতি বৎসরে ১৫ই অক্টোবরের শরৎ-কৌমুদী-বিধৌত প্রশান্ত নিশীথে প্রীতিভোজনে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরম সমাদরে প্রগাঢ় স্নেহালিঙ্গন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত করিতেন।†

বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজ বাঙ্গালী মিলিত হইয়া নগররক্ষার্থ অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া স্বহস্তে যে "মহারাষ্ট্র খাত" খনন করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভোদ্গত পূতিগন্ধে নাগরিকদিগের নাসারন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিত! পথ ঘাটের কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না ;—যাহা ছিল, তাহাও কখন ধূলায়, কখন কাদায়, এবং নিরন্তর হুঙ্কারজনক বীভৎস দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। সেকালের লালদীঘিই সাধারণের পক্ষে নন্দনকানন বলিয়া পরিচিত ছিল ; কিন্তু তাহার পূতিগন্ধে বহুদূর পর্যান্ত পথিকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত!‡

এখন যেখানে নর শার্দ্দুল শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণ সৌধ-ধবল চৌরঙ্গী অঞ্চলে সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে গিয়া রোগক্লিষ্ট বাঙ্গালী ভৃত্যের প্লীহা বিদারণ-নিপুণ অসীম পদ-গৌরব প্রকাশ করিবার অবসর লাভ করিয়াছেন, সেকালে সেখানে কেবল বনশার্দ্দুলনিনাদ-মুখরিত শ্যামল বন-বিটপরাজি বিরাজ করিত! ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইষ্টক প্রস্তুতের জন্য তাহার কিয়দংশ নির্ম্মূল হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি সে নিবিড় বন একেবারে উৎসাদিত হইয়াছিল না ; নগরের মধ্যেও সকল স্থানেই তরুগুল্মলতা স্বচ্ছন্দবনজাত স্বাভাবিক শোভা বিকাশ করিয়া সগৌরবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিস্তার করিত!§ লোকে কেবল বাণিজ্যলোভে অথবা বর্গীর ভয়েই এরূপ স্থানে বাস করিতে সম্মত হইত। কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থা যতই শোচনীয় হউক, ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিত সুগঠিত অট্টালিকা সমূহের বাহাড়ম্বরে কলিকাতা বহুজনাকীর্ণ মহানগরী বলিয়াই প্রতিভাত হইত।

* There was an Hospital in Calcutta, which many entered but few came out of to give an account of their treatment.—Hamilton.

† Revd. Long.

‡ Complaints were made in 1755 that owing to the washing of people and horses in the great tank, it is so offensive at times, there is no passing to the Southward or Northward.—Revd. Long.

§ In 1762 an order was issued to clear the town of jungle.—Revd. Long.

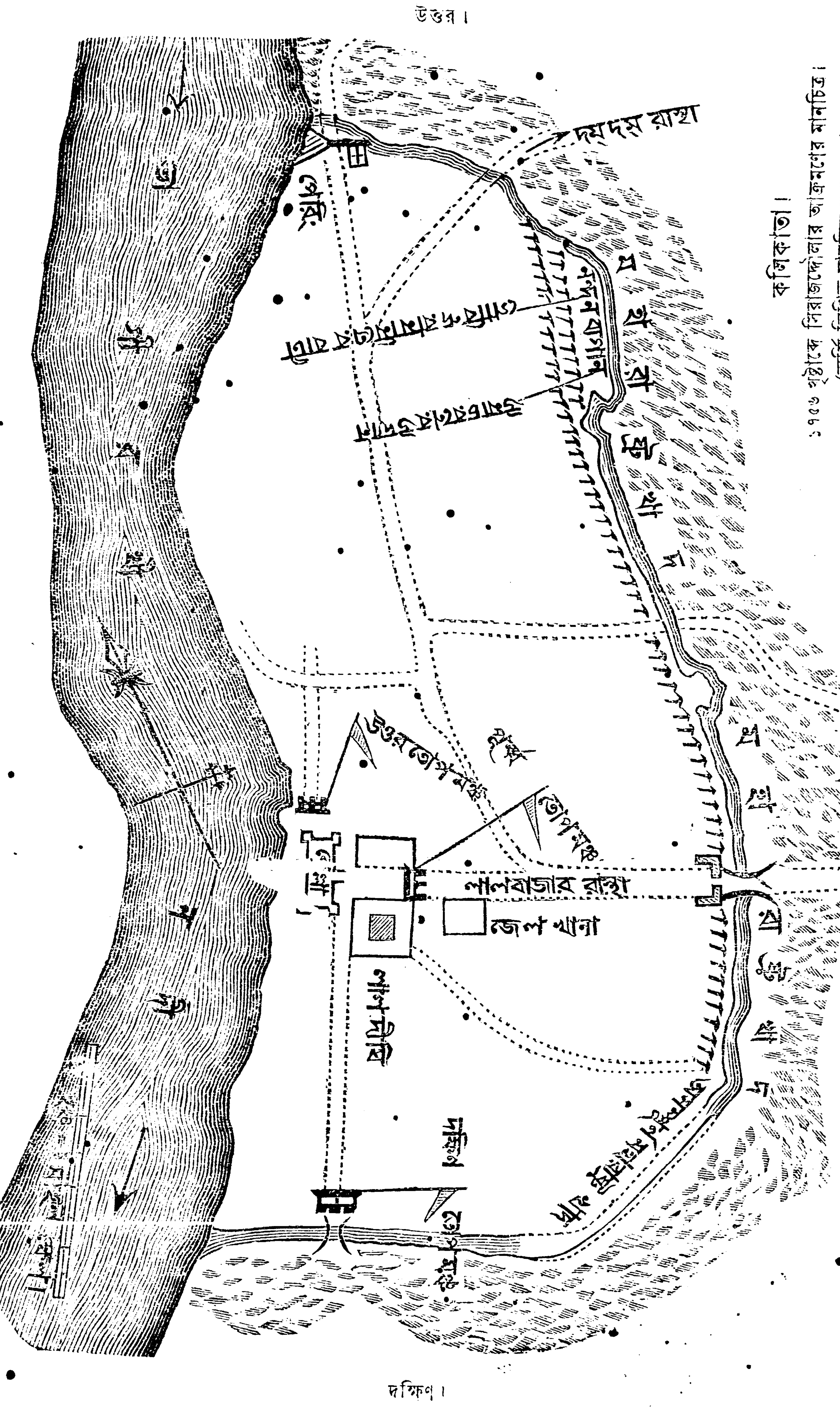

কলিকাতা।
১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার আক্রমণের মানচিত্র।
(অর্মি-লিখিত মানচিত্র অবলম্বনে)।

এই নবজাত মহানগরে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। তাঁহারা নবাবের রাজ্যে বাস করিয়াও নিজ সহর কলিকাতার মধ্যে স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহাদের অনুমতি ক্রমে পর্ত্তুগীজ, আরমানী, মোগল এবং হিন্দু-বণিকেরাও কলিকাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

আরমানী বণিকদিগের মধ্যে খোজা বাজিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা কারণে তাঁহার কথা বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। লবণের ব্যবসায়ে একাধিপত্য লাভ করিয়া খোজা বাজিদ পদগৌরবে সকলের নিকটেই সম্মানাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তজ্জন্য নবাব-দরবার হইতে "ফখর্-অল্-তোজ্জার" অর্থাৎ "বণিক গৌরব" উপাধি লাভ করিয়া খোজা বাজিদ এদেশে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন।

হিন্দু বণিকদিগের মধ্যে উমাচরণের নাম "উমিচাঁদ" বলিয়া এ দেশের ইংরাজ-লিখিত ইতিহাস মাত্রেই চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজেরা ইঁহাকে ধূর্ত্ততার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং সুললিত-পদবিন্যাস-নিপুণ লর্ড মেকলে আবার বর্ণনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য উমাচরণকে "ধূর্ত্ত বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই! উমাচরণ বাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুবণিক, কেবল বাঙ্গালা বিহারে বাণিজ্য করিবার জন্যই বাঙ্গালাদেশে বাস করিতেন। উমাচরণকে "বণিক" বলিয়া পরিচয় দিলে, সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁহার শত-সৌধ-বিভূষিত বিচিত্র রাজপুরী, তাঁহার কুসুমদামসজ্জিত সুবিখ্যাত পুষ্পোদ্যান, তাঁহার মণিমাণিক্যখচিত ইতিহাসবিখ্যাত রাজভাণ্ডার, তাঁহার সশস্ত্র সৈনিক-বেষ্টিত সুগঠিত সিংহদ্বার দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক,—ইংরাজেরাও তাঁহাকে একজন রাজা বলিয়াই মনে করিতেন *। শেঠদিগের মধ্যে যেমন জগৎশেঠ, বণিকদিগের মধ্যে সেইরূপ উমাচরণ নবাব-দরবারে সবিশেষ সুপরিচিত ও পদগৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ বণিক বিপদে পড়িলে সর্ব্বদাই তাঁহার শরণাগত হইতেন; এবং অনেকবার কেবল-মাত্র উমাচরণের অনুকম্পাবলেই যে তাঁহাদিগের লজ্জারক্ষা হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় †! একবার বর্গীর হাঙ্গামায় ইংরাজদিগের অনেকগুলি নৌকা লুট হইয়া যায়; স্বয়ং নবাব পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভয়ে জীবন্মৃত, ইংরাজবণিক আর

* The extent of his habitation, divided into various departments, the number of his servants continually employed in various occupations, and a retinue of armed men in constant pay, resembled more the *estate* of a prince, than the *condition* of a merchant.—Orme, vol. II. 50.

† He had acquired so much influence with the officers of the Bengal Government, that the Presidency, in times of difficulty, used to employ his mediation with the Nabab.—Orme, vol. II. 50.

তাঁহাদের কি করিবেন? তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া "উমিচাঁদের" শরণাগত হন। উমাচরণ বণিক হইলেও, মহারাষ্ট্র সেনাপতির নিকট অপরিচিত ছিলেন না;—সেনাপতি তাঁহার প্রেরিত দূত ভগবান সিংহের নিকট উমাচরণের পদাশ্রিত ইংরাজবণিকের লাঞ্ছনার কথা অবগত হইয়া যেরূপ সৌজন্য-পরিপ্লুত প্রত্যুত্তর প্রেরণ করেন, তাহাতে উমাচরণের পদগৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে!*

ইংরাজেরা উমাচরণের কৃপায় কেবল যে মহারাষ্ট্র-লুণ্ঠনেই নিরাপদ হইয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহারা উমাচরণের সহায়তা লাভ করিয়াই বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিলেন। উমাচরণের যোগে গ্রামে গ্রামে টাকা "দাদন" করিয়া ইংরাজেরা কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এরূপ সুবিধা না পাইলে, অপরিচিতদেশে ইংরাজের আত্মশক্তি সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার অবসর পাইত কি না সন্দেহ। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় ইংরাজের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় হইবামাত্র ইংরাজেরা উমাচরণকে উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংরাজবণিক আর পূর্ব্ববৎ উমাচরণকে বিশ্বাস করিতেন না; উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেকালে এ দেশের লোকের যেরূপ সরল প্রকৃতি ছিল, তাহাতে তাঁহারা ইংরাজদিগের অধ্যবসায়, অকুতোভয়তা এবং বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ইংরাজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য ইংরাজের পথ কিছু সুগম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজেরা অনেকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেও সিরাজদ্দৌলার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে চিনিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া ইংরাজের কুটিল নীতির পরিচয় পাইয়া সিরাজদ্দৌলার ইংরাজ-বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া দুর্গ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে পরম সমাদরে কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন;—ইহাতে সিরাজদ্দৌলার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পতিত হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র বৃদ্ধ মাতামহের অন্তিম উপদেশ † স্মরণ করিয়া ইংরাজদিগকে শাসন করিবার জন্য তাঁহাদের কাশিমবাজারের "গোমস্তা" ওয়াটস্ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ওয়াটস্ সাহেব উপনীত হইলে, সিরাজদ্দৌলা কোন কথা গোপন করিলেন না;—তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, "আমি তোমাদের ব্যবহারে মোটের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। শুনিলাম যে তোমরা নাকি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কলিকাতার নিকটে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছ? আমি কিছুতেই এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে

* Selections from the records of the Government of India, vol. I.

† His last advice to his grandson was to deprive the English of military power.—Holwell's Tracts.

পারি না। আমি তোমাদিগকে বণিক বলিয়াই জানি ;—যদি বণিকের ন্যায় শান্তভাবে বাস করিতে চাও, আমি তোমাদিগকে সমাদরে আশ্রয়দান করিব। কিন্তু মনে রাখিও যে আমিই এ দেশের নবাব ;—যদি দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করিতে ত্রুটি হয়, তবে কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।”

ওয়াটস্ সাহেব এ সকল কথার কোনই সদুত্তর দিতে পারিলেন না। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, “ওয়াটস্ সাহেব সিরাজদ্দৌলার ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়াও এ সকল কথা ইংরাজ-দরবারে জ্ঞাপন করেন নাই ;—কেবল তাহাতেই ত উত্তরকালে এত অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল!”* ইতিহাসলেখকের এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ওয়াটস্ সাহেব যে এ সকল কথা যথাসময়ে কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে! †

সিরাজদ্দৌলার অসন্তোষের প্রকৃত কারণ কি, তাহা ইংরাজদিগের মধ্যে কাহারও নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজের দোষক্ষালনের জন্য ইতিহাসপৃষ্ঠায় যাহাই লিখিত হউক, পদাশ্রিত বণিক হইয়া নবাবের ইচ্ছা এবং আদেশের প্রতিকূলে দুর্গসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইংরাজেরা যে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কলিকাতার ইংরাজ-দরবার যে এই সামান্য কথাটি একেবারেই বুঝিতেন না, তাহা বলিতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁহারা জানিতেন, বুঝিতেন, এবং ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে সরলভাবে অনুমতি ভিক্ষা করিলে ইংরাজ-বিদ্বেষী সিরাজদ্দৌলা কস্মিন্‌কালেও ইংরাজদিগকে দুর্গসংস্কারের অনুমতি প্রদান করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই সিরাজদ্দৌলার মুখাপেক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে ইতিহাসের চক্ষে ইংরাজকেই অপরাধী হইতে হইবে। যাঁহারা ইতিহাস লিখিতে বসিয়া ইংরাজের এই সকল উদ্ধত ব্যবহারের দোষক্ষালনের জন্য নানারূপ অলীক “কৈফিয়তের” সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজ ;—সুতরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তই এদেশের শিশুপাঠ্য ইতিহাসের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া বালকগণ সাদরে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে!

* It was unfortunate, Mr. Watts had neglected to inform the Presidency of the complaints which Shiraj-Daula had made.—Orme, vol. II. 55.

† Sometime before Kasimbazar was attacked, Mr. Watts acquainted the Governor and Council that he was told from the Durbar, by order of the Nabab, that he had great reason to be dissatisfied with the late conduct of the English in general. Besides he had heard they were building new fortifications near Calcutta without ever applying to him or consulting him about it, which he by no means approved of; for he looked upon us only as a set of merchants, and therefore if we chose to reside in his dominions under that denomination we were extremely welcome, but as Prince of the country he forthwith insisted on the demolition of all those new buildings we had made.—Hasting's MSS. in the British Museum, vol. 29209.

সিরাজদ্দৌলা অরণ্যে রোদন করিলেন—না ওয়াটস্ সাহেব, না কলিকাতার ইংরাজ-দরবার,—কেহই সে কথার সদুত্তর প্রদান করিলেন না। ইংরাজেরা সিরাজদ্দৌলাকে যেরূপ পাপমূর্ত্তিতে জনসমাজে পরিচিত করিবার জন্য লালায়িত, সিরাজদ্দৌলা সেরূপ উদ্ধত প্রকৃতির অশান্ত যুবক হইলে তৎক্ষণাৎ একটা মহান্ অনর্থ উৎপন্ন হইতে বিলম্ব ঘটিত না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা মর্ম্মপীড়িত হইয়াও আত্ম-সংযম করিলেন। যে দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগ সিরাজদ্দৌলাকে যৌবনে অশেষ পাপপঙ্কে টানিয়া লইতেছিল, সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র সে হৃদয়বেগ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নচেৎ ক্ষুদ্রজীবি ইংরাজ-গোমস্তা ওয়াটস্ সাহেবকে লাঞ্ছনা করিতে কতক্ষণ? সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে আর কোন কথাই বলিলেন না; সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ-দরবারের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য কলিকাতায় রাজদূত পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে সিরাজদ্দৌলা যেরূপ সতর্ক পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই; সেইজন্য কেহ অজ্ঞতাবশতঃ কেহবা স্বার্থ-সাধনের জন্য তাঁহার অযথা কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজেরা যে সহজে দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করিতে সম্মত হইবেন না, সে কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাঁহারা যখন একবার মুসলমান নবাবের দুর্ব্বলতার অবসর পাইয়া মুসলমান রাজ্যে দুর্গরচনা করিয়া লইয়াছেন, তখন সহসা যে তাঁহাদিগকে সাধারণ বণিক সমিতির ন্যায় পদানত করা সহজ হইবে না সিরাজদ্দৌলা তাহা বুঝিতেন, সেইজন্য একজন সামান্য রাজদূত না পাঠাইয়া, সিরাজদ্দৌলা সম্ভ্রান্ত সুকৌশলসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে খোজা বাজিদের উপর এই দৌত্যকার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। খোজা বাজিদ সর্ব্বত্র সুপরিচিত ;—সিরাজদ্দৌলার আশা ছিল যে, হয়ত তাঁহার পরামর্শে ও সদুপদেশে ইংরাজের মতিভ্রম দূর হইবে, এবং বিনা রক্তপাতে ইংরাজের সহিত কলহবিবাদ নীরবে মীমাংসিত হইয়া যাইবে।

খোজা বাজিদ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তিনি যথাসময়ে কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে উপনীত হইয়া একে একে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন ;—কিন্তু সে ধর্ম্মকথায় কেহ কর্ণপাত করিল না! কিছুতেই যে নবাবের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না, ইংরাজমাত্রেরই তাহা সুদৃঢ় সংকল্প। খোজা বাজিদ উদ্ধত ইংরাজকে মুহূর্ত্তের জন্যও সংকল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। বরং হিতে বিপরীত হইল। ইংরাজেরা নবাবের পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া, সেই সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া নগর-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন! ইতিহাস-লেখকেরা এ সকল কাহিনী সযত্নে গোপন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকেই সকল অপরাধে অপরাধী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজের এই সকল কুকীর্ত্তির কথা ইংরাজদিগের কাগজপত্রে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতের বৃটীশ মিউজিয়মে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে :—

"The Nabab at the same time sent to the President and Council, Fuckeer Tongar, with a message much to the same purport, which *as they did not intend to comply with*, looking upon it as a most unprecedented demand, treated the messenger *with a great deal of ignominy* and turned him out of their bounds without any answer at all*."

সিরাজদ্দৌলা ইহাতেও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। তিনি কেবল ইংরাজের উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় পাইয়া এইমাত্র বুঝিয়া রাখিলেন যে শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, ইংরাজের উৎকট রোগের উৎকট চিকিৎসা প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু সহসা সেরূপ ব্যবস্থা না করিয়া পুনরায় দূত পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলার অধীনে রাজা রামরাম সিংহ চরাধিপতির উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার অবসান সময়ে রামরাম সিংহ মেদিনীপুরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া যেরূপ প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাকে চরাধিপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী এবং সিরাজদ্দৌলা উভয়েই রামরাম সিংহকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং বিশ্বাসী রাজকর্ম্মচারী বলিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিরাজদ্দৌলা রাজা রামরাম সিংহের উপরে কলিকাতায় দূত পাঠাইবার ভারার্পণ করিলেন। খোজা বাজিদের অপমানের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল;—যাহারা খোজা বাজিদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে এমন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না, তাহারা যে অন্য কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। হয়ত পূর্ব্বে কোনরূপ আভাষ পাইলে রাজদূতকে কলিকাতায় পদার্পণ করিতেও বাধা প্রদান করিতে পারে, সুচতুর চরাধিপতি রামরাম সিংহ তজ্জন্য এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে † দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজদূতকে কেহ চিনিতে পারিল না; তিনি নিরাপদে উমাচরণের গৃহে উপনীত হইয়া বণিকরাজের সঙ্গে ইংরাজ-দরবারে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইঁহার ভাগ্যেও লাঞ্ছনার একশেষ হইল!

এই সকল পুরাকাহিনী পাঠ করিতে করিতে স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—ইংরাজেরা এতদূর উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? অথবা এ সকল নিতান্ত অলীক জনাপবাদ বলিলে ক্ষতি কি? যাঁহারা পদাশ্রিত বিদেশীয় বণিক, তাঁহাদের এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস, এত বাহুবল? বাস্তবিক পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনার আলোচনা না করিলে, এ সকল কথা

* Hasting's Mss. vol. 29.

† একজন "জন্মভূমিতে" লিখিয়াছেন যে স্বয়ং রামরাম সিংহই এই দৌত্য-কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু কোনস্থানে তাহার নিদর্শন পাইলাম না।

নিতান্ত জনাপবাদ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহা জনাপবাদ নহে;—ইহার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিলে কাহারই আর বিস্ময়ের কারণ থাকিবে না।

সিরাজদ্দৌলা যদিও নিরুদ্বেগে সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেকেই বিশ্বাস করিত যে, রাজবল্লভ জীবিত থাকিতে সিরাজদ্দৌলার নিস্তার নাই;—যেমন করিয়াই হউক, সিরাজদ্দৌল্লাকে শীঘ্রই সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঘসেটি বেগমের নামে মহারাজা রাজবল্লভই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় নবাবী করিতে আরম্ভ করিবেন। আলিবর্দ্দী জীবিত থাকিতেই ইংরাজেরা ইহার কিছু কিছু আভাষ পাইয়াছিলেন; এবং কোনরূপে রাজবল্লভকে হস্তগত রাখিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া, ইংরাজেরা তাঁহার পলায়িত পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে কি হইবে? ঘসেটি বেগমের সিংহাসন লাভের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে কি না ইংরাজেরা কেবল উদগ্রীব হইয়া সেই সংবাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ওয়াটস্ সাহেব লিখিতে লাগিলেন যে, "সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে কি হইবে? এখনও ঘসেটি বেগমের আশা নির্ম্মূল হয় নাই!" সুতরাং ইংরাজেরা রাজবল্লভকে হাতছাড়া করিয়া সিরাজদ্দৌলার পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস পাইলেন না। সেইজন্য তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও সিরাজদ্দৌলাকে গ্রাহ্য করিলেন না।

উত্তরকালে যখন রাজবল্লভের সমুদয় আশা ভরসা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল এবং সিরাজদ্দৌলাই সগৌরবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল। তাঁহারা আদ্যোপান্ত সকল কথা গোপন করিয়া কেবল এইমাত্র লিখিয়া রাখিলেন যে, "একজন রাজদূত আসিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলাই যে সেই রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? রাজদূত সামান্য ফেরিওয়ালার ন্যায় ছদ্মবেশে নগর-প্রবেশ করিয়া আমাদের পরমশত্রু "উমিচাঁদের" বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল কেন? উমিচাঁদের সঙ্গে আমাদের কলহ বিবাদ,—আমরা ভাবিয়াছিলাম যে উমিচাঁদ আদর বাড়াইবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন। সেইজন্যই ত আমরা রাজদূতকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম! নচেৎ, আমরা যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতাম যে স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা রাজদূত পাঠাইয়া দিয়াছেন,—সর্ব্বনাশ! আমরা কি বাতুল যে তাঁহাকে এমন করিয়া অপমান করিব?"

পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকেরা যাহাই বলুন, একজন সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক কিন্তু একেবারে সকল কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, "রাজা রামরাম সিংহের ভ্রাতা যেদিন কলিকাতায় উপনীত হন, সেদিন গবর্ণর ড্রেক সাহেব রাজধানীতে ছিলেন না;—সহর কোতোয়াল হলওয়েল সাহেবের সঙ্গেই রাজদূতের প্রথম সন্দর্শন ঘটে। তৎপরদিন ড্রেক সাহেব শুভাগমন করিলে মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বলিলেন যে এ কেবল উমিচাঁদের কুটিল কৌশল; কারণ কাশিমবাজার

হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ঘসেটি বেগমের আশা ভরসা নির্ম্মূল হয় নাই! এরূপ অবস্থায় রাজদূত যে পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই চক্ষে সন্দেহাত্মক বোধ হইতে লাগিল। কেহই তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। রাজদূতকে বিদায় দিবার আদেশ হইলে, অশিক্ষিত ভৃত্যবর্গ একে আর করিয়া তুলিল;—তাহারা রাজদূতকে সবিশেষ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল!* ইহাতে পাছে সিরাজদ্দৌলা অসন্তুষ্ট হন, তজ্জন্য সাবধান হইবার উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি ওয়াটস্ সাহেবকে পত্র লেখা হইল।

সকল কথা একত্র সমালোচনা করিতে গেলে কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হয় না। যদি উমাচরণের কুটিল-কৌশল বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল, তবে আবার ওয়াটস্ সাহেবকে সাবধান হইবার জন্য পত্র লেখা হইল কেন? ঘসেটি বেগমের সিংহাসন লাভের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে কি না, সে কথারই বা বিচার করিবার প্রয়োজন হইল কেন? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, ইংরাজেরা উত্তরকালে দোষক্ষালনের জন্য যে সকল কুটিল কৈফিয়তের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, কার্য্যকালে তাহার প্রতি কেহই আস্থা স্থাপন করেন নাই;—রাজবল্লভকেও হাতছাড়া করা হইবে না, সিরাজদ্দৌলাকে উত্তেজিত করা হইবে না,—বোধ হয় ইহাই তাঁহাদিগের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য একহস্তে রাজদূতকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া, আবার পরমুহূর্ত্তেই উভয় হস্তে কৃতাঞ্জলি বাঁধিয়া জানু পাতিয়া সিরাজদ্দৌলার নিকট করুণ কৈফিয়ত নিবেদন করিতেছিলেন! এরূপ দৃশ্য অন্যদেশের ইতিহাসে দুর্ল্লভ!

সিরাজদ্দৌলার নিকট এই অযাচিত অপমানের সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র, ইংরাজ প্রতিনিধি ওয়াটস্ সাহেব একজন উকীল লইয়া দরবারে উপনীত হইলেন এবং উকীলের মুখ দিয়া পূর্ব্বশিক্ষিত সুললিত কৈফিয়ত আবৃত্তি করাইয়া সসম্ভ্রমে আসনগ্রহণ করিলেন। ইংরাজেরা যে সিরাজদ্দৌলাকে দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই উদ্ধত যুবক বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল রাজসিংহাসনে বসিয়া পদাশ্রিত বণিক সমিতির এইরূপ উদ্ধত ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াও কোনরূপ দম্ভবিকার প্রকাশ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে কেবল গৃহকলহের ছিদ্রানুসন্ধান পাইয়াই ইংরাজ বণিক উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত চূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

*The Governor returning the next day summoned a Council, of which the majority being prepossessed against Omichand, concluded that the messenger was an engine prepared by himself to alarm them, and restore his own importance; and *as the last advices received from Kashimbazar described the event between Shirajudoula and the widow of Nowagis to be dubious*, the Council resolved that both the messenger and his letter were too suspicious to be received, and the servants, who were ordered to bid him depart, *turned him out of the Factory and off the shore with insolence and derision*: but letters were despatched to Mr. Watts, instructing him to guard against any evil consequences from this proceeding.—Orme, vol. II. 54.

ঘসেটি বেগম বিধবা। সিরাজদ্দৌলা ভিন্ন তাঁহার আর কেহ পরমাত্মীয় নাই। সুতরাং বৈধব্যদশায় একাকিনী মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে স্বাধীনভাবে বিচরণ না করিয়া রাজান্তঃপুরে সিরাজদ্দৌলার মাতা ও আলিবর্দ্দীর মহিষীর সহিত একত্র বাস করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা বিনীতভাবে আত্ম-নিবেদন করিলেন। ঘসেটি বেগমের পরামর্শদাতাদিগের স্বার্থসিদ্ধির সহজপথ চিররুদ্ধ হইতেছে বলিয়া তাঁহারা তুরী ভেরী বাজাইয়া মতিঝিলের সিংহদ্বারে সেনা সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইহাতে উত্যক্ত না হইয়া রাজবল্লভকে রাজসদনে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সকল প্রকার কুচরিত্রের কথা অবগত থাকিয়াও তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিনারক্তপাতে মতিঝিল অধিকার করিয়া পিতৃব্যরমণীকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। যেরূপ সুকৌশলে বিনারক্তপাতে এই প্রধূমিত বিবাদবহ্নি নির্ব্বাণলাভ করিল, তাহার জন্য ইতিহাস একবারও সিরাজদ্দৌলাকে সাধুবাদ প্রদান করে নাই;—বরং প্রকৃত কাহিনী গোপন করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে যে, "সিরাজদ্দৌলার কথা আর অধিক কি বলিব; তিনি সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র আপন পিতৃব্যরমণীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন!"

সোনায় অরুচি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তোমরা কি কেহ সোনার উপর বিতৃষ্ণার কথা শুনিয়াছ? হাঁ সত্য সত্যই বিতৃষ্ণা। চেনের উপর, সোনার মোহরের উপর, সোনার বোতামের উপর, সোনার অলঙ্কারের উপর বিতৃষ্ণা!

আমি অসম্ভব, অসত্য গল্প লিখিতে বসি নাই। আমি সোনার উপর স্ত্রীলোকের বিতৃষ্ণার কথা ফাঁদিতে বসি নাই। সে'ত আকাশকুসুমের ন্যায় অসম্ভব; সোনার পাথরবাটির মত অসম্ভব।* আমি সোনার উপর খ্যাতনামা পুরুষ-প্রবরের ঘোরতর বিতৃষ্ণার কথা—সত্য ঘটনা-মূলক কথার ইতিহাস বর্ণনা করিব। তোমরা অবহিত হইয়া শোন; তোমাদিগের "স্বর্ণ-সময়ের" অপব্যয় হইবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।

সে পুরুষ-প্রবরটি আমার পরম বন্ধু শ্রীমান রমেশচন্দ্র বসু, এম এ বি এল, উকিল, হাইকোর্ট। আজকাল হাইকোর্টে তাঁহার একচেটিয়া পসার বলিলেই হয়। আমার সহিত যখন প্রথম আলাপ হয় (সে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা), তখন তাঁহার উঠ্তি পশার। আমি আজ সেই প্রথম আলাপের সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গৌরকান্তি, উজ্জ্বল সরল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, অহঙ্কারের নাম গন্ধ নাই—তাঁহাকে দেখি-

* এমন দেবপ্রকৃতি অনেক নারী আছেন যাঁহারা আমার এ গণ্ডীর বহির্ভূত। আশাকরি সহৃদয় পাঠিকারা আমার উপর রাগ করিবেন না।

লেই আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। আমার সহিত অল্প দিনের মধ্যেই গাঢ় আলাপ হইল ও সেই আলাপ কালক্রমে ঘনিষ্ঠতায় ও বন্ধুতায় পরিণত হইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই সোনার ঘড়ি ও সোনার চেন ব্যবহার করে কিন্তু তাঁহার বক্ষদেশে রূপার ঘড়ি ও লোহার চেন। তাঁহার শরীরের সহিত সোনার সংস্রব নাই।

একদিন তাঁহার একটি মক্কেল পাঁচটি মোহর আনিয়া ফীস্ স্বরূপ তাঁহার হস্তে দিতে উদ্যত হইল। তিনি নিজে স্পর্শ করিলেন না; টেবিলের উপর রাখিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। মক্কেলটি যখন উঠিয়া গেল আর বৈঠকটি নির্জ্জন হইল, তখন রমেশ বাবুকে পাকড়াও করিলাম। বলিলাম—"একি! অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে। আপনার বাড়িটি Eldorado (Land of gold) বলিলেই হয়। লক্ষ্মী দেবী সোনার ঝাঁপি লইয়া আপনার বাড়িতে এক প্রকার permanent settlement করিয়াছেন। তবে সোনার উপর আপনার এ বিজাতীয় বিতৃষ্ণা কেন?

রমেশ বাবুর সদা-প্রফুল্ল-মুখ ঈষৎ ম্লান ও গম্ভীর হইল। বলিলেন—

"শুধু বিতৃষ্ণা নয়, Gold-o-phobia বলিলেও বলিতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমার superstition আছে। আমি এ কথা যার তার কাছে প্রকাশ করি না। তবে আপনার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, আপনার কাছে বলিতে আপত্তি নাই।"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভৃত্য আসিয়া ল্যাম্প জ্বালিয়া দিল। রমেশ বাবু বিষাদ-বিকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"আপনি শুনিয়াছেন আমি নিজ অধ্যবসায়-বলে দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র হইতে মুক্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি চিরকাল দরিদ্রের সন্তান ছিলাম না। আমার পিতা ধনশালী ছিলেন। স্বজন ও পরের জন্য অম্লান অকুণ্ঠিত চিত্তে যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। আমার মাতুল মহাশয়, যিনি এখন ফার্ষ্ট ক্লাস্ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট (নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি?), আমার পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া লালিত পালিত হন ও যখন আমার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হন তাহার পূর্ব্বেই এম এ বি এল পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার পশার আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের বড়ই দুরবস্থা। আমি এণ্ট্রেন্স ক্লাসে পাঠ করি; তিন মাসের স্কুলিং ফি দিতে পারি নাই, হেড্‌মাষ্টার শাসাইয়াছে নাম কাটিয়া দিবে। ঘরে অন্ন জোটে না অথচ আমার মনে প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষা, মামার মত সব পাশ করিব, আমিও তাঁহার মত বড় লোক হইব। একদিন বাবাকে গিয়া বলিলাম—

"বাবা, হেড্‌মাষ্টার বলিয়াছে এ হপ্তায় মাহিনা না দিলে, নিশ্চিত নাম কাটিয়া দিবে। আমি বরাবর ক্লাসে প্রথম থাকি বলিয়া এতদিন নাম রাখিয়াছে, তা না হইলে নাম কবে কাটিয়া দিত।"

পিতা ঠাকুর মহাশয় (আহা তাঁহার প্রেতাত্মা অক্ষয় স্বর্গে অক্ষয় সুখে থাকুক) তিনি

কত লোকের—আত্মীয়, স্বজন, পর, শত্রু, মিত্র, স্বদেশী, বিদেশী—কত লোকের কত উপকার করিয়াছেন; কিন্তু কখনও তিনি মুখ ফুটে বলেন নাই যে "আমি অমুকের করিয়াছি।" উপকারের বিনিময়ে কখন উপকার পান নাই, পরন্তু অপকৃত হইয়াছেন; তথাপি কখনও মুখ ফুটিয়া বলেন নাই "অমুক লোক কৃতঘ্ন!" পিতাঠাকুর মহাশয় বলিলেন—

"বল বাবা, আমি টাকা কোথায় পাব? এই দেখ একখানা কাপড় পরে দিন কাটাই। গাম্‌ছা পরে' স্নান করি। তোমার মার কাছে যাও; দেখ, তিনি যদি কোন বিলি বন্দেবস্ত করে দিতে পারেন।"

হায়! গরিব দুঃখিনী মা আমার—আমি জানিতাম তাঁহার হস্ত রিক্ত ও তাঁহার গাত্র অলঙ্কার শূন্য! পিতার উত্তমর্ণেরা ভয় দেখায় যে দেনার জন্য পিতাকে কারাগারে যাইতে হইবে। অন্নপূর্ণা মা আমার আপাদমস্তক ভূষণশূন্যা হইয়া প্রায় দশসহস্র টাকার গহনা মহাজনের হস্তে অর্পণ করেন। আর তাহাতেই তাঁহার কত আনন্দ!

ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। আমার এক আত্মীয়া ভিন্নমতাবলম্বিনী ছিলেন। তিনি গহনার বাক্সটি লইয়া, সূর্য্যের স্তব করিতে করিতে, রুদ্রাক্ষের মালা জপিতে জপিতে, "গহনা আছে যার, কি ভয় বল তার, কি ভয় বল তার" বলিতে বলিতে, তাঁহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্বামীর ঋণদাতা মহাজনদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া, কাশীধামে, পিত্রালয়ে, অগস্ত্যযাত্রা করিয়াছিলেন।

মার কাছে থাকিলে কি মা দিতেন না, চাহিয়া তাঁহার মনে ব্যথা আর কেন দিব, এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া, মামার কাছে চাহিব মনে করিয়া মাতুলালয়ে গেলাম।

মামা তখন টাকা গণিতেছিলেন। নিঃশব্দে আমি একপাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। টাকা গণিতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া মামা আমার আসা লক্ষ্য করেন নাই। এক দুই করিয়া তিন শত টাকা গণিলেন, আর অনতিউচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"বোড়্‌শে তান্‌পুরায় যাবার সময় ত হ'য়ে এল। তা, এই কটা টাকাতেই যথেষ্ট হবে।" আমার মামার শ্বশুরবাড়ি বোড়্‌শে তানপুরা। আমাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"কি রে রমেশ যে, খবর কি? এণ্ট্রেন্স পাশ হ'তে পারবি ত। আমার মত এম এ বি এল হওয়া চাই। দেখ্ আমি কখনও ফেল্ হইনি, এক নিশ্বেসে নব পাশ করে ফেলেচি।"

"মামা, হেড্‌মাষ্টার বলেছে—নাম কেটে দেবে। তিন মাসের স্কুলিং ফি বাকি। বাবার কাছেও টাকা নেই, মার কাছেও নেই। বাড়িতে ভারি কষ্ট। নটা টাকা হলে স্কুলের মাহিনা দেওয়া হয়। তাই আপনার কাছে চাইতে এলাম। বাবার মুখে শুনেছি শীঘ্রই তাঁর একটি চাকরি হবে। তখন আর আপনার কাছে চাব না।"

পথে সর্প দেখিলে পথিক যেমন হঠাৎ ব্যাকুল ও ত্রস্ত হয়, মামাও তেমনি সশঙ্কিত হইলেন ও অতি সাবধানে বলিলেন—

"বাবা, এ টাকা কি আমার ? এ টাকা কি আমার ? এ টাকা মক্কেলের গচ্ছিত টাকা, টাকা থাকলে আমি আর দিইনে ?"

মাতুলের নিদারুণ আচরণে ভাগিনেয় কি করিল ? ভাগিনেয় তখন চতুর্দ্দশবর্ষের বালক। তখনও তাহার হৃদয় নবনী-কোমল ; সংসারের নির্ম্মম কশাঘাতে তখনও তাহার প্রাণে কাল্‌শিরা পড়ে নাই। সেই তাহার প্রথম অপমান, সেই তাহার প্রথম অভিমান। সে মামার কথায় কোন উত্তর দিল না। সে কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মামা তাহাকে বুঝাইতে, তাহার অশ্রু মুছাইতে চেষ্টা করিলেন না। মর্ম্মাহত বালক কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

মার কাছে গিয়া আমি সব কথা বলিলাম আর অধীর অশান্ত হইয়া কাঁদিলাম। যাহাকে "মড়াকান্না" বলে, আমি তেমনি করিয়া কাঁদিলাম। সুরুচির বিষদিগ্ধবচনে জর্জ্জরিত হইয়া বোধ করি বালক ধ্রুবও এমনি করিয়া কাঁদিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার মাও কাঁদিলেন ও আমাকে কত উপদেশ দিয়া বুঝাইলেন। সুনীতির মত আমার মাও বলিয়াছিলেন

"সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ"

কিন্তু আমার ক্রন্দন কিছুতেই থামিল না ; আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া, মা-হারা শিশুর মত মার কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেইস্থলে আমার দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমার দিদির নাম হিরণ্ময়ী। তিনি এখন কোথায় ? ঐ কনক-কলেবর, সুধা-ধবল শশধরকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি এখন কোথায় ? ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ আকাশ-মন্দাকিনীকে জিজ্ঞাসা কর। আজিকালিকার সম্বাদ উহারা রাখে। আমি এই মাত্র জানি তিনি স্বর্গের দেবতা ছিলেন, শাপ-গ্রস্ত হইয়া মর্ত্তে আসিয়াছিলেন, শাপান্তে স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

দিদি বলিলেন "একি, কেন মা ? রমেশ কাঁদ্‌চে কেন ? কেন রমেশ, কি হয়েছে রে ?" এই বলিয়া দিদি আপন অঞ্চল দিয়া আমার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন ও সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া নিকটে বসিলেন।

দিদি সমস্ত কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তা, এই জন্যে এত কান্না ? মা, ঝিকে বল আমার এই বালা রামপোদ্দারের দোকানে বন্ধক দিয়ে আসুক্। ২০।২২ টাকা পাবে ; বোধ করি রমেশের এণ্ট্রেন্স পাশের পক্ষে যথেষ্ট হবে। রমেশ, তুই যখন বড় লোক হবি তখন দুই শত টাকার বালা আমার জন্য গড়িয়ে দিবি। কেমন দাদা, দিবি ত ?"

আমি দিদির টাকায় এণ্ট্রেন্স পাশ করিলাম, জলপানি পাইলাম ; তাহার পর, নানা-বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, কলেজ out হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দিদির জন্য সোনার বালা গড়াইতে পারিলাম না।

আমার সুখ সমৃদ্ধি হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি হঠাৎ একদিন আমাদিগকে ফাকি দিয়া সোনার রাজ্যে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর দিন তাঁহার উর্দ্ধগামী আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—

"দিদি, তোমার সাধ মিটাইতে পারিলাম না, এ খেদ আমার চিরকাল থাকিবে। কিন্তু যদি কখনও এ জন্মে রমেশ সুবর্ণ স্পর্শ করে তাহা হইলে বলিও রমেশ কৃতঘ্ন।"

রমেশ কৃতঘ্ন নহে ; সে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে। অদ্যাপি সুবর্ণের উপর রমেশের ঘোরতর বিতৃষ্ণা।

নববর্ষের আকিঞ্চন।

নববর্ষে আজি তোমা পূজিতে ভারতি !
এসেছে সন্তান যত লয়ে উপহার,
কেহবা করিছে ওই মঙ্গল আরতি
কেহবা পরায় গলে রতনের হার।

সাহিত্য, কবিতা, গীতি চারু-অলঙ্কার
বরঅঙ্গে মরি কিবা হয়েছে শোভন !
হরষে পরিয়া বাস গোলাপী-আভার
ধরিয়াছ মধুময়ী-মূরতি-মোহন।

দীন আমি অতি, করিবারে আয়োজন
তোমার পূজার যোগ্য নাহিক শকতি
নাহি সুরভিত ফুল, নাহি রত্নধন
আছে শুধু হৃদয়েতে অচলা-ভকতি।

তাই নিয়ে শূন্যহাতে সকলের পাছে
আসিয়াছি পূজিবারে ; করিতে সিঞ্চন
তব পদমূলে দেবি, যা আমার আছে
আমার সর্ব্বস্ব শুধু পূজা-আকিঞ্চন !
ধর তবে প্রীতিময়ি এ পূজা আমার
শুধু আকিঞ্চন সার নাহি কিছু আর।

সঙ্গীতা

JOTINDRO NATH

ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীত।

ইংরাজি গানে প্রায় বাঙ্গালিমাত্রেরই অলজ্ঘ্য বিতৃষ্ণা আছে। অনেক বাঙ্গালি ইংরাজি কবিতা পাঠে মোহিত হন; ইংরাজি চিত্রের সৌন্দর্য্য "আস্বাদন" করিতে পশ্চাৎপদ নহেন; ইংরাজি ভাস্কর-কার্য্যের নৈপুণ্য চট্ করিয়া বুঝিয়া লন; বিলাতি স্থপতি-কার্য্যেরও পক্ষপাতী; এবং ইংরাজি প্রথায় রন্ধন করা খাদ্যেরও বিশেষ রসজ্ঞ। কেহ কেহ বিলাতি যন্ত্র-সঙ্গীতও (Instrumental music) ভালবাসেন। কিন্তু ইংরাজি গান—মহাভারত!—ইংরাজি গান যে একটা কিছু, তাহা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে তাঁহারা রাজি নহেন। তাঁহারা অকুণ্ঠিতভাবে ও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন যে, ইংরাজি গান সারমেয় চীৎকারের ন্যায় বিশুদ্ধ চীৎকার মাত্র, এবং তাহাতে হাস্যরস ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিশুদ্ধ বা মিশ্রিত [illegible] হইয়া। তাঁহারা দস্তুরমত আশ্চর্য্য হন যে ইংরাজি জাতির ন্যায় একটা সভ্য জাতি—যে অ[illegible]ন্য বিষয়ে কতক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, সে ঐ প্রকার গান গম্ভীরভাবে শুনিতে পারে; শুদ্ধ তাহা নহে, এক এক বিখ্যাত গায়কের বা গায়িকার একটি গান শুনিবার জন্য পাঁচ দশ টাকা ব্যয় করিয়া টিকিট কেনে। তথাপি ইহা সত্য, যে ইংরাজের ন্যায় সভ্য জাতিও ঐ প্রকার কিম্ভূতকিমাকার গানে মুগ্ধ হয়, উন্মত্ত হয়, বাষ্পাপ্লুত হয়।

আমি সলজ্জভাবে স্বীকার করি, যে এককালে আমারও ইংরাজি গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সঙ্গীত-রচয়িতার রচিত সর্ব্বোত্তম Oratorio শুনিতে টিকিট কিনিয়া এলবার্ট হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম, সেদিন ইংরাজি সঙ্গীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি অবজ্ঞায় 'এলবার্ট হল' পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতপাদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম, এবং কেন যে লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া এরূপ সঙ্গীত শোনে ইহা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম। ক্রমে বিলাত্র-প্রবাসে, নানা বন্ধুর নিকটে ছোট খাট ইংরাজি গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম "বা এই মন্দই বা কি?" ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম; ও শেষে আ[illegible] ইংরাজি গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল, ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয় প্রথমতঃ, যে মানুষের প্রবৃত্তি কি পরিবর্ত্তনশীল! ও দ্বিতীয়তঃ, যে প্রথম ধারণা সব সময়ে ঠিক নহে।

ইংরাজেরাও বাঙ্গলা গান শুনিয়া অমিশ্রিত আমোদ উপভোগ করে, এবং বাঙ্গালা সুরের মধ্যে এক, যাহাকে কথায় 'লক্ষ্ণৌ ঠুংরি' বলে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ রসাস্বাদন করে। অনেকে "বাঙ্গালিদের গানের মধ্যে মাঝিদের গানেই যাহা কিছু শ্রোতব্য আছে" এরূপ মত প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালি সমাজে আরও ঘৃণা ও দয়ার পাত্র হন। কিন্তু এই সঙ্গীতই দ্বিসহস্র বর্ষ হিন্দুজাতিকে ও মুসলমানজাতিকে মাতাইয়া রাখিয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ উভয়বিধ সঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। উভয়েরই আত্মগত সৌন্দর্য্য আছে, যাহা শুনিতে শুনিতে ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসে। দূরবীক্ষণের 'ফোকস্' ঠিক না হইলে তাহার সাহায্যে দৃষ্ট বস্তু পূর্ণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না। আমারা আজ উভয়বিধ সঙ্গীতের সেই পার্থক্যটুকু পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আজ আলোচনাটি কেবল গানে আবদ্ধ রাখিব।

প্রথমতঃ ইংরাজি গানের স্বরগুলি (notes) সব সোজা সোজা। একটা স্বরের উপর আর একটার নির্ভর নাই। প্রতি স্বর স্পষ্ট, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বারটি স্বরের যেন বিভিন্ন রাজ্য। তাহারা একত্রিত হইয়া একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছে মাত্র। কিন্তু সকলেই যেন স্বকীয় স্বত্ব বজায় রাখিয়া আছে। যেন তাহাদিগের অন্তরে অন্তরে মিল নাই। সকলেই রাজা। সকলেরই নিজের নিজের আইনকানুন আছে। কেহই তাহার বিশেষত্ব বর্জ্জন করিতে রাজি নহে। হিন্দু গানে স্বরগুলি ওরূপ সোজা নহে। সকলেই পরস্পরের গায়ে হেলিয়া আছে। সকলেই যেন আন্তরিক বন্ধুত্বের বন্ধনে বদ্ধ। একটি স্বর আর একটি স্বরে মিশিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়া আছে। যেন সকলেই পরস্পরে মুগ্ধ, পরস্পরে নিবিষ্ট। যেন প্রতিরাগ বা রাগিণী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য; তাহার রাজা, অমাত্য, ভৃত্য ও শত্রু আছে। [ইহাদিগকে সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে যথাক্রমে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী কহে। শাস্ত্রে সেই রাজা বা রাগরাগিণীর প্রধান স্বরকে অন্যান্য স্বর অনুগমন করে বা তাহার আজ্ঞা[illegible]জলন করে। ইংলণ্ডের ও প্রাচীন ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী যেরূপ বিভিন্ন, এই উভয়[illegible] সঙ্গীতে তাহার অনুরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়—একটি প্রায় প্রজাতন্ত্র (republic) আর[illegible]কটী রাজতন্ত্র (monarchy)।

[illegible] পরি[illegible]কারে উক্ত সঙ্গীতদ্বয়ের বিভিন্নতা বোঝান যাইতে পারে। ইংরাজি সঙ্গীতে স্বর[illegible]ার, অ[illegible]ন পরস্পরের হেলানো যষ্টির মত, যেন মিলিতে হইবে বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় শুদ্ধ [illegible]রপুষ্ট ভাগদ্বারা সামান্যরূপে মিলিত হইয়াছে মাত্র। বাঙ্গলা সঙ্গীতে স্বরগুলি যেন স্বেচ্ছায় [illegible]ঙ্গীতা যেরূপ ঢেউয়ের উপর ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ পরস্পরে সম্মিলিত হয়। ইহাতে [illegible]মালায়েম, সব আত্ম-বিস্মৃত, সব প্রগাঢ়প্রেমপরিপ্লুত।

অথবা বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজিতে স্বরগুলি যেন 'শেকৃহ্যাণ্ড' করে মাত্র; হিন্দু সঙ্গীতে স্বরগুলি কোলাকুলি করে। ইংরাজিতে তাহারা শিক্ষিত অশ্বের মত বীরসমতাল-পদ-বিক্ষেপে চলিয়া যায়, অথচ কেহ কাহার প্রতি চাহিয়াও দেখে না; হিন্দু সঙ্গীতে তাহারা মেষপালের ন্যায় একের উপর আর একটি হেলিয়া পড়ে। ইংরাজিতে স্বরগুলি যেন ছাপার অক্ষরের লেখার মত; হিন্দু সঙ্গীতে তাহারা যেন জড়ানে হাতের লেখা।

ইংরাজি ও বাঙ্গলা সঙ্গীতে আর একটি বিভিন্নতা এই যে, ইংরাজি রাগরাগিণীতে স্বরগুলি একেবারে বাঁধা; তাহার এদিক ওদিক হইবার যো নাই। তাহারা রেলওয়ে ট্রেণের মত সর্ব্ববাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া, তাহার জন্য প্রস্তুত বর্ত্মে—যেন ঘড়ি ধরিয়া হুস্ হুস্

DAMAGE PAGES.

শব্দে সোজা চলিয়া যায়। বাঙ্গালা সঙ্গীতে রাগরাগিণীগুলি যেন তাহার অন্তর্গত স্বরেরই মত নদীবক্ষে নৌকার মত পাল তুলিয়া দিয়া নিজের বর্ত্ম নিজে রচনা করিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। রাগরাগিণীগুলির চলিবার দিক কতক নির্দ্দিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু তাহা অনেক পরিমাণে প্রতিগায়কের মার্জির উপর নির্ভর করে। ইংরাজি গায়কের এত স্বাধীনতা নাই। সে সঙ্গীত রচয়িতার রচিত বর্ত্মে যাইতে বাধ্য। ইহার জন্য বাঙ্গলা সঙ্গীতে তান ও আলাপ আছে, ইংরাজি সঙ্গীতে তাহা বড় নাই।

ইংরাজি গানে আবার যেরূপ ভাবের বৈচিত্র্য আছে, হিন্দুসঙ্গীতে তাহা নাই। কি করুণ; কি প্রেম, কি হাস্য, কি বীর, সব রসই ইংরাজি গানে আছে, সব রকম রাগই ইংরাজিতে আছে। হিন্দুসঙ্গীতে রাগরাগিণীর এত বৈচিত্র্য নাই;—সবই ভাবের সেই এক মধুর সংমিশ্রণ; সব রাগরাগিণীই হৃদয়কে মাতাইয়া গলাইয়া দেয়, চিত্তকে ডুবাইয়া, ভাসাইয়া বা নাচাইয়া লইয়া যায়। সেইজন্য ইংরাজি গান একসঙ্গে অনেক শোনা যায়, হৃদয় শ্রান্ত বা পরিতৃপ্ত হয় না; আর হিন্দু সঙ্গীত গুটিকতক শুনিলে আর শুনিতে পারা যায় না, হৃদয় শীঘ্র অতি মুগ্ধ অতি তৃপ্ত পরিপ্লুত হইয়া যায়। ইংরাজি গানে যেমন এক রাগের মধ্যেই বিবিধ ভাব আছে তেমনি তাহাতে বিভিন্নভাবের রাগরাগিণীই আছে। হিন্দু গানে রাগরাগিণীতে যেমন স্বরগুলির monotony, সেইরূপ বিভিন্ন রাগরাগিণী একের পর আর একটি শুনিতে শুনিতে monotonous হইয়া দাঁড়ায়; প্রতিটাই অতি মিঠে, অতি মোহকর; কি অ প্রাণ অধিকক্ষণ সে মাধুর্য্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারে না, শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। র্বাং

বাঙ্গালা সঙ্গীতের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, তাহার রাগরাগিণীগুলি যেন কোন কিছু আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা কিছুকাল সে আশ্রয় ছাড়িয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে সে আশ্রয় বিচ্যুত হইতে চাহে না। ইংরাজি সঙ্গীতে প্রতিগায়ক শয়ন-নিরাশ্রয়। তাহাদের আধার নাই। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি হইতে উঠে না বা ইহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে শেষ হয় না। ইংরাজি সুর ধূমকেতুর মত কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। বাঙ্গলা রাগরাগিণীগুলি যেন কোন গ্রহের ন্যায় এই কেন্দ্রস্থিত পদার্থের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। হিন্দু সঙ্গীতে প্রথমে যেন একটি স্বপ্ন-রাজ্য সৃষ্টি করিতে হয়, রাগরাগিণীগুলি যেন তাহা হইতে জন্মিয়া তাহাতেই মরে; যেখা-নেই যাউক তাহার জন্মভূমিকে কখন বিস্মৃত হয় না। দস্তুর মত হিন্দু সঙ্গীত গাইতে হইলে আগে যেন একটা স্বরের সমুদ্র তৈর করিয়া লইতে হয়, রাগরাগিণীগুলি যেন সেই সমুদ্রের বক্ষে ঊর্ম্মিমালার ন্যায়—তাহা হইতেই উঠে, তাহাতেই মিলাইয়া যায়; সেই তরঙ্গ ভঙ্গই রাগ বা রাগিণী। ইংরাজি রাগরাগিণী যেন হাউয়ের মত একবারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যায়, এবং সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যমার্গেই নিভিয়া যায়।

ইহারই জন্য ইংরাজি গানের সঙ্গৎ পিয়ানো বা অর্গান। রাগের সহিত সঙ্গৎও চলি-য়াছে। হিন্দু সঙ্গীতে সঙ্গৎ তম্বুর ইত্যাদি যন্ত্রে একটি বিশেষ অপরিবর্ত্তনীয় ঝঙ্কাররাশি সৃষ্ট

হয়, ও তাহা হইতে রাগ বা রাগিণীর সুর উত্থিত ও পতিত হয়। সকলেই বোধ হয় জানেন যে যাত্রায় প্রথমে খানিক তম্বুরাদি যন্ত্র বিনাগানে বাদিত হয়, পরে সুরটা 'জমাট' হইয়া আসিলে, শ্রোতাদিগের মনে একটা আবেশ বা মোহের সঞ্চার হইলে, পরে রাগরাগিণীর স্বপ্ন রাজ্য বুনিতে সুরু করা হয়। প্রথমে যেন একটা মধুর ঝঙ্কারের মদিরা শ্রোতাদিগের চিত্তকে পান করাইয়া পরে তাহাকে সঙ্গীতের ভাবে নৃত্য করান হয়। সাপুড়ে যেমন সাপকে খেলাইবার পূর্ব্বে বংশীবাদন করিয়া প্রথমে যেন mesmerise করে, হিন্দুগায়কও সেইরূপ শ্রোতার হৃদয়কে খেলাইবার পূর্ব্বে তম্বুরাদির ঝঙ্কারে তাহাকে একটা নূতন atmosphere এ বা গান শোনার moodএ আনিয়া দেয়। যেমন গ্যাসের আলোক রাশি ও চিত্রপটশোভিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ একটি স্বরের রঙ্গমঞ্চ রচনা করিয়া তাহাতে হিন্দু রাগ ও রাগিণী গীত হয়।

উক্ত কারণে হিন্দুসঙ্গীতে "গ্রহ" "ন্যাস" ও "অংশের" উল্লেখ আছে। কিন্তু সে বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

ইংরাজি সঙ্গীতে কেবলমাত্র ১২টি স্বর (৭টি সহজ ও ৫টি বিকৃত স্বর) ব্যবহৃত আছে। তাহাতে দুই প্রকার স্বর-বিন্যাস-প্রণালী (scales) আছে (chromatic ও diatonic)। বাঙ্গালা সঙ্গীতে ঐ ১২টি স্বর ছাড়া আরও ক্ষুদ্র স্বর ব্যবহৃত হয়। ঐ প্রতিস্বর ব্যবধানকে সঙ্গীতশাস্ত্রে 'শ্রুতি' বলে। বিলাতে হিন্দুসঙ্গীতে ব্যবহৃত scale এর নাম enharmonic। ইহারই জন্য ইংরাজিতে স্বরগুলি স্পষ্ট, বাঙ্গলাতে তাহারা যেন মদিরাজনিত তন্দ্রাবিজড়িত।

এটি দ্রষ্টব্য যে কি বিজ্ঞান কি দর্শন, কি রাজনীতি কি সমাজনীতি, কি কবিতা কি সঙ্গীত, সব বিষয়েই জাতীয় চরিত্র সমান প্রতিভাত হয়। এই সব বিষয়েই ইংরাজি জিনি-ষটা পরিষ্কার, মার্জ্জিত, উদ্যমশীল ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত; বাঙ্গালি জিনিষটা অস্পষ্ট, সাল-ঙ্কার, অলস ও কল্পনাবহুল। ইংরাজি সঙ্গীতাদি যেন বেড়াইতে বেড়াইতে প্রকৃতি দর্শনে পরিপুষ্ট হয়, বাঙ্গালি সঙ্গীতাদি একস্থানে শুইয়া মনে মনে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে। ইংরাজি সঙ্গীতাদি যেন 'পাইন' বৃক্ষের ন্যায় সোজা সংযত নিয়মিত; যেন প্রকৃতি মনুষ্য কৌশল দ্বারা শাসিত। বাঙ্গালা সঙ্গীতাদি বটবৃক্ষের ন্যায় বহুশাখা সমন্বিত, নিজভারে আনত, বিশৃঙ্খল; অথবা অত্যাদরে বিকৃত স্বভাব উচ্ছন্নমতি বালকের (spoilt child) ন্যায়। ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীতে সেই প্রভেদ যাহা সেক্সপীয়র ও কালিদাসের কবিতাতে আছে বা স্পেন্সরের দর্শন ও হিন্দু-ষড়দর্শনে আছে।

হিন্দুগানে 'ধ্রুপদ' কতকটা ইংরাজিগানের অনুরূপ। ইংরাজিগানে Home Sweet Home ইত্যাদিও পুরাতন স্কচ্ সুরগুলি কতকটা হিন্দুগানের অনুরূপ। কিন্তু সে সাদৃশ্যও অতি সামান্য।

এক কথায়, ইংরাজিগানে একটা সংযমের ভাব আছে, যাহা হিন্দুগানে নাই। ইংরাজি গান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর, হিন্দুগান আনন্দাধিক্যহেতু পীড়াজনক। একটি উন্মীলনোন্মুখ,

অপরটি অর্দ্ধনিমীলিত। একটি জাগরণ, অপরটি তন্দ্রা। একটি আনন্দ, অপরটি ভোগ। একটি দিবা, অপরটি সন্ধ্যা।

একটি যেন রাজপথে নির্ভয়া, স্বাধীনগতি, স্বাবলম্বা, বিংশতি বর্ষীয়া, সুকুমারী ইংরাজ মহিলা; অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গনে সলজ্জা, সশঙ্কগতি গৃহপ্রবেশোন্মতা ষোড়শী, সুন্দরী বঙ্গবধূ। একটি যেন প্রভাতে আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া; অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল। একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্য্যমুখী; অপরটি যেন সভয়া, বিনতনয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য; অপরটি বিলাপ।

অথবা কি বলিব যে ইংরাজি সঙ্গীত যেন কেরোসিনের আলো৷ হিন্দু সঙ্গীত যেন মোমবাতি; একটি নগর অপরটি অরণ্য; একটি Buggy, অপরটি পাল্কি; একটি আরামচেয়ার, অপরটি ফরাস; একটি হাভানা চুরোট, অপরটি বিষ্ণুপুরে তামাক; একটি কাবাব, অপরটি পোলাও।—এত উপমাতেও যদি পাঠক উভয় সঙ্গীতের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যে আর কোন প্রকারে তাহা পারিবেন সে বিষয়ে আশা ভগ্নাংশিক ও সুদূর ব্যবস্থিত; এবং তাহা হইলে তিনি বাড়ী গিয়া কচু নামক একটি উদ্ভিদবিশেষকে দগ্ধ করিয়া অনায়াসে আহার করিতে পারেন; তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি নাই—বন্দার গোস্তাকি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

তোমার দ্রব্য যদি তোমার অজ্ঞাতসারে ও আমার জ্ঞাতসারে হস্তান্তরিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লোকে ঘটনাটাকে চুরি আখ্যা দেয়; এবং সকলে মিলিয়া আমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে। আমি অনাসক্তির সহস্র সাফাই করিলেও তাহা গ্রহণীয় হয় না। সংসারের এইরূপ বন্দোবস্ত ঠিক আমার মনোমত না হইলেও ইহার অর্থ কতকটা বুঝা যায়। কেননা চুরি ব্যাপারে এক পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ সত্ত্বেও অন্য পক্ষের ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ইষ্টসাধনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং মৎকৃত কার্য্যটা যে মালিকের আকস্মিক চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া তাহার করমুষ্টি সবলে আমার পৃষ্ঠোপরি পাতিত করিবে, ইহা জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান তিনেরই অনুমোদিত।

আমার আর এক শ্রেণীর কার্য্য আছে, তাহাতেও কেন যে আমার প্রতিবেশিবর্গের চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং আমার শাসনের জন্য তাঁহাদের একটা বলবতী স্পৃহা জন্মে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। মনে কর আমার প্রতিবেশিবর্গ কোন দেবতা বা ঈশ্বর বিশেষের নির্দ্দিষ্ট বিধানে আরাধনা করিয়া থাকেন, এবং সেই আরাধনার সম্পূর্ণতার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানের সম্পাদন করেন। এই আরাধনার এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সম্পাদন দ্বারা তাঁহাদের পরকালে এবং হয়ত ইহকালেও নানাবিধি শ্রেয়ঃ সংসাধিত হয়। তাঁহারা আপনাদিগকে ও হয়ত আপনার পুত্র কলত্রাদিকে ইহ পরত্র এই শ্রেয়োভাগী করিবার জন্য আগ্রহের সহিত ও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত উক্তরূপ অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করেন। আমি তাঁহাদের বিশ্বাস বা যুক্তির কোনরূপ সমালোচনা করিতে চাহি না; এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠানেও কোনরূপ বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু আমার যুক্তি ও আমার বিশ্বাস যদি সাধারণের অনুষ্ঠিত কার্য্যে যোগ দিতে আমাকে উৎসাহিত না করে, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেন আমাকে নিগৃহীত ও পীড়িত করিবার উদ্যোগ করেন, তাহা বুঝিতে আমি অসমর্থ। ধর্ম্মকার্য্য অননুষ্ঠানের জন্য যাহা কিছু প্রত্যবায়, তাহা আমারই ঘটিবে; আমার প্রতিবেশীদিগকে তাহার ফলভাগী হইতে হইবে না; এবং তাঁহারা যে সকল শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবেন, আমিই সে সকল শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইব; অপরে মৎকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী হইবে না। অথচ আমার অস্তিত্ব যে তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া উঠে, এই আমার দুঃখ।

স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক নহে যে, পীনাল কোডে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে যে সকল মহাপাতকের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটাই প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির বিরোধাচরণের মত সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় ও ভয়ঙ্কর নহে। চোর ও ব্যভিচারী রাজশাসনে দণ্ডিত হইলেও সমাজের নিকট তাহার ক্ষমা থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত রাজশাসনে ধর্ম্মবিরোধীর দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিলেও সমাজের নিকট তাহার ক্ষমা নাই। সে সমাজের

নিকট উৎকটতম পাপে পাতকী; সমগ্র সমাজের শক্তি তাহাকে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল।

উদাহরণের অভাব নাই। বাঙ্গালীর ছেলে ইংরাজী পড়িয়া সহসা মন্দির হইতে শালগ্রাম শিলা নির্ব্বাসিত করিয়া ফেলিলে পুরোহিত মহাশয় এবং ফলাহারপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ সন্তানগণের সুগভীর আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু সেই শালগ্রাম শিলার অবস্থিতিতে যে সকল শান্তশীল প্রতিবেশীর কস্মিন্‌কালে কোন লাভের সম্ভাবনা ছিল না, তাহারাও হঠাৎ খড়্গহস্ত হইয়া একটা উপপ্লবের সূচনা করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য দ্বেষাদ্বেষির উদাহরণ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। শুনা যায় নাকি এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের বা উপাসনা-পদ্ধতির বিষয়ে মতভেদ লইয়াই প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে ঘোরতর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল; এবং সেই গৃহবিবাদের ফলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পারসীকগণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া খাইবার পার হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করেন। বৈদিক ধর্ম্ম পৌরাণিক ধর্ম্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বোধ হয় শৈববৈষ্ণবের সনাতন বিরোধের সূচনা হয়। কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণের সমূল সংহার সম্পূর্ণ উপকথা না হইতেও পারে।

আমাদের দেশে ধর্ম্ম বিদ্বেষের ফলে যতই কিছু না হউক, খৃষ্টান ইউরোপ এ বিষয়ে সকলের উপর বাহবা লইয়াছেন। ইউরোপের সমগ্র ইতিহাস শোণিতের এবং আগুনের অক্ষরে এই ধর্ম্ম-বিদ্বেষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। অথবা এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি [illegible] ধর্ম্মানুষ্ঠানগত মতভেদের জন্য বহ্নিমুখে এবং কুঠারের মুখে কতগুলি নিরীহ মনুষ্যজীবন অকালে সমাপ্ত করিয়াছে, আঠার শত পঁচানব্বই বৎসর ধরিয়া তাহার ধারাবাহিক লিপিরই নামান্তর খৃষ্টান ইউরোপের ইতিহাস। ক্রূরতার ও নিষ্ঠুরতার জন্য মনুষ্যের সহিত সর্পের ও ব্যাঘ্রেরও তুলনা হয় না। মনুষ্যজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথা বলে সত্য; কিন্তু মনুষ্যজাতির ইতিহাসের মধ্যে আবার খৃষ্টান ইউরোপের ইতিবৃত্তের মত ভয়াবহ অধ্যায় আছে কিনা জানি না।

অথচ ইহা সর্ব্বত্রই নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত যে চৌষট্টি নরক অপর সাধারণ পাতকীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে; ও পাষণ্ডী ও নাস্তিকের জন্য বিশেষ যত্ন ও প্রয়াস সহকারে স্বতন্ত্র পঞ্চষষ্টিতম নরকের নির্ম্মাণ হইয়াছে; এবং সেই নরকে পাষণ্ডীর আত্মার যথাযোগ্য দণ্ডদানের জন্য ব্যবস্থা উদ্ভাবনে বিধাতার মস্তিষ্ক বিশেষরূপে আলোড়িত হইয়াছে। পাষণ্ড ও নাস্তিক জানিয়া শুনিয়াই পরকালের এই ভীষণ শাসনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; তবে কেন তোমরাও তাহার পারলৌকিক ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা না করিয়া ইহকালেই তাহাকে যাতনা দিতে প্রস্তুত হইয়াছ? এই ভীষণ ভবিষ্যৎও কি তাহার ভাগ্যহীন উন্মার্গগামী আত্মার জন্য যথেষ্ট নহে?

তাহার বুদ্ধি বিবেচনার যতই নিন্দা করি না এবং তাহার অপরাধ যতই উৎকট হউক না কেন, তাহার পক্ষে এই একটা কথা অন্ততঃ বলা যাইতে পারে যে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য সে স্বয়ং দায়ী; সে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের অনিষ্ট করে নাই; তাহার সম্পাদিত অপরাধে অন্যে পাপী বলিয়া গণ্য হইবে না। মাতাল যতক্ষণ ঘরে বসিয়া মদ খায় ও পরের ছেলেকে প্রলোভিত না করে, ততক্ষণ সে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতে পারে বটে; কিন্তু অপরে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে না। এই টুকু স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা জনসমাজ তাহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট হইয়া আপনারই আত্মাকে সঙ্কটাপন্ন করে, অপরকে সে পথে লইয়া যাইতে চাহে না, সেই নির্ব্বোধ হতভাগ্য অথচ নিরীহ জীবের প্রতি সমাজ কেন এত নিষ্করুণ, তাহার কৈফিয়ত এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। তাহাকে ঘৃণা কর; নিন্দা কর; নাস্তিক, নির্ব্বোধ প্রভৃতি বিবিধ বিশেষণ অভিধান বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর অর্পিত কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কেননা তোমাদের বাগিন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে কেহ চাহে না। কিন্তু তাহার অধঃপতনোন্মুখ আত্মার প্রতি তোমার এত সমবেদনা কেন উপস্থিত হইল যে তুমি এত পরিশ্রমের সহিত তাহার চিতা সাজাইবার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছ, এবং তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটাকে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত করিবার জন্য ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কুঠার শাণাইতেছ, ইহা বুঝিলাম না। তোমার বাগিন্দ্রিয়কে যে স্বাধীনতাটুকু দান করিতে সে অনুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, তাহার অন্তরিন্দ্রিয়কে সেই স্বাধীনতাটুকু দিতে তোমার এতটা আপত্তির কারণ কি? তাহাকে তাহার নিজ কর্ম্মের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে দাও; তোমারই স্বীকার মতে পরকালে তাহার জন্য বন্দোবস্ত বিহিত রহিয়াছে; তোমার এত মাথা ব্যথার ও পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

সমাজের সহিত সমাজধর্ম্মত্যাগীর সম্বন্ধটা আর একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিবার চেষ্টা আবশ্যক। কোন না কোন মূর্ত্তিতে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রচলিত ধর্ম্ম-মাত্রেরই সাধারণ অঙ্গ বুঝিতে হইবে। একমাত্র বুদ্ধদেবই বোধ করি ধর্ম্ম হইতে অতিপ্রাকৃতকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রাকৃতের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্যসমষ্টিকেই ধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন; এবং মনুষ্যের ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ভুক্ত জীবের বা দেবতার অস্তিত্বে তিনি সংশয়যুক্ত না হইলেও সেরূপ বিশ্বাস তাৎকালিক বা অধুনাতন বিজ্ঞানের একেবারে বিরোধী, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু বুদ্ধদেবের নিজমত যাহাই হউক, তাঁহার পন্থাবলম্বী বৌদ্ধেরা যে বুদ্ধদেবেই বিবিধ অতিপ্রাকৃত শক্তির অর্পণ করিয়াছিল এবং বুদ্ধের ও বিবিধ দেবতার তুষ্টি সম্পাদন ও সাড়ম্বর উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য। স্থূল কথা, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বা শক্তিনিচয়ে বিশ্বাস ও নিতান্ত অন্ধভাবে তাহার প্রীতিসম্পাদন প্রয়াসই প্রচলিত সামাজিক ধর্ম্ম সকলের প্রাণ। কোন সম্প্রদায়ের মতে হয়ত এক জন শক্তিশালী সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা সংসার চালাইতেছেন; কাহারও মতে হয়ত একজন ব্যক্তি কোনরূপ

সিণ্ডিকেট বা পার্লেমেণ্টের সাহায্যে জগৎশাসন করিতেছেন; আবার কাহারও মতে বা বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র অল্লাধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি গোলেমালে একরূপে স্থষ্টির কলটা চালাইতেছেন। স্থষ্টির কল একরকম আপনা হইতেই চলিতেছে, তাঁহারা মাঝে হইতে উপস্থিত হইয়া হস্তক্ষেপ করেন; কেহ গোল বাধান, কেহ গোল সারেন; কেহ ভাঙ্গেন, অপরকে তাহা মেরামত করিয়া লইতে হয়। দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্নমত আছে; এবং এক একটা দেবতত্ত্বের সহবর্ত্তী এক একটা নির্দ্দিষ্টরূপ উপাসনা পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। দেবতত্ত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সমষ্টিকে ধর্ম্মের প্রাণ, ও উপাসনা পদ্ধতি ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্ম্মের শরীর বলা যাইতে পারে। সমাজের মধ্যে কতিপয় বাছাই লোকে ধর্ম্মের প্রাণটা অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাগ লইয়া টানাটানি করে; ইতর সাধারণে তাহা শুনে, ও বুঝিয়া বা না বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া চলে। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতে ইতর ভদ্র ও পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমানভাবে বাধ্য। এই অনুষ্ঠান কে কতখানি পালন করিয়া চলে তাহার দ্বারাই সাধারণতঃ ধর্ম্মে আস্থার মাত্রা পরিমিত হইয়া থাকে। তেত্রিশ কোটিতে তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাক আর নাই থাক, পথিপার্শ্বে সিন্দূর চিহ্নিত শিলাখণ্ড দেখিলেই মাথা নোয়াইতে ভুলিও না; তাহার উপর শিখা ফোঁটা ও নামাবলীর ব্যবহারে কার্পণ্যশূন্য হইতে পারিলেই সমাজমধ্যে তোমার যশের আর ইয়ত্তা থাকিবে না, তোমার অন্তরের ভিতরে কোথায় কি আছে অনুসন্ধান করিয়া কেহ তোমার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে না। আর তোমার অন্তরে গভীর ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকিলেও যদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসাধনে অঙ্গহানি ঘটে, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা তুমি পরকালে মুক্তি পাইতে পার; কিন্তু ইহকালে তোমার নিস্তারের কোন আশাই বর্ত্তমান নাই। আর যদি তুমি নিতান্ত দুঃসাহসিক হইয়া সেই অনুষ্ঠানগুলির যুক্তিমত্তা ও সারবত্তার সমালোচনা করিবার জন্য ন্যায়শাস্ত্র আনয়ন কর, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্ব সমাজের পায়ে কাঁটার স্বরূপ হইয়া উঠিবে। নরঘাতুকের মার্জ্জনালাভে অধিকার থাকিতে পারে, কেন না সে ব্যক্তিবিশেষকে মাত্র হত্যা করিয়াছে; কিন্তু তোমার মার্জ্জনালাভে কোন অধিকার নাই; কেন না তোমার ললাটপটে "সমাজদ্রোহী" শব্দ উজ্জ্বল ও ভীষণ অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এমন কেন হয়? খুঁজিলে কি ইহার উত্তর মিলে না? ব্যক্তিবিশেষকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা দিতে সমাজ এত কাতর কেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমাজদ্রোহেরই প্রকারভেদ বলিয়া গৃহীত হয়, ইহার কারণ কি? চোরের ও ঘাতুকের ক্ষমা আছে, ধর্ম্মত্যাগীর ক্ষমা নাই কি জন্য?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজি রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতে এই প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বাধ্য হইয়াছি। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মশব্দে মনুষ্যের কর্ত্তব্যসমষ্টিকে বুঝায়। ইংরাজি রিলিজন শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইংরাজিতে "মরালিটি" বলিয়া

আর একটা শব্দ আছে, সে শব্দটাও আমাদের ধর্ম্মের ভিতরে আসিয়া পড়ে। স্থূলতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, অতিপ্রাকৃতের সহিত মানুষের কারবার লইয়া রিলিজন এবং প্রাকৃতের সহিত কারবার লইয়া মরালিটি। দৈবক্রমে মানুষের ইতিহাসে প্রাকৃতে ও অতিপ্রাকৃতে বহুস্থলে মেশামিশি হইয়া গিয়া রিলিজন ও মরালিটির একটা আকস্মিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা স্বতন্ত্র পদার্থ। অন্ততঃ উহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বতন্ত্র অর্থে প্রয়োগ করিলে অনেক কূট বিতণ্ডার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলা ভাষায় মরালিটির জন্য পৃথক শব্দের ব্যবহার নাই। অগত্যা আমরা রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম ও মরালিটি অর্থে নীতি শব্দ এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করিব।

ধর্ম্মের অর্থাৎ রিলিজনের আবশ্যকতা লইয়া বহুকাল হইতে দুইটা সম্প্রদায়ে ঘোর বিসম্বাদ চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে এরূপ কোন বিসংবাদ নাই। নীতি না হইলে সমাজের স্থিতি ও অস্তিত্ব একবারে অসম্ভব হইত ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ধর্ম্মের সম্বন্ধে এইরূপ ঐকমত্য দেখা যায় না। একদল ধর্ম্মকেই মনুষ্য জন্মের প্রধানতম সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যত্বের কোন গৌরব নাই এইরূপ বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম হইতেই নীতির উৎপত্তি, যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে নীতি ভিত্তিহীন, এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস; সুতরাং ধর্ম্মই মনুষ্যের উন্নতির নিদান---ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা অতিপ্রাকৃতে শ্রদ্ধাহীন, সুতরাং ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য। স্থানবিশেষে ধর্ম্ম নীতির সহায়তা করিয়া মানুষের উপকার করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের কোন বিশেষ উপকার হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি মানুষের ইতিবৃত্তের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রবল অন্তরায় স্বরূপে মনুষ্যজাতির প্রধানতম শত্রুস্বরূপে দণ্ডায়মান আছে। আর ধর্ম্মের যে সকল অনুষ্ঠান, ঈশ্বর বা দেবতাবিশেষের প্রসাদনার্থ যে সকল কৌশল বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাদের মূলে যুক্তিও নাই, নীতিও নাই! বালকের চপলতা, বাতুলের নির্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষের ভীরুতা হইতে তাহাদের উদ্ভব। যত শীঘ্র তাহারা লোপ পায়, মনুষ্যের পক্ষে ততই কল্যাণ।

এক পার্শ্ব হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ধর্ম্ম অনেক স্থলে জ্ঞানের অন্তরায় ও নীতির অন্তরায় স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যের উন্নতিপক্ষে যথেষ্ট বিঘ্নসাধন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তথাপি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া মানব সভ্যতার প্রভাতাগম অবধি ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির কোলাহল মধ্যেও সহস্র দেবমন্দির ও গির্জাঘর ও মসজিদের উন্নত চূড়ার নিম্নদেশে কোটি কোটি নরনারী হৃদয়ের আন্তরিক ব্যাকুলতা ও শ্রদ্ধার সহিত অতিপ্রাকৃতের উদ্দেশে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া আসিতেছে তাহার উদ্দেশ্যের অপলাপ করিলে ঐতিহাসিক সত্যের নিকট অপরাধী হইতে হয়। মানবেতিহাসের বিস্তীর্ণ কাহিনী

হইতে তাড়িতযন্ত্র ও বাষ্পীয়যান, নিউটন ও অরিস্ততল, জ্ঞানের মহিমা, এমন কি নীতির মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই দেবমন্দির ও মসজীদঘরগুলার বিবরণ বাদ রাখিলে ইতিহাস জীর্ণ শীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের মূলে যুক্তি থাক আর নাই থাক, ইহার মত সত্য ঘটনা মনুষ্যের ইতিহাসে অস্তিত্বহীন।

ধর্ম্মের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদের উল্লেখ করিয়াছি, ধর্ম্মের একটা দিক্ আছে, উভয় সম্প্রদায়ই সে দিক্টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে চাহেন না।

উন্নতি বড় মধুর পদার্থ সন্দেহ নাই; কিন্তু যেখানে স্থিতি নাই, সেখানে উন্নতির প্রয়াস বিড়ম্বনা। যেখানে ভিত্তিমূল জীর্ণ, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইও না।

নীতির শাসন ও রাজশাসন ও আরও পাঁচটা শাসন সমাজের স্থিতিপক্ষে সহায়তা করিয়াছে সত্যকথা; কিন্তু এ হিসাবে ধর্ম্মের ও তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের সহিত কাহারও তুলনা হয় না।

মনুষ্যের ইতিহাসে বোধ হয় এমন দিন ছিল যখন নীতির উদ্ভব হয় নাই; যখন রাজশাসনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানই তখন মনুষ্যসমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল।

স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা লইয়া আমরা আজি কালি যতই আস্ফালন করি না কেন, ইহা একটা প্রকাণ্ড সত্য কথা যে, মনুষ্যের গৌরব স্বাধীনতায় নহে; পরাধীনতাই মনুষ্যের গৌরবের ও মাহাত্ম্যের নিদান। লজ্জার বিষয় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

মনুষ্যেতর জীব সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; তাহাদের মধ্যে নৈতিক শাসন ও ধর্ম্মশাসন ও রাজশাসন, লোকাচার ও দেশাচার, সকলই অস্তিত্বহীন। জীবন সংগ্রামে তাহারা আপন আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে উন্মুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত নিরত আছে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে সেখানে সবলের ও সমর্থেরই জয়।

মনুষ্য নামধেয় জীব ব্যাঘ্রের দংষ্ট্রাধার ও সর্পের হলাহল লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয় নাই। অথচ তাহার দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় ও ভঙ্গুর শরীর লইয়া সমর্থতর ইতরগণের সহিত জীবনসমরে সে প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল।

অথচ সে জীবজগতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কতকটা তাহার বুদ্ধির বলে, কতকটা তাহার দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য বশে।

এইরূপে মনুষ্যের সমাজের উৎপত্তি হয়। ইতর সমর্থতর জীবের সহিত সংগ্রামে জয় লাভের জন্য মনুষ্যকে সমাজ বাঁধিতে হইয়াছিল।

মনুষ্যকে সমাজ বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল; ইতর জীব তাহাতে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল! কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দেশে মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সমর তখনও চলিয়াছিল; অদ্যাপি ক্ষান্ত হয় নাই।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় সিংহ ভল্লুক ও বৃকের সহিত, ম্যামথ ও মাষ্টোডনের সহিত

তাহাকে যেমন নিয়ত আহারের জন্য সংগ্রাম করিতে হইত, মনুষ্যের প্রাথমিক সমাজের অভ্যন্তরেও মানুষের সহিত মানুষের জীবন-সংগ্রাম কোন অংশে তীব্রতায় তদপেক্ষা হীন ছিল না।

এবং সেই প্রাথমিক সমাজের প্রাথমিক মনুষ্য যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নৈতিক অংশে ইতর জীবের প্রকৃতি অপেক্ষা বড় অধিক উন্নত ছিল না; কেন না সে মানসিক প্রকৃতি জীবন সমরে তাহার অনুকূল ছিল; এবং বলা বাহুল্য এ জগতে নিরীহ নৈতিক জীবের সর্ব্বদা আহারলাভ ঘটে না। দুঃখের বিষয়; কিন্তু সত্য কথা।

অর্থাৎ অন্যান্য ইতর জীবের ন্যায় মুষ্টিমিত আহারের ভাগের জন্য মনুষ্য আপনাদের মধ্যে নখানখি, দন্তাদন্তি ও রক্তারক্তি করিত; এ বিষয়ে ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল না; এবং এই বর্ব্বর পাশবিক জীবনদ্বন্দ্বে নখানখি ও রক্তারক্তি আজিও যে থামে নাই, প্রাত্যহিক সংবাদপত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মনুষ্য-সমাজের সৃষ্টি অবধি দুইটা প্রতিকূল শক্তি সেই সমাজকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ রাখিয়াছে। মনুষ্য দল বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য; নতুবা জীবন-সংগ্রামে ইতর জীবের নিকট পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; এবং সেই দলের মধ্যেও আবার পরস্পর বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী; কেন না মানুষের খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ মুষ্টিমিত এবং খাদ্যবিনা জীবনযাত্রা অচল।

এই দুইটা শক্তি পরস্পর প্রতিকূল, অথচ কোন না কোনরূপে কতকটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বিধান করিয়া মনুষ্যকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় নীত করিয়াছে।

মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া সমাজ বাঁধিয়া থাকিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে আপনার উচ্ছৃঙ্খল স্বতন্ত্রতাকে সংযত করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পরাধীনতার মূল; ইহা হইতে ধর্ম্ম, নীতি ও রাজশাসনের উদ্ভব; ইহা হইতেই মনুষ্য-সমাজের স্থিতি; ইহা হইতেই মনুষ্যত্বের মহিমা ও গৌরব।

আবার মনুষ্যকে পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইবে; নতুবা আহার জুটিবে না, নতুবা শারীরিক ও মানসিক শক্তির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি ও বিকাশ ঘটিবে না। সুতরাং এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত উন্নতির মূল; এবং যেখানে ব্যক্তির সমষ্টিতে সমাজ, সেখানে সামাজিক উন্নতিরও ইহাই নিদান। পশুর সহিত মনুষ্যের এইখানে সমতা; ইহা সমাজ-বন্ধনের প্রতিকূল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা উন্নতিরও একমাত্র উপায়।

মনুষ্য বাধ্য হইয়া আপনার পায়ে অধীনতার নিগড় পরাইয়াছে; এবং অধীনতার নিগড় পরিয়া কথঞ্চিৎ যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে! যেখানে স্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত সেখানে সমাজ বন্ধনহীন; মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত। যেখানে স্বাতন্ত্র্য ম্রিয়মান, সেখানে সমাজ উত্থানশক্তি রহিত; উন্নতির পথ অবরুদ্ধ।

অধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যের সীমারেখা কোথায়? কে বলিয়া দিবে কোথায়? কোন্ খানে রেখা টানিলে উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটিবে, স্থিতি বজায় থাকিবে অথচ উন্নতি প্রতিহত হইবে

না; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ইহাই রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির প্রধানতম সমস্যা।

মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্বাতন্ত্র্যমুখে; সেই প্রবৃত্তিকে দমন ও নিরোধ করিতে হয়। নহিলে সমাজ টিকে না। নতুবা মনুষ্যত্ব পশুত্বের নিকট জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও অবসন্ন হয়। এই সমস্যা মনুষ্যের জীবন-মরণ-ঘটিত সমস্যা। মনুষ্যের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

দেশভেদে ও কালভেদে মনুষ্য পাঁচটা দলে বিভক্ত হইয়াছে; পাঁচটা সমাজ বাঁধিয়াছে। সমাজে সমাজে জীবনযুদ্ধ চলিয়াছে। যে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা যত নিয়মিত, সে সমাজ তত সংহত, সমর্থ, ও জীবনযুদ্ধে বলীয়ান্।

সমাজ রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সামাজিক মনুষ্য প্রথমে যে শিকল গড়াইয়াছিল, সামাজিক মনুষ্যমাত্রই যে শিকলে আপনাকে বাঁধা রাখিতে অদ্যাপি বাধ্য, তাহার নাম করিতে হয়ত অনেকের লোমহর্ষ উপস্থিত হইবে। ইহার ইংরাজী নাম Obedience to authority; চলিত বাঙ্গালায় পরতন্ত্রতা বা বশ্যতা। সামাজিক জীবের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম। যেখানে এই ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সমাজের অবস্থা ভয়াবহ।

শাদা কথায় ইহার অর্থ বড় ভয়ঙ্কর। তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা তুমি পাইবে না; তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে যে দিকে টানিতেছে, সে দিকে তোমার গতি রুদ্ধ; তোমার বুদ্ধি তোমার যুক্তি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে, সে পন্থা তোমার নিকট নিরুদ্ধ। সমাজের প্রবৃত্তি তোমার প্রবৃত্তিকে চালিত করিবে, সমাজের বুদ্ধির নিকট তোমার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত থাকিবে, সমাজ যাহাকে নীতিমার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, তোমার নৈতিক বৃত্তি তাহার বিপরীত মুখে তোমাকে লইতে পারিবে না। তোমার প্রবৃত্তি, তোমার বুদ্ধি, তোমার নৈতিক বৃত্তি যদি তোমাকে অন্য পথে লইতে চায়, তাহা হইলে তুমি সমাজদ্রোহে পাতকী; অন্যত্র তোমার মার্জ্জনা থাকিতে পারে; সমাজের নিকট তোমার ক্ষমা নাই। নীতিবিৎ, তুমি চকিত হইও না; বশ্যতাই সিটিজনের বা সামাজিকের প্রথম ধর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম; অন্য ধর্ম্মের স্থান তাহার পরে। সামাজিক জীব সমাজের বেতনভুক্ সৈনিক মাত্র; সৈনিকের অন্য ধর্ম্ম নাই।

সমাজের বুদ্ধির নিকট আপন বুদ্ধিকে বলিদান দিবে; সমাজের নীতির নিকট আপন নীতিকে বলিদান দিবে। হইতে পারে তোমার মার্জ্জিত বুদ্ধি, ও তোমার বিশুদ্ধ নীতি নিকৃষ্ট সামাজিক বুদ্ধির ও নিকৃষ্ট সামাজিক নীতির অনুমোদন করে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। প্রথমে তোমার সামাজিকত্ব; পরে তোমার ব্যক্তিত্ব। সমাজধর্ম্মের সমীপে ব্যক্তিধর্ম্মের আসন নাই।

সামাজিক জীবের এই বশ্যতা স্থানভেদে ও পাত্রভেদে নানা নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোথাও ইহা রাজভক্তি, কোথাও ইহা পিতৃভক্তি, কোথাও গুরুভক্তি বা দেবভক্তি, কোথাও স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতিবাৎসল্য নাম ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বত্র এই ভক্তি ও

বাৎসল্য মনুষ্যহৃদয় হইতে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত না হইতে পারে; যেখানে ইহার স্বতঃ উচ্ছ্বাস ও স্বতঃ বিকাশ নাই, সমাজ সেখানে বলপ্রয়োগে ও দণ্ডপ্রয়োগে আপন দাওয়া ষোল আনা বুঝিয়া লয়।

জীবধর্ম্মা ও পশুধর্ম্মা জীবনসমর-নিয়ত মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাকে চুরি করিতে ও মিছা কথা কহিতে প্রলোভিত করে; কিন্তু সমাজ যে দিন তাহাকে চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না প্রভৃতি নঞন্ত বাক্যময় আদেশবাণী শুনাইতে আরম্ভ করে, সেই দিন নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। যেখানে ব্যক্তিগণ আপন স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এই নীতিশাস্ত্রের আদেশ শুনিতে চাহে, সেই খানেই সমাজের বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়; অথবা যে যে সমাজে সামাজিকগণের প্রকৃতি এই নীতিশাস্ত্রের বশীভূত হয়, সেই সেই সমাজই জীবনযুদ্ধে টিকিয়া যায়; যে সমাজে নীতির মর্য্যাদা হয় না, সে সমাজ জীবনযুদ্ধে ধ্বংস পায়।

কিন্তু মনুষ্যের পশুপ্রকৃতি সহজে মানুষকে এই নীতিশাস্ত্রের ব্যবস্থায় কর্ণপাত করিতে দেয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে পাশব ভাব পরিহার করিয়া সামাজিক ভাব লাভ করিতে মানব-প্রকৃতি বহুদিনের অপেক্ষা করে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বহুদিনে ক্রমে ক্রমে দেখা দেয়। সুতরাং সমাজ রক্ষার জন্য, উদ্ধত সামাজিক জীবকে বশে রাখিবার জন্য অন্যবিধ বলের প্রয়োজন, অন্যবিধ প্রবল শক্তির আবশ্যকতা। যেখানে এই বল বর্ত্তমান, এই শক্তি কার্য্যকরী, সেইখানে সমাজের অবস্থা আশাপ্রদ।

এই শক্তির মধ্যে একটা রাজশাসন; আর একটা ধর্ম্মশাসন। মানুষ নীতিমার্গে থাকিতে চায় না; তাহাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিতে হয়। বলের নিকট প্রবৃত্তি পরাভূত হয়। রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন উভয়ই বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরের দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য স্বাভাবিক স্পৃহা দমনে রাখিতে হইবে, মনুষ্যের চরিত্র আজিও এত উন্নত হয় নাই যে শুধু এই নীতিশাস্ত্রের উপদেশ তাহাকে দুই চারিবার শুনাইলেই যথেষ্ট হইবে। অন্যবিধ শাসনের প্রয়োজন। যে এই স্বাভাবিক স্পৃহা দমনে রাখিতে পারে না, তাহাকে জোর করিয়া শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত কর, অথবা তাহার কল্পনার সমক্ষে কুম্ভীপাকের বিভীষিকার সৃষ্টি কর। মনুষ্যসমাজের ও মনুষ্যজাতির সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্য দুর্ব্বল ও ভয়ালু জীব। নীতির অনুশাসন যাহার দমনে অক্ষম, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন তাহাকে দমন করিবে। তাহার স্বভাবের শোধন করিবে এরূপ ভরসা করি না, নীতিশিক্ষা ও সহস্রবিধ শাসন মানুষের স্বভাব সংশোধন করিতে পারে কি না তাহা উৎকট সংশয়ের বিষয়। তাহার স্বভাবের উৎকর্ষ না ঘটিতে পারে, তবে ভীতির উৎপাদনে তাহাকে সমাজের ক্ষতিসাধন হইতে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

ফলে উদ্ধত মনুষ্যকে সংযত ও সমাজবদ্ধ করিবার জন্য, সমাজের স্থিতিসম্পাদনের নিমিত্ত, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসনের মত প্রকৃষ্ট উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হয়ত মানুষের অদৃষ্টে এমন দিন আসিতে পারে যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে মনুষ্যের

নৈতিক স্বভাব এমন বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিবে যে, উভয়বিধ শাসনের একটাও আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সে দিন এখনও মানুষের ইতিহাসে আইসে নাই। এখন বোধকরি কারাগার ও গির্জ্জাঘর উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

মনুষ্যের ইতিহাসেও অন্য কথা বলে না। প্রথমে রাজশাসন লইয়া দেখ। অরাজকতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু সমাজের পক্ষে উহা ভয়াবহ। রাজার ও রাজশক্তির বিবিধ মূর্ত্তি ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে রাজশক্তি বজ্রমুষ্টিতে শাসনদণ্ড চালনা করে না, সেখানে সমাজের অবস্থা শোচনীয়; সমাজ সেখানে দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষণে একেবারে অসমর্থ। প্রাচীন কালদীয়া ও বাবিলোন হইতে বিসমার্কের জর্ম্মনি পর্য্যন্ত সমস্বরে এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে। ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ চেষ্টা বৃথা। প্রাচীন ভারতবর্ষে কোন বিসমার্ক উদিত হইয়া আসমুদ্র হিমাচল তরবারির বলে এক ছত্রের অধীন করেন নাই; সেই জন্য ভারতের অদ্য এই দশা; ভারতবাসী পরাধীন, ভিখারী, লাঞ্ছিত। সমাজবন্ধনের জন্য রাজপ্রযুক্ত পাশবশক্তির প্রয়োজন। পুনশ্চ প্রার্থনা,— নীতিবিৎ, ক্ষুব্ধ হইও না; ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন ইহার মধ্যে কোন্ শাসনটা সমাজবন্ধনে অধিক সহায়তা করে নির্দ্দেশ করা দুষ্কর নহে। ধর্ম্ম অর্থে পুনরায় রিলিজন বুঝিতে হইবে। এবং বুঝিতে হইবে যে, রাজশাসনের ভিত্তি যেমন বিভীষিকায় প্রতিষ্ঠিত, রিলিজনের মূলেও সেইরূপ অতিপ্রাকৃতে বিভীষিকা বর্ত্তমান। মনুষ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও ভয়ালুতা উভয় শাসনেরই ভিত্তিস্থল। রাজশক্তি যেখানে রাজনৈতিক একতাসাধনে অসমর্থ, ধর্ম্মশাসন সেখানে সমর্থ। একে যাহা পারে না, অন্যে তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করে। সত্য প্রাকৃত যাহা পারে না, কাল্পনিক অতিপ্রাকৃত তাহা পারে।

উদাহরণ অনাবশ্যক, তবে কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য ইতিহাস হইতে গোটাকত চলিত উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীসে রাজনৈতিক একতা কোনকালে ছিল না; তথাপি সমুদয় হেলেনিকগণের মধ্যে যে একটা প্রবল বন্ধন ছিল, তাহাতেই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন নগরগুলি ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গুলি লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বর্ব্বর জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক মহামহিমময় মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজনৈতিক একতায় সে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তাহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি জিউস ও আপোলো, হোমর ও হীসিয়দ, দেলফির অরাকল ও অলিম্পির ক্রীড়াক্ষেত্র। অরিস্তফীনীস যেদিন আথেন্সের রঙ্গমঞ্চে দেবদেবীগণকে উপহাস করিয়া দর্শকের করতালি পান, তার পরদিন গর্ব্বিত এথীনিয়কে পারস্যের রাজসভায় উৎকোচগ্রাহী ও স্বদেশদ্রোহী মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট দেখিতে পাই।

প্রাচীন রোম অত্যুগ্র রাজশক্তির বলে পুরাণ-প্রথিত মৎস্যাবতারের মত আপনার ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া সমগ্র ভূভাগ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল; চতুঃপার্শ্বের সমাজসমূহ

তাহার বর্দ্ধমান কলেবরে ক্রমশঃ লীন হইয়া আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছিল। গল ও বৃটন, ফিনিক ও গ্রীক, ইহুদী ও পারসীক সকলেই এক উৎকট প্রবল পরাক্রম অপ্রতিহতপ্রভাব রাজশক্তির অধীন হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই প্রবল রাজশক্তি তাহার অখিল প্রজাপুঞ্জকে এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মপ্রণালীর অধীন করিতে পারে নাই। কোন কোন সম্রাট সমগ্র সাম্রাজ্যমধ্যে রাজপূজার প্রচলনের চেষ্টা করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াও সফলকাম হয়েন নাই। রোম সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন অবিচ্ছিন্ন রহিল না; উগ্র রাজশাসন পরাভূত হইল। রোম সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। খৃষ্টান ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া আবার রোম সাম্রাজ্যকে এক রজ্জুতে বাঁধিতে কিছুদিনের জন্য সমর্থ হইয়াছিল; রাজশাসনে যাহা হয় নাই, ধর্ম্মের শাসনে তাহা ঘটিয়াছিল; জষ্টিনিয়ানের ব্যবস্থা ও বেলিসারিয়সের তরবারির পক্ষে যাহা অসাধ্য হইয়াছিল, খৃষ্টান ধর্ম্ম তাহা সহজে সম্পাদিত করিয়াছিল। সত্য বটে উত্তরকালে বর্ব্বরজাতির উপপ্লবে রোম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক একতা শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহাও সত্য যে, সেই খৃষ্টান ধর্ম্মই আবার বর্ব্বরকে সভ্যপদবী প্রদান করিয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ডকে একীভূত করিয়া রোমের সাম্রাজ্য অভিনব মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ইউরোপের ইতিহাসে নবযুগ অভ্যুদিত করে। রোমের সম্রাট জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপে যাহার একীকরণে পরাস্ত হইয়াছিলেন, সেই রোমের সম্রাট এবং রোমের পোপ আবার ধরাতলে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপে সেই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদনে উত্তর কালে সমর্থ হয়েন।

রোমের পরবর্ত্তী ইতিহাসও ঠিক এই কথারই সমর্থন করে। প্রাচ্য রোমের খৃষ্টানেরা আপনাদের মধ্যে বিবিধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের শাসন ও সঙ্গে সঙ্গে রাজশাসন শিথিল করিয়া ফেলে; এরিয়স্ ও আথানেসিয়স্ যে অনৈক্যের বীজ রোপণ করেন, তাহারই ফলে প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়া ইস্লামের কুক্ষিগত হয়। কিন্তু প্রতীচ্য রোমের খৃষ্টানেরা একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ধর্ম্মযাজকের অনুশাসনে শাসিত থাকিয়া সেই গর্ব্বিত সর্ব্বগ্রাসী ইস্লামকে কালক্রমে জিব্রালতার পার করিয়া দেয়। যতদিন কনস্তান্তিনোপলের সিংহাসনে রোমসম্রাট্ অব্যাহতভাবে রাজদণ্ডের সহিত ধর্ম্মের দণ্ড চালনা করিতেছিলেন, ততদিন দামাস্কস্ ও বাগদাদের খলিফা বসপরস পার হইতে সমর্থ হয়েন নাই; আর প্রতীচ্য রোমে পোপের শাসন বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্দোবার খলিফা মেরোবিঞ্জীয় রাজ্যের লোপ করিয়া কৈশরের সিংহাসনে অধিরোহণের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

আর একটা উদাহরণ ইহুদী জাতি। এই জাতি কোন কালে রাজনৈতিক বলে বলীয়ান ছিল না। বাবিলোনীয় ও পারসীক, গ্রীক, রোমক ও মুসলমান যখন যে জাতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, তখনই ইহারা তাহার পদানত হইয়াছে। বস্তুতঃ এমন সর্ব্বতোভাবে বিড়ম্বিত জাতির উদাহরণ ইতিহাসে দুর্লভ। কিন্তু এক অদ্বিতীয় জেহোবার উপাসনা ভিত্তিস্বরূপ করিয়া যে দৃঢ় শাসন ধর্ম্মপ্রণালী ইহাদের সমাজকে গঠিত ও নিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই

বলে ইহারা সহস্রধা লাঞ্ছিত, পীড়িত ও বিড়ম্বিত হইয়া অদ্যাপি আপনাদের জাতীয়তা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। স্বদেশ হইতে ইহারা বহুকাল নির্ব্বাসিত; ভিখারীর ন্যায় ইহারা সমগ্র ভূমণ্ডলে বৈদেশিকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছে; আশ্রয়দাতা বৈদেশিকের নিষ্করুণ বিশ্বাস-ঘাতকায় ইহারা দলিত ও বিমর্দ্দিত হইয়াছে। তথাপি মিশর পরিত্যাগের তারিখ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তিনসহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ইহাদের সামাজিক জীবন একই স্রোতে বহিয়াছে। এখনও ইহাদের জাতীয় জীবনের অবসান হয় নাই। যেখানে যেভাবে বাস করুক, ইহারা এখনও সেই গর্ব্বিত সনাতন আচারাবলম্বী জেহোবার নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য—ইহুদী।

অথবা উদাহরণের জন্য অধিক দূর যাওয়ারই বা প্রয়োজন কি? হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক একতা কোন কালে বোধ হয় ছিল না। কিন্তু এক সনাতন প্রাচীন ধর্ম্মানুশাসনই হিন্দুর জাতীয়ত্ব সহস্র বিপত্তি মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর ভাষা কর্ণাটী বুঝে না; কর্ণাটীর ভাষা বাঙ্গালী বুঝে না। কিন্তু বাঙ্গালী ও কর্ণাটী মনু-প্রবর্ত্তিত পন্থায় অদ্যাপি বিচরণ করে। নর্ম্মদাতীরে ও ভাগীরথীতীরে ব্রাহ্মণেরা স্নানকালে একই দেবতার উপাসনা করে; হরি-দ্বারে ও সাগরসঙ্গমে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাষী বিভিন্নবেশী নরনারী সমবেত হয় এবং বিভিন্ন ভাষী বিভিন্নবেশী মনুষ্য সন্তান সহস্রে সহস্রে সেতুবন্ধ হইতে পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম হইতে বদরিকাশ্রম, ও বদরিকাশ্রম হইতে হিঙ্গলাজ মুখে একই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া পদ-ব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে যে কিছু বন্ধন, যে কিছু একতা, যে কিছু জাতীয়তা বর্ত্তমান, তাহা এই ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই একতাগত। সেই প্রবল জাতীয়ত্ব কোন বাহ্যশক্তির নিকট অদ্যাপি সঙ্কুচিত বা পরাভূত হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান পুরাতন পারসীক সমাজ ও পারসীক সভ্যতাকে,—কালদীয়া ও ব্যাবিলনের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রতাপ-শালী দরবেশের পরাক্রমে প্রসারিত, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত, এবং উত্তরকালেও নশিরবানের ও খসরুর পরাক্রমবলে রোম সাম্রাজ্যের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী পদবীতে সংস্থাপিত, পারসীক সমাজকে লীলাক্রমে পঞ্চবিংশবর্ষ মধ্যে বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণিত করিয়াছিল; রোম সম্রাটের হস্ত হইতে সমগ্র এশিয়া ও সমগ্র আফ্রিকা ছিনিয়া লইয়া তত্তৎ প্রদেশে হেলেনিক সভ্যতা ও রোমক ব্যবস্থা ও খৃষ্টীয় সমাজশাসন শতবর্ষ মধ্যে একেবারে লুপ্ত করিয়াছিল, জিব্রালতার পার হইয়া রোমের অঙ্গবৈকল্য সাধন করিয়া প্রতীচ্য বর্ব্বরতার সমীপে প্রাচ্য সভ্যতা উপস্থাপিত করিয়াছিল; এবং শতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্য রোমের ও দ্বিশতবর্ষ মধ্যে প্রতীচ্য রোমের সিংহদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সগর্ব্বে হুঙ্কার ছাড়িতেছিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান শতাব্দী মধ্যে এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের মানচিত্র একবারে রূপান্তরিত করিয়াছিল; প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন সমাজ একবারে উচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করিয়াছিল; আট শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজের সমবেত শক্তির সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছিল এবং পরিশেষে সেণ্ট সোফিয়ার চূড়া হইতে ক্রস্ নামাইয়া ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই লোক-ভয়ঙ্কর ইস্‌লামের আপতনের ইতিহাস অন্যরূপ। মহম্মদের

পর ছয়শত বৎসর মধ্যে মুসলমান হিন্দুস্থানে লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। ছয়শত বৎসর পরে হিন্দু জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হয়, কিন্তু তজ্জন্য হিন্দুর সামাজিক স্বতন্ত্রতা অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। হিন্দু সমাজে জাতীয় জীবনের যে স্রোত পঞ্চসহস্র বা ততোধিক কাল একটানে বহিয়া আসিয়াছে, সেই স্রোতের গতিরোধে মুসলমান সমর্থ হয় নাই। জীবন সংগ্রামে হিন্দু-সমাজ মুসলমানের নিকট পরাস্ত হয় নাই। রাজনৈতিক প্রাধান্য কিছু দিনের জন্য গিয়াছিল বটে; কিন্তু সেই বা কয় দিনের জন্য? সে অতীত কথা স্মরণে আর প্রয়োজন নাই। *

---

* প্রচলিত ইতিহাসগুলিতে এইরূপ একটা সংস্কার জন্মাইয়া দেয় যে, মুসলমান অতি সহজে ভারতবর্ষ দখল করিয়াছিল। কিন্তু এই সংস্কারটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভারতবর্ষ জয়ে মুসলমান যেমন বাধা পাইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন পায় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দী-মধ্যে মুসলমান সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা জয় করে। পর শতাব্দীতে তাহারা হিস্পানি দেশ জয় করিয়া ফ্রান্সের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখানে চার্লস মার্ত্তেলের বাহুবলে পরাহত হইলেও পর শতাব্দীতে ক্রীট ও সিসিলি বিজয়ান্তে জগতের রাজ-ধানী রোম নগরে প্রবেশ করিয়া পল ও পীতারের সমাধিমন্দির লুণ্ঠন করে। একাদশ শতাব্দীতে জেরুসা-লেমের খৃষ্টীয় মন্দির ভূমিসাৎ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন খৃষ্টানেরা মুসলমানগণকে স্পেন হইতে তাড়াইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনি অটোমান তুর্কী প্রাচ্য রোম ধ্বংস করিয়া খৃষ্টীয় সমাজের বিস্তৃত অংশ অধীন করে। সমগ্র খৃষ্টান ইউরোপের দুইশত বৎসরের সমবেত চেষ্টায় মুসলমানের হস্ত হইতে জেরু-সালেমের উদ্ধারসাধন হয় নাই। আজি পর্য্যন্ত আর্মিনিয়া হইতে আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আদিম ঐতিহাসিক লীলাভূমি মুসলমানের করায়ত্ত; এবং খৃষ্টানের আদিম রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের সিংহাসনে চক্ষুশূল তুর্কী উপবিষ্ট।

নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান ভারতবর্ষ-প্রবেশে সাহসী হয় নাই। কাশিমের সিন্ধুদেশ আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। গজনীপতি মামুদের সময় কিছুদিন তাহারা ভারতবর্ষে উৎপাত করিয়াছিল মাত্র। যে সময়ে সেলজুক তুর্কের আদেশে খৃষ্টীয় যাজক কেশাকৃষ্ট হইয়া জেরুসালেম হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সাহাবউদ্দীন ঘোরী তিরৌরী ক্ষেত্রে ভগ্নদন্ত রাখিয়া পলায়ন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমান-অধিকৃত হয়। চতুর্দ্দশে আল্লাউদ্দীন বিন্ধ্যাচল পার হয়েন। ষোড়শ শতাব্দীতে সংগ্রামসিংহ পতিত পাঠানের সহায় হইয়া হিন্দুস্থানের আধিপত্য জন্য মোগলের সম্মুখীন হন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আকবরশাহ হিন্দুসৈনিক হিমুর হস্ত হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন ও হিন্দু রাজার সাহায্যে বঙ্গ, উৎকল ও কাবুল বিজয় করেন। সেই সময়েই মুসলমান জুটিয়া বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে মেবারের রাণা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন। সপ্তদশ শতাব্দী অতীত না হইতেই রাজ-পুত ও মরাঠার হস্তে আরঙ্গজীব বাদশাহকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায় মরাঠা মুর্শিদাবাদের রাজকোষ লুঠ করিতেছে ও দিল্লীর দরজায় করাঘাত করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাহেনশাহ বাদশাহ সিন্ধিয়ার প্রসাদভোগী বন্দী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরাজ মরাঠা ও শিখের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ জয় করেন। ১৮৫৮ সালে ইংরাজ কোম্পানী হিন্দুরমণী ঝান্সীর রাণীর শোণিত পাত করিয়া ভারত-বিজয়-কাহিনীর উপসংহার করেন। ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানী কার্য্যতঃ দেশের প্রভু হইলেও আইনমতে দিল্লীর বাদসাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই বৎসর বাদসাহ ও কোম্পানী উভয়েরই বিলোপ ও বিক্টোরিয়ার রাজত্বের আরম্ভ হয়।

মূল প্রস্তাব হইতে আমরা কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। নীতিশাসন, রাজশাসন ও ধর্ম্ম-শাসন তিনেরই উদ্দেশ্য এক। সমাজকে বাঁধিয়া রাখা, সমাজের গায়ে বল দেওয়া, সমাজকে জীবনযুদ্ধে সমর্থ করা তিনেরই একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সামাজিক ব্যক্তিগণ আপন আপন স্বাতন্ত্র্য কতক পরিমাণে পরিহার করিতে বাধ্য। প্রবৃত্তির দমন আবশ্যক। সাধারণের কল্যাণের জন্য নিজ স্বাধীনতার সংযমের প্রয়োজন। মনুষ্য প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল নীতির শাসনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। দুর্ব্বল মনুষ্য-প্রকৃতিকে বিভীষিকা দেখাইয়া শাসনে রাখিতে হয়। সেই বিভীষিকার কোন যুক্তিযুক্ত মূল না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজজীবন রক্ষার জন্য সেই বিভীষিকা প্রদর্শনের আবশ্যকতা। এইজন্য রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন আবশ্যক। সমাজের জীবনরক্ষার্থ উভয়েরই উপযোগিতা। যেখানে রাজশাসন পরাভূত, সেখানেও ধর্ম্মশাসন বিমুখ হয় না। একে যাহা পারে না, অন্যে তাহা পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই হিসাবে ধর্ম্মশাসনের উপযোগিতা বুঝিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক অস্পষ্ট অধ্যায় স্পষ্ট হয়। অন্ততঃ ইউরোপে খৃষ্টানের ইতিহাস এই হিসাবে না বুঝিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। ক্যাথলিক কর্ত্তৃক প্রোটেষ্টাণ্টের নির্য্যাতন, প্রোটেষ্টাণ্টগণের পরস্পর উৎকট বৈরসাধন, ইউরোপের রাজগণের প্রজামধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক একতা রক্ষার জন্য উৎকট প্রয়াস, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া খৃষ্টীয় সমাজের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন, বিসংবাদ ও বিরোধ, এই হিসাবে না দেখিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। নীরো হইতে দায়োক্লিশিয়ান পর্য্যন্ত সম্রাট্‌গণের প্রাচীন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নূতন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন, কনস্তান্তাইনের পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণের প্রাচীনপন্থীদের প্রতি ততোধিক অত্যাচার, থিয়োদোসিয়সের আদেশে রোমের পুরাতন দেবমন্দিরের ও জস্তিনিয়ানের আদেশে এথেন্সের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক চতুষ্পাঠী সমূহের উচ্ছেদসাধন, ঠিক এইরূপ হিসাবেই বুঝা যায়। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর খৃষ্টান ইউরোপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজকে বহুদিন ধরিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান ও পশুবলে বলীয়ান্ তাতার ও মোগল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সহিত জীবন-দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই খৃষ্টীয় সমাজে রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন উভয়েরই সম্মিলন। প্রাচ্য রোমে সম্রাটের ও প্রতীচ্য রোমে পোপের অপ্রতিহত প্রভাব। যে এই প্রভুত্বের বিরোধী, সে সমাজের বিদ্রোহী। তাহার বিদ্রোহের মার্জ্জনা নাই। কুঠারাঘাতে তাহার মুণ্ডপাত কর; তুষানলে তাহাকে দগ্ধ কর। আবার সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা; পরস্পর তাহারা উন্মত্ত জীবনসমরে নিরত। সমগ্র সমাজকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখা দরকার; নতুবা জীবন-সমরে জয়ের সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখানে উন্মত্তের প্রলাপবাণী। রাজার নিকট ও যাজকের নিকট সকলকে আজ্ঞাকারী থাকিতে হইবে। রাজাই অনেক স্থলে যাজকমণ্ডলীর শীর্ষস্থিত; তিনি একাধারে রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তির অধিষ্ঠানস্থল। টিউডরের সময়ে ইংরাজ পোপের অধী-

নতাপাশ ছিন্ন করে। একের নিকট স্বাধীনতালাভ ঘটিলেও অপরের অধীনতাপাশ প্রজা-গণকে বদ্ধ করে। অষ্টম হেনরীর সময়ে ও এলিজাবেথের সময়ে প্রজাগণের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মগত স্বতন্ত্রতা একেবারে লুপ্ত হয়। ষ্টুয়ার্টগণের সময়েও অধীনতার ভার আরও বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রজাবিদ্রোহ ঘটে। ক্রম্‌বেল রাজার শোণিত পাত করেন, কিন্তু প্রজাকে স্বতন্ত্রতা দেন নাই। অধীনতার কেবল মূর্ত্তিভেদ ঘটিয়াছিল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরাজের রাজনৈতিক বা ধর্ম্মগত স্বাধীনতা ছিল না। ইংলণ্ডের যে ইতিহাস, অন্যান্য রাজ্যেও সেই ইতিহাস। সর্ব্বত্র রাজা ও পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া প্রজার স্বাধীনতা বিলো-পের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। ইতিহাস এই কাহিনী সর্ব্বত্র গাহিয়াছে। এখনও সেই কথার সমাপ্তি হয় নাই।

রাজশাসনের সহিত ধর্ম্মশাসনের এইখানে সম্বন্ধ। রাজা স্বৈরাচার দুর্বৃত্ত হইতে পারেন; কিন্তু যতক্ষণ তিনি রাজা, ততক্ষণ তাঁহার আদেশ পালনে তুমি বাধ্য। তাঁহার আদেশ ন্যায়-বিগর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি তোমার প্রাণ-দণ্ড। বর্ত্তমানকালে রাজাদেশের সমালোচনায় প্রজার অধিকার জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রথমে আদেশ পালন কর, পরে তাহার সমালোচনা করিও। ধর্ম্মের শাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। ধর্ম্ম হয়ত ন্যায় বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, জ্ঞানের অন্তরায়। উপায় নাই। ধর্ম্মের অনু-শাসন পালন কর; নতুবা তুমি সমাজদ্রোহী। সমাজের জীবনের কাছে তোমার জীবনের মূল্য নাই। তুমি ধর্ম্মদ্রোহী; তুমি সাধারণের শত্রু। তোমার প্রাণদণ্ডই ব্যবস্থা।

রাজা তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারেন; সমাজ তোমাকে ছাড়িবে না। তোমাকে নির্য্যাতন ও নিপীড়ন করিয়া সাধারণের চিরক্ষুণ্ণ মার্গে তোমাকে ব্যবস্থিত রাখিবে। তোমাকে উন্মার্গগামী হইতে দিবে না। তোমার যুক্তি, তোমার নীতি তুমি দূরে রাখ। আগে সমাজের আদেশ পালন কর। নতুবা তুমি সমাজদ্রোহী। রাজা দুশ্চরিত্র; তাঁহার চরিত্রের উপর তোমার শ্রদ্ধাভক্তি না থাকিতে পারে। তথাপি তিনি তোমার নমস্য। তাঁহার দর্শনলাভ তোমার সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জানু পাতিবে ও শিরোবসন উন্মোচন করিবে। প্রচলিত ধর্ম্মে তোমার আস্থা না থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দাও। কপটচারিতা অবলম্বন কর। কপটাচারে তোমার আত্মার অবনতি হইতে পারে। কিন্তু তোমার আত্মার উন্নতিতে সমাজের স্বার্থ নাই। সমাজ নিজের জীবন রাখিতে চাহে। তাহার স্বার্থ ও তোমার স্বার্থ এক নহে। নীতিবিৎ, তুমি শঙ্কিত হইও না। প্রকৃতির নিদেশ এই। দ্বন্দ্ব, নির্ম্মম নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব যেখানে জীবের অভিব্যক্তির ও উন্নতির একমাত্র উপায়, অধর্ম্ম হইতে যেখানে ধর্ম্মের উৎপত্তি, সে জগতে নীতিবিদের প্রিয় সিদ্ধান্তের সর্ব্বত্র স্থান নাই।

প্রচলিত উপাসনা-প্রণালীসমূহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে হর্বর্ট স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা যে মত প্রকাশ করেন, তাহা রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসনের মধ্যে উল্লিখিত সম্বন্ধেরই সমর্থনা করে। বর্ব্বরসমাজে বলবান্ ব্যক্তি রাজা। তাঁহার আদেশপালন ও

তাঁহার প্রসাদন আবশ্যক। তাঁহার বিরাগের ফল প্রাণদণ্ড। বর্ব্বর-সমাজে রাজপূজা প্রচলিত। রাজা মরিয়াও মরেন না। মানুষ মরিয়াও মরে না। তাহার আত্মা আসিয়া মাঝে মাঝে দেখা দেয়। প্রেতের আত্মারও উপাসনা ও প্রসাদন আবশ্যক। ইহা হইতে প্রেত পূজার উৎপত্তি। প্রেতের শক্তির সীমা নাই। জড়প্রকৃতির উপর প্রেতের ক্ষমতা অনির্দ্দেশ্য ও সীমারহিত। প্রেতকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। জীবন্ত রাজা সামাজিক প্রেতপূজার প্রধান যাজক। রাজাই প্রধানতম পুরোহিত। রাজার সহিত প্রেতের কথাবার্ত্তা চলে। রাজা প্রেতের প্রতিভূ। প্রেতপূজা হইতে দেবপূজার উদ্ভব। দেবতা ও উপদেবতার প্রভেদ মর্য্যাদাগত। মূলতঃ উভয়ে একজাতীয়। মহাদেব ভূতগণেরও অধিপতি। যক্ষগন্ধর্ব্বাদি পিশাচগণের সজাতীয়। নারদ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব হইলেও তাঁহাদের দেবত্বে কেহ সন্দেহ করে না। বিজিত জাতি জেতৃজাতির দেবতা গ্রহণ করে। জেতার দেবতা বিজিতের দেবতার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। দেবতাগণের মধ্যে ক্ষমতানুসারে পদবীনির্দ্দেশ হয়। দেবতাদের মধ্যে সমাজের সৃষ্টি হয়। বাদবিসংবাদ যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। মহাদেব বা জেহোবা বা পরমেশ্বর সকল দেবের ও উপদেবের অধিপতি। অসুরগণ দেবগণের চিরশত্রু। শয়তান জেহোবার প্রতিদ্বন্দ্বী। এঞ্জেল ও আর্কেঞ্জেল প্রভৃতি জেহোবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। ঈশ্বর দেবগণের রাজা, তিনি নরগণেরও রাজা, তিনি জগৎসংসারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার আদেশে জগৎসংসার চলিতেছে। মর্ত্ত্যে ভূমিপাল তাঁহার প্রতিনিধি। যাজক ও পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহার আদেশপ্রচারে ও সন্তোষসাধনে নিরত। সুরেন্দ্রগণের মাত্রা লইয়া নৃপতির নরদেহ নির্ম্মিত। রাজার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ। নীতির মূল ঈশ্বর; নীতির স্থাপয়িতা ও রক্ষাকর্ত্তা রাজা। রাজাদেশ ও ঈশ্বরাদেশ উভয়ের পালন প্রজার প্রথম কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনে দ্বিধা করিও না। পরকালে কুম্ভীপাক ত আছে; তাহা বলিয়া ইহলোকে তুষানল ও কুঠারও কি অস্তিত্বহীন হইবে? রাজার অস্তিত্ব তবে কিসের জন্য?

প্রেতপূজা হইতে পিতৃপূজা, দেবপূজা, ঈশ্বরপূজার উদ্ভব এইরূপে কতকটা বুঝা যায়। প্রেতের প্রসাদন হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তিও বুঝা যায়। অনেক দেবতা প্রাকৃত শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। মনুষ্য পরলোকগত আত্মার পূজা করে; আবার চন্দ্রসূর্য্য, জলবায়ু, নদী পর্ব্বতেরও উপাসনা করে। প্রেতপূজা হইতে প্রকৃতিপূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল ভাল বুঝা যায় না। হর্বর্ট স্পেন্সার বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন; কিন্তু তাহা সন্তোষকর নহে। মক্ষমূলর প্রকৃতিপূজার অভিব্যক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাও সন্তোষজনক নহে। স্পেন্সরের সহিত মক্ষমূলরের যে বিতণ্ডা চলিয়াছিল, তাহার সমালোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তাহা হইতে নিরস্ত থাকিলাম।

মনুষ্যকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে। সমাজের আদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও মানিতে হইবে। সামাজিক জীব সমাজের অধীন। এই অধীনতার সীমা কোথায়, তাহার সদুত্তর নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার মীমাংসার প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এক সম্প্রদায়কে সেই সীমারেখার এক পার্শ্বে রাখে; মনুষ্যের সমাজবশ্যতা অন্য সম্প্রদায়কে অন্য পার্শ্বে রাখে। স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল উভয় সম্প্রদায়ে চিরন্তন বিরোধ। বিরোধের মীমাংসা কখন হয় নাই; কখন হইবে কি না জানি না। কিন্তু এই সনাতন বিরোধের ফলে সেই সীমা-রেখা ক্রমশঃই সরিয়া গিয়াছে। বিরোধের ফলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও সমাজগত চরিত্রের ক্রমেই উন্নতি ঘটিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী। বিরোধ না থাকিলে বোধ হয় উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে ঘটিতে পারিত। অথবা প্রকৃতির বুঝি ইহাই নিয়ম। বিরোধই বোধকরি উন্নতির ও অভিব্যক্তির একমাত্র বিধিনির্দ্দিষ্ট উপায়।

JOTIND
JA

কদম্ব-সুন্দরী।

হ্যা দেখ, তোমরা কেহ যাও যদি কভু
মথুরায়, তীর্থ-ফল-রসাস্বাদ-আশে,
অথবা অজস্র-স্থান-দরশন-যশে
হইবারে যশস্বী; হেরি মন সাধে
পর-পারে মনোহর সুন্দর "গোকুল"
(যমুনা, দুকূল সম বেড়িয়াছে যারে!)
"শ্যাম-কুঞ্জ", "নন্দগ্রাম", "চারু বৃন্দাবন"
"নিধুবন" "ব্রজবন" "গিরি গোবর্দ্ধন"—
—হেরি সব এই দৃশ্য আনন্দে আকুল,
ভুল না ভুল না কভু করিতে উজ্জ্বল
দুই চক্ষু, নিরখিয়া "কদম্ব-সুন্দরী"
"কেলী-কদম্বের কুঞ্জে" যমুনার ধারে!
আর যদি হও তুমি বঙ্গের সন্তান,
বঙ্গের সাহিত্য-রসে হও যদি তুমি
রসবান, পাণ্ডা-মুখে "বিদ্যাপতি" নাম
শুনি হর্ষে, নাচে যদি তোমার ধমনী,
(বিদ্যাপতি শুক্রতারা কবিতা-আকাশে!
বিদ্যাপতি কলপিক চির মধুনাদে!)
অবশ্য হেরিবে তুমি, বিনা অনুরোধে,
কেলি-কদম্বের কুঞ্জে কদম্ব-মোহিনী!
কেলি-কদম্বের কুঞ্জে যত তরু আছে,
প্রতি কদম্বের মরি বাকলে বাকলে,
লেখা আছে শ্রুতি-মধু প্রেমের কাহিনী!
পাণ্ডারা তোমার গলে বরগুঞ্জমালা
দোলাইয়া, শুনাইবে সে সব কাহিনী!

* * *

কোন্ কদম্বের তলে (গভীর তিমির,
বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্, দলকে দামিনী!)
রাধিকা সুযোগ বুঝি, সখী-ছাড়া হয়ে,
মিলিলা একান্তে আসি শ্রীকান্তের সাথে!
উপরে বিদ্যুৎ-মেঘ, ভূতলে আমরি
নব জলধর-কান্তি, স্থির সৌদামিনী!

* * *

কোন্ কদম্বের তলে, চন্দ্রাবলী-কাণে
রঙ্গে দিলা দোলাইয়া কদম্ব-ঝুমুকা
প্রেমাদরে রসোরাজ;—সে সুরঙ্গ হেরি
অঙ্গভঙ্গে নাচে রঙ্গে ময়ূর ময়ূরী!

* * *

কোন্ কদম্বের তলে রাধা বিরহিণী
পঞ্চ দিন পঞ্চ নিশি, অজ্ঞান হইয়া,
পালিলা বিরহ-ব্রত, শিহরি শিহরি,
সে অশ্রু-পরশে মরি যত পুষ্পরাশি.

গেল ঝরি ; আহা! শোক-খিন্ন তরু
আর নাহি মুঞ্জরিল ; সেই দিন হ'তে
চিরতরে বিসর্জ্জিল মুকুল মঞ্জরি!

* * *

কোন্ কদম্বের তলে, শ্রাবণের দিনে,
(গুরু গুরু ঘন মেঘ গগনে গরজে!)
গোপিনীরা মহোল্লাসে, কাঁচলি আঁটিয়া,
দীঘল আঁচল যত্নে বাঁধি নিতম্বিনী
কটিতটে, হিন্দোলায় উঠিয়া বসিয়া
গাহিছে বর্ষার গীতি ; বাজিছে কঙ্কণ,
নূপুর-শিঞ্জন ; ছুটিছে হাসি-তরঙ্গ
তালে তালে ; ত্বনয়নে বিদ্যুৎ খেলিছে!
হেনকালে অকস্মাৎ মড়্ মড়্ করি
একি শব্দ! ভয়াকুলা দেখিলা চাহিয়া
গোপাঙ্গনা, অর্দ্ধভগ্ন কদম্বের শাখা—
এখনি ভূতল-লগ্ন হইবে হিন্দোলা!
কেহ চীৎকারিল উচ্চে, কেহ দড়ি ছাড়ি
পড়ি গেল হিন্দোলায়, কেহ গেল মূর্চ্ছা!
—গোপাঙ্গনা-পুষ্প মাঝে ফুল্ল-কমলিনী,
গোপিনী-মণির-মাঝে কহিনুর-মণি,
ব্রজ-আনন্দ-দায়িনী, স্মরিয়া কেশবে,
কহিলা "রক্ষ হে নাথ, রক্ষ এ দাসীরে,
—বিপদ-কালের বন্ধু দীন-বন্ধু কোথা?"
আইলা পুণ্ডরীকাক্ষ, হাসিয়া হাসিয়া
পর্শিলা তরুর দেহ, ভগ্ন শাখা মরি
হ'ল লগ্ন, দূরে গেল গোপীর কুস্বপ্ন!
ফিরে এল উচ্চ হাসি, হিন্দোলে দোলন,
নয়নে নয়নে কথা প্রেম-আলাপন!

* * *

এত বলি সুচতুর পাণ্ডা, সুগম্ভীরে,
দেখাইবে তোমা সেই ভগ্ন-শাখা-চিহ্ন,
সন্ধি-স্থলে ; তুমি কিন্তু হেঁস না'ক হাসি
বিদ্রূপের ; হে ধীমান, জান না কি তুমি,
ক্ষুধার্ত্ত আত্মার ইহা অমিয় সমান
সুখাদ্য? বালক যথা আরসি নিরখি,
চুম্বি প্রতিবিম্ব-মুখ পায় মহাসুখ,
তেমতি সত্যের ছায়া, মধুর কল্পনা,
বিতরে অতুল সুখ নর নারী-চিতে!
অজাগর সর্প যথা চন্দন তরুরে
আবেষ্টিয়া, হলাহল সধুম, উগারে,
নর-চিত্তে অবিশ্বাস-পন্নগ তেমতি!
শৈশবের সরলতা হারায়ে ফেলেছি
না জানি কি পাপে! কবি যদি বলে
"নক্ষত্র-কুসুম ওই ফুটেছে আকাশে,
"জ্বল্ জ্বল্ ত্বলি ত্বলি মন্দাকিনী-জলে
"ভাসে ওই দীপাবলি! দেয়ালি-উৎসবে
"মাতিয়াছে বুঝি যত দেবের অঙ্গনা"—
শুনি কথা (মূর্খ-কবি-বাতুল প্রলাপ!)
হেসে মোরা হই সারা, বুদ্ধি-বিমাতার
শ্রী-চরণে দিই মোরা অর্ঘ্য-উপহার!

* * *

সখা হে, মিনতি করি, মনে কর সেই
সরস শৈশব-কাল ; ঊষায়, প্রদোষে,
চাঁদনি-নিশীথে, শশব্যস্তে টানি শ্বেত
অঞ্চল, বৃদ্ধা পিতামহী-মুখে কত কি
শুনিতে! বিষাদ-হর্ষে হাসিতে কাঁদিতে!
এবে তুমি গৃহে ফিরি নিশীথে, প্রদোষে,
ক্লান্ত-দেহে, তব এই যৌবন-বসন্তে
(মম এই অনুরোধ) আবার শুনিও
বৃদ্ধা পিতামহী-মুখে অলীক কাহিনী
সেই সব, সেই সব আষাঢ়ের কথা!
বুঝিবে তখন সখে কল্পনা রঙ্গিনী
কত যাত্ন জানে, কিবা সুধারাশি ঢালে
বাঙালির দাবদগ্ধ মুমূর্ষু-পরাণে!

* * *

এই তরু—দেখিছ না? সম্মুখে তোমার
আপাদমস্তক ওর ছাইয়া গিয়াছে
ফুলে ফুলে। কি লাবণ্য! হয়েছে ধরণী
ধন্য, ধরি ওরে বক্ষে—শিহরি শিহরি,
মরি মরি, যেন তরু নব পুষ্পান্বিত
হইতেছে পলে পলে চক্ষের উপরি
তব, যেন বিরহিণী প্রকৃতি-রাধিকা,
শুভক্ষণে নেহারিয়া মদন-মোহনে,
পুলক-রোমাঞ্চে ভরা, পীন-পয়োধরা,
প্রফুল্লিত-কলেবরা, যৌবন-মাধুর্য্যে,
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে! ধরিয়াছে বনলক্ষ্মী
যেন, আপনারি হস্তে, ব্রজ-ভূমি-শিরে,
সুবিচিত্র আতপত্র পরম কৌতুকে!
ইহারো কাহিনী আছে—শোন মন দিয়া,
ধর্ম্ম-কথা পাণ্ডা-মুখে। আহা কর্ম্ম-ফলে
এ তরুটি ছিল সদা, দীন হীন বেশে,
(তরু-রাজ্যে মরু যেন) পর্ণ-পুষ্প-হারা!
তার পর, এক দিন, পুণ্যপুঞ্জ-ফলে
রাধিকার, পূর্ণ হ'ল কুসুমে কুসুমে!
সুন্দর কাহিনী সেই! এমনি বাদর!
গর্ভিণীর তৃপ্তিকর সুন্দর সুগন্ধ
হিল্লোলে উঠিতেছিল মেদিনী হইতে!
কুঞ্জে কুঞ্জে তপাসিয়া মদনমোহনে
বিরহিণী, ক্লান্ত হয়ে বসিলা আসিয়া,
পত্রপুষ্পহীন আহা এই তরুতলে—
খিন্ন-মনে, ছিন্ন যেন সরসী-নলিনী!
রাধিকার অশ্রুজল ঝর্ ঝর্ ঝরে
পড়িল তরুর মূলে, প্রাণ শূন্য তরু
তবু অচৈতন্য! ব্রজাঙ্গনা আঁখি মুদি
ধ্যানে হইলা মগনা, যথা পুরাকালে,
হে ভবেশ, তব তরে পার্ব্বতী সুন্দরী
করিলেন মহাধ্যান হিমাদ্রি-শিখরে!

* * *

আইল প্রদোষকাল—সন্ধ্যার প্রদীপ
ঘরে ঘরে লাগিল জ্বলিতে ; ধ্যান ভঙ্গে
রাধা, হে [illegible] —রত্নের দেউটি
জ্বলিছে [illegible] তার
সুন্দরী রমণী-মূ[illegible]
[illegible] কেশ!
জ্বলিছে কাঞ্চনে যেন [illegible]!
ত্নটি চক্ষু নীলমণি-প্রভা ;
নীলাম্বরী সাটী, বরাঙ্গের স[illegible]
মিশি, জলে জল যথা! কর-যুগে
প্রস্ফুটিত নীল-পদ্ম, মৃণাল-বাঁশরি!
ঈষৎ মুচকি হাসি, কহিলা মূরতি
গোপিনীরে, "ব্রজাঙ্গনে চিনিতে নারিলে
মোরে, তপন-নন্দিনী আমি, যমুনার
অধিষ্ঠাত্রী দেবী— এই লও আনিয়াছি
তব তরে মৃণাল-বাঁশরি" এত বলি
দেবী, অদৃশ্য হইলা।
সুস্বপ্ন হেরিলে,
খেলে যথা মৃত্ন হাসি সুপ্তের অধরে,
হাসিলেন হরি-প্রিয়া ; তুলি সে মুরলী,
পরীক্ষিলা মহাহর্ষে উলটি পালটি
কতবার। তার পরে অধরের রন্ধ্রে,
বাঁশরির রন্ধ্র মিলাইয়া, আন্মনে
(যেন গো স্বপনে) বাজাইলা। একি লীলা!
কি কুহক জানে এ বাঁশরি! আইলেন
পীতাম্বর হাসিতে হাসিতে, সখাগণ
গাহিতে গাহিতে, গোষ্ঠ-গীতি ; ব্রজনারী
সারি সারি, মুখরিত কাঞ্চী ও শিঞ্জিনী,
আবীর-কুঙ্কুমে-মাখা লালে লাল সাড়ি,
আঁখি ঠারি, রঙ্গভঙ্গে গাহিতে গাহিতে,

আসি উপস্থিত তথা চক্ষের নিমেষে !
একি মহোৎসব ! বুঝি আবার আইল
দোল পূর্ণিমার দিন গোপ-গোপী-মাঝে ?
কি কুহক ! সে আনন্দে শিহরি শিহরি,
ভরি গেল পত্রপুষ্পে কদম্ব-ত
লো বাসন্তি, তোর
হরষে কি জা ...লতা !

*   *

হেরি শুনি ... যদি ক্লান্ত,
অগ্রসরি ... তরু-কুঞ্জে
(বৃহৎ ... যমুনার ধারে !)
চারিধারে পিয়াল ও তমালের রাজী,
জটাজূটময় কত বট ও অশ্বথ
(নিত্য সনাতন তরু) শিরিষ, বকুল,
অসংখ্য কদম্ব আর দেবদারু তরু,
ক্ষীরফল, আম, জাম, রসালের শ্রেণী—
(যেন কোন নরপতি, দূরদেশ-বাসী,
আসি এই বৃন্দাবনে, তীর্থ-দরশনে,
করেছে স্থাপন মরি নয়ন-রুচির
এ শিবির !) হেরি নীর নীল কালিন্দীর,
প্রক্ষালিও হস্তপদ ; তার পরে যদি
থাকে মতি তব তাম্র-কূটে, জোগাইবে
পাণ্ডা, মহাযত্নে, খম্বীরা তামাকু চারু,
সরু "হুঁক্কা" অনুচ্ছিষ্ট—অভীষ্ট যেমতি
তোমার ; তুমিও রঙ্গে ধূম্রপান করি,
(লো হুঁকে, নিদ্রার সখি, শান্তি-সহচরি,
তোর ঐ চক্রাকার ধোঁয়ার পরিধি
চক্রে চক্রে আনে সুখ-শান্তি, ক্লান্তি করি
দূর, শূন্য তুল্য করি, চিরদুঃখীজনে
বঙ্গের !) তুমিও রঙ্গে হেরিও সলিলে
কচ্ছপের জলক্রীড়া, আর তরুশিরে
মহাহৃষ্ট বানরের দন্ত-খিচিমিচি !

*   *   *

ঐ যে দেখিছ উচ্চে সুগ্রীব রাজার
বংশধর ; সারি সারি, বৃহৎ লাঙ্গুল
কাহারো, কাহারো ক্ষুদ্র—বুদ্ধিতেও ওরা
উজ্জ্বল উপাধি-ধারী ! ছলে ও কৌশলে
রাজস্ব আদায় করে যাত্রীদের কাছে !
ঘাটেতেও দুই চারি মুদির দোকান
আছে তথা (পরামর্শ ভুল না, ভুল না) ;
কিছু তথা ক্রয় করি, রাজস্ব স্বরূপে
দিও তাহা বানর-রাজারে ; তা না হ'লে
হইবে দুর্গতি বড়, পরম লাঞ্ছনা !
আমি যবে গিয়াছিনু, দেখিলাম তথা
যাত্রী এক, মহা রুক্ষ আকৃতি প্রকৃতি,
অহিন্দু বাঙ্গালি-মূর্ত্তি, গৌরাঙ্গের বেশ,
ধরিত্রী মুষ্টিতে তার, সর্ব্বক্ষণ মুখে
হুতাশন, শ্রীমুখে সিগার, হস্তে শোভে
বর্ড্স্ আই,—আমি যবে বানরবৃন্দেরে
দিলাম দক্ষিণা, চাহিয়া বাবুর দিকে
করিনু ইঙ্গিত দিতে কিছু।
"ড্যাম ইট" !
আমি ত অবাক্ ! অগতির গতি সেই
শ্রীমধুসূদন, বিপদ-সিন্ধুর তরী,
দীনবন্ধু, দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ,
ডাকিলাম তার-স্বরে অন্তর-অন্তরে
তাঁরে। শুনিলা শ্রীহরি—দলে বলে নামি
আইল বানর-দল, কাড়ি নিল যত্নে
বঙ্গ-রত্নে দিয়ে ফাকি সিগার তাঁহার
আর তাঁর bird's eye।
তার পর বাবু
হুইস্কি ও সোডার মতন মুখখানি
করি, কি হেরিলা ? হায় শিক্ষানবিশেরা
মহাসুখে টানে ধূম বৃক্ষ-শাখে বসি !

বাবু হইলা ক্রোধান্ধ, "Damn beast" বলি
দিলা গালি ;—শাখামৃগ কিচিমিচি করি
আবক্ষলম্বিত সেই দাড়ির উপরে
বাবুর, ফেলিয়া দিল জ্বলন্ত সিগার !
অনল্প পুড়িয়া গেল দাড়ি, অতি অল্প
হয়ে গেল অর্দ্ধদগ্ধ ; প্রশান্ত বাবুটি
চাহিলেন উর্দ্ধদিকে, হতবুদ্ধি হয়ে,
দাড়িগুলি গেছে উড়ি পাখী হয়ে যেন !
চতুর্দ্দিকে হাস্যরোলে আর গণ্ডগোলে
ঘাট হৈল পরিপূর্ণ ; মর্কট-মণ্ডলি
হয়ে মহা কুতূহলি, করিতে লাগিল
আরো উচ্চে মুখভঙ্গি ; পাণ্ডারাও তথা
মহারঙ্গী, যার তার ললাটে আহ্লাদে
দিল ফোঁটা ; দুষ্ট এক বৈষ্ণব বালক
ছিল তথা, গাহিল সে তান মান লয়ে—
"হদ্দ মজা দুনিয়ার !
কৃষ্ণ-বধ হৈবে কোথা,
কংস-বধ হৈল সার ;
হদ্দ মজা দুনিয়ার !"
যথা যবে রঙ্গালয়ে লাগিলে আগুন,
আশঙ্কায় মরি, হুড়াহুড়ি করি, ছাড়ি
গ্যালারি ও পিট্, তাড়াতাড়ি বাহিরায়
সবে, অভিনেতা আর দর্শকমণ্ডলি,
চেয়ারে বেঞ্চেতে আর মানুষে মানুষে
হয় মুখামুখী, মুণ্ডে মুণ্ডে ঠকাঠকি,
চতুর্দ্দিকে উতরোল ভীম গণ্ডগোল
(খুলে গেছে দ্বার যেন বাতুল-আশ্রমে !)
সেইরূপ বাবুটির দাড়ির দগধে
বহিল তুমুল ঝড় ; পড়িয়ে তুফানে
সে রহস্য কাহিনীর নায়ক সুধীর
দ্রুত, হইলা বাহির !

*

শঙ্কা হয় মনে
পাছে নিন্দা বলে (হায়, মার্জ্জারের ভীতি
যথা কপোতের বক্ষে, তেমতি এ শঙ্কা !)
পাছে নিন্দা বলে "হে কবি, এ তব রীতি
কি রূপ ? রুচির মাথা খাইয়া কেমনে
এ গম্ভীর বর্ণনায় ব্যঙ্গের কাহিনী
আনিলে ? সভার মাঝে সংযত-প্রকৃতি
যেন কোন শিষ্ট লোক, হঠাৎ, সহসা
আরম্ভিল নৃত্য।"
সত্য ; মিথ্যা কভু নহে
হে বিজ্ঞ সমালোচক—অনিত্য সংসারে
এমনিই প্রকৃতির রীতি ! বসন্তান্তে
নিদাঘ যেমতি ; দিনান্তে রজনী ; শুভ্র
জ্যোতিঃ—তার পাছে ছায়া! তুমি কি জাননা
পতিহীনা হয়ে উন্মাদিনী, শব-বক্ষে
করে নৃত্য ? গৌরাঙ্গীর রূপরাশি ধরে
অতুল ঔজ্জ্বল্য, শ্যাম স্নিগ্ধ সাটি পরি,
জান না কি তুমি ?
জানি না, জানি না আমি
মূর্খ আমি ;—জানি শুধু প্রদীপ জ্বালিয়া,
নিশীথে, (গৌরাঙ্গী সে ; রূপে গুণে সে গো
অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী !) জানি গো হেরিতে,
জ্ঞানশূন্য হয়ে, তার সুন্দর চিবুকে
আহা মূল্য-হীন তিল্ (শশাঙ্ক-কলঙ্ক !)
অতুলনা ভবে !
সম্পাতে ছায়ালোকের
শাস্ত্রী যে, সে দার্শনিকে সুধাইও চুপে,
কেন হেন পাপপুঞ্জ এ মঙ্গল-ভবে ?
কেন হেন গ্লানি আহা কমলের হাস্যে ?
শিশু-আস্যে ? কেতকীতে ? যুবতি-যৌবনে ?

*   *   *

আমি শুধু (কবি আমি) অবাক্ হইয়া,

হয়ে মাতোয়ারা, সেফালি-সৌরভে ; পিয়ে
সুধাংশুর সুধা, শারদী-নিশীথে ; হর্ষে
বসি চুপে, সেফালির সৌরভ-মণ্ডলে,
চিন্তি যবে—এ জগতে সৌরভ ও প্রীতি,
রমণী-কণ্ঠের গীতি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না,
সবি এক ; মরি মরি একই মৃণালে
শত শতদল-গাঁথা !—সে মাহেন্দ্র ক্ষণে,
আমি হেরি মর্ম্মস্পর্শী সে লাবণ্য-মাঝে,
বিশ্বচিত্তহারী সেই সৌরভ-মণ্ডলে,
বসি এক বিহঙ্গম, গরুড়-আকৃতি,
মুহুর্মুহু উদ্গারিছে ধূম !—কৃষ্ণ ধূম
পুঞ্জ পুঞ্জ জলধরে, চক্ষের নিমেষে
সৃজিছে। কুঞ্জর-বৃন্দ ঐরাবৎ-শুণ্ড
আস্ফালিয়া, অনর্গল ফেলিছে ভূতলে
ভীম শব্দে জল রাশি !—গোমুখীর শৃঙ্গে
জলের কল্লোল যথা !—গিরি-গোবর্দ্ধনে
ইন্দ্রের আক্রোশ যথা, রক্ষিতে তুহারে
হে ব্রজ, ব্রজের নাথ, শক্র-দর্প-হারী,
হইলা যখন গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী !

(ক্রমশঃ)

সৌর-জগতের গতি।

গত বৈশাখের ভারতীতে "ছায়াপথ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার স্থল বিশেষে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে নক্ষত্রদিগের 'আপেক্ষিক গতি' (Proper motion) পর্য্যালোচনা করিলে সৌর-জগতের একটী নির্দ্দিষ্ট দিগ্বাহী গতি প্রতিপন্ন হয়।

রেলপথে চলিবার সময় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, যেদিকে রেলগাড়ী চলিতে থাকে সেইদিকের দূরস্থিত বৃক্ষ-শ্রেণীর প্রতি নেত্রপাত করিলে ইহা অনুমিত হয় যেন ঐ সকল বৃক্ষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে অপসারিত হইয়া যাইতেছে এবং রেলগাড়ীর গমনের জন্য রাস্তা পরিস্কার করিয়া দিতেছে। আবার অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা অনুমিত হইয়া থাকে যেন দূরস্থিত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত বৃক্ষসকল ক্রমে সন্নিহিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থিত ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে! গণিতজ্ঞের নিকট ইহার কারণ লুক্কায়িত নহে ;—কোন দূরস্থিত পদার্থদ্বয় হইতে নেত্রকেন্দ্রে রেখা টানিলে ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণদ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয়ের দূরত্ব নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এক্ষণে নেত্রকে ঐ পদার্থদ্বয় হইতে যতদূরে অপসারিত করা যাইবে উক্ত কোণের পরিমাণ ততই হ্রস্ব অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব ততই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। যদি নেত্রকে উক্ত পদার্থদ্বয়ের দিকে অগ্রসর করা যায়, তবে ঐ কোণের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ তাহাদের দূরত্ব ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতে থাকিবে।

নক্ষত্রজগৎ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগের মধ্যে ঐরূপ একটী গতি নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ঐ গতি এত সূক্ষ্ম যে তাহা বহু বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন প্রত্যক্ষ করা সাধ্যায়ত্ত

হয় না। যে প্রণালীতে ঐ গতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

রাত্রিকালে আকাশে নেত্রপাত করিলে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় যে, নক্ষত্রমালা পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছে। আমরা এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছি যে, ইহা আমাদের দৃষ্টিভ্রম মাত্র ; বস্তুতঃ পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহারই ফলে ইহা অনুমিত হয় যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে। আবার নক্ষত্রদিগের উদয়াস্তকাল অনুধাবন করিলে ইহা প্রত্যক্ষ হইবে যে, প্রত্যেক নক্ষত্রেরই উদয়কাল প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছে ; অর্থাৎ আজ কোন নক্ষত্রকে যে সময়ে উদয় হইতে দেখা যাইতেছে, কাল তাহকে তদপেক্ষা অগ্রে এবং তৎপরদিন তাহা হইতে আরও অগ্রে উদয় হইতে দেখা যাইবে। এই পর্য্যবেক্ষণ ফল হইতে দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে ;—(১) সমস্ত নক্ষত্রজগৎ সূর্য্য ও পৃথিবী উভয়কে একত্র যোগে বেষ্টন করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে। পর্য্যবেক্ষণ ফল আমাদিগকে ইহা প্রত্যক্ষ করাইতেছে যে হয়ত নক্ষত্রজগৎ পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমবাহী হইতেছে অথবা সূর্য্য স্বয়ং তাহার বিপরীত দিকে চলিতেছে। এ দিকে নক্ষত্রদিগের মধ্যে তাহাদের পরস্পরের সহিত স্থিতি তুলনা করিলে ইহা লক্ষিত হয় যে, গগনে এমত কতকগুলি তারকা আছে যাহারা সমস্ত নক্ষত্রজগতের উক্তবিধ গতিভিন্ন অপর একটী গতির পরিচয় দিতেছে ;—তাহারা আবার অপর সকল নক্ষত্রের তুলনায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখী গতিসম্পন্ন প্রতীত হইতেছে। নক্ষত্রজগৎ হইতে ইহাদিগকে পৃথক করিবার জন্য ইহারা গ্রহনামে আখ্যাত হইয়াছে ; এবং প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যকেও এই জাতীয় মনে করিয়া গিয়াছেন, এ কারণ হিন্দুমতে, সূর্য্য একটী গ্রহ! পৃথিবী নিবাসী কাহারও নিকট পৃথিবীর গতি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ; আবার গ্রহদিগের গতি একধারানিবদ্ধ নহে। তাহাদিগের গতি সমন্বয় করিলে পরস্পরের স্বতন্ত্র গতি প্রতীয়মান হয়। এ সকল কারণ হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, গ্রহগণ স্বস্ব পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে! আর্য্য ঋষিদিগের সময় হইতে টলেমির সময় পর্য্যন্ত এই মত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রাহ্য হইয়া আসিয়াছিল ; ভারতে এ পর্য্যন্ত তাহার খণ্ডন হয় নাই, কিন্তু ইয়ুরোপে কোপর্ণিকস্ প্রথমে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করেন। কোপর্ণিকসের পর গ্যালিলিও, তাহার পর কেপ্লার যথাক্রমে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, সূর্য্য স্বয়ং গ্রহ নহে ; অপরাপর গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। গ্রহদিগের গতিতে "চক্রত্বাদি" যে সকল বৈষম্য লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলাই ইহাদিগের একমাত্র কারণ। আবার ইহাও লক্ষিত হয় যে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলে যে ফল পর্য্যবেক্ষিত হইবে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলেও সেই ফলই ঘটিতে দেখা যাইবে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অপরা-

পর গ্রহগণ সকলেই যখন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে তখন পৃথিবীও ঐ গতিসম্পন্ন। কিন্তু ইহার বিশিষ্টতা আছে; চন্দ্রের গতিতে "চক্রত্বাদি" কিছুই নাই! ইহা হইতে চন্দ্রকে পৃথিবীর "উপগ্রহ" রূপে সিদ্ধান্ত করা হইল!

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতির মাত্রা যখন এই সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন জগতে নিউটন আবির্ভূত হইলেন। তিনি বিপুল "জ্যোতিঃ সাগর" মন্থন করিয়া সকল প্রকার গতির একমাত্র কারণ "মাধ্যাকর্ষণ" আবিষ্কার করিলেন। তখন ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, গুরু পদার্থ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলে লঘুপদার্থে গতি উৎপাদিত হইয়া থাকে। গ্রহদিগের সমস্ত গতিই সূর্য্য কর্ত্তৃক আকর্ষণের ফল; পৃথিবী ও সূর্য্য এতদুভয়ের মধ্যে সূর্য্যকে গুরু পদার্থ সিদ্ধান্ত করা হইল, অতএব দেখা গেল যে বস্তুতঃ পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে। গ্যালেলিও গগন-পর্য্যবেক্ষণার্থ প্রথম দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করেন; এবং দূরবীক্ষণদ্বারা তাঁহার প্রথম আবিষ্কার 'বৃহস্পতি গ্রহের চারিটী উপগ্রহ'! ইহা হইতে সপ্রমাণ হইল যে, সূর্য্যের চারিদিকে যেমন গ্রহগণ বিচরণ করিতেছে, তেমন গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ ভ্রমণ করিতেছে। আবার সূর্য্যের চারিদিকে যেমন কতকগুলি গ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমন এক একটী গ্রহের চারিদিকেও কতকগুলি করিয়া উপগ্রহ থাকিতে পারে; যথা, বৃহস্পতির চারিটী (অধুনা পাঁচটী), শনির আটটী, ইত্যাদি। এইরূপে সূর্য্যের শাসনাধীনে একটী "নক্ষত্র পরিবার" সৃষ্ট হইল, এবং ইহার নামকরণ হইল—"সৌর-জগৎ"! অতঃপর সৌর-জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় জ্যোতিষ্কের গতি পর্য্যালোচিত এবং তাহাদিগের কারণ নির্দ্দেশিত হইতে লাগিল!!

একদল জ্যোতির্ব্বিদ সৌর-জগৎ পর্য্যালোচনাতেই ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু অপর একদল পুনরায় নক্ষত্র-জগৎকে আক্রমণ করিলেন। পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণন ও সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ হেতু নক্ষত্র-জগতে যে গতি পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহা ভিন্ন নক্ষত্রদিগের অপর কোন গতি রহিয়াছে কি না তাহা নিরাকরণার্থ প্রত্যেক নক্ষত্র স্বতন্ত্রভাবে পর্য্যবেক্ষিত হইতে লাগিল। বহুবিধ পর্য্যবেক্ষণদ্বারা ইহা সপ্রমাণিত হইল যে, পৃথিবীর দৈনিক ও বাৎসরিক গতি বাদ দিলেও বৎসরে নক্ষত্রদিগের কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্থিতি বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে নক্ষত্রের 'স্থিতি' বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন পদার্থের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অপর কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বা তদানুষঙ্গিক নির্দ্দিষ্ট স্থানের সহিত দূরত্ব পরিমাপ দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া থাকে। সেই প্রকারে কোন নক্ষত্রের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধেও ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে "মহাবিষুব" (Vernal Equinox) হইতে বিষুবদ্বৃত্ত পথে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অংশকলাদি পরিমিত পথ চলিয়া তৎপর সোজা উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মুখে অপর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পরিমিত পথ অতিক্রম করিলে কোন নক্ষত্রের আবাসে উপনীত হওয়া যায়। বিষুবদ্বিন্দু হইতে বিষুবদ্বৃত্ত পথে পূর্ব্বাভিমুখে যে বৃত্তাংশ চলিতে হয় তাহাকে উপরোক্ত নক্ষত্রের "লগ্নভুজ" (Right

Ascension)* কহে। বিষুবদ্বৃত্তের উত্তর কিম্বা দক্ষিণাংশে যে পথ অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রের অবস্থিতিতে উপনীত হওয়া যায় তাহাকে ঐ নক্ষত্রের "লগ্নজ্যা" (Declination) বলা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন নক্ষত্রের লগ্নভুজ ও লগ্নজ্যা জানা থাকিলে তাহার স্থিতি অনায়াসে নির্দ্দেশিত হইতে পারে। কোন দুই নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণ ফল হইতে তাহার স্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া যদি দেখা যায় যে তাহাতে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তবে ইহা অনুমান করা যায় যে, নক্ষত্র উক্ত সময়ান্তরে স্থানবিনিময় বা গমন করিয়াছে। এই গতি সূক্ষ্ম হইলে মুক্তনেত্রে সহজে তাহা অনুভব করা যায় না। কিন্তু প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এবং চীন ও মিসরদেশীয় অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত রাশিচক্রের অন্তর্ভূত মূল নক্ষত্রদিগের এবম্বিধ সূক্ষ্মগতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার 'হেতু' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে ইহা লক্ষিত হইবে যে, যদি বিষুবদ্বিন্দু অল্পে অল্পে পশ্চাদপসরণ করিয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারা নক্ষত্রের স্বকীয় গতি ব্যতিরেকেও তাহার লগ্নভুজ বৃদ্ধি পাইবে। আবার বিষুবদ্বিন্দু বিষুবদ্বৃত্ত পথে না চলিয়া যদি অপর কোন পথে বক্রভাবে চলিতে থাকে, তবে তদ্দ্বারা নক্ষত্রের লগ্নভুজ ও লগ্নজ্যা উভয়েরই পরিমাণে ব্যত্যয় ঘটিবে। অতএব বিষুবদ্বিন্দুর গতিকে নক্ষত্রদিগের স্থিতি বিপর্য্যয়ের একটী হেতুরূপে গণ্য করা যাইবে। এক্ষণে ইহা বিশেষরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যভাগে যে স্ফীতাংশ আছে, তাহা পৃথিবীর কক্ষের সহিত বক্রভাবে অবস্থিতি করাতে পৃথিবীর আবর্ত্তনকালে তাহা সূর্য্য ও চন্দ্র কর্ত্তৃক অসমভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই আকর্ষণের ফলে পৃথিবী নিয়তই লাটিমের ন্যায় ঘুরিতেছে। (পাঠকগণ সকলেই বোধ হয় লাটিম ঘুরিতে দেখিয়াছেন; তাহার গতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ হইবে যে তাহাতে নানা প্রকারের গতি সমন্বিত হইয়া থাকে,—প্রথমতঃ লাটিম স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, ইহা লক্ষিত হয় যে লাটিমের বিঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডও অল্পে অল্পে পিছাইয়া চলিতে থাকে; তৃতীয়তঃ, উক্তবিধ পশ্চাচ্চলন ভিন্ন মেরুদণ্ডের শিরঃকম্পনও লক্ষিত হইয়া থাকে।) পৃথিবীর মেরুদণ্ডের পশ্চাদপসরণ ফলে বিষুবদ্বিন্দু নিয়ত ক্রান্তিবৃত্ত পথে পিছাইয়া চলিতেছে; এবং ঐ মেরুদণ্ডের "শিরঃকম্পন" (Nutation) ফলে বিষুবদ্বৃত্ত সমান্তরাল নিয়ত কম্পিত হইতেছে। ইহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ উভয় কারণে প্রত্যেক নক্ষত্রেরই পর্য্যবেক্ষিত স্থিতিফলের বিপর্য্যয় ঘটিবে।

এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে নক্ষত্রদিগের যে সকল স্থিতিবিপর্য্যয় পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহার অধিকাংশই পৃথিবীর নানাবিধ গতিসম্ভূত। কিন্তু ইহাতেও জ্যোতির্ব্বিদগণের

* গত বৈশাখের "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"প্রক্রিয়াস্থলে Right ascension লগ্নের ভুজ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি Right ascension এর নাম লগ্নভুজ হইবে?" যে জিনিষটা লগ্নের ভুজ হইতে পারিল তাহাকে লগ্নভুজ বলিলে গালি দেওয়া বুঝাইবে না।

শ্রমের অপশম হইল না ; এই সকল নানা কারণে নক্ষত্রের যে প্রকার আপাতঃদৃষ্ট গতি পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইতে পারে তাহা গণনাঙ্কে বিশোধিত করিয়া নক্ষত্রের স্থিতি-বিপর্য্যয়ের সহিত সমন্বিত করিলে দেখা যায় যে তাহাতেও নক্ষত্রের স্থিতি সঙ্কুলান হয় না, সমস্ত বাদ দিয়াও নক্ষত্রের অতি সূক্ষ্ম কিয়ৎ পরিমাণ গতি 'অকারণ লব্ধ' থাকিয়া যায়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে ইহাকে 'আপেক্ষিক গতি' বলা হইয়াছে। আগামী-বারে ইহার আলো-চনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

কর্ম্মদেবী।

রাজপুতানায় মারবারের অন্তর্গত ওরিন্ত উদ্যানে যে একটি অপরূপ ললনা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় যশঃ-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করিয়াছিল, তাহার অনৈসর্গিক আত্মত্যাগ, অতুল প্রতিভা ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। কর্ম্মদেবীর অত্যাশ্চর্য্য মানসিক দৃঢ়তা, পতিপরায়ণতা ও অনৈসর্গিক আত্মোৎসর্গের জীবন্ত কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ক্ষত্রীয় রমণীর সেই স্বর্গীয় তেজ সমগ্র রাজপুতানাবাসীর হৃদয় প্রদীপ্ত করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ম্মদেবী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, বিশ্ব-সংসারে কতই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে ; পূর্ব্ব তুলনায় ক্ষত্রীয় নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু ক্ষত্রীয় রমণীর আত্মত্যাগ, বীরত্ব, সাহস ও তেজস্বিতা আজও ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় গ্রথিত রহিয়াছে। যে বিপুল তেজো-রাশি, হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব জ্বলন্ত পাবকে ভস্মীভূত হইয়াছে, সে চিত্র কি কখন ভারতবাসীর হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে ?

কর্ম্মদেবী মোহিলরাজ মানিকরায়ের কন্যা, পিতামাতার অতি আদরের ও স্নেহের পাত্রী। কন্যার প্রদীপ্ত সুমনোহর মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া পিতামাতা অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। কর্ম্মদেবীর হৃদয় অতি উচ্চভাবে গঠিত ; তাঁহার উচ্চ-হৃদয় বিলাসিতার অঙ্ক-ভূমি ছিল না—বৃথা আমোদ প্রমোদে তিনি নিমগ্না থাকিতেন না। সর্ব্বদা বীর-কাহিনী শুনিতে ভালবাসিতেন এবং প্রকৃত বীরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। বীরবর সাধুর বীরত্ব-কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। যশল্মীরের ভট্টিরাজের অধীনে পুগল নামে একটি জনপদ ছিল। পুগল তৎকালে রণঙ্গদেব নামক জনৈক সর্দ্দারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে ছিল ; সাধু তাঁহারই মহাপরাক্রমশালী পুত্র। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়া বহু যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাগোর হইতে সিন্ধুনদের তীরভূমি পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশেই তিনি কখন কখন আক্রমণ করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিতেন। তাঁহার অসীম বীরত্বের কথা সমস্ত রাজপুতানায় প্রচার হইয়াছিল, সকলেই তাঁহাকে অতিশয় ভয় ও সম্মান করিত। তাঁহার সেই বলিষ্ঠ দেহ, বিস্তৃত বক্ষ, দীর্ঘায়ত লোচন নিরীক্ষণ করিলেই

সচরাচর লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। সাধু সুন্দর যুবাপুরুষ, বাহুতে অসীম বল—বীরতাই তাঁহার হৃদয়ের প্রধান ভূষণ। তিনি যখন কোন নগর আক্রমণ অভিপ্রায়ে গমন করিতেন, তখন প্রায়ই ওরিন্ত নগর দিয়া যাতায়াত করিতেন। তথাকার আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে চিনিত। সুবিধা পাইলেই বালিকা কর্ম্মদেবী তাঁহাকে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন। মানিকরায় কখন কখন সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিজ বাটীতে আনাইয়া তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতেন এবং তদীয় উত্তেজনাপূর্ণ-বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বিস্ময়ে ও হর্ষে অভিভূত হইতেন। কিন্তু বালিকা কর্ম্মদেবীর কর্ণকুহরে তাহা অমৃত বর্ষণ করিত। তিনি অন্তরাল হইতে সাধুর বীরত্ব-কাহিনী উৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রবণ করিতেন। বীরত্বকাহিনী শুনিতে শুনিতে কর্ম্মদেবী আনন্দে অধীর হইতেন। মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিত।

রাজপুত রমণীর হৃদয়ের তেজ সামান্য নহে। যে ভীষণ জহরব্রতের * স্মৃতি সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, যে তেজঃপ্রভাবে ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাই, চিতোরের অতুল রূপলাবণ্যময়ী পদ্মিনী সমর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিতা বা ভীতা হন নাই, সেই অসামান্য তেজোরাশি যে কর্ম্মদেবীতেও সন্নিবদ্ধ থাকিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ? যে ক্ষত্রীয় তেজ পদ্মিনী ও লক্ষ্মী বাইর ধমনীতে প্রবাহিত হইত, সেই তেজ কর্ম্মদেবীর হৃদয়েও প্রতি-ফলিত হইত।

কর্ম্মদেবী যতই সাধুর বীরত্ব-কাহিনী শুনিতেন, তাঁহার হৃদয় ততই আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিত। ক্রমে সাধুর প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ় হইতে আরম্ভ করিল। একদিন কর্ম্ম-দেবী গবাক্ষ দ্বারে অনন্য মনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন সময়ে সেই পথ দিয়া সাধু যাইতে-ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে পতিত হওয়ায় সাধু সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কর্ম্মদেবীর অতুলনীয় রূপলাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হইলেন, ভীষণ সমর-চিন্তা ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। সাধু সতৃষ্ণ নয়নে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া লইলেন। কর্ম্মদেবীর হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল, আজ চারি চক্ষুর সম্মিলনে সে দয়ের আবেগ আরও উছলিয়া উঠিল। সাধু সেই দেবীমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কর্ম্মদেবীর জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, কখন কখন চিন্তায় তিনি আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া পড়িতেন। হৃদয়ে যে অনলের সৃষ্টি করিলেন, পিতা-মাতার নিকট তাহা সম্পূর্ণ অবিদিত রহিল। পিতামাতা যদি তাঁহাদের এই পবিত্র প্রণয়ের কথা বিন্দুমাত্রও অবগত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের সেই ভীষণ হুতাশনের প্রকোপ সহিতে হইত না। বুঝি বা কর্ম্মদেবীর অক্ষয়কীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্যই জগদীশ্বর এই প্রজ্জ্বলিত-বহ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

---

* আলাউদ্দিন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন ক্ষত্রীয় রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার জন্য অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—ইহাই "জহরব্রত" নামে খ্যাত।

পিতামাতা কর্ম্মদেবীর বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন। ক্রমে মুন্দরাধিপতি রাও চণ্ডের চতুর্থ তনয় অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। বিবাহের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্মদেবীর এই সম্বন্ধ আদৌ মনোনীত হয় নাই। তিনি বীরপুরুষ সাধুর বীরকাহিনী শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

অরণ্যকমল কর্ম্মদেবীর রূপে মুগ্ধ, এই বিবাহে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা। হৃদয়কে অজ্ঞাত প্রেমে ধাবিত করিয়াছিলেন, স্বীয় প্রণয়োচ্ছ্বাসের আবেগে মনে করিতেন, কর্ম্মদেবী তাঁহারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী। যতই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় আনন্দে ততই অধীর হইতে লাগিল। মেঘমুক্ত নীলাকাশেও যে সহসা মেঘ-সঞ্চার হয় এবং প্রবল বাত্যার সৃষ্টি হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারে, সহস্র অনলকণাও যে ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে, এ চিন্তা বোধ হয় তখন অরণ্যকমলের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। সুখস্বপ্নে যাঁহার হৃদয় বিভোর, তাঁহার হৃদয়ে কি কখন অন্য চিন্তা স্থান পাইতে পারে?

পিতামাতা মনে করিতেন, কর্ম্মদেবীর এই সম্বন্ধ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। কন্যাকে সৎপাত্রে এবং সদ্বংশে অর্পণ করিবেন, কুল-গৌরবে উজ্জ্বলিত হইয়া কৃতার্থম্মন্য হইবেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিত। অসীম আনন্দ লইয়া তাঁহারা কন্যার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেন, আনন্দে কন্যার মুখখানি বক্ষে ধরিয়া সহস্র চুম্বনে প্রীতিলাভ করিতেন। কর্ম্মদেবী পিতামাতার এই আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে জানিলেন পিতামাতা অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন—সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। বিবাহের দিন আগত দেখিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। যাঁহাকে তাঁহার হৃদয় চাহে না, তাঁহারই সহিত স্বীয় জীবনের সুখ দুঃখকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে পিতা মাতা এত উৎসুক, এ চিন্তা কর্ম্মদেবীর প্রাণে নিদারুণ আঘাত প্রদান করিল। তিনি সখিদিগের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বলা বাহুল্য, সাধু এই সম্বন্ধের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই।

২

পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া গবাক্ষদ্বারে পড়িয়াছে; মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সে মধুর জ্যোৎস্নাধৌত রজনীকে অধিকতর মধুর করিয়া তুলিতেছে। আকাশ সুনির্ম্মল, সমস্ত পৃথিবী চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে বিভাসিত। এই সময় বাতায়ন-পথে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া কর্ম্মদেবী কি চিন্তা করিতেছেন? গভীর চিন্তায় নিমগ্না। কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি আলুলায়িত। পবনহিল্লোল থাকিয়া থাকিয়া সেই উন্মুক্ত-কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছে। তিনি গভীর চিন্তায় বিভোর। প্রিয়সখি অমলা অলক্ষিতভাবে পশ্চাতে দণ্ডায়মান, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। তাঁহাকে গাঢ়-চিন্তামগ্না দেখিয়া অমলা ডাকিলেন "প্রিয়সখি, কি ভাবিতেছ?" কর্ম্মদেবী চমকিয়া পশ্চাতে চাহিলেন, দেখিলেন অমলা। পরে বলিলেন তুমি এখানে

কখন আসিয়াছ জানিতে পারি নাই। অমলা দেখিলেন, কর্ম্মদেবীর চোখের কোণে কালিমা পড়িয়াছে, বিষাদে মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, কি গাঢ় ভাবনায় তাঁহার সুন্দর বদনে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি কর্ম্মদেবীর সুকোমল করযুগল নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন "প্রিয়সখি, তুমি এত বিমর্ষ কেন? আমাদের কত সুখের দিন আসিতেছে, তোমার হাসিমুখ দেখিয়া আমরা সুখী হইব, পিতা মাতা সুখী হইবেন, কিন্তু তাহারই পরিবর্ত্তে এ কি ভাব দেখিতে পাই? সখি, তোমার মনের ভাব আমার কি শুনিবার অধিকার নাই?" এই বলিয়া অমলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অমলা মনে করিয়াছিলেন কর্ম্মদেবী অরণ্যকমলের চিন্তায় সর্ব্বদা অন্যমনস্কা থাকেন, অরণ্যকমলের কথা লইয়া তাঁহার সহিত কিছু পরিহাস করিয়া আনন্দলাভ করিবেন—এই আশা করিয়া তিনি কর্ম্মদেবীর নিকট আসিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে বিষণ্ণা ও গভীর-বেদনা-জনিত চিন্তামগ্না দেখিয়া তাঁহার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। কর্ম্মদেবী তাঁহার কথার উত্তর দিতে প্রথমে অসমর্থা হইলেন। উজ্জ্বল চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া পরে বলিলেন, "সখি, আমার হৃদয় যে কি ভাবনায় আচ্ছন্ন, তাহা শুনিলে কি তুমি সুখী হইবে? পিতামাতাকে জানাইও আমি বীর সাধু ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমার হৃদয় একবার যাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়াছে, যাঁহাকে মনে মনে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার গণ্ড বাহিয়া দুফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অমলা তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অরণ্যকমলের সহিত বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, এ সঙ্কল্প ত্যাগ করা সহজ নয় ভাবিয়া অমলা বলিলেন "সখি, অরণ্যকমল সাধু অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নহেন, তাঁহার বীরোচিত প্রশস্ত বক্ষঃ তোমারই উপযুক্ত, তুমি এখন অরণ্যকমলের বাগদত্তা—কি প্রকারে এখন তাঁহাকে বঞ্চিত করিবে? অরণ্যকমল ধনী এবং কুলগৌরবে গৌরবান্বিত।" কর্ম্মদেবী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ হৃদয় ধনৈশ্বর্য্যের অভিলাষী নয়, কুল-মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষী নয়। বীরত্বকাহিনী শুনিয়া যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, এ হৃদয় তাঁহারই আকাঙ্ক্ষী। হৃদয় যাঁহাকে একবার বরণ করিয়াছে, তিনিই এ হৃদয়ের অধিষ্ঠিত দেবতা, এ হৃদয় তাঁহারই, অরণ্যকমলের জন্য নয়।" অমলা তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক উত্তেজিত স্বরে স্তম্ভিত হইলেন। কিছুকাল নীরবে থাকিয়া ধীরপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। আর হতভাগ্য অরণ্যকমল? তার এত দিনের সুখের আশা অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। এদিকে কর্ম্মদেবীর পিতা মাতা অমলা-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বজ্রাহতপ্রায় হইলেন। এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন এই বিবাহ কি প্রকারে নিরস্ত করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। অরণ্যকমলের সহিত বিবাহ স্থগিত করিতে গেলে বিষম অনর্থের সম্ভাবনা। এই সংবাদ পাইলেই অরণ্যকমল নিজকে অপমানিত জ্ঞান করিবেন। তিনি বীরপুরুষ, না জানি এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে কি অনর্থের

সূত্রপাত হইবে। বিপদের ঘোর কালিমা-ছায়া যেন তাঁহাদের সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহারা কন্যার ভাবী অমঙ্গল-চিন্তায় বিচলিত হইলেন। কিন্তু তথাচ কন্যার স্নেহের বশীভূত হইয়া, কন্যার স্নেহপূর্ণ মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা অমঙ্গল ভাবিয়াও ভীত হইলেন না। অপত্যস্নেহ বলবৎ হইয়া কন্যার প্রস্তাবে তাঁহাদের সম্মতিদান করাইল। মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল; পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা সাধুর পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। সাধুকে ডাকাইয়া আনিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। সাধু বলিলেন "যথানিয়মে আমার নিকট নারিকেল প্রেরণ করিলে কর্ম্মদেবীকে বিবাহ করিব। আমি অরণ্যকমলের ভয়ে ভীত বা সঙ্কুচিত নই। যাঁহাকে তিনি হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।" সাধুর আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু অরণ্যকমলের চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় হইতে সম্যকরূপে তিরোহিত হইল না। কন্যার কল্যাণ-কামনায় দেবতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মঙ্গল কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

৩

যথানিয়মে অচিরাৎ সাধুর সহিত কর্ম্মদেবীর উদ্বাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। কর্ম্মদেবীর হৃদয় আনন্দে উথলিত। তাঁহার ভবিষ্যগগন যে মেঘ-সমাচ্ছন্ন, মনোমত পতি পাইয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। সখিরা কর্ম্মদেবীর সুখে সুখী। পিতামাতা কন্যার হাসিমুখ দেখিয়া গভীর আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।

কর্ম্মদেবীর এই পরিণয়-সংবাদ অচিরে অরণ্যকমলের কর্ণগোচর হইল। অরণ্যকমল অবমাননায় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে, বিষাদে হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইল; হৃদয়ে সাধুর প্রতি প্রতিহিংসা-অনল জ্বলিয়া উঠিল, এবং ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়-বিরহচিন্তা যুগপৎ অরণ্যকমলের হৃদয়কে অধিকার করিল। যে দেবীমূর্ত্তির রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি দিবা-নিশি চিন্তাসাগরে ভাসমান ছিলেন, আজ সেই আশা ভগ্ন হওয়ায় তিনি কুপিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাধুকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবেন ভাবিয়া স্বীয় সৈন্যবল সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

অত্যল্প কালের মধ্যেই অরণ্যকমলের সঙ্কল্প ও অভিপ্রায়ের কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবীর পিতামাতার মনে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহার সূত্রপাত দেখিয়া তাঁহারা জামাতা ও কন্যার অমঙ্গল চিন্তায় অধীর হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সেই ভয়ঙ্কর দিন আগত হইল। সাধু কর্ম্মদেবীসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অসংখ্য দাসদাসী, হস্তী, উষ্ট্র সহ রথারোহণে কর্ম্মদেবী স্বামী-গৃহে যাইতেছেন। স্নেহময় পিতামাতার নিকট অশ্রুসিক্তবদনে বিদায় হইলেন। পিতামাতার স্নেহঅঙ্ক এতদিনে শূন্য হইল। পিতামাতাও গুরুভার-হৃদয়ে স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে

করিতে প্রাণসম দুহিতার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের আর্দ্র-নয়ন আর শুষ্ক হইল না। নয়নের কোণে আর হাসিরেখা সমুদিত হইল না, জীবনের শিথিল গ্রন্থি আর দৃঢ় হইল না।

সাধুর সহিত প্রায় সপ্তশত ভট্টিসৈন্য ছিল। মোহিলরাজ তাঁহাকে অতিরিক্ত চারি সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাধু তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার সেই সপ্তশত সৈন্যের প্রতি সাধুর অটল বিশ্বাস ছিল। সৈন্যগণ যে প্রভুর নিমিত্ত অম্লান-বদনে প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। তিনি তথাচ শ্বশুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আরও পঞ্চাশৎ সৈনিক সমভিব্যাহারে স্বদেশযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই অরণ্যকমল কর্তৃক তাঁহার গতিরোধ হইল। অরণ্যকমল পথিমধ্যে বহুসৈন্যসহ সাধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; জিঘাংসা বৃত্তিতে তাঁহার বীরমূর্ত্তি এক ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে। অবমাননার প্রজ্বলিত অনল হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। সাধুর সৈন্যদল সম্মুখে সুসজ্জিত। অরণ্যকমলের সৈন্যদল বিষম বিক্রমে সাধুর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দে ও সৈন্যগণের গগনভেদী সিংহ-নাদে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধ সাধু ও অরণ্যকমলের অভিপ্রায়, কিন্তু সৈন্যগণের উন্মত্ততা হেতু তাহার বিপরীত হইতে লাগিল। উভয় দল হুহুকারে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শত শত যোদ্ধা ভীষণ রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। ভারতের বীরত্বের যশ কত শোণিতে অঙ্কিত কে নির্ণয় করিতে পারে!

দলযুদ্ধ সাধু বা অরণ্যকমলের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং তাঁহারা উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। দূরে কর্ম্মদেবী এই যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সাধু তাঁহার নিকট শেষ-বিদায় লইবার জন্য আসিলেন। কর্ম্মদেবী সাধুকে দেখিয়া স্থিরগম্ভীর স্বরে বলিলেন "যাও, স্বামিন্, বীরধর্ম্ম প্রতিপালন কর—যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবেই উভয়ে আবার মিলিত হইব; নতুবা ইহজনমে এই শেষদেখা, পরলোকে আমরা পুনর্মিলিত হইব।" সাধু কর্ম্মদেবীর বীরত্ব ও উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাগত হইলেন। ঘোর উন্মত্ততার সহিত ভীমনাদে রাঠোর-সৈন্য মধ্যে গিয়া পড়িলেন। ভীষণ তরবারি-আঘাতে কত শত সৈন্য বধ করিলেন। অরণ্যকমল সাধুকে নিকটে দেখিয়া শত্রুর উষ্ণ শোণিতে স্বীয় অবমাননা রূপ হৃদয়জ্বালা ধৌত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয়ে উভয়কে সম্মুখীন দেখিয়া অশ্বচালনা করিলেন। উভয়ে উভয়ের অসি-আঘাতে আহত বৃহৎ বিটপীর ন্যায় সশব্দে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। রাঠোর বীর প্রচণ্ড আঘাতে পতিত হইয়াও পুনরায় উত্থিত হইলেন, কিন্তু বীর সাধু আর উঠিলেন না। তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। অমনি উভয় পক্ষের যুদ্ধ স্থগিত হইল। চঞ্চলা বিজয়লক্ষ্মী রাঠোর রাজকুমারের অঙ্কশায়িনী হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে সাধুর অস্ত্রাঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইল না।

আর কর্ম্মদেবী? তিনি দূর হইতে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয়

শোকাবেগ বহুকষ্টে সম্বরণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার ইহজীবনের আশা ভরসা সব বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, কত সুখস্বপ্ন তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। মনোমত পতি পাইয়া কত সুখী হইয়াছিলেন; আর আজ তাঁহার সুখের নিশি প্রভাত হইতে না হইতেই, সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই তাঁহার আশালতা ছিন্ন হইয়া গেল। কর্ম্মদেবী বীরনারী, স্বামীকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, উৎসাহদান করিয়াছিলেন। এখন স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার অনুগমন করিয়া হৃদয়ের শোকানল নির্ব্বাপিত করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিল। তিনি পতির অনুগমনের জন্য তথায় চিতা প্রস্তুত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। বীরহৃদয়া কর্ম্মদেবী একখানি শাণিত তরবারি লইয়া একহস্তে তাহা ধারণ করিয়া অপর হস্ত দিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কি ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! সৈনিকগণ সকলেই সেই ভয়ানক দৃশ্যে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; নিস্পন্দ নেত্রে সেই তেজস্বিনী দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কর্ম্মদেবী স্থির যাতনাশূন্য-হৃদয়ে হস্তখানি শ্বশ্রূকে উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন—"শ্বশুরকে বলিও, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিলেন।" ছিন্ন বাহু হইতে অনর্গল শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল—তৎপ্রতি বীরনারীর ভ্রূক্ষেপও নাই। একটিও অস্ফুট যাতনাসূচক শব্দ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। বদনমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ। তখনই আবার অপর হস্ত ছিন্ন করিতে একজন সৈন্যকে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ স্তম্ভিত। এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া গিয়াছে। কে আবার তাঁহার সেই কোমল বাহু ছিন্ন করিবে! কিন্তু জনৈক সৈনিক তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ আদেশ প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইল এবং মুহূর্ত্তে তাঁহার সুন্দর বাহু, শাণিত অসি-স্পর্শে ভূতলে পতিত হইল! কর্ম্মদেবী অমানুষিক তেজে বলীয়ান—তাঁহার একগাছি কেশও নড়িল না। দর্শকদিগের মর্ম্মভেদী চীৎকারে রণভূমি আলোড়িত হইল। তিনি ধীর অকম্পিত ও যন্ত্রণাশূন্য হৃদয়ে ছিন্ন দ্বিতীয় বাহুখানি মোহিলকুলের ভট্টকবিকে উপহার দিতে আদেশ করিলেন। কি অমানুষিক তেজ! তৎপরে সাধ্বী বীরবালা স্বামীর মৃতদেহ সহ চিতারোহণ করিলেন; তাঁহার অতুল মহিমা ও স্বর্গীয় জ্যোতি শূন্যে দীপ্তিমান হইয়া সুনীল-গগন রঞ্জিত করিল। শোক-সন্তাপহারী পবিত্র পাবকে স্বর্ণলতা ভস্মসাৎ হইল! পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ রণঙ্গদেব পুত্রবধূর হস্তখানি দগ্ধ করিয়া তথায় একটি সরোবর খনন করিলেন। সেই পবিত্র সরোবর অদ্যাপিও "কর্ম্ম-সরোবর" নামে পরিচিত। পতিপ্রাণা-সতী-সাধ্বী-কর্ম্মদেবী এখন দিব্যলোকে, আনন্দময়ের আনন্দ ভবনে, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিতে আর্য্যভূমি সুরঞ্জিত। সাধ্বী নারীর যশোগীতিতে আজিও ভারতাকাশ প্রতিধ্বনিত।

কাঙ্গাল হরিনাথ।

সংসারে অতি হীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াও যাঁহারা মানব-সাধারণের নিকট অতি উচ্চ সম্মানের আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে দুইটি গুণ সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইহার একটি প্রতিভা, অন্যটি প্রেম। যদি আর কিছু না থাকে, তথাপি শুধু বিধিদত্ত এই দুইটি অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া মানব আপনার জীবনের দিনগুলি সার্থকতার সহিত অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইতে পারেন; ইহারই বলে তিনি বিধাতার চিরমঙ্গল ইচ্ছাকে সংসার-আকাশের স্থির জ্যোতি ধ্রুবনক্ষত্র জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুঃখ দৈন্যের সহিত চিরজীবন অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করেন, সহস্র প্রকার বিপদের মেঘ, প্রলয়ের ঝটিকা তুলিয়া চারিদিক্ হইতে তাঁহার মস্তকের উপর ঘনাইয়া আসে বটে, কিন্তু প্রেম নামক যে দুর্ল্লভ রত্নটি তাঁহার নিভৃত হৃদয়ের অন্তস্তলে সংগুপ্ত থাকে, তাহারই উজ্জ্বল আভায় বিপদের সেই গাঢ়কৃষ্ণ মেঘ সম্পদের সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে; এবং অবশেষে যখন তিনি বিজয়ী প্রেমিকের মত, অনেকের হৃদয় হরণ করিয়া, মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখাঙ্কিত পরপারে চিরকালের জন্য মাথুর যাত্রা করেন, তখন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু এবং ভক্তগণ তাঁহার বিরহে অশ্রুত্যাগ করিতে থাকে।

তাই কাঙ্গাল হরিনাথের (হরিনাথ মজুমদার) মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একটি অংশে লোককোলাহল উত্থিত হইয়াছে; যাহারা তাঁহাকে জানিত, ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধাভক্তি করিত তাহাদিগের ত কথাই নাই, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি যাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, যাহাদিগের স্বার্থের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উৎপীড়িত ও বিপন্নকে আপনার স্নেহময় পক্ষপুটে সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, তাহারাও তাঁহার মৃত্যুতে সন্তপ্ত ও ব্যথিত। সত্য বটে তিনি সমগ্র দেশের উপর একটা বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া যান নাই, একটি বিশাল মানবসমাজ তাঁহার নিকট কোন বৃহৎ উপকার লাভ করে নাই, কিন্তু এক প্রদেশের এক অংশে, শিক্ষাবিহীন অজ্ঞানান্ধকার-পরিবৃত হীন সমাজে তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করেন, প্রতাপশালী জমীদার, মহাজন এবং নীলকরের অখণ্ড অত্যাচারের হস্ত হইতে দীন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন বিপন্ন করিয়াও যেরূপ সংগ্রাম করেন এবং তাহাদিগের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অভাব মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বীরের ন্যায় যেরূপ জীবন উৎসর্গ করেন, তাহাতে তাঁহার আসন মানব-হিতব্রত সন্ন্যাসীবর্গের সমশ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; গোপনে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী ঢক্কাধ্বনি সহকারে দেশে দেশে কীর্ত্তিত হয় না বটে, কিন্তু সুবাসিত পুষ্প লতাপত্রের অন্তরালে সংগুপ্ত থাকিয়া লোক-লোচনের দৃষ্টিপথবর্ত্তী না হইলেও তাহার সুধাগন্ধে যেমন চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠে, হরিনাথের মহৎ চরিত্রও সেইরূপ বিপুল জনসমাজের অলক্ষ্যে প্রস্ফুটিত

হইয়া আপনার মহিমা ও গৌরবে বিরাজ করিতেছিল ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করিব।"

কাঙ্গাল হরিনাথ।

৬৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৩৬ বঙ্গাব্দে মহাত্মা হরিনাথ মজুমদার নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের এক বৎসর মধ্যেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং মাতৃস্নেহ কি পদার্থ, তাহা জানিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন নাই। পিতৃব্যানীর স্তনদুগ্ধে তাঁহার দেহ পুষ্ট হয়, এবং সেই স্নেহশীলা রমণীকেই তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কিন্তু মাতৃহীন হইয়াও তাঁহার বিপদের অবসান হইল না, তাঁহার জন্মনক্ষত্র তাঁহাকে শৈশবেই অনাথ করিয়াছিল, কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইল। তাঁহার পৈত্রিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, মাতার স্নেহ ও পিতার যত্নে যে বয়সে শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয় এবং নিরুদ্বেগ সুখ ও স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে পালিত হইয়া যে বয়সে মানুষ ভবিষ্যতের প্রচ্ছন্ন জীবন-স্রোতে সন্তরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই শৈশব কালেই হরিনাথকে দারুণ অন্নচিন্তায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সংসারে প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে ; যাহারা বিশুদ্ধ স্বর্ণ, বিপদের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাহারা আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মলিন অঙ্গার পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। হরিনাথ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ছিলেন। এস্থলে আমরা তাঁহার স্বলিখিত আত্মপরিচয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাল্যের দুরবস্থাসম্বন্ধে দুই একটি কথা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি ; তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি তাহা কে বলিতে পারে ? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয়, তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ-বিধান না করায়, পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃ-বিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটী ভিজাইয়াছি ; এই অবস্থায় কতকদিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালীবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটী ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখাপড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতকদিন শিক্ষা দিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।"

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বাল্যকালে তাৎকালীক পাঠশালা-সুলভ শিক্ষা হইতেও বঞ্চিত ছিলেন ; কিন্তু নবীন কিশলয় যেমন তাহার নবোদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র সুকোমল শাখাগ্রভাগদ্বারা সূর্য্যের আলোকধারা পান করিয়া ক্রমে সবল ও বর্দ্ধিতশ্রী হইয়া উঠে, সেইরূপ বিধাতা তাঁহাকে যে গুণগ্রাহী, অনন্য সাধারণ হৃদয়রত্নটি দান করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাবে তিনি বহিঃ প্রকৃতি ও মহৎচরিত্র-মানবের মনোমন্দির হইতে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তরকালে যাঁহারা সাহসী, নির্ভীক স্বাধীন-চেতা বলিয়া পরিগণিত হন, বাল্যকালেও তাঁহাদের চরিত্রে সেই সকল মহৎ গুণের আভাষ থাকে, নদীস্রোতে বেতস তরুর ন্যায় তাঁহারা কোন দিনই দেহ ভাসাইয়া দেন না ; এইজন্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের "একগুঁয়ে" বলিয়া একটা সুখ্যাতি বা অখ্যাতি জন্মে, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই অখ্যাতি ছিল, এবং হরিনাথের বাল্যজীবনেও এই প্রকার অখ্যাতির প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন দিন পাঠশালে লিখিতে যাইবার অনিচ্ছা হইলে কেহই তাঁহাকে কোনরূপে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না ; এমন কি কথিত আছে একদিন তিনি গুরু মহাশয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি কূপের মধ্যে নামিয়া সমস্ত দিন লুকাইয়াছিলেন। তাঁহার আয়াস-সুখ-নিরত, চঞ্চল শিশুপ্রকৃতি মুক্তবিশ্বের সৌন্দর্য্যসুধা আস্বাদনে যেরূপ অনুরক্ত ছিল, মহিমাময়ী বাণীর কঠোরহৃদয় অনুচর, বেত্রমাত্র সম্বল গুরুমহাশয়ের জ্ঞান সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের প্রতি তাঁহার সেরূপ শ্রদ্ধা ছিল না।

এই পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকের গ্রাসাচ্ছাদন কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহার হিতৈষী আত্মীয়গণ তাঁহাকে এক নীলকুঠীতে শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সেকালে কুঠীর কার্য্যে যথেষ্ট মান সম্ভ্রম এবং পয়সা ছিল, এবং তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কুঠীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন, কিন্তু 'কুঠেল সাহেবের' গোলামীতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই; কুঠীর কর্ম্মচারীবর্গ সাধারণতঃ যেরূপ অসচ্চরিত্র, উৎকোচগ্রাহী, দরিদ্র প্রজার উৎপীড়ক হয়, তাহাতে অগণ্য অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি কুঠীর মধ্যে কাজ করিতেন না; অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার শিক্ষানবিশী পরিত্যাগ করিলেন।

নীলকুঠীতে প্রজা ও শ্রমজীবীবর্গের দুর্দ্দশা এবং উৎপীড়ন দেখিয়া তাহাদের ক্লেশ বিমোচনের সংকল্প এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠে। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য তিনি অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যে বিঘ্নও যথেষ্ট ছিল। ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই, তিনি বুঝিলেন এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে একদিকে যেমন নির্ভীক তেজস্বী হৃদয়ের প্রয়োজন, অন্যদিকে শাণিত লেখনীর সুতীক্ষ্ণ সন্ধানেরও সেইরূপ আবশ্যক। সুতরাং তিনি ঘরে বসিয়া তৎকাল-প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি পুস্তক এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন; এই সময়ে তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, এমন কি তিনি এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন ধনবান ব্যক্তিকে একরাত্রে একখানি পুস্তক নকল করিয়া দিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ একখানি বস্ত্র লইতে বাধ্য হন।

ইহার পর হইতেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার স্বগ্রামের প্রজাগণের দুঃখ ও অভাব-কাহিনী সাধারণের গোচর করিবার জন্য তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সে এ যুগের কথা নহে, পল্লীবাসীগণের অভাব একাল অপেক্ষা সেকালে অনেক অধিক ছিল, এবং তাহা প্রকাশ করিবার কোনই উপায় ছিল না। সেকালে জমীদারেরা আপনাদিগকেই প্রজাবর্গের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং কারণে অকারণে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। এই সকল অভাব ও অভিযোগের বিবরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তগত হইলে তিনি তাহা সযত্নে 'প্রভাকরে' প্রকাশ করিতেন, কোন ভ্রম থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দান করিতেন। এই প্রকারে হরিনাথ সংবাদপত্র সম্পাদনে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। দেশের দুঃখকাহিনী লিখিয়াই তিনি লেখনীকে বিশ্রাম দেন নাই, তাঁহার রচনা সরল, সুন্দর এবং মধুর ছিল, গ্রামস্থ লোক যাহাতে অনর্থক দলাদলী, পরনিন্দা, কুৎসা এবং মন্দকর্ম্মে কালাতিপাত না করে এই অভিপ্রায়ে তিনি সংকীর্ত্তন, কবি, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি সাধারণের আমোদজনক সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; এই

সকল গীতের ভাষায় তাঁহার নির্ভরশীল ভক্তহৃদয়ের শান্ত, শুদ্ধ, মধুর ভাব ধ্বনিত হইয়া উঠিত; তিনি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন, সুতরাং পিতৃমাতৃস্নেহের যে একটি আজন্ম-সঞ্চিত ক্ষুধা তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিদিন পোষিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা অবশেষে বিশ্বজননীর অনাদি অনন্ত প্রেমের প্রগাঢ়তার মধ্যে বিলীন হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ক্ষুধা, সেই পিপাসা এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সেই আকণ্ঠশান্তি তাঁহার সঙ্গীতের প্রতি ছত্রকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি তাঁহার প্রেমিক হৃদয়েরই আকুল প্রতিধ্বনি।

বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবকের ন্যায় হরিনাথেরও রচনাশিক্ষা গুপ্ত কবির নিকট আরম্ভ হয় বটে কিন্তু অনেক বিষয়ে গুপ্ত কবির সহিত তাঁহার মতভেদ ছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অন্যতম; বঙ্গরমণীর বিদ্যাশিক্ষা বঙ্গীয় পুরুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির যে সহযোগিনী একথা তিনি স্বীকার করিতেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র গ্রামটিতেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার আলয়ে একটি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েকটি বালিকার শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করেন; কিন্তু বালকদিগের শিক্ষার প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ লক্ষিত হইত। তিনি বাল্যকালে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই, তাই স্বগ্রামস্থ বালকবর্গের শিক্ষার অভাব তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেন, এবং এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে নিরাকরণের জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তিনি একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক গ্রামস্থ বালকদিগের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে অনেক ছাত্র এই পাঠশালা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার সেই কীর্ত্তিচিহ্ন, সেই পাঠশালাটি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

দরিদ্র প্রজা ও শ্রমজীবীবর্গ জমীদার এবং মহাজনদিগের হস্তে, কুঠিয়ালদিগের অত্যাচারে যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছিল, সেই পীড়ন নিবারণ করাই অবশেষে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি ১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সে আজি চৌত্রিশ বৎসরের কথা; সে সময় সংবাদপত্র প্রকাশ করা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সহজ এবং অল্প ব্যয়সাধ্য ছিল না; বিপন্ন দরিদ্র হরিনাথ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই পত্রিকাখানি প্রথমে কলিকাতায় 'গিরিশ বিদ্যারত্ন' যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও কুমারখালী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; তখন ইহা মাসিক ছিল। গ্রামবার্ত্তা পরে পাক্ষিক এবং অবশেষে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কুমারখালীতে যন্ত্রালয় স্থাপিত হইলে অবশেষে ইহা কুমারখালীতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গ্রামবার্ত্তা দ্বারা এদেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা যে শুদ্ধ জমীদার, মহাজন এবং নীলকুঠির অত্যাচার নিবারণের মুষ্টিযোগ স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, প্রজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাতে যে সকল সসার প্রবন্ধ থাকিত, তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইত। নদী প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার পূর্ব্বক জলকষ্ট নিবারণ, পুলিশ

বিভাগের সুব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি লেখনী পরিচালন করিতেন। ডাকঘরে মনি-অর্ডার প্রচলনের প্রস্তাব এদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে সোমপ্রকাশ এবং গ্রামবার্ত্তাই উচ্চশ্রেণীর সাময়িকপত্র ছিল।

এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রমে এবং বিবিধপ্রকার চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মে। একেত গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভারে তিনি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন, তাহার উপর তাঁহার প্রিয়তম পাঠশালার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়াতে ইহা ঋণজালে জড়িত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি প্রথমে এই পাঠশালার সম্পাদক ছিলেন, কিছুকাল পরে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত হইলে তিনি ইহার সম্পাদন কার্য্য অন্যের হস্তে অর্পণ করেন। এখন বিপদ দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিলেন "আমি কেবল নামমাত্র সম্পাদক আছি, ইহার শুভাশুভ ভার চিরকাল তোমার উপর ন্যস্ত আছে, অতএব তুমি ইহার উপায় উদ্ভাবন কর।" বিপদ দেখিয়া হরিনাথ অন্য লোকের ন্যায় কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না, তিনি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তিনজন শিক্ষকের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তিনি পরোপকার এবং স্বদেশের সেবারূপ যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুরোধে নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখসচ্ছন্দতা তুচ্ছ করিয়া পরিপূর্ণ উৎসাহের সহিত অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন, অবিলম্বেই তাঁহার পাঠশালা ঋণমুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা লাভ করিল, কিন্তু এই সংগ্রামে তাঁহাকে অস্ত্রাহত বিজয়ী বীরের ন্যায় শয্যাশায়ী হইতে হইল।

যাহা হউক ভগবানের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া অধিকতর যত্নের সহিত গ্রামবার্ত্তা পরিচালনে রত হইলেন। অধিক মূল্য দিয়া দরিদ্র পল্লীবাসী সংবাদপত্র গ্রহণে অসমর্থ ভাবিয়া, তিনি গ্রামবার্ত্তার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা নির্দ্ধারণ করিলেন। এত সুলভ মূল্যের সংবাদপত্র বাহির করা তখনকার দিনে স্বপ্নের অগোচর ছিল, ইহার অনেকগুণ অধিক মূল্য দিয়াও সংবাদপত্র গ্রহণ করা সহজ ছিল না; ইহার পরেও অনেক সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে, দেশে লেখক এবং যন্ত্রালয়ের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে কিন্তু সাধারণের জন্য এরূপ সুলভ মূল্যের সংবাদপত্র অধিক প্রকাশিত হইল না, কেবল স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুলভ মূল্যে "সুলভ সমাচার" প্রচার করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন।

কিন্তু গ্রামবার্ত্তার মূল্য আশাতীত সুলভ করাতে প্রতিদিন তিনি অধিক করিয়া ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন, এক পয়সা মূল্য হওয়ার পরও যদি গ্রামবার্ত্তার সহস্র সহস্র গ্রাহক সংগৃহীত হইত, গ্রাহকেরা যদি তাঁহাকে সমুচিত উৎসাহ দান করিতেন, তাহা হইলে গ্রামবার্ত্তার ন্যায় পত্রিকাকে কখন প্রাণধারণের জন্য চিন্তিত হইতে হইত না, গ্রামবার্ত্তার সম্পাদককেও ঋণদায়ে বিব্রত হইতে হইত না; কিন্তু হরিনাথ বাবু গ্রাহকবর্গের নিকট যথোচিত উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যাহাদিগের জন্য খাটিয়া মরিতেন, যাহাদের বিপদ দূর করিতে গিয়া নিজে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন, তাহারা পর্য্যন্ত তাঁহার সাধু-সঙ্কল্পে উপেক্ষা প্রকাশ করিত। ইহা অপেক্ষা আমাদের দেশের লোকের আর কি অধিক কলঙ্ক হইতে পারে? যাঁহারা আমাদের জন্য প্রাণপাত করেন, জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহি না, অবশেষে তাঁহারা ইহজীবন ত্যাগ করিয়া নিন্দা বা প্রশংসার অনেক উর্দ্ধে, দেশকালের অতীত হইয়া গেলে, আমরা তাঁহাদের শোকে সভা করি, এবং বক্তৃতাপূর্ব্বক বিলাপ করিতে বসি। সাধারণের হিতকর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া, দেশের সেবা করিতে গিয়া হরিনাথকে সময়ে সময়ে যে সকল বিপদে পড়িতে হইত, পরমেশ্বরের নাম করিয়া তিনি তাহা সহ্য করিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় মানব হৃদয় ছিল, সেই সকল বিপদে যদি কেহ একবার সমবেদনাভরে 'আহা' বলিত, তাহা হইলেও তিনি অনেক শান্তনালাভ করিতেন। যাহা হউক কোন বিপদেই হরিনাথকে কাতর এবং অধীর করিতে পারে নাই। এই সময় তিনি কিরূপ নির্ভীকভাবে তেজস্বীতার সহিত গ্রামবার্ত্তা সম্পাদন করিতেছিলেন, এবং ঘনীভূত বিপদের প্রতি কিরূপ উদাসীন ছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুইটি গল্প পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

একবার পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট হম্ফ্রে সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়া একজন গৃহস্থের একটি পয়স্বিনী গাভীর লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই; ছলে বলে কৌশলে তিনি সেই গাভীটিকে হস্তগত করেন। দুর্ব্বল প্রজা প্রবল প্রতাপান্বিত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে কি করিবে? নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাহাকে মৌন থাকিতে হইল। কিন্তু এই ঘটনা হরিনাথের অগোচর রহিল না, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া 'গরুচোর ম্যাজিষ্ট্রেট' এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশ পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের গর্হিতাচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখন গ্রামে গ্রামে এরূপ শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখন কদাচিৎ মানসিক তেজের (independence of spirit) পরিচয় পাওয়া যাইত, সামান্য একটা পেয়াদার লাল পাগ্ড়ি দেখিলে গ্রামের অনেক 'নামজাদা' লোক অন্তঃপুরে আশ্রয় লইতেন। সেইকালে দেশের ক্ষমতাশালী শিক্ষিত জমীদারেরা যাঁহার বিরুদ্ধে একটি সামান্য কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হইতেন, একজন নিঃসম্বল দরিদ্র গ্রামবাসী প্রকাশ্যভাবে নির্ভীকচিত্তে তাঁহার কুকার্য্যের কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব নামক যে মহাপ্রাণীর অধিষ্ঠান ছিল, সে জেলার কর্ত্তার এই কুকার্য্য দেখিয়া অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। হরিনাথ বিশ্বাস এবং কর্ত্তব্যের মস্তকে পদাঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণে হরিনাথের কথা প্রবেশ করিল, তিনি বিবিধ উপায়ে হরিনাথকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে ইন্‌কম্ ট্যাক্সের জনৈক অ্যাসেসারকে হরিনাথের উপর অতিরিক্ত পরিমাণে ট্যাক্স

ধার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া নির্ভীক হরিনাথ একদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের তাম্বুতে আসিয়া বলিলেন, তাঁহার উপর যত ইচ্ছা ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এক পয়সাও আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট জানিতেন না যে হরিনাথ একেবারে নিঃস্ব। অসহায় সামান্য দরিদ্র ব্যক্তির এতদুর সাহস ও তেজ দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট অবাক্ হইলেন, অবশেষে বলিলেন "বাবু, জানিলাম তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে একজন লোক।"

আর একবার জনৈক প্রতাপশালী জমীদার প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে তিনি নির্ভীকচিত্তে জমীদারের অত্যাচার কাহিনী 'গ্রামবার্ত্তায়' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মুখবন্ধ করিবার জন্য উক্ত জমীদারের কর্ম্মচারীবর্গ অর্থদ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রেম ভিন্ন অর্থদ্বারা কেহ কোন দিন হরিনাথের হৃদয় ক্রয় করিতে পারে নাই, তিনি অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে জমীদারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন জমীদারের লোকেরা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য লাঠিয়াল নিযুক্ত করিল, কিন্তু লাঠিয়ালেরা তাঁহার কেশস্পর্শ করিতেও সাহসী হইল না। অবশেষে একজন পাঞ্জাবী গুণ্ডা জমীদারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়া সশস্ত্রভাবে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত চড়াও করিল, তখন তিনি গৃহে সহযোগীবর্গের সহিত গ্রামবার্ত্তার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, বিফল মনোরথ হইয়া গুণ্ডাকে সে স্থল ত্যাগ করিতে হইল। এই সময়ে তিনি বিশেষ সাবধানে থাকিতেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অদম্য তেজ ক্ষণকালের জন্যও ম্লানভাব ধারণ করে নাই, বরং তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে এই সকল ষড়যন্ত্র চলিতেছে দেখিয়া, অকম্পিত হস্তে লিখিলেনঃ—

"মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডভয়ে কি কেহ পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্য পালনই জগৎপিতার সেবা করিবার উপায়; এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব যাঁহারা নূতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্ব্বল সন্তানগুলি অত্যাচারিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত ভারতরাজ্য বৃটিশসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অত্যাচার করিয়া এক দিন, না হয় দু দিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি।"

এই কয়েকটি ছত্র হরিনাথের মানসিক তেজস্বীতার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। ১৮৭১ শকে

তাঁহার "বিজয় বসন্ত" নামক পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়। এই পুস্তক বঙ্গসাহিত্যের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত ইহা দ্বাদশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, বাঙ্গালা গ্রন্থের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। "বিজয় বসন্ত" ভিন্ন তিনি ক্রমান্বয়ে "চিত্তচপলা" "প্রেম প্রমীলা" প্রভৃতি উপন্যাস, "কবিতাকৌমুদী," "চারু চরিত্র" প্রভৃতি কবিতাপুস্তক, 'বিজয়া',"অক্রুর সংবাদ" প্রভৃতি পাঁচালী,'সাবিত্রী' প্রভৃতি গীতাভিনয়,"কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী" এবং "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" নামক সাধন-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি প্রচার করেন। যেরূপ শিক্ষা লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা না থাকিলে, এতগুলি উৎকৃষ্ট এবং সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

তাঁহার জীবনের যাহা মূলমন্ত্র ছিল এবং যাহা অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি তাঁহার পবিত্র জীবনকে আমৃত্যুকাল পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পুরাতন এবং সরলসত্য; তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কথায়, কার্য্যে এবং কবিতায় সেই সত্য প্রতিধ্বনিত। নিম্নলিখিত কথা কয়টি তাঁহার মুলমন্ত্র ছিলঃ—

"পাপেতে পৃথিবী ক্ষার
ধর্ম্মতথা নাহি আর,
অনেকে 'মিলে'র ছাত্র
ধর্ম্মকর্ম্ম কথামাত্র।
কপটতা ধর্ম্মসাজে
পৃথিবী ঢাকিয়া আছে।
ধর্ম্ম যদি চাও ভাই—
ধর্ম্মসাজে কাজ নাই;
কপটতা পরিহর,
ভাল হও ভাল কর।"

"ভাল হও ভাল কর"—ইহা যদি আমাদের প্রত্যেকেরই মূলমন্ত্র হইত, তাহা হইলে আমরা আজ যেরূপ অধঃপতিত, নিঃসন্দেহই সেরূপ থাকিতাম না।

গ্রামবার্ত্তার ঋণভার ক্রমে বৃদ্ধি হওয়াতে দীর্ঘ ২২ বৎসরকাল পরে তাঁহার সাধের পত্রিকাখানিকে বন্ধ করিতে হইল, কিন্তু তখন গ্রামবার্ত্তার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। "Old order changeth yielding place to new"—কবির এই মহাবাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, অনেকগুলি নূতন সাময়িক পত্রিকা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গ্রামবার্ত্তার স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, সুতরাং অতঃপর গ্রামবার্ত্তার আর বিশেষ আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু গ্রামবার্ত্তার ঋণশোধ একটা ঘোর দুর্ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। পরমেশ্বর এরূপ বিশ্বাসী ভক্তকে কখন চিরবিপদে নিক্ষেপ করেন না, গ্রামবার্ত্তার ঋণ শোধের উপায় সহজেই হইল, সে কথা আমরা পরে বলিতেছি।

অতঃপর হরিনাথ ভজনসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। বাল্যে তাঁহার যে প্রেম তাঁহার আত্মীয় পরিজন এবং সহপাঠীবর্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, যৌবনে যাহার উদ্দীপনা তাঁহার স্বদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা উপকার এবং সহানুভূতিরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যে সেই প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উন্মত্ত আবেগে সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া বিশ্বেশ্বরের অনন্ত মহিমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রেমের গতিই এইরূপ। প্রেম ও নদী উভয়েরই

গতি সমান, প্রথমে ইহা গিরিগহ্বরে উদ্ভূত হইয়া নির্ঝরিণীরূপে নাচিয়া নাচিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ব শোভিত, জীবন্ত এবং পত্রপুষ্পময় করিয়া তোলে, তাহার পর তাহা নদীরূপে নগর ও গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, লক্ষ লক্ষ লোক তাহার সংস্পর্শে প্রাণ প্রাপ্ত হয়, দেহ পবিত্র করে, অবশেষে সেই প্রেমমন্দাকিনী বহুমুখী ও প্রশস্তকায়া হইয়া তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে আসিয়া মহাসাগরের সুনীল, অনন্ত, অসীম জলরাশির সহিত সম্মিলিত হয়। হরিনাথের জীবন প্রেমের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতির সুন্দর দৃষ্টান্ত।

হরিনাথের প্রধান কীর্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাউলের দল ; এই দলেয় প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত। আমরা উপরে বলিয়াছি সাধারণের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত ; অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত করিবার জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফিকিরচাঁদের গীতাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি সদলবলে এই গীতগুলি প্রকাশ্যভাবে গাহিতে আরম্ভ করেন ; এইরূপ ফিকির করিয়া সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের প্রচার করাতে এই দলের নাম ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল হয়, ফিকিরচাঁদ নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। সহজ ভাষায় সাধারণের আয়ত্বাধীন সুরে গীত এই সকল সঙ্গীতে লোকের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়াতে দেহ ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সঙ্গীত ভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় দুরবস্থাজ্ঞাপক অনেক সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই, শুধু তাঁহার দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানগুলিই এখন বঙ্গদেশের অনেক পল্লীতে ফকির বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই সকল সঙ্গীত রচনাপূর্ব্বক তাহা গ্রন্থাকারে বিক্রয় করাতে এবং কোন উৎসব উপলক্ষে কাহারো বাড়ীতে দলবল লইয়া গান করায় কিছু কিছু অর্থলাভ হইতে লাগিল ; এই অর্থ সাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু সঙ্গীত-সভার সভ্যগণ নির্দ্দেশ করেন যে, তাহা হরিনাথের গ্রামবার্ত্তার ঋণ পরিশোধে এবং সেই ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর তাঁহার সাহায্যার্থে নিয়োজিত হইবে। এই উপায়েই হরিনাথের সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়াছিল। উক্ত বাউলসঙ্গীতগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক গীত তাঁহার স্বরচিত নহে, কিন্তু সকলগুলিকেই তিনি সমান আদর করিতেন, এবং সকলগুলিই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের ভনিতায় রচিত।

সাধারণের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার পর হইতে হরিনাথ "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" নামক সাধনবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডবেদ তাঁহার ভক্তহৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ; এখনো ব্রহ্মাণ্ডবেদের যে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সঞ্চিত আছে, তদ্দ্বারা চারি পাঁচ বৎসর এই গ্রন্থ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। নানা রোগে জীর্ণ এবং চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়াও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য লেখনীকে বিশ্রাম দেন নাই।

ব্রহ্মাণ্ডবেদে তিনি যে সমুদয় সূত্র বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু জীবনে তিনি কোনদিন সংস্কৃত সাহিত্য কিম্বা

ব্যাকরণ পাঠ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম বক্তা পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পিতা সুপণ্ডিত স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল, এবং তাঁহারই সাহায্যে হরিনাথ অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহাও তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'কুমারখালীর ইতিহাস' নামক একখানি পুস্তকে তিনি অনেক প্রাচীন ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, এবং রোগশয্যায়-শায়িত হইয়াও 'মাতৃমহিমা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। যৌবনে কর্ত্তব্যজ্ঞান-সঞ্চারের সময় হইতে তিনি যে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে তাহা চালন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের কার্য্যেই তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ মহৎজীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের কৃতবিদ্য সাহিত্য সেবীগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে হরিনাথের নিকট ঋণী ; তন্মধ্যে দুই একজনের নাম উল্লেখ করা বোধ করি অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমাদের সহযোগী লেখক ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র ও বাবু জলধর সেন প্রথম জীবনে হরিনাথের নিকটেই বঙ্গসাহিত্যের সেবাব্রত গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকও এই ব্রত গ্রহণ করিয়া হরিনাথের সহানুভূতি এবং উৎসাহলাভে বঞ্চিত হয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে কুমারখালী গিয়া দুই একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি অধিক কথা বলেন নাই, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে যে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় তাহা হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল, এবং এতদিন পরে এখনো তাহা চিরনবীনভাবে কর্ণমূলে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতেছে।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাশিমবাজার অবরোধ।

মুসলমানের পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদের সৌভাগ্য-কাহিনী কালক্রমে জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাহার বড়ই গৌরবের অবস্থা ছিল। ভাগীরথী-তীর সমাশ্রিত সুরচিত পুষ্পোদ্যান, এবং তন্মধ্যবর্ত্তী উভয় তটান্ত-মিলিত সুগঠিত অট্টালিকাশ্রেণী সেকালের মুসলমান রাজধানীকে গর্ব্বোন্নত বৃটিশ রাজনগরী লণ্ডনের মতই সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল ; বরং লণ্ডন অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের ধনগৌরব যে সমধিক

স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, সেকালের ইংরাজ রাজপুরুষেরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। *

এই মোগল রাজধানীতে কোনরূপ রাজদুর্গ ছিল না; কয়েকটি নগর-তোরণ ভিন্ন পুরী-রক্ষার জন্য প্রাচীর পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যাইত না। মোগলের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিয়া কেহ যে সহসা বাহুবলে রাজধানী অধিকার করিতে সাহস পাইবে, এমন কথা স্বপ্নেও কল্পনায় স্থান পাইত না!

রাজধানীর এইরূপ অরক্ষিত অবস্থার সন্ধান পাইয়া লুণ্ঠনলোলুপ মহারাষ্ট্রসেনা যখন সত্যসত্যই নগর আক্রমণ পূর্ব্বক জগৎশেঠের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত লুঠিয়া লইয়া গেল, তখন কাহারো কাহারো কথঞ্চিৎ চেতনা হইয়াছিল। কিন্তু বাহুবলোন্মত্ত মুসলমান নবাব সেদিকে লক্ষ্যপাত না করিয়া, স্বস্ব ধনপ্রাণ-রক্ষার জন্য প্রজাসাধারণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন; রাজধানী রক্ষার জন্য কোনরূপ আয়োজন আরব্ধ হয় নাই। রাজানুমতি লাভ করিয়া আর কেহ কিছু করুক না করুক, সুচতুর বৃটিশ বণিক সেই সুযোগে কাশিমবাজারের বাণিজ্যাগারের চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিয়া, কামান পাতিয়া, সিংহদ্বার সাজাইয়া, একটি ছোট খাট রকমের দুর্গরচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা ধূলিপরিণত হইয়াছে; কেবল স্থান-নির্দ্দেশের জন্য কতকগুলি স্বচ্ছন্দবনজাত তীরতরু সগৌরবে আকাশে অঙ্গ বিস্তার করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ভাগীরথী-স্রোত সসম্ভ্রমে তাহার নিকট হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিয়া, ধ্বংসাবশিষ্ট ইংরাজদুর্গের পরিত্যক্ত ভিত্তিভূমি আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। †

এই ইংরাজ দুর্গটি সমচতুষ্কোণ না হইলেও দেখিতে প্রায় চতুষ্কোণ বলিয়াই বোধ হইত। চারিদিকে দৃঢ়োন্নত দুর্গপ্রাচীর, প্রাচীর-সংলগ্ন চারিটি সুদৃঢ় বুরুজ, প্রত্যেক বুরুজে দশটি করিয়া কামান পাতা;—নদীর দিকে প্রাচীরের উপর দিয়া সারি সারি বাইশটি কামান, এবং সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহদায়তন আগ্নেয়াস্ত্র নিরন্তর বদনব্যাদান করিয়া বৃটিশ-বণিকের সমর-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিত! "সেলামীর তোপ" বলিয়া ইংরাজেরা আরো অনেকগুলি তোপ আনাইয়া দুর্গমধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন; যুদ্ধকলহ উপস্থিত হইলে, তাহাতেও গোলাবর্ষণ করিবার সুবিধা হইতে পারিত। এই সকল কারণে কাশিমবাজারের ইংরাজদুর্গ সহসা হস্তগত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ‡

এই ক্ষুদ্রকার ইংরাজদুর্গে উইলিয়ম ওয়াট্‌স্, কলেট্, ব্যাট্‌সন্, সাইক্‌স্, এইচ্ ওয়াট্‌স্,

* The city of Muxudabad is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference, that there are individuals in the first, possessing infinitely greater property than any in the last city.—Evidence of Lord Clive before the Committee of the House of Commons—1772.

† There is a rough plan of the Fort in Tieffenthaler, I. 453. plate XXXI.

‡ Captain Grant.

চেম্বার্স্, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ বাস করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের বাণিজ্য ব্যবসায়ের ভিত্তিমূল রক্ষা করিতেন;—দুর্গ রক্ষার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা দুর্গমধ্যে পাদচারণ করিয়া বেড়াইত। *

একজন ইংরাজ ইতিহাস-লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করিতে না করিতেই ইংরাজেরা নির্ব্বিবাদে দুর্গ ত্যাগ করিয়া নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। † এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিলাতের 'বৃটিশ মিউজিয়মে' কাশিমবাজার অবরোধের একখানি হস্তলিখিত ইতিহাস আছে, কেহ কেহ বলেন যে তাহা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রচিত। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বিভারিজ্ মহোদয় তাহার কিয়দংশ এদেশে প্রকাশিত করিয়া ‡ অনেকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যাহারই রচিত হউক, সেগুলি যে ইংরাজলিখিত সমসাময়িক আত্মকাহিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আত্মকাহিনী লিখিবার সময়ে লেখক অবলীলাক্রমে দিন দিন যখন যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রেণীবদ্ধ ইতিহাস নহে, সুতরাং কোন বিশেষ মত সংস্থাপনের জন্য কিম্বা একজনের দোষে আর একজনকে অপরাধী করিবার জন্য কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। ইংরাজ লেখনীর যদৃচ্ছোৎগত সাময়িক কাহিনী বলিয়া সেগুলি যথার্থই সমধিক সমাদরের যোগ্য।

উত্তরকালে ইতিহাস-পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলার কীর্ত্তিকলাপ বিকৃতবর্ণে সুরঞ্জিত করিবার জন্য ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইংরাজ প্রতিনিধি ডাক্তার ফোর্থ সিরাজদ্দৌলাকে মিথ্যাবাদী সপ্রমাণ করিবার জন্য গায়ের জোরে অনেক কথাই অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাশিমবাজারের ইংরাজ সওদাগরেরা সকলেই জানিতেন যে, তাঁহারা যে ঘসেটি বেগমের পক্ষপাতী, সে কথা সিরাজদ্দৌলার নিকট লুক্কাইত নাই; আজি হউক, কালি হউক, আর দশদিন পরেই হউক, বৃদ্ধ নবাবের মানব-লীলা অবসানপ্রাপ্ত হইলে, সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরাজ বণিকের তুমুল সংঘর্ষের সূত্রপাত হইবে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতেন না। সেই জন্য সময় থাকিতে তাঁহারা গোপনে গোপনে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন, এবং সেই সাধু সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া কাশিমবাজারের ইংরাজদুর্গে সাধ্যমত গুলি গোলা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে কাশিমবাজারে যে সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ করিয়া উত্তরকালে কাপ্তান গ্রাণ্ট কতই আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। §

* Hasting's MSS. vol. 29209.

† He forthwith presented himself at the gate of the English factory at Cassimbazar, which immediately surrendered, without an effort being made to defend it.—Thornton's History of British Empire vol I.

‡ Calcutta Review.

§ We may justly impute all our misfortunes to the loss of that place, (Cassimbazar) as it not only supplied our enemies with artillery and ammunition of all kinds, but flushed them with hopes of making as easy a conquest of our chief settlement.—Captain Grant.

ঘসেটি বেগমকে বশীভূত করিয়াই সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইলেন না। উত্তরে পূর্ণিয়াধিপতি শওকতজঙ্গ, এবং দক্ষিণে কলিকাতাবাসী উদ্ধত ইংরাজ তখনো প্রবল-স্পর্দ্ধায় তাঁহার রাজশক্তিকে উপহাস করিতেছিলেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা রাজধানীর ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবামাত্র, পূর্ণিয়ার ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবার জন্য সসৈন্যে রাজমহলের পথে পূর্ণিয়াভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গমনকালে কলিকাতাবাসী উদ্ধত ইংরাজকে পুনর্ব্বায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "ইংরাজ-গবর্ণর ড্রেক সাহেব পত্রপাঠ দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ না করিলে সিরাজদ্দৌলা সশরীরে শুভাগমন করিয়া ড্রেক সাহেবকে ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন।"*

যথাকালে এই পত্র ইংরেজ দরবারের হস্তগত হইল। তাঁহারা এতদিন মহারাজ রাজবল্লভ এবং ঘসেটি বেগমের মুখের দিকে চাহিয়া, সিরাজদ্দৌলার প্রেরিত সম্ভ্রান্ত রাজদূতদিগকে অপমান করিয়া নগর-বহিষ্কৃত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই; রাজলিপি পাইয়াও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কিন্তু এখন সেই সিরাজদ্দৌলা আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিতেছেন দেখিয়া, সকলেই আতঙ্কযুক্ত হইলেন। ইংরাজ বণিকের বিষম সমস্যা। বুদ্ধিমান ইংরাজ অনেক গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়াও সরলভাবে সমস্যাপূরণ করিতে পারিলেন না। এবার পত্রোত্তর প্রদত্ত হইল, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবের কিছুমাত্র উত্তর প্রদত্ত হইল না।

মহামতি ড্রেক লিখিয়া পাঠাইলেন যে, 'সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা, কে বলিল যে ইংরাজেরা কলিকাতায় নগর-প্রাচীর রচনা করিতেছেন? ফরাসীদিগের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কেবল সেই আশঙ্কায় নদীতীরের কামান পাতিবার স্থানগুলি মেরামত করা হইতেছে!' † ড্রেকসাহেবের এইরূপ প্রত্যুত্তরে ইংরাজ ইতিহাস-লেখকও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদিগের উপর যেরূপ খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ সময়ে এই প্রকার প্রত্যুত্তর প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ‡

* That unless upon receipt of that order, he (Mr. Drake) did not immediately begin and pull down those fortifications, he would come down himself and throw him in the river.—Hasting's MSS. vol. 29209.

† That the Nabob had been misinformed by those who had represented to him that the English were building a wall round the town, that they had dug no ditch since the invasion of the Marattas, at which time such a work was executed at the request of the Indian inhabitants, and with the knowledge and approbation of Alliverdy; that in the late war between England and France, the French had attacked and taken the town of Madras, contrary to the neutrality, which it was expected would have been preserved in the Mogal's dominions; and that there being at present great appearance of another war between the two nations, the English were under apprehensions that the French would act in the same manner in Bengal;—to prevent which, they were repairing their line of guns on the bank of the river.—Orme ii. 55-56.

‡ Ibid.

ইহারই নাম 'ধান ভানিতে মহীপালের গীত'! ইংরাজেরা বাগবাজারের নিকটে পেরিং নামক একটি নূতন দুর্গ-প্রাকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার ইংরাজ দুর্গে ইচ্ছানুরূপ সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, অথচ তাহার কোন কার্য্যের জন্যই সিরাজদ্দৌলার অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে পুরাতন দুর্গ চূর্ণ করিতে বলেন নাই, বাগবাজারের নিকট যে নূতন দুর্গ-প্রাকার রচিত হইয়াছিল, তাহাই চূর্ণ করিতে বলিয়াছিলেন। ইংরাজেরা অনেক কথাই লিখিলেন, কিন্তু তাহার কথা বিন্দু বিসর্গও উল্লেখ করিলেন না। কে বলিল যে ইংরাজেরা নগর বেষ্টন করিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন? সিরাজদ্দৌলাও সেরূপ অভিযোগ শ্রবণ করেন নাই! তিনি কেবল পেরিং নামক দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিবার জন্যই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন;—ড্রেক্ সাহেব তাহার সম্বন্ধে রামগঙ্গাবিষ্ণু কোন কথাই দন্তস্ফুট করিলেন না।

উদ্ধত ইংরাজের কুটিল কৌশল সিরাজদ্দৌলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তিনি যখন রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সেই সময়ে ড্রেক সাহেবের পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইল। পত্র পড়িয়া সিরাজদ্দৌলা একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন, পাত্রমিত্র আত্মীয় অন্তরঙ্গ,—যাঁহারা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কেহই সাহস করিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না।* সিরাজদ্দৌলা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন;—অভিমানিনী কালসাপিনী পদাহতা হইয়া যেমন সফেণ হলাহলকণা বিকীরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ-শিরে গর্জ্জন করিয়া উঠে, সেইরূপ তীব্র তেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন! সমুদয় হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি আজ্ঞামাত্রে পটমণ্ডপ উঠাইয়া লইয়া আবার মুর্শিদাবাদ অভিমুখে মহাকলরবে ধাবিত হইল; সকলেই বুঝিল যে এবার আর ইংরাজের নিস্তার নাই। এই মুহূর্ত্ত হইতে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস রুধির-কর্দ্দমে কলঙ্কিত হইবার সূত্রপাত হইল। রাজমহলের পটমণ্ডপে উদ্ধত ইংরাজের অসংযত লেখনী সিরাজদ্দৌলার অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিল, সিরাজদ্দৌলার পরবর্ত্তী জীবনকাহিনী কেবল সেই বিষবৃক্ষের ক্রমবিকাশের শোচনীয় ইতিহাস!

জগতের স্বাধীন নরপতিদিগের তুলনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার এই রাজরোষের সমালোচনা করিতে হইলে কেহই তাঁহাকে ভৎর্সনা করিবার অবসর পাইবেন না। পৃথিবীর মহাবিপ্লবময় সামরিক ইতিহাসের সুবিখ্যাত যুদ্ধকাহিনী আলোচনা করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সিরাজদ্দৌলা যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কত তুচ্ছ কথা লইয়া গায়ে পড়িয়া ইংরাজ-রাজ এই জ্ঞানোজ্জ্বল যুক্তিতর্ক-পরিচালিত-ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কতদেশে কত লোমহর্ষণ ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিতে বাধ্য হইতেছেন! রাজশক্তি চিরদিনই প্রভুশক্তি; শত্রু হউক আর মিত্র হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতি হউক, আর পদাশ্রিত দীনহীন দুর্ব্বল প্রজাই হউক,—যে কেহ সমুন্নত রাজশক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে; তাহাকেই পদানত করিবার জন্য রাজ-

* Stewart's History of Bengal.

রোষ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, ইহাই সকল দেশের রাজধর্ম্ম! সিরাজদ্দৌলা সেই রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পদাশ্রিত ইংরাজ বণিকের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফলপ্রদান উদ্দেশ্যে, তাঁহাদিগের কাশিমবাজারের ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

কি কি ঘটনা পরম্পরায় নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অনেকে অনেক কারণে তাহার মূলানুসন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের ইতিহাসে 'কাশিমবাজার অবরোধ'ও যে সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার চরিত্র সমালোচনার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, পরবর্ত্তী ঘটনাপরম্পরাও সমালোচনা করিয়া সত্যোদ্ঘাটন করিতে হইবে। সিরাজদ্দৌলা নিতান্ত উত্যক্ত হইয়াও কিরূপ সুকৌশলপূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রকাশপূর্ব্বক বিনা রক্তপাতে কাশিমবাজার হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলেই সত্যনির্ণয় করিতে আর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে সোমবার অপরাহ্নে উমরবেগ জমাদার তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কাশিমবাজারে উপনীত হইয়া নীরবে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। নবাবের সিপাহী সেনা প্রায় মধ্যে মধ্যে এরূপভাবে কাশিমবাজারে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া থাকে; সুতরাং সেদিন আর কেহ কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিল না; রজনী প্রভাত হইতে না হইতে আরো দুইশত অশ্বারোহী এবং কতকগুলি বরকন্দাজ আসিয়া উমরবেগের শিবিরে মিলিত হইল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইটি সুশিক্ষিত রণহস্তী হেলিতে দুলিতে কাশিমবাজারে শুভাগমন করিল। ইহাতে ইংরাজদিগের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা কিরূপভাবে নবাবের সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে কলিকাতা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং একে একে দুই একটি করিয়া সুচতুর ইংরাজ-কুঠিয়াল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।* যাঁহারা দুর্গমধ্যে রহিলেন, তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন যে, এতদিনে প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; যেমন রজনীর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিবে, অমনি নবাবসেনা বলপূর্ব্বক দুর্গপ্রবেশ করিয়া ইংরাজদিগকে ধনেবংশে বিনাশ করিয়া তীব্র প্রতিহিংসা সাধন করিবে! তখন দুর্গমধ্যে কেবল ৩৫ জন গোরা আর ৩৫ জন কালা সিপাহী; আর জনকত লস্কর ভিন্ন অধিক সেনাবল ছিল না। তাহারাই অগত্যা তুরী ভেরী বাজাইয়া, শিরস্ত্রাণ বাঁধিয়া, কোমরবন্ধ আঁটিয়া তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে, বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া সগর্ব্বে সিংহদ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সিপাহীরা সেদিনও দুর্গ আক্রমণের কোনরূপ আয়োজন করিল না, বরং জমাদার উমরবেগ নথাগ্রগণনীয় ইংরাজ সেনাগণকে সগর্ব্বে পদচালনা করিতে দেখিয়া সূচনাতেই বলিয়া পাঠাইলেন

* Hastings escaped at about the same time, and the Cassimbazar tradition, which is probably a true one, is that he owed his safety to his Dewan Kanta Babu, who concealed him in a room.—H. Beveridge C. S.

যে, তিনি যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। ওয়াট্স্ সাহেব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে সমুদায় রজনী অন্নপান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; অগনিত নবাবসেনা বাহুবলে দুর্গ আক্রমণ করিলে, তাঁহারাও যে বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, তাহারই অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে বড় বড় কামানে গুলি, গোলা, বারুদ বোঝাই করিয়া, আক্রমণপ্রতীক্ষায় সিংহদ্বার রোধ করিয়া সসৈন্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন!

সোম, মঙ্গল, বুধ চলিয়া গিয়াছে; বৃহস্পতিবারও চলিয়া যায়। প্রাচীরের বাহিরে সিপাহীসেনা কাতারে কাতারে সমবেত হইতেছে, ইচ্ছা করিলে এখনি কাশিমবাজারের ক্ষুদ্র দুর্গ ধূমপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মাবশেষ করিতে পারে; অথচ একজন সিপাহীও বন্দুক উঠাইতেছে না কেন? ইংরাজগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দিয়া অনেক উৎকট চিন্তা করিয়াও কেহ কিছু তথ্যনির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে এরূপ নিদারুণ উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল;—ব্যাপার কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ডাক্তার ফোর্থকে উমরবেগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ডাক্তার সাহেব যথাকালে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিল যে, ওয়াট্স্ সাহেবকে নবাব-দরবারে হাজির হইয়া একখানি মুচলিকা-নামা লিখিয়া দিতে হইবে; সহজে সম্মত না হইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবে, সেইজন্যই এত সৈন্যসামন্ত সম্মিলিত হইয়াছে। কৌতূহল নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু উৎকণ্ঠা দূর হইল না। উমরবেগের কথার উপর নির্ভর করিয়া ওয়াট্স্ সাহেব আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর আবেদন-পত্র প্রেরিত হইল। তাহাতে লিখিত হইল যে, নবাববাহাদুরের অভিপ্রায় অবগত হইতেই যাহা কিছু অপেক্ষা, তিনি যাহা বলিবেন, ইংরাজেরা তাহাতেই সম্মত হইবেন। যথাকালে কেবল এইমাত্র উত্তর আসিল;—"দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিয়া ফেল; তাহাই নবাবের একমাত্র অভিপ্রায়।" *

ইংরাজেরা শিষ্টাচারের অনুরোধে লিখিয়াছিলেন যে, নবাববাহাদুর যাহা চাহিবেন, তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইবেন। এক্ষণে নবাব যাহা চাহিলেন, ওয়াট্স্ সাহেব তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজ-দরবার প্রাণান্তেও এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক কলিকাতার ইংরাজ-দরবার সিরাজদ্দৌলাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা কাশিমবাজার অবরোধের সংবাদ পাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা হয়ত কিছু উৎকোচ উপঢৌকন আদায় করিবার নূতন কৌশল! সুতরাং যেমন বুঝিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবেই নবাবের মনস্তুষ্টি-সাধনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও দেশের রাজা; এখন হয়ত তাঁহাকে আর মোমের পুতুলে কি কাচের খেলনায়

* Hasting's MSS. vol. 29209.

প্রতারিত করা সহজ হইবে না, এমন কথা ইংরাজের উর্ব্বরমস্তিষ্কে স্থানলাভ করিল না! তাঁহারা পাত্রমিত্রদিগকে হস্তগত করিলেন, চিরাভ্যস্ত মহাস্ত্র প্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ সন্ধি-স্থাপনের আয়োজন করিলেন; কিন্তু ইংরাজের কষ্ট-সঞ্চিত অর্থে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধই সার হইল;— সিরাজদ্দৌলা বিচলিত হইলেন না।

ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া দেওয়ান রাজবল্লভকে ধরিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। দেওয়ানজী সিরাজদ্দৌলার আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, এবার আর মন্ত্রৌষধিতে কুলাইবে না; তিনি বলিলেন যে, ওয়াট্‌স্ সাহেব যদি হাতে রুমাল বাঁধিয়া হীনবেশে সিরাজদ্দৌলার নিকট উপস্থিত হইতে সাহস পান, তবে তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। * ওয়াট্‌স্ সাহেব বিলক্ষণ ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন।

মহারাজা রাজবল্লভ, দুর্ল্লভরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। সিরাজের রাজত্বকালেই পিতৃ-সাহায্যে ইনি খালসার রাঁই রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন বলিয়া কথিত আছে। পিতাপুত্র উভয়েই ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ক্লাইবও তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। দুর্ল্লভরামের কলিকাতায় পলায়নের পর, ক্লাইব মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস্ সাহেবকে উপযুক্ত অনুচরাদিসহ রাজার পরিবারবর্গকে পাঠাইবার আদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন,—"রায় দুর্ল্লভ ও ইংরেজগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বোধহয়, তোমার বিদিত নাই। আমরা কেবল তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার পরিবারবর্গেরও রক্ষার জন্য লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিশেষ বাধ্য।' কোম্পানীর আমলেও রাজবল্লভ আজীবন খালসার রাঁই রায়ান পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭০১৭ নং রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায়, নূতন রাণী (তাঁহার স্ত্রী) মৃতপতির কার্য্য উল্লেখ করিয়া পেন্সন্ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার পোষ্যপুত্র-বংশীয়েরা এক্ষণে কলিকাতা রাজা রাজবল্লভ-ষ্ট্রীটে বাস করেন।" †

জগৎশেঠ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রদিগের সহায়তা লাভ করিয়াও ইংরাজবণিক সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি করিতে পারিলেন না। তখন কলিকাতার ইংরাজ-দরবার নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ওয়াট্‌স্‌কে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আর কালবিলম্ব করিয়া কি হইবে, যাহাতে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি হয় তাহাতেই সম্মত হইতে হইবে। ‡ এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ওয়াট্‌স্ সাহেব দেওয়ানজীর পরামর্শমতেই নবাব-দরবারের সম্মুখীন হইলেন।

ওয়াট্‌স্ সাহেব নবাব-দরবারে উপনীত হইবামাত্র সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন; ওয়াট্‌স্ বাতাহতকদলীপত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; কেহ কেহ ভাবিলেন যে, ইহার'পর হয়ত

* Hasting's MSS. vol. 29209.

† সাহিত্য, ৬ষ্ঠবর্ষ, দশমসংখ্যা—'নবাবী আমলে হিন্দুকর্ম্মচারী'—৬৯৭ পৃষ্ঠা।

‡ The Presidency were now very eager to appease the Subadar, they offered to submit to any condition which he pleased to impose.—Mill's History of British India Vol. III. 147.

ওয়াট্‌স্ সাহেবকে ডালকুত্তার মুখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মকার্য্য বিস্মৃত হইলেন না। ওয়াট্‌স্‌কে স্বতন্ত্র পটমণ্ডপে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রস্তাবিত মুচলিকাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য আদেশ করা হইল। ওয়াট্‌স্ সাহেব আশু প্রাণদান পাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে মুচলিকা স্বাক্ষর করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া পরিত্রাণ লাভ করিলেন। কলিকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত পেরিং দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিতে হইবে; যে সকল বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কলিকাতায় পলায়ন করিয়া থাকে তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া দিতে হইবে; বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যে বাদশাহী সনন্দ পাইয়াছেন, তাহার দোহাই দিয়া অন্য লোকেও বিনাশুল্কে বাণিজ্য চালাইয়া রাজকোষের যত ক্ষতি করিতেছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে; এবং কলিকাতার জমীদার হল্‌ওয়েল্ সাহেবের প্রবল প্রতাপে দেশীয় প্রজাবৃন্দ যে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, তাহা রহিত করিতে হইবে;—এই মর্ম্মে মুচলিকা-পত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল। *

ইতিহাস-লেখকদিগের স্বকপোল-কল্পিত বা আত্মস্বার্থ-বিজৃম্ভিত সরস পদলালিত্য অপেক্ষা এই সকল কাগজপত্র অধিকতর মূল্যবান। ইহাতে সিরাজ-চরিত্রের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত ইতিহাস-বর্ণিত সিরাজদ্দৌলার আকাশপাতাল প্রভেদ। ইংরাজেরা পদাশ্রিত বণিক হইয়াও নবাবের বিনানুমতিতে যে দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ স্বাধীন নরপতি তাহা চূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন না করিতেন? ইহাতে সিরাজদ্দৌলার প্রবল প্রতাপ ও শাসনদার্ঢ্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজেরা পলায়িত রাজকর্ম্মচারীদিগকে নির্ব্বিবাদে কলিকাতায় আশ্রয় দিবার অবসর পাইলে নবাবের রাজশক্তিকে আর কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও সম্মান করিত না, আবশ্যক হইলেই কলিকাতায় পলায়ন করিত। শাসন সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই তাহার গতিরোধ করা আবশ্যক। কোম্পানীর নামের দোহাই দিয়া ইংরাজগণ যাহাকে তাহাকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া আত্মোদর পরিপূর্ণ করিতেন; তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্য অবসন্ন হইত, রাজকোষ শুল্কগ্রহণে অযথা বঞ্চিত হইত। এরূপ স্বেচ্ছাচার নিবারণ না করিলে কোন নরপতি সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিতেন? হল্‌ওয়েলের অত্যাচারে কালা বাঙ্গালী জর্জ্জরিত হইতেছিল, তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিলে কোন্ নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখক সিরাজদ্দৌলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে সম্মত হইতেন? এই মুচলিকা-পত্রে

* The purport of the Muchalka was nearly as follows :—

To destroy the redoubt etc. newly built at Perrins near Calcutta ; to deliver up any of his subjects that should fly to us for protection (to evade justice) on his demanding such subject ; to give an account of the dastaks for several years past, and to pay a sum of money that should be agreed on, for the bad use made of them, to the great prejudice of his revenues ; and lastly to put a stop to the Zemindar's (Holwell's) extensive power, to the great prejudice of his subjects.—Hasting's MSS. vol. 29209. ইহার শেষোক্ত সর্ত্তটি কিন্তু অন্য কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিরাজদ্দৌলার যেরূপ চরিত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, কয়জন সৌভাগ্যশালী স্বাধীন নরপতি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিয়া সেরূপ চরিত্রবল, সেরূপ শাসন-কৌশল, সেরূপ প্রজাহিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? তথাপি সিরাজদ্দৌলা ইংরাজের ইতিহাসে ইহার জন্যও শতধিক্কারে সম্বোধিত হইয়াছেন! আর আমরা তাহাকেই স্বদেশের ইতিহাস বলিয়া পরম সমাদরে পুস্তকালয় সুসজ্জিত করিতেছি!

৪ঠা জুন মুচলিকা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কাশিমবাজারের ইংরাজদুর্গ সিরাজদ্দৌলার হস্তে সমর্পিত হইল। লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়ট সেই অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন। ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্স্ মুচলিকার সর্ত্ত-পালনের জন্য প্রতিভূ স্বরূপ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।* কাশিমবাজার আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। সিরাজদ্দৌলা যেরূপ সুকৌশলে বিনারক্তপাতে এই সকল রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী কেহই তাহার মর্ম্মাস্বাদ করিয়া সিরাজদ্দৌলার শাসনপ্রতিভার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলেন না; বরং অনেকেই কুটিলকটাক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, দুর্গ হস্তগত হইল, মুচলিকা স্বাক্ষরিত হইল, ইংরাজ অপদস্থ হইল, তথাপি ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্স্‌কে কারারুদ্ধ অপরাধীর ন্যায় মুর্শিদাবাদে বসাইয়া রাখা হইল কেন?

যাঁহারা উৎপীড়নের জন্যই উৎপীড়ন-কার্য্যে প্রশ্রয়দান করেন, তাঁহাদের উৎপীড়ন কার্য্যের মধ্যে কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদিগের বিচারে ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্সের কারাবাস নিতান্ত হেতুশূন্য অন্যায় উৎপীড়ন বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সিরাজদ্দৌলা কোনপ্রকার অন্যায় উৎপীড়নের প্রশ্রয়দান করেন নাই; তিনি দেখিয়াছিলেন যে, কলিকাতার ইংরাজ-দরবারই ইংরাজদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; কাশিমবাজারের কুঠিয়ালগণ নগণ্য রাজকর্ম্মচারীমাত্র, সর্ব্বাংশে কলিকাতার মুখাপেক্ষী। সুতরাং কাশিমবাজারের ইংরাজ গোমস্তা যেরূপভাবে মুচলিকাপত্র স্বাক্ষর করিলেন, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাহা স্বীকার না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। অগত্যা কলিকাতার ইংরাজ-দরবারকে শাসন-কৌশলে বশীভূত করিবার জন্যই ওয়াট্‌স্ ও চেম্বার্স্‌কে মুর্শিদাবাদে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্স্ একপক্ষ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিলেন, এই সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াও কলিকাতার ইংরাজ দরবার মুচলিকা সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিলেন না! এদিকে বিবি ওয়াট্‌স্ বেগমমহলীতে যাতায়াত করিয়া করুণ-ক্রন্দনে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন! বিবি ওয়াট্‌সের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার মাতার সখিত্ব ছিল। সেই সুবাদে করুণাময়ী সিরাজ-জননী বন্দীদ্বয়ের মুক্তিদানের জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে মাতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদ্বয়কে প্রতিভূ লইয়া আপাততঃ মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইলেন।†

* The Bengal obituary.

† Hasting's MSS. vol. 29209

একজন সমসাময়িক ইংরাজ ইতিহাসলেখক এই মুচলিকানামার সমালোচনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে "ফরাসিদিগের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিতে মুচলিকা-পত্রের প্রথম সর্ত্ত পালন করা অসম্ভব; বাণিজ্যরক্ষা করিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে পদাশ্রিত ইংরাজ বন্ধুদিগকে আশ্রয়দান করা নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং দ্বিতীয় সর্ত্ত পালন করাও তথৈবচ; আর তৃতীয় সর্ত্ত পালন করিতে হইলেই যে অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে হইলেই তাহার অপব্যবহার হইয়া থাকে।*

ইংরাজেরা যে মুচলিকা পালন করিবেন না, সে কথা অল্পদিনের মধ্যেই সিরাজদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল! তিনি ইংরাজের কুটিল কৌশলের পরিচয় পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ইহারাই না বলিয়াছিলেন যে, নবাবের অভিপ্রায় কি তাহাই অবগত হইতে যাহা কিছু অপেক্ষা? ইহারাই না মুচলিকা পালন করিবেন বলিয়া বিবি ওয়াট্‌সের নয়নকজ্জলে ইংরাজ বন্দীর মুক্তিপত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন? সিরাজদ্দৌলা অনেক সহ্য করিয়াছেন; আর সহ্য করিতে পারিলেন না; ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অপরাধ! তাঁহার রোষকষায়িত নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; মাতামহের অন্তিম উপদেশ স্মৃতিপটে অনল-অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিল; স্মরণ হইল যে, মানবচরিত্র-বিবেচক-পরিণামদর্শী প্রবীণ নবাব দীর্ঘকাল ইহাদিগের সহবাসে জীবনযাপন করিয়া, অবশেষে অন্তিম সময়ে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন :—

They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say is the Law of the Most High *are only to be restrained by force.* † সুতরাং সিরাজদ্দৌলা আর আলস্যে কালক্ষয় না করিয়া, কলিকাতায় দূত পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা পদে পদে অপমানিত হইয়া যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, কলিকাতা আক্রমণের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা যায় না। কিন্তু কলিকাতা আক্রমণই তাঁহার কাল হইল! তিনি যদি ইংরাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস কিরূপ আকার ধারণ করিত, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নানাদিক হইতে নানা বিরুদ্ধ শক্তি যেরূপভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছিল, ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহার তাহারই বাহ্যস্ফূর্ত্তিমাত্র; সুতরাং বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া রাজশক্তি সংস্থাপনের চেষ্টা না করিলেও যে সিরাজ-জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিত, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

সিরাজদ্দৌলা যে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা আদ্যোপান্ত সকল কথা আলোচনা না করিয়াই লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, "কাশিমবাজার হস্তগত করিয়া, ইংরেজদিগের কাকুতি

* Ive's Journals.

† Ive's Journal.

মিনতি শ্রবণ করিয়া, নবাবের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজ তাঁহার ভয়ে এতই জড়সড় হইয়াছেন যে এ সময়ে বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিতে পারিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে; ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ-লুণ্ঠনের সুবিধা হইবে; কেবল সেইজন্যই সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন।" *

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতা-আক্রমণ।

৭ ই জুন প্রাতঃকালে কলিকাতার ইংরাজ-সওদাগরেরা সংবাদ পাইলেন যে, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে; স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন! সেই দিনই ঢাকা, বলেশ্বর, জগদীয়া, প্রভৃতি মফঃস্বল-কুঠির ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগকে তহবিলপত্র কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িবার জন্য তাড়াতাড়ি পত্র লেখা হইল। † রোজার ড্রেক তখন কলিকাতার গবর্ণর। তিনি বাহুবলে নগররক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেনাদল সংগ্রহ করিবার জন্য নগরের মধ্যে ঢোল পিটিয়া দিয়া, ড্রেক সাহেব সবিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কলিকাতাবাসী ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, আরমানী, পর্ত্তুগীজ,—সকলকেই পরম সমাদরে সম্মিলিত করিয়া, রীতিমত সমর-কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখক জেমস্ মিল লিখিয়া গিয়াছেন যে,—ইংরাজ-দরবার কোন দিনই নবাবের নিকট কাকুতি মিনতি জানাইতে ত্রুটি করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিবেন না;—কেবল সেই ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়াই ইংরাজেরা সময় থাকিতে নগর রক্ষার জন্য কোনরূপ আয়োজন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন না! ‡

স্বদেশীয় বণিক-সমিতির পরাজয়-কলঙ্ক অপসারণ করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অকাট্য কৈফিয়ৎ ইংরাজের ইতিহাসে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়! এই কৈফিয়ৎ অত্যন্ত মুখরোচক; সিরাজদ্দৌলার অমানুষিক নির্দ্দয় স্বভাবের অভ্রান্ত নিদর্শন; এবং পরবর্ত্তী লেখকসম্প্রদায়ের

* The Subadar had a wish for a triumph, which he thought might be easily obtained; and he was greedy of riches, with which, in the imagination of the natives, Calcutta was filled.—Mill's History of British India, vol. iii. 147.

† *The 7th. June.*—Advice early in the morning was received at Calcutta of the loss of Cassimbazar factory, and that the Nabob was upon full march, with all his forces, for Fort William. The same day orders were sent to the Chiefs of Dacca, Jugdea, and Ballasore to withdraw and quit their factorys, with what effects they could secure.—Hasting's MSS, vol. 29209.

‡ The Presidency, trusting to the success of their humility and prayers, neglected too long the means of defence.—Mill's History of British India, vol. iii. 147.

ঐতিহাসিক গবেষণার উৎকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক। কিন্তু ইহা যেমন সুন্দর সুকৌশলপূর্ণ, সেইরূপ সরল সত্যসংযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ইংরাজেরা যে যথোপযুক্তভাবে নগররক্ষার সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন, সে কথা সত্য হইলেও, ইংরাজের অপরিণামদর্শিত্বই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা যে কায়মনোবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকে যৎপরোনাস্তি উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অগোচর ছিল না। তাহার পর যখন সংবাদ পাইলেন যে, মর্ম্মাহত সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করিয়া, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ওয়াট্‌স্ সাহেবকে কারারুদ্ধ করিয়া, মুচলিকা-পত্র স্বাক্ষরিত করাইয়া লইয়া, স্বয়ং সসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন; তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর কোথায়? তথাপি ইংরাজেরা নগর-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিলেন না কেন? সিরাজদ্দৌলার বিচিত্র ইতিহাসের আদ্যোপান্ত যেরূপ রহস্যপরিপূর্ণ, ইংরাজবণিকের এইরূপ বিমূঢ় ব্যবহারের মূলেও সেইরূপ নিগূঢ় রহস্য বর্ত্তমান। সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে, ইংরাজবণিকের মতিভ্রমের জন্য বিস্ময়ের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইংরাজেরা জানিতেন যে, সিরাজদ্দৌলার রাজসিংহাসন "নলিনীদলগতজলমিবতরলং;"—কখন্ কোন্ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার সেনানায়কদিগের মধ্যে অনেকেই অর্থগৃধ্নু; যাঁহারা মন্ত্রণাদাতা পাত্রমিত্র, তাঁহারও অনেকেই মন্ত্রৌষধির ক্রীতদাস; সিংহাসন কাহার,—সিরাজ না শওকতজঙ্গ,—এ সকল গুরুতর প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; এমন অবস্থায় ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কথায় দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিবেন কেন? তিনি কি শত্রুসঙ্কুল রাজসিংহাসন পশ্চাতে ফেলিয়া স্বয়ং সসৈন্যে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন? এ যুদ্ধসজ্জা কেবল বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহার জন্য আবার প্রাণপণ করিয়া নগর-রক্ষার আয়োজন করিয়া কি হইবে? বাহ্যাড়ম্বর বিস্তার করিবার জন্য নবাব-সেনা সত্য সত্যই কলিকাতা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই বা আতঙ্কিত হইবার কারণ কি? বাণিজ্য রক্ষার জন্য কত সময়ে কত অর্থ অনর্থক অপব্যয় করিতে হয়;—না হয় এতদুপলক্ষে নবাব-সেনানায়কদিগের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ কিছু কিঞ্চিৎ অপব্যয় হইয়া যাইবে! আর যদি সিরাজদ্দৌলাই সশরীরে শুভাগমন করেন, তাহাতেই বা ভীত হইবার প্রয়োজন কি? তিনি ত সেই মাতামহ-স্নেহপালিত অপরিণতবয়স্ক অসংযতচিত্ত দুর্ব্বল বালক;—সময়োচিত সরল তোষামোদ এবং পদোচিত কয়েক সহস্র রজতখণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিলেই, অর্থ লোলুপ নবীন নরপতি বিনাবাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না! ইংরাজদিগের আনুপূর্ব্বিক কার্য্য-কলাপ, তাঁহাদিগের উৎকোচ উপঢৌকনপূর্ণ কাতর নিবেদন, এবং নবাবদরবারের পাত্রমিত্রদিগের ইংরাজহিতৈষণা,—সকল কথা একত্র সমালোচনা করিতে হইলে,—এইরূপ সিদ্ধান্তই যে ইংরাজদিগকে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে আর ইতস্ততঃ হয় না।

এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নহে। কলিকাতায় বসিয়া নবাবে-দরবারের প্রতি দিবসের তর্ক বিতর্কের যে সকল গুপ্ত-সমাচার শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহাতে ইংরাজদিগের মনে এইরূপ সিদ্ধান্তই সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌল্লা যখন কলিকাতা আক্রমণের গুপ্তসঙ্কল্প পাত্রমিত্রদিগের নিকট দন্তস্ফুট করিলেন, তখন উৎকোচগ্রাহী ইংরাজহিতৈষী রাজকর্ম্মচারীমাত্রেই চারিদিক হইতে প্রবল প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের প্রতিবাদের স্থূলমর্ম্ম সেই এক কথা ;—এখনও সুসময় উপনীত হয় নাই ; এখনও সিংহাসন নিরাপদ হয় নাই ; এখনও শওকতজঙ্গ পদানত হয় নাই ; ইংরাজেরা নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব বণিক্ জাতি, তাহাদের দ্বারা এ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে ; ইত্যাদি ইত্যাদি। * সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, এই সকল স্বার্থান্ধ কাপুরুষদল, আপনারা অন্তরালে থাকিয়া, প্রকারান্তরে ইংরাজদিগের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে! ইহারা নামমাত্র নবাবের বেতনগ্রাহী ; কার্য্যতঃ সকলেই উৎকোচ-লোলুপ,ইংরাজবন্ধু। সুতরাং তিনি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। খোজা বাজিদ এই সময়ে হুগলীতে অবস্থান করিতেছিলেন ; ইংরাজদিগের প্ররোচনায় তিনিও নবাবকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু সিরাজদ্দৌলা বলিলেন যে, "ড্রেক সাহেব তাঁহাকে বড়ই অপমান করিয়াছেন ;—নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে ইংরাজেরা যেরূপভাবে বাণিজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, এখনও যদি তাঁহারা সেইরূপভাবে বাস করিতে সম্মত থাকেন, তবেই ইংরাজদিগকে আশ্রয়দান করা কর্ত্তব্য ; নচেৎ ইহাদিগকে আর কোন কারণে এদেশে বাস করিবার প্রশ্রয় দেওয়া হইবেনা !" †

তৎকালে কলিকাতায় যে অল্প কয়েক সহস্র ইংরাজ বণিকের বসতি ছিল, তাঁহারা যেমন সংখ্যায় নগণ্য, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত অশিক্ষিত। তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সবিশেষ আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন। কিন্তু পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালের অবসর পাইয়া কুচক্রীদল শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশসাধন করে, এইভয়ে যাঁহার যাঁহার প্রতি সন্দেহ সমধিক প্রবল, তাঁহাদের সকলকেই সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন ;—নিতান্ত অনুগত কয়েকজন সেনানায়ক রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ,—সকলকেই সসৈন্যে নবাবের অনুগমন করিতে হইল।

সিরাজদ্দৌলা যে এইরূপ সুকৌশলে রাজধানীর আপদাশঙ্কা নিবারণ করিয়া, মহাসমারোহে

* Seat Mootabray.(Mahatab Roy) and Roop Chund, the sons of the banker Jaggatseat who had succeeded to the wealth and employments of their father, and derived great advantages from the European trade in the Province, ventured to represent the English as a colony of inoffensive and useful merchants, and earnestly entreated the Nabob to moderate his resentment against them ; but their remonstrances were vain.—Orme, vol. II. 58.

† Ibid.

নিশ্চিন্তহৃদয়ে সসৈন্যে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবেন, ইংরাজদিগের ততদূর ধারণা ছিল না। ৭ই জুন প্রাতঃকালে এই সংবাদ কলিকাতার ইংরাজমহলে সবিশেষ হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। আর সময় নাই, যাহা কিছু করিবার এখনই তাহা সম্পন্ন করা আবশ্যক ; কিন্তু রণকুশল সেনাপতির অভাবে কোন কার্য্যেরই শৃঙ্খলা হইতে পারিল না। তথাপি যতদূর সম্ভব, ইংরাজেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাগ্‌বাজারে পেরিং নামক যে নূতন দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানে রাশি রাশি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জীভূত হইল ; জলপথে নগরাক্রমণ করিবার আশঙ্কা আছে ;—তজ্জন্য বাগ্‌বাজারের খালের ধারে ভাগীরথীগর্ভে যুদ্ধজাহাজ সুরক্ষিত হইল ; পোনের শত ঠিকা সিপাহী নিযুক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র খাতের ধারে ধারে স্থানে স্থানে সমাবেশ করা হইল ; দুর্গপ্রাচীরের যথাসাধ্য সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তন্মধ্যে অন্নপান সঞ্চয় করা হইল ; মান্দ্রাজে সাহায্যভিক্ষার জন্য পত্র লেখা হইল ; এবং নগররক্ষার জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের সহায়তা লাভের প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরিত হইল।

ওলন্দাজেরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরলস্বভাব নিরীহবণিক ; তাঁহারা গায়ে পড়িয়া নবাবের সঙ্গে কলহ সৃষ্টি করিতে সম্মত হইলেন না। ফরাসীরা চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশসিংহ যদি প্রাণভয়ে নিতান্তই জড়সড় হইয়া থাকেন, তবে তিনি অবলীলাক্রমে চন্দননগরের ফরাসীদুর্গে পলায়ন করিতে পারেন ; সেখানে আশ্রয়গ্রহণ করিলে আশ্রিতের প্রাণরক্ষার জন্য ফরাসীবীরগণ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কাতর হইবেন না! * এই নিদারুণ বিপৎসময়ে চিরশত্রু ফরাসীবণিকের এরূপ মর্ম্মভেদী পরিহাসবাক্যে ইংরাজেরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে সমর-শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

নগর রক্ষার আয়োজন শেষ হইবামাত্র ইংরাজেরা নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় কি ;—তিনি কাশিমবাজারের ন্যায় বিনারক্তপাতে সমুদয় তর্কের মীমাংসা করিবেন, কিম্বা অসিহস্তে কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিবেন ;—সে কথা কেহই বিচার করিবার চেষ্টা করিলেন না! সিরাজদ্দৌলা যখন অর্দ্ধপথে অগ্রসর, সেই সময়ে ইংরাজেরা কথঞ্চিৎ আত্মবলের পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন!

জলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, টানা নামক স্থানে, নবাবী আমলে একটি ক্ষুদ্রদুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে দুর্গে ১৩টি কামান লইয়া ৫০ জন সিপাহী নদীমুখ রক্ষা করিত এবং বহুদিন শত্রু-সেনার সন্ধান না পাইয়া সকলেই নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। ইংরাজেরা ১৩ই জুন প্রাতঃকালে চারিখানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া সহসা এই ক্ষুদ্রদুর্গ আক্রমণ করিয়া, প্রচণ্ডপ্রতাপে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন! অকস্মাৎ বজ্রনিনাদে হতবুদ্ধি হইয়া, সিপাহী সেনা

* Stewart's History of Bengal.

হুগলী অভিমুখে পলায়ন করিল ; টানার ক্ষুদ্রদুর্গপ্রাচীরে বৃটিশ-বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে অঙ্গবিস্তার করিবামাত্র বৃটিশবাহিনী দুর্গপ্রাচীরের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি অকর্ম্মণ্য করিয়া একে, একে ভাগীরথীগর্ভে নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল !

এই সংবাদে হুগলীর ফৌজদার স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিনে ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইল ! একে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজবিদ্বেষী, তাহাতে বারম্বার অবমানিত হইয়াছেন ; অতঃপর ইংরাজের এই ধৃষ্টতার পরিচয় পাইবামাত্র আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইবেন না। ফৌজদার তাড়াতাড়ি দুর্গ উদ্ধারকল্পে সিপাহীসেনা প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৪ই জুন টানার দুর্গদ্বারে ইংরাজ বাঙ্গালীর শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুই সহস্র সিপাহী সেনা মুহুর্মুহু কামান ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন করিয়া দৃঢ়পদে দুর্গদ্বারে সমবেত হইবামাত্র, ইংরাজ বীরপুরুষেরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন্ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিলেন না ! কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াও অনেকে নিস্তার পাইলেন না ; সিপাহীরা জাহাজের উপর মুষলধারায় গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজসেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল ; তাঁহারা অনেকগুলি গোলার অপব্যয় করিয়াও সিপাহীদিগকে দুর্গ হইতে তাড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না। কলিকাতা হইতে কতকগুলি নূতন বীরপুরুষ আসিয়া ছত্রভঙ্গ ইংরাজ-সেনাকে উৎসাহিত করিয়া, বীরকীর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ; যখন তাহাতেও সিপাহী সেনা হটিল না, তখন ইংরাজেরা নিতান্ত ভগ্নমনোরথে, নোঙ্গর তুলিয়া, জাহাজ খুলিয়া, ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন !*

একমাত্র অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাস ভিন্ন ইংরাজ-লিখিত আর কোন ইতিহাসে এই অপকীর্ত্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ, কি জানি কি জন্য, এ কথা একেবারে চাপা দিয়া ফেলিয়াছেন ! ইহার সহিত কলিকাতা ধ্বংসের কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহার সমালোচনা না করিয়া, মিল এবং থরন্টন্ এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়াই, সিরাজদ্দৌলাকে শোণিত-লোলুপ উৎপীড়নপরায়ণ নৃশংস-নবাব বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিল এবং থরন্টন্ যে বিশেষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অর্ম্মিলিখিত আদিম ইতিহাসখানি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বপ্রণীত ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় টীকাচ্ছলে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা অনেক কথাই অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কি মিল কি থরন্টন্, কেহই টানার দুর্গাক্রমণ-কাহিনীর কোনরূপ আভাষ প্রদান করেন নাই ! ইঁহারা অবশ্যই সমধিক প্রতিভাশালী ইতিহাস-লেখক !

* Whilst the Nabob was advancing, it was determined to take possession of the Fort of Tannah, which lay about 5 miles below Calcutta, on the opposite shore and commanded the narrowest part of the river between Hughly and the Sea, with 13 pieces of cannon. Two ships of 300 tons, and two brigantines, anchored before it early in the morning of the 13th June ; and as soon as they began to fire, the Moorish garrison which did not exceed 50 men, fled ; on which some Europeans and Laskars landed ; and having disabled part of the cannon, flung the rest into the river. But the next day they were attacked by a detachment of 2000 men, sent from Hugley, who stormed the fort, drove them to their boats, and then began to fire, with their matchlocks and two small fieldpieces, on the vessels, which endeavoured in vain with their cannon and musketry to dislodge them. The next day a reinforcement of 30 soldiers were sent from Calcutta, but the cannonade having made no impression, they and the vessels returned to the town.—Orme, vol. ii, 50-60.

আর একজন ইংরাজ ইতিহাস-লেখক আবার লিপিকৌশলে মিল এবং থরন্টন্‌কেও পরাজয় করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন যে, "কি সিরাজদ্দৌলা, কি পাত্রমিত্রগণ, কেহই ইংরাজদিগের সকরুণ আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না ; অসহায় ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সকলেই সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত সুবিচার লাভের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া গেল !"* আমরা কিন্তু ইংরাজ-লিখিত-ইতিহাস পড়িয়া দেখিতে পাইতেছি যে, সকরুণ আবেদনের মধ্যে কেবল ইংরাজ-সেনার সগর্ব্ব আস্ফালন এবং কামানমুখে অনলবর্ষণ ! ইহাতেও যদি সিরাজদ্দৌলার ক্রোধোদয় না হইত, তবে হয়ত সিরাজদ্দৌলাও স্বীকার করিতেন যে, তিনি সত্য সত্যই কাপুরুষ !

কলিকাতার কালা বাঙ্গালীদিগের উপর সিরাজদ্দৌলার কিরূপ স্নেহদৃষ্টি ছিল, তাহার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, কেবলমাত্র ইংরাজবণিকের উদ্ধত-ব্যবহারের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্যই সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে শুভাগমন করিতেছেন। তখন ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল ! তাঁহারা এতদিন ঘসেটিবেগমের শুভদৃষ্টি-লাভের জন্য রাজবল্লভের পুত্র পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে পরম-সমাদরে কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে নানাপ্রহারে অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এখন সকলেই শুনিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা রাজবল্লভের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করায়, তিনিও নবাব-সেনার সহিত কলিকাতায় শুভাগমন করিতেছেন। ইংরাজদিগের মনে হইল যে, নবাবসেনা নগরোপকণ্ঠে পদার্পণ করিতে না করিতে কৃষ্ণবল্লভও পিতার ন্যায় সিরাজদ্দৌলার অনুগত হইয়া পড়িবেন, এবং হয়ত নবাব-শিবিরে পলায়ন করিয়া ইংরাজদিগের গৃহছিদ্রের সন্ধান প্রদান করিয়া নগরাক্রমণের সহায়তা সম্পাদন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। অতএব সকলে মিলিয়া কৃষ্ণবল্লভকে রাজবিদ্রোহী অপরাধীর ন্যায় ইংরাজদুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ! ইংরাজদিগের এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে দেশের লোক

* No one dared to plead for the unfortunate English ; and the Subah, surrounded by a thousand greedy minions, and hanging officers, all eager for the plunder of so rich a place, heard nothing but the most servile applauses of his resolution. Thus the avenues to justice and mercy were shut up, and all our submissive offers ineffectual.—Ive's Journal.

শিহরিয়া উঠিল। সেকালে এ দেশের লোকে ইংরাজদিগকে ভাল করিয়া চিনিত না, ইংরাজেরাও দেশের লোকের ধর্ম্মনীতির গূঢ়মর্ম্ম অবগত ছিলেন না। কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই অতিথিকে দেবতা বলিয়া সমাদর করিত; খৃষ্টান ইংরাজ যখন সেই অতিথির উপর এরূপ নিদারুণ নির্যাতন আরম্ভ করিলেন, তখন সে সংবাদে মুসলমান সিরাজদ্দৌলাও সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণবল্লভের উপর যত ক্রোধ ছিল, তাহা একেবারে যেন জল হইয়া গেল; পাছে ইংরাজদুর্গে কারাক্লেশে কৃষ্ণবল্লভের দুর্গতির একশেষ হয়, সেই চিন্তা সিরাজদ্দৌলাকেও কৃষ্ণবল্লভের কল্যাণকামনায় অণুপ্রাণিত করিল! *

দেশীয় বণিকদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরাক্রমণকালে পাছে তঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হয়, সেই জন্য চরাধিপতি রাজা রামরামসিংহ গোপনে উমাচরণকে একখানি গুপ্তলিপি পাঠাইয়া দূরস্থানে সরিয়া পড়িবার জন্য উপদেশ করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজদিগের তীব্র তাড়নায় গুপ্তচরের নিকট হইতে সেই পত্রখানি ইংরাজদিগেরই হস্তগত হইল। তখন সকলেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উমাচরণকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য লোকলস্কর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উমাচরণ ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই; তাঁহাকে সহসা ইংরাজসেনা বন্দীবেশে রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল!

উমাচরণের সংসারে তাঁহার কুটুম্ব হাজারিমল্ল কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এইরূপ উৎপীড়নে আতঙ্কযুক্ত হইয়া, ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া অন্যস্থানে পলায়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা ইংরাজদিগের কিছুতেই সহ্য হইল না। কাতারে কাতারে ইংরাজসেনা বীরদর্পে উমাচরণের রাজবাটী অবরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইতে লাগিল। উমাচরণের প্রভুভক্ত বিশ্বাসী বৃদ্ধ জমাদার সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়-সন্তান। তিনি উমাচরণের বেতনভোগী বরকন্দাজ ও ভৃত্যবর্গ সমবেত করিয়া পুরীরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফিরিঙ্গীরা আসিয়া সিংহদ্বারে হাতাহাতি আরম্ভ করিল; উভয়পক্ষেই শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল; অবশেষে উমাচরণের বরকন্দাজগণ আর পারিয়া উঠিল না;—একে একে অনেকেই ধরাশায়ী হইতে লাগিল! মানুষের যাহা সাধ্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া গেল। ফিরিঙ্গীসেনা মহা কলরবে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! তখন জমাদারের ক্ষত্রিয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল! যে আর্য্য-মহিলার অন্তঃপুরদ্বারে ভগবান্ সহস্ররশ্মিও নিতান্ত সসম্ভ্রমে করসঞ্চালন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেখানে ম্লেচ্ছ-সেনার পদস্পর্শ হইবে? যে প্রভু-পরিবারের নিষ্কলঙ্ক-কুলের অবগুণ্ঠনবতী কুলরমণীগণ কখনও পরপুরুষের ছায়াস্পর্শ করেন নাই, তাঁহাদের পবিত্রদেহ ম্লেচ্ছ-করস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে?—ইহা অপেক্ষা হিন্দুমহিলার পক্ষে মৃত্যুক্রোড়ই যে সুকোমল পুষ্পশয্যা, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক হিন্দু-গৌরব-নীতি বিদ্যুৎবেগে জমাদারের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিল! হতভাগা আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিতে পারিল না; ক্ষিপ্রহস্তে অন্তঃপুরদ্বারে চিতাকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল; তাহার পর,—তাহার পর,—স্বহস্তে একে একে প্রভু-পরিবারের ত্রয়োদশটি মহিলামস্তক দেহবিচ্যুত করিয়া, সতী-শোণিত-পরিপ্লুত শাণিত খরশান আত্মবক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া রুধিরকর্দ্দমে লুটাইয়া পড়িল! অনুকূল পবন-সঞ্চরণে ধূমজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া চিতাকুণ্ডের দীপ্ত-শিখা চারিদিকে লোহজিহ্বা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদে, প্রাঙ্গণে, কক্ষতলে, সিংহদ্বারে তীব্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! ফিরিঙ্গীসেনা জমাদারকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল; কিন্তু আর পুরপ্রবেশ করিবার অবসর পাইল না; উমাচরণের ইন্দ্রভবন শ্মশানভস্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! কেবল সেই শোকসমাচার আমরণ কীর্ত্তন করিবার জন্য হতভাগ্য বৃদ্ধ জমাদারের জীবনবায়ু দেহবহির্গত হইল না! সকলি ফুরাইল; কেবল তাহারই মুমূর্ষু জীবন চিরশান্তির শীতলক্রোড়ে আশ্রয়লাভের অবসর প্রাপ্ত হইল না! *

সিরাজদ্দৌলা মহাসমারোহে সসৈন্যে হুগলীতে আসিয়া পদার্পণ করিবামাত্র চারিদিকে সে সংবাদ বিদ্যুৎবেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভাগীরথীবক্ষ বিতাড়িত করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যে শত শত সুসজ্জিত রণতরণী হুগলীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার সহিত হুগলীর ফৌজদার আরও অনেকগুলি তরণী সংযোগ করিয়া দিয়া সিপাহী-সেনার পক্ষে অপর পারে উপনীত হইবার সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলার আদেশে ওলন্দাজ এবং ফরাসীবণিক রাজসন্দর্শনে সমবেত হইলেন; ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কলিকাতা আক্রমণে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। সিরাজদ্দৌলা তজ্জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি না করিয়া ফরাসীদিগের নিকট বারুদ চাহিয়া লইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লোকে সংবাদ পাইয়া একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল; এত কলকৌশল, এত সগর্ব্ব আস্ফালন, এত রণকৌশলশিক্ষাপ্রণালী, সকলই যেন সিরাজদ্দৌলার নামে সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িল। নগরের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ইংরাজ নরনারীগণ যিনি যেখানে ছিলেন,—মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাপন সুসজ্জিত বাসভবনের দিকে সাশ্রুনয়নে

* অনেকের বিশ্বাস যে, কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয়দান করায়ই সিরাজদ্দৌলার ক্রোধোদয় হইয়াছিল, তাহাই কলিকাতা আক্রমণের একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। যতদিন রাজবল্লভের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল না, ততদিন উহা একটি কারণ বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু কলিকাতা আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কৃষ্ণবল্লভের কথার উল্লেখমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পর্য্যন্তও কৃষ্ণবল্লভের উপর কোনরূপ ক্রোধের কারণ থাকিলে তাহা যে এই উপলক্ষে জল হইয়া গিয়াছিল, পরবর্ত্তী ব্যবহারে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

* The head of the peons, who was an Indian of a high caste, set fire to the house, and, in order to save the women of the family from the dishonor of being exposed to strangers, entered their apartments, and killed, it is said, thirteen of them with his own hand; after which, he stabbed himself, but contrary to his intention, not mortally. —Orme, vol. ii. 60.

একবারমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে পলায়ন করিতে লাগিলেন; দেশীয় বণিকগণ যিনি যেপথে সুবিধা পাইলেন, নগর হইতে বহিস্কৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; পথে, ঘাটে, নদীসৈকতে, বনান্তরালে, সকল স্থানেই মহাকলরবে নরনারী, বালকবালিকা, শত্রু মিত্র কাতারে কাতারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই পলায়ন করিল, কিন্তু হায়! ফিরিঙ্গীদল বড়ই বিপন্ন হইয়া উঠিল। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া সাহেব সাজিয়া দেশের লোকের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদিন ফিরিঙ্গীদিগকে সবিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ বিপদের দিনে তাহাদের মসিমলিনমূর্ত্তির উপর তুষারধবল সাহেবী পরিচ্ছদ বড়ই বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল যে, ফিরিঙ্গীরাই যথার্থ "ন মাতা ন পিতা নচ বন্ধু;"—তাহারা কি বাঙ্গালীদলে, কি সাহেবমণ্ডলীতে, কোন স্থানেই আশ্রয়লাভ করিবার অবসর পাইল না। তখন সকলে মিলিয়া দুর্গদ্বারে সমবেত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য করুণক্রন্দনে পাষাণহৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকেও দুর্গমধ্যে আশ্রয়দান করিতে হইল। ইংরাজদুর্গ স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিল;—কেবল কোলাহল, কেবল আর্ত্তনাদ, কেবল স্বার্থচিন্তা;—সকলেই বুঝিল যে নগর রক্ষাকরা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

নবাবের বৃহদায়তন দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র যখন ভীমগর্জ্জনে তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল, ইংরাজেরা তখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া নবাবের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করিলেন না; অর্থ-প্রলোভনে সিরাজদ্দৌলাকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করাইবার জন্য উৎকোচ উপঢৌকন লইয়া নানারূপ কাকুতি মিনতি জানাইতেও কৃপণতা করিলেন না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না।* যখন সকল চেষ্টা নিস্ফল হইয়া গেল, তখন বিপদে পড়িয়া ইংরাজ-বীরপুরুষেরা নগর রক্ষার জন্য আপনাপন সঙ্কেতভূমিতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বাহিরে নবাবশিবিরে ঘন ঘন কামানগর্জ্জন ভিতরে ইংরাজমণ্ডলীতে ততোধিক তুমুল কোলাহল;—এইরূপে উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, প্রতিমুহূর্ত্তের পরাজয় চিন্তায়, ইংরাজ-সেনা বিনিদ্রনয়নে রজনীযাপন করিতে লাগিলেন!

* The usual method of calming the angry feelings of eastern princes was restored to. A sum of money was tendered in purchase of the Subahdar's absence, but refused. —Thornton's History of the British Empire, vol. i. 189.

কাহাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহাকে প্রথম দেখি দিদির বাড়ী—টেনিস পার্টিতে। ভগিনীপতি বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ইংরাজিআনা চালে চলেন; টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার বাড়ীতে ছোট খাট একটি স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনী হইয়া থাকে। তিনিও বিলাতফেরত; ভগিনীপতির সহিত একটু কি রকম সম্পর্কও আছে, ভগিনীপতির ভগিনীপতির দূর সম্পর্কীয় ভাই কি এই রকম একটা কিছু।

প্রথম দর্শনেই কি আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম? মোটেই নহে; আমি উপন্যাস লিখিতেছি না। বরঞ্চ বিপরীত, আলাপ হইবামাত্র একটু পরে তিনি একটু টেপা হাসি হাসিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—যদিও জনান্তিকে—"এমন মণিকে আপনি এতদিন খনির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন?" (আমার নাম মৃনালিনী আমাকে সকলে মণি বলিয়া ডাকে) তবু কথাটা আমি শুনিতে পাইলাম এবং এই প্রশংসার মধ্য হইতে কেমন একটা বেতর বেসুরো স্বর খট করিয়া কাণে বাজিল। ভগিনীপতি আবার ইহার পর ঠাট্টা করিয়া প্রকাশ্যেই বলিলেন—

Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air.

দিদির নন্দাই সংস্কৃতে এম্ এ দিয়াছেন, তিনিই বা বিদ্যা ফলাইবার এমন সুযোগ ছাড়িবেন কেন; তিনিও গোঁপে তা দিতে দিতে বলিলেন—"ন রত্ন মন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না—তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়।"

সকলের মুখেই বেশ একটু হাসি ফুটিল; এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়া ইহার কারণকে যে আমি বিশেষ প্রীতির নজরে দেখিয়াছিলাম এমনটা ঠিক বলিতে পারিতেছি না।—কিন্তু এ ঘটনা হয়—টেনিস খেলার আগে,—খেলার পরে একটু অবস্থান্তর ঘটিল।—উদ্যান হইতে সকলে গৃহে সম্মিলিত হইলে তিনি গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমে গাহিলেন ইংরাজিগান; দিদির তাহাতে মন উঠিল না, তিনি ধরিয়া পড়িলেন—"বাঙ্গলা গান গাহুন;"—অনেক আপত্তি প্রকাশ করিয়া অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে নাচারে পড়িয়া মিষ্টার জি বাঙ্গলা গানই আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ যে ছেলে বেলার ছোটুর সেই গান!

হায়! মিলন হোলো—যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো। কেবল ছোটুর সেই অস্পষ্ট গুনগুনানি নহে। দিদি তাঁহার গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাইতেছিলেন, পিয়ানোর তানে লয়ে

তাঁহার পূর্ণ কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া গৃহে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল ; আমি ত মুগ্ধ অভিভূত হইয়া শুনিতে লাগিলাম। পিপাসিত ব্যক্তির জল পানের ন্যায় গানের প্রতি শব্দ প্রতি ছত্র সোৎসুক্যে গ্রাস করিতে করিতে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।—

কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষা যতই সামান্য হউক যদি মর্ম্মান্তিক হয় তবে বুঝি তাহা সহজে পূর্ণ হয় না, ইহাই বুঝি সংসারের অব্যর্থ নিয়ম! দুই লাইন শেষ হইতে না হইতে মিষ্টার ক সস্ত্রীক সপুত্রিক গৃহে প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা সমাদরের সাধারণ একটা হিল্লোল-প্রবাহের মধ্যে গান বাজনা থামিয়া গেল ; গায়ক বাদক উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন সম্ভাষণ করিলেন। স্বাগতগণ তাঁহাদের পালায় সকলের সহিত যথাবিহিত ভদ্রতানুষ্ঠান শেষ করিবার পর যদিও সেই অসমাপ্ত গীত বাদ্যের পুনরারম্ভ প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু গায়ক আর তাহাতে সম্মত হইলেন না। মিশ ক একজন সুগায়িকা, তিনি তাঁহাকেই গাহিতে অনুরোধ করিলেন। গৃহশুদ্ধ সকলেরি—(আমি ছাড়া) সেইরূপ ইচ্ছা—অতএব মিশ ক তাঁহার সুশোভন শীলতাপূর্ণ আপত্তি প্রকাশের সুখভোগে পর্য্যন্ত কালব্যয় করিতে অবসর না পাইয়া তখনি পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন। আরার গান বাজনায় গৃহ গম গম করিয়া উঠিল; মিশ ক'য়ের সুকণ্ঠ সুতানে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতাগণ অবিরত একটি গানের পর আর একটির ফরমাশ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু আমার কর্ণে তাহার কোনটিই প্রবেশ করে না, আমার মাথায় সেই একই গান একই সুরে কেবল ঘুরিতেছিল।

হায়! মিলন হোলো! যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!

গান বাদ্য গল্পস্বল্পের পর নিয়মিত সময়ে নিমন্ত্রিতগণ যখন বাড়ী চলিয়া গেলেন, গৃহ নিস্তব্ধ নির্জ্জন হইয়া পড়িল—তখনো আমার কাণে সেই গান বাজিতে লাগিল। রাতে ঘুমাইয়াও তাহা স্বপ্নে দেখিলাম। ছেলেবেলার সেই আটচালা ঘর, তাহাতে দিদির এই ড্রয়িংরুম সমারোহ,—ছোটু গাহিতেছে—তাহার গুনগুনানি সুরে নহে—সুস্বরে সুতানে পূর্ণ কণ্ঠে গাহিতেছে—আমার দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গাহিতেছে—

সেই মিলন হোলো—যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!

সেই মধুময় গীতধারায় সেই প্রেমময় দৃষ্টিপ্রবাহে আমার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎ কম্পিত হইয়া উঠিল, আর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—দেখিলাম ভোর হইয়াছে।

বড় আশা ছিল, দ্বিতীয় হপ্তার টেনিস পার্টির দিনে গানটি শুনিব কিন্তু তিনি আর সেদিন আসিলেন না।—রাত্রিকালে ডিনার টেবিলে আমি বলিলাম—"মিষ্টার জি যে আজ এলেন না?" দিদি বলিলেন "হ্যাঁ আমিও ঐ ভাবছিলুম—তিনি যে আজ এলেন না?" ভগিনীপতি ঠাট্টার সুরে বলিলেন "তাইত! সেকি জানত এদিকে এমন প্রলয় উপস্থিত হবে, তাহলে অবশ্যই আসত—তা ডাকব নাকি?"

ঠাট্টাটা আমাকে স্পর্শ করিল না, আমি সত্যই গায়কের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই আমার

অনুরাগ গানের প্রতি, অতএব আমি তাঁহার ঠাট্টায় না দমিয়া বেশ সহজভাবেই বলিলাম "ডাক না তিনি বেশ গাইতে পারেন—আর একদিন শুনতে ইচ্ছা আছে।"

আমার মনে কোন লুকান অভিপ্রায় ছিল না—কিন্তু তাঁহাদের মনে ছিল ; (তখন যদিও বুঝি নাই পরে বুঝিয়াছি)—সুতরাং আমার কথাটা তাঁহারা লুফিয়া লইলেন—দিদি বলিলেন "মিষ্টার জি অনেকদিন 'কল' করেছেন কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তাঁকে ডিনারে বলা হোল না একদিন খেতে নিমন্ত্রণ করা যাক। "ভগিনীপতি বলিলেন "তথাস্তু তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা, যেদিন ইচ্ছা বলিয়া পাঠাও।"

ডিনারের দিন তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িলাম ;—পূর্ব্বে একদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি—একদিনেই যে তাঁহার মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এমন নহে, বরঞ্চ এই ১০।১২ দিনে চেহারাটা এতদূর ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে তাঁহাকে মনে করিতে সেই স্বপ্নের চেহারাই মনে পড়িতেছিল—তাই চাক্ষুষ প্রভেদ প্রত্যক্ষ করিবামাত্র একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম। আমার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যে দেবতার ন্যায় সুপুরুষ এমন বলিতেছি না—সত্য কথা বলিতে, সে মুখও আমার তেমদ সুস্পষ্ট মনে ছিল না, মনে ছিল কেবল স্বপ্নের সেই দৃষ্টি।—আর এখন যাঁহাকে দেখিলাম তিনি কিছু মন্দ দেখিতে না, দিব্যি নাক মুখ, বেশ পরিপাটি করিয়া বড় কপালে চুল ফেরান, ঘন গোঁপের বেশ বঙ্কিম বাহার—(যদিও গোঁপের এ বাহার প্রথমে চোখে লাগে নাই—ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম—প্রথমে বরঞ্চ একটু বেশী ঘন বলিয়াই মনে হইয়াছিল) সব শুদ্ধ বেশ ভালই দেখিতে। কিন্তু আমার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের মত তাঁহার নয়নে সেই প্রাণস্পর্শী পরিপূর্ণ সরল—অথচ প্রেমময়-দৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলাম না ; তাহার সন্ধান করিতে গিয়াই নিরাশ হইয়া পড়িলাম। কথা বার্ত্তাতেও মাঝে মাঝে কেমন একটু খটকা লাগিতে লাগিল। তাঁহার টানাবোনা রসিকতা এক একবার যেন ভদ্রতার সীমানা ছাড়াইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছিল।—অথচ স্পষ্ট করিয়া এরূপ মনে করিতেও ভরসা হইতেছিল না। ইংলণ্ডের best manners যিনি শিখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাতে সুরুচি বা ভদ্রতার অভাব কিরূপে সম্ভবে?—আমারি অমার্জ্জিত অশিক্ষিত রুচির তাহা পরিচয় এইরূপ ভাবিতেছিলাম।

তিনি আসিতেই দিদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যে বৃহস্পতিবারে এলেন না? আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবছিলুম আপনি আসবেন।"

তিনি বলিলেন মিষ্টার "কর" বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। I refused them so many times before that I had not the heart to do so again, so sorry—but did you really expect me? If I had only known it I would have sacrificed a thousand—"

ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন—"I say G don't be so very eloquent, it might make me jealous you know—"

দিদি বলিলেন "সেদিন ডিনারের পর আপনাদের কি গান হইল ? মিশ ক কি সুন্দর গাহিতে পারেন ?"

"মিষ্টার জি একটু হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ এইরূপ শোনা যায় বটে—অন্ততঃ তাঁহাদের ত এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। What a lovely colour ! it suits the complexion beautifully"

আমার সাড়ির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথাটা বলা হইল।" ডিনার টেবিলে অবশ্য আমি তাঁহার পাশে বসিয়াছিলাম কিন্তু মনে রাখিবার মত এমন কিছু বিশেষ কথা হয় নাই ভগিনীপতিতে তাঁহাতে বেশী সময় পলিটিক্‌স্ লইয়াই তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল, মাঝে মাঝে আমার সহিত যা কথাবার্ত্তা—অধিকাংশই তাহা প্রশ্নোত্তর—আমি গাহিতে পারি কি না, কবিতা পড়ি কি না—কাহার কবিতা আমি বেশী ভাল বাসি,—কতদিন এখানে থাকিব ইত্যাদি। আমি নিজে হইতে কথা কহিবার মধ্যে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়াছিলাম আন্তরিক প্রশংসা, ইংরাজি কম্‌প্লিমেণ্ট নহে। বোধ করি তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন "বাঙ্গলা বেশী গান আমি জানি না, এবার দেখিতেছি শিখিতে হইবে।" তাঁহার সমস্ত কথার মধ্যে এই কথাটি আমার ভাল লাগিয়াছিল; মনে হইল তিনি হৃদয়ের সহিত বলিতেছেন। খাবার পর আবার তিনি সেই গানটি গাহিলেন,—

হায় ! মিলন হোলো !
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো !
হাতে করে মালাগাছি সারাবেলা বসে আছি
কখন ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো,—
আসিবে সে বর বেশে মালা পরাইব হেসে
বাজিবে সাহানা তানে বাঁশি রসালো !—
আসিল সাধের নিশা তবু পুরিলনা তৃষা
কেমন কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল—
হায় ! মিলন হোলো !

গানটি এইখানে শেষ হইল, তিনি থামিলেন। কিন্তু মনে হইল, তবু যেন ইহা অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কি যেন আরো বলার ছিল, বলা হইল না; শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, অথচ পরিতৃপ্ত হইলাম না। কিন্তু গান শেষ হইলে নিকটে আসিয়া তিনি যখন বলিলেন—"I wish I was a painter to paint you like this" তখন আর পূর্ব্বের মত আমার বিরক্ত বোধ হইল না—মনে হইল তিনি যেন আর আমার অপরিচিত নহেন। সে সময় স্বপ্নের মূর্ত্তিতে তাহার মূর্ত্তিতে মিশ্রিত হইয়া আমি সে দেখিতেছিলাম তাঁহাকে বা কাহাকে ?

দশহরা গঙ্গাপূজা।

(চিত্র)

আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে আকাশে নবীন মেঘের সঞ্চার দেখিয়া যুগান্তরের পূর্ব্বে যেমন রামগিরির নিভৃত-উপত্যকাবাসী প্রবাস-অভিশাপ-ক্লিষ্ট একটি ক্ষিণ্ণকায় যক্ষের একক জীবনে দুঃসহ বিরহ-বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, একালেও তেমনি সেই অমরকাহিনী নববর্ষাসমাগমে শব্দহীন অব্যক্ত ভাষায় মর্ম্মস্পর্শ করিয়া প্রত্যেক প্রবাসীর প্রিয়জন সমাগমশূন্য তৃষিত-হৃদয়ে এক অতৃপ্ত কম্পন ফুটাইয়া তোলে; কিন্তু আষাঢ় মাসের এই বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত মেঘের ঘটা, নিদাঘের দীর্ঘসঞ্চিত উত্তাপ এবং ক্লান্তিহরা প্রাবৃটের এই ঘনবর্ষণ, জলাশয়ে নবজাগ্রত ভেকের সহর্ষ মকধ্বনি, এবং ধারাপাত-পুষ্ট তৃণাঙ্কুর হইতে প্রত্যেক বৃক্ষলতার স্নিগ্ধ শ্যামসৌন্দর্য্যময় শাখা পল্লবের প্রচুরোদ্গম দেখিয়া পল্লীবাসীগণের মনে নববর্ষার একটি প্রাচীন উৎসববারতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে, সেই মধুর গ্রাম্য উৎসবটি—দশহরা গঙ্গাপূজা।

বিল, খাল, নদী প্রভৃতি জলাশয় গ্রীষ্মের অখণ্ড রৌদ্রোত্তাপে শুকাইয়া গিয়াছিল, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে ঘনবর্ষণে সেগুলিতে আবার নবপ্রাণের সঞ্চার হইতেছে, বর্ষার প্রারম্ভেই আমাদের ক্ষুদ্র, গ্রামপ্রান্ত-বাহিনী তরঙ্গিনীর শীর্ণদেহে ল্যাবণ্যবিকাশ অনুভূত হইতেছে; অপরিণিতা কিশোরীর দেহ ও মনে যৌবনের কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহার জীবনের এক মাহেন্দ্র ক্ষণে, পুষ্পদাম-বিভূষিত বিবাহ-বাসরের অবসানে, তাহার সীমন্তে একবিন্দু সিন্দূরের লোহিত রাগের সঙ্গে সঙ্গে, সমুদ্রের অতলগর্ভ-শায়িনী বিশ্ব-বিমোহিনী দেবী কমলার ন্যায়, হৃদয়ের এক অন্ধকার গুহালীন সুপ্তপ্রেম জাগিয়া উঠিয়া, যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গে জীবন ও লাবণ্য, লজ্জা এবং কোমলতারূপে বিকসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বর্ষার পূর্ব্বাহ্নে নিদাঘ-কাদম্বিনীর একরাত্রির বর্ষণে ক্ষুদ্র নদীহৃদয়ে বন্যা আসিয়া পল্লীবাসীর মনে নব-বর্ষার সিক্ত-সৌন্দর্য্য-চঞ্চল-অনুভূতি জাগাইয়া তোলে।

গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদীটি শৈবাল-দলে ভরিয়া গিয়াছিল, অত্যন্ত পুরু টোপাপানার স্তূপ এবং শ্যাওলা, তাহার উপর দিয়া নৌকা চালান সহজ ছিল না, বিদেশী নৌকাগুলিকে অতি আয়াসের সঙ্গে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে হইত। ময়রারা মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই শৈবালরাশি কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া গৃহে লইত এবং তাহার সাহায্যে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিত। সে সময় নদীতে এক গলার বেশী জল ছিল না, শৈবালবর্জ্জিত স্নানের ঘাটে সেই জলটুকু টল টল করিত—অতি নির্ম্মল, নীচে শামুক, গুগুলি এবং বালি পর্য্যন্ত উপর হইতে দেখা যাইত। মধ্যে মধ্যে এক একটা ঝরণা হইতে ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ডা জল উঠিতেছে দেখিয়া ছেলেরা স্নান করিতে আসিয়া সেই সকল ঝরণার ভিতর পা ডুবাইয়া ক্রমাগত দাপাদাপি করিত, এবং জানুর ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেলে দুই তিন জনে মিলিয়া সেই মগ্নপ্রায় বালকের হাত ধরিয়া "হিঁয়ো জোয়ান তোলো, সাবাস জোয়ান টানো" প্রভৃতি

গোৎসাহধ্বনি সহকারে তাহাকে টানিয়া তুলিত ; তিন চারিজনে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক খানিক জল ঘিরিয়া সঘন বাহু-বিক্ষেপে তাহাতে কৃত্রিম তরঙ্গের সৃষ্টি করিত, কিন্তু নদীতে জলের ঢল লাগিয়া তাহাদের মধ্যে বর্ষাসুলভ খেলা সকল আরম্ভ হইয়াছে, কেহ নূতন স্রোতে দাম ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কোথাও পাঁচ'সাতজনে কোমরে গামছা বাঁধিয়া মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়া সেই পঙ্কিল জলে 'ডিম্ পাড়াপাড়ি' খেলা করিতেছে। আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী গ্রাম্য ছেলেদের মধ্য হইতে এই জলক্রীড়া লোপ পাইতেছে, অতএব এখানে ইহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে, ভরসা করি, আমাদের নাগরিক পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

চারি পাঁচটি ছেলে বাহুবেষ্টনে অনেকখানি জল ঘিরিয়া রাখিলে, একটি বলিষ্ঠ বালক কতকগুলি শৈবাল লইয়া অনেক দূর হইতে ডুব দিয়া এই বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শৈবালগুলি রাখিয়া যেভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবে প্রস্থান করিল। সেই দামগুলি দেখিয়া 'পাখী বাসা পাড়িয়া গেল' বলিয়া অন্যান্য সকলে উচ্চরবে আনন্দ করিতে লাগিল। বাসাপাড়া হইতে ক্রমে ডিম্‌পাড়া, ডিমে তা দেওয়া, ডিম্‌ফুটান, ছানাকে খাবার দেওয়ার উপলক্ষে সেই বালকটি অন্যের অদৃশ্যভাবে এই বন্ধনীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিল ; অবশেষে ছানা উড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় আসিল, যে সকল বালক বাহু বিস্তারপূর্ব্বক বাসা রক্ষা করিতেছিল, তাহারা এইবার প্রসারিতপদে অধিক সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল। বলিষ্ঠ বালকটি দূর হইতে একডুবে ইহাদের ভুজ-বন্ধনের মধ্যে আসিয়া ভাসমান শৈবালগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমস্ত জল আলোড়নপূর্ব্বক পলায়ন করিল ; 'ছা উড়িয়ে নিয়ে গেল রে' বলিয়া অন্যান্য ছেলেরা তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছুটিল, কিন্তু জল পঙ্কিল—পলাতক কোন দিকে গেল জলের মধ্যে চক্ষু উন্মীলিত করিলেও তাহা দেখিবার উপায় নাই। এদিকে পলাতক বালকটি ডুবসাঁতার দিয়া বহুদূরে ভাসিয়া উঠিল, তাহার মাথার উপর প্রচুর টোপাপানা, গলায় শৈবালদাম মালাকারে বেষ্টিত, মুখে কৌতুক-হাস্য। শিরোমণি মহাশয় স্নানান্তে একবুক জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এক ছোকরার মাথা ঠকাস্ করিয়া তাঁহার জানুদেশে আসিয়া লাগিল, তিনি মুখখানি বিকৃত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর সেই প্রতিহত বালক অপ্রতিভ হইয়া মাথা তুলিতেই শিরোমণি ঠাকুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধতন ছাপান্ন পুরুষকে অতি উৎকট গালাগালি দিতে লাগিলেন, সেই গালাগালির সঙ্গে এতই ইতর কথা মিশানো থাকিত যে, ঠাকুরের মুখে সেই কথাগুলি শুনিয়া অতি মূর্খেরও তাহাকে দেবতাস্তব বলিয়া ভ্রম হইত না, এবং তাঁহার অনুস্বর বিসর্গান্ত সংস্কৃতের সঙ্গে সেগুলি কিছুতেই খাপ খাইত না। ঠাকুর মহাশয়ের এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ছেলেরা মুখে গামছা দিয়া হাসিত, সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী বালকটির মুখগহ্বর হইতেও প্রচুর হাস্য উৎসারিত হইয়া পড়িত।

এইরূপভাবে দিনের পর দিন কাটিতেছিল। ছেলেরা সকালে পাঠশালায় লিখিয়া আসিয়া

দোয়াত কলম ও পাততাড়ী ফেলিয়াই আমবাগানে ছুটিত, সেখানে কতকগুলি গাছপাকা আমের শ্রাদ্ধ করিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া জলে নামিত। বাগানরক্ষকেরা বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া বাগানের টোঙে স্থায়ী রকমের আড্ডা বাঁধিয়া বাস করিত, তাহাদের পরিবারস্থ কেহ সেই বাগানের মধ্যেই তাহাদের ভাত আনিয়া দিত, সকালে বিকালে এক একটা পাকা কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত তাহারা সেই লোহিতবর্ণ, কদন্ন নিঃশেষ করিত এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে গাছে গাছে ঘুরিয়া টোকা দিয়া কাঁঠাল পরীক্ষা করিয়া দেখিত, পাকাগুলি মোটা দড়ীতে সাবধানে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে নামাইত। রাখালেরা গোরক্ষণকার্য্যে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক 'গেঁজে' লইয়া আম্রকানন-মধ্যবর্ত্তী ভাঁট, আশ্শেওড়া-জঙ্গলে ঘুরিয়া বৃক্ষচ্যুত পাকা আমের সন্ধান করিত, গরুগুলি রক্ষকশূন্য হইয়া কখন দূর মাঠে চলিয়া যাইত, কখন আউস ধানের জমীতে প্রবেশ করিত।

এদিকে গৃহস্থ-বাড়ীতে চাঞ্চল্য এবং কলরবের বিরাম নাই, বর্ষীয়সী রমণীগণ দাওয়ায় বসিয়া আহারাদি শেষ করিয়া—মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই আলুলায়িত কেশে, প্রসারিত পদে, প্রশান্ত চিত্তে গল্প করিতেছেন, 'অমুক মাগীর বড় দেমাক'—'অমুকের বৌ আদত কলির মেয়ে ; মুখ টিপ্‌লে দুধ বেরোয়, তিনদিনও হয়নি নবসতে এসেছে, শাশুড়ী মাগীকে পটপটিয়ে দশ কথা শুনিয়ে দিলে'—'অমুকের বড় কপাল জোর—পর পর তিন বেটা, আর আমাদের সাদের বৌ কি কপাল করেই এসেছিল, পাঁচ মেয়ের পর সোণার চাঁদ ছেলেটুকু হলো তো তিনমাসও থাকলো না, এমনি কি পরমেশ্বরের বিচার !'—বলিয়া বিধাতার ত্রুটির কঠোর সমালোচনা এবং নানারকম গল্প করিতেছেন ; প্রত্যেক বাড়ীতেই এইরূপ ছোট খাট এক একটা কমিটী বসিয়া গিয়াছে। বহুকাল হইতেই বঙ্গঅন্তঃপুরে এমনিভাবে এই সকল গল্প চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখনও তাহা পুরাণো হয় না, ছোট ছোট মেয়েরা যখন মা ও ঠাকুরমার বয়স লাভ করে—তখন বাল্যসুলভ পুতুল খেলায় ইস্তফা দিয়া তাহাদের মা ও ঠাকুরমাগণের অভ্যস্ত এই নির্ব্বিকার সমালোচনার চিরনবীন ভাণ্ডারটি দখল করিয়া লয়—এবং সুদূর-প্রবাহিত গল্পস্রোত অক্ষুণ্ণ রাখে,—কিন্তু হে পাশ্চাত্য শিক্ষা, তুমি আমাদের নব্যা রমণীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের মাতা, পিতামহীদত্ত এই অক্ষয় ভাণ্ডারটি কাড়িয়া লইয়া সেখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষের' আবাদ করিতেছ, পরনিন্দা ও বিদ্বেষবুদ্ধি ক্রমে বঙ্গান্তঃপুর হইতে বিলুপ্ত হইতেছে, সুতরাং তুমি সেকালের অনেক পক্ককেশ, চিন্তাশীল সমাজহিতৈষীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছ, ধিক্ তোমাকে !

আষাঢ়ান্ত বেলা, আহারাদির পর ঘুমাইয়াও বেলার শেষ হয় না ; রমণীগণ একঘুম দিয়া উঠিয়া অপরাহ্নে কেহ ছেলে পিলের জন্য কাঁথা সিলাই করিতেছে, অধিকাংশ বাড়ীতেই আগামী কল্যকার জন্য 'খোলা' জ্বালাইয়াছে, দশহরার দিন ভাত খাইতে নাই, তাই খোলা হাড়িতে চিড়া মুড়ি খৈ ভাজা হইতেছে, ছোট ছোট ছেলেরা মায়ের কাছে উননের পাশে বসিয়া পাকা কাঁঠালের বিচি পুড়াইতেছে, বিচিগুলি পুড়িলে তাহা তুলিয়া তাহাতে 'তেল

নুন' মাখাইয়া চাল ছোলা ভাজার সঙ্গে চর্ব্বণ করিতেছে, কোন কোন গৃহিনী বাড়ীর কর্ত্তাদের বৈকালিক জলযোগের জন্য কাঁঠালের 'মাড়ি' (রস) করিতেছেন; বধূগণ আমলা মেথি প্রভৃতি মসলাসুরভিত নারিকেল তৈলে কেশরঞ্জনপূর্ব্বক কলসীকক্ষে ঘাটে গা ধুইতে চলিয়াছে, কপালে 'কাঁচপোকার' একটি গোল টিপ, নাকে নলক, অধরে তাম্বুলরেখা, কাঁধে চারখানার সুরঞ্জিত গামছা, পায়ে নাপতিনীর সাবধানানুলিপ্ত অলক্তরাগ, পাছে আলতা মুছিয়া যায় এই ভয়ে অতিধীরে পা ফেলিয়া চলিতেছে, কোন কোন গৃহস্থকন্যা কেশবিন্যাস করে নাই, আগুল্‌ফলম্বিত কেশপাশ পিঠের উপর ছাড়িয়া দিয়া চারিগাছি মলের ঝঙ্কার তুলিয়া চঞ্চল গমনে চলিয়াছে; অপরাহ্ণে সেই পুরুষ সমাগমহীন, বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে সেই সকল যুবতীর সঙ্কোচসম্পর্কশূন্য, ব্রীড়াবিরহিত, কৌতুকহাস্যতরঙ্গিত প্রসন্ন মুখখানি দেখিলে সত্য সত্যই নাটককারের সেই গ্রাম্য ছড়াটা মনে পড়িয়া যায়ঃ—

'এলোচুলে বেনে বৌ আল্‌তা দিয়ে পায়
কলসী কাঁকে নলক নাকে জল্ আন্‌তে যায়।'

কোন কোন গৃহস্থবধূ নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, সম্যকরূপে লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে নাই, বাপের বাড়ী থাকিতে সমবয়সীদের সঙ্গে চিরদিন সন্ধ্যাবেলা তরুলতা বেষ্টিত দিঘীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়া তাহার আর সে সুবিধা, সে অধিকার নাই, আজ পিতৃগৃহের সেই সুখ এবং সঙ্কোচহীন স্বাধীনতার কথা মনে পড়াতে তাহার হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ঘনাইয়া আসিতেছে। শাশুড়ীর ফরমাস্ খাটিতে ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে পিতামাতার স্নেহসিক্ত সুন্দর মুখ, এবং পিতৃগৃহের প্রতিদিনের সহস্র আনন্দকাহিনী দিবসের অন্য সময় এই সকল বালিকার হৃদয়ে সুপ্ত থাকে, কিন্তু শান্ত, শীতল, স্তব্ধ অপরাহ্ণে যখন সংসারের কাজ শেষ হইয়া যায়, কর্ম্মোচ্ছ্বাস সংযত হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোমল, বিরহকাতর হৃদয়ের সহিত সমুজ্জ্বল অতীত স্মৃতির সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন তাহাদের প্রাণ এই নবীন, কুণ্ঠিত স্নেহের অনভ্যস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম জীবনের সেই উদ্দাম হর্ষকল্লোল-মুখরিত পুরাতন স্নেহের মুক্ত তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কিরূপ অধীর হইয়া উঠে, আমি পুরুষ লেখক কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিব? তাহার উপর আজ এই বর্ষার অপরাহ্ণে আকাশে নবীন নীল কাদম্বিনী ঘনাইয়া আসিয়াছে, নদীর অপর পারে বহুদূরবর্ত্তী ধূসর বনরাজির উপর বৃষ্টি হইয়া তাহা ঝাপসা দেখাইতেছে, বলাকাশ্রেণী শুভ্র পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক কম্পিত পক্ষভঙ্গে কোন্ অনুদ্দিষ্ট জলাশয় লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, গৃহপ্রান্তে পীতাভ ঝিঙের ফুল ফুটিয়া প্রাচীরের চাল আলো করিয়া ফেলিয়াছে, রাশি রাশি হল্‌দে, সাদা এবং লাল সন্ধ্যামণি ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় ছোট ছেলে মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেঃ—

"কচুর পাতায় নল
গেদে মার ঢল।"

কেহ বা সমোচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেঃ—

"কচুর পাতায় করমচা
এই মেঘখান উড়ে যা।"

প্রাঙ্গণস্থ শশার চালে গোটাকতক বুলবুল সন্ধ্যার এই আলো অন্ধকারের মধ্যে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শশার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি কাটিতে কাটিতে অর্থহীন ভাষায় কত রকম শব্দ করিতেছে এবং অদূরবর্ত্তী থানার আঙ্গিনাতে যে একটা অতি বৃহৎ বৃদ্ধ ঝাউ গাছ আছে, সন্ধ্যার বাতাসে তাহার পত্রশীর্ষ কম্পিত হইয়া শুধু সোঁ সোঁ শব্দ উঠিতেছে, বর্ষার সিক্ত সায়াহ্নবায়ুতাড়িত ঝাউর এই দীর্ঘ মর্ম্মোচ্ছ্বাস এবং বিহঙ্গকুলের এই বিচিত্র সান্ধ্যকূজনের অর্থ কি তাহা এই সকল গ্রাম্য-বালিকা জানে না, কিন্তু তাহাদের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তাহারা তাহাদের বেদনাপ্লুত কোমল বক্ষের অন্তর্লীন বিরহকে অতি নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেছে এবং যুগান্তরের পূর্ব্বে আষাঢ়ের সেই স্মরণীয় প্রথম দিবসে আকাশে নব মেঘের সঞ্চার দেখিয়া দেবী বীণাপানির বরপুত্র হৃদয়ে যে অতৃপ্ত বেদনা অনুভব করিয়া অমর গাথায় বলিয়াছিলেনঃ—

'মেঘালোকে ভবতি সুখি নো পন্যথা বৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনীজনে কিম্পূনর্দ্দর সংস্থে।'

বালিকা প্রকাশ করিতে না পারুক তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে, পিতৃগৃহের সুখ স্মৃতির প্রান্তটিতে তাহার দেহ ও মন ঝঙ্কারিত করিয়া এই অম্লান সুরটিই পুনং পুনঃ ধ্বনিত হইতেছিল এবং মৃৎপ্রদীপের শলিতা পাকাইতে পাকাইতে শুধু তাহার মনে হইতেছিল বাল্যকালের মত তেমনি করিয়া কোন সুধাসিক্ত পুরাতন পরিচিত কণ্ঠে যদি কেহ একবার আহ্বান করিয়া বলেঃ—

"বেলা যে প'ড়ে এল জল্‌কে চল।"

কিন্তু তেমন কেহই নাই, ব্যাকুলা বালিকার অশ্রুতরলচক্ষে ম্লান সন্ধ্যাদীপালোকহিল্লোলিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। ঝম্‌ঝম্ করিয়া জল পড়িতেছে, বিদ্যুতের সমুজ্জ্বল চঞ্চল আলো, মেঘের গর্জ্জন, ছেলেরা কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, বাড়ীর বাহিরে বাঁশতলার গর্ত্তে নূতন জলে অসংখ্য ভেক সরু মোটা বিচিত্রকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিতেছে, আর দুই তিন মিনিট অন্তর একটা কোলা ব্যাং 'গ্যাঁৎ গ্যাঁৎ' করিয়া ডাকিয়া সেই জলাশয়ে স্বকীয় মহিমান্বিত অস্তিত্বের কথা জ্ঞাপন করিতেছে। সেই ভেকের ডাক আর টিনের মুরি দিয়া ছাদসঞ্চিত বৃষ্টিধারা গৃহ-প্রান্তস্থ একটা মানগাছের প্রকাণ্ড পাতার উপর পড়িয়া যে শব্দসমন্বয় উৎপন্ন করিতেছে তাহা বালকবালিকার ক্লান্ত নয়নপল্লবে নিদ্রার কুহকের মত, তাহাদের চক্ষু ঘুমঘোরে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আজ আর কেহ সহজে নিদ্রা যাইতেছে না, আগামী কল্য দশহরা, দশহরার জন্য দশরকম ফলের আয়োজন করিতে হয়। কোথায়

কোন ফল পাওয়া যায়, খুব সকালে না উঠিলে চক্রবর্ত্তী-বাগানে ফল পাওয়া শক্ত হইবে, ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা হইতেছে ; ইতিমধ্যে ঘরের এককোণে একটা প্রকাণ্ড ভেক দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধববর্গের সহর্ষ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর আত্ম-গোপন করিতে পারিল না, "কোঁ কট কট" করিয়া ডাকিয়া উঠিল, আর ছেলেরা লাফাইয়া উঠিয়া লাঠি দিয়া খাটের নীচে হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল, একজন গামছা মুড়ি দিয়া রান্নাঘরের বারান্দা হইতে খানিক গোবর লইয়া আসিল, তাহার পর সেই গোময় নিরীহ ভেকের মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে একটা তৈলসিক্ত প্রজ্বলিত শলিতা বসাইয়া দিল, ভেক সেই শলিতা সংযুক্ত গোময় লইয়া লাফাইয়া ঘরের এদিকে ওদিকে বেড়াইতে লাগিল, আর ছেলে মেয়েরা 'বেঙের মাথায় প্রদীপ জ্বলে' বলিয়া উল্লাস-হাস্যে গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল ; অবশেষে বুড়া কর্ত্তামা আসিয়া ব্যাং বেচারীকে অব্যাহতি দিলেন।

খুব ভোরে ছেলের দল চক্রবর্ত্তীদের কামরাঙ্গা বাগানে চলিল, সেখান হইতে বোঁটা সংযুক্ত কামরাঙ্গা, জামরুল, ডালিম, নেবু, পেয়ারা, থোকা থোকা জাম, ফল্‌সা সংগ্রহ করিয়া কোঁচড় ভরিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। মাসী, পিসী, দিদি সম্পর্কীয়া পাড়াপ্রতিবেশিনীরা পূজায় দেওয়ার জন্য সেই সকল ফলের কিছু কিছু অংশ চাহিয়া লইলেন, কিন্তু এখনো তিন রকম ফল বাকী, কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করা যায় এই চিন্তায় অনেকেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শেষে তাহারা খেজুরগাছ হইতে পীতবর্ণ 'খেজুরের কাঁদি,' মজুমদারদের খিড়কি-বাগান হইতে সাদা সাদা 'সাহেব করমচা' এবং একটা 'কেলেকোঁড়ার' ফল আনিয়া দশ-রকম ফল মিশাইয়া সহর্যচিত্তে সাবধানে ঘরে তুলিয়া রাখিল। 'কেলেকোঁড়া' একপ্রকার কণ্টকময় লতার ফল, দেখিতে অনেকটা কাঁচা সুপরীর মত, কোন প্রয়োজনে লাগে কি না জানি না, কিন্তু 'মেয়েপাঁচালী' মতে এই ফল দশহরা উপলক্ষে সংগৃহীত দশরকম ফলের মধ্যে একটি অবশ্য ব্যবহার্য্য ফল—এই ফলে মনসাদেবী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

গ্রামে ছেলেদের মধ্যে আজ খেজুর পাড়ার ধূমই কিছু বেশী, বড় বড় খেজুরের কাঁদি কাটিয়া ছেলেরা মহানন্দে তাহা বাড়ী লইয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে তৈল লবণ মাখাইয়া বিভিন্ন থোকায় তাহা ঘরের চালের সঙ্গে সারি সারি টাঙ্গাইয়া রাখিতেছে। তৈল ও লবণে জর্জ্জরিত হইয়া সেগুলি দুই একদিনের মধ্যে নরম হইলে ছেলেরা তদ্দ্বারা রসনার তৃপ্তি-সাধন করে।

একটু বেলা হইলে গৃহকর্ত্রী স্নান করিয়া আসিলেন এবং মনসা পূজার আয়োজনে মনো-নিবেশ করিলেন। গোময়লিপ্ত তুলসীতলাতে পাতাসেজের একটি ডাল আনিয়া পোঁতা হইল ; বারকসে নৈবেদ্য, পাথরের বাটীতে কাঁচা দুধ, পাথরে আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি সময়োপযোগী সুরস ফল, ধুনুচিতে ধূপ, ঝাঁঝুরি ঢাকা দীপ, গোময়ের উপর বসানো ; সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে সেগুলি তুলসীতলায় রক্ষিত হইল। পুরোহিত আসিয়া একে একে দশরকম ফল, ফুল নৈবেদ্য এবং ধূপ দীপ সহকারে দেবীর পূজা শেষ করিয়া গৃহান্তরে চলি-

লেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "নৈবেদ্যগুলো পিপড়েতে যেন নষ্ট ক'রে না ফেলে, সকালে সকালে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো দিদি।"

পুরোহিত-বাড়ীতে নৈবেদ্য এবং 'ফলফুলারি পাঠান' হইলে গ্রামস্থ-রমণীবর্গের সাধারণ মাসী মুক্তাঠাকুরাণী মনসার কথা বলিবার জন্য গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলে-মেয়েরা চিড়া, দই ও আম কাঁঠাল দিয়া ফলার আরম্ভ করিবে তাহারই উমেদারীতে কর্ত্তামার চারিদিকে কলরব করিয়া বেড়াইতেছিল, মুক্তাঠাকুরাণীকে দেখিবামাত্র তাহাদের ফলাহারের আকাঙ্ক্ষাটা একেবারে নিবৃত্ত হইয়া গেল। বাড়ীর গিন্নি বৌ-ঝিরা ছেলেমেয়েদের লইয়া মুক্তাঠাকুরাণীকে ঘিরিয়া বসিল ; ঠাকুরাণী তখন পিঁড়ির উপর বসিয়া নানা কথার গৌর-চন্দ্রিকা ফাঁদিয়া অবশেষে 'মনসার কথা' আরম্ভ করিলেন :—

'এক ছিল মণ্ডল, তার ছিল সাত বেটা ; মস্ত গেরস্ত, গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা খন্দকুটো, সোনার সংসার। ছোট বেটার বৌ বড় লক্ষ্মী মেয়ে, নামটি তার কনে বৌ। কনে বৌ একদিন বিকেলে কলসী কাঁকে জলকে গিয়েছে, যেতে যেতে দেখ্‌তে পেলে মাঠে ধানের জমীর আলে গরুর পায়ের একটা পাউঠার (পদচিহ্ন) মধ্যে ছোট ছোট দুটি ডিম। 'আহা, কোন পাখীর ডিম এখানে পড়ে রয়েছে' বলে কনে বৌ ডিম দুটি তার ডুরে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিলে, তারপর বাড়ী এসে টাকের উপর সরার মধ্যে পোয়াল চাপা দিয়ে বেশ 'যতন' করে ঢেকে রাখ্‌লে ; রোজ দেখে, রোজ দেখে, ডিম আর ফোটে না, শেষে একদিন দেখতে পেলে ডিম দুটি ফুটেছে, পাখীর বাচ্চা নয়, দুটো গোখুরো সাপের ছোট ডেঁকা! কনে বৌ তখন রোজ রোজ দুধ গঙ্গাজল খাইয়ে ডেঁকা দুটিকে পুষতে লাগলো, শেষে যখন তারা বেশ বড় হয়ে উঠ্‌লো, তখন বাড়ীর মধ্যেকার ধানের গোলাতে তাদের তুলে রাখ্‌লে, তারা কনে বৌর কাছে দুধ কলা খেয়ে ডাগর হতে লাগলো।'

'গোলায় ধান বের কর্ত্তে গিয়ে একদিন মণ্ডলদের বড় ছেলে দেখ্‌লে দুটো 'ওরেবত' সাপ, গোলার মধ্যে ফোঁস ফোঁস কচ্ছে, ভয়ে পালিয়ে এল, শেষে সাপ দুটোকে বের ক'রে ফেল্লে, লাঠি নিয়ে মারতে গেলো, গিন্নি বল্লে, "আহা, বাস্তুসাপ, মারিস নে, তাড়িয়ে দে"। মায়ের কথা শুনে সাপ দুটোকে না মেরে তাড়িয়ে দিলে, কনে বৌ আবার এক সময় এসে তাদের চুপে চুপে গোলায় তুলে রাখ্‌লে।"

"তার পরদিন মণ্ডলদের মেজ ছেলে ধান বের কর্ত্তে গিয়ে দেখে, দুটো 'ওরেবত' সাপ, ভয়ে পালিয়ে এলো, তারপর সাপ দুটোকে বের করে ফেল্লে, লাঠি নিয়ে মারতে গেল, গিন্নি বল্লে "আহা বাস্তুসাপ, মারিস নে, তাড়িয়ে দে"—মায়ের কথা শুনে সাপ দুটোকে না মেরে তাড়িয়ে দিলে, কনে বৌ আবার এক সময় এসে তাদের চুপে চুপে গোলায় তুলে রাখ্‌লে।"

'এমন করে সেজ, ন, ফুল, ছোট সকল ছেলে, সাপ দুটোকে একে একে তাড়িয়ে দেয় আর কনে বৌ তাদের কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনে ; বাড়ীর কর্ত্তার কাণে সে কথা গেল, সে কনে-বৌকে ডেকে বল্লে 'হেঁ দেখ কনে বৌমা, তুমি দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষচো ভাল হচ্ছে

না, সাপ দুটোকে তাড়িয়ে দেও!' কনে বৌ ঘোমটা টেনে আস্তে আস্তে বল্লে "আমি ওদের মানুষ করেছি কি করে তাড়াব; গাছ পুঁতে কি সে গাছ নিজের হাতে কাটা যায়?'

কনে বৌকে খোঁটা দিয়ে বাড়ীর সকলে তখন পাঁচ কথা বলতে লাগলো; চোখের জলে বৌটির গাল দুটি ভেসে যেতো, সে হাপুস নয়নে কাঁদতো, এমন কি তার পরাণের সামিগ্গীর যে সোয়ামী সেও তাকে নাথি ঝেঁটা দিতে লাগলো, 'নড়'কথায় বল্‌তে লাগলো, 'হয় তুই সাপ ছাড়, না হয় বাড়ী ছাড়'।

'একদিন সন্ধেবেলা কনে বৌ গোলার দুয়োরে আলো দেখাতে' গিয়েছে, এমন সময় সাপ দুটো তাকে ডেকে বল্লে "দিদি গো দিদি, আমাদের জন্যে তোমার বড় নাখোঁকা হচ্ছে সতীলক্ষ্মী তুমি তোমার এ কষ্ট কি চক্ষে দেখা যায়, আমরা আর এখানে থাক্‌বো না।"

'কনে বৌ বল্‌লে কোথা যাবি ভাই তোরা, আমার কষ্ট হচ্ছে হোক, আমি থাক্‌তে কেউ তোদের কোন মন্দ করতে পারবে না।'

'সাপেরা দুই ভাই বল্‌লে "না দিদি, আমরা দেশে যাব, দেশে আমাদের কত ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য্য আছে, আমাদের রাণীমাকে ব'লে তোমাকে একবার দিনকতকের জন্যে সেখানে নিয়ে যাব।'

'কনে বৌ বল্‌লে "হ্যাঁ গেরস্তর সোমত্ত বৌ আমি, আমাকে কি কোথা যেতে দেয়? তোরা পাগল হয়েছিস, আমার যাওয়া টাওয়া হবে না।"

'সাপেরা হেসে বল্‌লে "তা হবে না, আমরা পালকী বেহারা নিয়ে আস্‌বো, তুমি বাপের বাড়ীর নাম ক'রে যাবে, আবার দিনকত পরে রেখে যাব।'

'বৌ তখন মাথা নেড়ে বল্‌লে "আচ্ছা আমি যেন যাব, আর যদি তোর জাতভায়েরা আমাকে খেয়ে ফেলে!" সাপেরা বল্‌লে "তা খাবে না, তোদের মানুষের মধ্যে যত খল আছে সাপের মধ্যে তত খল নেই।"

'সাপ দু ভাই চলে গেল। দু মাস ছ মাস যায়, একদিন তারা দু ভাই মানুষের বেশ ধরে বারোটা বেহারা আর পাল্কী নিয়ে কনে বৌকে নিতে এলো। কনে বৌ আগে কোন দিন ভাবেনি যে সাপেরা আবার তাকে নিতে আস্‌বে, তাই তরাসে আজ তার গা কাঁপ্‌তে লাগলো, কথা দিয়েছে কি করে, শাশুড়ীকে বল্‌লে "মা দিনকত বাপের বাড়ী থেকে আসি, অনেক দিন যাইনি।"

'শাশুড়ী বল্‌লে "এস মা, বাপের বাড়ী যাবে বইকি, হাজারো হোক মা বাপের চেয়ে ব্যথার ব্যথি আর কে আছে।'

'শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে, শ্বশুর, ছয় ভাশুর, সোয়ামী সকলকে প্রণাম করে, কনে বৌ পালকী চড়'লো, বারোটা বেহারা পালকীখানা উড়িয়ে নিয়ে চোল্‌লো।'

'কনে বৌ অনেকদিন নাগপুরীতে থাক্‌লো। ছমাস পরে আবার বেহারাদের কাঁধে চড়ে শ্বশুরবাড়ী ফিরে এলো; নাগরাণী মনসাদেবী তাকে অনেক গহনাগাঁটি, অনেক টাকাকড়ি

ধনদৌলত দিলে, আর বলে দিলে যেন তাদের গেরস্থালীতে আষাঢ়মাসে মনসা পূজো হয়, তাহলে আর সাপের ভয় থাক্‌বে না, সুখ সম্পদ উথলে উঠবে।'

'অনেক টাকাকড়ি মণিমুক্তো নিয়ে কনে বৌ শ্বশুরবাড়ী ফিরে এসে দেখলে সেখানে তার নামে দুর্নাম রটেছে, শাশুড়ীত মুখ বেঁকিয়ে রইল, সোয়ামীত কথা কয় না, পাঁচ জনে ছিছিক্কার কচ্ছে; শুনে কনেবৌ লজ্জায় মরে গেল, মনে মনে বল্লে "মা মনসা, তুমি জান আমি নির্দ্দুষী, আমার এ কলঙ্ক দূর কর মা।"

'মনসা তখন ঢেঁকির মত হয়ে এক বাড়ীতে পূজো খাচ্ছিলেন, তাঁর মাথায় টনক পড়লো, একটা সাপকে ডেকে ব'লে দিলেন "কনে বৌকে ব'লে আয় তার কোন ভয় নেই, খুব ধূমধামে মনসা পূজোর আয়োজন করুক।"

'ধূমধামে মনসা পূজোর আয়োজন হলো' কুটুম কুটুম্বিতের ধূম পড়ে গেল, মণ্ডলদের জাত ভায়েরা যে যেখানে ছিল সকলে এসে জুটলো, চিড়ে দৈয়ের পেল্লাই ফলার লাগলো।'

সকলে ফলার খেতে বসবে এমন কালে মণ্ডলদের জাতের চাঁই, সে বল্লে "বুড়োমণ্ডল, আমরা তোমার বাড়ীতে খেতে পারিনে, একটা কথার উত্তর দিতে পার তবে খেতে পারি, তোমাদের ক'নে বৌ বাপের বাড়ীর নাম ক'রে এতদিন কোথায় কাটিয়ে এলো, এত টাকা কড়ি মণি মুক্তোই বা কোথায় পেলে তা যদি ক'নে বৌ এই দশের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারে তাহলেই তোমার বাড়ীতে ফলার খাওয়া মঞ্জুর, তা না হলে তুমি একঘরে হয়ে থাক।"

মণ্ডল গিন্নি তখন ক'নে বৌর কাছে এসে কেঁদে বল্লে "কি হবে মা, আজ যে জাত যায়, পারিস ত মান বাঁচা।"

'ক'নে বৌ তখন হাত জোড় ক'রে বল্লে "হে মা মনসা, আজ লজ্জা নিবারণ কর।" শাশুড়ীকে বল্লে 'আমি এতদিন বলিনি, আজ সকল কথা খুলে বলবো, দশঠাকুরকে বৈঠক বস্‌তে ব'লে পাঠাও আমি যাচ্ছি।"

'কনে বৌ ময়লা কাপড় পরে, মাথা নীচু করে, দশঠাকুরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সতী লক্ষীর হাতের শাঁখা, কপালের সিঁদুর জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো, কোথা হ'তে দুটো পেল্লাই অজগর সাপ (মা, বলতে গা শিউরে উঠ্‌চে) ছুটে এসে ক'নে বৌর কাঁধের উপর ফণা ধ'রে দাঁড়ালো।'

'কনে বৌ চিনতে পাল্লে এরা তার সেই কুড়িয়ে পাওয়া দুটি ভাই। ক'নে বৌর মনে ভরসা হলো যে মা মনসা আজ লজ্জা নিবারণ করবেন। তখন সে দশের মাঝে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো "এক ছিল মণ্ডল, তার ছিল সাত বেটা, মস্ত গেরস্ত, গোয়াল ভরা গরু" (এই স্থানে মুক্তাঠাকুরাণী সমস্ত গল্পটা প্রথম হইতে পুনরাবৃত্তি করিলেন)—কথা শেষ হলে সাপ দুটো আস্তে আস্তে নেমে জঙ্গলে চলে গেল, দশে ধন্যি ধন্যি করতে লাগলো, বুড়ো মণ্ডল আহ্লাদে ছোট বেটার বৌকে কোলে নিয়ে নাচতে লাগলো, বল্লে "মা তুমি

আমার ঘরের লক্ষী, তুমি আমার সতীসাধ্বী বৌ, তোমার মনে বড় কেলেশ দিয়েছি, বুড়ো শ্বশুরের অপরাধ নিয়োনা মা।"

'ক'নে বৌ বল্লে "মা মনসা আজ আমার লজ্জা নিবারণ করেছেন, কলিতে তিনিই জাগ্রত দেবতা, আজ হ'তে ঘরে ঘরে যেন তাঁর পূজো হয়।"

'ধুমধামে দৈ চিড়ের ফলার হয়ে গেল, ঘরে ঘরে মনসা পূজোর ধুম পড়লো। মণ্ডলদের সম্পদ আরো উথলে উঠলো। শেষে অনেক কাল সুখে কাটিয়ে লক্ষী ক'নে বৌ বুড়োবয়সে পাকাচুলে সিঁদূর প'রে, হাতের নোয়া অক্ষয় রেখে সোয়ামী পুত্তুর, নাতিপুতি রেখে স্বগ্গে গেল।'

মুক্তাঠাকুরাণী ওরফে মুক্তোমাসী তাঁহার স্বাভাবিক সরল, অলঙ্কার ভাষায় এই কাহিনী বিবৃত করিয়া গেলেন। কথা শেষ হইলে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য চারিদিক হইতে তাঁহার উপর অনুরোধ চলিতে লাগিল, মুক্তাঠাকুরাণী বলিলেন "ওমা, এখন কি আমি জল খেতে পারি, আরো দশবাড়ী কথা শুনোতে হবে তবে ত খাওয়া দাওয়া, তোমাদের ত খাচ্চি মা, এখন আসি।"

বেলা দশটার মধ্যে মনসা পূজা শেষ হইয়া গেল; এমন সময়ে সহসা নদীতীরে যুগপৎ অনেকগুলি ঢকাধ্বনি উথিত হইল। গ্রামের ছেলেরা তেল মাখিয়া কোমরে গামছা জড়াইয়া নদীতীরে গঙ্গাপূজা দেখিতে ছুটিল।

গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী আজ যেমন মনসা পূজা হইতেছে, তেমনি গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণ ঢাক ঢোল বাজাইয়া নদীতীরে গঙ্গাপূজা করিতেছে। গোবিন্দপুরে শ্রীমানী ও নন্দীদের আড়তই অতি বৃহৎ এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন, ইহাদের জিনিষ পত্র নানাস্থান হইতে নৌকা বোঝাই হইয়া গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়া লাগে। পণ্যদ্রব্য বোঝাই সমেত নৌকা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ঘাটে আসিয়া পৌছে, এই অভিপ্রায়ে গঙ্গাদেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বৎসরান্তে আজ দেবীর পূজা হইতেছে, গতবৎসর শ্রীমানীদের তিনখানি চুণের নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে তাহাদের বড় ক্ষতি হইয়াছে। হয়ত কোন কারণে দেবী ভগবতী অনুগত ভক্তের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এই আশঙ্কায় শ্রীমানীরা এবার বিশেষ ধূমধামে পূজা দিতেছে। নদীতীরে অনেক খানি জায়গা কোদালী দিয়া চাঁচিয়া সেখানে ছড়াঝাঁট দিয়া একটা ছোট সামিয়ানা বা নীলের চাদরের নীচে পূজার আয়োজন হইয়াছে; আমাদের গ্রাম্য অঞ্চলে প্রতিমাগঠনপূর্ব্বক গঙ্গা পূজা করিবার নিয়ম নাই, শুনিয়াছি কোন কোনস্থানে ভগীরথানুসৃতা মকরবাহিনীর পূজা হয়, কিন্তু এখানে মৃন্ময় ঘটে দেবীর আবাহন করিয়াই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে, তবে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। নাকে তিলক কাটা, নামাবলীতে আবৃত দেহ সদ্যোস্নাত পুরোহিতেরা সামিয়ানার নীচে পূজায় বসিয়া গিয়াছেন, গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। পুরোহিতের হস্তে এক একবার ঘণ্টা বাজিতেছে আর বটগাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর উপবিষ্ট ঢাকিরা 'ড্যাডাং ড্যাং ড্যাং' শব্দে ঢাকে দুই একবার কাটি দিয়া সঙ্গীদিগের সঙ্গে

আলাপ করিতেছে; পূজার কাছে বড় বড় বারকসে বুট ভিজে, মুগের ডাল ভিজে, খণ্ডখণ্ড পাকা কলা, দুই পাঁচ জন নাছোড়বান্দা অতিথি ও চাকর বাকরের জন্য ধামা বোঝাই চিড়ে ও মুড়কি তেকাটার উপর রেকাবিতে আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, ফলসা ও বনকাঁঠাল প্রভৃতি নানারকম সাময়িক ফল স্তূপাকারে সজ্জিত। সন্নিকটে প্রকাণ্ড ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কলার পাতায় রাশি রাশি ফুল—গন্ধফুলই বেশী! দোকানদারদের ছোট ছোট ছেলেরা কাঁশর ঘণ্টার বিশৃঙ্খল শব্দ তুলিয়াছে। নদীতীরে বিশ পঁচিশ খানি ছোট বড় নৌকা বাঁধা, নৌকার মাঝিরা নৌকাগুলিকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহার অগ্রভাগ তৈল ও সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে; কেহ কেহ নৌকাগ্র শোলার মালা ও শোলার কদম্ব ফুলে ভূষিত করিয়াছে। বড় বড় নৌকায় যে সকল মাড়োয়াড়ী দাঁড়ি গুণ টানিবার জন্য নিযুক্ত আছে তাহারা নৌকার সুবৃহৎ শতছিদ্রবিশিষ্ট পালগুলি নদীতীরে সবুজ ঘাসের উপর বিছাইয়া গুণছুঁচ দিয়া তাহাদের ছিন্ন অংশ মেরামত করিতেছে। কৌপিনের উপর আজানুসমুত্থিত-বহির্ব্বাস পরিহিত নামাবলীবেষ্টিতমস্তক বৈষ্ণব ভিখারীদল কাঁধে ঝুলি লইয়া নৌকায় নৌকায় ভিক্ষা লইয়া বেড়াইতেছে এবং গ্রাম্যকারুকার্য্যখচিত সারিন্দের তারের উপর দ্রুত ছড় ঘুরাইয়া তাহার চঞ্চল কম্পিত তানের সহিত আপনার মোটা কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গাহিতেছে,

"ব্রজ হতে তোমায় নিতে পাঠায়েছে রাই
তুমি যাবে কি না যাবে হরি জানতে এলেম তাই।"

তাহার কণ্ঠস্বর মুক্ত নদীতীর ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, অদূরে আউসের ক্ষেত্রে বসিয়া কৃষাণেরা নিড়াণী দ্বারা বড় বড় শ্যামাঘাস ও কাঁটা নিড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল বায়ু-প্রবাহে ধান্যশীষগুলি হিল্লোলিত হইতেছে; যাহা দোকানদারেরা নদীজল বেষ্টনপূর্ব্বক এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত নদীর গলায় যে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছে তাহা হইতে দুই পাঁচটা ফুল খসিয়া যাওয়াতে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য স্নানরত ছেলেরা সমস্ত জল তোলপাড় করিয়া দলবদ্ধ হইয়া সেইদিকে সাঁতার দিয়া যাইতেছে। আকাশে এই মেঘ, এই রৌদ্র, মেঘের চঞ্চল ছায়া নদীবক্ষে অল্পক্ষণের জন্য ক্রীড়া করিয়া অদৃশ্য হইতেছে, আবার তখনই মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, দেখিয়া মনে হয় বহুপূর্ব্বকালেও এমনি একদিন বুঝি দেবী জাহ্নবী ভগীরথের পতিত পিতৃগণের চিতাভস্মে জীবন সঞ্চার করিবার জন্য এমনি করিয়া কলপ্রবাহ ঝঙ্কারিত ক্ষিপ্র চঞ্চল গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্যপাদস্পর্শে চারিদিকে এমনি আনন্দ ও উন্মাদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, যাজ্ঞিকেরা মঙ্গলবাদ্যনিনাদিত শঙ্খঘণ্টা-আরাবিত তীর-তরুচ্ছায়ায় বসিয়া এমনি করিয়া ভক্তি মধুর স্তব পাঠে তাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন এবং সেই পতিতপাবনীর সংস্পর্শে অনুর্ব্বর কঠিন ক্ষেত্র ফুলফলে সুশোভিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন নিষ্ঠাপ্রীতি এবং অনন্যসাধারণ নির্ভরতা আর নাই, তথাপি আজিকার নববর্ষার একটি মেঘ রৌদ্র হিল্লোলিত আনন্দ কল্লোলভরা উৎসবময়ী দিবা হর্ষোচ্ছ্বাস-তরঙ্গায়িত অতীত স্মৃতির বিস্মৃতপ্রায় রহস্য

ভাণ্ডার হইতে যে স্মরণচিহ্নটুকু আহরণ করিয়া আনিতেছে তাহাতেই আমাদের ক্ষুব্ধ, শুষ্ক, মরুচিত্ত ভরিয়া যাইতেছে ; এবং এই দৃশ্য আমাদের সংশয়সঙ্কুল, জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত, অনভ্যস্ত চক্ষুর সম্মুখে স্নিগ্ধ মধুর মায়া চিত্রের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে !

প্রত্যাবর্ত্তন।

৩রা জুন বুধবার,—এক বাজার পাহাড়ে লোকের মধ্যে দারোগা সাহেবকে খুব খানিকটে অপদস্থ ক'রে, আমরা চটি ত্যাগ কল্লুম, বলা বাহুল্য তখন মনে মনে প্রচুর আত্ম-প্রসাদ লাভ করা গিয়াছিল এবং দারোগার দর্পচূর্ণ কল্লাব দরুণ তারপরেও কিছু ক্ষোভের কারণ জন্মায় নি ; তবে মনটা বিশেষ প্রসন্ন ছিল না ; থানার দারোগা মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই যমের এক একটি আধুনিক সংস্করণ, কনেষ্টবলগুলা যমদূত ; কিন্তু সেকালের যম ও যমদূতের সঙ্গে একালের দারোগা এবং কনেষ্টবলদের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় ; দারোগা সাহেবদের হাতে যমদণ্ডের ন্যায় কোনরকম দণ্ড না থাকলেও তাঁদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মফঃস্বলবাসীদিগকে সশঙ্কিত থাকতে হয়, এবং যদিও যমদূতদিগের শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর ও পাশ একালে লৌহ নির্ম্মিত হাতকড়া এবং 'রুল' নামক অনতি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে পরিণত হয়েছে, তথাপি সাহসপূর্ব্বক বলা যায় যে, যম ও যমদূতের হাতে অন্ততঃ সাধুদিগের কোন আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু পুলিসের হাতে সাধু অসাধু কারো রক্ষে নেই ; অতএব এরকম ক্ষমতাশালী দারোগা সাহেব তাঁর হাতার মধ্যে একজন নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, কম্বলধারী মুসাফির সন্ন্যাসীর কাছে এরূপভাবে অপদস্থ হ'য়ে এবং তাঁর অমোঘ হুকুম ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে সাধারণের সম্মুখে যে গৌরব হ'তে বঞ্চিত হ'লেন, তাঁর সেই হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার কর্ত্তে তাঁকে অনেক হয়রাণ হতে হবে, এবং আমাদের দোষে হয়ত অনেক নির্দ্দোষী বেচারা তাঁর হাতে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করবে—অনেক অসাধু লোকের এরকম স্বভাব যে যদি তারা নিজের কুকর্ম্মের জন্যে কারো কাছে নিগ্রহ ভোগ করে, তাহ'লে আর পাঁচটা নিরীহ লোককে নিগৃহীত কর্ত্তে না পাল্লে তারা কিছুতে শান্তি পায় না, যতক্ষণ সেরকম কোন সুবিধা না পায় ততক্ষণ মনে করে তার অপমানটা সুদ সমেত অনাদায় থেকে গেল।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে এবং তৎসম্বন্ধে বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামীজির সঙ্গে বৃহস্যালাপ কর্ত্তে কর্ত্তে আমরা অপরাহ্নে পর্ব্বত-গাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ পথ ধ'রে চল্‌তে লাগলুম। তখন সূর্য্য অস্ত যায় নি, ধূসর পাহাড়ের অন্তরালে খানিকটে ঢলে পড়েছিল, এবং তার লাল আভা পার্ব্বত্য গাছপালার উপর দিয়ে আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে প'ড়েছিল ; অল্পক্ষণ পরে আকাশের পশ্চিমদিগন্তে একটু মেঘ দেখ্‌তে পেলুম, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নীল আকাশের

লোহিতাভ প্রদেশের অতি ঊর্দ্ধে দুই একটা কালোপাখী যেমন ছোট দেখায়, তেমনি ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ,—ক্রমে মেঘখান বড় হ'তে লাগলো, শেষে মোড় ঘুরে দেখি সম্মুখে পাহাড়ের উপরে মেঘের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে, বোধহ'ল যেন তারা পরামর্শবদ্ধ হয়ে কোন আগন্তুক শত্রুর প্রতীক্ষা কচ্ছে। আমরা বৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না, সন্ধ্যার প্রাকালে, দুর্গম, দীর্ঘ পথের উপর সহসা এরকম ঘনঘটা দেখে মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো, ভাবলুম আর যাইহোক দারোগার শাপটা হাতে হাতে ফ'লে গেল দেখছি, কলিযুগেরও কিন্তু মাহাত্ম্য আছে, সত্যযুগে শুনেছি ব্রাহ্মণ যোগী ঋষির শাপে অগ্নিবর্ষণ হতো, ব্রহ্মতেজে অভিশপ্তব্যক্তি দগ্ধ হয়ে যেতো, আর এই কলির শেষে মুসলমান দারোগার শাপে বুঝি অজস্র বৃষ্টিধারায় আমরা ভেসে যাই ; এখন কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায় এই চিন্তায় মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো।

কিন্তু এখানে আশ্রয় জুটানোও বড় সহজ কথা নয়, এ সহরাঞ্চলের পথ নয় যে ঝড় বৃষ্টির উপক্রম দেখ্‌লে কোন বাড়ীর দুয়ারে আশ্রয় নেব ; একবার পথে বেরিয়ে সহজে গ্রাম নজরে পড়ে না, যদি বা দুই চারিক্রোশ অন্তর এক আদখান গ্রাম দেখা যায়, সে গ্রাম আর কিছুই নয় পাঁচ সাত কি বড় জোর দশখানি কুটীরের সমষ্টিমাত্র, গোটাকত মহিষ, ছাগল, আর জনকত স্ত্রী-পুরুষ এবং তাদের ছেলেমেয়ে এই গ্রামের অধিবাসী। যে কয়খান কুটীর তা হয়ত তাদের নিজের ব্যবহারের জন্যই যথেষ্ট নয় ; এই পথে চল্‌তে চল্‌তে অনেক সময় বিপদে প'ড়ে এরকম গ্রামে গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে, কিন্তু ঘরে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত রাত্রি বাইরেই কাটিয়েছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, একবার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সে এতটা পথ কি রকম ক'রে এল, তাতে সে লোকটা উত্তর করেছিল "নৌকাতেই এসেছি, তবে সমস্ত রাস্তাটা গুণ টেনে।" আমাদের এ পার্ব্বত্য আশ্রয়ও ঠিক সেই রকমের, গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনাবৃত আকাশতলেই কাটাতে হয়েছে। কেউ মনে করবেন না যে, আমি গ্রামবাসীদের আতিথেয়তার দোষ দিচ্ছি, তারা বাস্তবিকই অত্যন্ত আতিথেয়, এমন আতিথেয় পার্ব্বত্য জাতি দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাই অনেক যাত্রীর প্রাণরক্ষা হয় ; বাস্তবিক যদিও তারা গরীব, এবং কায়ক্লেশে সংসার চালায়, তবু তারা তাদের পার্ব্বত্য জমীর পাষাণবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে যে মুষ্টিমেয় গম বা ভুট্টা সংগ্রহ করে তারই তিনখান রুটির একখানা ক্ষুধিত অতিথিকে দিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না, এবং অতিথির প্রতি তাদের যে যত্ন ও আগ্রহ তা অপার্থিব ; কিন্তু পরের জন্য তারা নূতন করে ঘর বেঁধে রাখতে পারে না, আর পাহাড়ের গায়ে বৈঠকখানা তৈয়েরী করবার মত জমীও মেলে না। অনেক খুঁজে পাহাড়ের যেখানে সামান্য একটু চাষের উপযুক্ত যায়গা পায়, তারই এককোণে দুই পাঁচ ঘর গৃহস্থ ছোট ছোট কুটীর তৈয়ারী ক'রে বাকী জমীটাতে চাষ করে। কাজেই অতিথির মাথা রাখবার মত স্থান কখন মেলে কখন মেলে না।

যাহোক আমাদের সম্মুখেত আপাততঃ বৃষ্টি উপস্থিত, ঝড় হওয়াও আশ্চর্য্য নয়; তিনটি প্রাণী ঘোর তুফান মাথায় করে চলেছি, এক একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছি আর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে সম্মুখদিকে অগ্রসর হচ্ছি, কিছু লক্ষ্য নেই, তবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে চলেছি—কথাটা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমরা কেউ নির্ব্বাক হয়ে চলচিনে, দারোগার সঙ্গে আমার যে কথান্তর হয়েছিল তাই লক্ষ্য করে বৈদান্তিক ভায়া উল্লেখ কল্লেন যে "লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা সাধু সন্ন্যাসী মানুষের উচিত নয়, তাতে প্রত্যবায় আছে।" তাঁর মত নৈয়ায়িক প্রবর যে এই শব্দ বিন্যাসের মধ্যে হতে "অকারণ" কথাটা অনায়াসে বাদ দিলেন সেজন্যে তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার প্রলোভনটা সম্বরণ করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। আমি সবে গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বিষম একটা তর্কজাল বিস্তার করবো এবং সেই অবসরে অনেকদূর নির্ভাবনায় যাওয়া যাবে ঠিক করেছি, এমন সময় স্বামীজি আমাদের ডেকে বল্লেন সম্মুখে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছে, সময় থাকতে থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার, আর তর্ক করবার সময় নেই। স্বামীজি আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন, এক মিনিটের মধ্যে ঝড় আমাদের উপর এসে পড়লো, স্বামীজি তৎক্ষণাৎ পাহাড় ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন, প্রবল বাতাসে কতকগুলো শুকনো পাতা উড়ে স্বামীজিকে ঠেলে ফেল্লে, তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমি হঠাৎ বিপদে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লুম, কি করবো ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাল্লুম না, কিন্তু দেখলুম বৈদান্তিক ভায়া তর্ক করতে বিশেষ মজবুদ হলেও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিটা আমার চেয়ে অনেক বেশী, তিনি অন্য উপায় না দেখে এবং বেশী কিছু বিবেচনা না ক'রে আমাকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে রাস্তার পাশে উচু হয়ে শুয়ে পড়লেন আমি তাঁর শরীরের নীচে পড়ে রইলুম, তিনি তাঁর বিপুল শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখ্‌লেন। বাতাসটা আমাদের উপর দিয়ে এত জোরে বয়ে গেল এবং আমাদের এমন নাড়া দিলে যে বোধহলো যেন সেই দণ্ডেই আমাদের দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে পথের পাশে গভীর খদের মধ্যে ফেলে দেবে। কিন্তু দেখলুম বৈদান্তিকের শরীরে অসাধারণ বল, সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাৎটা তিনি অকাতরে সহ্য কল্লেন, আমাদের নাক মুখের ভিতরে যে কত ছাই ভস্ম প্রবেশ করলো তার শেষ নেই। বাতাস চলে গেলে আমরা চেয়ে দেখ্‌লুম গাছের পাতা, ধূলো, কাঁকর, আর রাস্তার ছোট ছোট পাথরের মধ্যে আমরা সমাহিত হয়েছি, দুজনেই গা ঝেড়ে উঠ্‌লুম, উঠে দেখি বৈদান্তিক ভায়ার পিঠ যায়গায় যায়গায় কেটে গেছে, এবং সেখান হতে অল্প অল্প রক্ত পড়ছে; পাঁচ সাত যায়গায় ছড়ে গিয়েছে, বড় বড় কাঁকর খুব জোরে এসে পিঠে লাগাতেই এরকম হয়েছে, আমার কোন ক্ষতি হয়নি, শুধু একবার দম আট্‌কে গিয়েছিল; ঝড় বৃষ্টির সময় পক্ষীমাতা যেমন তার ক্ষুদ্র, অসহায় শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও যত্ন এবং সুকোমল প্রসারিত পক্ষপুট দিয়ে ব্যাকুল আবেগের সঙ্গে ঢেকে রাখে, আজ এই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বৈদান্তিকও তেমনি নিজের শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা ক'রে শরীর দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন, নিজের যে কষ্ট হয়েছে,

সেদিকে একটুও লক্ষ্য নেই, আমার শরীরে যে আঘাত লাগে নি এতেই তাঁর মহানন্দ। বৈদান্তিকের সহৃদয়তা মহত্ত্ব এবং আমার প্রতি করুণ-স্নেহ দেখে স্বতই আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে ভিজে গেল; বিপদের সময় ভিন্ন যে মানুষ চেনা যায় না, বিপদই মানুষের কষ্টি-পাথর তা তখন বুঝ্‌তে পাল্লুম। এই সংসার-বিরাগী, শুষ্কহৃদয়, তর্কপ্রিয়, পরুষভাষী বৈদান্তিকের সঙ্গে অনেক কাল হতেই একত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শরীর শক্ত, কারণ প্রকাণ্ড উচু মানুষটা, মাথার চুলগুলো আবড়া খাবড়া ঠিক খেজুর গাছের মত, মনে হতো এর মধ্যে শুধু তর্কেরই ইন্ধন হতে পারে, এতে আর কিছু পদার্থ নেই; কিন্তু আজ বুঝতে পাল্লুম এই কঠিন দেহের মধ্যে একখানি অতি সুকোমল, স্নেহার্দ্র হৃদয় আছে, এবং তার ঐ অতি বিশালবক্ষ আর্ত্তের নিরাপদ স্নেহনীড়; কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে আমার চোখে জল এল। আমরা উঠে দাঁড়ালে স্বামীজি তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ছুটে এলেন, আমরা কেমন ক'রে রক্ষা পেয়েছি শুনে তিনি বৈদান্তিকের গায়ে তাঁর স্নেহাশীর্ব্বাদ হাতখানি বুলিয়ে দিলেন, স্বামীজির ভাবে বোধ হ'ল আমাকে এমনভাবে রক্ষা করেছেন ব'লে বৈদান্তিককে তিনি তাঁর প্রাণের মধ্যে হ'তে নীরব আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করছিলেন। দুইজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার? বৈদান্তিক বিপদের সময় আমার কাছে ছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তিনি না হয় নিজের, প্রাণ দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা করেছেন, কিন্তু স্বামীজি সংসারের উপর বীতস্পৃহ হয়ে লোটা কমণ্ডলুমাত্র সার করে বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁর এ আসক্তি, এ মায়াবন্ধন, এ বিড়ম্বনা কেন? কোথায় ভগবানের নামে বিভোর হয়ে তিনি সময় কাটাবেন, না শুধু আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যই তিনি ব্যস্ত, এই পর্ব্বতের মধ্যে শতকার্য্যে আমার প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় পেয়েছি, আজও দেখলুম আমার জন্য তাঁর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা স্নেহবন্ধনেবদ্ধ গৃহীর আগ্রহ উৎকণ্ঠা অপেক্ষা অল্প আসক্তিবর্জ্জিত নয়, তাই একবার আমার ইচ্ছা হোল, তাঁকে চেঁচিয়ে বলি "সাধু, সন্ন্যাসী এই কি তোমার সংসারত্যাগ, ইহারই নাম কি মায়ার বন্ধন-ছেদন, সমস্ত ছেড়ে হিমালয়ের মধ্যে এসেও তোমার আসক্তি বিদূরীত হলোনা, শেষে কি বলবে "এই লেড়কা লোক হাম্‌কো বিগাড় দিয়া"—কিন্তু এতকথা মুখ দিয়া বাহির হ'ল না, শুধু বল্‌লুম "আমার প্রতি আপনার মায়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা কিন্তু ভাল নয়।" তিনি একথার জবাবে আমাকে যা বলেছিলেন, তেমন দেববাণী আমি আর কখন শুনি নি। তিনি বল্লেন "আমি সংসার ছেড়ে এসেছি, সংসারে আমার কেহ নাই, তোমার সঙ্গেও আমার কোন সম্বন্ধ নেই, তোমার উপর আমার হৃদয়ের নিস্বার্থ স্নেহবর্ষণ করে আমি প্রেমময়ের প্রেমমন্দিরে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করচি, তুমি আমার কে?"

আমি নিরুত্তর রইলুম। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলো, তাতে পথ আরো পিচ্ছিল এবং দুরারোহ হয়ে উঠলো, আমরা তিনটি প্রাণী নীরবেই চলচি, কিন্তু বোধ করি কারো মন চিন্তাশূন্য নয়, চারদিকে ঘোর মেঘ, দূরে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছগুলোতে বাতাস বেধে একটা অস্পষ্ট অথচ বিকট শব্দ উঠচে, যেন বহুদূরে উন্মত্ত দৈত্যদল দুর্ভেদ্য পর্ব্বতদুর্গ

বিদীর্ণ করবার জন্যে প্রবল আস্ফালন করচে। আমরা কখন অতিধীরে কখন দ্রুতপদে চলে অনেক বিলম্বে নারায়ণচটি নামক একটা খুব ছোট চটিতে উপস্থিত হলুম, শুনলুম এ যায়গাটা পিপুলকুঠি হতে সবে দু মাইল; শুনে আমার বিশ্বাস হলো না, আমাদের দেশে দুমাইল তফাৎ বল্লে এ পাড়া ও পাড়া বুঝায়; বৌবাজার হতে—শ্যামবাজারও দু মাইলের বেশী নয়, কিন্তু এ কি রকম গজের দু মাইল তা বুঝতে পাল্লুম না, এ যদি দু মাইল রাস্তা হয় তা হ'লে স্বীকার কর্ত্তে হবে এর সঙ্গে আরো পাঁচ সাত মাইল 'ফাউ' যোগ করা ছিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের সঙ্গেকার যে রোগা ছেলেটির কথা বলেছি, আমরা তাকে কাতর দেখে আহারান্তেই তাকে আগে রওনা করে দিয়েছিলুম, কারণ সে যে রকম রোগা তাতে সে যে আমাদের সঙ্গে চল্‌তে পারবে সে ভরসা ছিল না, তার উপর যদি তাকে আগে রওনা করা না যেত, তাহ'লে দেখচি পথে এই দেবদুর্য্যোগের মধ্যে সে নিশ্চয়ই মারা পড়তো। যাহোক দারোগা সাহেব আমাদের চটিত্যাগ করবার নিষেধবার্ত্তা জারী করবার পূর্ব্বেই সে বেরিয়ে পড়েছিল, কথা ছিল সে সম্মুখের চটিতে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে; আমরা নারায়ণচটিতে পৌঁছে দেখলুম সে আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছে। পথে জলে ঝড়ে আমাদের কি দুরাবস্থা হচ্ছে ভেবে বেচারী বড়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ হয়ে বসেছিল, আমরা ভিজতে ভিজতে নারায়ণচটিতে উপস্থিত হলুম, আমাদের দেখতে পেয়ে তার রোগক্লিষ্ট, শুষ্ক মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, আমরাও তাকে সুস্থদেহে সেখানে উপস্থিত দেখে খুব আনন্দিত হলুম।

নারায়ণচটিতে যখন পৌঁছন গেল, তখনও দেখলুম বেলা আছে, পাতলা মেঘের দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে উড়ে যাচ্ছে, রোদ একটুও নাই, গাছের ডালে ডালে নানারকম পাখী ব'সে তাদের সিক্ত-পাখা ঝাড়চে আর কলরব করচে, এখানে দু পাঁচ জন মানুষের মুখ দেখে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। এ চটিও পাহাড়ের এক অতি নির্জ্জন নেপথ্যে, লোকালয় নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না; তবু এখানে এসে মনে হলো আমরা জনমানবশূন্য নির্জ্জন প্রান্তর ছেড়ে যেন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছি। পুরুষেরা নিশ্চিন্তমনে গল্প করচে, মেয়েরা দু তিনজন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হাসচে, কথাবার্ত্তা বলচে, অপরিচিত কয়েকজন সন্ন্যাসীকে দেখে কৌতুক-বিস্ফারিত চকে আমাদের দিকে চেয়ে জনান্তিকে কি বলা কহা করচে, আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, পথের উপরে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত রাশিকৃত ভিজে কাঁকর জড় করচে, কিম্বা অদূরবর্ত্তী গাছের তলা হ'তে রাশি রাশি শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনচে, চারদিকে বেশ একটা জীবনের হিল্লোল এবং সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

এই চটিতে দুখানা ঘর। ঘর দুখানা নিতান্ত কুটীরের মত নয়, একটু বড় বড়। আমরা বদরীনারায়ণে যাবার সময় এ চটিটা দেখ্‌তে পাইনি, এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছি তাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনো বোধকরি এ চটি খোলা হয়নি, কি হয়ত কোন গৃহস্থের বাড়ী

ভেবে এদিকে না তাকিয়েই চলে গিয়েছি, সম্ভবতঃ তখন বিশেষ দরকার হয়নি ব'লেই এ বিষয়ে উপেক্ষা করেছিলুম, এমন কি ফিরবার সময় এই চটির সম্ভাবনার কথা একবারও আমাদের মনে হয়নি বলেই আমরা মেঘ দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলুম, কারণ আমাদের মনে হয়েছিল এত নিকটে বুঝি আর চটি পাওয়া যাবে না। যাহোক এই চটিতেই আজ আমরা কয়জন মাত্র যাত্রী, অন্য কোন যাত্রী নেই, দেখে আমাদের বড়ই ভরসা হোল, কারণ যদি আমাদের আগে কোন যাত্রীর দল আস্‌তো, তা হ'লে চটিতে যে সামান্য খাদ্য সামগ্রী পাবার সম্ভাবনা তা পঙ্গপালের মত সমস্ত নিঃশেষ করে চটির দোকানখানিকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ নিতান্ত অসার করে রাখত; আমরা দারুণ-পথশ্রম, এবং তা অপেক্ষাও নিদারুণ ক্ষুধা নিয়ে অনাহারেই প'ড়ে থাকতুম; যৎকিঞ্চিৎ পানাহার হতে বঞ্চিত হতে হবে না ভেবে আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হলুম, বৈদান্তিক ভায়া পেটের চিন্তাতে এতই বিভোর হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর পিঠের বেদনার দিকে কিছুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই, চটিতে যাত্রীর ভিড় নেই দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর সেই দীর্ঘনিশ্বাসকে ভাষায় তর্জ্জমা কর্ত্তে হলে এই ভাবখানা দাঁড়ায় যে "রাম, বাঁচা গেল, একটা বাজে লোকও এখানে আসেনি দেখ্‌চি, তা হলে এখানে দুটো খাবার এবং একটু মাথা রেখে আরাম করবার অসুবিধা হবে না।"

চটিতেই দোকানদারকে দেখ্‌তে পেলুম, তার বাড়ীও এই চটির নিতান্ত কাছে, একেবারে লাগাও বল্লেই হয়। রাস্তার বাঁধারে পাহাড়ের ঢালুর দিকে দুখানা দোকান ঘর, আর ডাইন পাশে একটু উচু জমীতে তার বসতবাড়ী। দোকানের সমুখে দাঁড়িয়ে একটু উপর দিকে নজর কল্লেই তার বাড়ী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আজ এতদিন পরে তার সেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছোট চটিখানার কথা লিখ্‌চি, এখনও যেন সেই ঘর, দ্বার, বাড়ী আমার চক্ষুর সমুখে চিত্রের মত ভাস্‌চে। তার বাড়ীখানিও বেশ সুন্দর, আমাদের বঙ্গদেশের সমভূমিতে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থবাড়ী যে রকমের ঠিক সে রকমের নয় বটে, কিন্তু তার সেই পার্ব্বত্য পল্লীর সামান্য বাড়ীটাতে আমাদের পল্লীগ্রামের অনেকটা ভাব পরিস্ফুট দেখা গেল, তেমনি জাঁকজমকহীন, পরিস্কার, সরল মাধুর্য্যমণ্ডিত, রাঙামাটীর দেওয়াল—দেওয়ালের উপর নানারকমের ফলফুল লতাপাতা কাটা পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা রবিবর্ম্মার হাতের তৈয়ারী অদ্ভুত রকমের পাখীর ছবি, ছবিগুলিতে যে পরিমাণেই শিল্প-চাতুর্য্যের অভাব থাক কিন্তু সেই অশিক্ষিত হস্তের অঙ্কনভঙ্গীর মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠ্‌ছিল, সুন্দর ক'রে আঁকবার জন্যে যে একটা ব্যাকুলতা আর তাতে স্থায়ীত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তার প্রত্যেক রেখার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, আর সেইটিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সজীব এবং সুন্দর ব'লে বোধ হচ্ছিল। পৃথিবীতে সকলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে না, কিন্তু যারা সিদ্ধিলাভের জন্যে চেষ্টা করে—অসিদ্ধ হলেও তাঁদের প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষাটা উপেক্ষার বস্তু নয়।

দোকানদারের বাড়ীতে দুখানা ঘর, একখানা বেশ বড়, তাতেই সে সপরিবারে বাস করে, আর একখানা ছোট কুঁড়ে—বোধহলো গোয়াল ঘর। তখন সে ঘরের মধ্যে গরু ছিল না, একটা মাঝারি গোছ বেলগাছতলাতে দু তিনটে গরু বাঁধা ছিল, এবং একটী ছোট বাছুর পাহাড়ের একধারে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল, বাছুরটা এক একবার তার মায়ের দৃষ্টির বাহিরে গেলেই তার পয়স্বিনী মাতা মাথা উচু করে প্রসারিত চক্ষে ঘনঘন সেদিকে তাকিয়ে দেখচে, যেন সেই রজ্জুবদ্ধ গাভীটির সকরুণ মাতৃ-স্নেহ বাধা বন্ধহীন হ'য়ে তার চঞ্চলবৎসটিকে কোন অনিশ্চিত বিপদ হতে রক্ষা করতে চায়। এই বেলগাছের অদূরে আরো একটা বেলগাছ, এবং দুটো পেয়ারা গাছ; এখন বর্ষার পূর্ব্বাভাস মাত্র, ফুল এবং ছোট ছোট ফলে পেয়ারা গাছ দুটি ভরে গিয়েছে। গোয়ালের পাশে এককাড় কলাগাছ, তেমন সরল নয়, এবং পাতাগুলো ছোট ছোট, যেন পাহাড়ের শুষ্ক নীরস জমী হতে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যরস সংগ্রহ কর্ত্তে পাচ্ছে না। দোকানদারের বাড়ীর ঠিক নীচ দিয়ে একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, জল গভীর নয় কিন্তু অতি নির্ম্মল, এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রাণ-স্বরূপিনী। দোকানদারের বাড়ীর সম্মুখে একটুখানি সমতল জমী আছে, মাঝখানে একটা মধ্যআকৃতি বটগাছ, গোড়াটা পাথর দিয়ে বাঁধান, আমাদের দেশে কোন কোন গাছের তল যেমন ইটপাথর দিয়ে বাঁধান হয় সে রকম নয়, কতকগুলো বড় বড় পাথর গোল করে গাছের গোড়ায় দেওয়া। পাথরগুলি সমস্তই আলগা, তবে তার উপর বস্‌লে খ'সে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই, সকালে সন্ধ্যায় অনেকেই এসে এই গাছতলায় বসে এবং গল্পগুজবে দুদণ্ড কাটিয়ে দেয়, ধরতে গেলে এই গাছতলাই দোকানদারটির বৈঠকখানা। আমরা এই দোকানদারের দোকানেই রাত্রির মত আশ্রয় নিলুম।

সুরাপান।

(শাস্ত্রীয় বিচার)।

সুরাপান সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য;— সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখকের নিজের মত ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই যে অভ্রান্ত ও সনাতন ধর্ম্ম সম্মত, এরূপ বিশ্বাস প্রবন্ধ-লেখক করে নাই।* আর হিন্দুশাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই পাপাবহ, এরূপ বিবেচনাও

* উদাহরণস্বরূপ মনুর মাংসভক্ষণ সম্বন্ধীয় নীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনুর মতে মাংস ভক্ষণে কোনও দোষ নাই অন্ততঃ দৈব পিতৃকার্য্যে পশুহত্যা ও মাংসভক্ষণ তাঁহার মতে নিষিদ্ধ নহে; বরং উহা নিহত পশু ও হন্তারক ব্রাহ্মণ উভয়ের পক্ষেই স্বর্গকর। পশুহত্যার ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্য দেবতা ও পিতৃগণের তুষ্টিকারক, প্রবন্ধলেখক এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পান না। বরং তাঁহার মতে সর্ব্বঅবস্থাতেই পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা অনুচিত।

তিনি করেন না।* সুতরাং এই বিচার-লব্ধ ফলের সহিত, অর্থাৎ সুরাপান সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মতের সহিত প্রবন্ধ-লেখকের মতের কোন সহানুভূতি বা সংস্রব নাই। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে আধুনিক হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চান, কেবল তাঁহাদিগের বিচারের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

হিন্দুশাস্ত্রে সুরাপান পঞ্চমহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; † এবং যাহারা সুরাপায়ী, হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাহারা পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেরই বিদিত আছে। সুরাপায়ীর পাতিত্য বিষয়ক বিধানের ব্যাপ্তি কত দূর, তাহার নির্ণয় করা শাস্ত্রীয় বিচার-সাপেক্ষ। সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আলোচনার সুবিধার জন্য, "সুরা কাহাকে বলে?" প্রথমতঃ তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক।

শ্রুতিতে অনেক স্থলেই "সুরা" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখই বিচারস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"দেবা বৈ ব্রহ্মণশ্চাথন্ন চ শমলমপান্নন্। যদ্ ব্রহ্মণঃ শমলমাসীৎ সা গাথা নারাশংস্যভবৎ। যদন্নস্য সা সুরা। তস্মাদ্ গায়তশ্চ মত্তস্য চ ন প্রতিগৃহ্যম্। যৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াচ্ছমলং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৩।২ অনুবাক।

অর্থাৎ দেবগণ বেদের ও অন্নের মলভাগ নিষ্কাশন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের নিষ্কাশিত বেদের মলভাগকে "নারাশংসী গাথা" (নরস্তুতি বিষয়ক শ্রুতি) এবং অন্নের মলভাগকে "সুরা" বলে। এই কারণে গায়কের ও সুরাপায়ীর নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। যদি কেহ তাহাদিগের নিকট হইতে দানগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার মল প্রতিগ্রহ করা হয়।" এই শ্রুতিতে সুরা শব্দের সংজ্ঞা (Definition) ও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল; এবং ইহাও জানা গেল যে, প্রাচীন শ্রৌতকালে নরস্তুতি গায়কগণ (ভাটগণ) সুরাপায়ীর ন্যায় হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

বৈদিককালে প্রধানতঃ সক্তু (ছাতু) ও তণ্ডুলাদি পদার্থ 'অন্ন' মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং সক্তু ও তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত যে মদ্য বা মাদকদ্রব্য, তাহাকেই বেদে "সুরা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে

* পলাণ্ডু, লশুন ও গৃঞ্জনাদি সেবন বা উহাদিগের ঘ্রাণগ্রহণ শাস্ত্রে পাতক ও পাতিত্যজনক বলিয়া গণ্য হইলেও, প্রবন্ধলেখক উহাদিগের (যদি ঐ সকল পদার্থ স্বাস্থ্যহানিকর না হয়, তবে) সেবনে কোন প্রকার অধর্ম্ম বা পাতকের সম্ভাবনা দেখেন না। পশুহত্যা ও মাংসভক্ষণরূপ নির্দ্দয় ও ঘৃণিত কার্য্য অপেক্ষা, লশুন, গৃঞ্জন ও পলাণ্ডু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ভক্ষণকে লেখক অধিকতর পাপাবহ বলিয়া মনে করেন না।

† ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥ মনু।

alc (সক্তুজাত মদ্য) ও arrack (তণ্ডুলোৎপন্ন মদ্য) বলে, তাহাই বেদোক্ত "সুরা"। মহামতি মনুও শ্রুতিপ্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্‌মা চ মলমুচ্যতে।"

অর্থাৎ অন্নের মল বা পাপকে সুরা বলে।

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥"

মনু ১১।৯৩

অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সুরাপান করিবেন না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতির সহিত মনূক্তির একবাক্যতা করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, alc ও arrack প্রভৃতি (শক্তু ও তণ্ডুলজাত মদ্য) মদ্যই প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সুরা-পদবাচ্য; এবং শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে অপেয়। পরন্তু যাহারা ale ও arrack-পানকারী, শ্রুতিমতে তাহাদিগের নিকট হইতে দানগ্রহণও নিষিদ্ধ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহারা শেরী, শ্যাম্পেন, ক্লারেট, পোর্ট, বার্গণ্ডী ও হাক প্রভৃতি দ্রাক্ষাজাত মদ্য, এবং ব্রাণ্ডী, রম্ প্রভৃতি বিলাতী আসব, অথবা তাড়ী, খর্জ্জুররস প্রভৃতি গ্রাম্য-মদ্য পান করে, তাহারা শ্রুতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না?

বৈদিক সুরা কি, ও তাহারা ব্যাপ্তি কতদূর, তাহা দেখিলাম। এখন, মনুপ্রোক্ত সুরা কিরূপ তাহা দেখা যাউক। ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতা হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকে সুরাকে ত্রিবিধা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ॥"

অনুবাদ,—"গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী ভেদে সুরা ত্রিবিধা। যেমন ত্রৈবর্ণিকের মুখ্যসুরা পানে দোষ; তেমনই ব্রাহ্মণের ত্রিবিধা সুরা পানেই দোষ বলিয়া জানিবে। অতএব ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রকার সুরাপানে বিরত থাকিবেন।" গুড় হইতে সমুৎপন্না সুরাকে গৌড়ী বলে। ইহার অপর নাম, ঐক্ষব (ইক্ষুজাত) সুরা। মাধ্বীর অপর নাম মাধ্বীক। মধুর বিকৃতিতে মাধ্বীর উৎপত্তি। মনুটীকাকার কল্লুক ভট্ট বলেন, মধুক (যষ্ঠি মধু) বৃক্ষের পুষ্পবিরচিতা সুরার নাম মাধ্বী।* সক্তু ও তণ্ডুলাদি-পিষ্ট পদার্থ হইতে প্রস্তুত সুরা পৈষ্টী নামে পরিচিতা। বলা অনাবশ্যক যে, মনু যাহাকে পৈষ্টী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে বৈদিক "সুরা"। কল্লুক ভট্টও এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন;—

"সুরা শব্দঃ পৈষ্টী মাত্রে মুখ্যো, নতু গৌড়ী-
মাধ্বী-পৈষ্টীষু, ত্রিতয়ানুগতৈক রূপাভাবাৎ।"

* মহুয়া হইতে যে মদ্যের উৎপত্তি তাহাকে মাধূক বলে। দ্রাক্ষারসজাত মদ্যকে দ্রাক্ষমদ্য বলে। ইহা মাধূক ও মাধ্বীক হইতে স্বতন্ত্র।

অন্যত্র যথা,—

"যথৈবৈকা পৈষ্টী মুখ্যা সুরা।"

ভবিষ্য পুরাণেও এই পার্থক্যের উল্লেখ দেখা যায়।—

"সুরা চ পৈষ্টী মুখ্যোক্তা ন তস্যাস্থিতরে সমে।" কল্লুকধৃত বচনং।

অর্থাৎ সুরা বলিলে মুখ্যতঃ পৈষ্টীকেই বুঝায়। গৌড়ী ও মাধ্বী, পৈষ্টী সুরার তুল্য গুরুতর পাপজনক নহে। স্মৃতিশাস্ত্রেও মাধ্বীপানকারী অপেক্ষা পৈষ্টী-পায়ীর প্রতি কঠোরতর দণ্ড বিহিত হইয়াছে।

গৌড়ী ও মাধ্বী প্রকৃত পক্ষে বৈদিক সুরার অন্তর্গত না হইলেও, মনুর মতে, ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা অপেয়। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর বলেন, মনুর মতে, গৌড়ী ও মাধ্বী সেবন ব্রাহ্মণের পক্ষে পাতিত্যজনক বলিয়া, তিনি (মনু) উহাদিগকে বৈদিক সুরার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ফল কথা, শ্রুতির মতে সুরা বা পৈষ্টী-পায়ী ব্যক্তিই প্রায়শ্চিত্তার্হ; এবং মনুর মতে গৌড়ী ও মাধ্বী সেবনকারীও (ব্রাহ্মণ হইলে) পতিত বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপরাপর সিদ্ধান্তের মধ্যে এক প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রুতির সহিত স্মৃতির সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিবে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্মৃতি মান্য; কিন্তু স্মৃতি যখনই শ্রুতিচিহ্নিত পথের বহির্ভাগে পাদ-বিক্ষেপ করিবেন, তখনই শ্রুতির প্রামাণিকতা বিলুপ্ত হইবে। এতদনুসারে গৌড়ী ও মাধ্বী শ্রুতিসম্মত সুরা-মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য কি না? এবং উহারা সুরা নামের যোগ্য হইলে, শ্রুতি অনুসারে উহাদিগের পাতিত্য-জনকতা সিদ্ধ হয় কি না, তাহা শ্রুতিমার্গাবলম্বী হিন্দু সমাজের বিবেচ্য।

শ্রুতি ও মনুসংহিতা হিন্দুশাস্ত্র সমূহের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত। এই কারণে বর্ত্তমান প্রস্তাবে প্রধানতঃ শ্রুতি ও মনুর মতই আলোচিত হইল। অবসর মতে অপরাপর শাস্ত্রের মতও আলোচিত হইবে।

হত্যা।

১

মনে পড়িলে এখনও গা কাঁপিয়া উঠে। তখন আমি ছোট; কিন্তু একেবারে শিশু নই—সব কিছু বুঝিতে পারি, আর উপন্যাসটা কবিতাটাও বড় বাদ যায় না। বাবা ও দাদার সঙ্গে মুলতানে গিয়াছিলাম। তখন রুষাতঙ্কের যৌবনাবস্থা। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রুষ আসিতেছে, আর চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজ সীমান্ত সাজাইতেছেন। যে সময়ে আমরা মুলতানে যাই—তখন রুষভীতিটা একটু বেশী রকম চাড় দিয়াছে। মুলতানের অলিতে গলিতে, আনাচে কানাচে ঐ গল্প। রুষ আসিলে প্রথম কোন্ স্থান আক্রমণ করিবে? মুলতান আক্রমণ করিলে তাহারা কি দিয়া আত্মরক্ষা করিবে—কিরূপেই বা রমণীর 'ইজ্জত' রাখিবে?—

ইংরাজ তাহাদের ছুরি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন ! আর ইংরাজের অবস্থা ? ছাউনি ছাপাইয়া সিপাহীর স্রোত বহিতেছে—দু'বেলা 'প্যারেড্' হইতেছে ; গোরার পায়ের মস্‌মসানি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, রণবাদ্যের ঝম্‌ঝমানি, ও বন্দুকের কড়্‌কড়ানিতে মুলতানের মাটি টল্‌মল্ করিতেছে ! দূরে কেহ পটকা ছুড়িলে ছাউনিতে "আলারম্" বাজিয়া উঠে। রাত্রে কুকুর ডাকিলে তো কথাই নাই—সে নিশ্চয় "গাজির" বদ্‌মাশি। বাস্তবিক পাঠানেরা এই সময়ে বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। কোথা হইতে * হঠাৎ আসিয়া সান্ত্রীকে মারিয়া বন্দুক লইয়া পলাইত। হত্যা ও বন্দুকচুরির ধূম বাড়িল। রাত্রে ইংরাজের বিছানায় দোনলা বন্দুক উঠিল। এইরূপ সময়ে আমরা মুলতানে পৌঁছিলাম।

২

ছাউনির পাশে বাজার ; বাজারের শেষে থানা—বা পুলিসের নিদ্রাগার,—আর তার পাশ দিয়া একটা না-গলি, না-বাজার গোছ পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে একতালা বাড়ী—বাড়ীগুলা বেশ ধপ্‌ধপে। ইহাই মুলতানের "বেঙ্গলি সেণ্টর"। এখানে সব বাঙ্গালী—অধিকাংশ কমিসেরিয়েটের বাবু। স্থানটার কাট্ কাট্ ধূ ধূয়ে ভাবের দিকে না চাহিয়া চোক বুজিয়া থাকিলে বোধ হয় দেশে আছি—চারিদিকে বাঙ্গালা কথার ঢেউ উঠিতেছে। আমরাও "বেঙ্গলি সেণ্টরে" বাসা লইলাম। যেথানেই থাকি—আর পাঁচ পুরুষ বাঙ্গালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হউক—বাঙ্গালীর গন্ধ পাইলেই বাঙ্গালীর রক্ত সেই দিকে টানে। যাহাহউক, খুব আমোদে মাসখানেক কাটিল।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক আমাদের বাসার পিছনে আর বাড়ী নাই। একটা ছোট মাঠ ; আর মাঠের মধ্যে আমাদের বাসা হইতে প্রায় দেড়রশি তফাতে—কমিসেরিয়েট্ অফীসর কাপ্তেন রাইলেনের বাঙ্গলা—ঝাউগাছ-ঘেরা খুব বড় বাঙ্গলা। তার খানিক পরে আর একটা বাঙ্গলার মত দেখা যাইত, সেটাতে কে থাকিত কখনও খোঁজ লই নাই। মুলতানের মাটিতে বালির ভাগ বেশী, শীঘ্র তাতিয়া উঠে—তাই আমাদের দেশের মতন লশ্‌লশে শাক সব্‌জি হয় না। কিন্তু এ মাঠটা তেমন নয়। ধারে ধারে অশ্বথ, বাব্‌লা, আঁব, তেঁতুলের সারি—বোধ হয় যত্ন-রোপিত,—আর মাঠেতেও ঘাস খুব। দুপুরবেলা রাজ্যের গরু আসিয়া মাঠে জড় হইত। সাহেব ভালমানুষ—কিছু বলিতেন না।

কেদার বাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। কেদার বাবু কমিসেরিয়েটে কর্ম্ম করিতেন, খুব ভাল লোক ; বড় অমায়িক ; আর রীতিমত বলিষ্ঠ। থাকিতেন রাইলেন্ সাহেবের কুঠিতে। রাইলেন্ সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। সাহেব যে ঘরে শয়ন করিতেন তাহার দুই কাম্‌রার পরের কাম্‌রায় কেদার বাবু থাকিতেন। সঙ্গে এক বোতল গঙ্গাজল

* মুলতান হইতে কাবুল যাইবার এক গুপ্ত পথ আছে। সে পথ দিয়া অতি শীঘ্র কাবুল যাওয়া যায়। সে পথ পাঠান ছাড়া আর কেহ জানে না—পাঠানেরা প্রাণান্তে বলে না।

আনিয়াছিলেন,—এক হাঁড়ি ইঁদেরার জলে দুই ফোঁটা তাই মিশাইয়া রোজ দু'বেলা ঘরময় ছড়াইতেন। আমরা হাসিতাম, তিনিও হাসিতেন।

সাহেবের রামটহল নামে এক পুরবিয়া চৌকিদার ছিল। সে রাত্রে ছাতে উঠিয়া পাহারা দিত। পাঠানেরা অলক্ষ্যে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে—নীচে থাকা অসম্ভব ; তাই উপরে উঠিত। উপর হইতে চারিদিক্ ভাল দেখা যায়।

৩

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ছাতে শুইয়া গল্প করিতেছি। গ্রীষ্মকাল—কিন্তু বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। লাহোরের গুমট্ মনে পড়িল। মুলতানের গরম লাহোরের চেয়েও বেশী—অনেক বেশী, কিন্তু তা' দিনে। দিনে যেমন গরম, রাত্রে তেমনি ঠাণ্ডা। দিনে সূর্য্যকিরণে বালি তাতিয়া গরম ভাপ্ ওঠে, আর সূর্য্যাস্তের পর সেই পরিমাণেই ঠাণ্ডা হয়। মুলতানের সৌখিন্ লোকেরা ঐ সময়ে মাটিতে রাশিরাশি গোলাপফুল ছড়াইয়া তাহার উপর পাত্‌লা চাদর পাতিয়া শয়ন করে। আমরা অবশ্য গোলাপফুলে শুই নাই ; যেমন বিছানায় শুইতাম তেম্‌নিই শুইয়াছিলাম। ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস বহিতেছিল—আর পিয়ানো বাজাইয়া রাইলেন্ সাহেব গাহিতেছিলেন, বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। তখন জুন মাস ; সাহেব গাহিতেছিলেন—

In a drear-nighted December,
Too happy, happy trees,
Thy branches ne'er remember
Their green felicities :
The north cannot undo them,
With a sleeky whistle through them ;
Nor frozen thawings glue them
From budding at the prime.

গান শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইলাম জানি না। মাঝে একবার—জানি না কেন—ছাঁৎ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি ঢং করিয়া ১টা বাজিল। গলা শুকাইয়া কাট হইয়া গিয়াছিল, উঠিয়া জল খাইলাম। দেখিলাম সকলেই নিদ্রিত। কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। কাহারও বাড়ীতে আলো নাই। রাইলেন্ সাহেবের কুঠির দিকেও অন্ধকার। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠির চৌকিদার হাঁকিল—"হুশিয়ার হো—"। আমি আবার শুইলাম। শুইবামাত্র নিদ্রিত হইলাম। এবার স্বপ্ন দেখিলাম—আমার স্পষ্ট মনে আছে—যেন আমি কোন্‌দিক দিয়া কোথায় যাইতেছি। কোথা যাইতেছি ঠিক নাই, অথচ যাইতেছি। দুইধারে বড় বড় গাছ, কিন্তু একটাতেও পাতা নাই—বড় ভীষণ দেখাইতেছে। আমার মনে যেন একটু ভয় হইল ; এতক্ষণ ঠাওর করি নাই—এখন যেন দেখিয়া

ভয় হইল। বনটা যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে! আমি পলাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না—হাত পা জমিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে মাথার উপর শব্দ হইল—"চির্—র্—র্—র্—র্" ; চাহিয়া দেখিলাম একটা চিল উড়িয়া একটা নেড়া গাছে বসিল, আর বসিয়াই আমার কোন পরিচিত আত্মীয়ের গলায় বলিল "পলাও—পলাও রুষ আস্‌ছে!" এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আমার মাথার রোঁয়া দাঁড়াইয়া উঠিল! আমিও যেন উড়িবার চেষ্টা করিলাম—অমনি দুর হইতে কে যেন বলিল "গেল—গেল—আর আশা নাই!!" অম্‌নি দুম্ করিয়া একটা শব্দ হইল!—ছাঁৎ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম বাবা ও দাদা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাবা বলিতেছেন—"এত রাত্রে বন্দুক ছুঁড়্‌লে কে?" আমার তথনও ঘুমের ঘোর যায় নাই—বলিতে যাইতেছিলাম "রুষ!" এমন সময় 'দড়াম্' করিয়া আবার শব্দ হইল—আর সেই সঙ্গে "হো—" করিয়া একটা গোল উঠিল! গভীর রাত্রে সেই "হো—" যে কত ভীষণ শুনায়—যাঁহারা হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

৪

তথন বুঝিলাম কোন হত্যা হইল। শব্দ রাইলেন্ সাহেবের কুঠির দিকে হইয়াছিল। আমরা সেইদিকে ছুটিলাম। পাড়ার আরও কয়েকজন লোক সঙ্গ লইল—দেখিলাম আরও অনেক লোক সেইদিকে ছুটিতেছে। এক নিশ্বাসে রাইলেন্ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছিলাম; দেখিলাম—অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাটির উপর রামটহল পড়িয়া গুমিতেছে,—থালি মাথায়, থালি পায়ে, সর্ব্বাঙ্গে বিছানার চাদর জড়াইয়া রিভল্‌ভর হাতে রাইলেন্ সাহেব দাঁড়াইয়া "the devil—the devil," করিতেছেন,—দ্বারে ডান হাতে হরিকেন্ ল্যাম্প আর বাঁ হাতে একখানা ছোট তলোয়ার লইয়া রাইলেন্-পত্নী কাঁপিতেছেন,—আর কেদার বাবু তীব্রস্বরে "রামটহল—রামটহল" করিতেছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ—থালি গা, মালকোচামারা—হাতে প্রকাণ্ড এক মশারির খোঁটা। ঠিক্ এই সময়ে ছাউনিতে "আলারম্" বাজিল—আর রামটহল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া বলিল—"হে রাম!" আর সেই মুহূর্ত্তেই তাহার পিঠে রাইলেন্ সাহেবের বজ্রলাথি পড়িল! রামটহল একবার মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া পরমুহূর্ত্তে উঠিয়া বেগে পলায়ন করিল।

আমরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। রামটহলের অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম রামটহল বধ হইয়াছে—এখন দেখিলাম রামটহল লাথি থাইয়া বেগে প্রস্থান করিল। তবে কে কাহাকে মারিল?—সাহেবই বা রামটহলকে লাথি মারিলেন কেন? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সমস্তটা একটা রহস্য বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইলাম না, কারণ সেই মুহূর্ত্তেই সাহেব থানসামাকে আলো লইতে বলিয়া, কেদার বাবুকে বলিলেন—"আমার বাড়ীর পিছনে হত্যা হইয়াছে—শব্দ ঐ দিক্ দিয়াই আসিয়াছিল। আমি চলিলাম, আপনার ইচ্ছা থাকিলে আসিতে পারেন।" এই বলিয়া সাহেব—

সেই অপূর্ব্ব বেশেই—সেই যে আর একটা বাঙ্গলার কথা বলিয়াছিলাম সেইদিকে চলিলেন। কেদার বাবু খোঁটা হস্তে, মেম অসি হস্তে, আর আমরা সকলে যে যেমন অবস্থায় ছিলাম চলিলাম। মেম যে অসি লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া পাইলাম না। বলাবাহুল্য বন্দুকের শব্দ হইতে এথন পর্য্যন্ত লিথিতে যত সময় লাগিল প্রকৃত ঘটনায় তত লাগে নাই।

বাঙ্গলায় পৌঁছিবামাত্র দুইজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"শীঘ্র আসুন—খুন—খুন—শীঘ্র!" সাহেব লাফাইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। আমরাও ঢুকিলাম। আমার মন তথন কৌতূহলে গুর্ গুর্ করিতেছিল। ঘরগুলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা—কিন্তু অত দেখিবার তথন অবসর ছিল না। চতুর্থ ঘর ছাড়াইবামাত্র থানিকটা থোলা যায়গার উপর ল্যাম্পের আলো পড়িল। দেখিলাম—ভীষণ দৃশ্য!! এক বিশালকায় ইংরাজ মাটিতে পড়িয়া রক্তে ভাসিতেছে!—দূরে হ্যাট্ পড়িয়া আছে—সাদা কোট, সাদা পেণ্টালুন রক্তে লাল; দুইপাশে প্রায় একগজ ধরিয়া মাটি লাল—আর সেই রক্তরাশির মাঝে সাহেব মৃত্যু-যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! সাহেবের শেষকাল উপস্থিত, থাবি থাইতেছে। কম্পিত আলোকে সেই রক্তমাথা মুখ বড় ভীষণ দেখাইতে লাগিল! মেম প্রথমে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলেন। কেদার বাবু মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "সার্জেণ্ট জন্‌স্‌টন্!"

সাহেব আর এক পরদায় সুর চড়াইয়া বলিলেন—Johnston? Johnston—dead!"

কেদার বাবুও সেই সুরেই বলিলেন "at death's door, sir"

বাস্তবিক আমরা কাছে যাইতে না যাইতে জন্‌স্‌টনের ভবলীলা সাঙ্গ হইল। একবার মুখব্যাদান করিয়াই স্থির হইল,—মুথ তেম্‌নিই রহিল। সে বিকট "হাঁ" আমি এ জীবনে ভুলিব না। দেখিলাম তাহার বয়স ত্রিশের অধিক হইবে না। শরীর খুব লম্বা চৌড়া—গোঁপ দাড়ি কামান!—এই সময়ে আমি একবার স্থানটার অবস্থা দেখিয়া লইলাম। সেটা উঠান। একদিকে বাঙ্গলা, আর তিনদিকে পাঁচিল। উঠান ভারি নোংরা—এথানে ওথানে জঞ্জালের গাদা। আর একপাশে পাঁচিলের গায়ে একটা অন্ধকার মাটির ঘর, দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের যাহা কিছু মন্দ উহার ভিতর আছে। এইসব দেখিতেছি—হঠাৎ সেই অন্ধকার ঘর হইতে একটা সাদা কাপড়পরা লোক সাঁ করিয়া বাহির হইয়া আমার ও দাদার মাঝথানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম—দোনলা বন্দুকধারী এক ইংরাজ। কে যেন আমাকে জোর করিয়া বলাইল—"খুনি!" আর সেই মুহূর্ত্তেই—"you are the murderer!" বলিয়া রাইলেন্ সাহেব বাঘের মত লাফাইয়া উহার গলা ধরিলেন ও তাহার বন্দুক উঠাইবার পূর্ব্বেই এক ঝট্‌কায় বন্দুক কাড়িয়া নাকের উপর এক ভীষণ মুষ্টাঘাত করিলেন! সে বেগ সহ করিতে না পারিয়া সাহেব ভূমিশায়ী হইল,—রক্তে বক্ষ ভাসিয়া গেল। কেদার বাবু ও রাইলেন্ সাহেব তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। পরমুহূর্ত্তেই ছাউনির সিপাহী, গোরা, লেফ্‌টেনাণ্ট, কর্ণেল—ও নিদ্রোত্থিত পুলিস পুঙ্গবেরা উঠান ছাইয়া ফেলিল।

হত্যাকারী কোন ভয়ের লক্ষণ দেখাইল না, বরং অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। তাহার বয়স পঁচিশ ও ত্রিশের মধ্যে; মধ্যমাকৃতি; দেখিতে খুব সুশ্রী।

পুলিস ইন্সপেক্টর বলিলেন "তুমি হত্যা করিয়াছ স্বীকার করিতেছ?"

হত্যাকারী বলিল "হাঁ।" তাহার মুখের ভাব একটুও বদ্‌লাইল না।

ইন্সপেক্টর বলিলেন "যদি এখানে বলিবার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। যখন স্বীকার করিয়াছ তখন কাচারিতে বলিতেই হইবে।"

হত্যাকারী বলিল "কোন আপত্তি নাই। যখন হত্যা করিয়াছি তখন মরিব ভাবিয়াই করিয়াছি।" তাহার পর সে সব কথা বলিল।

৫

তাহার নাম গ্রীন্। সে গার্ডের কর্ম্ম করে। মুলতানে কোন মুসলমান মহম্মদ ছাড়িয়া যীশু ভজিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল—আলিবক্স; এখন হইয়াছিল—অ্যাল্‌ফর্ড আলিবক্স। তাহার এক উনিশ বছরের কুমারী কন্যা ছিল, নাম ফাতেমা—লোকে বলিত মিস্ অ্যাল্‌ফর্ড্ আলিবক্স। সে দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল। একদিন গ্রীনের নজরে পড়ে—গ্রীন তাহাকে দেখিয়া মোহিত হয়। কিন্তু গ্রীনের মন তত নীচ ছিল না, সে তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। অ্যাল্‌ফর্ড্ আলিবক্সের তাহাতে কোন অমত ছিল না,—খাঁটি ইংরাজের সঙ্গে কুটুম্বিতা সে বিলক্ষণ চাহিত। তাহা হইলে তাহার দৌহিত্রগণ কোন কালে মাতুল-বৃন্দের দিকে চাহিয়া বলিতে পারিবে "we Europeans"—ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীনের আত্মীয় স্বজনেরা ইংরাজের এই দারুণ অবনতি প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিবেন না, এবং গ্রীন্‌এ বিবাহে নিরস্ত না হইলে তাঁহারা সাধ্যমত তাহাকে নিরস্ত করিতে বাধ্য হইবেন—এই কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু 'যার প্রতি যার মজে মন।' গ্রীন্ শুনিল না,—বিবি ফাতেমাকে Mrs. Green করিল। গ্রীন্ তাহাকে বাস্তবিক ভালবাসিত। সকলে তাহাকে ত্যাগ করিল, কিন্তু সে বিবি ফাতেমাকে ত্যাগ করিল না। এই বাঙ্গলাতে আসিয়া দুইজনে রহিল। তিনদিন পরে গ্রীন্ একদিন ছুটী পাইত। সেই 'একদিন' দুইজনে এই বাঙ্গলাতে আমোদ আহ্লাদে কাটাইত। দুইজনে খুব ভাব ছিল—অথচ বিবি ফাতেমা ইংরাজী জানিত না।

এইরূপে দেড়বৎসর কাটিল। তাহার পর গ্রীনের কাণে কেহ চুপিচুপি বলিল যে বিবির স্বভাব আর তেমন নাই, গ্রীনের অবর্ত্তমানে সার্জ্জেণ্ট জন্সটন্ আসিয়া ঐ গৃহে বাস করে। গ্রীন্ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

আরও কয়েক মাস কাটিল। গ্রীনের আত্মীয়-স্বজনেরা গ্রীনের দেখা পাইলেই ঐ কথা তুলিত। কোন রকমে গ্রীন্ যদি উহাকে ত্যাগ করে এই ইচ্ছা। কেবলই ঐ কথা শুনিয়া শুনিয়া গ্রীনের কাণ ঝালাপালা হইল। যেন একটু বিশ্বাসও হইল। সে তো বাড়ীতে প্রায় থাকেই না। তখন সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন হঠাৎ বাড়ীতে আসিয়া দেখে জন্সটন্ বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহাকে

মৌখিক আলাপে বিদায় করিয়া ভিতরে গিয়া বিবিকে তিরস্কার করিল। বিবি কাঁদিয়া বলিল—"তুমিই যদি আমাকে অবিশ্বাস কর তো আমি দাঁড়াই কোথা? তুমিতো বাড়ী থাক না, একলাটি বাড়ীর ভিতর থাকিয়া পাগল হইবার মত হই,—তাই একবার এর সঙ্গে তার সঙ্গে দুটা কথা কহিয়া মনটাকে ঠাণ্ডা রাখি। আর ভদ্রলোক বাড়ীতে আসিলে কি করিয়াই বা তাড়াইব? আর আমাদের জাতে তো স্ত্রীলোকের ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে বারণ নাই।"—গ্রীন্ অপ্রতিভ হইল। মনে মনে তাহার প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া অনুতপ্ত হইল। সব গোল মিটিয়া গেল।

আরও দিন কতক কাটিল। আবার সেই কথা। গ্রীন্ ব্যতিব্যস্ত হইল। আজ কুঠিতে আসিবামাত্র খানসামা তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল—"হুজুর, বড়মানুষের কাণ্ডে গরিব কেন মারা যায়? আপনার অবর্ত্তমানে এখানে সার্জ্জেণ্ট সাহেব থাকেন। আমি বারণ করিয়াছিলাম—তিনি বলিয়াছেন—এ কথা প্রকাশ হইলে গুলি করিব। আমি আপনাকে বলিয়া খালাস। আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, আমি মরিলে তাহারা খাইবে কি?"

গ্রীনের মাথা ঘুরিয়া গেল! তবে এ কথা সত্য? ক্রোধে গ্রীন্ উন্মত্ত হইল। বলিল—"প্রমাণ কি?"

খানসামা বলিল—"প্রমাণ আপনি আজ লুকাইয়া স্বচক্ষে দেখুন। এখনও কেহ জানে না যে, আপনি আসিয়াছেন। রাত্রি বারটার পর আসিবেন, দেখিবেন এ বাড়ী আপনার না সার্জ্জেণ্ট্ সাহেবের।"

গ্রীন্ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তাহার তখন খুন চাপিয়াছে। একজন বন্ধুর নিকট হইতে শিকারের নাম করিয়া একটা দোনলা বন্দুক চাহিয়া লইল। শিকারের বাহানায় সারাদিন বনে কাটাইয়া রাত্রি ১২টার পরে আসিয়া বিবির ঘরের পাশের ঘরে লুকাইল। খানিক পরে জন্সটন্ আসিল। বিবি বাহিরে আসিয়া খাতির করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। তাহার পর বোতল চলিতে লাগিল, একটা ভাঙ্গা পিয়ানো ছিল—তাহা বাজিতে লাগিল। গ্রীন্ ঘণ্টা খানেক ধৈর্য্য ধরিয়া সব শুনিল—কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিল, বিবি আর এখন তেমন নাই। আর ধৈর্য্য রহিল না!

তখন ঢং করিয়া একটা বাজিল। দ্বার ভেজান ছিল—গ্রীন্ এক ধাক্কায় খুলিয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহারা চমকিয়া দেখিল—বন্দুক হাতে গ্রীন্! বিবি ভয়ে পাথর হইয়া গেল। কিন্তু জন্সটন্ ভয় পাইল না। তাহার তখন হুইস্কি ধরিয়াছে—সে গ্রীন্‌কে মারিতে আসিল। গ্রীন্ বলিল—"জন্সটন্! আমি প্রতিশোধ লইতেই আসিয়াছিলাম। আজ তোমাকে নিশ্চয় হত্যা করিতাম, কিন্তু এখনও আমার অল্প জ্ঞান আছে—নরহত্যা করিবার ইচ্ছা নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। প্রস্থান কর—আর কখনও এদিকে আসিও না।"

জন্স্‌টন্ ভেঙচাইয়া বলিল—"ইস্—হত্যা কর্‌বেন! বেটা গার্ড, রেল দেখ্‌গে যা—হত্যা হত্যা করিস্‌নে—মূর্চ্ছা যাবি। গার্ড হত্যা কর্‌বেন সার্জ্জেণ্ট্‌কে! ইস্!"

তবুও গ্রীন্ তাহাকে প্রস্থান করিতে বলিল। কিন্তু জন্সটন্ তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তলোয়ারের বাঁট দিয়া তাহার মাথার উপর ঠকাস্ করিয়া মারিল! তখন গ্রীন্ উন্মত্ত হইল—দড়াম্ করিয়া বন্দুক ছুড়িল! গুলি জন্স্টনের বুকে লাগিল, জন্সটন্ ঘুরিতে—ঘুরিতে—উঠানে গিয়া পড়িল,—তাহার পর আর একবার দড়াম্ করিয়া বন্দুক ছুটিল—জন্স্টন্ রক্ত সমুদ্রে পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল! সেই সময়ে চাকর খানসামারা খুন হইল দেখিয়া হৈ চৈ রৈ রৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠে—আর সেই শব্দ দূর হইতে আমাদের কাণে ভীষণ "হো—" শুনাইয়াছিল।

* * * * *

৬

এখন রামটহলের রহস্যটাও কেদার বাবুর মুখে শুনিলাম। সে সেদিন ভাঙ্ খাইয়াছিল। রাত্রে নেশার ঝোঁকে পাঁচিলে বসিয়া ঝিমাইতেছিল—আর সম্ভবতঃ চোরের স্বপ্ন দেখিতেছিল। হঠাৎ ছুম্ করিয়া শব্দ হইল, আর সেও সেই সঙ্গে—অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে—ছুম্ করিয়া নীচে পড়িল! পড়িবার ধমকে অজ্ঞান হইল। সেই শব্দে রাইলেন্ সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই সময়ে আবার দড়াম্ করিয়া শব্দ হইল। তখনও সাহেবের ঘুমের ঘোর যায় নাই—ভাবিলেন, পাঠান রামটহলকে মারিয়া বাঙ্গলার ভিতর লাফাইয়া পড়িয়াছে। সাহেব তাড়াতাড়ি রিভল্ভর্ খুঁজিলেন, কিন্তু অন্ধকারে—এবং তখনও উত্তমরূপে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই বলিয়া পাইলেন না। তখন—পাছে হঠাৎ কামরায় ঢুকিয়া পাঠান বন্দুক ছোড়ে—এই ভয়ে সাহেব একখানা চেয়ার টানিয়া ঢালস্বরূপ মাথার উপর ধরিয়া খানসামাকে ডাকিতে লাগিলেন। এই সময়ে মেমের ঘুম ভাঙ্গাতে মেমও যোগ দিলেন। ওদিকে ডাকাডাকিতে কেদার বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার ঘরে সারারাত একটা হরিকেন্ ল্যাম্প জ্বলিত। তিনি হাতের কাছে আর কোন হাতিয়ার না পাইয়া মশারির গোঁটা ভাঙ্গিয়া ল্যাম্প হাতে সাহেবের কামরায় আসিলেন। আসিয়া সাহেবকে ঐ অবস্থায় দেখিলেন। রামটহলকে ভূশয্যায় শায়িত দেখিয়া সাহেবকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। তখন যে ইংরাজ—সেই ইংরাজ,—বিছানার চাদর জড়াইয়া রিভল্ভর্ লইয়া বাহিরে আসিলেন; আর মেম একখানা ছোট তলোয়ার লইয়া—কেদার বাবুর হাত হইতে ল্যাম্পটা লইয়া (কারণ যদি যুদ্ধ বাধে কেদার বাবুর হাতটা খালি থাকাই ভাল।) দ্বারে দাঁড়াইলেন! সাহেব ভাবিয়াছিলেন রামটহলকে গুলি লাগিয়াছে, কিন্তু যখন সর্ব্বাঙ্গে সামান্য একটা ফোস্কাও খুঁজিয়া পাইলেন না তখন বুঝিলেন কাণ্ডখানা কি। তাই "devil—devil" করিতেছিলেন। বেহুঁস ছিল বলিয়া কিছু বলেন নাই। যখন উঠিয়া বসিয়া "হে রাম" বলিল তখন তাহার সচকিত পাহারার পুরস্কার দেওয়াটা উচিত বিবেচনা করিলেন। সে পুরস্কার রামটহল বোধ হয় জীবনে ভুলিবে না।

* * * * *

৭

গ্রীনের কথা শেষ হইলে ইন্সপেক্টর সাহেব ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বিবি ফাতেমাকে টানিয়া বাহির করিলেন। বিবি তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার বয়স একুশ। কিন্তু দেখিয়া বোধ হইল আরও ছোট। রঙ্ বেশ ফর্সা—জোড়া ভুরু, কোঁকড়া চুল—নাক মাঝারি; সব শুদ্ধ লইয়া বেশ। গ্রীন একবার তাহাকে দেখিয়া হাসিল। সে হাসি তখন বড়ই ভীষণ দেখাইয়াছিল।

তাহার পর জন্সটন্কে গোরারা ধরাধরি করিয়া ছাউনিতে লইয়া গেল। সেই রাত্রেই তাহার কবর হইল।

শেষ।

গ্রীনের ফাঁসি হইল না। ইংরাজী কাণ্ড,—নানা ফন্দীতে তাহাকে সকলে বাঁচাইয়া দিল। তবে জেল হইল বটে। ছোট বড় সব ইংরাজ তাহার দিকে হইয়াছিল—কারণ গ্রীন স্বভাবতঃ ভাল লোক ছিল। বিবি ফাতেমার পরিণাম দেখিবার জন্য গ্রীন তাহাকে হত্যা করে নাই। সে এখন মণ্ট্গুম্রি সহরে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাহাকে মাটির ঢেলা তুলিয়া মারে, আর বলে—"এই সেই!"*

হিমালয়-দর্শনে।

(দার্জিলিঙে)

কে তুমি সহস্র যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হ'তে তাতার,—
অক্ষয়হীরকমুকুটের মত ভারতলক্ষ্মীর মাথার,
জ্বলিছ প্রদীপ্ত, পাইয়া উষার কনকচরণপরশ
তুষারমণ্ডিত চূড়ায়? হিমাদ্রি? ব্যাপি কত লক্ষ বরষ
আছ এইরূপ নিশ্চল নিস্তব্ধ, ভেদিয়া নির্ম্মল গগন
উত্তুঙ্গ শিখরে গিরিবর? আছ, কোন্ মহা ধ্যানে মগন,
মহর্ষি? বিরাজে পদতলে দূরে কত রাজ্য শ্যাম, নবীন
শিশুসম; শুধু তুমিই একাকী, ব'সে আছ কৃশ, প্রবীণ,
—পাষাণ পঞ্জর যেন; দেখি দেহে আছে কয়খানি যা হাড়;
কার্য্যময় এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে প্রকাণ্ড অকেজো পাহাড়।

দেখ, নিজ কার্য্য করে সকলেই—হউক বড় কি ইতর—
তুমি কি একাকী বসিয়া রহিবে নিষ্কর্ম্মা, জগত-ভিতর?

---

* সত্য ঘটনা।

দেখ উর্দ্ধে ঘুরে সূর্য্যগ্রহচন্দ্র অশ্রান্ত, উন্মত্ত, অধীর ;
অযুত নক্ষত্র ঘুরে মহানৃত্যে নিজমত্ততায় বধির।
পদতলে দেখ শত নদী ধায় কি দিবায় কিবা নিশায়,
বনকান্তারের প্রান্ত দিয়া, শেষে সুদূর সাগরে মিশায়।
গহনে, শীকারে ফিরে সিংহ ধীরে। ব্যাঘ্র সে পশুর রাজার
রাজত্বের ভাগ নিতে চায় কেড়ে। হরিণ কানন-মাঝার
সভয়ে দৌড়ায়। ছাগকুল দেখে উঠিয়া পর্ব্বত-শিখর
নীচের গভীর গহ্বর, বিস্ময়ে। বনের বানর নিকর
বৃক্ষে চড়ি' নিজ শ্রেষ্ঠতা (অন্ততঃ সে বিষয়ে) সবে দেখায়।
দীর্ঘ অজগর নির্ভয়ে দিবসে চলেছে বঙ্কি[illegible]
মন্থর গমনে। বিহঙ্গ মেলিয়া [illegible] রঞ্জিত [illegible]াথায়
উড়ে সূর্য্যকরে। বৃক্ষলতাশত [illegible]লায়ে শ্যামল শাখায়
নৃত্য করে হর্ষে পর্ব্বতের গায়ে[illegible] ভাত-কিরণ ছটায়।
ভ্রমর গুঞ্জরি বেড়ায়—না জানি কাহার কি কুৎসা রটায়।
দূরে বংশবনে কে বসিয়া তার বাজায় মুরলি মধুর।
ডাকে ঘুঘু ঘন শালবনে। প্রেমী কোকিলও উত্তমরূপে
তমালের ডালে ডাকিছে বধূরে। কেতকী-কদম্ব-তলায়
নাচিছে ময়ূর!—দূরে অধিত্যকা;—ধান ও সরিষা, কলাই
ঢাকিয়া দিতেছে কোমল বসনে নগ্নতা উলঙ্গ জমীর ;
গাভীরা চরিছে, চাষারা গাইছে, বহিয়া যাইছে সমীর।
সুদূরে জলধি ছুটিছে—তক্কা সে, রাখেনা কাহারো বাবার ;
মহাজলচরসম দেশ তায় ডুবিছে উঠিছে আবার
যুগান্তে। সবাই কিছুত করিছে ;—শুধু পড়িয়া চিৎপটাং—
অর্দ্ধেক এসিয়াপ্রস্থ জুড়ে' একা তুমিও ঘুমাও সটাং।

দেখ এ ভারতে কেহবা হাকিমি করিছে বিচারশালায় ;
কেহবা তাঁহারি পার্শ্বে কিম্বা দূরে বসি, হংসপুচ্ছ চালায় ;
কেহ ওকালতি করে, 'ক্রস্' করে শামলা পরিয়া মাথায়,
বাড়িতে আসিয়া লেখে আয় ব্যয় জমাখরচের খাতায় ;
কেহবা ডাক্তারি করিয়া দুপরে করিছে একটু আরাম ;
কেহ বে-পসার ঘুরে' ঘুরে' শুধু বেড়ায়—না গঙ্গা না রাম ;
কেহ বা চালায় সংবাদ-পত্রিকা ; কেহ বা লিখিছে কেতাব ;

বহু কষ্ট করি' কেহ পায় কৃষ্ণ ;—কেহ বা পাইছে খেতাব ;
কেহ বা পৈতৃক সম্পত্তি ওড়ায়ে সময়টি বেশ কাটায় ;
কেহ জমিদারি করে, কেহ টাকা ব'সে ব'সে শুধ খাটায় ;
কেহ বা খুঁজিছে দলাদলি করি 'জাতি'টা মারিবে কাহার ;
কেহ তা' সত্ত্বেও গোপনে, 'হোটেলে,' মুরগী করিছে আহার ;
কেহ বা বিশেষ কার্য্য না থাকায় ভাঙ্গিছে গড়িছে সমাজ ;
কেহ বা করিছে ঠাকুরের পূজা ; কেহ বা পড়িছে নমাজ ;
সবার উপরে শ্বেতাঙ্গের দল রাজত্ব করিছে শাসন ;—
আর বসে' আছ তুমিই অচল, অকেজো অনড় পাষাণ।

তোমার ঘুমের এমনি মহিমা!—তোমার কাছেতে শয়ন
কি উপবেশন করিলে আপনি ঢুলে' আসে দুই নয়ন।
তোমার উত্তরে দেখিছ না চীন ঢুলিছে আপিঙ নেশায় ;
ঢুলিতে ঢুলিতে বসিয়া আপিঙে পেয়ারার পাতা মেশায় ;
আপন মহত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে করিছে আনন্দে চা-পান ;
এদিকে আসিয়া পদাঘাত করে' চলে' যায় বেশ জাপান।
তোমার দক্ষিণে সমানই অবস্থা প্রায় এ ভারত মাতার ;
সমানই বিপন্ন আরব, তুরস্ক, পারস্য, তিব্বত, তাতার।
সমস্ত এসিয়া কি করিবে শুয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া না পায় ;
যখন যুনানী বীর-পদদাপে হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপায়,
দলিয়া ধরণী, মথিয়া জলধি, আকাশ করিয়া বিদার ;—
সে সময়ে এঁরা নাকে তেল দিয়ে এখানে ঘুমান 'দিদার'।

একি ঘুম বাপ্!—শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষঃ ছিল এক ; ছমাস করিয়া ঘুমা'ত সে রক্ষঃ ফি সন!
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের—
একবার জাগো!—শুধু একবার 'মেরে কেটে' ভাই যা হয়—
দেখি না ;—অন্ততঃ একবার ভুলে চোখ মেলে চাও না হয়।
—না না কাজ নেই—জানি জানি বেশ তোমাদের কারখানায় ;
—বাপ্‌রে! কিরূপ তোমাদের জাগা আমার কি নেই জানাই ?
'বিশ্বাবসু' কিম্বা 'এটনার' মত যদি জাগ ; যদি জ্বালোই

জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই!
—তোমাদের তাতে বিশেষ আমোদ হ'তে পারে সম্ভবতঃই;
কিন্তু ঠিক বলা যায় না অন্যের হয় কি না ওটা অতই।—
সহর পুড়ায়ে, অরণ্য উড়ায়ে, ছাইয়ে ধূসর গগন
ধূমরাশি দিয়ে, প্রলয় আঁধারে মেদিনী করিয়া মগন,
লেলিহান অগ্নিজিহ্ব, চরাচরে সঘন গর্জ্জনে কাঁপাও
করাল কালিকাসমান, নির্দ্দয়; ক্রোধে অন্ধ—ভেবে না পাও
কাহারে করিবে চূর্ণ, উড়াইয়ে কাহারে ভস্মের সমান
তোমার অসীম ক্ষমতা, অসীম বিক্রম করিবে প্রমাণ;
পর্জ্জন্যের বজ্রসম ছোড় তব বিনাশের অস্ত্র 'লাভা'
—বহ্নিনদ এক—সৃষ্টির সংহারে,—না না কাজ নেই বাবা!

—তুমি যেন বল "দেখ বাপু সব জানোত আমার প্রভাব।
কিন্তু তবু জেনো স্বভাবতঃ অতি নিরীহ আমার স্বভাব।
একটু উঁচুতে বসে' আছি; দূরে বসে' বসে' রোদ পোহাই,—
বুড়োসুড়ো লোক, তাই শীত লাগে;—ঘাঁটিও না বেশী—দোহাই!
কোন কৌতূহল নাই কারো গুপ্ত বিষয়ে খুঁটিয়া দেখায়—
কোনই উচ্চাশা নাই; একধারে পড়ে আছি একা একাই;
কাহারো অনিষ্ট করিনাকো; আমি মাটির মানুষ 'নেহাইৎ';—
কিন্তু জেনো বেশী রাগালে—তা আমি—কাহাকে করিনা 'রেয়াৎ;
তখন উদ্গারি ক্রোধের অনল, ভস্ম করি দশ দিশি,
করে ভস্ম শাপে সবারে যেমতি ধ্যানভগ্ন মহা-ঋষি।

"আমি বসে' বসে' কি ভাবি জানিতে মনে তোমাদের সবার
কৌতূহল হ'তে পারে বটে, আর কারণও আছে তা হবার।
—তা শোন, অন্তরে আমি করি যত কূটপ্রশ্ন অবতারণ
—জগতের আদি জগতের অন্ত, জন্ম ও মৃত্যুর কারণ;
এত যে অনন্ত জীবন কল্লোল উঠে পড়ে নিশিদিবাই;—
কোথা হতে' আসে কোথায় মিলায় তাহার উদ্দেশ্য কিবাই।
ভাবিয়া কিছুই হয় না; মাথাটা গরমটি হয় খালি;
দিবারাত্র তাই রাশি রাশি রাশি মাথায় বরফ ঢালি।
তোমরা এ ঊনবিংশতি শতাব্দীশেষে ত ভাবিবে কি ছাই

ও সব ভাবনা। মনুষ্যের ওই কূটচিন্তা সব মিছাই।
তোমরা ভাবিছ উপায়, দুদিনে দুমাসের পথ যাওয়ায়;
ভূতত্ত্ব, উত্তাপবিজ্ঞান, স্নায়ুর বিষয়, গঠন হাওয়ার।
তোমরা ভাবিছ বিদ্যুতে কিরূপে লাগাবে কার্য্যেতে আপন;
কি উপায়ে এই ষাট বর্ষ সুখে করা যায় কালযাপন।
ভাবিছ কিরূপে মিনিটে মিনিটে মারা যায় দশহাজার;
তোমরা বসাতে চাও বিশ্বমাঝে এক বাণিজ্যের বাজার।
তা ভাব না; বেশ!—আমি বলিয়াছি বলিবও দুশ দুবার—
বৃদ্ধের উচিত কার্য্য যোগ, যোগ্য কার্য্য 'কর্ম্ম করা' যুবার।

কি? অস্তিত্বলোপ করিতে চাও কি আমার এ বিশ্বমাঝেই?
এ সব কুড়েমি? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাযেই?
ফলশস্য কিছু পারিনাক দিতে পূরাতে জীবের উদর;
পড়ে আছি এক আলস্যের ঢিবি কঠিন অনড় ভূধর?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই?
—কিন্তু ব্যোম হ'তে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায়?
ব্যোমই সেই বিষ্ণু, আমিই ধূর্জ্জটী, সে জটা আমারই শিখর
লতাগুল্মময়।—সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ নদী নিকর
আমি বহাইনা ক্ষেত্রে গ্রামে বনে?—আমি অনুর্ব্বর না হয়—
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত কে করে উর্ব্বর তাহায়?

অগ্নির সন্তান আমরা পর্ব্বত বসুধার তরে জাগি;
বরুণদুহিতা বসুধা পড়িয়া চরণে শরণ মাগি'।
আমরা ভিজায়ে দেই তার ওষ্ঠ বিদগ্ধ কিরণে রবির;
নদ নদী দিয়া! নিজে জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক, নিরাহার, স্থবির।
ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি ধরণীরে নিত্য শেখাই;—
নিজে নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, পড়িয়া দূরে আছি একা একাই।
কর্ত্তব্যের মূর্ত্তি আমরা, জানিনা ভক্তি প্রেম দয়া স্নেহে;
বার্দ্ধক্যের রেখা আমরা ধরার শ্যামল কোমল দেহে।"

—দাঁড়াইয়ে থাক নগেন্দ্র এমনই গৌরবে চিরবর্ত্তমান
সত্য সম মিথ্যামাঝে; কোলাহলে স্বর্গীয় সঙ্গীত সমান।

জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই!
—তোমাদের তাতে বিশেষ আমোদ হ'তে পারে সম্ভবতঃই;
কিন্তু ঠিক বলা যায় না অন্যের হয় কি না ওটা অতই।—
সহর পুড়ায়ে, অরণ্য উড়ায়ে, ছাইয়ে ধূসর গগন
ধূমরাশি দিয়ে, প্রলয় আঁধারে মেদিনী করিয়া মগন,
লেলিহান অগ্নিজিহ্ব, চরাচরে সঘন গর্জ্জনে কাঁপাও
করাল কালিকাসমান, নির্দ্দয়; ক্রোধে অন্ধ—ভেবে না পাও
কাহারে করিবে চূর্ণ, উড়াইয়ে কাহারে ভস্মের সমান
তোমার অসীম ক্ষমতা, অসীম বিক্রম করিবে প্রমাণ;
পর্জ্জন্যের বজ্রসম ছোড় তব বিনাশের অস্ত্র 'লাভা'
—বহ্নিনদ এক—সৃষ্টির সংহারে,—না না কাজ নেই বাবা!

—তুমি যেন বল "দেখ বাপু সব জানোত আমার প্রভাব।
কিন্তু তবু জেনো স্বভাবতঃ অতি নিরীহ আমার স্বভাব।
একটু উঁচুতে বসে' আছি; দূরে বসে' বসে' রোদ পোহাই,—
বুড়োসুড়ো লোক, তাই শীত লাগে;—ঘাঁটিও না বেশী—দোহাই!
কোন কৌতূহল নাই কারো গুপ্ত বিষয়ে খুঁটিয়া দেখায়—
কোনই উচ্চাশা নাই; একধারে পড়ে আছি একা একাই;
কাহারো অনিষ্ট করিনাকো; আমি মাটির মানুষ 'নেহাইৎ';—
কিন্তু জেনো বেশী রাগালে—তা আমি—কাহাকে করিনা 'রেয়াৎ;
তখন উদ্গারি ক্রোধের অনল, ভস্ম করি দশ দিশি,
করে ভস্ম শাপে সবারে যেমতি ধ্যানভগ্ন মহা-ঋষি।

"আমি বসে' বসে' কি ভাবি জানিতে মনে তোমাদের সবার
কৌতূহল হ'তে পারে বটে, আর কারণও আছে তা হবার।
—তা শোন, অন্তরে আমি করি যত কূটপ্রশ্ন অবতারণ
—জগতের আদি জগতের অন্ত, জন্ম ও মৃত্যুর কারণ;
এত যে অনন্ত জীবন কল্লোল উঠে পড়ে নিশিদিবাই;—
কোথা হতে' আসে কোথায় মিলায় তাহার উদ্দেশ্য কিবাই।
ভাবিয়া কিছুই হয় না; 'মাথাটা গরমটি হয় খালি;
দিবারাত্র তাই রাশি রাশি রাশি মাথায় বরফ ঢালি।
তোমরা এ ঊনবিংশতি শতাব্দীশেষে ত ভাবিবে কি ছাই

ও সব ভাবনা। মনুষ্যের ওই কূটচিন্তা সব মিছাই।
তোমরা ভাবিছ উপায়, দুদিনে দুমাসের পথ যাওয়ায়;
ভূতত্ত্ব, উত্তাপবিজ্ঞান, স্নায়ুর বিষয়, গঠন হাওয়ার।
তোমরা ভাবিছ বিদ্যুতে কিরূপে লাগাবে কার্য্যেতে আপন;
কি উপায়ে এই ষাট বর্ষ সুখে করা যায় কালযাপন।
ভাবিছ কিরূপে মিনিটে মিনিটে মারা যায় দশহাজার;
তোমরা বসাতে চাও বিশ্বমাঝে এক বাণিজ্যের বাজার।
তা ভাব না; বেশ!—আমি বলিয়াছি বলিবও দুশ দুবার—
বৃদ্ধের উচিত কার্য্য যোগ, যোগ্য কার্য্য 'কর্ম্ম করা' যুবার।

কি? অস্তিত্বলোপ করিতে চাও কি আমার এ বিশ্বমাঝেই?
এ সব কুড়েমি? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাযেই?
ফলশস্য কিছু পারিনাক দিতে পূরাতে জীবের উদর;
পড়ে আছি এক আলস্যের ঢিবি কঠিন অনড় ভূধর?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই?
—কিন্তু ব্যোম হ'তে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায়?
ব্যোমই সেই বিষ্ণু, আমিই ধূর্জ্জটী, সে জটা আমারই শিখর
লতাগুল্মময়।—সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ নদী নিকর
আমি বহাইনা ক্ষেত্রে গ্রামে বনে?—আমি অনুর্ব্বর না হয়—
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত কে করে উর্ব্বর তাহায়?

অগ্নির সন্তান আমরা পর্ব্বত বসুধার তরে জাগি;
বরুণদুহিতা বসুধা পড়িয়া চরণে শরণ মাগি'।
আমরা ভিজায়ে দেই তার ওষ্ঠ বিদগ্ধ কিরণে রবির;
নদ নদী দিয়া! নিজে জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক, নিরাহার, স্থবির।
ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি ধরণীরে নিত্য শেখাই;—
নিজে নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, পড়িয়া দূরে আছি একা একাই।
কর্ত্তব্যের মূর্ত্তি আমরা, জানিনা ভক্তি প্রেম দয়া স্নেহে;
বার্দ্ধক্যের রেখা আমরা ধরার শ্যামল কোমল দেহে।"

—দাঁড়াইয়ে থাক নগেন্দ্র এমনই গৌরবে চিরবর্ত্তমান
সত্য সম মিথ্যামাঝে; কোলাহলে স্বর্গীয় সঙ্গীত সমান।

নীচে বসুমতী পড়ে' থাক্ যত্নে রত্ন শস্য বক্ষে রাখি,
যেমন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়ে থাকি—
তুমি থাক ঋষিসম গিরিবর অনন্তের ধ্যানে মগন,
মৌন হিমাচল ! অটল শিখরে স্পর্শিয়া সুনীল গগন
হীরক কিরীটী ! এমনই উজ্জ্বল কনক কিরণে উষার;
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ তুলি গর্ব্বে—তুষার উপরে তুষার।
কল্লোলিয়া যাক্ ঘটনার সম পদতলে জলনিধি ;
তুমি থাক অদ্রি দৃঢ় যেই মত আদি নিয়ম ও বিধি।
আকাশে ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম ধ্বংসমধ্যে রহে স্থির যেমতি তার
অক্ষুব্ধ, অটল, শান্ত, সৌম্য, দিব্য, অনন্ত, নীলিমাবিথার।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

৪র্থ অধ্যায়।

অন্ধকূপ-হত্যা।

এখন আর কলিকাতার পুরাতন কেল্লার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। সে কেল্লা পূর্ব্বপশ্চিমে দুইশত দশ গজ, দক্ষিণাংশে একশত ত্রিশ গজ, এবং উত্তরাংশে কেবলমাত্র একশত গজ পরিসর ছিল। চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর, চারি কোণে চারিটি বুরুজ, প্রত্যেক বুরুজে দশটি কামান, পূর্ব্বদিকের সুগঠিত সিংহদ্বারে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ত বদন ব্যাদান করিয়া, বৃটিশ বণিকের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিত। * নবাব এব্রাহিম খাঁর শাসন-শিথিলতার অবসর পাইয়া, সভাসিংহ এবং রহিম খাঁ যে সময়ে বর্দ্ধমানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় চুঁচড়ানিবাসী ওলন্দাজ এবং চন্দননগরনিবাসী ফরাসীদিগের ন্যায় সুতানটী-নিবাসী ইংরাজ বণিকেরাও কলিকাতায় একটী ছোটখাট দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। † কালক্রমে সেই দুর্গ "ফোর্ট উইলিয়ম" নামে পরিচিত হইয়া ইংরাজদিগের সর্ব্ব প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

এই নবজাত ইংরাজ-দুর্গের পশ্চিমপার্শ্বে ভাগীরথী-স্রোত অবিরাম গতিতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইত ; পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বারের নিকট হইতে সরল সুপ্রশস্ত লালবাজারের রাজপথ

* Stewart's History of Bengal.
† Early Records of British India.

বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে বালিয়াঘাটা পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। নগররক্ষার আয়োজন শেষ হইলে, দুর্গরক্ষার জন্য ইংরাজেরা পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ,—তিনদিকে তিনটি তোপমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর লক্ষ্যভেদি আগ্নেয়াস্ত্র পুঞ্জীকৃত করিয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা কোনক্রমে নগরপ্রবেশ করিতে পারিলেও, এই সকল তোপমঞ্চ বর্ত্তমান থাকিতে, কিছুতেই দুর্গপ্রবেশ করিতে পারিবেন না। বোধ হয় সেই ভরসায় অনেকেই সাহস করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গমূলের অনতিদূরেই ইংরাজদিগের অট্টালিকারাজি বর্ত্তমান থাকায়, শত্রুসেনার পক্ষে সহজেই দুর্গমধ্যে গোলাবর্ষণ করিবার যে সকল আশ্রয়স্থান ছিল, তৎপ্রতি হয়ত কেহই লক্ষ্য করিয়াছিলেন না !*

যে সকল ইংরাজ বীরপুঙ্গবগণ যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই নগররক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, ত্রাসকম্পিত-কলেবরা ইংরাজ-মহিলার কণ্ঠলগ্ন হইয়া, দ্রুতপদে দুর্গাভ্যন্তর হইতে একে একে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য উত্তরকালে অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"দুর্গপ্রাচীর যেরূপ জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সাহস করিয়া দুর্গমধ্যে বাস করিলেই বা কি হইত ? আর কোন কারণে না হউক, নিতান্ত অন্নাভাবেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত ! গোলা, বারুদ এত অপ্রচুর যে, তাহাতে তিন দিনের অধিক আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইত না ! সত্য বটে আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহার অধিকাংশ কেবল চক্রহীন গতিহীন অবস্থায় ভগ্নকলেবরে প্রাচীরমূলে পড়িয়া থাকিত ;—সেগুলি ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না।" † ভাবার্থ এই যে, আমরা আর কি করিব ? নিতান্ত বাধ্য হইয়াই পলায়ন করিতে সম্মত হইয়াছিলাম ! কেল্লার অবস্থা সত্য সত্যই এরূপ শোচনীয় হইলে, তাঁহাদের আর অপরাধ কি ? কিন্তু যাঁহাদের কেল্লা এরূপ জরাজীর্ণ, "রসদ" এরূপ অপ্রচুর, অস্ত্রশস্ত্র এরূপ অকর্ম্মণ্য,—তাঁহারা যে কোন্ সাহসে সিরাজদ্দৌলার বিপুল সেনা-তরঙ্গের সম্মুখে বুক বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কেহই সে কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই !

কলিকাতার দক্ষিণাংশে মহারাষ্ট্র-খাত সম্পূর্ণ হইয়াছিল না ;—চারিদিকে যেরূপ বিজন বন, তাহাতে নবাব-সেনা হয়ত সে পথের সন্ধান জানিত না। সুতরাং তাহারা নগরের উত্তরাংশে বরাহনগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বাগ্‌বাজারের পথেই নগর-প্রবেশের আয়োজন করিতে লাগিল।

১৮ই জুন প্রাতঃকালে নবাব-সেনা কামানে অগ্নি-সংযোগ করিল। ইংরাজ-সেনা সবিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে তাহাদিগের আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিবার জন্য জলস্থল বিকম্পিত করিয়া জাহাজ হইতে এবং পেরিং নামক দুর্গপ্রাকার হইতে যুগপৎ গোলাবর্ষণ করিতেছিল ; সুতরাং নবাবের সিপাহী-সেনা সহজে বাগ্‌বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। অনেক

* Orme, vol. ii. 63.
† First Report of the Committee of the House of Commons, 1772.

চেষ্টায় খালের ধারের একটি ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে কয়েকজন সিপাহী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু পিস্‌কার্ড নামক একজন ইংরাজ-সেনানী রজনীযোগে তাহাদিগকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ক্ষণিক উল্লাসে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ইংরাজপ্রতাপ চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!*

উমাচরণের আহত জমাদার অলক্ষিতভাবে দোলারোহণে নগর হইতে পলায়ন করিয়া একেবারে নবাব-শিবিরে উপনীত হইলেন; এবং সিরাজুদ্দৌলার নিকট আদ্যোপান্ত সকল কথা নিবেদন করিয়া দক্ষিণ এবং পূর্ব্বাঞ্চল হইতে নগরাক্রমণের গুপ্তসন্ধান প্রকাশ করিয়া দিলেন। নবাবের সিপাহীসেনা দলে দলে বিভক্ত হইয়া, কেহ পূর্ব্বদিকে, কেহ বা দক্ষিণদিকে সমবেত হইতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র উত্তরের কামানগর্জ্জন নীরব হইয়া গেল; পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিক হইতে যুগপৎ লৌহপিণ্ড ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ইংরাজেরা তাড়াতাড়ি তোপমঞ্চে আরোহণ করিয়া নগররক্ষার জন্য কামানে অগ্নি-সংযোগ করিতে ধাবিত হইলেন!

লালবাজারের রাস্তার উপর যে পূর্ব্বতোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দ্দূর সম্মুখেই "জেলখানা"। ইংরাজেরা তাহার উত্তর প্রাচীরে ছিদ্র ফুটাইয়া কয়েকটি কামান পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং লালবাজারের রাজপথে নবাব-সেনাদল নগরপ্রবেশ করিবামাত্র, জেলখানা ও পূর্ব্বতোপমঞ্চ হইতে যুগপৎ অনলবর্ষণ করিয়া শত্রুসেনার সর্ব্বনাশ করিবেন ভাবিয়া কথঞ্চিৎ হৃষ্টান্তঃকরণেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু নবাব-সেনা নির্ব্বোধের ন্যায় সরল রাজপথ বহিয়া তোপমঞ্চের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইল না। তাহারা প্রহরীসেনাদলকে পরাজয় করিবামাত্র, উত্তর ও দক্ষিণদিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং দেখিতে না দেখিতে ইংরাজদিগের তিনটি তোপমঞ্চই তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইল। তখন আর নগর রক্ষা করা সম্ভব হইল না; পূর্ব্বতোপমঞ্চের অধিনায়ক কাপ্তান ক্লেটন ও তাঁহার সহকারী হলওয়েল সাহেব দুর্গমধ্যে পলায়ন করিবামাত্র, চারিদিকে নবাব-সেনা অধিকার বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল; তাহারা ইংরাজের তোপমঞ্চে আরোহণ করিয়া, ইংরাজের অস্ত্রসাহায্যেই দুর্গবাসী ইংরাজদিগের উপরে প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল! বীরপদভরে কলিকাতা সত্য সত্যই টলমল করিয়া উঠিল!

দুর্গমূলে ভাগীরথীগর্ভে কতকগুলি ডিঙ্গী নৌকা এবং একখানি সুবৃহৎ জাহাজ প্রস্তুত ছিল। সায়ংকালে মহিলাদিগকে সেই জাহাজে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড মহিলাদিগের শরীররক্ষার্থ জাহাজ পর্য্যন্ত গমন করিতে অগ্রসর হইলেন; তখন সকলে মিলিয়া ধীরে ধীরে দুর্গাভ্যন্তর হইতে সায়াহ্নের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাগীরথীতীরে সমবেত হইতে লাগিলেন। মহিলামণ্ডলী জাহাজে আরোহণ করিলেন, কিন্তু ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড আর জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে সম্মত হইলেন না! দুর্গরক্ষা করা

* Orme, vol. ii. 62.

নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া অনেক সময়ে অনেক বীরপুরুষ দুর্গত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন;—তাহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড যেরূপভাবে দুর্গত্যাগ করিয়া রমণীমণ্ডলীর সহিত জাহাজে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজইতিহাস-লেখকেরাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন!*

যাঁহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুর্গতির অবধি রহিল না। সকলেই উপদেশ দিবার জন্য লালায়িত, কেহই উপদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত নহেন! † বাহিরে বাহিরে নবাব-সেনার উন্মত্ত আস্ফালন, দুর্গমধ্যে ইংরাজমণ্ডলীতে তুমুল কোলাহল;—ফিরিঙ্গীদের আর্ত্তনাদ, সৈনিকদিগের আত্মকলহ, সেনাপতিদিগের মতিভ্রম,—নানাকারণে দুর্গমধ্যে শাসনক্ষমতা একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল!

রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নবাবসেনা দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল! তাহা দেখিয়া দুর্গরক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই নিজ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন;—সেনাপতি উপর্য্যুপরি তিনবার দামামাধ্বনি করিয়া সকলকেই আহ্বান করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ ভিন্ন আর কেহ সে আহ্বানে কর্ণপাত করিল না! ‡ দুর্গবাসীগণ সশস্ত্রদেহে জাগরিত রহিয়াছেন মনে করিয়া নবাবসেনা শিবিরে প্রস্থান করিল; কিন্তু সে রজনীতে ইংরাজদুর্গে কেহ আর নিদ্রালাভের অবসর পাইলেন না।

রজনী দুই ঘটিকার সময়ে সামরিক সভার অধিবেশন হইল। নিম্নশ্রেণীর সেনাদল ভিন্ন আর আর সকলেই সে সভায় উপনীত হইলেন। দুই ঘণ্টা তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, "আর দুর্গরক্ষার জন্য পণ্ডশ্রম করিবার আবশ্যক নাই, পলায়ন করাই সুপরামর্শ"! কিন্তু কখন পলায়ন করিতে হইবে, কিভাবে পলায়ন করিতে হইবে, সে সকল কথার কিছুমাত্র মীমাংসা হইতে পারিল না! §

নদীতীরে যে সকল ডিঙ্গী নৌকা বাঁধা ছিল, তাহার অনেকগুলিই রাতারাতি চলিয়া গিয়াছিল; পর্ত্তুগীজ রমণী ও বালকবালিকাদিগকে জাহাজে উঠাইবার জন্য প্রভাতে গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিবামাত্র, ভাগীরথীতীরে মহাকলরব উপস্থিত হইল। সে কলরবে কেহ

* In such circumstances, the expediency of abandoning the fort and retreating on ship-board naturally occurred to the beseiged, and such a retreat might have been made without dishonor. But the want of concert, together with the criminal eagerness manifested by some of the principal servants of the Company to provide for their own safety at any sacrifice, made the closing scene of the seige one of the most disgraceful in which Englishmen have ever been engaged.—Thornton's History of British Empire. vol. I. 190.

† From the time that we were confined to the defence of the fort itself, nothing was to be seen but disorder, riots and confusion. Every body was officious in advising, but no one was properly qualified to give advice—The evidence of John Cooke Esqr.

‡ Orme, vol. ii. 69. § Orme, vol. ii. 69.

কাহারও কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর পাইল না; সকলেই সর্ব্বাগ্রে জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে যাহা হইবার তাহাই হইল;—কেহ কেহ ডিঙ্গী উল্‌টাইয়া জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ নবাব-শিবিরের তীরন্দাজদিগের হাতে দেহত্যাগ করিল, কেহবা কায়ক্লেশে জাহাজে উঠিবামাত্র, নোঙ্গর তুলিয়া জাহাজখানি অবলীলাক্রমে ভাসিয়া চলিল। নবাবসেনা তাহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পলায়িত জাহাজের গতিশক্তি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! যাঁহারা পলায়নের অবসর না পাইয়া দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি দ্বাররোধ করিয়া পলায়িত বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করিয়া নানারূপে হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। *

যাঁহারা এইরূপে অকস্মাৎ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গবর্ণর ড্রেক, সেনাপতি মিন্‌চিন্, কাপ্তান গ্রাণ্ট এবং মিঃ ম্যাকেটের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে! † উত্তরকালে ইতিহাস লিখিবার সময়ে অনেকে অনেকরূপ "কৈফিয়তের" সৃষ্টি করিয়া ইহাদের কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, গবর্ণর ড্রেক অতুল সাহসে দুর্গপ্রাচীরের উপর পাদচালনা করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে ভীত হন নাই; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আর দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাও ভিজিয়া গিয়াছে,—তখন নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়াই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! এই কৈফিয়ত কতদূর সত্য তাহা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা হলওয়েল সাহেবকে সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সেই "ভিজা বারুদ" লইয়াই কেমন অতুল সাহসে দুইদিন পর্য্যন্ত নবাবসেনার গতিরোধ করিয়া অবশেষে দৈববিড়ম্বনায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা ইংরাজের ইতিহাসেই প্রকাশিত রহিয়াছে!

হলওয়েল আর কি করিবেন! বাগবাজারের নিকটে যে একখানি যুদ্ধজাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানি নিকটে আনিবার জন্য দুর্গপ্রাচীর হইতে সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। নাবিকদিগের অনবধানতায় সে জাহাজ খুলিতে না খুলিতেই চড়ায় আট্‌কাইয়া গেল, নবাবসেনার গুলিবর্ষণে নাবিকগণ ভাগীরথী সন্তরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সকলে মিলিয়া নানা উপায়ে ড্রেক সাহেবকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, অকস্মাৎ মতিভ্রান্ত হইয়া মহামতি ড্রেক সাহেব সময়ের উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি হয়ত নিজে নিজেই নিজের মতিভ্রম বুঝিতে পারিয়া, সহকারীগণের উদ্ধার-কামনায় আবার জাহাজ লইয়া দুর্গদ্বারে উপনীত

* The astonishment of those who remained in the fort was not greater than their indignation.—Orme, vol. ii. 71.

† Among those who left the factory in this unaccountable manner, were, the Governor Mr. Drake, Mr. Macket, Captain Commandant Minchin, and Captain Grant.—The evidence of John Cooke Esqr.

হইবেন। আশা কুহকিনী! সে আশা সফল হইল না! ড্রেক সাহেব নিজে নিজে জাহাজ লইয়া আসিলেন না; দুর্গবাসীদিগের নানারূপ সঙ্কেতপূর্ণ কাতর-নিবেদন অবগত হইয়াও ফিরিয়া চাহিলেন না! * তখন আর উপায়ান্তর নাই; সকলে মিলিয়া যথাশক্তি আত্ম-রক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। একজন ইতিহাস-লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, পঞ্চদশজন সাহসী বীরপুরুষ একখানিমাত্র নৌকা লইয়া অগ্রসর হইলেই দুর্গবাসীদিগের দুর্দ্দশার অবসান হইতে পারিত; কিন্তু হায়! শত শত পলায়িত ইংরাজ পুরুষের মধ্যে পঞ্চদশজন বীরপুরুষও অগ্রসর হইলেন না! †

হলওয়েল দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সিরাজদ্দৌলার গতিরোধ করিতে পারিলেন না; নবাব-সেনা ক্রমে ক্রমে দুর্গমূলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২০শে জুন সহস্র সহস্র নবাব-সেনা প্রত্যূষেই দুর্গমূলে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। তখন দুর্গবাসী ইংরাজগণ নিতান্ত ভীত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য হলওয়েলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হলওয়েল আর কি করিবেন? তিনি অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজের বিপদভঞ্জন উমাচরণের শরণাপন্ন হইলেন। উমাচরণ হিন্দু, ইংরাজেরা খৃষ্টীয়ান; কিন্তু পূর্ব্বকাহিনী স্মরণ করিয়া উমাচরণ খৃষ্টীয়ান ইংরাজকে প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হইয়া নবাব-সেনানায়ক রাজা মাণিকচাঁদের নিকট পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "আর না, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে; অতঃপর নবাব যাহা বলিবেন, ইংরাজেরা তাহাই শিরোধার্য্য করিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথায় নবাব বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য উমাচরণ মাণিকচাঁদের নামে পত্র লিখিয়া হলওয়েলকে প্রদান করিলেন। হলওয়েল দুর্গপ্রাচীর হইতে সেই পত্রখানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিবামাত্র তাহা কে যেন কুড়াইয়া লইয়া গেল; কিন্তু তাহার আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর আসিল না। এদিকে নবাব-সেনার প্রবল পরাক্রমে অনেকেই আহত হইতেছেন, গোরাপল্টন গুদাম ভাঙ্গিয়া মদ্যপান করিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে, হলওয়েল চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া সেনাসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এমন সময়ে অবরুদ্ধ ইংরাজ-সেনা সহসা পশ্চিমদিকের দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া দিল! সেই উন্মুক্তদ্বারে জলস্রোতের ন্যায় প্রবল প্রবাহে নবাব-সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আর যুদ্ধ করিতে হইল না; সকলেই বন্দী হইলেন; ইংরাজদুর্গের সমুন্নত সিংহদ্বারের উপর সিরাজদ্দৌলার বিজয়পতাকা সগৌরবে অঙ্গবিস্তার করিল!

* Signals were thrown out from every part of the Fort, for the ships to come up again to their stations, in hopes they would have reflected (after the first impulse of their panic was over) how cruel as well as shameful it was to leave their countrymen to the mercy of a barbarous enemy; and for that reason we made no doubt they would have attempted to cover the retreat of those left behind, now they had secured their own; but we deceived ourselves.—The evidence of John Cooke Esqr.

† A single sloop with fifteen brave men on board, might, in spite of all the efforts of the enemy, have come up, and, anchoring under the Fort, have carried away all who suffered in the dungeon.—Orme, vol. ii. 78.

সেনাপতি মীরজাফর খাঁ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য পাত্রমিত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া নবাব-সিরাজ-
দ্দৌলা অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময়ে ইংরাজদুর্গে পদার্পণ করিলেন, এবং দরবারে সমাসীন
হইয়াই সর্ব্বাগ্রে উমাচরণ ও কৃষ্ণবল্লভ কোথায়, তাহার সন্ধান লইবার অনুমতি করিলেন!
ইংরাজের ইতিহাসেই লিখিত আছে যে, উমাচরণ ও কৃষ্ণবল্লভ যখন সসম্ভ্রমে অভিবাদন
করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন কাহাকেও কোনরূপ তিরস্কার করা দূরে থাকুক,
সিরাজদ্দৌলা উভয়কেই যথোচিত সমাদরে আসনপ্রদান করিলেন! যে সকল ইতিহাসে
পূর্ব্বকাহিনীর কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, সে সকল ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যে
কৃষ্ণবল্লভকে লইয়া এত গোলযোগ, তাঁহাকে হাতে পাইয়া এরূপ সমাদর করিবার অর্থ কি?
সিরাজদ্দৌলাকে যাঁহারা নৃশংসস্বভাব উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়া
গিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণবল্লভের প্রতি সিরাজের সদয় ব্যবহারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার আয়ো-
জন করেন নাই!

ইংরাজদুর্গের কোষাগার হস্তগত করিয়া, ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই যে
তাঁহাদের এরূপ দুর্গতি হইল তাহা বুঝাইয়া দিয়া, সিরাজদ্দৌলা বন্দীগণকে আশ্বাস-দান
করিলেন। ইংরাজেরা বন্দী; সিপাহীগণ তাঁহাদিগকে বন্দীবেশেই নবাবের নিকট বাঁধিয়া
আনিয়াছিল। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা তাহা দেখিবামাত্র হলওয়েলের বন্ধন-মোচন করিয়া, অভয়-
দান করিলেন। দরবার ভঙ্গ হইল। রণশ্রান্ত বিজয়ী সেনাদল আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধানে
চারিদিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। সেনাপতি মাণিকচাঁদের উপর শাসনভার সমর্পণ করিয়া,
সিরাজদ্দৌলা বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। প্রভাতে যে ইংরাজদুর্গ বীরবিক্রমের লীলাভূমি
বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছিল, সায়াহ্নে সেই দুর্গাভ্যন্তরে ইংরাজ বন্দী, আর মুসলমান ভূপতি
নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে বিরামশয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন!

ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকেরা বলেন যে, যাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়া বন্দী হইয়াছিলেন,
সেই সকল হতভাগা ইংরাজ নরনারী, নিদাঘ-সন্তপ্ত গভীর রজনীতে ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে
নিদারুণ মর্ম্ম-যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে, অনেকেই প্রাণবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া
ছিলেন! মুসলমানদিগের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই;—ইংরাজদিগের ইতিহাসে ইহারই
নাম লোমহর্ষণ "অন্ধকূপ-হত্যা"!

অন্ধকূপ-হত্যার সর্ব্বপ্রধান সংবাদ-দাতা হলওয়েল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"লোকে
বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া, কেবল এইমাত্র জানিয়া রাখিবে যে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুনের
নিদাঘ-সন্তপ্ত গভীর নিশীথে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন হতভাগা অন্ধকূপে জীবন বিস-
র্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল! কেমন করিয়া এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল, তাহার যথাযথ
বর্ণনা করিতে পারেন, এমন অল্প লোকেই প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন!—যাঁহারা যত্ন
করিলে কিছু কিঞ্চিৎ লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহারা কেহই সে শোচনীয় কাহিনী বর্ণনা
করিবার চেষ্টা করেন নাই! লিখিব লিখিব করিয়া আমিও কতবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি;

কিন্তু কতবার সে উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে! লিখিতে বসিলেই প্রাণের মধ্যে সেই নিদারুণ মর্ম্ম-যাতনার চিরজীবন্ত শোচনীয় স্মৃতি এরূপ হৃদয়বেদনা জাগরিত করিয়া দেয় যে, সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যপট অঙ্কন করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মর্ম্ম-বেদনার দৃষ্টান্ত আর নাই।* সেই মর্ম্ম-বেদনায় শরীর মন যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আবার কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সুতরাং অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী বিস্মৃতি-গর্ভে বিসর্জ্জন না করিয়া, তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম। স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া লিখিতে বসিয়াছি; কিন্তু এক বর্ণও অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে পারিব না;—যাহাই লিখি না কেন, তাহাতে প্রকৃত দুর্দ্দশার অংশমাত্রও প্রকটিত হইবে না!

"অন্ধকূপের কথা লিখিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করা আবশ্যক। অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময়ে নবাব ও তাঁহার সেনাদল দুর্গপ্রবেশ করেন। আমার সঙ্গে সেদিন নবাবের তিনবার দেখা হয়। সাত ঘটিকার একটু পূর্ব্বে শেষ সাক্ষাৎ;—তিনি তখনও এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তিনিও একজন বীরপুরুষ, এবং বীরপুরুষের ন্যায় বলিতেছেন, 'আমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না।' আমার এখন পর্য্যন্তও এইরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমাদের সম্বন্ধে নিতান্ত সাধারণভাবে হুকুম দেওয়া ব্যতীত, কোথায় রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া রাখিতে হইবে,—এ সকল কথা সিরাজদ্দৌলা কিছুই বলিয়া দেন নাই! আমরা যেন পলায়ন করিতে না পারি,—বোধহয় এই পর্য্যন্তই বলিয়া থাকিবেন। যাহারা এই কয়দিনের যুদ্ধকলহে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, তাহাদের সহকারী সিপাহীগণ প্রতিশোধ লইবার জন্যই আমাদের এরূপ দুর্গতি করিয়াছিল; ইহাই আমার ধারণা!

"সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। একজন প্রহরী আসিয়া আমাদিগকে একটি বিস্তৃত বারান্দার খিলানের কাছে বসিতে বলিল। সে স্থান অন্ধকূপ কারাগার এবং প্রহরী-বারিকের পশ্চিমদিকে। সম্মুখে ময়দান। সেখানে মশাল জ্বালাইয়া চারি পাঁচশত গোলন্দাজ দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা চাহিয়া দেখিলাম যে, চারিদিকেই আগুন লাগিয়া উঠিয়াছে। বড় ভয় হইল। সকলেই ভাবিলাম যে, আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই বুঝি এত লোক মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

"৭॥ টার সময়ে কতিপয় সেনানায়ক মশাল লইয়া প্রাচীর-সংলগ্ন কক্ষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তখন আর সন্দেহ রহিল না; আমাদের অনুমানই ঠিক হইল ভাবিয়া

* আছে। তাহার নায়ক ইংরাজ, সংযোগস্থল স্কট্‌লণ্ড; Massacre of Glenco নামে তাহা ইংলণ্ডের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস-পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে! তবে প্রভেদ এই যে, অন্ধকূপ-হত্যার সত্য মিথ্যা লইয়া লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, গ্লেন্‌কোর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে মতভেদ নাই! আরও একটু প্রভেদ আছে;—অন্ধকূপ-হত্যায় কেহ কেহ পরিত্রাণ পাইয়াছিল, গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ডে কেহ আর পরিত্রাণ পায় নাই; সুতরাং হলওয়েলের ন্যায় সুললিত ভাষাপ্রয়োগ-কৌশলে কেহ আর গ্লেন্‌কোর লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার অবসর পায় নাই। হলওয়েলের এই সকল উক্তির সহিত "Torren's Empire in Asia" একত্র পাঠ করিলে ভাল হয়।

ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম! ভাবিলাম যে, শীঘ্র শীঘ্র অগ্নি-সংকার শেষ করিবার জন্য নিকটস্থ কক্ষগুলিতেও অগ্নিসংযোগ করিতে আসিতেছে! তখন সকলেই স্থির করিলাম,—আর না,—এইবার প্রহরীদিগের উপর লাফাইয়া পড়িব, তরবারি কাড়িয়া লইব, সম্মুখে যে সকল গোলন্দাজ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে সদর্পে আক্রমণ করিয়া, বীরের ন্যায় জীবনবিসর্জ্জন করিব,—কাপুরুষের মত রহিয়া রহিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিব না! বেলি, জেন্‌কস্ ও রেভেলী বলিলেন যে, 'সহসা এতবড় দুঃসাহসের কার্য্য করিয়া কি হইবে? আগে ব্যাপার কি দেখিয়া আইস।' আমি একটু উঠিয়া গিয়া দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে ভ্রম দূর হইয়া গেল! আমাদিগকে কোথায় রাত্রিবাস করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মশাল লইয়া স্থানান্বেষণ করিতেছে;—দেখিলাম যে, পাহারাবারিকের ঘরগুলির অনুসন্ধান চলিতেছে!

"এইখানে একজন লোকের পরিচয় দিয়া রাখি। ইঁহার নাম লিচ্;—ইঁনি কোম্পানীর কলিকাতার কুঠীর কর্ম্মকার ছিলেন। আগে ইঁহাকে কেবল বন্ধু বলিয়াই সমাদর করিতাম, কিন্তু বন্ধু আজি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে অধিকতর সমাদর করা আবশ্যক। মুসলমানেরা যে সময়ে তুমুল কোলাহল করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিতেছিল, লিচ্ সেই অবসরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অন্ধকার হইলে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নদীতীরে নৌকা প্রস্তুত করিয়া আমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছেন; আমি পলায়ন করিতে প্রস্তুত কিনা কেবল তাহাই জানিবার জন্য গুপ্তপথে দুর্গপ্রবেশ করিয়াছেন। সে সময়ে আমাদের কাছে অধিক প্রহরী ছিল না; যাহারা ছিল তাহারাও সন্দেহশূন্য হইয়া দূরে দূরে পাদচারণ করিতেছিল;—ইচ্ছা থাকিলে পলায়ন করিতে কোনরূপ অসুবিধা হইত না। কিন্তু যাঁহারা আমার আজ্ঞায় দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমার সঙ্গে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অসহায় অবস্থায় নবাবের হাতে সমর্পণ করিয়া, একাকী প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তখন লিচ্ অবলীলাক্রমে বলিয়া উঠিলেন যে,—কেবল আমার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন; আমিই যদি পলায়ন না করিলাম, তবে তিনি আর একাকী পলায়ন করিবেন কেন? বলা বাহুল্য যে, কাহারও পলায়ন করা হইল না!

"যাহারা এতক্ষণ স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা আসিয়া পাহারা-বারিকের বামপার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিতে লাগিল। সেই বারিকে সিপাহীদিগের নিদ্রার জন্য কতকগুলি তক্তাপোষ ছিল; বায়ুসমাগমেরও অসুবিধা ছিল না;—ভাবিলাম বুঝি সমুদয় দিনের রণশ্রান্তি দূর করিবার সদুপায় হইল; সেইজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এই বারিকের ভিতর দিয়াই অন্ধকূপকারাগারের প্রবেশ-দ্বার! কতকগুলি সিপাহী আসিয়া বন্দুক উঠাইয়া সেই অন্ধকূপে প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। নিরস্ত্র দেহে সে ইঙ্গিত অবহেলা করিতে সাহস হইল না।

যাহারা পশ্চাতে ছিল, তাহারাও প্রবলবেগে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। সম্মুখের তরঙ্গ যেমন পশ্চাতের তরঙ্গাঘাতে কেবল সম্মুখের দিকেই ছুটিয়া চলে, আমরাও সেইরূপ তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া অন্ধকূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম! সে অন্ধকূপ যে এত ক্ষুদ্রায়তন তাহা জানিতাম না; আমি কেন, দুই একজন সৈনিক ভিন্ন কেহই তাহা জানিতেন না। যদি জানিতাম যে সত্য সত্যই তাহা অন্ধকূপ, তবে বরং আদেশ লংঘন করিয়া প্রহরীহস্তে জীবন-বিসর্জ্জন করিতাম; তথাপি সে অন্ধকূপের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পদার্পণ করিতাম না!

"আমিই সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেলি, জেন্‌কস্, কুক্, কোল্‌স্, স্কট, রেভেলি এবং বুকাননও প্রবেশ করিলেন। দ্বারের নিকটেই জানালা; আমি প্রবেশ করিয়া সেই জানালার ধারে আশ্রয় পাইলাম। কোল্‌স্ এবং স্কট্ উভয়েই আহত; সুতরাং তাঁহাদিগকেও সেখানে ডাকিয়া লইলাম। আর আর সকলে আমাদের আশে পাশে, যে যেখানে পারিল, ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দরজা বন্ধ হইল। আট্‌টা বাজিয়া গেল।

"এইরূপে রণ-পরিশ্রান্ত ১৪৬ জন হতভাগা নিদারুণ নিদাঘ-সন্তপ্ত অন্ধকার রজনীতে বায়ুসমাগমবিরহিত ১৮ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্রকক্ষে বন্দী হইল! একটি মাত্রদ্বার, তাহাও উত্তরদিকে। দুইটিমাত্র জানালা, তাহাও লৌহশলাকাবেষ্টিত! একটু যে শীতল বাতাস পাইব, তাহারও উপায় নাই! এই অবস্থা স্মরণ করিলে, আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করা সহজ হইবে।

"আমাদের যে কত না দুর্গতি হইবে, তাহার ভয়াবহ দৃশ্যপট যেন জীবন্তভাবে চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কারাকক্ষের আয়তন দেখিয়াই চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল! সকলে মিলিয়া রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল;—কিন্তু সে প্রচণ্ড বিক্রম বিফল হইল; দ্বার খুলিল না!

"তখন ক্রোধান্ধ-কলেবরে সকলে মিলিয়া উন্মত্তের মত আস্ফালন করিতে লাগিল! আমি দেখিলাম যে, সে নিষ্ফল ক্রোধে কেবল শরীর মন শীঘ্র শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং শান্ত হইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলাম।

"সকলে শান্ত হইলে, অবসর পাইয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্বস্থ আহত বন্ধুদ্বয় মৃত্যুযাতনায় বিকট আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন! নানাভাবে মানুষকে দেহত্যাগ করিতে দেখিয়া, এবং সর্ব্বদা মৃত্যুকাহিনী আলোচনা করিয়া মৃত্যুচিন্তা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য ভয় হইল না; কিন্তু সহকারীদিগের যন্ত্রণা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।

"পাহারাওয়ালাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ জমাদার ছিল। মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন আমাদের মর্ম্ম-যাতনায় কাতরতা অনুভব করিতেছে! তাহা দেখিয়া কথঞ্চিৎ সাহস হইল। তাহাকে জানালার কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম যে, স্থানাভাবে আমাদের বড়ই দুর্গতি

হইতেছে ; সে যদি অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক আর একটি ঘরে রাখিতে পারে, তবে প্রভাত হইবামাত্র সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। জমাদার চলিয়া গেল, কিন্তু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"অসম্ভব!" আমি ভাবিলাম যে, পারিতোষিকের অঙ্ক বুঝি কম হইয়াছে, তখন দুই সহস্র মুদ্রার প্রলোভন দেখাইলাম। জমাদার আবার চলিয়া গেল ; কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে,—"একেবারেই অসম্ভব! নবাব নিদ্রাগত। তাঁহার অনুমতি না লইয়া এমন কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে? আর তাঁহাকে যে জাগাইবে এমন সাহসই বা কাহার?"

"এতক্ষণ অনেকেই শান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই বিলক্ষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্ব্বশরীর এরূপ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল যে, না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব। শরীরের রক্ত যেন একেবারে জল হইয়া বাহির হইতে লাগিল! ধারা বহিয়া ঘর্ম্মস্রোত ছুটিয়া চলিল! সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম!

"নয়টা না বাজিতেই পিপাসা ও শ্বাসকষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। একেবারে বায়ুরোধ হইলে বরং ভাল হইত,—তৎক্ষণাৎ সকল যাতনার অবসান হইত! তাহা হইল না। যে পরিমাণে বাতাস পাইতে লাগিলাম, তাহাতে না যন্ত্রণার অবসান হইল, না জীবনধারণের সুবিধা হইল!

"আর পিপাসা সহ্য করিতে পারিলাম না। শ্বাসকষ্টও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল! দশ মিনিট থাকিতে না থাকিতেই বুকের মধ্যে খিল্ ধরিয়া আসিতে লাগিল। সে মর্ম্ম-যাতনা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু পিপাসা, শ্বাসকষ্ট এবং বুকের ব্যথা যেন বাড়িয়া উঠিল। তখনও সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু হায়! সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইতেছে না কেন,—আর কত কষ্ট সহিব,—আর কতক্ষণে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে,—এই চিন্তায় ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলাম। একটু বাতাস,—একটু বাতাস,—আর কিছু না, কেবল একটু বিশুদ্ধ বাতাস;—মনে হইল বুঝি একটু বাতাস পাইলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে! তখন দ্বিগুণবলে লোক ঠেলিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লোকে পাড়াপাড়ি করিয়া জানালা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; সুতরাং জানালার নিকটে পৌঁছিতে পারিলাম না। জানালার ধারে একসারি লোক,—তাহার পরে আর একসারি,—তাহার পরে আরও একসারি! অনেক চেষ্টায় সেই তৃতীয় সারিতে একটুমাত্র স্থান পাইলাম ; সেখান হইতেই হাত বাড়াইয়া জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিলাম!

"বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট যেন দূর হইয়া গেল, কিন্তু পিপাসা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। এতক্ষণ নীরবে সকল কষ্ট বহন করিতেছিলাম;—আর পারিলাম না! একেবারে অধীর হইয়া মর্ম্মবেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম,—"ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে একটু জল দাও।" সাড়াশব্দ না পাইয়া সকলেই ভাবিয়াছিল যে, আমি বুঝি বহুক্ষণ পঞ্চত্বলাভ করিয়াছি।

কিন্তু সাড়া পাইবামাত্র সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত হইয়া সকলেই সেই মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে "জল দাও, জল দাও" করিয়া আমাকে জলদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

"প্রাণ ভরিয়া জলপান করিলাম। কিন্তু সে অতৃপ্ত পিপাসা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিল না! তখন জলপানে বিরত হইয়া ঘর্ম্মবিন্দু সংগ্রহ করিয়া ওষ্ঠসিঞ্চনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হায়! হায়! সে ঘর্ম্মবিন্দুর বিন্দুমাত্রও মাটিতে পড়িয়া গেলে, কত কষ্টই বোধ হইতে লাগিল!

"১১৷৷০টার মধ্যেই সকলে বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুতেই শান্ত করা গেল না। যাহারা জানালার আশ্রয় পাইয়াছিল, কেবল তাহারাই কথঞ্চিৎ শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাতাস,—বাতাস,—আর একটু বাতাস,—আরও একটু বাতাস,—চারিদিক হইতে কেবল এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! গুলি করিয়া মার—আমাকে আগে মার—আমাকেই আগে মার,—চারিদিক হইতে কেবল এই ভয়ঙ্কর কোলাহল! অনেকে প্রহরীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য, নবাব এবং মানিকচাঁদের নামোল্লেখ করিয়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে করিতে উন্মত্তের মত জানালার উপর আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল! যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহারা গৃহমধ্যে সহকারীদিগের শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা জানালা আক্রমণের জন্য প্রচণ্ডবেগে সহকারীদিগকে পদদলিত করিয়া ছুটিয়া চলিল! কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ কাহারও কাঁধের উপর চড়িয়া প্রাণপণে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিতে লাগিল;—তখন আর কাহার সাধ্য যে তাহাদিগকে সরাইয়া দেয়! আমার কাঁধের উপর যেন পাষাণ চাপিয়া পড়িল। গুরুভারে অবনত হইলেও পরিত্রাণ নাই;—যে দুর্গন্ধ! যেন নাসারন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল!

"এমন নিদারুণ পরীক্ষায় পড়িয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্থির রাখিতে পারিলাম না। সহসা মনে হইল যে আমার কাছে একখানি ছুরিকা রহিয়াছে কেন? সেই ছুরিকা বাহির করিয়া শিরা উপশিরা খণ্ড খণ্ড করিবার আয়োজন করিলাম! অকস্মাৎ যেন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাপুরুষের ন্যায় আত্মহত্যা করা বড়ই নীচকার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন প্রায় ২টা বাজে বাজে। এরূপ ভাবে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার কাছে কেয়ারী নামে একজন নৌ-সেনানায়ক দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত দিন অতুল বিক্রমে দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমার স্থান অধিকার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া আমি গৃহমধ্যে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। কেয়ারী ধন্যবাদ দিলেন; কিন্তু তিনি আর আমার স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না—আমার কাঁধের উপর একজন ওলন্দাজ বসিয়াছিল, স্থানটুকু সেই অধিকার করিয়া ফেলিল। কেয়ারী তাঁহার বিশালবাহু বিস্তার করিয়া, ভিড় ঠেলিয়া আমাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল শক্তি সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িল; দেখিতে না দেখিতে কেয়ারী সহসা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন!

"গৃহমধ্যে আসিলেও কিছুক্ষণ কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা ছিল। তখন কিছু যাতনা-বোধ ছিল না। তাহার পরে সকল সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল! প্রভাতে কুক্ সাহেবের প্রস্তাবে লসিংটন এবং ওয়াল্‌কট্ মৃতদেহের ভিতর হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তখন একেবারে সংজ্ঞাহীন। তাহার পর প্রভাতের শীতল বাতাস লাগিয়া চেতনাশক্তি ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।"*

২১শে জুন প্রাতঃকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন হলওয়েলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, প্রহরীগণ তখন দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিল। হলওয়েল নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। হলওয়েল যখন নবাবদরবারে উপনীত হইলেন, তখন তিনি একরূপ শক্তিহীন,—শুষ্ককণ্ঠে জিহ্বার জড়তা হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। হলওয়েল লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দান করিয়া জলপান করিতে দিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের রাজকোষ কোথায় লুক্কায়িত আছে, হলওয়েল তাহা কিছুই বলিতে পারিলেন না। রাজা মানিকচাঁদ তাঁহাকে এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে উঠাইয়া লইয়া বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন; আর আর সকলেই মুক্তিলাভ করিল।

হলওয়েল এবং তাঁহার সঙ্গীগণ কারারুদ্ধ হইলেন কেন, সে কথা হলওয়েল নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, উমাচরণের উত্তেজনায়, রাজা মানিকচাঁদের আদেশেই তাঁহারা বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিলেন; সিরাজদ্দৌলা তাহার জন্য কিছুমাত্র অপরাধী নহেন। হলওয়েলের বিশ্বাস এইরূপ যে, উমাচরণ কারারুদ্ধ হইয়া যে সকল মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উমাচরণ যে নিতান্ত অন্যায় উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সে কথা হলওয়েলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হলওয়েলের অনুমান সত্য হইলেও, তাহার সহিত সিরাজদ্দৌলার কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। উমাচরণ সে সময়ে শোকে তাপে জর্জরিত। যাঁহারা সন্দেহমূলে উমাচরণকে ধনেবংশে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, উমাচরণ যে তাঁহাদের জন্য যৎকিঞ্চিৎ উৎপীড়নের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও প্রমাণাভাব;—একমাত্র হলওয়েলের অনুমানই যাহা কিছু প্রমাণ!†

* "Letter from J. L. Holwell, Esq., to William Davis, Esq., from on board the *Syren* sloop, the 28th of February 1757."—Printed in Holwell's Tracts.

† But that the hard treatment I met with, may truly be attributed in a great measure to Omichand's suggestion and insinuations I am well assured, from the whole of his subsequent conduct; and this further confirmed me in the three gentlemen selected to be my companions, against each of whom he had conceived particular resentment; and you know Omichand can never forgive.—Holwell's Letter.

স্বরলিপি।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

কথা—শ্রীমতী সরলা দেবী. সুর—ঐ

মিশ্র-সুরট—রূপকতাল।

এস হে এস সুন্দর, চিতরঞ্জন,
মম জীবন-উল্লাস!
এই হৃদয় কাননে কর চিরবিলাস!
দিব অর্ঘ্য চরণে, কত না বরণে
স্নিগ্ধ প্রেম-কুসুম ধ্যাশ!
এস হে এস!
কত ললিত তানে, বন্দন গানে
ফুটাব অধরে অরুণ-হাস!
এস হে এস!
আমি মাধুরী ভরিয়া, রাখিব এ হিয়া
রচিয়ে তোমার সুখ-নিবাস!
এস হে এস!

॥৭॥[নো১ র্স১ র্র১। র্ম১ র্গর্মর্গ১ র্র২। র্র১ র্র১ র্স১। ন১ র্স২ র্স১। র্র১ র্স১ র্সর্রর্স১।
এ স হে এ স সু ন্দ র চি ত র ঞ্জ — ন ম

নো১ নো১ ধ১ প১। নো১ ধনোধ১ প১। ধপ১ ম১ প২। প১ ধপ১ ম১।
ম জী — ব — ন উ — ল্লা স এ ই হৃ

প১ ধ১ ম১ গ১। মগর২ র১। ম১ মগ১ র১ প১। ম১ গমগ১ র১। ম১ প১ পনো২।
দ য় কা ন নে — — — — ক র চি র বি লা

পনোর্স২ র্সনো১। র্স১ র্র১ র্গর্মর্গ১ র্গর্মর্গ১ ॥ র্র৩। {—২ র্সনোধ১। }]
স এ স হে এ — স {— —}

শেষ।

—২ র্স১ র্স১। নো১ র্স১ র্র। নো১ র্সর্র১ র্সনো২। ধনোধ১ প১ ধ১। ম১ গ১ মগর২।
দি ব অ — র্ঘ্য চ র ণে ক ত না ব র ণে.

প২ ধ১ । ম১ গ১ রগর১ স১ । র১ ম১ প১ । পনো২ পনোর্স২ । র্সনো১ র্স১ র্র১ ।
স্নি গ্ধ প্রে — ম — কু সু ম রা শ এ স হে

র্গর্মর্গ১ র্গর্মর্গ১ র্র২ । —৩ । —২ র১ র১ । র১ ম১ র১ । রম১
এ — স — — ক ত ল লি ত তা

রমপ১ মপনো১ পনোর্স১ । নোর্সর্র১ র্স২ । —২ স১ স১ । র১ ম১ র১ ।
— — — — নে — ক ত ল লি ত

রম১ রমপ১ মপনো১ পনোর্স১ । নোর্সর্র১ র্স২ । প২ ধ১ । ম১ গ১ মগর২ ।
তা — — — — নে ব ন্দ ন গা নে

প১ প১ ধ১ । ম১ গ১ রগর১ স১ । র১ ম১ প১ । পনো২ নোর্স২ । র্সনো১ র্স১ র্র১ ।
ফু টা ব অ ধ রে — অ রু ণ হা স এ স হে

র্গর্মর্গ১ র্গর্মর্গ২ র্র২ । —৩ । ধ১ ॥ —২ স১ স১ । স১ নো১ ধ১ । নো১ ধ১ র্সনো১ ধ১ ।
এ — স — — আ মি মা ধু রী ভ রি য়া —

(আ—প্র)

প১ ধ১ পধপ১ । ম১ গমগ১ র২ । প১ প১ ধ১ । ম১ গ১ রগর১ স১ । র১ ম১ প১ ।
রা খি ব এ হি য়া র চি য়ে তো মা র — সু খ নি

পনো২ পনোর্স২ । র্সনো১ র্স১ র্র১ । র্গর্মর্গ১ র্গর্মর্গ১ র্র২ । —৩ । —২ র্স১ র্সর্র১ ।
বা স এ স হে এ — স — — ও হে

র্সনো১ র্স১ র্র১ । নো১ র্সর্র১ র্সনো২ । ধনোধ১ প১ ধ১ । ম১ গ১ মগর২ ।
মা ধু রী ভ রি য়া রা খি ব এ হি য়া

প১ প১ ধ১ । ম১ গ১ রগর১ স১ । র১ ম১ প১ । পনো২ পনোর্স২ । র্সনো১ র্স১ র্র১ ।
র চি য়ে তো মা র — সু খ নি বা স এ স হে

র্গর্মর্গ১ র্গর্মর্গ১ র্র২ ॥
এ — স

(আ—প্র)

কাহাকে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মেশ্‌মেরাইজ করিলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। আমি যেন সেইরূপ মন্ত্রপূতঃ হইয়া পড়িতাম। তিনি যখন আমাদের বাড়ী আসিতেন, তাঁহাকে যখন প্রথম দেখিতাম, তখন আমার বেশ সহজ অবস্থা, অন্য একজন সাধারণ আলাপীর সহিত দেখা শুনা কথাবার্ত্তায় যতটুকু আনন্দ, তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাতেও তদপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। কিন্তু গানটি গাহিলেই সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া পড়িত ; অন্য সময়ে এমন কতবার পণ করিয়াছি—সে গান আর শোনা হইবে না, তাঁহাকে আর গাহিতে বলিব না, কিন্তু সময় কালে সে সঙ্কল্প কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারিতাম না, শুষ্ক পত্রের মত যেন আপনা হইতে টুটিয়া খসিয়া পড়িত। গানটির কি যে মোহ ছিল জানি না, শুনিতে শুনিতে বাল্যের স্মৃতি-ধারা পূর্ণপ্রবাহে উথলিয়া উঠিয়া কুমারী-হৃদয়ের সুপ্ত অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে স্ফীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত। সঙ্গীতধ্বনি সুরে তানে উঠিয়া পড়িয়া যতই মধুরতা বর্ষণ করিত—ততই সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র আকুলতর হইয়া প্রবল দ্রুতোচ্ছ্বাসে তাহার চির-পরিচিত অথচ চিরনূতন কে জানে কোন অজানা প্রেমময় সাগর-দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইত,—তাহাতে আত্ম-বিলীন করিতে চাহিত। এই সুমধুর সুকোমল তীব্র অতৃপ্তির আতিশয্যে ক্রমশঃ যেন আপনা হারাইয়া ফেলিতাম ; সেই পরিচিত মধুর গীত-সম্ভাষণে মুগ্ধ স্মৃতিদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া গায়ক ক্রমে আমার মনে নয়নে পরিচিত প্রিয়জনের মূর্ত্তিতে বিভাসিত হইয়া উঠিতেন ; নূতনে পুরাতনে, অতীতে বর্ত্তমানে, স্মৃতি বাসনায় তখন একাকার হইয়া পড়িত—আমি জাগিয়া যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতাম।

তিনি চলিয়া যাইবার পরেও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কেমন মোহাচ্ছন্ন থাকিতাম,—স্বপ্নে জাগরণে ঐ একইরূপ ভাব আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিত ; পরদিন নিদ্রা ভঙ্গের পর হইতে সে ভাব অল্পে অল্পে দূর হইয়া যাইত। তিন চারি দিন পরে, কখনও সপ্তাহ পরে আবার তিনি যখন আসিতেন, তখন আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ—তখন আর সে ভাবের চিহ্নমাত্র নাই ; তখন তাই তাঁহাকে দেখিলে পূর্ব্ব ভাবের স্মৃতিতে এমন লজ্জাবোধ হইত ! কিন্তু আবার গান আরম্ভ করিলেই যেকে সেই ! এ কি অপরূপ রহস্য জানি না ; সূর্য্যের উদয়াস্তে পৃথিবী যেমন দ্বিমূর্ত্তি ধারণ করে, ঐ ভাবের উদয়াস্তে আমিও সেইরূপ দুই আমি হইয়া পড়িতাম।

ক্রমশঃ আমার এই মন্ত্রপূতঃ ভাব স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ; অর্থাৎ সময়ে অসময়ে সকল সময়েই আমার তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এরূপ হইবার নূতন কারণ ঘটিল এই ; চারিদিক হইতেই আমি শুনিতে লাগিলাম, বুঝিতে লাগিলাম

তিনি আমার স্বামী হইবেন; কোন বঙ্গবালার মনে এই বিশ্বাসের কিরূপ প্রবল প্রভাব তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে কি? স্বামী যেমনই হৌন, তিনি রমণীর এক মাত্র পূজ্য আরাধ্য দেব — প্রাণের প্রিয়তম, জীবনের সর্ব্বস্ব—এই বাক্য, এই ভাব, এই সংস্কার আজন্মকাল হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে; সুতরাং বিশেষ কারণে স্পষ্ট বীতরাগ না থাকিলে এই বিশ্বাসই প্রেমাঙ্কুরিত হইবার যথেষ্ট কারণ।

কিছুদিন হইতে আমরা যেখানে যাই কেবল ঐ কথা, যিনি আসেন কেবল ঐ কথা। বয়স্তারা ঠাট্টাচ্ছলে আমার কাছে গোপনে ঐ প্রসঙ্গ তোলেন, বয়োজ্যেষ্ঠারা গম্ভীরভাবে দিদির কাছে আমার সাক্ষাতেই প্রকাশ্যে ঐ আলোচনা করেন, আর দিদি ভগিনীপতি ত সুবিধা পাইলেই যখন তখন ঐ কথা তুলিয়া কখনো ঠাট্টা করিয়া, কখনো গম্ভীরভাবে আমার ভবিষ্যৎ-সৌভাগ্য-কল্পনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। এ কল্পনা যে কখনো সত্যে পরিণত না হইয়া কল্পনাতেই অবসিত হইতে পারে, এ কল্পনা কিন্তু কখনো তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। কেনই বা হইবে? যাঁহাকে লইয়া এত কথা, এত আলোচনা, তিনি দিন দিন এই বিশ্বাস আমাদের মনে গভীররূপে বদ্ধমূল করিতেছেন, তাঁহার যাতায়াতও বাড়িতেছে, এবং কথাচ্ছলে ভাবে ভঙ্গাতে তাঁহার অনুরাগও দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, এখনো যে কেবল সুস্পষ্ট বাক্যে তিনি বিবাহ-প্রস্তাব করিতেছেন না, সে যেন শুধু আমাদের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বুঝিবার অপেক্ষায়।

রমণী-হৃদয়ে প্রীতিতে যেমন প্রীতিরুদ্রেক করে, এমন কি অন্যকোন গুণে? যদি হৃদয় অন্যপূর্ব্ব না থাকে বা কোন কারণে কেহ নিতান্ত বিদ্বেষভাজন না হয়—তাহা হইলে সে আমাকে প্রাণপণে ভালবাসে—এইরূপ বিশ্বাসস্থলে যদি প্রকৃত প্রেম দিবারও ক্ষমতা না থাকে, তবে অন্ততঃ গভীর করুণাও তাহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করে। আত্মদানে অন্যকে সুখী করিব—নারীপ্রকৃতির এই যে সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা প্রবণতা—নারীপ্রেমের শিরায় মজ্জায় যে আকাঙ্ক্ষা শোণিতাকারে প্রবাহিত বর্ত্তমান; তাহার সফলতাতেই, তাহার বিশ্বাসেই রমণীহৃদয় পরিপূর্ণ, বিকশিত; জীবনজন্ম সার্থক চরিতার্থ; আবার এই বিশ্বাসেই সে ভ্রান্ত, কলঙ্কিত, মহাপাপী। প্রেমময়ী রমণী ইহার জন্য কতদূর আত্মত্যাগ না করিতেছে, আর কতদূর না করিতে পারে?

তাঁহার প্রীতিময় ব্যবহারে, রূপেগুণে আমার নয়নে তিনি সর্ব্বসুন্দর হইয়া উঠিলেন; আপনাকে এই সর্ব্বগুণবর সুপুরুষের সুখের কারণ ভাবিয়া আমি অতি উপাদেয় গর্ব্বময় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিলাম। বেশীদিন এরূপে দিন কাটিল না, ভাবে ভঙ্গীতেই তাঁহার অনুরাগ আবদ্ধ রহিল না, একদিন তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন, সেই প্রার্থিত প্রত্যাশিত দিন আসিল—কিন্তু?

বিকালবেলা বাগানে ফুল তুলিতেছিলাম, বৃষ্টির পর চারিদিক সুন্দর সুদৃশ্য নবীন হইয়া উঠিয়াছে, আকাশের লাল আলো তরল মেঘের উপর, গাছ পাতা ফুলের কোমলতার উপর

অতি মধুর উজ্জ্বলতা বিস্তার করিয়াছে—আমি একটি গোলাপ বোঁটাশুদ্ধ ছিঁড়িতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছিলাম না সহসা হাত বোঁটাতেই রহিয়া গেল, কম্পাউণ্ডে গাড়ী জুড়ি প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাতেই নয়ন আকৃষ্ট আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে বাগানে দেখিয়া নিকটে আসিলেন, গোলাপটি ছিঁড়িয়া দিয়া বলিলেন "কাহার জন্য ফুল তুলিতেছেন!" আমিও ফুল তুলিতে তুলিতে ইহা ভাবিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তখন ছোটুকে কেমন অসঙ্কোচে ফুল দিতাম, আর ইঁহাকে দিতে ইচ্ছা করিলেও কেন পারি না"—তাঁহার জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলাম—"দিদির জন্য"।

একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলাম। আর একটি সুন্দর গোলাপ ছিঁড়িয়া তিনি আমার হাতে দিতে দিতে আস্তে আস্তে আওড়াইলেন—

A lamp is lit in woman's eye
That souls, else lost on earth, remember angles by.

তখন আমি তাড়াতাড়ি লজ্জিতভাবে বলিলাম—"ঘরে চলুন"।

তিনি বলিলেন—"চলুন না, আপনি গেলেই যাই, মনে আছে আজ আপনি আগে গাবেন বলেছেন?"

আমরা উপরে উঠিলাম, তখনো ভগিনীপতি বাড়ী ফেরেন নাই, দিদিও এদিকে আসেন নাই, আমি চাকরকে বলিলাম—দিদিকে খবর দাও, বলিয়া তাঁহার সহিত ড্রয়িংরুমে বসিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি পিয়ানোর কাছে বসুন, "এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী" এই গানটি গান"—

আমি বলিলাম "সে রাত্রের গান কি বিকালে গাওয়া হয়?"

তিনি বলিলেন—"তবে যা ইচ্ছা গান—sing sweet bird of beauty sing—জানেন ত কবিতাটী—

To me there is but one place in the world
And that where thou art, for wherever I be
Thy love doth seek its way into my heart,
As will a bird into her secret nest.
Then sit and sing, sweet bird of beauty sing."

আমি বলিলাম, "আপনি সেই গানটি গান আমার ভারী শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে?"

তিনি এ কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন—"সেলির একটি কবিতা আমার বড় সুন্দর লাগে, আপনি অবশ্য পড়েছেন?

We—are we not formed as notes of music are
For one another though dissimilar
Such difference without discord as can make

Those sweetest sounds in which all spirits spoke
As trembling leaves in a continues air."

আমি কোন উত্তর করিলাম না, তিনি একটু পরে আবার বলিলেন—"আগে ভাবতুম ভাল কবিতা যাকে বলা যায় more or less সে সবই ফাঁফা—মিথ্যা, তার মধ্যে সত্য কিছু নেই; কেবল বাজে কল্পনা, এখন দেখছি আমারি ভুল, আপনার কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম—"আমি অমন করে ভেবে দেখিনি—পড়ি ভাল লাগে শুধু এই জানি"

তিনি বলিলেন—"কিন্তু সত্য বলে না মনে বসলে তার কি প্রকৃত রসটুকু উপভোগ করা যায়? আমি আগে নভেলে first sightএ love যেখানে পড়তুম এমন খারাপ লাগতো—কেননা তা নিতান্তই মিথ্যা অসম্ভব বলে মনে হোত, এখন দেখ্‌চি There are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamed of in your philosophy.—কে জানত ঐ মিথ্যা আমার জীবনের পক্ষে একদিন পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়াবে?—" বলিয়া বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

To see her is to love her
And love but her for ever
For nature made her what she is
And never made another.

আরো কি স্পষ্ট করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে?

To see you is to love you
And love you but for ever—'

ভগিনীপতি এই সময় গৃহে আসায় তিনি হঠাৎ এইখানেই থামিয়া পড়িলেন—ভগিনীপতি বলিলেন—হ্যালো কতক্ষণ! finishing stroke eh!—final proposal in poetry it seems Hurrah! let me congratulate you both!

তিনি যেন একটু সলজ্জভাবে গোঁপ ফিরাইয়া বলিলেন—"I say you are very late in returing to day. We were whiling away our time as best we could. By the bye did you win that murder-case of yours? Have you got the poor fellow discharged?"

ব্যারিষ্টারদিগের নিকট তাঁহাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় গল্পের মত প্রীতিজনক গল্প আর নাই, উপরোক্ত প্রশ্নে ভগিনীপতি পূর্ব্ববর্ত্তী কথা ভুলিয়া গেলেন, ঐ প্রসঙ্গে উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আমি এতক্ষণ যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম—একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিবার অবসর পাইলাম। এইত তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করিলেন,—আমি কি নিতান্তই সুখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি? মনের মধ্যে মন দিয়া অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম,—না তাহা ঠিক নহে; সর্ব্ব প্রথম তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার

কথাবার্ত্তা শুনিয়া যেমন হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার এই অনুরাগ-বাক্যে আজও কেমন সহসা সুমধুর সঙ্গীত সুরে যেন বেসুরো স্বর কাণে বাজিল, অমৃত-কলসে একবিন্দু বিষ ক্ষেপের ন্যায় সুখের মধ্যে তাই প্রাণ কেমন আকুল হইয়া উঠিল—আশার কোণে কোণে নৈরাশ্যের ঘন ছায়া জমাট বাঁধিল,—মনে হইতে লাগিল যেন যাহা চাহিয়াছিলাম এ তাহা নহে—যাহা বুঝিয়াছিলাম এ তাহা নহে! একি পাশব স্বতঃজ্ঞান?

আমি ভাবিতেছি—তাঁহারা দুইজনে গল্প করিতেছেন, চাকর আসিয়া খবর দিল একজন মক্কেল আসিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি 'কার্ড'পাত্র সম্মুখে ধরিল, ভগিনীপতি তিনখানি টিকিট হাতে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—'ডাক্তার বি আমাদের উপর কল করতে এসেছেন দেখ্‌ছি, আচ্ছা এইখানে আসতে বল,—মণি তুমি যাও—তোমার দিদিকে ডেকে আন—

আমি চলিয়া গেলাম, গৃহ পার হইয়াই প্রায় নূতন কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম, কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিলাম—লোকটার চেহারাখানা কি রকম একবার দেখিয়া যাওয়া যাক। দরজার আড়ালে নিজে অদৃশ্য থাকিয়া নবাগতকে দেখিবার প্রয়াস করিলাম। আপনাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া তাঁহাকে দেখিবার তেমন সুবিধা হইতেছিল না—একবার এদিকে একবার ওদিকে ফেরাফেরি করিতে করিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কাণে যাইতে লাগিল, তখন দর্শন-কৌতূহল তিরোহিত হইয়া শ্রবণ-কৌতূহলে বাঁধা পড়িলাম। ভগিনীপতি ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াই মুহূর্ত্তের জন্য বিদায় লইয়া মক্কেলের সহিত দেখা করিতে গেলেন, দুইজনে একাকী হইবামাত্র ডাক্তার বলিলেন—

By the way I met Miss. K. just before leaving England. She seemed very anxious to know whether you had arrived safely and why you had not sent her the money you promised for her passage out to India. You know her people will have noting to do with her since her engagement to you, so the poor girl—

আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, দেয়ালে ঠেস দিয়া আমি প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিনি। Nonsense, there was never any formal engagement between us. I thought that affair was over and done with long ago. For goodness' sake, don't bring up before any body here—all my friends would think I was a villian of the deepest dye.

ডাক্তার। And what else do you make yourself out to be? Do you think it is very honourable conduct to forsake a helpless girl who has trusted you implicitly? Before God you are man and wife"—

ইহার পর আর কিছুই জানি না, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

A NARROW ESCAPE.

অথবা

দগ্ধ কচু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"

আমি অবাক্ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। রাঙ্গাদিদি গলা ছাড়িয়া অত্রাসে অসম্ভ্রমে বিশ্বস্ত হৃদয়ে গান ধরিয়াছিলেন। বাড়ীর পুরুষেরা সকলেই স্থানান্তরে গিয়াছিল। আমি চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়া গোপনে শুনিতে লাগিলাম—

"ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল-খেলা,
মধুর বহিছে বায়ু, ভেসে যাবে রঙ্গে"

মধুর সন্ধ্যাকাল; মধুর রমণীকণ্ঠে মধুর গীতি। আকাশে চাঁদ উঠিল। দেবকন্যা জ্যোৎস্না রাঙ্গাদিদির গলার সাড়া পাইয়া বাতায়নে পা রাখিয়া নীরবে নিঃশব্দে আমার কাছে আসিয়া হাসিতে লাগিল।

গানটি সমাপ্ত হইলে আমি সহাস্যে যবনিকা তুলিয়া রাঙ্গাদিদির অন্দরমহলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আর বলিলাম "বা ঠান্‌দিদি—তুমি বেশ গাও।"

রাঙ্গাদিদি লজ্জিত হইয়া বলিলেন "ওমা কি হইবে গো! নাত্‌জামাই যে—"

আমি বলিলাম "তা—লজ্জা কি দিদি? তুমি

"উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা"

রাঙ্গাদিদি হাসিয়া বলিলেন "সে আবার কি?"

আমি মনোহর "চিত্রা" কাব্যের "ঊর্ব্বশী" নামক মনোহারিণী কবিতার কিয়দংশ আবৃত্তি করিয়া বলিলাম,—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি,
কবে তুমি ফুটিলে ঊর্ব্বশি!
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "আমি ঊর্ব্বশী হ'তে যাব কেন গা? আমাদের "অনঙ্গ" হচ্ছে ঊর্ব্বশী। তোমার শালিরা, তোমার শালাজেরা হচ্ছে ঊর্ব্বশী [N. B. আমার গৃহিণীটির নাম অনঙ্গমঞ্জরী]

আমি বলিলাম "রাঙ্গাদিদি—তবে 'ত স্বর্গ খালি হয়ে গেছে দেখ্‌চি; ইন্দ্র বেচারি বড় মুস্কিলেই পড়ে থাকবে।"

আমার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে সত্য সত্যই অমরাবতী শূন্য করিয়া আমার পাঁচ শালী ও পাঁচ শালাজ—দশটি অনিন্দ্যসুন্দরী—রাঙ্গাদিদির মহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাঙ্গাদিদি আদর করিয়া তাহাদিগকে "দশমহাবিদ্যা" বলিয়া ডাকিতেন। [আমার গৃহিণীটিকে "বিদ্যা" বলিয়া ডাকিতেন]

উহারা যখনই সরল অপাঙ্গভঙ্গিতে, সহজ গ্রীবাভঙ্গীতে, প্রতি মুহূর্ত্তে উপচিত-নব-নব-সৌন্দর্য্যে, আমার চতুর্দ্দিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইতে ছুটাইতে, আমার সমীপে আসে, তখনই আমার কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত আকালিক বসন্তোদয় ও "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" উপমাটি মনে পড়িয়া যায়।

অপি চ; আমার বিবেচনায় এক একটি সুন্দরী এক একটি অনাবিষ্কৃত মল্লিনাথ (হে যুবা পাঠক, তুমি হাসিও না—আমার মত প্রৌঢ় হইলে তুমিও বুঝিতে পারিবে যে একথাটি মহাসত্য)। আমি যখনই কোন অনিন্দ্যসুন্দরীর সাক্ষাৎলাভ করি তখনই তাঁহাকে "some mute inglorious Mallinath" ভাবিয়া মনে মনে টমাশ্ গ্রে কবির সহস্রমুখে প্রশংসা করি। যে কবি লিখিয়াছেন

"যাদুকরি, তুই এলি;
অমনি দিলাম ফেলি
টীকাভাষ্য; তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
"বিদ্যাপতি" "মেঘদূত" সব বোঝা যায়;
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্ত্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?"

সেই কবির হৃদয়ে প্রতিভার আলোক না থাকুক্, ভুয়োদর্শিতার আলোক যথেষ্ট আছে—তিনি চক্ষুষ্মান।

শ্রীমান কমলাকান্ত বলিয়াছেন "অনিদ্রারোগের মহৌষধি—তাঁহার দফ্‌তর।" আমিও তাঁহার দেখাদেখি amateur ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছি (তবে আজ পর্য্যন্ত

Homœopathic box containing twelve principal medicines কিনি নাই)। আমি নিজের উপর বহুবার পরীক্ষা করিয়া ও অপর বহুলোকের case আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সকল প্রকার ঔদাস্যরোগের specific অব্যর্থ মহৌষধি,—দুইদিন মাত্র শ্বশুর বাড়িতে অবস্থিতি! তুমি হাজার মনের কষ্টে থাক, শালিশালাজের অকৃত্রিম বাক্য কৌতুকে তোমাকে মুগ্ধ হইতেই হইবে!

"সদা হাসি রঙ্গ, কৌতুক তরঙ্গ,
Lovely শালি and loving শালাজ!
নাহি তব ছল, নাহি তব ব্যাজ।
When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou!"

এই ঔষধিটি এমনি আশু ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ যে আপনি হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন না। (কিন্তু গল্পটি অত্যন্ত authentic) যে, সেদিন, আমার বুড়া গাঙ্গুলি ঠাকুরদাদা (আমার গ্রামসুবাদে ঠাকুরদাদা) প্রেমারায় অনেকগুলি টাকা হারিয়া "শরীর ও মন সারিতে" শ্বশুর-বাড়ি গিয়াছিলেন, আর যখন বাড়িতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন একেবারে চাঙ্গা! বুড়ার মুখে হাসি ধরে না! বুড়ার বয়স সপ্ততির ঊর্দ্ধে কিন্তু যখন Nature's Hospital হইতে ফিরিয়া আসিয়া সহাস্যে সবিক্রমে স্বহস্তে আপনার portmanteauটি তুলিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন তখন আমার বোধ হইতে লাগিল যেন Young Romeo সহর্ষে সদর্পে প্রাচীর পার হইয়া বাতায়নের দিকে উঠিতেছে!

বুড়া আহ্লাদে আট্খানা। শালি শালাজের ব্যঙ্গ ঠাট্টা তামাসার ইতিহাস যথাক্রমে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল! আর সহাস্যে গদগদ কণ্ঠে বলিল "দেখ নাতি—ছুঁড়ি কি দুষ্ট আমার টিকি কাটিয়া লইয়াছে" (N.B. যে রমণীরত্নটিকে গাঙ্গুলি মহাশয় "ছুঁড়ি" বলিয়া নেপথ্যে সপ্রেম অভিবাদন করিলেন তাহার বয়েস ষাটের উপর)। আমি বুড়ার আনন্দে অতিশয় আনন্দিত হইলাম কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম বুড়া completely cured। বাস্তবিক শালিশালাজের আমোদকৌতুক এক প্রকার Elixir of life। মধ্যে মধ্যে শ্বশুর-বাড়িতে যাওয়া আর mineral springsএ গিয়া স্নান করা একই কথা!

আমি ঠাকুরদাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "দাদা মহাশয়, তোমার শালিশালাজেরা কি দফ্তরি?"

ঠাকুরদাদা মহাশয় নব্য ছোক্রার মত হাসিয়া বলিলেন "সে কি রকম?"

আমি বলিলাম "দাদা—একদা আমার বটতলার অতিজীর্ণ অতিশীর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ খানিকে জীর্ণসংস্কারের জন্য দফ্তরির হস্তে সমর্পণ করি। দফ্তরি তাহাকে ইংরাজি gilt মরোক্কো মলাটে সুশোভিত করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দেয়। আমি দেখ্‌ছি শালিশালাজের হাতে পড়ে তোমারও সেইরূপ হইয়াছে।"

বৃদ্ধটি আমার ব্যঙ্গের অর্থ সম্যক সংগ্রহ করিতে না পারিয়া "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল। জগৎ তখন বৃদ্ধের চক্ষে অতি সুন্দর, অতি মনোহর, "নব রে নব নিতুই নব" বোধ হইতেছিল। কাজেই সে আমার ব্যঙ্গের মধ্যে খাটি মজা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ Ovid's metamorphosis, এইরূপ যযাতির যৌবনপ্রাপ্তি গৃহে গৃহে প্রতিদিন হইয়া থাকে। এই মহাতত্ত্বটি মহাকবি কালিদাস রূপকের ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরে মহাশয়, ঐ যে কুমারের তৃতীয় সর্গে বসন্তের আবির্ভাবের বর্ণনা আছে তা কি সত্য সত্যই অসময়ে বসন্তের উদয় হইয়াছিল? তাহা নহে। উদাসী মহাদেব ভাবী শ্বশুর-বাড়িতে—হিমাচলে—গিয়া, শান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাটি মহাকবি রূপকের আবরণে গোপন করিয়াছেন। True art consists in concealing art।

* * *

শালি শালাজ এবং কোম্পানিকে দেখিয়া আমি কল্পনা-অশ্বিনীর রাশ ছাড়িয়া দিলাম। বড়বা সুন্দরী অবিরাম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, কামরূপী উচ্চৈঃশ্রবার মত, গ্রীক্ কবি বর্ণিত ডল্‌ফিনের মত, প্রতিমুহূর্ত্তে লাল নীল সবুজ কতই বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। আমি আমার চতুর্দ্দিকে রসেলিণ্ড, বিএট্রিস, প্রিন্সেস্, চিত্রাঙ্গদা, মালতী, মেনকা, তিলোত্তমা, ডেস্‌ডিমোনা, আয়েষা, রেবেকা, রৌয়েনা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা দেখিতে লাগিলাম। অর্জ্জুনের মত আমিও যেন ইন্দ্রালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়াছি।

তাহারা সকলেই ঐকতানিক কণ্ঠে বলিল "মেঘনাদ বাবু এ বড় অন্যায়—আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়!"

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন "নাত্‌জামাই, আমাদের ভোলো তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু প্রমীলা বেচারি কি দোষ করেছে?"

আমার পঞ্চশালাজের মধ্যে এক জন বিদুষী ছিলেন। তিনি যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও চাণক্যশ্লোকগুলি আগাগোড়া তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; এই জন্য তাঁহাকে আমি "পণ্ডিত মহাশয়" বলিয়া ডাকিতাম। তিনি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শকুন্তলার আঙ্গুলে আপনি যে আংটিটি দিয়াছিলেন তাহা অপ্সরাতীর্থে স্নানের সময়ে পড়িয়া যায় নাই। আর এ তপোবনে দুর্ব্বাসাও আসে নাই। তবে মহারাজের বিস্মৃতির কারণ কি?"

আমি এতগুলি joint chargeএ অভিযুক্ত হইয়া বমালধৃত চোরের মত ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলাম—

"অপরাধ স্বীকার করচি, মাপ করুন।" তখন volunteer regimentটি ও তাহার কাপ্তেন শ্রীমতী রাঙ্গাদিদি সকৌতুকে মৃদু মৃদু গুঞ্জনস্বরে আমার অজ্ঞাতসারে কি বলাবলি করিতে লাগিল। যখন পরামর্শ স্থির হইল তখন রাঙ্গাদিদি প্রকাশ্যে বলিলেন—

"দেখ নাতজামাই! আমাদের সকলের এই মত যে তুমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। কিন্তু যেহেতু তুমি আমাদের আপনার লোক ও তোমাকে আমরা বড়ই ভালবাসি, এই জন্য তোমার গুরু পাপে লঘু দণ্ড হইবে।"

আমি সকৌতুকে বলিলাম "আজ্ঞা করুন্।" তখন বড় শালাজ বলিলেন "আগে শপথ করুন্ আমরা যাহা বলিব তাহাই করিবেন।"

বড় শালি সহাস্যে বলিলেন "তিন্ সত্যি করুন্।"

আমি উত্তর করিলাম "এ মন্দ বিচার নয়! আপনারা যখন বিচারকর্ত্রী তখন আমার কাছে তিন সত্যি আদায় করা কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় প্রস্ফুটিত ঝুমুকাসুন্দরীর মত কর্ণের অবতংশ ঈষৎ দোলাইয়া সগম্ভীরে বলিলেন "ভ্রাতঃ এ রাজ্যে এইরূপই বিচারপদ্ধতি।"

ইংরাজিতে যাহাকে misnomer বলে, সুন্দরীকে "গৌরী" বলাও তাই—প্রকৃত নামের অপলাপ করা। আমার বিবেচনায় এক একটি সুন্দরী এক একটি "গোরা" বিশেষ। তাহাদের সহিত বাক্য-মল্ল-যুদ্ধে হার মানিতেই হয়। অতএব speech is silvern but silence is golden এই ঋষি-বাক্যটি স্মরণ করিয়া "তাহাই করিব, করিব, করিব" বলিয়া এক নিশ্বাসে তিন সত্যি করিয়া ফেলিলাম।

"অবাক্ আর কি! তিন সত্যি করবার রকম দেখ" এই বলিয়া সেই বিজয়িনী সেনা হাসিয়া উঠিল। আমিও শ্বশুরবাড়িতে হাসিবার উদ্দেশেই আসিয়াছিলাম—সুযোগ বুঝিয়া যথাসাধ্য হাসিয়া লইলাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন রাঙ্গাদিদি বলিলেন "নাতজামাই, আমাদের সকলেরি এই মত যে যদি তুমি দুই চারিটা গান গাও, তাহা হইলে তোমার অপরাধ মাপ।"

আমি দণ্ড শুনিয়া অবাক, হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত। সেসন্ জজের মুখে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা শুনিয়া অপরাধী ব্যক্তি বোধ করি এতদূর ম্রিয়মাণ হয় না।

আমি সাগ্রহে বলিলাম "রাঙ্গাদিদি, আর যে কোন শাস্তি দাও—আমি সব সহ্য করতে পারি। ঐটি আমার দ্বারা হবে না। এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড"

আমার ছোট শালিটি (আমার স্ত্রীর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা) ভারি দুষ্ট। সে যখন কথা কয়, বিরিশি শিক্কা ওজনের কথা কয়, সে বলিল—

"তবে গানের বদলে নাচ।"

আমি বলিলাম "বোন্, নাচ্‌বার আর বাকি কি? তোমরা তো ওঠ্ বোস্ করাচ্ছ।"

আমি অনেক কাকুতি মিনতি সাধ্য সাধনা করিলাম। বৃথা! বৃথা! এ যেন court martial হুকুম! নিয়তির ন্যায় অচল অটল।

আমার তৃতীয়া শালিটি কিছু কবিতাপ্রিয়। তিনি বলিলেন—

"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

আমি রাঙ্গাদিদির কাছে Highest Appellate Court ভাবিয়া আপীল করিলাম। কিন্তু আমার আপিলটি appeal from Phillip drunk to Phillip soberএর মত তৎক্ষণাৎ নামঞ্জুর হইল। আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম—

"রাঙ্গাদিদি, আবার কি বাসর এল যে রাত জেগে গান গাইতে হবে।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "নাতজামাই—তুমি সুরসিক হয়ে আজ এই সৃষ্টিছাড়া কথা কেন বলছ? এতগুলি সুন্দরী যেখানে, এমন সুপুরুষ যেখানে, সেখানে বাসর নয় 'ত কি? এ যে চাঁদের হাট!" আমার বড় শালাজ হাসিয়া আকুল হইলেন ও বলিলেন "ওমা—তাই বল্‌তে হয় আগে—উনি সত্যিকার বাসর চান! অনঙ্গ, অনঙ্গ, ইদিকে আয় তো। তুই না এলে মেঘনাদ বাবু গান গাবেন না!"

আমার গৃহিণী শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী দাসী কপাটের আড়ালে বসিয়া সব কথা শুনিতেছিল। এইরূপে আহূত হইয়া ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে সবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমার ছোট শালিটি "ধর ধর চোর পালায়" বলিয়া উক্ত শ্রীমতীর পশ্চাতে ছুটিল।

তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "রাঙ্গাদিদি, অনঙ্গ অথবা পূর্ণশশধরকে অস্তাচল-চূড়া হ'তে ধরিয়া আন। আমাদের মধ্যে একজনও সুধাংশু নেই চাঁদের হাট হবে কেমন করে? এক চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণৈরপি—জান 'ত রাঙ্গাদিদি?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে রাঙ্গাদিদিই এই অদ্ভুত শাস্তির সৃষ্টিকর্ত্রী। চিকের আড়ালে থাকিয়া আমি তাঁহার গান যে গোপনে শুনিয়াছিলাম তাহাতেই মধুরে বিষমে মিলিয়া এই প্রতিহিংসার উৎপত্তি। সুপণ্ডিত বেকনের সেই লোক-বিশ্রুত মহাবাক্যটি হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম করিলাম—"Revenge is a sort of wild justice।" সঙ্গীতের ধাতু পাঠ দূরে থাকুক্ আমি স্বর সন্ধি পর্য্যন্ত জানি না—আমার কাছে গান আদায়ের চেষ্টা! প্রস্তাবটা কতকটা Utopian আর কতকটা Bœotian গোচের; ইহাতে উদ্যানের কোমলতা নাই, —জঙ্গুলে ধরণের!

যাহা হউক্ Courtship স্বয়ম্বরার নায়িকার মত বহুবার "না—না—না—না" করিয়া অবশেষে অস্ফুটস্বরে "আচ্ছা" বলিতে হইল। Saying "I will never consent, I at last consented!"

তখন সেই দশমহাবিদ্যার মধ্যে হাসির তরঙ্গ ছুটিল। সকলেই মহাখুসি!

আমার চতুর্থা শালিটি বলিল, "মেঘনাদ বাবু, আপনার এ বিকট কটমট নাম কে রাখিল? আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল—গোপাল।"

আমি হেঁয়ালিটির মর্ম্মোদ্ভেদে অক্ষম হইয়া বলিলাম "কেন ?"

পূর্ব্বোক্তা সুন্দরী কৌতুকরঞ্জিত নেত্রে বলিল "গোপাল বড় সুবোধ ; সে যাহা পায় তাহাই খায় ; আরো দাও বলিয়া আব্দার করে না। তাহাকে যে গানটা গাইতে ফরমাশ্ করা সেই গানটাই গায়। "এটা গাব না ওটা গাব না" বলিয়া বাঁকিয়া বসে না !"

আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা শালিটি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—

"বেণী বড় অনাবিষ্ট। ঐ অনঙ্গ ছুঁড়িটা হচ্ছে বেণী। তাকে এত বল্লাম "আয়, আয়," চুপ্টি করে বসে থাক্‌বি, আর কিছু কর্তে হবে না। ছুঁড়িটে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই এল না। আমার ভয় হচ্চে অনঙ্গের কুমন্ত্রণায় এই ভাল মানুষের অবতারটি বিগ্‌ড়ে না যান !"

দ্ব্যর্থ-বিশারদ পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া আকুল। প্রকাশ্যে বলিলেন "মন্দ বলিস্ নি প্রভা ঠাকুর ঝি—অনঙ্গের কুমন্ত্রণাই বটে !"

সুন্দরীর উচ্চহাস্য ও কঙ্কণবাদ্য এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। রজতে কনকে সুন্দর সমাবেশ হইল। সুর ও তাল বজায় রাখিবার জন্য আমিও হাসিতে লাগিলাম।

বহুকালপূর্ব্বে ভারতী পত্রিকায় "আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী" নামক একটি আজ্‌গুবি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম, ঘটনা-চক্রে পড়িয়া আমার আজ সেই কবিতাটির কয়েক ছত্র মনে পড়িয়া গেল।

"আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী,
নাগিনী, সাপিনী কেহ, কেহ বা যক্ষিনী !
একদা অশুভদিনে, ফুল্ল কায়ে, ফুল্ল মনে,
তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারিদিক্ হ'তে তারা, শ্লেষ বিদ্রূপের ধারা
মোর অসহায় মাথে বর্ষিল অমনি !
প্রদোষে বিহীন বাক্ তীরে ঘোরে চক্রবাক,
তাহারে আক্রমে যথা বিংশতি হংসিনী ;
নিকুঞ্জে পশিলে ভুলে, সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া হুলে
মৃগেরে আক্রমে যথা মধুকর শ্রেণী ;
একি হাসি ! একি রঙ্গ ! রণে আমি দিয়ে ভঙ্গ
কুরুক্ষেত্র হ'তে ভয়ে পলানু তখনি !"

তবে কি উক্ত কবিতার নায়কের মত আমিও সত্য সত্যই কুরুক্ষেত্র হইতে ভয়ে পলাইয়া গেলাম ? তাহা নহে। রাঙ্গাদিদির ও শালিগণের ও শালাজগণের সর্ব্ববাদী-সম্মতি-ক্রমে আমি তিন ঘণ্টার জন্য অব্যাহতি পাইলাম। এই স্থির হইল যে জলযোগান্তে ও আহারান্তে রাত্রি দশটার সময়ে আমাকে অনেকগুলি গান গাহিতেই হইবে। আমি বলিলাম "তথাস্তু।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কোন কোন চঞ্চল অপরিণামদর্শী পাঠক হয় 'ত বলিতেছেন "এমন শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া ঝকমারি !"

ভ্রাতঃ—আরও কিছুদিন যাক্—বড় হও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে জগতে খাটি স্বচ্ছ অবিচ্ছিন্ন সুখ পাইবার পূর্ব্বে খানিকটা বরদাস্ত-শিক্ষা আবশ্যক। অত ব্যস্তবাগীশ হইলে চলিবে কেন ? আমি পরখ করিয়া দেখিয়াছি যে যাহারা অতি মাত্রায় তাড়াতাড়ি করে তাহারাই train-fail হয়।

সৌভাগ্যক্রমে আমি বাল্যকাল হইতেই সৎশিক্ষা পাইয়াছিলাম। যখন সন্ধ্যাকালে পিশিমা ইলিশ্‌মাছ ভাজিতে আরম্ভ করিতেন তখন ভুলু, চন্টু, হারু প্রভৃতি আমার সমবয়স্ক বালকেরা "কোলের মাছ দাও, কোলের মাছ দাও" বলিয়া তার-স্বরে চীৎকার করিত কিন্তু কাঁটার ভয়ে কেহ গাদার দিকে অগ্রসর হইত না। আমি কোলের মাছ শেষ করিয়া, দুই তিনটি গাদার মাছ অম্লানবদনে পার করিতাম এবং জেদ্ করিয়া (বাড়ি শুদ্ধ লোক একদিকে আর আমি আর দিকে) ইলিশ্‌মৎস্যের মুণ্ডটি ভর্জ্জিত অবস্থাতেই নিঃশঙ্কচিত্তে, অসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে, দ্বিতীয় মহর্ষি চার্ব্বাকের মত, উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিতাম। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে ক্ষুদ্র শিশু নিদ্রিত হইলে—

"জননী যেমন
তাড়ান্ মশক-বৃন্দে কর সঞ্চালনে"

তেমনি কোন মায়া-দেবী অদৃশ্য হইয়া আমাকেও রক্ষা করিতেন ও দেখিতেন—

"গলে না বিঁধিয়া যায় ইলিশের কাঁটা !"

দৈবাৎ কখনও এক আধটি কাঁটা বিঁধিত বটে কিন্তু আমি Mutins Scævolar মত যন্ত্রণা সহ্য করিতাম ও চাপিয়া রাখিতাম।

আমার বেশ্ মনে পড়ে, বাল্যকালে যখন বাড়িতে এক থাল মিষ্টান্ন আসিত, আমি হুড়্মুড়্ করিয়া সজোরে সেই থালার উপরে গিয়া পড়িতাম। আমার পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত শিলাবৃষ্টি পড়িত কিন্তু আমি অচল অটল হইয়া মিষ্টান্ন খাইতাম। আমি বাল্যকালেই এই গূঢ় রহস্যটি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে অতিশয় সুখ পাইতে হইলে কিছু বরদাস্ত করা আবশ্যক।

আমার মাতামহ মহাশয় (তিনি সেকালের senior scholar ছিলেন) এই সব বাল্য বীরপণা দেখিয়া আমাকে আদর করিয়া "young Hercules" বলিয়া ডাকিতেন। বালক-মহলে আমার নাম ছিল "বীর মেঘনাদ।"

তোমরা কি কেহ মনে করিয়াছ অভিসারিকা রাধিকা যখন কুঞ্জবনে যাইতেন তিনি সঙ্গে করিয়া "মশারি" লইয়া যাইতেন ? জঙ্গলে কাট্‌খোট্টা মশকবৃন্দ বিরহিণী রাধিকাকে কঠোর

দংশন করিত। নির্ব্বাক্ নিঃশব্দে বেচারি সব সহ্য করিত, আর মশকবৃন্দাকীর্ণ কুঞ্জবনকে সম্বোধন করিয়া বলিত—

"তুমি হে আকাশ, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন"

তখন শ্রীহরি সদয় হইয়া গোপিনীকে দেখা দিতেন। কে না জানে রাধিকার মত সুখী আজ পর্য্যন্ত কেহ হয় নাই? তাঁহার বরদাস্ত করিবার ক্ষমতা অসীম ছিল।

খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার Mr. X.————গল্প করেন "আমার secret of success—কি তা জান? আমি ভারি patient—সহ্যশক্তির অবতার বলিলেই হয়। হিন্দুস্থানি মক্কেলেরা ভারি dirty—তাহাদিগকে নিকটে বসান অসভ্যতা, তাহাদিগের সহিত কথা কহা অসভ্যতা ও তাহাদের গাত্রে এমনি দুর্গন্ধ যে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি Medical Collegeএর কোন First Year Student তাহাদের কাছ হইতে নিশ্চয়ই পলাইতে বাধ্য। কিন্তু আমি সবিশেষ জানিতাম "এক একটি moving chest of gold।" তাহারা দেখায় "বড় গরিব" ও বলে "সঙ্গে করিয়া কেবল মাত্র পাঁচটি টাকা আনিয়াছি।" আমি নাকে rose-scent দিয়া তাহাদিগকে বসাই, "মেজাজ সরিফ" জিজ্ঞাসা করি আর বলি "পাগ্ড়ি খোলিয়ে"—পাগ্ড়ির মধ্যে পঞ্চাশ টাকা!—"জুতা খোলিয়ে"—জুতার মধ্যেও টাকা and so on—Patience was my creed and I am a rich man now!"

* * *

মশক-শূন্য, কণ্টক-শূন্য, rose-scent-পূর্ণ শ্বশুর বাড়ি! মর্ত্তে কৈলাসধাম,—অলকা—অমরাবতী—বৈকুণ্ঠ! কে তোমায় অবজ্ঞা করে?

হে শ্বশুরবাড়ি!

"কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রচিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী!"

যাহারা সহজবুদ্ধিতে (intuitively) তোমার মাহাত্ম্য না বুঝিতে পারিল সেই কৃপাপাত্রদিগের জন্য এতগুলি নজির বৃথায় আহরণ করিয়াছি!

মধু আর পুষ্প, পুষ্প আর মধু! একটু আধটু দংশন থাকিলে কি হয়? মধুকরী কল্পনার মত এই বঙ্গে শালি ও শালাজেরা গুণ গুণ গুণ গুণ স্বরে মধুচক্র রচনা করে—

"গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি!"

ক্রমশঃ

শ্রীমেঘনাদ শত্রু, এম এ।*

* হো! হো! হো! শত্রু!—এমন সৃষ্টিছাড়া পদবী কস্মিন্‌কালে শোনা যায় নাই! পাঠক, এ কথাটা

আমি স্বীকার করি; কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করি—অত হাসিবেন না। আমার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই জানে—আমার আসল নামটা হচ্চে "শ্রীমেঘনাদ মিত্র"। দৈব-নির্ব্বন্ধে (কতকটা আমার দোষ, কতকটা গ্রহের দোষ)—সে ইতিহাসটা শুনিলে আপনার চক্ষে জলও আসিবে ও ওষ্ঠে হাসিও আসিবে—আমার পদবী পরিবর্ত্তন হইল। অবশ্য এমন সচরাচর দেখা যায় যে কুমারী শ্রীমতী বিনোদিনী দত্ত ও কুমারী শ্রীমতী সরসীবালা কর হঠাৎ পরিণীতা হইয়াই শ্রীমতী বিনোদিনী বটব্যাল ও শ্রীমতী সরসীবালা গড়্‌গড়ি হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাও স্বীকার্য্য যে ভার্য্যা-পরিগ্রহণে পুরুষের পদবী পরিবর্ত্তনের নিয়ম সুদূর (অথবা অদূর!) ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। কিন্তু কে কবে—এমন আজগুবি পদবী-পদচ্যুতির কথা শুনিয়াছে?

আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া, কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক University Calendar খানা খুলিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে যে স্থলে অক্ষরের পর্য্যায় ক্রমে (alphabetical orderএ) গ্র্যাজুয়েট্‌দিগের নামাবলী লিপিবদ্ধ আছে, সে স্থলে, "শত্রু"র কোটায়, একা আমি, একান্ত মহিমায়, মেঘনাদ শত্রু, এম, এ, হইয়া বসিয়া আছি! সত্য বটে, Truth is stranger than fiction।

যখন প্রথমে আমার পদবী-পরিবর্ত্তন হয় তখন আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবর্ষমাত্র। এণ্ট্রেন্‌শ ক্লাশে পাঠ করি English, Mathematics, দুষ্টামি, জ্যাঠামি, History ও Geography, সকল বিষয়েই আমি dux of the class ছিলাম।

একদা অশুভক্ষণে একটি নূতন বালক আমাদের ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে আসিল। খুব চালাক চতুর smart চোকে নাকে মুখে কথা কয়; কিন্তু তাহাকে দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না। চেহারা খানা ঠিক্ pictorial editionএর Pickwickএর মত। আমি বলিলাম—

"Good morning, Mr. Pickwick."

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তখন class inspect করিবার জন্য নিচের তলায় গিয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া ক্লাশশুদ্ধ ছেলেরা হাসিয়া উঠিল।

নবাগত বালকটি কিছু সপ্রতিভ। আমার অপূর্ব্ব সম্ভাষণ শুনিয়া সহাস্যে বলিল—

"আমি ভারি মোটা—তাই বুঝি মশায় হাস্‌চেন। তবু আমি আমার মার আটাশে ছেলে!"

আমি বলিলাম "বলেন কি মশায়? তবে 'ত দেখচি আমরা সকলেই বিনা গর্ভবাসে ভূমিষ্ঠ।"

ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে হাস্‌তে হাস্‌তে দম আট্‌কে যায় আর কি! আমি তখন হাস্যবন্ধ করিয়া, শিষ্টাচার করিয়া, নবাগত বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মশায়ের নাম?"

উত্তর। শ্রীগোবিন্দলাল মাসচটক"

পদবীটা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমার স্কন্ধে ভূত চাপিয়াছিল। সম্মুখে, হেড্‌মাষ্টারের টেব্‌লে Attendance Register রাখা ছিল। আমি তাহা খুলিয়া roll অনুযায়ী বালকদের নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম।

"Ram Chandra Zero"
রামচন্দ্র হাততালি দিয়া উত্তর দিল "Present"
"সতীশচন্দ্র fraction"
উত্তর "Present"
"বিপিন বিহারী decimal"
উত্তর "Present"

"পঞ্চানন one third"
উত্তর। "Present"
"সুরেন্দ্রনাথ skeleton"
উত্তর "Present"
"মেঘনাদ মূলে হাবাৎ"
আমি স্বাভাবিক স্বরে বলিলাম "Present"
"গোবিন্দলাল মাঁস্চটক"

নবাগত গোবিন্দলাল তখন ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ও বেচারি তখনও ভর্ত্তি হয় নাই—সে কোন উত্তর না দিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। কিন্তু ছেলেরা হাসিতে হাসিতে কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিকানা নাই। আমাদের হাসির গর্‌রা বায়ুর তরঙ্গে আরোহণ করিয়া নিচের তলায় গিয়া হেড্ মাষ্টারের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্ষুলাল! বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি! আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনও টেব্‌লের নিকটে দাঁড়াইয়া—সকলেই বাক্‌শূন্য!

আপনারা সকলেই বোধ করি সবিশেষ অবগত আছেন যে প্রতি ক্লাশে ঘরের শত্রু বিভীষণ প্রকৃতির দুই একটি বালক থাকে। হেড মাষ্টারের ধমকে তাহারা inter regnum অবস্থায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত কথাই প্রকাশ করিল। হেডমাষ্টার আমাকে দুই টাকা ফাইন্ করিলেন ও সমস্ত বালককে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন

"দেখ, মেঘনাদ সকলের পদবী শুনে ঠাট্টা করে। আজ থেকে ও মেঘনাদ মিত্র নয়—ও মেঘনাদ শত্রু। আমি ক্লাশের roll ডাক্‌বার সময়ে ওকে "মেঘনাদ শত্রু" বলে ডাক্‌ব।"

মশায়—যা বলা তাই করা। হেডমাষ্টারের দেখাদেখি স্কুলে সকলেই আমাকে "শত্রু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আমি জগৎশুদ্ধ লোকের শত্রু হইয়া পড়িলাম। ত্যক্ত বিরক্ত, ঝালাপালা হইয়া আমি অশুভমুহূর্ত্তে Examination fee পাঠাইবার সময়ে, Form fill up করিবার দিনে, নামের স্থলে—সয়তানের প্ররোচনায় —মেঘনাদ মিত্র না লিখিয়া, লিখিলাম "Meghnath Sattru।"

Fees পাঠাইবার সময়ে আমার এ দুষ্টামি হেডমাষ্টার মহাশয় সারিয়া লন নাই। বোধ করি oversight হইয়াছিল। কিন্তু হরি! হরি! একি হইল? Gazette আসিল; আমি ক্ল্যাশের first boy—আমার নাম খুঁজিরা পাওয়া যায় না! অবশেষে বহু অন্বেষণের পর প্রথম শ্রেণীতে "Sattru"র কোটায় আমার নাম বাহির হইল "Meghnath Sattru।"

তাহার পর First Arts, B. A. ও M. A. পরীক্ষাতেও আমাকে আমার আন্তরিক অনিচ্ছাসত্বেও ঐ নামই বজায় রাখিতে হইল। আমি University authoritiesদিগকে move করিব কি না এ বিষয়ে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার Mr. Bonerji'র পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—

"না বাপু; তোমার নূতন নামটি Factum Valet."

শ্রীমেঘনাদ শত্রু, এম. এ.

সেকালের নাজীর।

রামনগরে যখন প্রথম মুন্সেফী চৌকী স্থাপিত হয়, সেই সময়ে গোপীনাথ সরকার অনেক যোগাড় মন্ত্র করিয়া সেই আদালতের নাজীরিপদটি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে একবারও কোথাও বদলী হইতে হয় নাই। গোপীনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু দেনদারগণের মালপত্র ক্রোক করিবার সময় কাহারো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম উপলক্ষে, কিম্বা পেয়াদাদিগকে চিঠিপত্র হাওলা বাবদ, দুশো একশ হইতে টাকাটা সিকেটা—ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন উৎকোচই তিনি পরিত্যাগ করিতেন না, এমন কি, শিকি পয়সাটী পর্য্যন্ত তিনি সমান সহিষ্ণুতার সহিত অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেন; অথচ সে সময় মুখের যে ভাবখানা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে উৎকোচদাতাগণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অনুগৃহীত বোধ করিত, যেন তিনি তাহাদের নিকট দুপয়সা খাইয়া তাহাদিগকে চিরবাধিত করিলেন। "হরি হে তোমারই ইচ্ছা"—বলিয়া গোপীনাথ যখন উৎকোচলব্ধ টাকা পয়সাগুলি করচে গুঁজিতেন; তখন সহজেই মনে হইত উৎকোচগ্রহণজনিত পাপটুকু তিনি পরম বিশ্বস্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদনপূর্ব্বক তাহার সুবিধাটুকু নিজের জন্য রাখিয়া দিলেন।

একালের মুন্সেফী আদালতের আমলার সঙ্গে সেকালের আমলা গোপীনাথের অনেক প্রভেদ ছিল। একালে আমলাদের উপরি পাওনা অনেকস্থলেই একেবারে নাই, কিন্তু ঘুষখোর নামটি পুরামাত্রায় আছে। মুন্সেফী আমলাদের মধ্যে একালে যাহা কিছু পাওনা, তা নাজীর ও ডিক্রিজারীর মুহুরীরই আছে, কোন কোন স্থানের সেরেস্তাদারেরা দু দশ টাকা পাইয়া থাকেন, কিন্তু সেই সামান্য প্রাপ্য আদায় করিতে একালের আমলাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়; তাই একটু অবসর পাইলেই তাঁহারা তাগাদায় বাহির হন, বিশেষতঃ রবিবারের সকাল বেলাটা উকীল ও মক্কেল-বাড়ীতে মধুসঞ্চয় করিতেই কাটিয়া যায়। মধুচক্র অনেক কিন্তু মধুর পরিমাণ বড় কম, কোন কোন স্থানে মৌমাছির হুলের আঘাতও যে সহ্য করিতে না হয় তাহা নহে; আমলাদিগকে মক্কেলবাড়ী গিয়া দু পয়সার লোভে বিলক্ষণ দশকথা শুনিতে হয়, কিন্তু পনেরো বিশ টাকার চাকরী করিয়া বৃহৎ পরিবার চালান কঠিন সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রশান্তভাবে সেই দশকথা পরিপাক করিতে হয়। আগে কিন্তু এমন ছিল না; তখন আমলারা ঘরে বসিয়াই টাকা পাইতেন, এতই টাকা পাইতেন যে, বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিয়াও অনেক টাকা বাজে খরচে ব্যয় করিতেন, এবং এই বাজে খরচের উপর তাঁহাদের মানসম্ভ্রম ও আর্থিক খ্যাতি নির্ভর করিত। সেকালের আমলাদের এই প্রকার অতিরিক্ত পরিমাণে 'উপরি পাওনার' কারণ নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন নহে। সেকালে সাধারণের সঙ্গে আইনের এত পরিচয় ছিল না, তদ্ভিন্ন আদালতের অনেক কাজেই আমলার হাত ছিল। একালে বড় বড় আমলার উপরও হাকিমের কিছুমাত্র

বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না, তদ্ভিন্ন এখন লোকে কথায় কথায় হাকিমের কাছে যায়,
কোন কাজে আমলাদের অমনোযোগ দেখিলে তাহা অবিলম্বে হাকিমের কর্ণগোচর করে;
কিন্তু সেকালে উকীলেরা পর্য্যন্ত হাকিমদিগকে দুর্ল্লভ জগতের কোন রহস্যময় জীব বলিয়া
মনে করিতেন, বিশেষ আবশ্যকীয় কথা ভিন্ন কোন কথা তাঁহাদের কাণে তুলিতে অত্যন্ত
সাহসী উকীলেরও সাহস হইত না, সুতরাং আমলাকে হাতে রাখাই সকলে অবশ্যকর্ত্তব্য
বলিয়া মনে করিত; লোকের অবস্থাও ভাল ছিল, কার্য্যোদ্ধারের আশায় তাহারা এক টাকার
স্থানে দুই টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। একালে আমলার নাম করিয়া উকীল মোক্তা-
রেরা যে কিছু রজতমুদ্রাগ্রহণ করেন, অধিকাংশ সময় তাহা জমাখরচের খাতায় আমলাবর্গের
নামে খরচভুক্ত হইলেও তাহাদের হস্তগত হয় না, তাই একালের একজন আমলা একদিন
দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন "আমিও ভেক্ নিলাম দেশেও আকাল হলো।"

কিন্তু বৃদ্ধ গোপীনাথ সরকার অতি সুসময়েই নাজীরি করিয়া গিয়াছেন। এ সমস্ত
আর্থিক অসুবিধা তাঁহাকে একদিনও ভোগ করিতে হয় নাই, উপরি আদায়ের জন্য তিনি
কোনদিনই মক্কেলবাড়ী ঘুরেন নাই, মুন্সেফী আদালতের ছোটবড় সকল উকীলই তাঁহার
হাতধরা ছিল, বিশেষতঃ উকীল সরকার গোবিন্দ নিয়োগীর সঙ্গে তাঁহার হরিহরআত্মা
ছিল। তিনি যে কয়েকটি টাকা বেতন পাইতেন, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ব্যয় আজি
কালিকার দিনে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন কিন্তু তখনকার কালে সকল জিনিষই সুলভ ছিল,
তাহার উপর গোপীনাথের পরিবারে সাধারণতঃ অশনবসনের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে
অধিক টাকা খরচ হইত না, বেতন ও উপরি পাওনার দরুণ অনেক টাকা তাঁহার ভবিষ্যৎ
বিপদের সম্বল এবং দরিদ্র অধমর্ণের বন্ধনরজ্জুরূপে তাঁহার গৃহে সঞ্চিত হইত।

এত বড় নাজীরের বাড়ী হইলেও গোপীনাথের বাড়ীতে কোনপ্রকার ধূমধাম কি বাহুল্য
আয়োজন কিছু ছিল না। নদীর ধারে একখানি মেটেবাড়ী, তিন খানি পাঁচচালা ঘর, দুখানি
বাড়ীর ভিতর, একখানি বাহিরে; এতদ্ভিন্ন একখানি দোচালা পাকের ঘর, এক খানি ঢেঁকি
ঘর, ও বৈঠকখানার পাশে খানিকটে জায়গা বাঁশ দিয়া শক্ত করিয়া ঘেরা, মধ্যে একখানা
গোয়াল ঘর। তাহার সম্মুখে গোটা তিন চার পোড়ান মাটীর 'নাদা' মাটি দিয়া উঁচু করিয়া
বাঁধান, গাই বলদে তাহাতে জাবনা খায়। চাকরী ও মহাজনী ছাড়াও নাজীর মহাশয়ের
খাদাখানেক ভুঁই চাষ ছিল, এবং সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন মধ্যে তিনি তেজারতী করিতেন; ধান,
গম, ছোলা প্রভৃতি শস্য তিনি বাড়ীর বাহিরে দুই তিনটি গোলা বোঝাই করিয়া রাখিতেন,
কিন্তু তাঁহার চাকরী ভিন্ন তাঁহার মহাজনী, তেজারতী প্রভৃতি সমস্তের মালিক, তাঁহার
ভার্য্যা শ্রীমতী তিলকমঞ্জরী দাসী।

বাড়ীর ভিতর নাজীর মহাশয়ের শয়ন-গৃহখানির সাজসজ্জা কিছু বিচিত্র, একালে সর্ব্বত্র
তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। একেত সেই ঘরে বাতায়ন একটির অধিক নাই, তাহার
উপর তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং বহির্দ্দেশ হইতে 'মাটিঝাঁপা' দিয়া তাহা দেওয়ালের সহিত

বেমালুমভাবে লিপ্ত। গৃহাভ্যন্তরে বহু দ্রব্যসামগ্রী অগ্ন্যুৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৃহে
মাটিকোঠা পাতা, কোঠার উপরে উঠিবার জন্য ঘরের বারান্দা দিয়া মাটির সিঁড়ি। কোঠার
উপরে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিছু থাকে না, কিন্তু অনাবশ্যকীয় জিনিষের অভাব নাই,
কতকগুলি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড,—ছেঁড়া কাগজপত্র, নেকড়া এবং আরসুলা বোঝাই করা মান্ধা-
তার আমলের গোটাদুই পুরাণো বেতের ভাঙ্গা পেট্‌রা, গোটাকত ছাতির শিক, তিনটে
লোহার ভাঙ্গা খাঁচা একখানা মরচেপড়া আগাভাঙ্গা তলোয়ার, এক চেঙ্গাড়ি অপরিষ্কার
কালো বোতল এবং একডজন জীর্ণ, পুরাণো হাঁড়ি, নাজীর মহাশয়ের বিবাহ কি এমনি
কি একটা উৎসব উপলক্ষে এই হাঁড়িগুলিতে করিয়া গোয়ালারা দধির যোগান দিয়াছিল;
বলাবাহুল্য এই সকল জিনিষপূর্ণ দুষ্প্রবেশ্য মাটি-কোঠার উপর কাহারো আরোহিবার কোন
সম্ভাবনা ছিল না, কেবল গুরুমহাশয়ের সুগুরু চপেটাঘাত এবং বেত্রদণ্ড-ভয়ে ভীত মুন্সোজীর
মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র নন্দদুলাল সর্দ্দার পড়োর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য
মধ্যে মধ্যে অন্যের অনধ্যুষিত এই বিজন দুর্গে সমস্ত দিনমানের মত আশ্রয়গ্রহণ করিত,
এবং নিজের ও পরের বাড়ী হইতে অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত পাকাকলা, আম বেল, নারি-
কেল প্রভৃতি যে সকল সুরস ফল কোঁচড় পুরিয়া লইয়া আসিত, তাহাদের খোসা বা খোলা
এই মাটিকোঠার অন্ধকারপূর্ণ, আবর্জ্জনাময় প্রাঙ্গনে পতিত থাকিয়া সেই সুশীল সুবোধ
বালকটির অসাধারণ বিদ্যানুরাগ ও রসগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিত।

গোপীনাথের শয়ন-ঘরের দ্বারের দুই পাশে দুইখানি মাটিঝাঁপা হাঁসকলের দ্বারা আবদ্ধ
থাকিত, দৈবাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার উপর এই দুখানি
আঁটিয়া দিলেই নিরাপদ। ছককাটা চৌকাঠের উপর সিন্দূরের ময়ূর ও ফুল আঁকানো।
তাহার উপর অনেকখানি জায়গা লইয়া লাল ও সাদা আলিপনার অসম্ভব রকমের লতাপাতা
ফুল এবং পাখীর চিত্র। ঘরের মধ্যে একখানি মাইপোশপাতা, তাহার সঙ্গে বাক্স আঁটা,
এই বাক্সে গোপীনাথের যথাসর্ব্বস্ব সঞ্চিত থাকিত, তাহার উপর বিছানা পাতিয়া শয়নের
ব্যবস্থা করা হইত। সেকালে প্রত্যেক গৃহস্থের চৌকী তক্তপোষ প্রভৃতির সহিত এক একটা
গুপ্ত বাক্স সংযুক্ত থাকিত, নতুবা চোরের হাত হইতে টাকাকড়ি রক্ষা করা সহজ ছিল না,
অনেক সময় চৌকীদারেরাই চোরের সঙ্গে মিলিয়া গৃহস্থের ঘরে সিঁদ দিত।

ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক, তাহার মধ্যে পিতল ও কাঁসার থালা, ঘটি,
বাটি প্রভৃতি নানারকম তৈজসপত্র বোঝাই করা থাকিত, নাজীর মহাশয় অনেক সময়ই
অনেক বেওয়ারিশ পিতল কাঁসার বাসন পেয়াদাদের নামে কমদামে ডাকিয়া লইতেন। এই
সিন্দুকের উপর একটা ঝাঁপা এবং কাপড় দিয়া সযত্নে মোড়া কাটের খুরো লাগান একটা
সেকেলে টিনের প্যাটরা, তাহাতে গোপীনাথ এবং তাঁহার স্ত্রী তিলকমঞ্জরীর ভাল কাপড়
চোপড় রক্ষিত হইত। তিলকমঞ্জরী বৎসরে দুইবার করিয়া এই সকল কাপড় উঠানে দড়ি
টাঙ্গাইয়া রৌদ্রে দিতেন; বিবিধ বর্ণের চেলী, তসর, গরদ, ফুলকাটা ঢাকাই সাড়ী, সোনালী

রঙ্গের চেওড়া তিন-পেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী, নাজীর মহাশয়ের শাল, জামিয়ার, রুমাল সমস্ত উঠানটি জুড়িয়া শরতের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে যখন রৌদ্র পোহাইত, তখন পাড়ার রমণীগণ দৈবাৎ হাতা লইয়া নাজীর মহাশয়ের বাড়ীতে একহাতা আগুণ লইতে আসিয়া কিম্বা গৃহে চাউলের অভাবে সেরে করিয়া একসের চাউল ধার করিতে আসিয়া এই সকল বস্ত্রাদির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত এবং নাজীর-পত্নীর অলৌকিক সৌভাগ্য ও নিজের দগ্ধললাটের কথা চিন্তা করিয়া স্বগতভাবে প্রচুর হা হুতাশ করিত।

নাজীর মহাশয়ের গৃহে দ্বারের সম্মুখীন দেওয়ালে দুইটি ছোট কলুঙ্গা ছিল, তাহার এক-টিতে গৌর নিতাই দুইটি মাটি পুতুল স্থাপিত থাকিত, ছবি দুটি অধিক উচ্চ নহে, পীতবর্ণ মাথায় ক্যালো দুটি ঝুটি সম্মুখভাগে উচু করিয়া বাঁধা, মস্তক সম্মুখের দিকে ঈষৎ অবনত, একটু বাঁকানো, হাতদুটি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, পরিধানে লোহিত বস্ত্র, গলে উত্তরীয়, উভয়েই অবনত নেত্রে প্রেমবিহ্বলচিত্তে হরিসংকীর্ত্তনে মত্ত। আর একটি কলুঙ্গাতে কতকগুলি পুঁথি, শ্রীমৎভাগবত, প্রভাসখণ্ড, বৈষ্ণব-বন্দনা, পদচিন্তামণি, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বটতলার ভ্রমসঙ্কুল ছাপা ও অপকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থ সমূহ লাল খেরুয়া বাঁধানোভাবে অবস্থান করি-তেছে। দুই পাশে দুইটি গঁজালে রূপার আংটায় লাল সূতা দিয়া 'রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত হরিনামের ঝোলা ঝুলিতেছে। একটু উপরে কাঠের মোটা মোটা 'ডাঁসার' উপর একখানা চওড়া কাঁঠালের তক্তা, তাহাতে নানাপ্রকার মাটির পুতুল সাজান রহিয়াছে, মুখে অলকা তিলকা কাটা নাড়ুগোপাল হাঁটু গাড়িয়া বামহস্তখানিতে ভর দিয়া দক্ষিণ করপল্লব প্রসারণপূর্ব্বক বসিয়া আছেন, হাতের উপর একটি মাটির নাড়ু; একটি রমণী কক্ষে ঘট লইয়া জল আনিতে যাইতেছে, পরিধানে নীলাম্বরী, তাহার উপর লালের ডোরা; কোন রমণীর ক্রোড়ে শিশু গোপাল; মাটির হাতি, বাঘ, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পুতুলে কাঠখানি পরিপূর্ণ! ঘরের দেওয়ালে বিবিধবর্ণ-রঞ্জিত এক পয়সা দামের পট—পটগুলি বিচিত্র এবং তাহা নাজীর মহাশয়ের হরিভক্তি প্রকাশক, বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তাঁহার গৃহে একখানিও কালীর পট নাই, সকলগুলিই কৃষ্ণলীলাসূচক। কোনখানিতে গোবর্দ্ধন ধারণের দৃশ্য,—ধরাচূড়াধারী কৃষ্ণ বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের যত গোপ এবং রাখাল লাঠি ঠেঙ্গা উচু করিয়া গোবর্দ্ধনে ঠেকো দিয়া সর্ব্বশক্তিমান গোপবালকের সহায়তা করিতেছে, গোবর্দ্ধনের উপরে বৃহৎ জঙ্গল, বৃক্ষশাখায় বানর, অরণ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতি জন্তু। গোবর্দ্ধন ধারণের পাশেই একখানি বৃন্দাবনের গোচারণের মাঠ, শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গাভীদল চরিয়া বেড়াইতেছে, বাছুরগুলি তাহাদের পিছন হইতে বাঁট টানি-তেছে, রাখালেরা মাঠে খেলা করিতেছে, কেহ একটি গোবৎস লইয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে, আর তাহার মাতা সেই রাখালের পশ্চাতে উন্নমিতাননে ছুটিয়া যাইতেছে; যমুনাকূলে তমালমূলে কৃষ্ণ রাধিকার মিলন হইয়াছে, অধরে মুরলী, শিখিপুচ্ছ হেলিয়া রাধিকার চূড়া স্পর্শ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গলে বনমালা, চরণে নূপুর, ত্রিভঙ্গিমভাব, দুই পাশে ললিতা

বিশখা প্রভৃতি সখীগণ ফুলহার হাতে লইয়া আনন্দে হুলাহুলী দিতেছে, আর অদূরে একটি রাখাল বালক, বোধ হয় শ্রীনন্দনন্দনের 'সুবল সাঙ্গাতি'—একটি ফলহাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন তাহার অভিন্ন হৃদয় সখাটিকে ডাকিয়া বলিতেছে:—

"সুমিষ্ট ফল খাওরে কৃষ্ণ আমি এনেছি।"

নিকটেই একখানি কালীয়দমনের ছবি, কালিন্দীর কালোজলে কালীয়-সর্পের বিস্তীর্ণ ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ বামচরণের উপর দক্ষিণ চরণ হেলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, দুই পাশে নাগেন্দ্র নন্দিনীদ্বয় স্ত্রীমূর্ত্তিতে যুক্তকরে তাঁহার স্তব করিতেছে, কালিন্দীকূলে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালবালকেরা ধড়াচূড়া সমেত বিষ-জর্জ্জরিত-দেহে অচৈতন্যভাবে গড়াগড়ি যাইতেছে। কোন ছবিতে গোপরাজ্ঞী যশোদা নাকে নথ পরিয়া, হাতে তাবিজ যশম ঝুলাইয়া গোদোহন করিতেছেন, গরুর সম্মুখপদে বাছুর বাঁধা, শিশুকৃষ্ণ মায়ের পিঠের উপর পড়িয়া মহাহাঙ্গামা বাধাইয়া দিয়াছে, নিকটে এক গোপনারী উদূখলে ঘোল মইতেছে। দেয়ালের একপাশে নবনারী কুঞ্জরের ছবি, নয়জন সখি অপূর্ব্ব জিমনাষ্টিকের কৌশলে এক সুবৃহৎ হস্তীদেহে পরিণত হইয়াছে, একখানি কুসুমকোমল ভুজলতা হাতীর শুঁড় হইয়াছে, দুই খানি করপল্লব গজদন্তযুগলের স্থান অধিকার করিয়াছে, একখানি বিস্তীর্ণ অলক্তরাগ-রঞ্জিত পদ তাহার দীর্ঘ পুচ্ছরূপে প্রসারিত এবং একটি যুবতীর পীনোন্নত পয়োধর করিকুম্ভরূপে প্রকাশিত, কুঞ্জরের উপর কুঞ্জকুটীর গমনোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট। এই রূপ বস্ত্রহরণ, পুতনাবধ, জন্মাষ্টমীরাত্রে যমুনা পার হইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে আগমন, প্রভৃতি অনেকছবি গৃহপ্রাচীরের চারিদিকে আঁটা রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় নাজীর মহাশয় এই সর্ব্বসংশয়ী পাপ কলিযুগটাকে দ্বাপরের প্রেমভক্তিসখ্যসমাকুল, হাস্যবিলাস বিভ্রম বিজ-ড়িত, কালিন্দী যমুনাকল্লোলমুখরিত, বিজন কুঞ্জকানন পরিবেষ্টিত শান্তসুন্দর বৃন্দাবনের একটি পল্লবঘন আভীর পল্লীতেই অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। আফিসে সমস্ত দিন তিনি মামলা, মকদ্দমা, ডিক্রীজারী, সম্পত্তি ক্রোক নিলাম, সমন ও পেয়াদা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, রাত্রিকালে এই গৃহে একটি মধুর দৃশ্যে স্নিগ্ধ প্রশান্তিপূর্ণ মোহময় স্বপ্নের মধ্যে তাঁহার দিবসের শ্রান্তি এবং ক্লান্তি সমাহিত হইত।

এখনকার মত সেকালে এত বাক্স ডেকস ছিল না। নাজীর মহাশয়ের ঘরের দুইকোণে সূচফোড়ের সূতার দুগাছি ছিকে টাঙ্গান থাকিত, তাহাতে ছোট ছোট ভাঁড়, ছোবা, পিতলের ফেরো, গ্লাস থরে থরে সজ্জিত থাকিত, তিলকমঞ্জরী তাহারই কোনটাতে শিকি, অধুলী দুয়ানী, কোনটাতে পয়সা নেকড়ায় বাঁধিয়া রাখিতেন, তদ্ভিন্ন তিলকমঞ্জরীর বিবাহের সময়ে আলতা ও সিন্দূর বোঝাই করা যে একটী বৃহৎ কড়ির পেছে পাইয়া ছিলেন, সেই পেছের মধ্যে দু পাঁচ পণ কড়ি সর্ব্বদার জন্য রক্ষিত হইত, শাকওয়ালী শাক বিক্রয় করিতে আসিলে, কি বাগদিনীরা পদ্মের 'নাল' লইয়া আসিলে পাঁচ গণ্ডা কি দশগণ্ডা কড়ি দিয়া তাহা কিনিয়া রাখিতেন।

অন্য ঘরখানিতে হাঁড়ি, কলসী তৈজসপত্র বাঁশের সাঙ্গার উপর রক্ষিত হইত, এবং বড় বড় হাঁড়ায় চাউল, ডালের খন্দ, কলসীভরা বড়ি, আমচুর, ভাঁড় ভরা ঘি, গুড় প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য থাকিত; এতদ্ভিন্ন ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে বহুদিনের পুরাতন অনেক রকম চিত্র বিচিত্র ছককাটা যে বাঁশের চালি বাধা ছিল, তাহার উপর কাঁথা বালিশ প্রভৃতি বিছানাপত্র স্তূপাকারে সজ্জিত ছিল। এইঘরে গোপীনাথের পুত্রকন্যা লইয়া তাঁহার বিধবা ভগিনী বাস করিতেন।

গোপীনাথ খুব সকালে উঠিয়া একবার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিতেন; পূর্ব্ব গগনে তখন সামান্য লোহিত রাগ ফুটিয়া উঠিত, গৃহপ্রান্তবর্ত্তী বকুলশাখা হইতে রাশি রাশি বকুলফুল ঝরিয়া তরুমূল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত; নিকটবর্ত্তী আমবাগানে নবজাগ্রত পাখীরদল তাহাদের সহর্ষ কোলাহলে স্তব্ধ অরণ্যমুখরিত করিয়া তুলিত এবং নদীর অপর পারে পুরাতন শিবালয় হইতে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইত। দুই একটি পল্লীরমণী প্রাতঃস্নান করিবার জন্য নদীতীরে অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইতেন নাজীর মহাশয় সানন্দ মনে দুইহাতে করতালি দিয়া টহলদারদের সুরে ঃ—

"রাই জাগো রাই জাগো বলি ডাকে শুকশারী" গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিতেছেন।

গোপীনাথের বাহিরের ঘরে একখানি তক্তপোষ ছিল, তাহার উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া প্রাভাতিকদরবারে বসিলে, ক্রমে সেখানে নানারকম লোক আসিয়া জুটিত। পাঁচ সাতজন পেয়াদা আসিয়া তাঁহার তোষামোদপূর্ব্বক চিঠিগুলি 'হাওলা' করিয়া লইবার চেষ্টায় থাকিত; কেহ কাহারো ক্রোকী বাগানটি সুবিধামত ডাকিয়া লইবে, সমুচিত পূজোপকরণ লইয়া নাজীর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে গ্রামের ষোলআনা লোকের বিশুখুড়ো একগাছা হেলেহার ও দুটি ফুলঝুমকো রাখিয়া দুকুড়ি টাকা ধার লইবার জন্য নাজীর মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল; নাজীর মহাশয় তাহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক রমানাথ সেকরাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; রমানাথ সোনার দর কষিয়া নাজীর মহাশয়কে জনান্তিকে জানাইল যে, সোনাটা মন্দ নয়, ইহার পরিবর্ত্তে চল্লিশ টাকা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তা বড় হিসাবী লোক; অনেক বিবেচনার পর মুখখানি বক্র করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন "দেখ খুড়ো, তুমি আমার বিশেষ আত্মীয় লোক, তোমাকে বিনিবন্দকে টাকা দেওয়াতে আমার কিছু আপত্তি নেই, তোমাকে টাকা ধার দেওয়া, আর টাকা সিন্দুকে পুরে রাখা একই কথা, তবে কি জান খুড়ো, এখনকার আইন আদালত বড় খারাপ, হাতে ঘেঁটে সব দেখ্‌চি কিনা, একালে জাবেদা রকমে কাজ করাই উচিত। আর এই সামান্য জিনিষ রেখে চল্লিশ টাকা কিছুতেই দেওয়া যায় না, আজকাল সোনার বাজার একেবারে মাটি, রূপার দাম ক্রমেই চড়চে, আমাদের মুন্সেফ বাবু সেদিন গল্প কচ্ছিলেন যে, বিলেতে মেম সাহেবেরা রূপার চুড়ী পর্‌তে আরম্ভ করাতেই এরকমটা হয়েছে, এরপর যদি তারা মল পায়ে দিতে আরম্ভ করে, তাহলে সোনারূপো এক দাম হয়ে যাবে। যাহোক অন্যে হ'লে এ জিনিষ রেখে কখন কুড়ি টাকার বেশী দিতাম

না, তা তুমি যখন এসেছ তখন পঁচিশ টাকা দিতে পারি। আর একালে মহাজনী করাই ঝকমারী, টাকায় দু পয়সার বেশী সুদ নয়, তাও আবার আগাম আদায় হয় না।"—নিত্যানন্দ দাস পেয়াদা একখানি দূর গ্রামের চিঠি পাইবার উমেদারীতে বসিয়াছিল, সে দেখিল এই একটা সুযোগ যায়, বলিল "কর্ত্তা আপনি ঠিক কথা বলেছেন, আমাদের গাঁয়ে মুন্সীদের দরোয়ান লছমন তেওয়ারির কিছু টাকা ছিল, সে কি টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদ নিত, তার উপর যত দিনের মেয়াদে টাকা ধার দিত, তার আগাম সুদ কেটে নিয়ে তবে টাকা দিত, আজকাল আর তা হবার যো নেই, বিশেষ আপনার যেরকম চক্ষুলজ্জা, এত চক্ষুলজ্জা থাকলে কি মহাজনী করা হয়?"—নাজীর মহাশয় বিশুখুড়োর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন "নিতাই আমাদের সকল খবর রাখে, শুন্‌লেত বিশুখুড়ো, তা চক্ষুলজ্জাটা কি ক'রে ত্যাগ করি, টাকাকড়িত সঙ্গে যাবে না।"—বিশুখুড়ো দেখিল নাজীর মহাশয় ত্রিশ টাকার উপর কিছুতেই উঠিবেন না, তাহারও টাকার বিশেষ আবশ্যক, অগত্যা তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল। নাজীর মহাশয় নিত্যানন্দকে বলিলেন "কেমন হে নিতাই, ঠকা হয়নি ত?—আমি আবার বেশী দোকানদারী করতে পারিনে।"—নিতাই জিহ্বা কাটিয়া বলিল "রাধামাধব, আপনি ঠকবেন, এও কি একটা কথা।"—তখন নাজীর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে গহনা কয়েকখানি তিলকমঞ্জরীর হস্তে প্রদান করিলেন, প্রৌঢ়া সুন্দরী তিলকমঞ্জরী হাস্যবিস্ফারিত, কৌতুকগর্ব্ব-মিশ্রিত কটাক্ষপাতে বৃদ্ধের চিত্ত আলোড়িত করিয়া বলিলেন "তোমার আর বুদ্ধি হ'লোনা, এই পিতুলে সোনা রেখে পঁচিশ টাকা কি না দিলেই নয়, টাকাত আর বাক্সে থেকে কামড়ায় না!"—নাজীর মহাশয় স্থূল, তাম্রকূট-ধূম্র-কষায়িত বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণাপূর্ব্বক কহিলেন "কি জানি, পরের কষ্ট দেখ্‌লে আমি আর স্থির থাক্‌তে পারিনে, বেচারা বড় কষ্টে পড়েই আমার কাছে এসেছিল, তা যাগগে, আদত দামটা উঠ্‌বে। আর সুদ আসলে টাকা শোধ করতে না পারেত তোমারই থাকবে, মন্দ কি?"

বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া নাজীর মহাশয় নিতাইকে বলিলেন "নিতাই একবার ওপাড়ার হরশে গোয়ালাকে ধ'রে আনতো, কাল হ'তে বেটাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, কিছুতেই যদি তার বার পাওয়া যায়, বেটা যেন নবাব, একমুঠো টাকা পাব, তা শোধ করবার গা নেই, বাক্স হতে টাকা বের করে দিয়ে যেন আমিই চোর হয়েছি, তুমি সে বেটার কাছে আট আনা রোজ আদায় করবে তবে ছাড়বে, সরকারী পেয়াদা পাঠানোর সুখটা সে এখনো টের পায়নি।"—নিতাই বিনাবাক্যব্যয়ে চাপড়াসবদ্ধ হইয়া হরিশকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল।

অবিলম্বেই হরিশ আসিয়া হাজির হইল, ইতিমধ্যেই তাহার টাকা দেওয়ার কথাছিল, কিন্তু এবার তাহার চাষের অবস্থা বড় শোচনীয়, বৃষ্টি-অভাবে চোতেলি খন্দ কিছুই হয় নাই, বিশেষতঃ ট্যাংরামারীর মুচিরা বিষপ্রয়োগে তাহার বড় বড় দুটো বলদ ও একটি ভাল দুগ্ধবতী গাভীকে মারিয়া ফেলাতে বেচারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি কোনদিন

একবেলা একমুঠো আহার জোটে কোনদিন জোটে না ; কিন্তু সরকারী পেয়াদার অসম্মান করিবার যো নাই, কাজেই সে তাহার বিক্রয়াবশিষ্ট তৈজসপত্র হইতে একটা পিতলের বোখনো, এবং একখানা গয়েশ্বরী মণ্ডলদের বাড়ী বাঁধা রাখিয়া আটগণ্ডা পয়সা আনিয়া পেয়াদার সম্মান রক্ষা করিল। তাহার পর নাজীর মহাশয়ের কাছে কাঁদিয়া বলিল "হুজুর আপুনি আমার মা বাপ, অপুনি রক্ষে না কল্লে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই, একেবারে ভিঁটেমাটি ছাড়া করবেন না কত্তা, তুটো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বড়ই নাকালে পড়েছি, আপুনি আর তুটো মাস সবুর করুন আমি আপনার টাকা যোগাড় করে দিচ্ছি।" নাজীর মহাশয় তাঁহার হ্রস্বটিকিটিতে হস্তার্পণপূর্ব্বক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কালাপাহাড়ের ন্যায় নির্দ্দয় এবং রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন "তোর ও চালাকী রাখ, তোর ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হোক তার আমি কি জানি ?" এখনি টাকা ফেলবিত উঠ্‌তে পাবি, জানিস আমি তোর ঘরবাড়ী আজ্‌ই নিলাম ক'রে নিতে পারি ?"—অনেক কাঁদাকাটির পর কর্ত্তামহাশয় তাহার পুরাণো খতখানি বদলাইয়া একখানি নূতন খত লিখিয়া লইতে রাজী হইলেন, সুদে আসলে এপর্য্যন্ত যত টাকা হইয়াছিল, সেই খতে সমস্ত আসল বলিয়া গণ্য হইল। রামনগরের পাঠশালার 'সরকার' হরেকৃষ্ণ গোঁসাই খত লিখিয়া দিলে, হরিশ খতে যথারীতি অঙ্গুলীসহি করিল, কয়েকজন পেয়াদা ও তুই চারিজন প্রতিবেশী সাক্ষী হইয়া রহিল ; তুপুরের সময় আফিসে গিয়া খত রেজেষ্টারী করিয়া দিবার হুকুম দিয়া নাজীর মহাশয় হরিশকে গজভুক্ত কপিথবৎ পরিত্যাগ করিলেন।

গৃহস্থলীর এইরূপ অনেক কাজ সারিয়া নাজীর মহাশয় তৈলচর্চ্চিত দেহে নদীতে স্নান করিতে গেলেন। পুরুষ ও মেয়েদের স্নানের ঘাট স্বতন্ত্র, কিন্তু কেন বলা যায় না, স্ত্রীলোকের ঘাট ভিন্ন নাজীর মহাশয়ের স্নান করা হইত না। নাজীর মহাশয় স্নান শেষ করিয়া উঠিবেন এমন সময় বেনেদের নবৌ চারিগাছি মল বাজাইতে বাজাইতে চারআনার গামছা খানি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিল। তাহার পরিধানে নীলাম্বরী সাড়ী, নাকে নথ, কাণে পাশা এবং প্রকোষ্ঠে লোহিতবর্ণ-রঞ্জিত শাঁখা। পাড়ায় বেনেবৌর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল, সেই প্রশংসায় তাহার বক্ষঃস্থল পরিপূর্ণ, চক্ষের কটাক্ষও তীব্র ; সে জলে নামিয়াই দেখিতে পাইল নাজীর মহাশয় সেই ঘাটে স্নান করিতেছেন, দেখিয়া ঘোমটাটি একটু টানিয়া তাঁহার দিকে ঈষৎ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার সহচরীকে জনান্তিকে বলিল "দেখেছ ঠাকুরঝি, মিন্‌সের রকমটা, তিনকাল গিয়েছে এককাল আছে, যম বৃষকাঠ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরচে, মেয়ের ঘাট ছাড়া ড্যাঁকরার মরণ হয় না ; আবার নাইতে এসে কতরকমই ভিট্‌কিলেমো করেন, দেখে গাটা জ্বলে যায়।"—বাস্তবিকই নাজীর মহাশয় তখন স্নানান্তে আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, আহ্নিক শেষ হইলে মুখে মৃদু মৃদু মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উভয় অঞ্জলীতে জল তুলিয়া তাহা জলেই ঢালিয়া দিতেছিলেন ; কাহার উদ্দেশে এই অঞ্জলী প্রদত্ত হইতেছিল তাহা তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু রসগ্রাহী কোন লোক

সেখানে উপস্থিত থাকিলে বলিত নাজীর মহাশয় ইষ্টদেবের পরিবর্ত্তে বেনেবৌর শ্রীচরণোদ্দেশেই তাহা অর্পণ করিতেছেন, কারণ তাঁহার উদ্ভ্রান্ত চক্ষুর সাগ্রহ-দৃষ্টি সেই পল্লীবধূর সুন্দর মুখখানির উপরই তখন ঘন ঘন নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। বুঝি তখন নাজীর মহাশয়ের মনের মধ্যে একটু মধুর ভাবের ঢেউ খেলিতেছিল ; বর্ষা সমাগত প্রায়, ক্ষুদ্র নদীতে নূতন জল পড়িয়া তাহার যৌবনশ্রী ফিরিয়া আসিতেছে, বিজন নদীকূলে শ্যামল প্রকৃতি নবজলধারায় স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, আর নদীজলে সেই আবক্ষমগ্না ষোড়শী সুন্দরীর কমনীয় মুখকান্তি;—রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাসক নাজীর মহাশয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞ নহেন, আহ্নিকের মধ্যেও জয়দেব গোস্বামীর 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, এমন সময় যুবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিল, তাহার আগুল্‌ফ-বিলম্বিত ঘনকালো একঝাড় চুল পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সিক্ত নীলাম্বরীখানি সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, রমণী তাহার কোমল করপল্লবে বস্ত্রাগ্রভাগ নিপীড়ন করিতে করিতে, মধুর হাস্যকল্লোলে নদীতীর ধ্বনিত করিয়া, পদতলে নবোদ্গত তৃণাঙ্কুর দলিত করিয়া মন্থরগমনে চলিতে লাগিল ; আহ্নিক পূজা সারিয়া নাজীর মহাশয়ও তীরে উঠিলেন, কিন্তু গৃহমুখে চলিতে চলিতে তাঁহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল :—

"সজনি, ওধনী কে কহ বটে
গোরচনা গৌরী নবীনা কিশোরী
নাইতে দেখিনু ঘাটে।

* * *

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে
পড়েছে চিকুর রাশি,
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি।

* * *

বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের একপ্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র নান্নুর গ্রামের একটি অশিক্ষিত প্রেমিক কবি যাহা গাহিয়া গিয়াছেন, ভাষা-সমুদ্রমন্থিত সেই ভাবসুধা তাঁহার চঞ্চল-চিত্তে তরঙ্গিত হইতে লাগিল ; তাঁহার মনে হইল, জগতে সকলই মিথ্যা, শুধু এই সঙ্গীতই সার, রাধাকৃষ্ণের চরণামৃতের ন্যায় মৃত্যুঞ্জয়ী।

গৃহে ফিরিয়া নাজীর মহাশয় তুলসীতলায় পূজোপকরণ লইয়া বসিলেন, পরিধানে পট্টবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে নামাবলী। উঠানের একপ্রান্তে তুলসীগাছটি উচ্চ-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বেদীর উপর সংস্থাপিত। প্রথমে তিনি চন্দন, তুলসীপত্র এবং গঙ্গাজলে তাঁহার খেরুয়া-মণ্ডিত পুঁথিগুলি পূজা করিলেন, তাহার পর হরিনামের ঝোলা হইতে খানিক গঙ্গামৃত্তিকা বাহির করিয়া বামহস্তে একটু গঙ্গাজল ঢালিয়া তাহা ঘসিলেন, ললাটে, নাসিকাগ্রে, কর্ণমূলে, বাহুমূলে

এবং পৃষ্ঠে তিলক দিয়া ঝোলা হইতে একখানি ক্ষুদ্র টিনমোড়া আয়না বাহির করিয়া মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, অনন্তর ঝোলা লইয়া মালা জপিতে বসিলেন। গোপীনাথের হিরণ্যকশিপুর ন্যায় নাস্তিক গোছের একটি দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, সে বলিত, খুড়োমহাশয় আফিসে গিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন, ঝোলা হাতে লইয়া এই সময় শুধু সেই কথাই ভাবেন; কিন্তু পল্লিবৃদ্ধাগণের নিকট নাজীর মহাশয় আদর্শ পুরুষ ছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি দ্বারা বিধাতাপুরুষ তাঁহার ক্ষুদ্র মস্তকটি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাই যদি তাঁহাদের পুত্র বা পৌত্র কেহ অনার্য্যরীতিসুলভ জুতা পায়ে দিয়া জল খাইত, কি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেখিলে মাথাটা না নোয়াইত, তাহা হইলে তাঁহারা বৃদ্ধ গোপীনাথকে দেখাইয়া 'তরিবৎ' শিখিবার জন্য তাহাদের উপদেশ দিতেন। গোপীনাথের স্ত্রী তিলকমঞ্জরীও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন, স্নান ও পূজা আহ্নিকের পর সুবলদাস বাবাজীর পাদোদক পান না করিলে তাঁহার কোন কার্য্যই আরম্ভ হইত না। কিন্তু গোপীনাথের পুত্র নন্দদুলাল পিতামাতার অনুরূপ হয় নাই, বোধহয় অমৃতে অমৃতে মিশিয়া গরল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই তাহার পিতার সহিত গৌরাঙ্গ-লীলামৃতকাহিনীকীর্ত্তন-সমুৎসুক কোন বৈষ্ণবকে বাড়ীর সম্মুখে দেখিতে পাইলেই তাহার শিশু-হৃদয়ে বিদ্রূপ-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিত, সে উক্ত বাবাজীউর আজানুলম্বিত, নাভিকুণ্ডল নিম্নগামী বহির্ব্বাস, বর্ত্তুল উদর, মুণ্ডিতমস্তকে তরমুজের বোঁটার মত সুদৃঢ় টিকির গোছা ও সর্ব্বাঙ্গে ফোটা তিলকের চটক দেখিয়া কিছুতেই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিত না; একটু তফাতে গিয়া দেশস্থ বালকবর্গের সহিত সুর করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিত ঃ—

"বোষ্টম টম টম,
ঝুলির ভিতর মালা থুয়ে পাঁটা খাবার যম।"

শুনিয়া বাবাজীউগণ কর্ণে অঙ্গুলীপ্রদানপূর্ব্বক গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিত "নাজীর মহাশয় আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনার পুত্রটির মতিগতি এরূপ কেন? মহাপ্রভুর লীলা বোঝা ভার।"—ইহাতে নাজীর মহাশয়ের কোন স্পষ্টবাদী আত্মীয় একদিন বলিয়াছিল, "সেকালে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম হইয়াছিল, একালে প্রহ্লাদের বংশে দৈত্য জন্মিবে তার আর আশ্চর্য্য কি? এযে ঘোর কলি!" শুনিয়া অনেকের সঙ্গে নাজীর মহাশয়ও উচ্চহাস্যে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই ভরসা করিয়াছিল যে, নন্দদুলালের স্বভাব পরে সংশোধিত হইবে।

নাজীর মহাশয়ের একজোড়া চটিজুতা ছিল। রামনগরে যে বছর মুন্সেফী স্থাপিত হয়, সেই বৎসর একজন মুচী তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ উপকার পাইবার প্রত্যাশায় "পান খাইবার জন্য" এই চটি জোড়াটা তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল, তাহার পর একাল পর্য্যন্ত তাহা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবেই রহিয়াছে। ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল, যতক্ষণ নাজীর মহাশয় বাড়ীতে থাকিতেন, এমন কি তিনি যখন গ্রামান্তরে যাইতেন তখনও তাঁহার বিনামার সহিত দেখা সাক্ষাৎ

হইত না, কেবল আফিসে যাইবার সময়ই জুতা জোড়াটার খোঁজ পড়িত, কিন্তু তাহাও পথের মধ্যে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান প্রাপ্ত হইত না। আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বেলা বারোটার সময় একটা জামা ও একখানি চাদর কুক্ষিগত করিয়া বামহস্তে চটি জোড়াটি ঝুলাইয়া নাজীর মহাশয় আফিসে যাইতেন। সাধারণে তাঁহার সাদাসিধে গরিবিয়ানা ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইত, কেহ দুইহাত তুলিয়া নমস্কার করিত, অনেকে মাথা নোয়াইয়া সসম্ভ্রমে সেলাম দিত। নাজীর মহাশয় আদালতের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে নামিয়া পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক চটি জোড়াটি পায়ে দিতেন, এবং পিরাণ ও চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া আফিসে প্রবেশ করিতেন। মুন্সেফটি সেকালে, এবং অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী, তিনি এই বৃদ্ধ কৃষ্ণভক্ত নাজীরের শতত্রুটী মার্জ্জনা করিতেন, নাজীর মহাশয় মুন্সেফ বাবুকে নমস্কার করিয়া নাজীরখানায় প্রবেশপূর্ব্বক চৌকীবিন্যস্ত শতরঞ্চির উপরস্তূপাকার ন্যস্ত খাতাপত্রের মধ্যে বসিয়া পুরাতন ময়লা চসমাখানি নাকে লাগাইতেন, তাহার পর পেয়াদাদের হাজিরা লিখিতে আরম্ভ করিতেন। তালবৃন্তে তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল করিবার জন্য পেয়াদারা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিত।

অপরাহ্ণে গোপীনাথ গৃহে ফিরিয়া তাঁহার কন্যার একখানি চারিগজা তিনপেড়ে সাড়ী পরিধানপূর্ব্বক আফিসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেন, এবং হাত মুখ ধুইয়া হরিনামের ঝোলাটি হাতে করিয়া বহির্বাটীতে আসিয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতে শ্রীরাধা গোবিন্দের পদারবিন্দ মকরন্দপিপাসু ভক্ত বৈষ্ণবের দল মধুচক্রস্থ মধুকরের ন্যায় তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত হইয়া গুঞ্জন আরম্ভ করিত, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা চলিত, অবশেষে ভক্তবৃন্দসমাবৃত সেই গৃহখানিতে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলে খোলকরতালধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সান্ধ্যকীর্ত্তনের আগমজ্ঞাপন করিত, এবং সমবেত ভক্তগণের সেই মৃদুগুঞ্জন উচ্চতর হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানি ভরিয়া ফেলিত, রমণীগণ ভক্তি-গদ্গদচিত্তে চণ্ডীমণ্ডপপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতেন, গোপীনাথ দুইবাহু তুলিয়া ভাবাবেশে নাচিয়া নাচিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত গোবিন্দ অধিকারীর ললিত মধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন ঃ—

"বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের,
রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের,
শ্যাম তোমাদের, রাই আমাদের।
শুকবলে—আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
শারীবলে—আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
সে যে গুরুর গুরু।"

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া উঠিত। তখন নক্ষত্রভূষিত অনন্ত আকাশ সহস্র চক্ষু মেলিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মৌন ধরণীর দিকে নতনেত্রে চাহিতে থাকিত, নদীর উপর দিয়া নৈশবাতাস নিতান্ত উদাসীনভাবে, বিশ্বের চিন্তাক্লিষ্ট দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় এক একবার বহিয়া যাইত, অদূরে

বাগানের মধ্যে শৃগালের দল সমস্বরে প্রহর ঘোষণা করিয়া নীরব হইত; কিন্তু খোল করতালের খচমচ এবং কীর্ত্তনের ঝঙ্কারের তখনো বিশ্রাম নাই, কোন্ যুগান্তরের বিহঙ্গ-দম্পতির প্রেমকলহ স্ফুরিত, এই ভক্তগণের কলকণ্ঠ-নিনাদিত মোহন সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তখন সেই গৃহ-প্রান্তবর্ত্তী বকুলের নিবিড় পত্ররাশির অভ্যন্তর ন্যস্ত বিকশিত পুষ্পরাজির সুবাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামের কর্ম্মশ্রান্ত নরনারীবর্গের নিদ্রালস চক্ষুর উপর একখানি শব্দস্পর্শ গন্ধময় বিচিত্র মায়া-যবনিকা ধীরে ধীরে বিস্তৃত করিয়া দিত।

জাপান ও জাপানী।

বিগত চীন-জাপান-যুদ্ধের অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিণাম এশিয়ার স্বাধীন জাতির ইতিহাসে যুগান্তর। বিশাল চীন-সাম্রাজ্যের সহিত ‘ক্ষুদ্র’ জাপানের যুদ্ধাভিলাষ প্রথমে অনেকেই অসমসাহসিক স্পর্দ্ধা মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু শুধু এক অথবা একাধিক ক্ষেত্রে নয়, পুনঃপুন প্রত্যেক সংঘর্ষে গৌরবগর্ব্বিত জাপান তাহার প্রকৃত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে; বিস্মিত সাধারণ এখন সবিশেষ জানিয়াছেন ক্ষুদ্রকায় বিক্রান্ত সিংহের সম্মুখে সুবিশাল চীনহস্তী শুণ্ডাস্ফালনে কিরূপ শোচনীয় ক্ষতবিক্ষত এবং ওষ্ঠাগতপ্রাণ!

হিন্দুস্থানের সহিত উভয়েরি সম্বন্ধ প্রায় তুল্যানুরূপ। উভয়জাতিই এসিয়ার অধিবাসী। চীন বরং নিকটতর প্রতিবেশী। তুলনার সমালোচনায় পক্ষপাত প্রবৃত্তি থাকিলে সুতরাং চীনের পরাজয়ে সহানুভূতি প্রকাশ পাইত; কিন্তু জানিনা এ ক্ষেত্রে কাহারো তেমন হইয়াছে কিনা। জাপের প্রত্যেক বিজয়গৌরব তাহার জাতীয় একতা ও সাধনার অবশ্যম্ভাবী শুভফল এবং মস্তক-পুচ্ছধারী, মৌতাতসেবী, স্থিতিপ্রিয়, ‘স্বর্গসাম্রাজ্যের’ অধিবাসী চায়নাম্যানের প্রত্যেক লজ্জাজনক পরাজয় তাহার আত্মকৃত কর্ম্মভোগ। কে না স্বীকার করিবেন নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীল পৃথিবীর পার্শ্বে কোন অপরিবর্ত্তিত অংশ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

কবির ছন্দোবন্দে যখন এদেশের সকলে জানিয়াছিল ‘অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন’ তাহার পূর্ব্বেই জাপান তাহার অনুকূল স্বভাব এবং অধিবাসীদের প্রতিভাবলে বাণিজ্য, ব্যবসা, শিল্প ও সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিতেছিল। বাস্তবিক যে অদম্য উৎসাহ, একাগ্রতা, অধ্যবসায় এবং দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ আজ আটাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের কোন এক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহারি সংরুদ্ধশক্তি নিত্য নূতন শোভা সামর্থ্যে প্রস্তুত হইয়া বিগত উপলক্ষমাত্রে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা অল্পপূর্ব্বেও অতি কম লোকেই তাহা অবগত ছিলেন।

তথাপি জাপানের বর্ত্তমান উন্নতাবস্থা এত অল্প দিনের ফল যে, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। ইহার ইউরোপীয় প্রণালী অনুযায়ী দেশসংস্কার প্রায়

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। কোন দেশের জাতীয়স্বভাব সমাজ ও রাজনীতির এত দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখা যায় না। অনুকরণ ক্ষমতায় জাপানী অনন্যসাধারণ। বহির্ব্বাণিজ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য ও ক্ষমতাপন্ন জাতির সংস্রব ও অনুকরণ করিতে যখন জাপানের স্বদেশভক্ত, শিক্ষিত অধিবাসী যথার্থই লালায়িত হইয়াছিলেন, তাহা সে দেশের পক্ষে এক চিরস্মরণীয় দিন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকাল হইতে জাতীয় অনুন্নত, অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব ও নিয়মপ্রণালী লইয়া পৃথিবীর উন্নত জাতিদের ক্রমশঃবর্দ্ধিত, বলদৃপ্ত বিজয়াভিলাষের সম্মুখে ধন-প্রাণ-সম্মান অব্যাহতি রাখা তাঁহারা সম্ভব মনে করেন নাই। জাতীয় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ, অপার্থিব উদ্দেশ্যের কথা না ভাবিলেও, অন্ততঃ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ সংস্কারচেষ্টা ভিন্ন জাপানের এক সম্প্রদায় উপায়ান্তর দেখেন নাই। ইঁহাদের অভিনব প্রস্তাব তখনকার রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু আজ সে দেশে একজনও নাই যে সেই প্রথম উন্নতাকাঙ্ক্ষী জনসংখ্যার শুভকার্য্যের উপাদেয় ফল ভোগ না করিতেছে।

যুদ্ধ ঘটনায় জাপানসম্বন্ধে এখন অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত! ইহার আদ্যন্ত বিবরণেরও প্রচার হইয়াছে। কিন্তু কেবল যুদ্ধঘটনার আলোচনায় কৌতূহলের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। কিরূপে ইহার আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল জানিতে হইলে ফরাসীভাষায় লিখিত একখানি জাপানসম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ দেখিলে কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে।* জাপানের অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত যুগের ধারাবাহিক ঘটনাবিবৃতি, ধর্ম্মনীতি রাজনীতি ও সমাজনৈতিক অবস্থা, স্ত্রীপুরুষ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-যাজক ও পুরোহিতেদের চরিত্র, রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, অন্তর্ব্বাণিজ্য, বহির্ব্বাণিজ্য, উৎপন্ন পদার্থ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, জলবায়ু এবং ইহার শৈলশোভা হইতে উদ্যান এবং আরাম-নিকুঞ্জ গ্রন্থের বর্ণনাগুণে এবং পত্রে পত্রে সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর হস্ত ও ছায়াচিত্রে পাঠকের নিকট যেন বাস্তবচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

গ্রন্থকার তাঁহার দুইবৎসর জাপানবাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অভিজ্ঞ জাপানীসহচর সঙ্গে দেশের যেখানে যাহা দেখিবার যোগ্য আপনার সম্মুখে তাহার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র ইউরোপের কুতূহলী শিক্ষিত নরনারী আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বাঙ্গলা প্রস্তাব যে ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের প্রসঙ্গে লিখিত, সেই ইংরেজিগ্রন্থ মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে একটি মহিলার অনুবাদ।

জাপানীচরিত্র বুঝিতে হইলে অন্ততঃ অনুবাদ পুস্তকখানি পড়া উচিত। যাঁহাদের ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় নাই, তাঁহাদের জন্য ইহার আদ্যন্ত বাঙ্গলা অনুবাদ আবশ্যক। বর্ত্তমান

* Japan and the Japanese.—By M. Aime Humbert from the French by Mrs. Cashel Hoey, and Edited by W. H. Bates. Illustrated by 207 Drawings by Italian and French Artists, and sketches from Photographs.

অবতারণার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। জাপানের যে অধ্যায় আলোচনা করিয়া আমরা সমধিক আন-
ন্দিত হইয়াছি, সেই বিগত পঁচিশ বৎসরের ঘটনা অন্থকার আলোচ্য। মূলগ্রন্থের প্রথম
সংস্করণে এ ঘটনার বিবরণ কিছুই ছিল না, কেবলি তাহাতে জাপানের প্রাচীন জাতীয়-
চরিত্র চিত্র ও স্বভাব-শোভার নিপুণ অঙ্কন। জাপানের পরবর্ত্তী বৈপ্লবিক যুগের উচ্ছৃঙ্খল
অথচ ভবিষ্যৎ হিতকর ঘটনার বিবরণ গ্রন্থকার তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে নূতন অধ্যায়ে
লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—সে ঘটনা তাঁহার স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পরে সংঘটিত
হয়। এই বিপ্লবফলে পরবর্ত্তী জাপানের অর্থাৎ আজ পঁচিশ বৎসর হইতে অতি দ্রুতগতিতে
পাশ্চাত্য অনুকরণে যে উন্নতি হইতেছিল, কি জানি কোন কারণে, গ্রন্থকার তাহা বলেন
নাই অথবা বলিতে পারেন নাই। পরে লেখিকা তাঁহার সুন্দর অনুবাদপুস্তকে নূতন অধ্যায়ের
অবতারণায় সে কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। 'কিন্তু গ্রন্থকার পূর্ব্বেই জাপানেয় সেই
ভবিষ্যৎ নিশ্চিত উন্নতির আভাষ বুঝিয়া তাঁহার অনুমানবলে বলিয়া গিয়াছিলেন।*

'টাইকন্' বংশের মুখাপেক্ষার সম্বন্ধ হইতে জমিদার 'ডামিও' সম্প্রদায়ের নিষ্কৃতি ও
'টাইকন্' বংশের সম্পূর্ণ পতন জাপানের অন্তর্ব্বিপ্লবযুদ্ধের শুভ পরিমাণ। একতাবদ্ধ, ক্ষমতা-
পন্ন, বিজয়ী 'ডামিও' সম্প্রদায়ের রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের উন্নতিপক্ষে প্রাণগত
অভিলাষ তাঁহাদিগকে যে অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগে স্বতঃপ্রবৃত্ত করাইয়াছিল, সে ঘটনা
আনন্দ ও বিস্ময়োদ্দীপক,—মানবচরিত্রের ইতিহাসে এমন ঘটনা সুদুর্লভ। যতদিন পৃথিবীতে
সভ্যমানবজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ইতিহাস শতমুখে সত্যপ্রশংসার জগৎব্যাপী
গানে স্বদেশবৎসল, মহানুভব 'ডামিওদিগের' মহৎচরিত্রের মহৎঅনুষ্ঠানের কীর্ত্তিকথা ঘোষণা
করিবে, আর উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতার সমুচ্চভাবে অনুপ্রাণিত পরবর্ত্তী জাপানসন্তান তাহাদেরই
সেই স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মাদের পদানুসরণে আপনাদের জীবন বিনিময়ে লব্ধ গৌরব রক্ষায়
সযত্ন হইবে। একথা এখন আর অলীক স্বপ্ন নয়, অবিসম্বাদিত সত্য।

এই 'ডামিও' সম্প্রদায়েরকৃত কার্য্যবিবরণ আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট দেখা যায় আদ্যন্ত
তাহা ন্যায় এবং বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের একতাবদ্ধ উৎসাহ ও একাগ্র
দেশসংস্কার-স্পৃহা অতি বিচক্ষণ রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধিবলে পরিচালিত হইয়াছে। তাহাতে বীরত্ব
ছিল, অদূরদর্শিতা ছিল না; বিপ্লবান্তে অসামান্য ক্ষমতা ছিল, রাজভক্তির ত্রুটি ছিল না;
জন্মভূমির উন্নতির জন্য আগ্রহাতিশয্য ছিল; আত্মস্বার্থের বিন্দুমাত্র আবিলতা ছিল না।

* "They will soon be asking us to work their mines, to establish their telegraphic communication, and to make their railroads. Afterwards the time will come when their windows will be made of glass, instead of slides of transparent paper; when they must have curtains to their windows and mirrors in their drawing rooms; when they will burn gas instead of smoky candles; and when Parisian millinery will have its establishments at Niphon; for the Japanese men are already adopting European, and we cannot suppose that the women will not follow the fashion."

প্রত্যেকে সামান্যমাত্র জীবনসম্বলগ্রহণে আপনাপন অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগসুখলালসা একদিনে স্বদেশবাসীর সমবেত সুখ ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পবিত্র চরণে সমর্পণ করিলেন। জাপানের বর্ত্তমান গৌরবের ইহাই একমাত্র মূল কারণ।

'টাইকন্' সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও স্বার্থস্পৃহা কোন সময়ে এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে এক সময়ে তাহারা সম্রাটের মুখাপেক্ষার বন্ধন হইতে আপনাদিগকে কোন কোন অংশে মুক্ত করিতে প্রকাশ্যভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের এই অনধিকারচর্চ্চার মূলে দেশের সর্ব্বজনীন উন্নতির আভাষ অথবা সংস্রব মাত্র ছিল না; তাহার অর্থ কেবল নীচ আত্মস্বার্থসাধন। 'ডামিও' সম্প্রদায়েব উত্থান দেশে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। তাঁহাদের চিরপ্রতিপালক, প্রিয়তম সম্রাটের প্রতি সমুদায় বিশ্বাস ও যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণে তাঁহারা স্বদেশের মহৎকল্যাণসাধনের জন্য যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা সরলভাবে জানাইবামাত্র তাঁহাদের এবং সমগ্র দেশের সৌভাগ্যবশতঃ বিচক্ষণ সম্রাট তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির সহিত সেই রাজভক্ত, মহানুভব, স্বদেশবৎসল সংস্কারকদের মতেই মত দিলেন। অদূরবর্ত্তী উজ্জ্বলালোকিত উন্নতিরাজ্যের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল; সম্রাট হইতে সাধারণ পর্য্যন্ত উন্নতির প্রকৃত পথ চিনিতে পারিয়া অদম্য উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত মনুষ্যের সারধর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

'ডামিও'দিগের কৃত কার্য্যবিবরণ বলিবার পূর্ব্বে পাঠকের নিকট তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র ধরিতে হয়। ইহাঁদিগকে জমিদার শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু আমাদের দেশের রাজা ও জমিদারের সহিত 'ডামিও' সম্প্রদায়ের ক্ষমতার তুলনা হয় না। 'টাইকন্' বংশের পতনের পর 'ডামিও' সম্প্রদায়ই সম্রাটের পরবর্ত্তী মিত্র-ভূস্বামী। (Semi-independent feudal nobles.) রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে ইহাঁদের 'টাইকন্'দিগের সহিত মুখাপেক্ষার সম্বন্ধ ছিল।—বিপ্লবান্তে 'ডামিও' সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সমুদায় অধিকার এবং স্থাবর অস্থাবর যথা-সর্ব্বস্ব সম্রাট মিকাডোর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা ও পরিবারস্থ স্বজনের প্রাণধারণোপযুক্ত নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য প্রত্যেকে আপনাপন আয়ের দশমাংশ-ভাগমাত্র গ্রহণে পরিতৃপ্ত থাকিবেন এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। চিরস্মরণীয়, কীর্ত্তিমান প্রিন্স আকিদ্‌জুকি এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের প্রথম উদ্ভাবক। তাঁহার 'ডামিও' ভ্রাতাদিগকে একত্র করিয়া সম্মিলনস্থলে তিনি সেই বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাপ্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রের ত্রিবিধ ধারা ঃ—

"যাঁহারা স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও রাজভক্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত নিয়মে তাঁহারা কর্ত্তব্যসম্পাদন করুণ, যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাঁহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।—

"১। এককালে যে সম্রাট হইতে তাঁহারা বর্ত্তমান রাজ্য ও ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, অবিভক্ত এবং সমুন্নত রাজ্যগঠনের জন্য আজ তাহাই তাঁহাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করা হোক্।

"২। তাঁহারা তাঁহাদের উপাধি পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে এমন যৎসামান্য সম্পত্তি গ্রহণে শুধু 'কাজকু' (অভিজাত) নামে অভিহিত হইবেন।

"৩। অধীনস্থ সামন্তদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে ও এখন হইতে 'সম্রাটের ভৃত্য' নাম গ্রহণে তাঁহারা তাঁহাদিগের সম্পত্তি যথাপূর্ব্ব ভোগ করিতে থাকিবেন।

"এই অত্যাবশ্যকীয় ত্রিবিধ নিয়ম প্রচলিত হোক্, যাহাতে নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী শক্তির উপর সংস্থাপিত হয়।"

তখন 'ডামিও' বংশ দুইশত চৌষট্টি জন রাজ্যাধিপতিতে বিভক্ত ছিল। সুখের বিষয় ইহাঁরা কেহই পরস্পর অনৈক্য না হইয়া প্রত্যেকেই আনন্দের সহিত প্রিন্স্ আকিদজুকির প্রস্তাবিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। একদিনে এই দুইশত চৌষট্টিজন অতুল বিভববান রাজপুত্র তাঁহাদের রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া জননী জন্মভূমির জন্য সুকঠোর, অনভ্যস্ত দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন!

অধীনস্থ সামন্তদের সঙ্গে তাঁহারা কোন সংস্রব না রাখিয়া সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের সুবিস্তৃত রাজ্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্রাটের রাজকীয় রাজস্বের অন্তর্গত হইল। 'ডামিও সম্প্রদায়ের জন্য বহুসংখ্যক চিহ্নিত শরীররক্ষক প্রতিপালিত হইত, বৃথাবোধে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ অভিনব নিয়মপ্রণালীমত চলিতে লাগিলেন।

জাতীয় প্রাচীনপ্রথা এইরূপে ধূলিসাৎ করিয়া তাহা পুনরায় সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত জাপান যেমন দেখাইয়াছে পৃথিবীর আর কোনদেশ বুঝিবা তেমন দেখাইতে পারে নাই। ইহার পর একতাবদ্ধ সকলে একাগ্রচিত্তে, অব্যাহতবলে, উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সম্রাট মিকাডো ও তাঁহার পরামর্শদাতা উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের কার্য্য-তৎপরতাগুণে দ্রুতগতিতে দেশ সংস্কার চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদায় রাজ্যে নূতন ভাব, নূতন মত, নূতন নিয়ম-প্রণালী ছড়াইয়া পড়িল; সুবুদ্ধি সংস্কারকদের সহিত একমনপ্রাণে সম্রাট তাঁহার বাঞ্ছিতফলভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজকীয় মন্ত্রণাভবন হইতে প্রতিদিন নূতন আইন প্রস্তুত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল, রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশস্থ প্রত্যেক শাসক ও শান্তিরক্ষক, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সবিস্ময় উৎসাহে অভিনব কর্ত্তব্যপথে চলিল। 'এড্ডো' নগরের অতঃপর নূতন 'টোকী' নামকরণ হইয়া তাহা প্রধান রাজধানীতে পরিণত হইল। এড্ডো এবং 'ওকোহামার' সহিত 'কিটো' 'ওসাকা' 'হিগো' প্রভৃতি স্থানকে অভিনব রেলপথদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করার প্রস্তাব স্থির হইয়া অবিলম্বে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইল। সমুদায় সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—'নাগাসাকি' ও টোকী পর্য্যন্ত তড়িৎবার্ত্তার (তার চলিল। শত শত সৎসাহসী, বুদ্ধিমান জাপান যুবক ইউরোপ

ও আমেরিকার বিখ্যাত বিদ্যালয়ে বৈদেশিক ভাষা, প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবহার শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ঐ সকল শিক্ষার্থী, উৎসাহী যুবক অনেকেই অতি উচ্চবংশীয়। স্বয়ং মিকাডো মনোযোগের সহিত ইংরেজিভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিভিন্ন নগরসমূহে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে অধ্যাপক আনান হইল। সাধারণ্যে শিক্ষবিস্তার অভিপ্রায়ে রাজ্যময় উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।—কেবল অধ্যাপক আনাইয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকে নাই, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং যথাযথ অনুকরণ প্রবৃত্তিবলে আপনারাও ঠিক তেমনি শিক্ষা করিয়াছে। রাজ্যের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনে যদিও তাহারা অনেকাংশেই পাশ্চাত্য জাতিকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকেই সমুদায় ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে জাপানীরা সেরূপ পাত্র নয়। অনভ্যস্ত প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহারা এইভাবে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু অধিক দিনের জন্য এইরূপ মুখাপেক্ষা আবশ্যক মনে করে নাই। বিজাতীয় অনুকরণ প্রবৃত্তি অনন্যসুলভ, কিন্তু তাহার ষোল আনা উদ্দেশ্য স্বজাতির উন্নতি—ইহাই জাপানীর উল্লেখযোগ্য চরিত্ররহস্য।

পাশ্চাত্যজাতির সর্ব্বাঙ্গ অনুকরণ করিতে জাপানীদের একদিন এতদূর উৎকট অভিলাষ হইয়াছিল যে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার হইতে দৈনন্দিন সামান্য নিত্যকার্য্যের খুঁটিনাটিটিও অনুকৃত হইয়াছে। ইংরেজি ডিসেম্বর মাসের শেষে 'ক্রিস্ম্যাস্' উপলক্ষে সমুদায় ইউরোপে আনন্দোৎসব সুতরাং ঠিক্ সেই সময়ে জাপানও উৎসবের জন্য লালায়িত। কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টানভাবে না করিয়া মিকাডোর প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট 'জিমুর' স্মরণার্থ করিয়া থাকে। ইংরেজি ২৫শে ডিসেম্বর এই মহোৎসবের দিন। ইহার ফলে এই বহু পুরাতন জাতির জাতীয় কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কি না, বর্ত্তমানে আমরা তাহা বলিব না; কিন্তু ইহাদের পরবর্ত্তী বিপ্লবকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে স্বতঃই এ কথা উদয় না হইয়া যায় না যে, যদি কোন প্রাচীন জাতি অনুকরণ প্রবৃত্তিবশে সহসা তাহাদের রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে বহুদিনের গঠিত ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির ভিত্তি এইরূপে একদিনে আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে প্রস্তুত হয় তবে পূর্ব্বপ্রচলিত সেইসব মন্দের সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় অল্পবিস্তর ভালও নষ্ট হওয়া সম্ভব।—সে যাহাহোক্ ইহারই ফলে জাতীয় ঐক্য, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহায় জাপান আজ পৃথিবীর যেকোন উন্নত জাতির সমকক্ষ ইহা আমরা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অনিরপেক্ষ, সসঙ্কুচিত অভিমতের মধ্য হইতেও তাঁহাদেরই দ্বারা লিখিত ঘটনার আলোচনায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারি এবং একটি বিষয়ে হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হইয়া ওঠে। জাপানের পূর্ব্বাপর ঘটনা বিবৃতি-প্রসঙ্গে যেখানেই উক্ত ঐতিহাসিক অভিধেয় লেখকেরা জাপানের শক্তি, সামার্থ্য, সুবুদ্ধি ও সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছেন, সেখানেই সেই সঙ্গে ইউরোপীয় জাতির সাহায্য এবং এখনো যে জাপান ইউরোপের তুলনায় অনেক নীচে আছে সে কথা বারম্বার পাঠকের গলা

ধরিয়া বলিতে ভোলেন নাই। ইহা হইতেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, জাপান যদি এশিয়ার সুদূর পূর্ব্বদেশ না হইয়া ইউরোপের অংশবিশেষ হইত, তবে তাহাদের এই জাতীয় উন্নতি ও প্রতিভার কথা নিশ্চয়ই শতগুণ অধিক কীর্ত্তিত হইত।

সে যাহাহোক, দেশের পুরাতন সকল বিষয়ের প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে বহুকালের অভ্যস্ত ধর্ম্মমতের প্রতিও জাপানীদের ক্রমশঃ শ্রদ্ধাভক্তির বিলক্ষণ অভাব হইয়া আসিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসাহ অভাবে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল এবং ধর্ম্মমন্দির সমূহের বিপুল আয় অক্ষোভে রাজ্যের সাধারণ কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিতে উন্নতিশীলদিগের দ্বিধাবোধ হইল না। পুরোহিত সম্প্রদায় বিলক্ষণ বুঝিলেন এতদিনে 'সুখের নিশি' প্রভাত হইতে চলিয়াছে; অতএব কাল বিলম্বমাত্র না করিয়া দিন থাকিতে অন্ততঃ তাঁহারা তাঁহাদের 'হাতের পাঁচ' রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি—যথা, শঙ্খঘণ্টা, ধাতব মূর্ত্তি, অলঙ্কার ইত্যাদি এত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছিল যে, কিছুদিন পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কেবল স্তূপে স্তূপে ধাতব পদার্থ ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় নাই।

প্রাচ্যদেশের পথেঘাটে অকর্ম্মণ্য ভিক্ষুক ফকীরের অন্ত নাই; সেই শত সহস্র রোগ ও দারিদ্র্য-মলিন দৃশ্য বড় অশোভন, তাই সে সম্বন্ধে আইন প্রস্তুত হইয়া 'অনাথ আশ্রম' স্থাপিত হইল। এইরূপে যাহা কিছু নব্যরুচির চক্ষে দেখিতে মন্দ—এমন সমুদায় প্রথা একে একে আইনদ্বারা নিবারিত হইতে লাগিল। এত দিনের প্রথা, এত দিনের সংস্কার অভিনব শিক্ষা ও সংস্কারের নিকট পুরাতন প্রীতির একবিন্দু অশ্রুপাতের অবসর পাইল না! জাতীয় পরিচ্ছদটিও গায়ে সহিল না; অন্ততঃ উন্নতিশীল পুরুষপুঙ্গবেরা পরমাগ্রহে প্যারিস্ এবং লণ্ডনের প্রচলিত পোষক পরিচ্ছদ পরিয়া তবে সুস্থির হইলেন! 'আরিনোরি মোরি' নামক জাপানের একজন প্রধান ব্যক্তি জাপানী ভাষার দুরূহ লিখনভঙ্গী এবং অক্ষরকাঠিন্য হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার জন্য সমুদায় দেশের আগাগোড়া ইংরাজিভাষা প্রচলিত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ নবোন্নত জাপানের চিরস্মরণীয় বৎসর। নূতন রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বাভাষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া উৎসাহ, আনন্দ ও কৌতুক-কোলাহল জাগিয়া উঠিল। যেদিন প্রথম রেল্ চলিবে, সেই ১৪ই অক্টোবরের জন্য দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা উৎসাহ ও আশার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল।—জাপানের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে সম্রাট মিকাডো সাধারণের সহজ চাক্ষুষের সামগ্রী নহেন; সে সংস্কার অল্প কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই রহস্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, অদ্যকার এই নূতন রেল্‌পথ খোলা উপলক্ষে কার্য্যতঃ তাহার পরিবর্ত্তন হইতে চলিল। মিকাডো স্বয়ং রেল্‌পথ খুলিবেন এবং প্রকাশ্যরূপে সাধারণের সহিত জাতীয় কার্য্যে যোগদান করিবেন এ সংবাদ রাজ্যময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জাপানের পক্ষে এ ঘটনা সামান্য নয়। বিস্ময়-বিমিশ্র-আনন্দোৎসাহে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ১৪ই অক্টোবর এই উপলক্ষে জাতীয় মহামহোৎসবে পরিণত। ঐ দিবস এড্ডো রেল্‌ওয়ে

ষ্টেশনের ভিতরে বাহিরে অগণ্য লোকের জনতাদৃশ্য, ভাষায় তাহা প্রকাশ হয় না। সে সর্ব্বজনীন আনন্দ উৎসাহ কেবল অনুভবের যোগ্য।—ষ্টেশন-প্ল্যাট্‌ফরমে সর্ব্বশুদ্ধ দশহাজার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির স্থান সংকুলান করা হইয়াছিল এবং যাহাতে তাঁহারা অক্লেশে সেখানে স্থান পাইতে পারেন, সে সম্বন্ধে রেল্‌ওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সুবন্দোবস্ত করেন। সম্রাট নিজে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চারিদিকেই আনন্দ উৎসাহের যেন উৎস খুলিয়া গেল। 'টাইকন' বংশজদের জন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট, সাধারণের অগম্য, সুন্দর আনন্দোদ্যানগুলি উপস্থিত রেল্‌পথ খোলা উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের প্রীতিসম্মিলন ও আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য খোলা হইল। ওকোহামা হইতে সমুদায় বৈদেশিক রাজপ্রতিনিধি ও দূতেরা আসিয়া টোকীতে একত্রিত হইলেন। সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং ঐ তারিখে রেল্‌ওয়ে খোলা সময়ে তাঁহারা যাহাতে উপস্থিত হন, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।—পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় রেল্‌ওয়ে ষ্টেশনে রওনা হইবার জন্য মিকাডো প্রাসাদদ্বারে রাজকীয় সুদৃশ্য অশ্বশকটে আরোহণ করিলেন। একদল নির্দ্দিষ্ট অশ্বারোহী শরীররক্ষক এবং রাজবংশীয় একটি রাজপুত্র ও প্রধানমন্ত্রী পার্শ্বসহচররূপে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার শকটের পশ্চাতে আরও অনেক প্রধান ব্যক্তি ও মন্ত্রীসভার সদস্যেরা অগ্রসর হইলেন।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র পূর্ত্তবিভাগীয় মন্ত্রী, রেলপথ বিভাগের কমিশ্যনর, বৈদেশিক মন্ত্রীদল ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা সসম্মানে গৃহীত হইয়া মিকাডো প্রথমেই রেল্‌পথের জ্ঞাতব্য-বিষয় ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত ট্রেণের 'স্যালুন্' মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট পার্শ্বসহচরেরা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দলে দলে মহানন্দে গাড়ী বোঝাই হইয়া বসিলেন। নবীন জাপানীজাতির সাধের নূতন কীর্ত্তি রেলের গাড়ী তাহার রঞ্জিত পত্র পুষ্পমাল্য ও পতাকা-শোভিত ক্রোড়ে মহামহিমান্বিত মিকাডো এবং শতসহস্র যাত্রী তুলিয়া বংশীধ্বনির সহিত ছুটিল!—ট্রেণ ওকোহামায় পৌছিবার পূর্ব্বেই কানাগার গভর্ণর, রেল্‌ওয়ে বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা সম্রাটের শুভ অভ্যর্থনা করিতে আগ বাড়াইয়াছিলেন। সম্রাট এবং টোকী হইতে নবাগত রেলযাত্রীদের সাদরসম্বর্দ্ধনার জন্য তাঁহারা সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেখানে দস্তুরমত এক সভা হইয়া আবেদন, আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও উন্নতির কথা ও সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপার কিছুরই ত্রুটি হইল না। ওকোহামার বিদেশী অধিবাসীর পক্ষ হইতে সম্রাটকে যে কৃতজ্ঞতাসূচক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইল, তদুত্তরে মিকাডো তাঁহার বিদেশবিভাগীয় মন্ত্রীদ্বারা নিম্নলিখিত উত্তর দিলেন:—

"ওকোহামাবাসী আমাদের বিদেশী অতিথিসম্প্রদায় আজ আমাকে তাঁহাদের যে কৃতজ্ঞতাসূচক অভিনন্দন দিতেছেন, শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিদেশী যাঁহারা জন্মাবধি অথবা ঘটনাবশতঃ কিম্বা স্বকার্য্যসাধন উপলক্ষে এদেশে আছেন, তাঁহারা কেহই রাজকীয় সাহায্য, আশ্রয় ও অপক্ষপাত বিচারে বঞ্চিত হইবেন না। এই নীতির বলেই

আমার রাজ্য ক্রমেই উন্নতি এবং সভ্যতার চরম সীমার দিকে যাইতে থাকিবে। যতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে এদেশের এইরূপ মধুর মিত্রসম্বন্ধের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আমিও স্বদেশী ও বিদেশী উভয়কেই আমার হৃদয়ে ধারণ করিব।"

এই উপলক্ষে মিকাডোর সর্ব্বসাধারণের সহিত প্রকাশ্যরূপে সম্মিলন, সাধারণ হিতানুষ্ঠানে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও উৎসাহ, প্রকাশ্যভাবে সরল উক্তিদ্বারা নিজের কর্ত্তব্য ও অপক্ষপাত বিচার বিবেচনা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি জাপানীদের প্রাণে যেন এক নবীন আনন্দ, নবীন উৎসাহ এবং নবীন ভাবের স্রোত ছুটাইয়া দিল। উপস্থিত অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধিকাংশ জনসাধারণের একতা, নূতন নিয়মপ্রণালী প্রবর্ত্তনায় তাহাদের আন্তরিক অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে মিকাডোর প্রতি অসাধারণ রাজভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সেইদিন ওকোহামা হইতে মিকাডোর ফিরিয়া আসার সময় স্পষ্টতঃ ইহা প্রত্যক্ষ হইল। সম্রাট সভাস্থল পরিত্যাগ করিবামাত্র, সহস্র সহস্র ব্যক্তি, তিনি যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন এবং যে কার্পেটের উপর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভক্তি-অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাই স্পর্শে কৃতার্থ হইবার জন্য ধাবিত হইল। অবশেষে তাহাতেও তাহারা পরিতৃপ্ত হইল না। রাজকীয় চেয়ার ও কার্পেট সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তাহার এককণা যে পাইল, সে তাহাকে সৌভাগ্য মনে করিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ রাজকর্ম্মচারীগণ নিশ্চল, স্তম্ভিত; পুলিস শক্তিহীন! পুলিসের সাধ্য কি সেই উন্মত্ত জনস্রোতকে বাধা দেয়!—ট্রেণ পুনরায় সম্রাটকে লইয়া এড্ডো নগরে (টোকী) ফিরিয়া আসিল। সেখানেও মিকাডো রেল্‌ওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ধন্যবাদ দিয়া রাজ্যের সমুদায় স্থানে রেল্‌বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবশিষ্ট দিবস নানাবিধ আনন্দোৎসবে অতিবাহিত হইয়া এড্ডো এবং ওকোহামা সে রজনীতে অপূর্ব্ব আলোকমালায় সজ্জিত হইল।

এইরূপে অভিনব জাপানের অসীম কর্ম্ম-সাধনার প্রথম ফল ফলিতে চলিল। উন্নতিশীলেরা ক্রমশঃ তাঁহাদের অভিলাষোচিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু এই অতিক্রত সংস্কারক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। নিরাপদে কোন বাধা বিঘ্ন না পাইয়া জাপান তাহার নবনির্ম্মিত পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সহসা তাঁহারা বাধা পাইলেন। অবিলম্বে জাপানের কোন কোন প্রদেশে অসন্তোষ উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহা অশান্তি, উপদ্রব এবং অবশেষে প্রকৃত বিদ্রোহে পরিণত হইল। সৌভাগ্যের বিষয় ইহা কেবল জাপানের অনালোকিত প্রদেশমাত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু যখন সেই পুরাতন ভক্ত, নূতন বিদ্বেষী মূর্খ প্রজার দল অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখন সে ঘটনা সংস্কারকদলের নিকট নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় হয় নাই। এই সকল খণ্ড বিদ্রোহদলের মধ্যে নাগাসাকির দেড়শত মাইল দূরবর্ত্তী 'ফাকোকা' প্রদেশের বিদ্রোহই উল্লেখযোগ্য। কিঞ্চিন্ন্যূন আশীহাজার লোক এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। অতএব অনুমান করা সহজ ইহা নিতান্ত সামান্য গোলযোগে

পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহাদের শাসনের জন্য প্রেরিত শিক্ষিত সৈন্যদিগকেও স্থলবিশেষে ইহারা আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া রাজকীয় কর্ম্মস্থান সমূহের বাড়িঘর পোড়াইয়া দিতে একটুও অগ্রপশ্চাৎ দৃক্‌পাত করে নাই। রাজার নিয়ম অমান্য করিয়া এই সকল শুভাশুভ জ্ঞানহীন জনসংখ্যা যদিও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছিল, তথাপি আমরা এই ঘটনায় স্বাধীনজাতির চরিত্রের বিশেষত্ব বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। এই সকল বিদ্রোহিদিগকে অশান্ত, উপদ্রবকারী, অজ্ঞান এবং শাস্তিযোগ্য বুঝিয়াও ইহাদের স্বমত সমর্থনে দৃঢ়তা ও ভীতিহীন স্বভাবকে প্রশংসা করিতে হয়। স্বাধীন জাতির স্বভাবগত এইগুণ—এই দৃঢ়তা ও নির্ভীকতাই জাপানের নবোন্নত, উন্নতিশীল সম্প্রদায়কে কঠিন কর্ত্তব্যপথে এতদূর অগ্রসর করিয়াছে। নির্ভীক, ক্রিয়াশীল একাগ্রতা অসৎকার্য্যে লাগিলে তাহাই নিন্দিত 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দে অভিহিত হয়,—আবার তাহাই সৎকার্য্যে সংযুক্ত হইলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ফলতঃ জাপানের সৌভাগ্য বশতঃই জাপানে অশান্ত ছেলের সংখ্যা খুব বেশী। গৃহে অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকশাসিত বাঙ্গালীছেলের মতন বৃদ্ধসুলভ সুস্থিরতা তাহাদিগকে যৌবনেই জরাগ্রস্ত করে না। জাপানের সর্ব্ববিধ সংস্কারের প্রারম্ভকাল ইহার পক্ষ-বিপক্ষদের মধ্যে শূন্য শাস্ত্রবিচার অথবা বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় ব্যয়িত হয় নাই, তাহাতে একটা অত্যুষ্ণ গতির সঞ্চার হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় বিপ্লবে পরিণত হইয়াছিল। একজন মানুষের সঙ্গে আর একজনের বাক্‌যুদ্ধের উৎকট অভিনয় হইতে থাকিলে অবশ্য সেস্থলে হস্তযুদ্ধাভিনয়ের পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু কোন দেশের সর্ব্বজনীন সংস্কারে শুধু বাক্যযুদ্ধে কিছু হয় না। সময় বিশেষে তাহাতে হস্তযুদ্ধের বিশেষ আবশ্যক।

সে যাহাহোক্, জাপানের নূতন নিয়মপ্রণালী অনুসারে সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য রাজ্যময় করভার কিছু বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল—ইহাই উক্ত বিদ্রোহের একমাত্র কারণ। পূর্ব্বতন নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট কর ইত্যাদি শস্যরূপে দিতে হইত, সহসা নূতন করভার এবং শস্যের পরিবর্ত্তে টাকাব্যয়ের অনভ্যস্ত অবস্থা ভাবিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী প্রজার দল, অবশেষে রাজসমীপে নূতন প্রথার পরিবর্ত্তন এবং তাহাদের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম প্রার্থনায় আবেদন-পত্র পেশ্ করিল। তাহাতে ছোটবড় অনেক আব্‌দার ও আকাঙ্ক্ষার কথা। কিছুদিনের মধ্যে, যাহাহোক্, কতক বা বলপ্রয়োগে এবং মূল উদ্দেশ্য নষ্ট না হয় এমন কোন কোন নিয়মের আংশিক পরিবর্ত্তনে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হইল। জাপানের 'সামুরী' সম্প্রদায় যোদ্ধৃবংশ; এই উপলক্ষে তাহাদেরও যথেষ্ট রাজভক্তি, স্বদেশানুরাগ ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত সামুরী সম্প্রদায় তাহাদের বীরোচিত সাহায্যদ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রবৃহৎ বিদ্রোহিদলকে শক্তিহীন করিয়া দিয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী সংবাদ সবই সন্তোষজনক। সংস্কারকদের কার্য্য এবং নূতন সংস্কার সর্ব্বসাধারণ্যে বিস্তারে আর কোন বাধাবিঘ্ন পায় নাই। জাপানের সামাজিক ও রাজনৈতিক এই সুবৃহৎ পরিবর্ত্তন ইহাদিগকে উত্তরোত্তর সর্ব্বতোভাবে পার্থিব

উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে তাহাতে এখন আর কোন সন্দেহ নাই।—এশিয়ার সুদূর-পূর্ব্বদেশীয় এই উন্নতিশীল আশ্চর্য্যজাতির দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া পাশ্চাত্য-জাতিরাও ইহাদিগকে শতমুখে ধন্যবাদ না দিয়া পারে নাই। আমরাই এতদিনও জাপানকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতাম না।—বৈদেশিকজাতি জাপানের প্রশংসা করিয়াও পরন্তু তাঁহাদের প্রাণের দুঃখ প্রকাশ করিয়া কিয়দংশে মনঃকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন, যাহার কারণ জানিতে পারিলে জাপানীচরিত্রে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিলক্ষণ একটু রহস্য উপভোগ হয়। জাপানের বিদেশী অধিবাসীদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতে জাপান-গভর্ণমেণ্টের ত্রুটি নাই, কিন্তু জাপান তাহাদিগকে চিরদিন অবিশ্বাসের চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছে! পাশ্চাত্যজাতির নিকট তাহারা যেসব কার্য্যে সাহায্যগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার যথোপযুক্ত পারি-শ্রমিক দিতে যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ করে কিন্তু স্বদেশীয় কোন কার্য্য সম্পাদনে কোন বিদেশী কর্ম্মপ্রার্থীকে প্রাণান্তেও অংশী করিবে না। একটিমাত্র স্বদেশীর লাভের অর্থ কোন বিদেশীকে দেওয়া হয় ইহা তাহাদের ইচ্ছা নয়। পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা পাইতে ইহাদের যথেষ্ট অনুরাগ, কিন্তু শিক্ষা হইলেও প্রথমেই কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ততা হয় না, সেজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। জাপানীজাতি স্বদেশে এইরূপ কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে তাহারাই তাহাদের নিজেদের মধ্যে অংশ করিয়া লইয়া হয়ত অপেক্ষাকৃত অধিক দিনে তাহা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত—তথাপি তাহাতে বিদেশী লোক আসিতে দিবে না। এ কারণ, বড় কষ্টের সহিতই লেখিকা কহিয়াছেনঃ—So strong, in fact, is still the jealousy of foreign participation in the benefits of their country, that it is delaying by the preference given to the inefficient native contractors, the completion of great public works. such as the telegraph line from Nagasaki to Yeddo." "তাদের দেশের উপকার হয় এমন কার্য্যেও বিদেশীদের অংশী করিতে তা'রা এমন হিংসুক যে সে কথা অধিক আর কি কহিব, অযোগ্য দেশীয় লোকদের হাতে ভারার্পণ করিয়া নাগাসাকি ও এড্ডোমধ্যবর্ত্তী তারপথ প্রস্তুতের বিলম্বই তা'র প্রমাণ।" কিন্তু জাপা-নীরা লেখিকার তথাকথিত ঐ উপকারকে উপকার মনে করিতে বড়ই নারাজ!

ইহার পরবর্ত্তী সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত জাপানের অপ্রতিহতভাবে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা যেমন বিস্ময়পূর্ণ—তেমনি আনন্দজনক। অল্পদিন হইল সর্ব্বসাধারণ ইহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে জাপান সভ্যতার যে স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের জাতীয় একতার ইতিহাস সর্ব্বথা আলোচনার যোগ্য। জলে স্থলে এখন ইহারা আপনাদের মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায় ইহাদের সমকক্ষ আর নাই। বিদেশীভ্রমণকারী এশিয়ার অতি দূরপ্রান্তের নগরীপ্রধানা টোকীতে উপস্থিত হইয়া যেদিকে নয়ন ফিরাইবেন, ইহার অতুল স্বভাবশোভার সঙ্গে ধনসম্পদ ও শিক্ষাসৌকর্য্যের জীবন্ত চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। কর্ম্মফল জাপানকে তাহার প্রতিভা

এবং অক্লান্ত অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়াছে। এখন, যাঁহারা নিরব-চ্ছিন্ন শিক্ষার জন্য অথবা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৈদেশিক জাতিদের অবস্থা আলোচনা করেন, তাঁহারা হৃদয়ের সহিত এই নবীন জাতির নূতন শ্রীসৌভাগ্যের স্থায়িত্ব কামনা করি-বেন, এবং পতিত জাতিসকল অল্পবিস্তর আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া এই আশ্চর্য্য জাতির ইতিহাস আলোচনাদ্বারা অসম্ভাবনার নিরাশান্ধকার দূর করিতে পারিবে।

জ্যোতিষের সহিত তাপের সম্বন্ধ-বিচার।

জ্যোতিষের সহিত তাপের সম্বন্ধ। আপাততঃ অনেকের মনে হইতে পারে যে, তাপ কেবল পরীক্ষা-মূলক-পদার্থ-বিদ্যার বিষয় বিশেষ; ইহার সহিত গ্রহগণিতের কোন বাস্তব সম্বন্ধ থাকা সম্ভাব্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বোধ হইত না। কিন্তু পদার্থবিদ্যা-বিশারদদিগের অভিনব গবেষণা দ্বারা প্রতীতি হইয়াছে যে তাপের সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে; এমন কি যে সকল প্রধান প্রধান সাধন সহকারে জগৎ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাপ অন্যতম সাধন। তাপপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত বিস্তর জ্যোতিষিক ব্যাপার ঘটে; অতএব তাপবিষয়ক বিবরণ অবশ্য জ্যোতিষের অঙ্গীভূত।

জ্যোতিষ্কগণ কঠোর পরমাণুবিশিষ্ট পদার্থ, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বা-বতের গত্যাদির বিচারণায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়; সে সমস্ত শীত বা উষ্ণ তাহা উক্তরূপ বিচার-স্থলে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া বোধ হয়। কথাও মিথ্যা নহে যে, সূর্য্যের তাপ যতই হউক এবং গ্রহগণ শীত বা উষ্ণ হউন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যথানিয়ম পরিভ্রমণের কোনরূপ ব্যতিক্রম বহুকালেও ঘটে না। পরন্তু তাপকর্ত্তৃক কালসহকারে গ্রহগতিতে যে কথঞ্চিৎ বিষমতা ঘটে, তাহা অনিবার্য্য। গ্রহগতি সম্বন্ধে তাপের ফল অচির-উপলভ্য নহে। কিন্তু তাপের যে কিছু ফল আছে তাহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য এবং সেই ফলপ্রযুক্ত যুগান্তে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটে।

পৃথিবীর তাপ। ভূপৃষ্ঠ দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে, ভূগর্ভ তাপশূন্য। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে সে ভ্রম আর থাকে না। জ্বালামুখ, উষ্ণপ্রস্রবণ ইত্যাদি দেখিয়া বিশ্বাস হয় না যে পৃষ্ঠ অপেক্ষা অভ্যন্তরে প্রভূত প্রখর তাপ আছে? আভ্যন্তরিক তাপের লক্ষণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আভ্যন্তরিক তাপের মূলকারণ অবশ্য দুরবগম্য, কিন্তু ভূগর্ভ যে তাপভাণ্ডার, তাহার সন্দেহ নাই। গভীর খনিতলে তাপমান যন্ত্র লইয়া যাও, দেখিবে যে তথা উপরিভাগ অপেক্ষা তাপ অধিক; যতই নিম্নে যাইবে ততই তাপের বৃদ্ধি দেখিবে। তাপে যদি এইরূপ ক্রম-বৃদ্ধি হয় তবে ২০, ৩০ মাইল নীচে—যেখানে আমাদের যাইবার শক্তি নাই, লোহিত লৌহবৎ তাপ থাকা অসম্ভাব্য নহে।

অন্যান্য জ্যোতিষ্কে তাপের অস্তিত্ব। অন্যান্য জ্যোতিষ্কে যে তাপ আছে
বা ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ চন্দ্রমণ্ডল দেখ। এ মণ্ডল পূর্ব্বে অত্যন্ত
উত্তপ্ত ছিল, এক্ষণে শীতল হইয়াছে; তত্রত্য অনন্যসাধারণ নির্ব্বাপিত জ্বালামুখ সকলই
তন্মণ্ডলের উক্তরূপ অবস্থার নিদর্শন। চন্দ্রমণ্ডলের জ্বালামুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ প্রভৃতি
উৎপাত সকল বহুকালাবধি হয় না, সুতরাং চন্দ্রের উপরিভাগ এক্ষণে শীতল হইয়াছে; ভিত-
রের অবস্থা যে কি তাহা ঠিক বলা যায় না। উত্তরোত্তর উদ্ধ্বচল, দেখিপাম পৃথিবী
অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনিতে অধিক তাপ আছে; ইহা অনুমান মাত্র নহে,—ইহা তথ্য।
স্বয়ং সূর্য্য তো একটি প্রকাণ্ড প্রজ্জলিত অনলকুণ্ড। যত বড় তেজস্বী পর পর ত্যজনা কেন,
সূর্য্যের তাপের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। নানাবিধ স্থিরতারাসমূহ স্ত্র সূর্য্যোপম
দেদীপ্যমান অনলকুণ্ড; এবং নীহারিকা নামক পদার্থপুঞ্জ সকলকে প্রভূত তাপাশয় ভিন্ন আর
কিছু বলিতে পারা যায় না। এই সকল দিব্য বিগ্রহের মধ্যে কাহার কত তাপ তাহা বলা
অবশ্য দুষ্কর, কিন্তু সকলের তাপ যে সমান নহে, তাহার সন্দেহ নাই। সূর্য্য এবং তারাগণ
অবশ্যই তপ্ততম; কিন্তু শীতল সুতরাং নিষ্প্রভ পদার্থের সংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহা
যুক্তিসঙ্গত। এগুলিকে আমরা দেখিতে পাই না, কাজেই তাহাদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ
নাই।

তাপোপশমের বিধি। পদার্থ যখন শীতল হইতে থাকে, তখন তাহা হইতে
তাপ বিনির্গত হয়। বায়ু বা গ্যাসে নিমগ্ন পদার্থের উষ্ণতা যদি বায়ু বা গ্যাস অপেক্ষা অধিক
হয়, তবে বহির্গত তাপের পরিমাণ অধিক হয় এই বিধি সার্ব্বত্রিক,—পৃথিবীতে এ বিধি
অলঙ্ঘনীয় এবং জগতের অন্যান্য স্থানে যে এ বিধির ব্যতিক্রম ঘটেনা, তাহা অনুমানসিদ্ধ।
অতএব প্রত্যেক গ্রহ হইতে,—প্রত্যেক তারা হইতে অবিরামে সমন্তাৎ অজস্র তাপধারা
বিনির্গত হইতেছে। তাপবিনির্গমনের দ্বারা গুরুতর ফলোৎপন্ন হয়। উদাহরণের স্বরূপ সূর্য্য-
মণ্ডল-বিনির্গত তাপের ফল সমালোচিত হউক।

সৌর-তাপ। মরীচিমণ্ডল হইতে সমন্তাৎ প্রদীপ্ত তাপস্রোত অনবরত বহির্গত
হইতেছে। এই তাপের অত্যল্পাংশ পৃথিবীতে আইসে, এবং তন্মাত্রই উপভোগ করিয়া পার্থিব
জীবগণ প্রাণধারণ করে। তাপই সর্ব্বপ্রকার গতির মূলকারণ। সূর্য্যমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত
না হইলে এত তাপ তথা হইতে আসিতে পারিত না। কতিপয় ঘটনা দর্শন করিয়া পণ্ডিত-
গণ এই তাপের একটা আনুমানিক পরিমাণ ধরিয়াছেন। রৌদ্রে আতসীকাচ ধরিলে কাচে
যে সমস্ত রশ্মি পড়ে, তাহা সূচলভাবে একত্রিত হইয়া কাচের অপরদিকে এক বিন্দুবিশেষে
জমা হয়; এই বিন্দুকে ঐ কাচের অধিশ্রয়ণী বলে। এই খানে কোন জিনিস ধরিলে তাহা
পুড়িয়া যায়। অধিশ্রয়ণীতে যে পরিমাণে তাপ জন্মে, তাহা সূর্য্যমণ্ডলের তাপ অপেক্ষা অধিক
হইতে পারে না। কাচের দ্বারা পদার্থকে পরমার্থতঃ সূর্য্যাভিমুখে কিয়দ্দূর লইয়া যাওয়া হয়।
অতএব কাচের ভিতর দিয়া আসাতে তাপের যে অপচিতি ঘটে, তাহা যদি না ধরা যায় তবে

আতসীর অধিশ্রয়ণী হইতে আতসীকে যত বড় দেখায়, তত বড় সূর্য্যকে যে স্থানে দেখাইবে
সেই স্থানের উষ্ণতার সমান অধিশ্রয়ণীর উষ্ণতা হইবে।

অত্যন্ত তেজস্বী এবং অত্যন্ত আতসী কাচের অধিশ্রয়ণীতে কোন পদার্থ রাখিলে তাহা
যেন বস্তুতঃ সূর্য্যা সমযুগে রবি আশহাজার মাইল অন্তরে পৌছে। এই স্থানে প্লাটিনম,
হীরক প্র তাপের তারতম্য যে অঙ্গা ধরিবামাত্র দ্রবী বা বাষ্পীভূত হইয়া যায়। আমাদের
সম্বন্ধে চন্দ্র যক্ষয়-মত ভূতত্ত্বের আশ্রটে যদি সূর্য্য আসেন তবে অখণ্ড ভূমণ্ডল মোমের মত
গলিয়া যাইতে পারে। পরিবর্ত্তন প

সৌরতাপের পরিমাণ সাধ্য? সূর্য্যের তাপের পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা
সুকঠিন। কৃত্রিম তাপাপেক্ষা তপনের তাপ এতই অধিক যে, কোনরূপ অঙ্কাদি দ্বারা তাহার
আনুমানিক পরিমাণ প্রকাশ করিলে সে বড়ই স্থূল ও অনিশ্চিত হয়। কৃত্রিম তাপের পরাকাষ্ঠা
যদি ৪০০০° ফারন্‌হিট ধরা যায়, তবে উক্ত যন্ত্রদ্বারা সৌরতাপের পরিমাণ ৮০০০° ধরিলে ভুল
হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অনেকে এ পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক ধরেন।

মণ্ডল যেমন উষ্ণ, তাপও তেমনই প্রচুর পরিমাণে বিনির্গত হয়। তাপের পরিমাণ নানা-
রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কোন পরিমাণই সংশয়বিহীন নহে। সাড়ে তেত্রিশ
ফুট পুরু বরফ দ্বারা যদি রবিমণ্ডল ঢাকা যায়, তবে ঐ বরফ এক মিনিটের মধ্যে গলিয়া
যাইবে। যদি ৪৫ ফুট ব্যাস পরিমিত তুষারস্তম্ভ অনবরত সূর্য্যমণ্ডলে প্রপতিত হইতে থাকে,
তবে উহার অগ্রভাগ মণ্ডল সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। রোজ
ষোল টন্ কয়লা পোড়াইলে যে পরিমাণে তাপ জন্মে, সেই পরিমাণে তাপ উক্ত মণ্ডলের এক
এক বর্গফুট হইতে বিনির্গত হয়। এই পরিমাণে তাপ যদি কৌশলক্রমে কারখানায় লইয়া
যাওয়া যায়, তবে এতদ্দ্বারা বহুশত অশ্ববলবিশিষ্ট প্রকাণ্ড এঞ্জিন সম্বৎসর চলিতে পারে।
পৃথিবীতে যত কল আছে, সমস্ত কলকে সূর্য্যমণ্ডলের বিঘাকতক স্থানের তাপ পাইলে চালা-
ইতে পারা যায়। রবিমণ্ডলের এক এক বর্গ ফুট হইতে অহরহঃ কত তাপ বাহির হইতেছে
তাহা ভাবিলে এবং মণ্ডলের পৃষ্ঠফলের সহিত তাহার অনুপাত চিন্তা করিলে বিস্ময়াভিভূত
হইতে হয়। বস্তুতঃ তাপক্ষয়ের পরিমাণ কল্পনাতীত।

মণ্ডলের পরিমাণের সহিত তাপ নির্গমের সম্বন্ধ। মণ্ডলের বিশা-
লতা অত্যধিক তাপনির্গমের অন্যতম কারণ। ক্ষণকালের জন্য দুইটি সূর্য্য কল্পনা কর এবং
একটির ব্যাস অন্যটির ব্যাসের দ্বিগুণ ধর। উভয় মণ্ডলের উপকরণীভূত পদার্থনিচয় যদি
সমভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে গোলদ্বয়ের তাপসঞ্চয়কে তাহাদের ঘনমানের অনুপাতী ধরিতে
হইবে। সুতরাং বড় সূর্য্যের তাপ ছোট সূর্য্যের তাপের আটগুণ হইবে। কিন্তু বড় সূর্য্যের
পৃষ্ঠফল ছোট সূর্য্যের পৃষ্ঠফলের চারিগুণ *। অতএব উভয় সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে শীতল হইবার

* গোলের পৃষ্ঠফল = $\text{ব্যাস}^{২} \times ৩\cdot১৪১৫৯$ গোলের ঘনফল = $\text{ব্যাস}^{৩} \times \frac{৩\cdot১৪১৫৯}{৬}$

পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ছোট সূর্য্যের উপরিভাগের এক এক অংশ হইতে যে পরিমাণে তাপ বাহির হইবে, বড় সূর্য্যের উপরিভাগের তৎপরিমিত এক এক অংশ হইতে তাহার দ্বিগুণ তাপ বাহির হইবে। অথবা আমাদের এই পরিদৃশ্যমান সাধার সহিত পৃথিবী অপেক্ষা অনধিক একটি কল্পিত সূর্য্যের তুলনা করিয়া দেখ ফল কি দাঁ লামুখ হইতে অগ্নি উদ আদৌ সমবস্থ হয়, তবে উভয়ে সমশীতল হইবার পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠের এ ভাগ এক্ষণে শীতল হইয়াছে সূর্য্যের পৃষ্ঠের এক এক ফুট হইতে শতগুণ তাপ বাহির হইবে র উর্দ্ধে চল, দেখি

রবির তাপভাণ্ডার ক্রমশঃ কি নিঃশেষমান হইতেছে? তাপের এতাদৃশ অমিতব্যয় দেখিয়া পৃথ্বীর এবং পার্থিব জীবকদিগের মঙ্গল সম্বন্ধীয় উক্তরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উত্থাপিত হয়। দয়াময় সবিতার এইরূপ অজস্র তাপদান ভিন্ন আমরা ক্ষণকাল জীবনধারণ করিতে পারি না; অতএব আমাদের প্রতি তাঁহার এই অনুগ্রহ চিরকাল সমভাবে থাকিবে কি না তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতি নিয়ত সৌরতাপের অত্যন্ত অপচয় দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে, তাঁহার তাপভাণ্ডার উত্তরোত্তর খালি হইতেছে; যদি খালি হয় তবে আমাদের গতি কি হইবে?

প্রশ্নটি অতি গুরুতর,—অধুনাতন বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়। প্রস্তাবের সমালোচনার প্রারম্ভে বিষয় সম্বন্ধে সুলভ তথ্যসমূহের পরীক্ষা আবশ্যক। জানা চাহি যে, রবিমণ্ডলের ক্ষয়সূচক কোন লক্ষণ দেখা যায় কি না। দিবাভাগে এ বৎসর যেমন উষ্ণতা ও আলোক অনুভূত হইতেছে, গত বৎসর দশ শত, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি এইরূপ উষ্ণতা ও আলোক অনুভূত হইত? গত দুই সহস্র বৎসর মধ্যে সৌরতাপের যদি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে সদৃশ পরিবর্ত্তন জন্তু ও উদ্ভিদ্‌-জীবনে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন তো কিছুই টের পাওয়া যায় না। বৈদিক ভারতে বা প্রাচীন চীনে জলবায়ুর যেরূপ অবস্থা ছিল, বর্ত্তমান ভারতে বা বর্ত্তমান চীনে জল বায়ুর সেইরূপ অবস্থা আছে। এখন যেখানে দ্রাক্ষা বা চা জন্মে, দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বেও সেইখানে দ্রাক্ষা বা চা জন্মাইত।

ভূতত্ত্ববিষয়ক প্রমাণ। পরন্তু এ যুক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে না; কারণ তাপের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলেও চাষের গুণে উদ্ভিদে সে পরিবর্ত্তনের ফল দেখা যায় না। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে অর্থাৎ চারি পাঁচ হাজার বৎসর মধ্যে তাপের যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা সুনিশ্চিত; কিন্তু অতি প্রাচীন কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূস্তরের লক্ষণরূপ যে লেখ্য তাহার ব্যাখ্যান্তর অসম্ভাব্য। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, এরূপ পরিবর্ত্তন সূর্য্যের তাপক্ষয়জনিত বলিয়া কদাপি বিশ্বাস হয় না। সত্য বটে যে এখনকার অপেক্ষা প্রাচীন কালের আবহাওয়া উষ্ণতর ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অঙ্গারযুগে কেন্দ্রাসন্ন প্রদেশেও নিরক্ষ প্রদেশের মত তাপের প্রাদুর্ভাব ছিল। পরন্তু তাহা হইলেও সেকালের সূর্য্যের উষ্ণতার আধিক্য সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ যেমন অঙ্গারযুগ—তেমনই আবার হৈমযুগ ছিল;

হৈমযুগে ভারত আদি সমকোটিবন্ধের দেশসমূহও উত্তর গ্রীনলণ্ডের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন তুষার-আবৃত ছিল। যদি ধর যে পূর্ব্বে সূর্য্য অত্যন্ত উষ্ণ ছিলেন, তজ্জন্য বিস্তর গাছপালা জন্মিয়াছিল, এবং সেই গাছপালা সকল অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে; তাহা হইলে পক্ষান্তরে ধরিতে হইবে যে, হৈমযুগে রবি অপেক্ষাকৃত শীতল ছিলেন। অতএব সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনির্গত তাপের তারতম্য যে অঙ্গারাদিযুগের কারণ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। সূর্য্যের বহু-বার্ষিক-তাপক্ষয়-মত ভূতত্ত্বের আশ্রয়ে সমর্থন করা যায় না, কারণ হৈমযুগ এ মতের বিরোধী। পার্থিব শীতোষ্ণতার পরিবর্ত্তন পৃথিবীগত পরিবর্ত্তনের দ্বারা ঘটিবার সম্ভাবনা। পৃথ্বীগত পরিবর্ত্তন কি? পৃথিবীর অক্ষের অবস্থানের পরিবর্ত্তন,—পৃথিবীর বাস্তবী কক্ষার অবস্থানের পরিবর্ত্তন। পৃথিবীর শীতোষ্ণতার কারণ যাহা হউক না কেন, তদ্দ্বারা সৌর-ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় কোন ঘটনার উপলব্ধি হয় না।

সূর্য্য ক্রমশঃ শীতল হইতেছেন। সূর্য্যের তাপ যে কতযুগ রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। অথচ এমনও বিশ্বাস হয় না যে সবিতার তাপপ্রসবিনী শক্তি আছে। পার্থিব পদার্থ সমূহ যে সকল নিয়মাধীন, সূর্য্যের অপরিসীম সামগ্রী নিচয়ও সেই সকল নিয়মের অধীন। তাপের এই অপর্য্যাপ্ত অপচয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে এত তাপ কোথা হইতে আইসে? এ সম্বন্ধে কাহার কি মত তাহা দেখা যাউক। দুইটি লোহিত-তপ্ত লৌহ গোল পাশাপাশি রাখ,—একটি ছোট একটি বড়। দুইটিই এক অগ্নিকুণ্ড হইতে বহিষ্কৃত এবং দুইটিই সমান তপ্ত। দুইটিই ক্রমে শীতল হইবে; ছোটটি শীঘ্র শীতল সুতরাং শ্যামবর্ণ হইবে, বড়টি আরও ক্ষণকাল লাল সুতরাং উষ্ণ থাকিবে। গোল যত বড় হইবে তত বিলম্বে ঠাণ্ডা হইবে। এই দেখিয়া অনুমান হয় যে, অত্যুতপ্ত প্রকাণ্ড সৌরমণ্ডল যদিও ক্রমশঃ শীতল হইতেছে তথাপি শত সহস্র লক্ষ লক্ষ বর্ষেও উহা আলোক ও তাপের আকরস্বরূপ থাকিবে। কিন্তু এ উপক্ষেপ গণিত সিদ্ধ হইতে পারে না। স্বকীয়া উষ্ণতা ভিন্ন তাপ সংগ্রহের কোন উপায় যদি না থাকে তবে রবির তাপ বর্ষে বর্ষে অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। দুই হাজার বৎসর মধ্যেই তাপের বিলক্ষণ অপচয় দৃষ্ট হইতে পারে; অথচ এরূপ তাপক্ষয় যে ঘটে নাই তাহাও নিশ্চয়: রবিমণ্ডল ক্রমশঃ শীতল হইতেছে বলিয়া যে তাহা তাপ বিনির্গমের কারণ তাহাও ইহাতে পারে না।

দাহ দ্বারাও কিছু উপলব্ধি হয় না। তবে কি সূর্য্যমণ্ডল সমবেত অগ্নিহোতৃ কুলের সমিদাদি দ্বারা চিরপ্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ড? সূর্য্য চিরসঞ্চিত অক্ষয় দাহ্য পদার্থ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হুতভুক হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু এমতও গণিতের অনুমোদিত নহে। সূর্য্যমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন সসার অঙ্গার স্তূপ হইলেও ৬০০০ বৎসর মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এ মণ্ডল আগর্ভ অঙ্গারাত্মক হইলেও ঋগ্বেদ সংগ্রহ কালে যেরূপ তাপ বিনির্গত হইত, সেইরূপ তাপের ব্যয়ে এখন পর্য্যন্ত হইলে মণ্ডলের অনেক অংশ দগ্ধ হইয়া যাইত। অতএব এ মত অসমর্থনীয়।

মণ্ডলের বহির্ভাগ হইতে তাপাগম। মণ্ডলের বহির্ভাগ হইতে তাপ আসিয়া মণ্ডলে সঞ্চিত ও পুনঃব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা, সম্ভাবনা কেন? নিশ্চয়ই হয়; অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে রবিমণ্ডলে উল্কোদ্ভব সামগ্রী নিচয়ের অবপাতজনিত তাপাগম হয়। মণ্ডলোপরি এবম্ভূত পদার্থের যে পতন হয় তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে উল্কেয় পদার্থদ্বারা তাপোপচয়ের অতি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। উল্কাপাত বিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব অক্ষর ভাণ্ডার। কোটি কোটি উল্কাপাতের মধ্যে কতিপয় ভূবায়ুতে প্রবেশ পূর্ব্বক লয়প্রাপ্ত হয়; অপরগুলি সূর্য্যমণ্ডলে নিপাতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। ইহাও স্বীকর্ত্তব্য যে পতনের সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি ও তাপের উৎপত্তি হয়। উল্কাপতনকালে ভূবায়ুতে যে তাপাগম হয় তাহা অতি অকিঞ্চিতকর—অনুভূতই হয় না। উল্কাপাতজনিত সূর্য্যের যে তাপাধিক্য ঘটে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, অনেকে অনুমান করেন যে তদ্দ্বারা মণ্ডলের তেজস্বিতা জন্মে।

উল্কাপাত দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের তাপরক্ষা অসম্ভাব্য। ন্যায়বান তুলা বা আঢ়কধারীর হাতে ফেলিয়া এ মত কতদূর সত্য তাহা দেখা উচিত্। কি পরিমাণে সূর্য্যমণ্ডলে উল্কা পড়িলে মণ্ডলের বর্ত্তমান তাপের সমতা রক্ষা পাইতে পারে তাহা গণিত সহকারে প্রথমত ঠিক করা আবশ্যক। উল্কাপিণ্ডের দ্বারা তাপের সমতা রক্ষা করিতে হইলে সে পিণ্ডের পরিমাণ এত অধিক যে তাহা মোণ বা টন্ দ্বারা ব্যক্ত করা সাধ্য নহে, চলিত মোণের কর্ম্ম নহে, প্রকাণ্ড বাটখারা চাহি। চন্দ্রকে বাটখারা কর, চন্দ্রের মোট ওজনকে মোণ ধর। মনে কর ২০০০ মাইল ব্যাস পরিমিত এই প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডল কোটি কোটি খণ্ডে চূর্ণীকৃত হইয়া রবিমণ্ডলে পতিত হইল, এখন এই উল্কাবৃষ্টিদ্বারা এত তাপ জন্মিতে পারে যে তাহা রবি এক বৎসরে খরচ করিয়া উঠিতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবীকে পিষে ধূলার মত গুঁড়া করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলে এত তাপ উদ্ভূত হইতে পারে যে, যে হিসাবে এক্ষণে তাপ বাহির হইতেছে সে হিসাবে রবির শতবর্ষ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। এইরূপে যদি বার্হস্পত্যমণ্ডল চূর্ণ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে পড়ে, তবে বৃহস্পতি যে পরিমাণে পৃথিবী অপেক্ষা বড়, সেই পরিমাণে তাপ ও আলোক জন্মিতে পারে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত সৌর-জগৎ ঝল্সাইয়া যাইতে পারে। সমস্তগ্রহ উল্কারূপে রবিমণ্ডলে পড়িলে ৪৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে তাপ থাকিতে পারে।

অতএব উল্কাবৃষ্টি দ্বারা রবির তাপসঞ্চয় সম্ভাব্য হইলেও দেখিতে হইবে যে, যদিও চন্দ্র এক বৎসর এবং বৃহস্পতি ৩০০০০ বৎসর পর্য্যন্ত তাপ যোগাইতে পারেন কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা কি উক্তরূপে তাপ-যোগান? বৎসর বৎসর কি চন্দ্রমণ্ডলের সামগ্রী পরিমিত উল্কা সূর্য্যমণ্ডলে পড়ে? উত্তরে না ভিন্ন আর কি বলিবেন। বর্ষমধ্যে রবিমণ্ডল বস্তুতঃ যে পরিমাণে উল্কাপাত হয়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহা সমস্ত উল্কার অতি অল্প অংশ। অতএব প্রতি বর্ষে চন্দ্রমণ্ডল পরিমিত উল্কাপাত হইলে উল্কার সংখ্যা কল্পনাতীত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে পৃথিবীতে এত উল্কা পড়িত যে, আমাদের এখানে থাকা ভার হইত, এবং

তাপের আতিশয্য প্রযুক্ত ভূমণ্ডল জীবশূন্য হইয়া পড়িত। যদি বল যে সৌর-মণ্ডল সন্নিকর্ষে রাশি রাশি উল্কা আছে, কিন্তু এ মতও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে বুধের গতিতে ব্যতিক্রম ঘটিত। সত্য বটে বুধের গতিতে কথঞ্চিৎ বিষমতা দৃষ্ট হয় এবং তাহার কারণও অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সে বিষমতা এত অল্প যে, তাহা উল্কাপাত-নিবন্ধন হইলে উল্কাপাত সংখ্যা এত কম হইবে যে তদ্দ্বারা রবিমণ্ডলের তাপের সমতা রক্ষা পাইতে পারে না। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদগণের বিশ্বাস এই যে উল্কাদ্বারা রবির দৈনিক তাপব্যয়ের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হইতে পারে কিন্তু খরচের অধিকাংশ উপায়ান্তর হইতে চলিতেছে।

উত্তপ্ত গ্যাসাত্মক গোলের সঙ্কোচন। তাপের অপর্য্যাপ্ত অপচয়সত্ত্বেও সৌর-মণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস হয় না, এই বিষম প্রহেলিকাভাসের মীমাংসা অধুনাতন বিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। পূর্ব্বে যদ্রূপ নীহারিকার উল্লেখ করা হইয়াছে * তদ্রূপ অন্তরীক্ষে বিশাল উত্তপ্ত গ্যাসময় গোল কল্পনা কর। এবং মনে কর এই গোল যে পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ হইতে তাপ পায় তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ ইহা হইতে বাহির হয়, সুতরাং এই গোল হইতে তাপের অপচয় হইতে থাকিবে, কিন্তু তা বলিয়া উহার উষ্ণতা কমিবে বলা যাইতে পারে না। তাপ বাড়িবে বলিলে আপাততঃ বিরোধাভাব উপস্থিত হয় কিন্তু তাপ এবং গ্যাসের ধর্ম্মই এমন যে তাপক্ষয়ে তাপের বৃদ্ধি হয়।

এই কল্পিত গোলের পৃষ্ঠগত গ্যাসের একাংশের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিক্ষেপ কর। উপরের গ্যাস অপর সমস্ত গ্যাসদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গোলের মধ্যাভিমুখে প্রেরিত হইতে পারে কিন্তু গ্যাসাত্মক পরমাণু সকলের মধ্যে যদি সাম্যাবস্থা থাকে অর্থাৎ পরমাণু সকল যে যেখানে আছে সে সেইখানে থাকে, এদিক্ ওদিক্ চালিত না হয়, তবে উপরের গ্যাস আর ভিতর পানে যাইতে পারিবে না—কারণ নীচের গ্যাস উপরের গ্যাসকে ঠেলে ফেলিবার চেষ্টা করিবে সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ যে পরিমাণে অধিক হইবে সেই পরিমাণে ঠেলও অধিক হইবে। এখন মনে কর যে গ্যাসময় গোল হইতে তাপ বাহির হওয়ায় গোল ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল, উহার উষ্ণতা কমিল। উষ্ণতা কমিলে ঠেল কমে, ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ব্যাপার, কাজেই উপরস্থ গ্যাসস্তরের অধোভাগে যে গ্যাস, তাহার ঠেল কমিবে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ কর্তৃক ঠেলন পরাভূত হইবে এবং ফলতঃ গোল আকারে কমিবে।

শক্তিবাদ। বিষয়টি প্রকারান্তরে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। তাপ আর শক্তি একই; অতএব গোল হইতে তাপ নির্গত হইলেই গোলের অবশ্য শক্তি ক্ষয় হইল। গোলের শক্তির

* এ উল্লেখ মৎপ্রণীত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে আছে। গ্রন্থ অদ্যাপি ছাপা হয় নাই। এ সম্বন্ধে কোন ইংরাজি জ্যোতিষ দেখুন।

কিয়দংশ তদীয় উষ্ণতাসম্ভূত ; কিন্তু সম্বন্ধ বিশেষে শক্তির প্রধান অংশ পরমাণু সকলের পরস্পর হইতে পরস্পরের বিশ্লেষিত হইবার উদ্যম সম্ভূত। পরমাণুগুলিকে যদি সমাসন্ন হইতে দেওয়া যায়, তবে বিশ্লেষণসম্ভূত শক্তির হ্রাস হইবে এবং এই বিনির্মুক্ত শক্তি তাপাকারে পরিণত হইবে কিন্তু পরমাণু সকলের সমাসন্নতা প্রযুক্ত গোলটি অবশ্যই সঙ্কোচিত হইবে।

এখন কি অপূর্ব্ব ফলোৎপন্ন হয় তাহা দেখ। জ্যোতিষের সহিত এই ফলের গুরুতর সম্বন্ধ। গোলের সঙ্কোচন ঘটিলেই বিশ্লেষণ-সম্ভূত শক্তি তাপে পরিণত হইল। এই তাপের কিয়দংশ বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্কোচন দ্বারা যে পরিমাণে তাপ জন্মে, সে পরিমাণে তাপ বিনির্গত হয় না ; ফল এই দাঁড়ায় যে গোলের শক্তি যদিও বস্তুতঃ অপচিত হইতে থাকে এবং গোল ছোট হইয়া যায় তথাপি উহার উষ্ণতা বস্তুতঃ বাড়িতে থাকে। মনে কর সঙ্কোচন জন্য গোলটির আন্তব্যাস অর্দ্ধমিত হইল। এখন পিণ্ডের কোনস্থানের এক ঘন ইঞ্চ পরিমিত গ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সঙ্কোচন প্রারম্ভের পর চতুরস্র ঘনটির প্রত্যেক ধার অর্দ্ধইঞ্চ হইয়া যাইবে সুতরাং পিণ্ড আদিপিণ্ডের অষ্টমভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে। গ্যাসের ধর্ম্মই এই যে উষ্ণতার পরিবর্ত্তন যদি না হয়, তবে ঠেল পিণ্ডের বিলোমানুপাতী হইবে সুতরাং কিউবের আভ্যন্তরিক ঠেল আটগুণে বাড়িবে। এক্ষণে প্রত্যেক পরমাণুর ব্যবধান অর্দ্ধীকৃত হওয়াতে পরমাণুদ্বয়ের আকর্ষণ চতুর্গুণ হইবে এবং ক্ষেত্রফল চারি আনা রকম হওয়াতে হ্রস্বীকৃত কিউবের ঠেল ষোলগুণ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উষ্ণতা সমান থাকিলে ঠেল আটগুণ হয় অতএব উষ্ণতা সমান থাকিতে পারে না, সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বাড়িতে থাকে।

তবেই কথঞ্চিৎ বিস্ময়জনক ফল এই দেখা যাইতেছে যে, অন্তরীক্ষে গ্যাসময় গোল হইতে তাপ বাহির হইলে গোল ক্রমে ছোট হইতে থাকে কিন্তু উষ্ণতা বস্তুতঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ রকম চিরকাল চলিবে না। গ্যাসপিণ্ড কি দিন দিন সঙ্কোচিত হইতে থাকিবে ? এবং উষ্ণতা কি ক্রমশঃ ভয়ানক তীব্রতা প্রাপ্ত হইবে ? এবং তাপ যত অপচিত হইবে ততই কি তাপ বিনির্গমনের আধিক্য জন্মিবে ? এ ব্যাপারের কি সীমা নাই ? সঙ্কোচনপ্রযুক্ত পিণ্ডের সান্দ্রত্ব বাড়িবে যাবৎ না উহা দ্রবত্ব বা সসারত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাবৎ না উহাতে আমাদের স্বীকৃত পক্ষানুসারে উহার গ্যাসাত্মক পদার্থের ধর্ম্মের বিরতি না হয়। গ্যাসধর্ম্ম তিরোহিত হইলেই বিতর্কও তিরোহিত হইল, পরিণামে তাপের অপচয় জন্য উষ্ণতার অপচয় অবশ্যই জন্মায়, অবশেষে পিণ্ডের উষ্ণতা পার্শ্বস্থ গগণের উষ্ণতার সহিত সমান হইয়া যায়।

সূর্য্যমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা। এ যুক্তি সূর্য্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাবয়বে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। রবিমণ্ডল এখন এত সান্দ্র যে উহাতে ঠিক গ্যাসের ধর্ম্ম না থাকিতে পারে। এ যুক্তি খাটাইতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্বে সূর্য্য অধিকতর গ্যাসাত্মক ছিলেন, এক্ষণে গ্যাসময় ও নিরেট এই দ্বিবিধ অবস্থার মাঝামাঝি আছেন ; অতএব এ কথা বলা যায় না যে সঙ্কোচন অনুসারে সূর্য্যের উষ্ণতা এক্ষণে বৃদ্ধি

পাইতেছে। উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতেছে কি না তাহা মীমাংসা করিবার উপায় নাই। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে এখনও এত গ্যাস আছে যে উষ্ণতার বৃদ্ধিপক্ষে সন্দেহ হইতে পারে না। মণ্ডলের সসার অংশের তাপক্ষয় দ্বারা গ্যাসাত্মক অংশের তাপবৃদ্ধি কিয়দংশে বা সম্পূর্ণরূপে নষ্টীভূত হইতে পারে। যদি এক অংশের তাপবৃদ্ধি অপরাংশের তাপক্ষয়ের সমান হয়, তবে সূর্য্যের শীতল হইতে অনেক বিলম্ব আছে। এই কারণ বশতঃই সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনির্গত তাপের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য ঘটিতেছে কি না তাহার প্রমাণ দেখা যায় না।

সূর্য্যমণ্ডলের শক্তি। সূর্য্যমণ্ডলে একটি শক্তিভাণ্ডার আছে। সেই শক্তির কিয়দংশ বিনির্গত তাপরূপে প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ; অবশিষ্ট শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তরিত হয়, এবং কিয়ৎপরিমাণে তাপরূপে পরিণত হইয়া যে তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা পূরণ করে। সুতরাং রবির শক্তির সমষ্টি অপচিত হইতেছে তজ্জন্য অনুমান হয় কোন না কোন সময়ে ইহার শক্তি নিঃশেষিত হইবে এবং তখন আর মণ্ডল তাপ ও আলোকের আকর বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যে পরিমাণে মণ্ডল সঙ্কোচিত হইতেছে তাহা অতি অল্প। মণ্ডলের কতটুকু কমিল তাহা আমরা মাপিয়া ঠিক করিতে পারি না। কমের পরিমাণ এত অল্প যে বিশুদ্ধ জ্যোতিষের সৃষ্ট্যবধি একাল পর্য্যন্ত সঙ্কোচন এত হয় নাই যে তাহা দূরবীক্ষণে টের পাওয়া যায়, যে পরিমাণে দিন দিন তাপ বিনির্গত হয় সেই পরিমাণে যদি শক্তিক্ষয় ধরা যায়, তবে সঙ্কোচনের পরিমাণের একটা হিসাব করিতে পারা যায়। এক্ষণের সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস ৮,৬০,০০০ মাইল যদি প্রতি বৎসরে এই ব্যাস ২২০ ফুট করিয়া কমে তবে যে পরিমাণে তাপ বিনির্গত হয় তাহার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হইবে। এই ক্রম অপচয় অনিবার চলিয়াছে।

উক্তরূপ হিসাবে যদি মণ্ডল কমিতে থাকে, তবে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে মণ্ডলের ব্যাস ৪ মাইল অধিক ছিল, ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে ৪০ মাইল এবং ১০০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ব্যাসাপেক্ষা ৪০০ মাইল অধিক ছিল। ভূতলে নরের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে উক্তব্যসমান সহস্র সহস্র মাইল পরিমাণে অধিক ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মণ্ডল যে এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে এমন বিবেচনা করিবেন না। ব্যাস-পরিমাণ এত অধিক যে দশহাজার মাইল কমিলে ব্যাসের শতাংশের একাংশ মাত্র কমিল। রবি যদি একবারে অকস্মাৎ ১০০০০ মাইল কমিয়া যায়, তবু সাধারণের চক্ষু তাহা টেরই পাইবে না ; পরন্তু ইহা অপেক্ষা অপচিতির অংশ ন্যূন হইলেও জ্যোতিষীর চক্ষে তাহা ধরা পড়িবে। তা বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে, পূর্ব্বে পৃথিবীর আব হাওয়া আর এক রকম ছিল কারণ সূর্য্যের তাপালোক ব্যতীত জল বায়ু পরিবর্ত্তনের অন্যতর কারণ আছে।

নীহারিকা বাদ। যুগ সুদূরপ্রস্থিত হইলেও সিংহাবলোকনের ন্যায় যে অতীত পর্য্যবেক্ষণ তাহার আকস্মিক বিরাম কোন যুগেই হইতে পারে না। যুগ হইতে যুগান্তর মনু হইতে মন্বন্তর, অর্থাৎ উত্তরোত্তর প্রাচীনতর কালে প্রবেশ কর্ত্তব্য। স্তরীভূত শৈলসঞ্চয়ের

জন্য ভূতত্ত্ববিদের গণিতাগত কাল অতীত করিয়া ভূপৃষ্ঠে জীবোদয়ের প্রারম্ভে উপনীত হইলে দেখা যাইবে যে সূর্য্যের ক্রমশঃ তাপক্ষয় হইতেছে; অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ছিল। তাপক্ষয় চিরকাল সমভাবে চলিতেছে না। এক্ষণে ভৌতিক জগতের নিয়মসকল যেরূপ দেখা যাইতেছে, এরূপ যদি আবহমান কাল হইয়া থাকে, তবে এমনও সময় ছিল যখন সূর্য্য এখনকার অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় ছিলেন। কখন্ যে দ্বিগুণ ছিলেন, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না—বলিতে সাহসও করেন না। সূর্য্য দশগুণ বৃহৎ ছিলেন এমনও দিন ছিল। মণ্ডলের আয়তনের বৃদ্ধির সহ মণ্ডলের সান্দ্রত্বে ন্যূনতা অবশ্যই ছিল, অর্থাৎ আদিত্য আদৌ এক প্রকাণ্ড নীহারিকা পিণ্ডরূপে অন্তরীক্ষের বহুস্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান ছিলেন।

এই সুপরিজ্ঞাত নীহারিকা বাদানুসারে সৌরজগতের সৃষ্টি। এ মত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত করা যাইতে পারে না,—এ মত গণিত সহকারে উপপাদ্য নহে; ইহা অনুমান মাত্র, অথচ ইহাতে অল্পবিস্তর সত্য আছে, অথবা তাপের নিয়ম যদি চিরকাল সমান থাকে এবং আমাদের অবোধগম্য কোন আকস্মিক কারণ ভিন্ন আমাদিগের পরিচিত ভৌতিক নিয়ম সকল চিরকাল অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে নীহারিকাবাদ সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবার নহে। নীহারিকাবাদ কেবল সূর্য্যপক্ষে প্রযোজ্য নহে, এ সকল যুক্তি প্রত্যেক গ্রহেই খাটান যাইতে পারে। উত্তরোত্তর যত পুরাতন কালে যাইবে ততই দেখিবে যে গ্রহগণ উষ্ণতর ছিলেন। পৃথিবীও কোন কালে এত গরম ছিলেন যে এখানে কোনরূপ প্রাণী ছিল না। এমনও সময় ছিল যখন পৃথিবী ও গ্রহগণ লোহিত লৌহবৎ উত্তপ্ত ছিলেন। এবং কোন সময়ে পৃথিবী ও গ্রহগণ সূর্য্যের ন্যায় এক এক অনলকুণ্ড ছিলেন। সূর্য্য ও গ্রহগণের সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্তরীক্ষে এক প্রজ্বলিত গ্যাসপিণ্ড ছিল, তাহা হইতেই সূর্য্যাদি গঠিত হইয়াছিল। সৃষ্টি ঠিক কি রূপে হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে?

অসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিবসর্ব্বতঃ॥

তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে নীহারিকাবাদ সুসঙ্গত বোধ হয়।

সৃষ্টি সম্বন্ধে নীহারিকাবাদের অনেক উপক্ষেপের সহিত সৌরজগতের অনেক লক্ষণের সামঞ্জস্য দেখা যায়। গ্রন্থারম্ভেই বলা হইয়াছে যে সমস্ত গ্রহগণ একদিকে পরিভ্রমণ করেন এবং বারুণ জগৎ ভিন্ন প্রায় সমস্ত গ্রহগণ একদিকেই আবর্ত্তিত হয়। কোন বিশিষ্ট ভৌতিক কারণ ভিন্ন আক্ষ্য ও কাক্ষ্য গতির এরূপ একতা ঘটিতে পারে না। নীহারিকাবাদ স্বীকার করিলেই সে ভৌতিক কারণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মনে কর বহু বহু যুগপূর্ব্বে অন্তরীক্ষে এক বিশাল নীহারিকা ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত ও অল্পে অল্পে সঙ্কোচিত হইতেছিল। সঙ্কোচিত হইতে হইতে নীহারিকার কতিপয় ঘনীভূত খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং অংশগুলি মধ্যস্থিত পিণ্ডের সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। সঙ্কোচনের ক্রমবৃদ্ধি সহকারে অক্ষাবর্ত্তনের

বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং পরিণামে খণ্ডগুলি ঘনীভূত হইয়া গ্রহরূপ ধারণ করিবে এবং মধ্যস্থিত মূলপিণ্ড সদৃশ প্রক্রিয়াজনিত সূর্য্যরূপে পরিণত হইবে। পুনঃ গ্রহগণ হইতে উক্তবৎ ভৌতিক ক্রিয়াযোগে উপগ্রহের সৃষ্টি হইবে এবং উপগ্রহগণ মূলগ্রহ পরিতঃভ্রামিত হইতে থাকিবে। এইরূপে সৌরজগতের প্রধান প্রধান লক্ষণের নিদান লাভ হইতে পারে।

নীহারিকাবাদের নাক্ষত্রিক প্রমাণ। গগণমণ্ডলের তারাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয় যে সৌরজগৎ নীহারিকামূলক। রবির সহিত তারাগণের সাদৃশ্যের কথা পূর্ব্বে বিস্তর বলা হইয়াছে; সুতরাং নীহারিকাবাদানুসারে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা সেই সকল পরিবর্ত্তন যদি সূর্য্যমণ্ডলে ঘটিয়া থাকে তবে তারাগণ মধ্যে তদ্বৎ ব্যাপার সকল অবশ্যই লক্ষিত হইবে। পরন্তু সূর্য্যমণ্ডল বস্তুতঃ এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তারাগণকে অদ্যাপি তদপেক্ষা প্রাগ্‌ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

সামান্যতঃ বৃহদ্দূরবীক্ষণের দৃষ্টিক্ষেত্রে অন্তরীক্ষের শ্যামাভ পশ্চাৎ ভূমিতে কতিপয় তারা বিকীর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ভূমির শ্যামত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। সুনিপুণ দর্শকের নেত্রে নভোমণ্ডলের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট দীপ্তিপুঞ্জ প্রতিভাত হয়। কখন কখন এই দীপ্তিপুঞ্জ সমস্ত দৃষ্টিক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকে কখন বা উহা একাধিক দৃষ্টিক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া থাকে; বহুবর্ষেও উক্ত তেজোরাশিতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। এরূপ দর্শন ভ্রমাত্মক নহে; সুতরাং অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত পদার্থ সকল বিশাল অস্পষ্ট প্রজ্জ্বলিত গ্যাস বা বাষ্পপুঞ্জ। ইহাকে বলে শুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত নীহারিকা, ইহা অত্যন্ত হীনপ্রভ এবং যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম। আবার মধ্যে মধ্যে সুপরিচ্ছিন্ন সুন্দর দীপ্তিমৎ বায়ুমণ্ডল পরিবেষ্টিত তারাও নয়নগোচর হয়। এই উভয়বিধ নীহারিকার মধ্যে অর্থাৎ ম্লান বিরল বাষ্পরাশি এবং নীহারিকা-পরিবৃত তারা এই দুইএর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বহুজাতীয় নীহারিকা থাকিবার সম্ভাবনা। এই দেখিয়া স্যার উইলিয়ম হার্‌সেল তারাসৃষ্টিবাদ প্রচার করেন।

হার্‌সেলের মত। হার্‌সেলের মতে নীহারিকাসকল বিশাল ফস্‌ফরাত্মক বাষ্পরাশি। এই বাষ্পরাশি ক্রমে ক্রমে শীতল হয় এবং পরিণামে একটী বা একাধিক তারারূপে প্রকাশ পায়। বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট নীহারিকা সকল শ্রেণীবদ্ধ করিলে বোধ হইবে যেন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রত্যেক অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হইল। অস্পষ্ট বিশাল নীহারিকায় ঘনীকরণরূপ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ লক্ষিত হইবে; ক্ষুদ্রতর ও উজ্জ্বলতর তারায় ঘনীকরণ ক্রিয়া অনেকদূর অগ্রসর দেখিবে এবং অন্যান্য নীহারিকার স্থলে দেখিবে যে ঘনীকরণ সম্ভূত এক বা একাধিক তারা স্পষ্টাকারে দৃশ্যমান রহিয়াছে।

যদি বল যে হার্‌সেল কেমন করিয়া জানিয়াছিলেন যে এইরূপে নীহারিকা হইতে তারা সৃষ্ট হইয়াছিল? তাঁহার প্রমাণ কি? তবে উত্তর স্থলে এই উদাহরণটি আলোচনা কর। অরণ্যে যাও, শতাধিক বর্ষের বিশাল সালতরু অবলোকন কর। এই তরুবর যে কোন সময়ে বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখার উপচয় সহকারে বর্ত্তমান

বিপুলতা ও প্রকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু কেহই এ গাছের জন্মাবধি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখেন নাই। কেবল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার গাছ দেখিয়া উক্ত সালের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ছিল তাহাতে বিশ্বাস জন্মে। বৃক্ষ সমস্তের ক্রমাবস্থা দেখিয়া প্রত্যেক বৃক্ষের ক্রমাবস্থায় বিশ্বাস হয়।

এবম্ভূত যুক্তি সহকারে হার্‌সেল তারাসৃষ্টিবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু দূরবীক্ষণ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করা অবধি একাল পর্য্যন্ত নীহারিকা সমূহের কোনরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নরজাতি যদি বহুশতবর্ষ ভূতলে থাকে আর পর্য্যবেক্ষণের কাগজপত্র বিনাশ না পায়, তবে হার্‌সেলের মতের সত্যতার পরীক্ষা হইতে পারিবে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

অঙ্গারযুগ,	Carboniferous.	লোহিত-তপ্ত,	Red-hot.
উল্কেয়,	Metioric.	বিরোধাভাস,	Paradoxical.
কঠোর,	Rigid.	বিলোমানুপাতী,	In inverse ratio.
জীবোদয়,	Dawn of life.	বিশ্লেষণ,	Separation.
ঠেলন,	Pressure.	বিষমতা,	Perturbation.
তাপনির্গম,	Radiation of heat.	শক্তিবাদ,	Doctrine of Energy.
তারাসৃষ্টিবাদ,	Stellar Theory.	সঙ্কোচন,	Contraction.
দিব্য বিগ্রহ,	Heavenly body.	সসারত্ব,	Solidity.
দৃষ্টিক্ষেত্র,	Field of view.	সান্দ্রত্ব,	Density,
নীহারিকা,	Nebula.	সাম্যাবস্থা,	Equilibrium.
নীহারিকাবাদ,	Nebular hypothesis.	সিংহাবলোকন,	Retrospect.
পৃষ্ঠফল,	Superficial area.	সুপরিছিন্ন,	Well defined.
বারুণ জগৎ,	System of Uranus.	স্থিরতারা,	Fixed star.
বিতর্ক,	Argument.	হৈমযুগ,	Glacial period.

এই প্রস্তাবটি R. S. Ballএর Astronomical significance of heat দেখিয়া লেখা হইয়াছে।

নূতন কবিতা।

কে তুমি দেবের কন্যা ? প্রীতিময়ি ! তোমার যতনে
বসোরা-গেলোপ-কুঞ্জ ভরি গেল কুসুমে কুসুমে !
কে তুমি গো আহ্লাদিনি ? নেত্রে হাসি ! তোমার চরণে
মুখর নূপুর বাজে—রাগরক্ত পাদপদ্মচুমে
প্রফুল্ল অশোক-তরু ঝলসিল রতনে রতনে !
কে তুমি কৌতুকময়ি ? হেরি তোমা, শঙ্খ-ঘণ্টা-ধূমে,
শেফালির শাখে শাখে, গৃহাঙ্গনে, দূর বনভূমে
হ'ল পূজা ; উর্ব্বশী-উদ্বাহে মরি যেন, গো নন্দনে !
হে কবি চির-বাঞ্ছিত, এস, এস, কবির আশ্রমে।
হের দেখ পুষ্পরাশি ঢালি দিল তোমার চরণে
আমার কল্পনা-বধূ ; মন্দ মন্দ কর-আন্দোলনে
ডাকে তোমা কবিকুঞ্জে আশা-সখী বিলাস-বিভ্রমে !
যুগে যুগে জন্মে জন্মে নবোৎসাহে দেবেন্দ্র-বন্দিতা,
ধর ধর অর্ঘ্য-পুষ্প, দাসের এ নূতন কবিতা !

প্রত্যাবর্ত্তন।

আমরা যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, সেই দোকানদারের বাড়ী ও দোকান খুব কাছাকাছি ব'লে সে দোকান এবং ঘরের দু জায়গার কাজই চালাতে পারে। তার কটি ছেলে মেয়ে তা জানিনে, তবে একটি একটু বড় মেয়ে দোকানে এসে আমাদের জিনিষপত্র এনে দিয়েছিল। আমরা আজ সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন ক'রে ফেল্লুম। দোকানে চাউল মিল্‌লো না, এ পাহাড়ে রাস্তার অতি কম জায়গাতেই চাউল পাওয়া যায়। অনেকদিন পরে পিপুলকুঠীতে একদিন চাউল পাওয়া গিয়েছিল ; চাউল না পাবার কারণ এই যে, ভাতভক্ত বাঙ্গালী এদিকে প্রায়ই তীর্থ করতে আসে না, যে দু পাঁচজন আসে তারা অল্পদিনের মধ্যে অগত্যা ডাল রুটিতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। দোকানদারের মেয়ে আমাদের জন্যে আটা নিয়ে এল। আটার চেহারার বর্ণনাটা এখানে দিতে পাল্লুম না, সেটা আমার দোষ নয়, বঙ্গভাষায় তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করবার চেষ্টায় একেবারে হয়রাণ হয়ে গিয়েছি, তবে কাব্যরসবঞ্চিত বৈদান্তিকের মুখে একটা উপমার কথা শুনা গিয়েছিল, তিনি আটার রং

দেখে বলেছিলেন "একি আটা? তবু ভাল, আমি ভাবছি বুঝি খোল পিষে এনে দিয়েছে।"—কথাটা শুনে আমার মনে একটু তত্ত্ব-কথার উদয় হো'ল; আমি বল্লুম "আমাদের মনরূপ গাড়োয়ান এই দেহ গরুগুলার নাকে দড়ি দিয়ে ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কাঁধের জোয়ালও নামচে না, যাত্রারও অবসান নেই, শুধু মহাপ্রাণীটাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা এই রকম চাট্টি খোল বিচিলীর বন্দোবস্ত হচ্ছে।" স্বামীজি সকল অবস্থাতেই অটল, তিনি বোল্লেন 'অচ্যুত আজ তুমি যেমন পিঠে খেয়েছ, তেমনি এই আটা দিয়ে লুচি তৈয়েরী ক'রে তোমাকে পেটে খাওয়াতে পার্ত্তুম ত বড় আনন্দ হতো।"—"সেত আর কিছু কঠিন কথা নয়" বলে আমি দোকানদারের দোকানে প্রবেশ কল্লুন, এবং তার ঘিয়ের ভাঁড়টি বাদ সমস্ত ঘিটুকু নিয়ে এলুম; দোকানদার আমাদের এই ভোজন-ব্যাপারে স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য কর্ত্তে অঙ্গীকার করলে, সে তার বাড়ী হতে জিনিষপত্র এনে আমাদের যোগাড় ক'রে দিলে, তার মেয়েটি সন্ধ্যার সময় হতে আমাদের কাছেই বসে রইল। উনন জ্বলছে, আটা মাখা হচ্ছে, একটি ছোট প্রদীপে ছোট ঘরখানি আলোকিত হয়েছে, আর মেয়েটি যুক্তাসনে ব'সে তিনটি অপরিচিত অতিথির কারখানা দেখচে; সে একবার উননের আগুণের দিকে তাকাচ্ছে, একবার প্রদীপের দিকে চেয়ে দেখচে, একবার বা আমাদের দিকে চাইতেই আমাদের সঙ্গে যেমন চোখোচোখী হচ্ছে, অমনি মুখ নামিয়ে দুহাতের দশটা আঙ্গুল নিয়ে খেলা করচে। আমি বারে বারে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্ছিলুম, মুখখানি যে খুব সুন্দর তা নয়, তবে ভারি সরলতাপূর্ণ, চোখের উপর কাল কাল ভ্রূ, সমস্ত মুখখানি এবং রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন চুলের উপর প্রদীপের আলো প'ড়ে তাকে একটি পবিত্র আরণ্য ফুলের মত দেখাচ্ছিল, সুন্দর নাহোক কিন্তু সুবাস তার ঢাকা থাকে না। এই মেয়েটি তার ক্ষুদ্রজীবনের কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের মত কত দেশের কত অপরিচিত পথিক দেখেছে, কতদিন কত লোকের সুখদুঃখের সঙ্গে তার জীবনের একদিনের সুখদুঃখ, আনন্দ মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারের সকল বন্ধন কেটে যারা সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছে, পুত্রকন্যার স্নেহের টান এই দূর হিমালয়শৃঙ্গেও যাদের হৃদয়কে সবলে আকর্ষণ করেছে—এমন কত লোক এমনি সন্ধ্যাবেলা এই কুটিরে প্রদীপের আলোতে এই মেয়েটির কচি মুখখানি দেখে চির-বিদায়-ক্লিষ্ট-হৃদয়ে আপনার একটি সুন্দর ছোট মেয়ের করুণ আহ্বান অনুভব করেছে, হঠাৎ একটা অব্যক্ত মধুর ব্যথায় তাদের বুকের শিরাগুলো টন্‌টন্ করে উঠেছে; এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে আমি কুটীরের এক কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বৃষ্টি ও ঝড়ে আমার শরীরটেও বড় কাতর হয়েছিল, কাজেই আমাকে ঘুমুতে দেখে কেউ জাগিয়ে দেন নি; শেষে, কতক্ষণ পরে জানিনে, স্বামীজির ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বস্‌লুম; দেখি তখনো মিটমিট করে আলো জ্বলচে, উননের আগুণ নিবে গিয়েছে, মেয়েটিও চলে গিয়েছে, তার বদলে থালের উপর অনেকগুলি গরম লুচি, খোসাওয়ালা 'রহড়কী ডাল' আর ছোট একতাল গুড়, তাতে বালি, কাঁকর প্রভৃতি এমন অনেক জিনিষ প্রচুর পরিমাণে মিশানো যা

কোন কালে খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য হতে পারে না, কিন্তু তাই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করা গেল। আমার অনুরোধ ক্রমে দোকানদার তার মেয়েটিকে নিয়ে এল, বোধহয় সে ঘুমিয়ে ছিল, প্রথমে কিছুতেই খাবার নিতে চায় না, শেষকালে তার বাপের উপদেশে কিছু কিছু নিলে। দোকানদার নিজের বা গৃহিণীর হাতের রান্না ভিন্ন খায় না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষ উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াই নিজের পরিচয় দেয়, সুতরাং আমাদের এই আনন্দ-ভোজন হতে তাকে বঞ্চিত হতে হলো। আমরা খুব পরিতোষের সঙ্গেই আহার কল্লুম, পথের সমস্ত কষ্ট এবং ক্ষুধা এই গরম পুরি ও 'রহড়কী' ডালের সঙ্গে পরিপাক হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গী রোগা ছেলেটির প্রতিও এই পথ্যের ব্যবস্থা হো'ল, কিন্তু এই ব্যবস্থার সমালোচনা করবার উপযুক্ত লোক সেখানে ছিলেন না, এক স্বামীজি নাড়ী টিপ্‌তে জান্‌তেন কিন্তু তিনিই রোগা ছেলেটিকে স্বহস্তে 'ডাল ও পুরী' দিলেন।

আহারান্তে আবার নিদ্রা। অতি চমৎকার নিদ্রা; এই দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সকল জিনিষেরই অভাব ছিল, অভাব ছিল না কেবল একটি জিনিষের, সেটি হচ্ছে—সুনিদ্রা। নিদ্রাটা বাস্তবিকই এই অতি দুর্গম দীর্ঘপথে আমাদের সন্তাপহারিণী মায়ের মত হয়েছিল; এই নিদ্রার অভাব হ'লে বোধকরি আমরা এতটা কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পার্ত্তুম না। বিছানাত কোনদিন জোটেই নি, কোনদিন কদাচিৎ পত্র-কুটীরে মাথা রাখ্‌বার জায়গা পেয়েছি, অধিকাংশ সময়ই হয় অনাবৃত পর্ব্বত-বক্ষ, না হয় গাছের তলায় রাত্রি কাটাতে হয়েছে, কিন্তু সেকালে সেই পর্ব্বতগহ্বরে ভূমি-শয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে যেমন ঘুমাতুম, সেরূপ নিদ্রালাভ কর্‌বার জন্যে এখন কতদিন সুকোমল শয্যার উপর শয্যাকণ্টক ভোগ করতে হয়েছে। সন্ধ্যার সময় শুয়েছি, আর এক ঘুমেই রাত্রি ভোর হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জড়তা, পায়ের বেদনা, মনের অবসন্ন ভাব দূর হয়ে গিয়েছে, সম্মুখের বড় বড় চড়াই উৎরাইগুলো ভাঙ্গ্‌তে কিছুই কষ্টবোধ হয়নি। আজ এই বাঙ্গালা দেশে সে সব কথা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, আরও দিনকত পরে হয়ত মনেই কর্ত্তে পারবো না যে আমাকে দিয়ে এমন একটা গুরুতর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার—আজ অতি সকালে যাত্রা আরম্ভের উদ্যোগ কল্লুম; স্থির করা গেল লালসাঙ্গায় গিয়ে দুপুর বেলাটা বিশ্রাম কর্ত্তে হবে। লালসাঙ্গার কথাটা আমার এখনো বেশ মনে আছে, এই পথ দিয়ে নারায়ণে যাবার সময় এখানেই সেই জুতোচোর সাধুর বিড়ম্বনা দেখেছিলুম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার দেখ্‌তে হোল। নারায়ণ চটি হতে লালসাঙ্গা ছয় মাইল, পথের বর্ণনায় আর দরকার নেই, আজ এই এক মাসের উপর হতে শুধু চড়াই ও উৎরাই, নামা আর উঠা, পর্ব্বত ও নির্ঝর এবং নির্ঝর ও পর্ব্বত এই নিয়েই আছি। এসব কথা বলতে আর ভাল লাগে না, কিন্তু এখন নেমে যাচ্ছি, আর কখন এ সব জায়গাতে ফিরে আস্‌তে পারবো না—তাই ভেবে মনে বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। একরাত্রিও যে দোকানে বাস করেছি, সেটি ছাড়তে মনে হচ্ছে যেন চিরকালের মত একটা

শান্তির আশ্রম ছেড়ে চল্‌লুম; নারায়ণে যাবার সময় মনে হচ্ছিল যেন মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গে চলেছি, এখন মনে হচ্ছে আবার সেই আকাঙ্ক্ষা কাতর, ধূলিময়, রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি, আমার চিরদিনের মাতৃভূমিতে যাচ্ছি এই যা কিছু শান্তনা, কিন্তু সেখানেও দুঃখ-যন্ত্রণা হাহাকারের বিরাম নেই।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে চল্‌তে লাগ্‌লুম, শেষে বিস্তর চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে শ্রান্তদেহে বেলা প্রায় এগারটার সময় লালসাঙ্গায় পৌঁছুলুম। আজ আমার পথশ্রম বড়ই বেশী হয়েছিল, ধীরে চলা আমার অভ্যাস নয় সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি, চলতে চলতে মাঝ রাস্তাতে বসে আমি কোনদিনই বিশ্রাম কর্ত্তে পারিনে, যেদিন যতটুকু যাওয়া দরকার এক-দম্ চলে তারপর হাত পা ছড়িয়ে সেদিনের মত ছুটী, এই রকম হিসেবেই চলে আসা যাচ্ছিল। কিন্তু আজ আমাকে বাধ্য হয়ে এ অভ্যাস ছাড়তে হলো; আমাদের সঙ্গে সেই রোগা ছেলেটি আছে, সে নিতান্ত ভাল মানুষ, মুখে কথাটি নেই, তাকে সঙ্গে করে পথ চলা বড় কঠিন, পাছে দ্রুত চল্‌তে তার কষ্ট হয়, এই ভেবে আমি বড় আস্তে আস্তে চলছিলুম। সে দশ পা যায় আর নিতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন গাছের ছায়ায় কি পাথরের পাশে বসে তাকে অঞ্জলীপুরে ঝরণার জল খাওয়াই, ইংরেজী পুঁথির দু চারটে ভাল গল্প বলি, কখন বা দুই একটা কবিতা বলে তার মনটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করি। তারপর আবার তাকে নিয়ে উঠি—ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে তাকে নানারকমের অদ্ভুত গল্প ব'লে—মা যেমন ছোট ছেলে-টির মন গল্পে আকৃষ্ট ক'রে তাঁর চঞ্চল শিশুটিকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যান, তেমনি আমিও তার অজ্ঞাতসারে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, অজ্ঞাতসারে তার গতিবৃদ্ধি হচ্ছে, এই রকম ক'রে ছয় ঘণ্টায় প্রায় ছয় মাইল পথ পার হয়ে লালসাঙ্গায় হাজির হওয়া গেল।

নারায়ণে যাওয়ার সময় লালসাঙ্গার বাজারটি পর্য্যন্ত ঘুরে দেখিনি। সন্ন্যাসী-চোরের হুজুগে চারদিকে ঘুরে কিছু দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়নি। এবার লালসাঙ্গায় এসে সেবারকার সেই দোকানের উপর ঘরেই বাসা নেওয়া গেল। আহারাদির বন্দোবস্ত-ভার সঙ্গীদের উপরে সমর্পণ করে বাজার দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাজারের ঘরগুলি বেশ বড় বড়, অধিকাংশই দোতালা; দোকানগুলিতে প্রচুর পরি-মাণে জিনিষপত্র আছে দেখলুম। চারিদিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি বাজারের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হলুম। সেখানে একটা ছোট অথচ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরের সম্মুখে একটু জনতা দেখ্‌তে পেলুম, দেখলুম চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাপার কি জানবার জন্যে একটু অগ্রসর হয়েই দেখি দুজন স্ত্রীলোক হিন্দী ও বাঙ্গালায় কথা মিশিয়ে ঝগড়া কর্‌চে। এই দূরদেশে বাঙ্গলা কথা, তা আবার স্ত্রীলোকের মুখে, আমি আরো খানিকটে এগিয়ে গেলুম। সে সময় আমার চেহারা এমন হয়েছিল যে, আমার অতি নিকট বন্ধুও আমাকে বাঙ্গালী ব'লে সন্দেহ কর্ত্তে পার্ত্তেন না, সুতরাং সেখানে যে সমস্ত পাহাড়ী দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখ্‌ছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন হ'য়ে পড়লুম। কিন্তু গিয়ে দেখলুম সেখানে

না গেলেই ভাল হ'তো, সে দৃশ্য দেখে আমার যেমন কষ্ট তেমনি রাগ হলো। অনেক দিন হতেই সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চলা ফেরা আহার উপবেশন কচ্ছি, সাধারণের কাছে আমিও একজন সন্ন্যাসী ব'লে পরিচিত, কিন্তু এত সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসী জাতের উপর শ্রদ্ধা অপেক্ষা আমার অশ্রদ্ধাই বেশী হয়েছে। সন্ন্যাসীদের দূরে হতে দেখ্‌তে বেশ, কোন আসক্তি নেই, বিলাস লালসা, সংসারচিন্তার নামমাত্র নেই, মুক্ত, স্বাধীন বন্ধনহীন, কিন্তু শরীরের উপরের মত তাদের অধিকাংশেরই মনের ভিতরে এত মলামাটি যে এদের ঘৃণা করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়। শ্রেষ্ঠতীর্থ কাশীধামের পবিত্রতার আবরণ-তলে যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হয়, পবিত্র সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ ক'রে কত সমাজ-তাড়িত লোক যে সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপর কলঙ্ক ঢেলে দিচ্ছে, তার আর অবধি নেই, অধিকাংশ সন্ন্যা-সীই শুধু গাঁজাখোর, ভিক্ষুক, কোপনস্বভাব, সকল দোষের ঝুলি পিঠে নিয়ে তীর্থে তীর্থে পাপের বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম, তাই তাদের কুকীর্ত্তি বলবার কোন সুযোগ হয় না, কিন্তু খুঁজে দেখলে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যেও অনেক ভণ্ড নজরে পড়ে।

আজ যে স্ত্রীলোক দুটিকে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া কর্ত্তে দেখ্‌লুম, তারা বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী, ভৈরবী বেশ, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, সিঁথিতে রক্তচন্দনের কি সিন্দূরের ফোটা, রুক্ষকেশপাশ আলুলায়িত, হস্তে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের ঝুলি বোধ হয় কুটীরের মধ্যে আছে, অনুষ্ঠানের ত্রুটী নেই, যাত্রারদলের নির্লজ্জ ছোকরারা যেমন গোঁফ কামিয়ে সন্ন্যাসিনীর পোষাকে দর্শকদিগের সম্মুখে দর্শন দেয়, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কিম্বা শ্লীলতা নেই, এদের দুজনেরও ঠিক সেই ভাব দেখা গেল। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী না থাকলেও এদের আর কিছু নেই, স্ত্রীজাতির ভূষণ লজ্জাশীলতা নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, সতীত্বের সৌকুমার্য্য নাই! স্ত্রীলোক দুজন মধ্যবয়সী, একটি কিছু প্রৌঢ় বয়স্কা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যার বয়স কিছু বেশী, সে এইমাত্র লালসাঙ্গায় এসেছে, দেখে বোধহল সে এখনো বাসা নেয়নি, সর্ব্বশরীর ধূলি-ধূসরিত, শ্রান্ত ক্লান্ত। এদের বিবাদের কারণ শুনে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হলো; এরা দুজনেই কেদারনাথ দর্শন করতে গিয়েছিল, বড় ভৈরবীর সঙ্গে একটী সাধুপুরুষ ছিল, কনিষ্ঠা ভৈরবী পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে সেই সাধুটিকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, জ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনী বহুপরিশ্রমে এখানে এসে তার হারানিধিকে আবিষ্কার করেছে, এবং সেই সাধু পুরুষের উপর অধিকার কার এই নিয়ে দুজনে বিষম ঝগড়া আরম্ভ করেছে। এ বিবাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত হিন্দুস্থানীতে কুলিয়ে ওঠেনি, কাজেই হিন্দুস্থানী ছেড়ে এখন বাঙ্গলায় কথা চলছে, সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই হাত মুখের অতি কুৎসিৎ ভঙ্গী করচে। আমি আর সেখানে লজ্জায় দাঁড়াতে পাল্লুম না, যে সকল দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা বাঙ্গলা জানে না, কাজেই তারা পরম তৃপ্তমনে এই বীরত্ব-গাথা শুনে যাচ্ছিল; আমি সেখান হ'তে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলুম, কথায় কথায়

অচ্যুত ভায়া এই কলঙ্ক-কাহিনী শুনতে পেলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "তারা কি সত্তি সত্তিই বাঙ্গালী নাকি ? এতক্ষণ বলনি !"—এই বলে তিনি তাঁর সুবৃহৎ পার্ব্বত্য যষ্টি নিয়ে ভৈরবীদ্বয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চটি ত্যাগ কল্লেন্। আমি ও স্বামীজি মিলে কি তাঁকে ঠাণ্ডা কর্ত্তে পারি ? শেষে অনেক নীতিকথা ব্যয় করে তাঁকে ফিরিয়ে আন্লুম, ভৈরবীদ্বয় আপাততঃ রক্ষা পেলে, কিন্তু ভায়া তর্জ্জন করতে করতে বল্লেন যে একবার তাদের সঙ্গে দেখা হলে এক লাঠির বাড়িতে তাদের ভণ্ডামী ভেঙ্গে দেবেন।

ছাতু ও গুড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালককাল হইতেই আমার দৃঢ় পণ ও দৃঢ় সঙ্কল্প এই যে "পরমুখাপেক্ষী হইব না।" যো করেঙ্গা—আপ্ করেঙ্গা। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের শিষ্য আমি পুরুষকার—Free will theory আমার রক্তে মাংসে হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। I *say* it *shall* be and it *shall* be—ইহা আমার ইচ্ছা আর ইহা হইবেই হইবে—এই বাক্যটি আমার একমাত্র motto ; ইহারই ইঙ্গিতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মায়াবাদ, প্রারব্ধ, অদৃষ্ট, Necessity, নিয়তি—এ গুলিকে আমি splendid humbug, জাঁকাল গাঁজাখুরি, বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সম্প্রতি আমি আমার চিরপোষিত মতগুলির সম্বন্ধে বিশেষ গোলে পড়িয়াছি। ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গিয়াছে ; কি করিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হঠাৎ ভূতযোনি দেখিয়া হ্যামলেট্ ও হোরেশিওর যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, আমারও মানসিক অবস্থার কতকটা সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, হোরেশিওর বিজ্ঞানের স্বপ্নাতীত ও বহির্ভূত সত্য সত্যই এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, শোভাময়, বৈচিত্র্যময়, প্রহেলিকাময়, সত্য জগৎ আছে। কি বলিব, মহাশয়, দেখিয়া শুনিয়া আমি 'ত অবাক্ স্তম্ভিত stunned হইয়া পড়িয়াছি।

মনে করুন আপনার কোন বন্ধু—যে লোককে আপনি বহুবৎসর হইতে পুরুষ বলিয়া জানেন, সেই ছদ্মবেশী লোকটি হঠাৎ একদিন, আপনার বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, যদি জগতের সমক্ষে স্ত্রীলোক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনার মনটা ও জীবনটা রেলওয়ে-কোলিজন (collision) এ গাড়ির মত ঝাঁকানি খাইয়া অস্থির চঞ্চল ও কেন্দ্রশূন্য হইয়া পড়ে না কি ? জীবনটা স্বপ্নময় বলিয়া বোধ হয় না কি ? আমারও কতকটা সেইরূপ হইয়াছে। মানুষের মনেরও terra firma থাকে ; আমি সেই terra firma হারাইয়াছি।

সুকবি Goldsmithএর Hermit নামক কবিতায় পুরুষবেশী Angelina ও যোগীবেশী Edwin উভয়েই যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু সে বিস্ময়ের পরিণতি নিবিড় সুখ ও আনন্দ। হায়! আমার এ বিস্ময়ের পরিণতি কতকটা মোহ, কতকটা বিষাদ, আর কতকটা আনন্দও বটে। অদৃষ্টে ও প্রারব্ধে বিশ্বাসবান হইয়াছি ; কিন্তু জীবনটা সমস্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—মনুষ্যজীবনটা গোলোকধাঁধাঁবিশেষ বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমি পাঠকবর্গকে প্রথম হইতেই সাবধান করিয়া দিতেছি, আমার এ কাহিনীটি প্রেমকাহিনী (love-story) নহে। ইহা অবিমিশ্র ছাতু ও গুড়ের কাহিনী। কিন্তু উপক্রমণিকা যথেষ্ট হইয়াছে ; এক্ষণে আমার মত পরিবর্ত্তন (Conversion)এর ইতিহাসটা বলি, শুনুন্।

* * * *

বিগত ফাল্গুন মাসে কোন এক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি কানপুরে গিয়াছিলাম। কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে ; এলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিবার মানসে বইগুলি গুছাইতেছি ও পোর্টম্যাণ্টো ঠিক্ করিতেছি—এমন সময়ে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত নিঃ—বাবু আমাকে বলিলেন "আজকের দিনটা থেকে যাও। এখানে একজন হিন্দুস্থানি জ্যোতিষী এসেছে। সে লোকের ললাটরেখা ও হস্তরেখা দেখে জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সব ঘটনাগুলি সবিশেষ বলে দেয়। তার গণনাশক্তিটা দেখে আমাদের সকলেরি তাক্ লেগে গিয়েছে। আজকাল এই জ্যোতিষী ও তাহার ফলিত-জ্যোতিষ sensations of our town। তোমার উচিত একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা।"

আমি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম "shame, shame Mr. N.——তুমিও এইসব nonsenseএ বিশ্বাস কর ? আমি দেখ্‌চি human credulousnessএর সীমা পরিসীমা নেই।"

নি—বাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "Dogged scepticism is but credulousness in another form। পরীক্ষা করিয়া দেখাতে ক্ষতি কি ?"

আমি বলিলাম "ক্ষতি যথেষ্ট ; সময়ের অপব্যয়।"

নিঃ—বাবুর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় আমার কৌতূহলের উদ্রেক হইল। আপনার ডায়েরি খুলিয়া দেখিলাম যে এলাহাবাদে সে দিন ফিরিয়া না গেলেও কাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, শ্রীযুক্ত স—বাবুকে আমি আমার alter ego করিয়া আসিয়াছিলাম। এ জন্য আমি নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিলাম "Very well Mr. N.—আজ আমি এলাহাবাদে ফিরিয়া যাওয়া রহিত কর্‌লাম। এখন চল, তোমার জ্যোতিষীর গৃহে যাওয়া যাক্। শ্রীমতী খনা সুন্দরীর ও শ্রীমান মিহির দেবের এই অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্রটি কি বলেন, শোনা যাক্"

সেখানে নি—বাবুর আত্মীয় বিজয় বাবু বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "যদি যান্ তাহা হইলে বেলা একটার সময়ে যাইবেন ; নচেৎ জ্যোতিষীর দর্শনলাভ দুর্লভ হইবে। সেখানে ভারি ভিড়। যে hallএ জ্যোতিষী বসে, তাহা লম্বাইতে কলিকাতার Town Hallএর

অপেক্ষা কম নহে। এমন বৃহৎ বাড়ি কানপুরে নাই বলিলেই হয়। বাড়ির কর্ত্তাবাবু শিবসহায় সিংহ কানপুরের সর্ব্বপ্রধান ধনী। তাঁহারই আহ্বানে এ জ্যোতিষীটি এখানে আসিয়াছে। কিন্তু বসিবার তেমন সুবন্দোবস্ত নাই। শত শত লোক দাঁড়াইয়া থাকে। ভদ্রলোকেরা প্রায়ই ফিরিয়া আসে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা খুব তাড়াতাড়ি করিলাম কিন্তু তবু "দৈব নির্ব্বন্ধে" এক ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গেল। প্রায় বেলা দুইটার সময়ে আমি শ্রীযুক্ত নিঃ—বাবুর সহিত ভাগ্য পরীক্ষা অথবা জ্যোতিষীর বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষার উদ্দেশে জ্যোতিষীর বাসস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভারতীর পাঠক পাঠিকার মধ্যে যাঁহারা কানপুরে গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সান্যাল জজ কোর্টের মুন্‌শরিম মহাশয়ের বাড়ি দেখিয়াছেন। উক্ত বাড়ির সন্নিকটেই প্রকাণ্ড দোতালাগৃহে জ্যোতিষীর বাসস্থান। দ্বারদেশে sign-boardএ দেবনাগরী ও ইংরাজি অক্ষরে লেখা আছে :—

"পণ্ডিত গণেশরাম শাস্ত্রী জ্যোতিষী
Pandit Ganeshram Shastri, Astrologer"

আমরা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, প্রকাণ্ড দালান, লোকে লোকারণ্য। বৈঠকে, অনতিবিস্তৃত দরী ও চাদর ও তাহার এক পার্শ্বে ভিত্তিসংলগ্ন তাকিয়া ঠাসান দিয়া বসিয়া হাস্যবদনে শাস্ত্রী মহাশয় অসংখ্য লোকের ভাগ্যপরীক্ষা করিতেছেন।

ন স্থানম্ তিল ধারয়েৎ। অধিকাংশ লোক বসিতে না পাইয়া, দুর্ভেদ্য ব্যূহ ও প্রাচীর রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তন্মধ্যে অবলীলাক্রমে অবকাশ ও প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য।

নিঃ—বাবু ম্লানমুখে বলিলেন "হেম বাবু; বড় বেগতিক দেখ্‌ছি, বুঝিবা ফিরে যেতে হয়।"

আমি বলিলাম "সিটি হচ্চে না। সবুরে মেওয়া ফলে। It is easier for a camel to enter the eye of a needle than for an impatient man to enter the kingdom of heaven."

এই বলিয়া সেই বিপুল লোক-সঙ্ঘের মধ্যে তিন চারি পদ প্রবেশলাভ করিয়া, কৃত্রিম-অন্যমনস্ক হইয়া, ভাল মানুষটির মত, সজোরে, সবলে, ধাক্কা দিতে লাগিলাম।

আমার বন্ধুবান্ধবেরা (স্তুতির অর্থে কি নিন্দার অর্থে তা তাঁহারাই জানেন) আমার স্বভাবটার একটি অদ্ভুত ইংরাজি বিশেষণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন "আমার natureটা কিছু pushing।" আমি আজ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভাবিলাম "আমার বন্ধুরা সৎসমালোচক—তাঁহারা আমার চরিত্রের যে প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন, তাহা হুবহু ঠিক্। আমার natureটা in more than one sense pushing।" এই ভাবিয়া

আমি কায়মনঃপ্রাণে ধাক্কা দিতে লাগিলাম—Congressএর agitatorsদিগের মত steadily ও কায়মনঃপ্রাণে ধাক্কা দিতে লাগিলাম।

বিজ্ঞানবিৎ বলেন ""Force generates force।" বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচকের আসনে বসিয়া বলিয়াছেন "আঘাত হইলেই প্রতিঘাত হয়।" আমার ধাক্কার উত্তরে প্রতিধাক্কা হইল—তাহার উত্তরে অন্য এক ধাক্কা। এইরূপে একটি বিপুল তরঙ্গে সেই জনসমূহের ব্যূহ তরঙ্গায়িত হইল ও আমরা সেই তরঙ্গের মধ্যে দুলিতে দুলিতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পড়িলাম। অবশ্য ধাক্কা খাইয়া অনেকগুলি লোক পলায়নপর হওয়ায় আমরা "শনৈঃ শনৈঃ অবকাশলাভ" করিতে পারিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু তখনও দিল্লি বহুৎদূর। আর সৎকাজে বিঘ্ন বাধা অনেক। আমার সঙ্গী শ্রীযুক্ত নিঃ—বাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেকর হইলেন, আর বলিলেন

"হেম'বাবু আর যে পারি নে। এই যবচূর্ণ-লোভীদিগের ধাক্কা খাইয়া আমার শরীরটা যবচূর্ণ হয়ে গেল; পালাতে হ'ল দেখ্‌চি।"

আমি বলিলাম "Fie! Mr. N.—Courage! Survival of the fittest.
Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime"

আমি আবার বলিলাম "দেখ নিঃ—, তুমি ভাত ও মাগুরমাছের ঝোল ত্যাগ কর। আমার মত দাল রুটি ধর। ভাত আর মাছের ঝোল bears the same ratio to দাল আর রুটি as the earthenpot bears to the iron-pot।"

বৃথা! বৃথা! আমার ওজস্বিতাপূর্ণ বাক্যরত্নগুলি বেণাবনে মুক্তা ছড়ানর মত অকার্য্যকর হইল।

মহাবিপদেই পড়িলাম। নিঃ—বাবু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। বলিলেন "হেমবাবু আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। তুমি থাক, আমি চল্‌লাম।"

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল তো হইতে পারে না। যদি নিঃ—বাবু চলিয়া যান্, আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ না করিলে অভদ্রতা হয়। আমি মনে মনে "হা হতোঽস্মি" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। "পাটলিপুত্রের দিকে অগ্রসর হইব না—গৃহে ফিরিব" বলিয়া সৈনিকেরা যখন বাঁকিয়া বসিয়াছিল, তখন Alexander the Great বুঝি এইরূপে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন! যখন Atlantic মহাসাগরে নাবিকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল 'Lisbonএ ফিরিয়া চল' তখন মহাপুরুষ Columbus বুঝি এইরূপে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন!

নিঃ—বাবু গৃহে ফিরিবার জন্য মুখ ও স্কন্ধ ফিরাইলেন। "মুখ ও স্কন্ধ" বলিলাম, কারণ সেই ধাক্কার তরঙ্গে লোকের ঠেলাঠেলিতে তাঁহার সমস্ত শরীরটা ভাল করিয়া ফিরিল না।

আমিও দেখাদেখি তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিলাম। এমন সময়ে সেই ভাগ্য-পরীক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাগ্যদেব সহসা আমার উপর প্রসন্ন হইলেন।

সপ্তরথীর কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া আমার অভিমন্যু বন্ধুটি বাহিরে যাইবার পথ খুঁজিয়া পান না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, "ন যযৌ ন তস্থৌ"বৎ—"না স্বর্গে, না মর্ত্তে" রাজা হরিশ্চন্দ্র বৎ—like a good Christian who practises the virtue of resignation—এক জনের অঙ্ক হইতে অপরের অঙ্কে আরোহমানা হিমাচলের শিশু কন্যা পার্ব্বতীবৎ আমার বন্ধুটি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

আমরা যেন শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছি, আর মনের সাধে সমুদ্রের ঢেউ খাইতেছি। কেবল মধ্যে মধ্যে প্রাণের মধ্যে ভয় হইতেছে—কোন প্রবল ঢেউ আসিয়া নিঃ বাবুকে একেবারে না বলিয়া কহিয়া, তাঁহার ও আমার অজ্ঞাতসারে, Borneo কিম্বা Phillipine Islands এ নিয়া উপস্থিত না করে। এমন সময়ে ভাগ্যদেব কৃপাকটাক্ষ করিলেন।

বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপেক্ষাও দীর্ঘাকৃতি কিন্তু সেই সৌম্য-মূর্ত্তির ঠিক্ বিপরীত মূর্ত্তি একটি কালো ষণ্ডা কাটখোট্টা জোয়ান আমার বন্ধুকে প্রবলবেগে ধাক্কা দিল। সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে, সেই দেববাঞ্ছিত অতি শুভ মুহূর্ত্তে, "বাল্মীকির রসনায় পদ্মাসনে যেন" Inspiration দেবী ওরফে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া আমার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। আমার পকেটে অতি উত্তম Masulipatam নস্যে পরিপূর্ণ একটি পোগণ্ড বাক্স ছিল। আমি আমার চিত্তের অজ্ঞাতসারে (যেমন অক্ষর না গণিলেও কবির ছন্দপতন হয় না) পকেটে হাত দিয়া সেই ক্ষুদ্র নস্যদানিটি বাহির করিলাম। ইহাকেই বলে প্রতিভা। আমার বন্ধুরা এ অপবাদটা যেখানে সেখানে রটনা করিয়া দিয়াছেন যে আমি Original—মৌলিক। কিন্তু আজ আমি Incomparably original! আমি বাক্সটি খুলিয়া কিঞ্চিৎ নস্য লইয়া (হে পাঠক, বন্দার গোস্তাকি মাফ করিতে আজ্ঞা হয়) সেই নিঃ বাবুর আক্রমণ-কারী কাটখোট্টার নাসিকারন্ধ্রে, সকলের অলক্ষিতভাবে আচ্ছা করিয়া গুঁজিয়া দিলাম।

বঙ্কিম বাবুর কাপালিক যে স্বহস্ত-প্রস্তুত সুতীব্র সুরা সেবন করাইয়া নবকুমারকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আমার এই গোলাপ-সুবাসিত নস্য তদপেক্ষাও তীব্রতর।

আর যাইবে কোথায়! হাঁচি—হাঁচি—হাঁচি—অসংখ্য হাঁচি! কাটখোট্টা জোয়ানটি Arithmetical, geometrical এবং Harmonical progression এ হাঁচিতে লাগিল। সেই রমণীয় নস্যের কমনীয় রেণুকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আরও তিন চারিটি হিন্দুস্থানির নাসা-বাতায়নে প্রবেশলাভ করিয়া মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে আরোহণ করিল। অনেকেই হাঁচিতে হাঁচিতে বিস্ময়ে কষ্টে লজ্জায় সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল। অনেক হিন্দু মহাত্মা গাত্র অপ-বিত্র হওয়ার ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। খুব হাসির গর্‌রা উঠিল। অনেকের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইল। সেই সঙ্গে আমাদেরও পথ পরিষ্কার!

আমি নিঃ বাবুর কাণে কাণে সব কথা ভাঙ্গিয়া, বলিলাম "Knowledge is Power"

নিঃ বাবু হাসিয়া অস্থির। তখন নিঃ বাবুর হাত ধরিয়া, নাটকের ধীর ললিত নায়কের মত নির্ভয়ে, জ্যোতিষীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

সভামণ্ডপের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নিঃ বাবুর কাণে বলিলাম—

"None but the brave,
None but the brave,
None but the brave deserves the fair"

আমার কথা শুনিয়া নিঃ বাবু সহাস্যে বলিলেন "হেম বাবু, তোমার নিকটে থাকিলে মড়া মানুষও হাসিয়া উঠে"!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হে সভ্য, ভব্য, সমাজের নিয়ন্ত্রিত মণ্ডল-মাঝারে বিবর্ত্তিত, মনোহর চন্দ্রগ্রহসম পাঠক, তুমি আমার এই কক্ষভ্রষ্ট-ধূমকেতু-স্বভাব-সুলভ অশিষ্টাচারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, Necessity has no law। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে দেশ কাল পাত্র-ভেদে অশিষ্টাচার অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। স্বয়ং শিষ্টাচারের আধার K বাবু—সভ্যভূমি ইংলণ্ডে গিয়া দদ্রুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ও lecture দিবার সময়ে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া (হে পৃথিবী, তুমি সে সময়ে দ্বিধা হইলে না কেন?) "দাদ চুলকাইয়াছিলেন।"

আর অত্যধিক শিষ্টাচারে দেবতারাও ক্ষুণ্ণ হন। ইহার দৃষ্টান্ত আছে।

উ—বাবু আমার দূরসম্পর্কে ঠাকুরদাদা হন। তিনি ঘোর হিন্দু ও ঘোর শিষ্টাচারী, "জামাই-বাড়ির অন্নগ্রহণ করিতে নাই" বলিয়া যখন জামাই-বাড়িতে যাইতেন, তখন নিজ ব্যবহারোপযোগী কিঞ্চিৎ তণ্ডুল সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এত বাড়াবাড়ি কি ভাল লাগে? ইহা অশিষ্টাচার অপেক্ষাও অসহ্য। আমি একদা দুষ্ট সরস্বতীর প্ররোচনায় ঠাকুরদাদা মহা-শয়ের তণ্ডুলের পোঁটলাটি সরাইয়া ফেলিলাম। শুষ্ক ড্যাঙ্গায় উপনীত হইয়া রোহিত মৎস্য যেমন ধড়্‌ফড়্ করে, পোঁটলা-বিরহে ঠাকুরদাদা মহাশয় তেমনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়া ধড়িবাজ কি কম! "দুগ্ধ ও সন্দেশ" খাইয়া হিন্দুয়ানি রক্ষা করিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া তার পরের দিন বুড়ার খড়ম্ সরাইলাম—তারপর বুড়ার চশ্‌মা হস্তগত করিলাম। এ যেন সতরঞ্জের চাল! বুড়া পাকা ঝানু খ্যালোয়াড়ি; কিছুতেই বাগ্ মানে না। কিন্তু চতুর্থ দিনে বোড়ের কিস্তিতে বুড়াকে কায়দায় আনিয়া ফেলিলাম। কিস্তি মাৎ! আমি বুড়ার শালেগ্রামশিলা সরাইয়া ফেলিলাম! বুড়া Checkmated হইয়া বলিল "নারায়ণ, নারায়ণ, আমাকে ঘোর শনিতে পেয়েছে দেখ্‌ছি"। পরিশেষে হ য ব র ল হইয়া জামাই-বাড়ির ভাত খাইল। আমি তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম—

"এই নাও ঠাকুরদাদা, তোমার চস্‌মা, এই নাও তোমার খড়ম্। তোমার বেশি বাড়া-বাড়িতে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ং দেবতা অন্তর্দ্ধান হয়েছিলেন। এই নাও তোমার শালেগ্রাম"।

*　　　*　　　*

আমি জানি আমার পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। এক যাঁহারা আশুতোষ প্রকৃতি, মোট কথাটা পাইলেই সন্তুষ্ট হন—আর এক যাঁহারা অত্যধিক অনুসন্ধান-তৎপর—over inquisitive। এই শেষ শ্রেণীর পাঠকের সহিত আমার বিলক্ষণ "সহানুভূতি" আছে, কারণ আমারও স্বভাবটা ঐ ছাঁচেই ঢালা। আমার বেশ মনে আছে আমার বাল্য-কালে ঠাকুরমা বালকবালিকা-পরিবেষ্টিতা হইয়া যখন "রাজা ও রাণী সুখে ঘরকন্না কর্ত্তে লাগ্‌লেন" বলিয়া বৃহৎ কাহিনীটি সমাপ্ত করিতেন ও "আমার কথাটা ফুরোলো, নটে গাছটা মুড়োলো" বলিয়া সুর ধরিতেন, তখন "সেই বুড়িটার কি হ'ল—সে রাখালটার কি হ'ল—যে দাসীমাগী বিষ এনেছিল সে দাসীমাগির কি হ'ল? মন্ত্রী মহাশয় কোথায় গেলেন"? এই সব কূট প্রশ্নে ঠাকুরমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতাম। আমি নাছোড়বান্দা হইয়া নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছোট বড় প্রত্যেকেরই শুভাশুভ পরিণাম খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম। উত্তর না পাইলে আমার আহার হজম হইত না।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই নাছোড়বান্দা-প্রকৃতি পাঠক সকৌতুকে প্রশ্ন করিতেছেন "তুমি'ত ঠাকুর, নস্যের সাহায্যে জ্যোতিষীর নিকটে গেলে, তোমার জুতাজোড়াটি কোথায় রহিল"?

বটেই'ত; শ্রীবিষ্ণু। মহাশয়, আমাদের সঙ্গে নিঃ বাবুর ভৃত্য আসিয়াছিল। তাহার হস্তে আমাদের বিনামা সমর্পণ করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তির পুনর্ব্বার শ্রীফল-মূলে যাওয়া কি সম্ভব? একদিন "দুগ্ধের প্রহরী করি পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে" আমার ও আমার বিনামার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা এ জন্মে ভুলিব না। যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে Parenthetically সেই বৃত্তান্তটা এই স্থলেই বিবৃত করিতে পারি। গল্পটা বেশী বড় নয়। আর edifying বটে।

*　　　*　　　*

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। তবে শুনুন্।

*　　　*　　　*

তখন আমার বয়ঃক্রম কম; পাটনা কালেজে বি, এ, ক্ল্যাশে পাঠ করি। পূজার সময়ে কলিকাতা হইতে Dawson এর বাড়ির নূতন জুতা আসিয়াছে; আমি তাহা পায়ে দিয়া, সুসজ্জিত বেশে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত ব—বাবুর বাগানে, সুবিখ্যাত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের lecture শুনিতে গেলাম।

আমি তখন নেহাৎ সরল প্রকৃতি ছক্কাপঞ্জাবিহীন যুবা। আমি তখন বসন্ত কালের নবীন দূর্ব্বাদল ও শ্যামল পল্লবরাশির অপেক্ষাও "Green"। অসঙ্কোচে দরীর একপার্শ্বে, যে স্থলে অনেকেই জুতা খুলিয়া রাখিয়াছিল, আমার সেই জ্বলন্তবহ্নি-প্রবেশ-লোলুপ-আসন্ন-মৃত্যু মদনের ন্যায় সুন্দর ও অভিনব ও ভাগ্যহীন জুতাজোড়াটিকে রাখিয়া অনন্য মনে সরস্বতীজিউর মুখনিঃসৃত সরল বেদব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলাম।

বক্তৃতার শেষে জুতা পায়ে দিবার ধূম পড়িয়া গেল। জুতা কোথায়, জুতা কোথায়। হুড়াহুড়ি, গণ্ডগোল। আমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও জুতা পাইলাম না। তখন মনে করিলাম—সকলে চলিয়া গেলে বোধ করি একপাশে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইব। একে একে একে সকলে প্রফুল্লমনে চলিয়া গেল। আমি আবার হাত পা চক্ষু একত্র করিয়া desperately খুঁজিলাম। তখন হতাশ নিরানন্দ হইয়া বুঝিতে পারিলাম "আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে"। সত্যসত্যই "নির্দ্দয় অক্রূর, হরিয়া লয়েছে
ব্রজরতনে"

"Like Marius amidst the ruins of Carthage" আমি কপালে হাত দিয়া সেই জুতাশূন্য জনশূন্য উদ্যানে বসিয়া পড়িলাম। দুই একবার পাদচারণা করিয়া

I seemed like one
Who treads alone
Some banquet-hall deserted,
Whose *shoes* are fled,
Whose garlands dead,
And all but he departed!

আমার বাসা সেই উদ্যান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই রাত্রে, সদর রাস্তায়, শুধু পায়ে—এত লোক সমূহের মধ্য দিয়া, যাই কি প্রকারে? মদন ভস্মের পর—

"রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরোমার্গে ঘনশব্দবিক্লবা"

কৃপাপাত্রী অভিসারিকার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, আমার সর্ব্বলজ্জা-নিবারক সর্ব্বভয়হারক জুতা জোড়াটির হরণে আমারও সেই দুর্দ্দশা হইল। হে উপানৎ, এই রাত্রে, আমার বাসায়

"ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ"?

সে রাত্রে, দ্বিপ্রহরের পর, যখন রাস্তা ঘাট জনশূন্য হইয়াছে, তখন চক্ষুকর্ণ বুজিয়া, বহুকষ্টে, ধূলাধূসরিত চরণে বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

*　　　*　　　*

প্রভাতে পুরাতন জুতা জোড়াটি বাহির করিয়া পায়ে দিলাম। আবার সন্ধ্যাকালে দয়ানন্দ সরস্বতীর অলোক-সামান্য উল্লাসক উন্মাদক lecture শুনিবার জন্য ছুটিলাম। কিন্তু এবার সতর্ক হইলাম; জুতা আগলাইবার জন্য একটি বালক ভৃত্যকে সঙ্গে লইলাম।

উদ্যানে পহুঁছিয়া, যে স্থান হইতে পূর্ব্বদিনে আমার জুতাজোড়াটি অপহৃত হইয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম!

জুতা—জুতা—জুতা—জুতা। যেন জুতার বাজার বসিয়া গিয়াছে।

শ্রীহরি! একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?

সেই জুতার অরণ্যের মধ্যে একপার্শ্বে আমারই অপহৃত অশ্বিনীকুমার শোভা পাইতেছে! আমার ছোট ভাই বসন্ত রবার-ষ্ট্যাম্প দিয়া জুতার শুকতলায় ও নিম্নে H. B. G. মার্কা করিয়া দিয়াছিল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম—পূর্ব্বোক্ত মার্কা আর Dawson Co.র মার্কা উভয়ই জুতার অবয়বে বিদ্যমান আছে। তখন এ জুতা যে আমারই সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, আর আমি আহ্লাদে গদ্গদ হইলাম।

তবে কি ইহা কেহ ব্যঙ্গ তামাসা করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছিল। হো, হো, হো, মন্দ practical joke নহে। আমার মস্তিষ্কে দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, হুসেন খাঁর জেনি কতুহমু সিং, কত কি উদয় হইতে লাগিল।

কিন্তু গোষ্ঠ হইতে রাখাল বালকদিগের সহিত হারাণ মাণিককে ফিরিতে দেখিয়া জননী যশোদা এতদূর আহ্লাদিত হন নাই; দাতাকর্ণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের আদেশে নগরে গিয়া বৃষকেতুকে দেখিয়া এতদূর বিস্মিত হন নাই; মহাত্মা যিশুকৃষ্ণের parableএ বর্ণিত রাখাল তাহার stray sheepটি পুনরায় পাইয়া এতদূর চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই।

"হারাণধন আয় রে রতনমণি, পায়ে পরি রে" স্বগতভাবে এই কথাগুলি বলিয়া সহর্ষে জুতাজোড়াটির উদরে চরণযুগল সাঁদ করিয়া দিলাম। এমন সময়ে আমার সম্মুখে আসীন একটি হিন্দুস্থানি যুবা কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল

"কেঁও বাবু তুম হমারা জুতা কেঁও পহ্‌ন্‌তে হও?"

আমি 'ত অবাক্, স্তম্ভিত!! আমি কি কোনো কামাখ্যায়, কোনো Wonder landএ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি?

মনের স্থৈর্য্য ও চৈতন্যলাভ করিয়া আমি উত্তর দিলাম "ইয়হ, হমারা জুতা হয়, তোমরা জুতা কেঁও কর্?"

হিন্দুস্থানিটি আস্তিন গুটাইয়া, লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "তুম চোর হও"

আমিও রাগান্ধ হইয়া বলিলাম "তুম চোর হও"

উভয়ে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল; অনেক লোক জড় হইল, Lectureএ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হইল। তখন একটি লালপাগড়ি Constable আসিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল।

নিকটেই Police থানা। লাল্‌পাগড়ির আদেশানুযায়ী আমরা উভয়েই থানায় গেলাম। আমি জানিতাম Tempest in a teapot হইয়া থাকে। কে জানিত Tempest in a shoe হওয়া বিচিত্র নহে?

থানার মুন্‌শি আমার বর্ণিত "এতলা" রোজনাম্‌চায় "দর্‌জ" করিয়া লইলেন। কিন্তু দারোগা মহাশয় স্থানান্তরে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইল।

মুন্সীজি কিছু রসিক, মজাক্-প্রিয় লোক। তিনি আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেনঃ—

"আপলোগ দোনো আদ্‌মি শরিফ আদ্‌মি মালুম হোতে হঁয়। আপুস্ মে বেফায়দা কেঁও লড়তে হঁয়। আপুস্ মে তক্‌সিম্ কর্ লিজিয়ে। এক আপ লিজিয়ে, এক আপ লিজিয়ে।"

দারোগাজি আসিয়া আমাদের উভয়ের জবানবন্দি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন "আপলোগ্ দোনো আদ্‌মি উঠিয়ে—হমারা সাম্‌নে আপলোক জুতা পহিন্‌কে চলিয়ে।"

আমরা তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী জুতাজোড়াটি একে একে পায়ে দিয়া দারোগাজির সম্মুখে মৃদুপাদবিক্ষেপ করিয়া আবার খুলিয়া রাখিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে হিন্দুস্থানিটির পায়েও জুতাজোড়াটি ঠিক্ হইল।

দারোগাজির এই আদেশ প্রতিপালনের সময়ে আমার সেই বত্রিশ সিংহাসনে বর্ণিত সওদাগর ও সওদাগর বেশধারী দুষ্ট ভূতের গল্প মনে পড়িয়া গেল। স্ত্রী নিয়া ঝগড়া। সওদাগর বলে "এ স্ত্রী আমার;" ভূত বলে "এ স্ত্রী আমার!" উভয়ের বেশ ভূষা আকৃতি একই প্রকার। রাজা বিক্রমাদিত্য বড় গোলেই পড়িলেন। পরিশেষে এক ক্ষুদ্র চাম্‌ড়ার কুপো আনিয়া বলিলেন "তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে এই কুপোর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এ স্ত্রী তাহার।" ভূত (হাজার হোক্ ভূত বৈ 'ত নয়; কত বুদ্ধি ধরিবে?) তদ্দণ্ডেই অবলীলাক্রমে কুপোর মধ্যে প্রবেশ করিল। Cork দিয়া রাজা বিক্রম তাহার মুখবন্ধ করিয়া দিলেন। তখন আসল সওদাগর আপনার স্ত্রীকে পাইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল।

আমার ইচ্ছা হইল দারোগা সাহেব এইরূপ কোন সর্‌সরি বিচার করিয়া ভূতকে জব্দ করেন, আর আমি জুতাজোড়াটি পাইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে থাকি।

কিন্তু দারোগা মহাশয় পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে বলিলেন "আপলোগোঁমে কোই আদ্‌মি চোর নহি হঁয়। আপলোগ্ দোনো আদ্‌মি সরিফ্ হঁয়। হম্‌কো ইস্ মোকোদ্দমামে কুছ্ মেহনৎ কর্‌না হোগা; চোর পকড়্‌না মুস্কিল হয়। আপলোগ্ আজ যাইয়ে। হম্ কল্‌সে তহকিকাৎ সুরু করেঙ্গে।

বলা বাহুল্য জুতাজোড়াটি দারোগার দফ্‌তরে রাখিয়া, হিন্দুস্থানিটি ম্রিয়মাণ হইয়া শূন্য চরণে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। আমিও বালক ভৃত্যটির সহিত বাসায় ফিরিলাম।

আমার হিন্দুস্থানি প্রতিদ্বন্দ্বীটির নাম সাহেবলাল—বাঁকিপুরের রামজিউয়াওন সাহুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার ইংরাজি জুতা পরার সক্‌টা কিছু বেশি অথচ ইংরাজি আদপে জানেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন কলিকাতা হইতে এক জন জুতাবিক্রেতা আসিয়াছে। যে রাত্রে আমার জুতাচুরি হয়, তাহার পরের দিন উক্ত জুতাবিক্রেতার দোকান হইতে জুতাজোড়াটি পাঁচ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। দারোগা সাহেব সাহেবলালের প্রমুখাৎ এই উপক্রমণিকাটুকু মাত্র সংগ্রহ করিয়া তহকিকাৎ সুরু করেন। প্রথমে মুরাদপুরে ও চৌহট্টায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে চৌহট্টায় এক ব্যক্তি "রহিমবক্স" নামক জুতাবিক্রেতা আসিয়াছিল বটে কিন্তু সে একসপ্তাহ মাত্র থাকিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকিপুর, বেগমপুর ও দানাপুর ষ্টেশনে দরিয়াফ্‌ত করিয়া জানিতে পারিলেন রেলে সওয়ার হইয়া রহিমবক্স যায় নাই। তখন দারোগাজি কিছু গোলে পড়িলেন।

যথাসম্ভব রহিমবক্সের "হুলিয়া" (descriptive roll) সংগ্রহ করিয়া দারোগাজি চারিদিকে চর ও "পরওয়ানা" পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে "হুলিয়ার" অনুরূপ এক ব্যক্তি বেহারের সন্নিকট কারাপর সরাই গ্রামে অবস্থিতি করিতেছে। তখন দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি সশরীরে উক্তগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে স্থানীয় পুলিশ "রহিম"কে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। জুতাজোড়াটি তাহাকে দেখান হইল। রহিম বলিল "অবশ্য এ জুতা আমি বিক্রয় করিয়াছি কিন্তু আমি চোর নহি।" কিন্তু দারোগা সাহেব তাহার কথা শুনিলেন না। তাহার জুতার দোকান ও আস্‌বাব সমেত তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া বাঁকিপুরে আনিলেন।

বাঁকিপুরে আসিয়া রহিম ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অফ্ পুলিশের সম্মুখে নীত হইল। সাহেব বলিলেন—

"তুমি বলিতেছ তোমার দোকান চুঁচুড়ায়—তুমি এখানে কেন?"

রহিম বলিল "চুঁচুড়ায় ভাল বিক্রি হইত না বলিয়া আজ দুই বৎসর হইতে হিন্দুস্থানের গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে এইরূপে বিক্রয় করিয়া বেড়াই, তাহাতে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়"।

তখন D. S. P. চুঁচুড়ার telegram পাঠাইলেন। উত্তরে সংবাদ আসিল "রহিমবক্স নামক এক ব্যক্তি জুতাবিক্রেতা ছিল বটে কিন্তু তাহার দোকান বন্ধ, সে এক বৎসর হইতে নিরুদ্দেশ"।

D. S. P. কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "রহিম, জুতায় Dawson Co.র মার্কা আছে, তুমি এ মার্কা কোথায় পাইলে?"

রহিম উত্তর করিল "আমার সহিত Dawson Co.র বরাবর কার্‌বার্ ছিল। আপনার না বিশ্বাস হয় তাহাদিগকে লিখিয়া খবর লউন্।"

তখন D. S. P কলিকাতায় telegram পাঠাইলেন। উত্তরে সংবাদ আসিল "Dawson Co.র সহিত চুঁচুড়ার জুতাবিক্রেতা রহিমবক্সের কার্‌বার্ ছিল বটে; কিন্তু তাহা এক বৎসর হইতে বন্ধ।"

উত্তর পাইয়া সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দারোগাকে বলিলেন—"রহিম নিরপরাধী; উহাকে অনর্থক অনেক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

দারোগা সাহেব "জো হুকুম" বলিয়া রহিমকে ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া সাহেবের অজ্ঞাতসারে রহিমের উপর "নজর্" রাখিতে লাগিলেন।

এইরূপে আমার জুতাজোড়াটি অকূল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল।

*   *   *   *

দারোগা সাহেব চতুর সুদক্ষ তেজিয়ান্ পাঠান্ ও ভারি "দেয়ানৎদার" ছিলেন। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ছিলেন বলিয়া D. S. P. সাহেব কিম্বা কলেক্টর্ সাহেব কাহাকেও ভয় করিতেন না।

পরদিন D. S. P. দারোগাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ দারোগা, এ মকোদ্দমার বিষয় আমি খুব মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছি। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি ঐ বাঙ্গালিটি যত নষ্টের গোড়া; উহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আন।" দারোগা সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"খোদাবন্দ, সে বেচারার কসুর কি?"

D. S. P. বলিলেন "সেই লোকটাই ব—বাবুর বগইচায় চুরি করিবার উদ্দেশে গিয়াছিল। ধরা পড়িল বলিয়া সেই এ গোল বাধাইয়া দিয়াছে।

দারোগা বলিলেন "বিলক্ষণ। সে কালেজে উচ্চক্লাশে পড়ে, মোয়াজ্জিজ্ বাঙ্গালি।"

D. S. P. রাগান্ধ হইয়া বলিলেন—"Damn it—Bengali! As the horn is to the buffallo so deceit is to the Bengalee. This fellow must be another Umichund।* এই লও পরওয়ানা। আমার হুকুম, গ্রেফ্‌তার করিয়া আন।

দারোগা জোড়হস্তে বলিল "খোদাবন্দ, এই লও পাগড়ি, এই লও উর্দ্দি, আমি গ্রেফ্‌তার করিতে পারিব না"।

গুস্তাকির জন্য সাহেব দারোগাজিকে suspend করিলেন এবং স্বয়ং বাঙ্গালিকে গ্রেফ্‌তার করিতে চলিলেন।

যে সময়ে প্রমীলার কপাল পুড়িয়াছিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে তাহার "বামেতর নয়ন" নাচিয়াছিল, যে সময়ে রোহিণী ও গোবিন্দলালের দৌরাত্ম্যে ভোম্‌রার কপাল পুড়িয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে (ঘটনাটি আমার ঠিক্ স্মরণ হচ্চে না) একটা হুলো বেড়াল ভোমরাকে আঁচড়াইয়া লইয়াছিল, আর যে সময়ে সাহেব আমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসিতেছিলেন ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে (আমার বেশ মনে পড়্‌চে) আমার হস্ত হইতে Variorum Edition of Shakspearখানা পড়িয়া গিয়াছিল।

আমি চীৎকার করিয়া dramatic সুরে হাত পা নাড়িয়া Othello পাঠ করিতেছি—

"Tush never tell me that thou Iago.
Who hast had my purse as if the strings were thine,
Shouldst know of this"

এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখি, সত্য সত্যই আমার সম্মুখে আয়েগো-বেশ-ধারী শ্বেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। (ক্রমশঃ)

* অনেক সাহেবেরই ধারণা আছে যে উমিচাঁদ বাঙ্গালি।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পঞ্চম অধ্যায়।

অন্ধকূপ-হত্যা—রহস্যনির্ণয়।

যে অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী সভ্যজগতের নিকট নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নরশোণিতলোলুপ নৃশংস নরপতি বলিয়া শত কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশের অধিবাসিদিগের নিকট তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও সর্ব্বজনসম্মত সন্দেহশূন্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই।

এ কালের লোকের কথা বলিতে চাহি না;—আমরা একালের লোক, ইংরাজইতিহাস-লেখকদিগের বর্ণনালালিত্যে বিমুগ্ধ হইয়া অন্ধকূপ-হত্যার শোকসমাচার পাঠ করিতে করিতে কতবার সাশ্রুনয়নে হাহাকার করিতেছি; কত ছন্দোবন্ধে কবিতা রচনা করিয়া স্বজাতি-সমাজে সেই শোকসমাচার প্রচারিত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছি; কখন বা রঙ্গমঞ্চের সুশিক্ষিত অভিনেতৃদলের নাট্যনৈপুণ্যে আত্মহারা হইয়া, "নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে" শত বিভীষিকামূর্ত্তিতে বারম্বার শিহরিয়া উঠিতেছি! যাঁহারা সেকালের লোক, যাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ইংরাজ বাঙ্গালীর কুটিল কৌশলজালে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া সিরাজদ্দৌলা ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এই অন্ধকূপ-হত্যার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না!

মুসলমানদিগের ইতিহাসে অন্ধকূপহত্যার নাম গন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না।* সাইয়েদ গোলাম হোসেনের রচিত "মুতক্ষরীণ" গ্রন্থ সেকালের সর্ব্বজনসমাদৃত সুবিস্তৃত ইতিহাস;—তাহাতে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, ইংরাজদিগেরও অনেক দুঃখদৈন্যের সমাচার আছে; কিন্তু সমগ্র মুতক্ষরীণগ্রন্থে, আকারে ইঙ্গিতেও, অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই! হাজি মুস্তাফা নামধারী সুবিখ্যাত ফরাসীপণ্ডিত মুতক্ষরীণের যে সুবৃহৎ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি টিকাচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,—"সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের নিকট সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন,—অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিজ কলিকাতার অধিবাসিরাই অন্ধকূপহত্যার সংবাদ জানিত না।" যাহাদের বুকের উপর এরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারা ইহার কিছুই জানিল না;—ইহা কি আদৌ সম্ভব হইতে পারে? শুধু তাহাই নহে,—হতাবশিষ্ট ইংরাজগণ মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতার কুটীরে কুটীরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারাও কি এই শোকসমাচার রটনা করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন?

* Mustafa's Mutakherin.

মুসলমানের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা না হয় স্বজাতিকলঙ্ক বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ-কারাগারে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরাজদিগের চিঠিপত্রে অন্ধকূপহত্যার নাম পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

রণপলায়িত ইংরাজবীরপুরুষগণ পল্‌তার বন্দরে বসিয়া দিন দিন যে সকল গুপ্তমন্ত্রণা করিতেন, তাহার বিবরণ-পুস্তকের কোন স্থানেই অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। সুদূর সমুদ্র-কূলে বসিয়া মাদ্রাজের ইংরাজমণ্ডলী কলিকাতার পুনরুদ্ধারকল্পে যে সকল বাগ্‌বিতণ্ডায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই! মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবারের অনুরোধ রক্ষার্থে দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। মাদ্রাজদরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীল শ্রীযুক্ত পিগট সাহেব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলার নিকট তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ণ পত্র লিখিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন;—তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া পলাশি-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরাজদ্দৌলাকে যত সুতীব্র সামরিক লিপি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই! সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের যে আলি-নগরের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই!*

মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজেরা প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষতিপূরণের জন্য কড়ায় গণ্ডায় অঙ্কপাত করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় অন্ধকূপে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিল, সন্ধিপত্রে তাহাদের বা তাহাদের স্ত্রীপুত্রের জন্য কপর্দ্দকও লিখিত হয় নাই কেন? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী নিতান্তই কাহারও রচাকথা।

অন্ধকূপহত্যাকাহিনী কবে কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল,—সে ইতিহাসও সবিশেষ রহস্য-পরিপূর্ণ! হলওয়েল সাহেব তাহার প্রথম প্রচারক। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হলওয়েল তাঁহার প্রিয়বন্ধু উইলিয়ম ডেভিস্‌কে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই অন্ধকূপহত্যার প্রথম এবং শেষ পরিচয়! হলওয়েল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে "সাইরেণ"† নামক পোতারোহণে বিলাতযাত্রাকালে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই বিষাদ-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা যে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল,

* আলিনগরের সন্ধিপত্রে অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই বলিয়া একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক মর্ম্মবেদনায় লিখিয়া গিয়াছেন যে:—"No satisfaction was obtained for the atrocities of the Black Hole; and the absence of any provision for this purpose is the greatest scandal attached to the treaty. For this no sufficient apology can be found. Peace was desirable, but even peace is bought too dearly when the sacrifice of national honor is the price."—Thornton's History of the British Empire, vol. I. 212-213.

† Early Records of British India.

সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পলাশির যুদ্ধাবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজ বণিকের অপকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের নরনারী যখন তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল, সেই সময়ে (তৎপূর্ব্বে নহে!) এই পত্রখানি জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইল! ইংলণ্ডের নরনারী নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলার নামে শিহরিয়া উঠিল;—ইংরাজের কুকীর্ত্তির কথা কোথায় বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গেল;—সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ককাহিনীতে সভ্যজগৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল!

যে উদ্দেশ্যে অন্ধকূপহত্যার করুণ কাহিনী সভ্যজগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা যখন সুসিদ্ধ হইয়া গেল, তখন আর কেহ তাহার সত্য মিথ্যার আলোচনা করিলেন না! কালক্রমে সেই সকল কথা ইংরাজলিখিত ইতিহাস পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলার শতধিক্কৃত দুর্দ্দান্ত নামের সঙ্গে চিরসংযুক্ত হইয়া, পরবর্ত্তী লেখকসম্প্রদায়ের কল্পনাপ্রবাহ খরতর করিয়া দিয়াছে। আজ বহুবৎসরের বিলুপ্ত কাহিনীর চিতাভস্মাচ্ছন্ন জীর্ণ কঙ্কাল আলোড়ন করিয়া, কে তাহার রহস্যভেদ করিবে? যে সন্দেহ মুতক্ষরীণের অনুবাদক ফরাসী পণ্ডিত হাজি মুস্তাফাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল, সে সন্দেহ আর দূর হইল না। যতই আলোচনা হউক, ইতিহাসলেখকদিগের নিকট অন্ধকূপকাহিনী চিরদিনই সন্দেহপূর্ণ থাকিবে; কেবল কল্পনানিপুণ ভারতীর বরপুত্রগণ কখন কখন বিমুক্ত গগনের নক্ষত্র-লোক হইতে কবিতাবৃষ্টি করিয়া অন্ধকূপহত্যার করুণকাহিনী জনসমাজে জাগরূক করিয়া রাখিবেন।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল অন্ধকূপহত্যাই এদেশে বৃটিশ রাজশক্তি সংস্থাপিত হইবার মূলকরণ।* তাহাই যদি সত্য হইত, তবে তদনুরূপ স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পাইতেছি না কেন? কানপুরের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ সযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে; মণিপুরের হত্যাকাণ্ডকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়াছ;—অথচ যাহারা অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া বৃটীশ রাজশক্তি সুসংস্থাপিত করিল, সেই সকল হতভাগাদিগের স্মৃতিচিহ্নের জন্য একটি ইষ্টকস্তম্ভও দেখিতে পাই না কেন? ইহা কি বিস্ময়ের স্থল নহে?

ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের স্থল আছে। যাহারা অন্ধকূপকারাগারে জীবনবিসর্জ্জন করে, তাহাদের নামে কলিকাতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কালক্রমে ইংরাজেরাই তাহা স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন! যাহাদের বণিজ্য রক্ষার জন্য এই সকল হতভাগারা অকালে জীবনদান করিয়াছিল, সেই কোম্পানী বাহাদুর কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করেন নাই;—করিয়াছিলেন অন্ধকূপহত্যাকাহিনীরচয়িতা হলওয়েল বাহাদুর। কবে এই স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার সময়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।† এই স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত ছিল :—

* The Great battles of the British Army.
† Echoes from old Calcutta.

TO
THE MEMORY
OF
Edw. Eyre, Wm. Baillie, Esqrs.
The Revd. Fervas Bellamy, Messrs.
Jenks, Revely, Law, Coales, Valicourt,
Jebb, Torrians, E. Page, S. Page,
Grub, Street, Harod, P. Johnstone,
Bellard, N. Drake, Carse, Knapton,
Gosling, Dod, Dalrymple, Captains Clayton, Buchanan, Witherington, Lieuts. Bishop, Hays, Blagg,
Simpson, J. Bellamy, Ensigns Paccard, Scot. Hastings, C. Wedderburn,
Dumbleton, Sea-captains Hunt,
Osburne, Purnell, Messrs. Carey,
Leech, Stevenson, Gay, Porter, Parker,
Caulker, Bendall, Atkinson, who
with sundry other inhabitants, Military
and Militia to the number of 123
persons were by the Tyrranic violence
of Siraj-ud-Dowla, Suba of Bengal
suffocated in the Black Hole prison
of Fort William in the Night of the 20th day
of June 1756 and promiscuously thrown
the succeeding morning into the Ditch of
the Ravelin of this place
This
Monument is errected
by
Their Surviving fellow-sufferer
J. Z. HOLWELL.

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরফলকের নিম্নে আর একখানি ফলকে লিখিত ছিল যে :—

This horrid act of violence
was as amply
As deservedly revenged on
Siraju'D Daulah,
By His Majesty's Arms,
Under the conduct of
Vice Admiral Watson and
Colonel Clive,
Anno 1757.

এই স্মৃতিস্তম্ভ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, মারকুইস্ অব হেষ্টিংসের শাসন সময়ে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) "কষ্টম ঘর" নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে!! অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ডে যাহারা জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের শবদেহের সমাধিগহ্বরের উপর এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল;—ইতিহাসে এইরূপই লিখিত আছে। তজ্জন্য তাহা সকলজাতির নিকটেই পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত এবং খ্রীষ্টিয়ান ইংরাজসাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধিবশতই তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। অন্ধকূপ কাহিনী সত্য হইলে সেই পবিত্র সমাধিস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইতে পারিত না; সামান্য "কষ্টমঘরের" স্থান সংকুলনের জন্য এরূপ পবিত্র সমাধিমন্দিরে লৌহদণ্ডাঘাত করিলে খৃষ্টীয় সমাজ সে বর্ব্বরতা সহ্য করিতেন না। এই সমাধিস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইল, অথচ কেহ ক্ষীণস্বরেও প্রতিবাদ করিলেন না কেন? একজন ইংরজে-লেখক ইহার একটি মুখরোচক সুন্দর কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "বোধহয় বৃটিশবাহিনীর পরাজয়কলঙ্কের স্মৃতিস্তম্ভ বলিয়াই ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করা হইয়াছে।" * ইহাই কি সম্ভবপর কৈফিয়ৎ? এমন কলঙ্ক-স্তম্ভ কি ভারতবর্ষে আর নাই? পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের জালজুয়াচুরির যে জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কি বৃটিশজাতির গৌরবের নিদর্শন!

অন্ধকূপ কোথায় ছিল, এখন আর তাহা চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিবার উপায় নাই। কলিকাতার 'জেনারেল পোষ্টাপিস'-সংলগ্ন উত্তরদিকে যে ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্তম্ভগাত্রে পশ্চিমদিকে খোদিত আছে যে :—

"The stone-pavement close to this, marks the position and size of the prison-cell in old Fort-William, known in history as the Black Hole of Calcutta."

* Calcutta,—its highways and by-paths, by Edmund Mitchell, M.A.

এই ফলকলিপিতে যে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণের কথা লিখিত আছে, সে প্রাঙ্গণ হলওয়েল-বর্ণিত ১৮ ফিট আয়তনের নহে;—তাহা দীর্ঘে ২২ ফিট, প্রস্থে ১৪½ ফিট। ইহাই কি অন্ধকূপ কারাগারের একমাত্র নিদর্শন? ইহাও পুরাতন নহে;—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত। সে বৎসর নাকি মৃত্তিকাগর্ভে অন্ধকূপ কারাগার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল! ইহাই যে সেই অন্ধকূপের যথার্থ আয়তন, সেকথা কেহ কেহ অতীব দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন!* আমরা কিন্তু অন্যত্র দেখিতেছি যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অন্ধকূপ কারাগার একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। † ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া "এসিয়াটিকস্" নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন সুবিখ্যাত পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাস-বিখ্যাত কারাগার সন্দর্শন করেন, তখনই তাহা পড় পড়,—এখন আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই!" ‡

হলওয়েল যে কারাগৃহের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৮ ফিট দীর্ঘ এবং ১৮ ফিট প্রস্থ। এরূপ ক্ষুদ্রায়তন সংকীর্ণকক্ষে ১৪৬ জন নরনারী কিরূপে কারারুদ্ধ হইতে পারে, সে কথা কিন্তু অল্পলোকেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন! এক একজন মানুষের জন্য অন্ততঃ ৬ ফিট দীর্ঘ ২ ফিট প্রস্থ এবং ২ ফিট বেধসমন্বিত স্থানের নিতান্ত আবশ্যক;—তাহা হইলেও ওরূপ সংকীর্ণকক্ষে ৮১ জনের অধিক লোকের কিছুতেই স্থানসংকুলন হইতে পারে না: অথচ তাহারই মধ্যে ১৪৬ জন নরনারী কেমন করিয়া স্থানলাভ করিয়াছিল? § অল্পায়তন গৃহকোটরে নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ১৪৬ জন নরনারীকে কারারুদ্ধ করাই অন্ধকূপ-হত্যার সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক;—সে কলঙ্ক কি নিতান্ত অতিরঞ্জিত বা সর্ব্বথা কাল্পনিক কলঙ্ক নহে? হলওয়েল আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন, অথচ জ্ঞানগর্ব্বিত বৃটিশ-জাতি ইহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সাশ্রুনয়নে হলওয়েলের কল্পিত কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়া আজিও কত না হা হুতাশ করিতেছেন!

সিরাজদ্দৌলা দুর্গজয় করিবার সময়ে আদৌ ১৪৬ জন লোক বন্দী হওয়াই বিশেষ সন্দেহের কথা! হলওয়েল যেদিন দুর্গরক্ষার ভারগ্রহণ করেন, সেদিন দুর্গমধ্যে কেবলমাত্র ১৯০ জন বর্ত্তমান ছিল; ¶ আর আর সকলেই দুর্গাধিপতি মহামতি ড্রেক সাহেবের সাধুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই ১৯০ জন লোকের মধ্যে দুই দিবসের অক্লান্ত রণতরঙ্গে অনেকেই জীবনবিসর্জ্জন করে; যাহারা জীবিত ছিল, তন্মধ্যে আহত ও মুমূর্ষুর সংখ্যাও অল্প ছিল না। যে সকল লোক কোনরূপে পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহারাই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল; তদ্ভিন্ন যাহাদের শক্তি ছিল, সাহস ছিল, পলায়নের প্রবৃত্তি ছিল, তাহারা অনেকেই দুর্গজয়ের কোলাহলের অবসর পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে সকল নরনারী মিরজা আমীরবেগের হস্তে পতিত হয়, মীরজাফরের কৃপায়

* Ibid. † Early Records of British India. ‡ Asiatic Journal of Bengal.

§ As to the Black-Hole tragedy,—the unburied site of which is the subject of so much fuss in our day,—I have a very doubtful faith in its account. Holwell, one of the fellow-sufferers, was the first to publish it to the world. But I have always questioned it to myself, how could 146 beings be squeezed into a room 18 feet square even if it were possible to closely pack them like the seeds within a pomegranate, or like the bags in a ship's hold made into one mass by packets shoved in here and there into the interstices? Geometry contradicting arithmetic gives a lie to the story. It is little better than a bogey against which was raised an uproar of pity—Dr. Bhola Nath Chunder (Calcutta University Magazine.) ¶ Stewart.

তাহারা সেইদিনই নিরাপদে পল্‌তায় প্রেরিত হইয়াছিল।* এরূপ অবস্থায় হলওয়েলের কথিত ১৪৬ জন বন্দী কারারুদ্ধ হওয়া বিশেষ সন্দেহস্থল। হলওয়েল স্বপ্রণীত পুস্তকে † যে সকল মৃত ও মৃতকল্প সহযোগীদিগের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ৬৬ জনের অধিক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইংরাজবন্দীদিগের জন্য নবাব-সেনাগণ যে সে রজনীতে সুকোমল পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া দেয় নাই, তাহা সত্য কথা। কিন্তু হলওয়েল যেরূপ ক্ষুদ্র-কক্ষে যে পরিমাণ নরনারী কারারুদ্ধ করিবার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকমাত্রেই হলওয়েল-বর্ণিত অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কাহার দোষে এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনামখ্যাত মহাত্মা বিভারিজ বলেন যে, "আমাদের পক্ষে অন্ধকূপ-হত্যার কথা তুলিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষ্ঠুর স্বভাবের কলঙ্কঘোষণা করা শোভা পায় না। এ বিষয়ে বোধহয় বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই কর্ত্তব্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট অমৃতসর প্রদেশে কি দুর্ঘটনাই না সংঘটিত হইয়াছিল।" ‡ বিভারিজ সাহেব যে দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নিকট অন্ধকূপ-হত্যা লজ্জায় মলিন হইয়া যায়। একটি ক্ষুদ্রায়তন গোলাকার কক্ষের মধ্যে বহুসংখ্যক সিপাহীকে কারারুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা তাহার মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া ২৩৭ জন হতভাগাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া গুলি করেন; তখন বন্দীদিগের মধ্যে আর কেহ বাহিরে আসিতে স্বীকার করিল না। ইংরাজের আদেশে কক্ষদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন সংজ্ঞাশূন্য ৪৫ জন হতভাগার অবসন্ন দেহ টানিয়া বাহির করিতে হইল;—ভয়ে, রণশ্রমে, গলদ্‌ঘর্ম্মে, গ্রীষ্মাতিশয্যে, দমবন্ধ হইয়া তাহাদের কত না দুর্গতি হইয়াছিল! § জ্ঞানোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সহৃদয় বৃটিশশাসনে যে এরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, ইহার জন্য কয়জন ইতিহাস-লেখক লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন? যুদ্ধাবসানে বন্দীদিগের ভাগ্যে অনেক সময়ে নিদারুণ নির্যাতন উপস্থিত হইয়া থাকে;— তাহারা অন্নজল পায় না, বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত অবসর পায় না, কখন কখন নৃশংসস্বভাব প্রহরীগণের নির্যাতনে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। এসকল যুদ্ধব্যাপারের অপরিহার্য্য অপকীর্ত্তি; কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা একদিন স্বদেশে গ্লেন্‌কোর হত্যাকাণ্ডে রুধির-কর্দ্দমে কলঙ্কিত হইয়া, এদেশে আসিয়া কতশত স্থানে ভীষণ হত্যাকাণ্ডে পাশবশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্যের অমোঘ নিদর্শনস্বরূপ কত শত হতভাগা ভারতবাসীর জীর্ণকঙ্কাল হিন্দুস্থানের প্রত্যেক অশ্বত্থশাখায় বহুবৎসর পর্য্যন্ত দোদুল্যমান রহিয়াছিল, যাঁহাদের প্রতিহিংসাতাড়িত উদ্ধত সেনাদল কানপুরের শত শত নাগরিকদিগকে সন্দেহমূলে বা ঈর্ষাবশতঃ অবিচারে শোণিতলেহন করাইয়া তাহার পর ধনে বংশে বিনাশ করিতে মমতা প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের ইতিহাসে অন্ধকূপহত্যার অতিরঞ্জিত অথবা সর্ব্বথা কাল্পনিক কাহিনী লইয়া সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক রটনা করা বড়ই পরিতাপের বিষয়!

* Mutakherin. † India Tracts. ‡ Calcutta Review, April, 1892.

§ "The doors were opened, and behold! they were all dead. Unconsciously the tragedy of Holwell's Black hole had been re-enacted. Fortyfive bodies,—dead from fright, exhaustion, fatigue, heat and partial suffocation—were dragged into light."—The Crisis in the Punjab, p. 162.

অন্ধকূপহত্যা সত্য হইলেও সিরাজদ্দৌলার অপরাধ কি? স্বয়ং হলওয়েল সাহেবই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার সহিত সিরাজদ্দৌলার কিছুমাত্র সংস্রব থাকা তিনি বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহার ধারণা এইরূপ যে, নবাব সেনাদিগের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির জন্যই এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।* ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদিগের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা সর্ব্বজনসমক্ষে হলওয়েলের বন্ধনমোচন করিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে অভয়দান করিয়াছিলেন। অন্যায় উৎপীড়ন করাই যদি সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় হইত, তিনি কখনও এরূপ ব্যবহার করিতেন না। সিরাজদ্দৌলার আশা ছিল যে, হলওয়েল তাঁহাকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে হলওয়েলের জীবনসংশয় হইয়া ধনলাভের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই তাহাতে সম্মতিদান করিতেন না।

হলওয়েল এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সমস্ত দিন বীরের ন্যায় দুর্গরক্ষা করিয়া দৈববিড়ম্বনায় পরাজিত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিবার অবসর প্রদান করা হইয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহারা যদি সিপাহীদিগের উপর লাফাইয়া পড়িবার আয়োজন না করিতেন, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পলায়নপথের সন্ধান লইবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ না করিতেন, তবে হয়ত তাঁহাদিগকে কক্ষমধ্যে আদৌ অবরুদ্ধ হইতে হইত না। যখন অবরোধের আয়োজন হইল, তখন ইংরাজেরাই কারাকক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন; নবাবসেনা তাহার আয়তন বিষয়ে কিছুমাত্র সন্ধান রাখিত না।† হলওয়েল সর্ব্বাগ্রে গৃহপ্রবেশ করিয়া কোনরূপ আপত্তি না করায় তাহারা সকলকেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে যদি কষ্ট হইয়াছিল, তবে সে কষ্টের কথা বুঝাইয়া না বলিয়া বা কোন সেনাপতিকে সংবাদ না পাঠাইয়া উদ্ধত ইংরাজসেনা বাহুবলে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া প্রহরীদিগকে যে অতিমাত্র ভীত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। হলওয়েলের কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে ইহাও বোধ হয় সত্য যে, ইংরাজসেনার আস্ফালন দেখিয়াই প্রহরীগণ নবাবের বিনানুমতিতে দ্বার মোচন করিতে সম্মত হইয়াছিল না। ইহার জন্য তাহাদিগের অপরাধ হইতে পারে না। আর তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া জানালার ধারে যাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল, তাহারা ত বিশেষ যন্ত্রণাভোগের পরিচয় প্রদান করে নাই। অন্ধকার কারাকক্ষের অপরাংশে লোকচক্ষুর অগোচরে যাহারা মর্ম্মযাতনায় ছটফট করিতেছিল, বাহির হইতে প্রহরীসেনা তাহার বিষয় বোধ হয় কিছুই জানিতে পারে নাই। এ সকল কথার যথোপযুক্ত আলোচনা না করিয়াই কোন কোন ইতিহাস-লেখক অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা নিজেই বন্দীদিগকে অন্ধকূপ কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন! এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই; কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ইঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন! একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, "প্রমাণ না থাকিলেও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার বিচার করিয়া সিরাজদ্দৌলাকেই অপরাধী করিতে হয়। নচেৎ তাঁহার আদেশ ব্যতীত দ্বার উন্মোচন করিতে কাহারও সাহস হইল না কেন,

* একথা সত্য হইলে দুর্গপ্রবেশের সময়েও সিপাহীরা সাহেবদিগকে হত্যা করিতে ক্রটি করিত না; কিন্তু ষ্টুয়ার্ট বলেন যে,—"The English having surrendered their arms, the Nawab's troops refrained from bloodshed."

† Mill, vol. iii.

এবং এতগুলি নরনারীর জীবনরক্ষার জন্য ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মা-ইতে ইতস্ততঃ হইল কেন? ইহাই ত যথেষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, সিরাজ-দ্দৌলার আদেশক্রমেই এরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল!"*

সিরাজদ্দৌলাই যে হতভাগ্য ইংরাজ বন্দীদিগকে অন্ধকূপ কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং হলওয়েলের লিখিত কাহিনী অনু-সরণ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নিরপরাধ বলিবার অনুকূল প্রমাণের অভাব নাই। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ম্যালিসন, স্বপ্রণীত ইতিহাসে † সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমোচন করিয়া গিয়াছেন।

অন্ধকূপহত্যা যদি সত্য হয়, তবে ইংরাজেরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান সহকারী অপরাধী তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মহাত্মা হাওয়ার্ডের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশেই এইরূপ পূতিগন্ধময় আলোকসম্পাতশূন্য অন্ধকূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে আসিয়াও, স্বদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, সেইরূপ অন্ধকূপ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল অন্ধকূপে কত হতভাগাই না অকালে অন্যায় উৎপীড়নে জীবনবিসর্জ্জন করিত! কত উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক, কত মদমত্ত নাবিক, কত অন্নহীন দাদনগ্রস্ত দরিদ্র বাঙ্গালী যমযাত-নায় ছটফট করিয়া মরিত! ইতিহাসলেখক জেমস্ মিল এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্ম-বেদনায় লিখিয়াছেন যে, "হায়! যদি অন্ধকূপ না থাকিত, তাহা হইলেত ইংরাজবন্দীদিগের এরূপ শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইতে পারিত না!"‡

গান।

আশাভৈরবী—একতালা।

একটু আলো ও একটু আঁধার একটু সুখ ও একটু ব্যথা ;
—না কহিতে হায় ফুরাইয়ে যায়—একটু প্রাণের একটু কথা !
একটু আলাপ ; কলহ, বিলাপ, বিশ্বাস, সংশয়, আশা, ভয় ;
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয় !
একটু হৃদির একটু স্পন্দন,
—চির নিস্পন্দতা পরে সব ;
একটু হাসি ও একটু ক্রন্দন,
—থেমে যায় এই কলরব ;
ধনের গৌরব, যশের সৌরভ, প্রেমের মত্ততা, সবই হায়
একই সঙ্গে শেষে, চখের নিমেষে ধূ ধূ ধূ ধূ করে' পুড়ে যায় !

---

* But the probability is, that the Subahdar had himself made or sanctioned the selection of the Black hole as the place of confinement, for when the miserable prisoners besought that they might be relieved by the removal of part of their number to some other place, their prayer was unavailing, because it could not be granted without the express orders of the Subahdar, whose sleep no one dared to disturb for so trivial a purpose as the preservation from death of nearly one hundred and fifty human beings.—Thornton's History of the Britith Empire, vol. i. 197.

† Malleson's Decisive Battles of India.

‡ What had they to do with a Black hole? Had no *blackhole* existed, (as none ought to exist anywhere, least of all in the sultry and unwholesome climate of Bengal) those who perished in the Black Hole of Calcutta would have experienced a different fate.—Mill's History of British India, vol. iii. 149 note.

যোগেশ।

১

আজ অনেক দিনের পর যোগেশের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি মনে পড়িতেছে। সেই মলিন মধুর মুখচ্ছবি, সেই ওষ্ঠে লুক্কায়িত ঈষৎ ম্লান হাস্য, সেই নয়নের করুণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি আজি যেন জীবন্ত ছবির ন্যায় মনে জাগিতেছে। হারাণো রতন কি আর ফিরিয়া পাইব?

ছেলেবেলা হইতে যোগেশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। আমি যেখানে যাইতাম, যোগেশ ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিত। একত্র বিচরণ, একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন, সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস। যোগেশকে আমি বড়ই ভাল বাসিতাম, কিন্তু তাহাতে আমার গুণ কিছু ছিল না। আমি স্বেচ্ছায় তাহাকে ভালবাসি নাই। সে আমার ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছিল। কেই বা তাহাকে ভাল না বাসিত?

গ্রামে আমার মত দুরন্ত বালক আর দুটী ছিল না। হায়, কোথায় সে সুখের বাল্যকাল! সমস্ত দিন ছুটাছুটী আর অশান্তপণা! কখনো নগার পিঠে একটা চড় মারিয়া পলাইতেছি, কখনো ঘোষেদের কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়িতেছি, কখনো রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি, মার সহস্র ডাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। স্নান করিতে যদি একবার নদীতে নামিলাম, তবে আমাকে কাহার সাধ্য উঠায়! একবার এপার একবার ওপার করিয়া ক্ষীণ স্রোতস্বিনীকে চঞ্চল করিয়া তুলিতাম। যাহা কিছু সহজপ্রাপ্য তাহাতে কখনো আমার মন উঠিত না। আমার এই দুরন্ত স্বভাবে আমার জননীকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তবু মা আমার কখনো আমাকে তিরস্কার করেন নাই। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই মা বলিতেন "পাঁচটি ছেলে ভগবান দিয়া আবার কাড়িয়া নিয়াছেন, ওই কি বাঁচিবে? দিদি, আমার আর শাসন করিতে মন সরে না।"

পিতামাতা আমাকে কখনো শাসন করেন নাই, কিন্তু আমার আর একজন শাসক ছিল, সে যোগেশের দুটী করুণ নয়ন। সে নয়নের দৃষ্টি আমি কখনও অবহেলা করিতে পারিতাম না। যখনই আমি কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনই সেই দুটী নয়ন আমাকে নিবৃত্ত করিত। এজন্য যতক্ষণ যোগেশের সংবাসে থাকিতাম, ততক্ষণ আমার প্রকৃতি কিছু শান্ত থাকিত।

মার উপর আমার দণ্ডে দণ্ডে রাগ হইত। রাগ করিয়া বসিয়া আছি, কিছু খাইব না, মা কিছুতেই আমার সহিত না পারিয়া যোগেশকে ডাকিয়া আনিতেন। যোগেশ আসিবা-মাত্র আমার সে রাগ সে আব্দার কোথায় যাইত! জানিনা যোগেশ কি যাদুমন্ত্র জানিত!

২

আমার বয়স তখন দশ বৎসর, যোগেশের নয় বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে যোগেশের শান্ত মধুর প্রকৃতি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইতেন। তাহার মুখে কেহ কখনও মন্দ কথা শুনে নাই, গ্রামের কোন ছেলের সহিত তাহার কখন বিবাদ হয় নাই।

আমাদের দুই বন্ধুর যেমন বিভিন্ন প্রকৃতি, তেমনি আবার দুজনের অবস্থাতেও অত্যন্ত পার্থক্য ছিল। আমি আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছি, দুঃখ যে কি তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। যোগেশও তেমনি জন্মাবধি দুঃখই পাইয়াছে, সুখের মুখ দেখা তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। "চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?" কবির এ উক্তি জীবন্ত সত্য। আমি আমার প্রাণের বন্ধুর দুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম না। আহা কি কষ্টেই না তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে! অভাগিনী

জননী দুইমাসের পিতৃহীন শিশুসন্তান বক্ষে করিয়া লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া শিশুটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তখনো ত মার কোলটুকু যোগেশের জুড়াইবার স্থান ছিল, কিন্তু একবৎসর হইল যোগেশ তাহার সে আশ্রয়ও হারাইয়াছে।

৩

আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণ বসুর বাটী। বসুজ মহাশয় সদাশয়, ধার্ম্মিক ও সঙ্গতিপন্ন। পিতৃ মাতৃহীন বালকের ভার তিনি স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনাথ জননী-অঙ্কচ্যুত অষ্টমবর্ষীয় বালক বসুপরিবারের অন্নভুক্ত হইল।

রাধাকৃষ্ণ বাবুর একটি মাত্র পাঁচ বৎসরের বালিকা কন্যা। যোগেশের উপর সেই বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। কন্যাটীর নাম সুলোচনা ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে শুধু যে তাহার লোচন দুটীই সুন্দর একথা বলা যায় না, তাহার শ্রী, গঠন, মুখমাধুর্য্য, গমনভঙ্গী, ঈষৎ হাস্য এ সকলই অতি সুন্দর—গ্রামের ভিতর সেই কেবল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা। রাধাকৃষ্ণ বাবুর সেই আদরিণী ভুবনমোহিনী কন্যার সহিত অতি শৈশবাবধি আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির ছিল। আমার জননীর সুলোচনাকে বধূ করিবেন বড়ই সাধ, আর রাধাকৃষ্ণ বাবু এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীরও আমাকে জামাতা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল।

সুলোচনাদের বাড়ী আর আমাদের বাড়ী পাশাপাশি, আমি জানিতাম সে আমার কনে, কিন্তু অতটুকু ক্ষুদে মেয়েকে আমি গ্রাহ্যের ভিতর আনিতাম না। বালক বালিকার প্রণয় কেমন তাহা উপন্যাসলেখকেরাই ভাল বুঝেন, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, বা নাই করুন, আমি স্বরূপ বলিতেছি সুলোচনার সহিত আমার কোনরূপ প্রণয়ের নামগন্ধ ছিল না। বরং কিছু বিদ্বেষই ছিল—কেন না সেও বড় আদরের। অন্যের আদর আমার সহ্য হইত না।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যোগেশের উপর তাদৃশ প্রসন্ন ছিলেন না। যোগেশের অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি তাঁহার নিকট "মিট্‌মিটে ডাইনি" বলিয়া বোধ হইত, তাহা ব্যতীত যোগেশের আরও অনেক দোষ ছিল। রাধাকৃষ্ণ বাবু যোগেশকে অত্যন্ত ভাল বাসেন—এ একটী প্রধান দোষ। সকলে যোগেশের সুখ্যাতি করে—আর একটী দোষ, এইরূপ আরও অনেক দোষ। কিন্তু প্রসন্ন না থাকিলেও অগত্যা যোগেশকে বাটীতে স্থান দিতে হইত, তাড়াইয়া দিলে রাধাকৃষ্ণ বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, আবার সুলোচনা যেগেশ দাদার সঙ্গ ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত থাকিবে না। যোগেশ দাদা বেড়াইতে নিয়া যাইবে, যোগেশ দাদা খাওয়ার সময় খাবার মুখে তুলিয়া দিবে, ঘুমাইবার সময় যোগেশ দাদা শিওরে বসিয়া গল্প করিবে। সুলোচনার সম্পূর্ণ ভারই যোগেশের উপর। ইহাতে যদি কোন দিন কিছু ত্রুটি পাইতেন, সেদিন অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঘণ্টাখানেক বাক্যবর্ষণ করিয়া কিছু মন খোলসা করিতেন।

৪

সে দিন অক্ষয় তৃতীয়া। মা এবং পল্লীবাসিনী অপর জনকয়েক রমণী মহা উৎসাহের সহিত সরিষা কুটিতেছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মা শঙ্কিতভাবে বলিলেন "বাপ আমার, এ ঠাকুরের জিনিষ, হাত দিও না।" যদিও বা হাত না দিতাম একথা শুনিয়া কি আর থাকিতে পারি, তখনই এক মুঠা সরিষাগুঁড়া তুলিয়া মুখে দিলাম। নিষিদ্ধ কার্য্যে আমার পরম আমোদ ছিল, কখনও তাহা না করিয়া ছাড়িতাম না। এইরূপ অবাধ্যাচরণ করিয়াও কখনো আমাকে শাস্তি পাইতে হয় নাই। আজ কিন্তু অবাধ্যতার বিলক্ষণ শাস্তি পাইলাম। সরিষা মুখে দিবামাত্র আমার নাক, মুখ, গলা অত্যন্ত জ্বালা করিতে লাগিল, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু এরূপ সর্ব্বসমক্ষে অপমানে আরও গুরুতর শাস্তি হইল। সকলে আমার এই অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, মা ছুটিয়া জলের ঘটি আনিতে গেলেন, আমি অমনি দৌড়িয়া পলাইলাম।

পৃথিবীর এরূপ নিষ্ঠুরতায় মনে অত্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাগ হইতে লাগিল, কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ আমারই, কাজেই কাহার উপর রাগ করিব খুঁজিয়া না পাইয়া স্থির করিলাম "দূর হোক্, আর বাড়ীতে যাইব না।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নদীর ধারে বনের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

ক্রমে ক্রমে রৌদ্রটুকু পশ্চিম আকাশে মিলাইয়া গেল, অমনি পুবধারে আকাশের গায়ে রেখার মত একখানি চাঁদ উঠিল। পাখীরা সকলে চেঁচামেচি করিয়া সকলের উদ্দেশ লইতে লাগিল, কিন্তু আমার উদ্দেশ এখনও কেহ লইতে আসিল না। সন্ধ্যাকাল, বনের ধার, আবার ঐ বটগাছে নাকি কি আছে শুনিয়াছিলাম, একা কেমন করে থাকি, উদরও বৈরাগ্যের প্রতিকূল পক্ষ লইলেন। অবশেষে অগত্যা কি করি, বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম—এমন সময় দেখি যোগেশ সুলোচনার হাত ধরিয়া বেড়াইতে আসিতেছে।

আমার হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল আসিল। গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকি, হঠাৎ যোগেশের সম্মুখে গিয়া পড়িব, সে কেমন চমকিয়া উঠিবে, বড় আমোদ হইবে, স্থির করিয়া ঝোপের ওপাশে গিয়া লুকাইলাম।

সেদিনের সন্ধ্যার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। অস্ফুট চন্দ্রালোকে বনশ্রেণী ছায়ার মত দেখা যাইতেছে, আর সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা করতোয়া নদী। আকাশ নক্ষত্রপূর্ণ, যেন কে একটা কাল কাগড়ে রাশি রাশি হীরার ফুল ছড়াইয়া দিয়াছে। সুলোচনা এক দুই করিয়া তারা গণিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ক্ষান্ত হইয়া কোন তারাটি বড়, কোন তারাটি ভাল ইহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল।

যোগেশ বলিল "ঐ যে বড় তারাটা সুলু, ঐটী আমার মায়ের চোখ। আমার মা আকাশে গিয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে যোগেশের গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া আসিল।

সুলোচনা বলিল "তোমার মা আকাশে গিয়াছেন?" হাঁ যোগেশ দাদা তোমার মা কেন ওখানে গেলেন?"

যোগেশ ভগ্ন স্বরে বলিল "সকলে বলে মা ঐ আকাশে গিয়াছেন। সুলোচনা, আমার মা ঐখানে আছেন। আর এখন কেহ আমাকে তেমন ক'রে ডাকে না, কেহ আর আদর করে না, আর কেউ কোলে নেয় না। হয় ত আমি মার কথা শুনি নাই, তাই মা রাগ করে চলে গ্যাছেন।

"যোগেশ দাদা, ওকি? তুমি অত কাঁদচ কেন যোগেশ দাদা? আর আমি কখনো মাকে তোমার নামে কোন কথা বল্‌ব না, আর তোমার উপর রাগ কর্‌ব না, তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌ব। যোগেশ দাদা কেঁদনা বাড়ী চল।"

সুলোচনা আর যোগেশ যখন চলিয়া গেল, তখন আমার মোহভঙ্গ হইল। আজ আমি প্রথম যোগেশের দুঃখ বুঝিলাম। কি জানি কেন আমার চোখে জল আসিল। নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীতে চলিলাম।

৫

তার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই পাঁচ বৎসরে আমার স্বভাবের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কি আর কেহ আমাকে সেই দুরন্ত, অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বালক বলিয়া অনুমান করিতে পারে? এখন আর কেহ আমার নিন্দা করে না, সকলের মুখেই আমার সুখ্যাতি। আমার সুখ্যাতি শুনিয়া যোগেশের আনন্দের সীমা থাকিত না।

সুলোচনা আর এখন আমার সম্মুখে আসে না। আমাকে দেখিলে পলাইয়া যায়। আমারও যেন তাহাকে দেখিলে কেমন লজ্জা করে, কিন্তু দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল

হয়। হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়িলে সে যখন ছুটিয়া পলাইয়া যায়, তখন আমার বিদ্যুতের
সহিত তুলনা মনে পড়ে। দুই বৎসরের ভিতরই তাহার সহিত আমার শুভবিবাহ হইবে
একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

বালককালে গ্রামস্থ সমুদায় বালকবালিকার ভিতর যোগেশই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল,
বয়োবৃদ্ধিতেও আমার সেভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। যোগেশ সর্ব্বদাই আমার সঙ্গী, একত্র
পাঠ, একত্র শয়ন, একত্র ভ্রমণ। আমার যখন যাহা মনে হইত, তৎক্ষণাৎ যোগেশকে বলি-
তাম, আর কাহাকেও বলিয়া তৃপ্তি হইত না।

কার্য্যে যোগেশের তিলমাত্রও আলস্য ছিল না। যখন যাহার যে কার্য্য উপস্থিত হইত,
যোগেশ উপযাচক হইয়া সাহায্য করিত। বিপদে আপদে যোগেশ গ্রামবাসীর দক্ষিণ হস্ত।
কিন্তু ভ্রমেও সে স্বকৃত কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিত না। এজন্য সকলেরই তাহার উপর যথেষ্ট
স্নেহ ছিল। তথাপি তাহার সেই মলিন মুখ কখনো আমি প্রফুল্ল দেখি নাই।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইল, অতএব পিতা আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন স্থির
করিলেন। তখন সহসা মন বড় বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিব,
বিদ্বান হইব, গ্রামের ভিতর যশস্বী হইব, রাজধানীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব, নূতন নূতন
দ্রব্য দেখিব, মাদকের ন্যায় এই সকল চিন্তা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। এই চিন্তাতেই
দিন কাটিত—আর প্রত্যহ দিন গণিতাম। তবে যোগেশকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এটী
একটী গুরুতর কষ্ট বটে, কিন্তু সে বিষয়টা ভাবিবার আমার বড় একটা অবসর রহিল না।

৬

সাধ পূর্ণ হইল, কলিকাতায় আসিলাম। আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরী সম্বন্ধে
যেরূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে কল্পনা সত্য হইল না বটে, কিন্তু তথাপি কলিকাতা
দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল। যতই কলিকাতার শ্রী সমৃদ্ধি দেখিতে লাগিলাম, ততই
আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিতে থাকিল। দিনের অধিকাংশ সম-
য়ই পাঠে অতিবাহিত হইত, যেটুকু বিশ্রামের সময়, সেইটুকু ভ্রমণে ব্যয় করিতাম। ভ্রমণ
সময়ে সঙ্গীর অভাব অনুভব হইত। আমি স্বভাবতঃই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ
করিতে ভালবাসি না। সমপাঠীগণের সহিত আলাপ হইল বটে, কিন্তু মিত্রলাভ আমার
অদৃষ্টে ঘটিল না। যখন যে কিছু নূতন সুন্দর দ্রব্য দেখিতাম, অমনই যোগেশকে মনে পড়িত,
ভাবিতাম, যোগেশ আমার সঙ্গে আসিলে বড়ই ভাল হইত। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া পড়িতে
বসিতাম আর কিছু ভাবিবার অবসর থাকিত না।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কলিকাতায় কাটিল। নানা কারণে ইহার ভিতর একবারও
বাটী যাওয়া হইল না। এ দুই বৎসরে আমার সাধের কলিকাতা আমার নিকট পুরাতন
হইয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল ততই কলিকাতা আমার নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে
লাগিল। আর সেই সঙ্গে আমার দীনা জন্মভূমির ভূষণহীন সৌন্দর্য্য মনে উদয় হইত। আর
বিশেষ কতদিন মাকে দেখি নাই, কতদিন যোগেশকে দেখি নাই। বাড়ী যাইবার জন্য মন
বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চৈত্র মাসের শেষে বাবা লিখিলেন "বৈশাখ মাসে তোমার শুভবিবাহ স্থির করিয়াছি,
অতএব তুমি পত্রপাঠ সত্বর আসিবে।" চিঠি পড়িয়া আমার একটি দৃশ্য মনে পড়িল। আমাকে
দেখিলে সুলোচনা কেমন ছুটিয়া পলাইত—যেন একখানি বিদ্যুত চমকিয়া যাইত। সেই
সুলোচনা আমার জীবন-সঙ্গিনী, যুগপৎ কতকটা আনন্দ লজ্জা ও গাম্ভীর্য্যে হৃদয় ভরিল।

৭

বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি বাটী আসিলাম। কতদিন পরে কুহকিনী রাজধানীর ক্রোড়
হইতে স্নেহময়ী জন্মভূমির ক্রোড়ে আসিলাম। মেঠো পথ, পথের দুইধারে ফলভারনত আম্র
কানন, কানন-শিরে প্রদোষের ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঐ মল্লিকদের শিবালয়,
ঐ দত্তদের পেয়ারা বাগান, এই যে ঘোষেদের পুকুর দেখা যাইতেছে। কামিনী ঘাটে বাসন
মাজিতেছে, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। পথের মাঝে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম, "বিজু-
দাদা কখন এলে" ? আঁক চিবাইতে চিবাইতে রসসিক্ত উদরে তাহার ছোট ভাইটী দিগম্বর
বেশে ছুটিয়া আসিল, গোলমাল শুনিয়া রাই পিসি বাহিরে আসিলেন, এইরূপে বাটী
পৌঁছিতে না পৌঁছিতে আমার আগমন-বার্ত্তা গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। যে যেখানে ছিল সক-
লেই আমাকে দেখিতে আসিল।

আশীর্ব্বাদ প্রণামকাণ্ড শেষ হইলে মা আমার চিবুক তুলিয়া অভিনিবেশ সহকারে মুখ
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন "বাছা আমার একেবারে কাহিল হয়ে
গেছে। সে রঙ নাই, সে মুখ নাই, সে চেহারাই নাই। আহা সেখানে যত্ন করবার কে
আছে, বাছার কত কষ্ট হইয়াছে।" গ্রামস্থ বৃদ্ধাগণ একবাক্যে মার কথা সমর্থন করিলেন।
কেহ বলিলেন "আহা বাছার যত্নের শরীর, অযত্ন সইবে কেন ? তা কষ্ট না হলে কি বিদ্যা-
লাভ হয় ? কথায় বলে "কষ্ট পেলে কৃষ্ণ মেলে।" কেহ বলিলেন "আহা বেঁচে থাক। সোনার
চাঁদ ঘরে এল, এখন বিয়ে দিয়ে বউ বেটা কোলে নিয়ে জন্ম সার্থক কর।" এইরূপে বহুক্ষণ
আলাপের পর সকলে স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন।

এতক্ষণ আমি যোগেশের সহিত আলাপ করিবার অবকাশও পাই নাই। এখন তাহার
হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে মাঠের দিকে চলিলাম কেননা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! যোগেশের মুখের
দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহাকে আর চেনা যায় না। শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, তজ্জন্য যোগেশকে
কিছু অধিক দীর্ঘ বোধ হইতেছে। বদনমণ্ডল একেবারে রক্তশূন্য, চক্ষু নির্জীব। দেখিলে
বোধহয় যেন যোগেশ সম্প্রতি কোন গুরুতর পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমি
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম; বলিলাম "যোগেশ! তুমি এমন হইয়াছ
কেন? তোমার কিছু অসুখ হইয়াছিল" ? যোগেশ হাসিয়া বলিল "কিছুই না।"

৮

১৭ই বৈশাখ। আজ আমার জীবনের একটী প্রধান স্মরণীয় দিন। আজ আমার সুলো-
চনার সহিত বিবাহ। এই বিবাহোৎসবে গ্রাম আজ আনন্দময় হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ
সকলেই আমোদে মাতিয়াছে। আর আজ একবার যোগেশের দিকে চাহিয়া দেখ! শরীর
ঘর্ম্মসিক্ত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, তবু তাহার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই। সে একাই আজ
বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা। যেদিকে যাও যোগেশকে দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই সে পর্য্যবেক্ষণ
করিতেছে।

দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাদেবী কৌতুক দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে দর্শন দিলেন। আমা-
দের বাটী আলোকাকীর্ণ হইল, চারিদিকে তুমুল বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। যোগেশ তখন
সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া আমার বেশভূষা করিতে আসিল। যোগেশের অনুরোধ আমি ছাড়া-
ইতে পারি না। মস্ত এক ঢিলাপোষাক পরিয়া, মাথায় তাজ দিয়া সং সাজিলাম। অলঙ্কারেরও
অভাব হইল না, তাহার উপর একরাশ ফুলের মালা গলায় দেওয়া হইল। এইরূপে যোগে-
শের মনোনীত বেশ হইলে নিষ্কৃতি পাইলাম। সেই বাদ্যকোলাহল, আলোকমালা ও সাজ-
সজ্জাসহ গ্রামপ্রদক্ষিণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাটী পৌঁছিলাম।

আমার বাল্যসহচরীটি বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া আমার পার্শ্বে আনীত হইল। অন্তঃ
পুরে ঘন ঘন মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আমার হাতের উপর একখানি কোমল ঘর্ম্মাক্ত
হস্ত স্থাপিত হইল, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে একবার চাহিয়া
দেখিলাম, আত্মীয়গণ সকলেই উপস্থিত, কিন্তু যোগেশ কোথায়, কোথাও তাহাকে দেখিতে
পাইলাম না।

৯

বিবাহোৎসব সাঙ্গ হইল। জনকজননীর চিরবাঞ্ছিত সাধ পূর্ণ হইল। এ কয়েক দিন
যোগেশের সহিত একবারও দেখা হয় নাই। বধূ-আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে যখন আত্মীয়গণ
সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যোগেশ তখন আসে নাই। আমারও যোগেশের কথা বড়
একটা মনে পড়ে নাই। আজ সহসা মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল, যোগেশের সন্ধানে বাহির
হইলাম। পথে সুলোচনার পুরাতন ভৃত্যের নিকট শুনিলাম, যোগেশ কাল বিদেশে যাইবে।
সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া সে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাদিগের বাটী গিয়াছে।
শুনিয়া আমিত অবাক্, আবার বাটীর দিকে ফিরিলাম, আসিয়া দেখি যোগেশ একা বাহি-
রের ঘরে বসিয়া আছে।

আমি আসিয়াই বলিলাম "যোগেশ তুমি নাকি কাল চলিয়া যাইতেছ" ?

যোগেশ নতমুখে বলিল "হাঁ ভাই, কালই যাইব স্থির করিয়াছি। এতদিন আমি চলিয়া
যাইতাম, কেবল তোমার সহিত দেখা হইবার আশায় ছিলাম।"

আমি বলিলাম "সেকি ভাই, তুমি [illegible] লিতেছ, বিদেশে যাইবে কেন? আমিত ভাব
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" [illegible]াম।

যোগেশ ক্ষীণস্বরে বলিল "বিজয়, সে কল্পন[illegible]ই কি রাধাকৃষ্ণ বাবুর অন্নে প্রতিপালিত হইব?
আপনার উন্নতি-চেষ্টা করিব না? এখ[illegible]ই কা[illegible]াকিয়া আর কি করিব? ভাই তুমি অনুমতি কর,
বিদেশে গিয়া কার্য্যের চেষ্টা করি।" [illegible]

আমি কাতর হইয়া বলিলাম "[illegible] বি[illegible] আর কিছুদিন থাক, আমি যখন কলিকাতা যাইব
আমার সহিত যাইও।"

যোগেশ মিনতি-স্বরে বলিল "[illegible] বিজয়, আর আমাকে বাধা দিও না। কাল যাইব
স্থির করিয়াছি, তুমি বারণ করিলে [illegible]তন সু[illegible]ত পারিব না।"

আমি আর কিছু বলিতে পারি[illegible]লাম না। বিষণ্ণ মনে নীরব হইয়া রহিলাম। তখন যোগেশ
বলিল "কাল প্রত্যূষে যাত্রা করি[illegible] হয়ত কাল আর দেখা হইবে না। চল দুইজনে একবার
নদীর ধারে যাই।" বিষণ্ণমনে [illegible]রে ধীরে যোগেশের সহিত চলিলাম। পথে কেহ কাহারও
সহিত কথা বলিতে পারিলাম না। নীরবে দুজনে নদীতীরে একটী অশ্বত্থ-তলে বসিলাম।

সেই একদিন আর এই এক দিন! এখানে কতদিন যোগেশের সহিত বসিয়াছি, দুজনে
দুজনের কথায় বিভোর হইয়া সন্ধ্যা কাটাইয়াছি, আজ শেষ সুখের দিন। হৃদয় উদ্বেলিত
উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

যোগেশের হাতখানি ধরিয়া বলিলাম "যোগেশ, ভাই আবার কবে তোমার সহিত দেখা
হইবে? তুমি কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ?"

যোগেশ বলিল "কোথায় যাইব এখনও স্থির নাই, ভগবান যেখানে লইয়া যান সেই
স্থানেই যাইব। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা, হয়ত আর কখনও দেখা হইবে না।" যোগে-
শের স্বর অতি মৃদু ও কম্পিত। স্বরে বুঝিলাম যোগেশ কাঁদিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। নদীর জলরাশিতে গভীর কৃষ্ণছায়া পড়িয়াছে,

যেন অন্ধকার নদী-দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। নদীর অতি অস্ফুট কলধ্বনি শুনা যাইতেছে। সহসা এক একটা উচ্ছৃঙ্খল বাতাস আসিয়া হা হা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পাখীদের কোলাহল নীরব হইয়া গিয়াছে। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি ও যোগেশ নীরবে নদীতীরে বসিয়া থাকিলাম।

একটু পরে আমি বলিলাম "তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলাম না। ভাই, আমাকে সর্ব্বদা সংবাদ দিও, আমি তোমার জন্য বড় উদ্বিগ্ন থাকিব"

যোগেশ কিছু উত্তর দিল না। কেবল আমার হাতের উপর তাহার এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল।

১০

আরো ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। এ ছয় বৎসরে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রামে একটী ক্ষুদ্র ডাক্তারখানা হইয়াছে, পূর্ব্বতন স্কুলটী পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন "মডেল স্কুল" নাম ধারণ করিয়াছে, মেঠো পথের পরিবর্ত্তে পাকা রাস্তা হইয়াছে, আর গ্রামবাসীগণেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঘোষেরা দুইভাই সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, চক্রবর্ত্তীদিগের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রে বিবাদ চলিতেছে, এবং অন্য সকল ব্যক্তি সেই দলাদলিতে পরম আরামে আছেন।

আমি একজন গ্রামবাসী, অতএব আমারও অবশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে সংসার-ভার আমার স্কন্ধে সহসা অবতরণ করিলে সেই সঙ্গে আমার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যও বর্দ্ধিত হইল। এখন আর সে আমোদপ্রিয়তা, সে চাপল্য নাই। এখন সর্ব্বদাই আমি কর্ম্মে ব্যস্ত, যেটুকু অবকাশ তা আমার একটী ক্ষুদ্র কন্যার মনস্তুষ্টিতেই ব্যয়িত হয়।

শোভার সহিত আমার মায়ের বড় বিবাদ, কেননা শোভা আমার উপর আর মার কোন দখল রাখিতে দেয় না। খাওয়ার সময় মার অনুকরণে আমার সম্মুখে বসিয়া "আর ভাত নিবি, এটা একটু খা, ওটা একটু খা, এই সকল বলিয়া তিনিই আমার জননী—একথা সপ্রমাণ করেন। মা দাঁড়াইয়া দেখেন আর হাসেন। এইরূপ আমার দিনগুলা পরমসুখে কাটিতেছে।

মানুষ এমন স্বার্থপর! যে যোগেশ কেবল আমার সুখেই সুখী ছিল, আজ তার কথা দিনের [illegible] কয়বার স্মরণ করি? সেকি আর এ পৃথিবীতে আছে? জীবিত থাকিলে কি আর এতদিন আমার সংবাদ না লইয়া থাকিতে পারিত? আজ ছয় বৎসর হইল যোগেশ বিদেশে গিয়াছে, এ ছয় বৎসর তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। অনেক অনুসন্ধানেও কেহ কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

যোগেশ যখন নিকটে ছিল, আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন তাহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু এখন প্রায়ই তাহার জন্য আক্ষেপ করেন "বাছা সেই যে কি ক্ষণে গেল আর এলোনা। আহা, মুখে কথাটী ছিল না, এমন গুণের ছেলে কি আর হয়।" গ্রামের সকলেই যোগেশের জন্য দুঃখিত, তাহার গুণে কেই বা বশ না ছিল! সকলেই বুঝিয়াছিল যে সে আর এ পৃথিবীতে নাই। কেবল সুলোচনা বলিত "আমার মনে হয় যোগেশ দাদা ভাল আছে। যদি একদিন হঠাৎ একখানা তাঁর চিঠি আসে! ঠাকুর করেন যেন শীঘ্র আসে!" তাহার বিশ্বাস দেখিয়া আমার চোখে জল আসিত।

সুলোচনার কথা যথার্থ হইল। একদিন প্রাতে একখানি পত্রের উপরে দেখি যোগেশের হস্তাক্ষর! আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলাম। পত্র আর খুলিতে পারি না, হাত কাঁপিতে লাগিল। এতদিন কেন যোগেশ সংবাদ দেয় নাই? না জানি পত্রের ভিতর কি আছে?

পত্র পড়িয়া আমার সে ক্ষণিক আনন্দ ফুরাইয়া গেল। যোগেশ লিখিয়াছে "ভাই বিজয়,

আমি বড় পীড়িত হইয়াছি, তোমাকে একবার দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, যদি তুমি একবার এস, তাহা হইলে বড়ই সুখী হই।" পড়িয়া বুঝিলাম যে পীড়া সামান্য নহে। আমি আর একদিনও বিলম্ব করিতে পারিলাম না। সেইদিনই বাটীর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যোগেশকে দেখিতে যাত্রা করিলাম।

১১

ছয় বৎসরের পর যোগেশের সহিত আমার দেখা হইল। দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। একটী নিম্নতলের অন্ধকার ঘরে যোগেশ রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। শরীর এত শীর্ণ যে শয্যায় কেহ আছে কি না সহসা বুঝা যায় না। কেবল কয়েকখানি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। চক্ষু এরূপ দীপ্তিহীন যে, দেখিলে জীবিতের চক্ষু বলিয়া বোধ হয় না। নিকটে একটু জল দিবে এরূপ কেহ নাই। আমি হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া বলিলাম "যোগেশ, ভাই একি? এইজন্যই কি আমাকে ডাকিয়াছিলে?" যোগেশ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল, ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা স্ফুরিত হইল। আর অমনিই চক্ষু-কোণে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল (স্বর শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।) "ভাই আমি তোমার আসিবার আশায় ছিলাম, বড় সাধ ছিল আর একবার তোমাকে দেখিব, ভগবান কৃপা করিয়া সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম "ভাই, আমি কি অপরাধ করেছিলাম? কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে? কেন আমাকে এতদিন পত্র লিখিলে না?" আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া যোগেশ তদ্রূপ ক্ষীণস্বরে বলিল "আমাকে ক্ষমা কর ভাই, দুঃখিত হয়ো না। যদি পরলোক থাকে আবার আমাদের দেখা হবে।" এই কয়টী কথা বলিয়াই যোগেশ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম, যোগেশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া আসিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব হইয়া থাকিল। একবার তাহার পাংশু ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বড় কারুণ্যের সহিত একটী অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হইল—"সুলোচনা"—শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিছুই আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। অন্তরে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সেই দেবদুর্লভ মুমূর্ষু মুখের দিকে চাহিয়া আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না। ললাটে উষ্ণজল স্পর্শে যোগেশ নয়ন মেলিল, আর একবার আমার দিকে চাহিল। সেই শেষ দৃষ্টি! এ জীবনে আর সে করুণ নয়নের দৃষ্টি দেখিতে পাইব না।

স্থানাভাবপ্রযুক্ত এবার "কাহাকে" ও অন্যান্য প্রবন্ধ গেল না।

মনসার ভাসান।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ন্যায় মনসার ভাসান একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কেতকা ক্ষেমানন্দ নামক কবিযুগল ইহার রচয়িতা। কথিত আছে এই গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গলাদেশে মনসাপূজার প্রচলন হইয়াছে। এই গ্রন্থে বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র প্রভৃতি সকল রসেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; সাবিত্রীর উপাখ্যান, শ্রীমন্তের মসান, প্রভৃতি বিষয় বঙ্গীয় নরনারীর নিকট যেরূপ প্রীতিকর, মনসার ভাসান অথবা বেহুলার কীর্ত্তিকাহিনীও পল্লীবাসী পুরুষ ও রমণী-বর্গের নিকট সেইরূপ আদরণীয়; প্রকৃত পক্ষে বেহুলা, আদর্শসতী পৌরাণিক সাবিত্রীর অভিনব সংস্করণ। সাবিত্রীর উপাখ্যান কথকদিগের কথকথায় মধুরভাবে কীর্ত্তিত হয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয়ও দেখা যাইতেছে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অংশ-বিশেষ গ্রহণ করিয়া যাত্রাওয়ালারা শ্রীমন্তের মসান গাহিয়া থাকে, শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন, সিংহলে শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, তত্রত্য মসানে কালীকর্ত্তৃক শ্রীমন্তের উদ্ধার সাধন,—এ সমস্ত ঘটনা চণ্ডী ছাড়িয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মনসার ভাসান রঙ্গমঞ্চে বা যাত্রায় অভিনীত হইতে দেখা যায় না; না যাউক তথাপি তাহা বঙ্গীয় নরনারীর নিকট অভিনব নহে। অনেকদিন পূর্ব্বে বঙ্গের, অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই চাষার দলের মধ্যে মনসার ভাসানের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, মধ্যে এই ভাব লোপ পাইয়াছিল, এখন আবার পল্লীগ্রামের চাষাভুষার মধ্যে মনসার পালা গাহিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। দিনের বেলা চাষারা কেহ মাঠে চাষ করে, কেহ গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়বাতাড় বাঁধে, মজুর খাটে, ঘর ছায়, রাখালেরা গরু চরায়, যাহার যাহা দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করে, রাত্রে দশপনের জন একত্র হইয়া এক একটা আড্ডায় জোটে, এবং মনসার ভাসান বা বেহুলার পালার তালিম দেয়। এইরূপে প্রতি গ্রামে পাঁচ সাতটা দল হইয়াছে। কিছু পোষাক জুটাইতে পারিলেই ইহারা গৃহস্থের বাড়ীতে গান গাহিবার বায়না লইয়া থাকে। পোষাক ও বায়না উভয়ই অতি সামান্য। খানকয়েক পুরাতন শাড়ী, রঙ্গীন কাপড়, গোটাকত পরচুলা, দাড়ী গোঁফ, কয়েকখান পিতলের গহনা, নাচিবার জন্য ঘুঙুর, এই হইলেই পোষাকের কাজ শেষ হইল,—বায়না পাঁচশিকা। পাঁচ শিকা পাইলেই ইহারা সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন বেলা আট নয়টা পর্য্যন্ত গান করে। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত, নৃত্য গীত, বাদ্য চলিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের মধ্যে প্রায় প্রতি রাত্রেই কোন না কোন পাড়ায় বেহুলার পালা গীত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ কোন উৎসব উপলক্ষে কোন পাড়াই প্রায় ফাঁক যায় না।

পনের বিশ জন লোক সমস্ত রাত্রি গান করে, কিন্তু পাঁচ শিকা বায়নাতে তাহারা কেন এতটা কষ্ট স্বীকার করে, তাহা ভাবিলে প্রথমে কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় কিন্তু যাঁহারা একবার বেহুলার গান শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন এই সকল চাষা গান উপলক্ষে বায়নার অতি-

রিক্তও অনেক পয়সা উপায় করে। একে এই পালাটি অতি দীর্ঘ, তাহার উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসরের মধ্যে নূতন নূতন সঙ্‌ খাড়া করিয়া ইহারা আরো অনেক সময় অনর্থক ব্যয় করে। পালার মধ্যে এত বেশী সঙ দিবার ইহাদের একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য পয়সা উপায় করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গোটাদুই সতরঞ্চ টাঙ্গাইয়া নীচে মাদুর বিছাইয়া ইহারা আসর জমকাইয়া বসে। একটা কি দুইটা ডাবা হুকা, কয়েক সিলিম তাম্রক এবং গোটা কত কেরোসিনের টিমি জ্বালাইয়া দিয়াই গৃহস্থ নিষ্কৃতি পাইলেন। মাদুরের উপর বসিয়া একজন লোক ঢোলক বাজাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরা চলিল, তিন চারটি ছোট ছোট চাষার ছেলে শাড়ী পরিয়া পায়ে নূপুর আঁটিয়া, গায়ে পিতলের বিবর্ণ গহনা দিয়া নর্ত্তকীবেশে আসরের মধ্যে নাচিতে আরম্ভ করিল, কখন গ্রীবা বক্র করিয়া, কোমরে হাত দিয়া, রুক্ষপরচুলা কিম্বা তাহার উপর বিন্যস্ত সোলার ফুল স্পর্শ করিয়া, কখন দুই হস্তে নানাভঙ্গীতে অঞ্চল ঘুরাইয়া, একবার ধীর, একবার চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, হয় ত বা একটা বহু পুরাতন, ভদ্রতা-বর্জ্জিত খেমটার গান ধরিতেছে—আর পাড়ার মেয়েরা তাড়াতাড়ি বাতায়ন-বিলম্বিত চিকের আড়ালে আসিয়া বসিয়া কৌতুকপূর্ণনেত্রে তাহাদিগের সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছে—তাহাদের সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে; দেখিতে দেখিতে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা যুবকেরা, এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত নিদ্রা ছাড়িয়া আসরের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া যায়; মেঠোসুরে তাহাদের সেই গ্রাম্যসঙ্গীত নিস্তব্ধ নৈশআকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।

নাচিতে নাচিতে ও গান করিতে করিতে এই সকল কৃত্রিম নর্ত্তকী প্রত্যেক দর্শকের সম্মুখে গিয়া হাত পাতে, অনেকেই তাহাদের হস্তে এক এক পয়সা ফেরি দেয়। রমণীগণও চিকের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ইহাদের হাতে পয়সা ফেলিয়া দেন; এইরূপে একবারে যতগুলি পয়সা সংগ্রহ হয়, তাহা আসরের মধ্যস্থলে দলপতির সম্মুখে রক্ষিত রেকাবীর উপর জমা করা হয়।

নৃত্য শেষ হইলে দুইটি সঙ্‌ আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল দলেই ঠিক এক রকম সঙ্‌ আসে না, কিন্তু সঙ আসিবেই। হয়ত কাপড়ের মোট ঘাড়ে করিয়া দুই ধোপা আসিয়া উপস্থিত হইল, হাতে লাঠি, একজন হয়ত তামাক খাইতে খাইতেই আসিয়া উপস্থিত, তাহাদের একগালে চূণ আর একগালে কালী। গালে চূণকালী লেপিবার কি অভিপ্রায় তাহা তাহারাই বলিতে পারে, বোধ করি তাহারা যে প্রকৃত ধোপা নয়, সঙ মাত্র, তাহাই বুঝাইবার জন্য এরূপ প্রক্রিয়া করা হয়। বিস্তর রহস্যালাপের পর একজন ধোপা তাহার সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যাইতেছে কেন?—সে উত্তর দিল তাহার শ্বশুর কন্যা (অর্থাৎ স্ত্রী) তাহাকে 'মাওড়া' (মাতৃহীন) করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। (এই স্থূল রসিকতায় পুরুষ ও নারীগণের মধ্যে ভারি হাস্যধ্বনি উঠিল) তাহার তত্ত্বাবধান করিবার আর কেহ নাই বলিয়াই এক গান ধরিল। তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী রজকবন্ধু তাহাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের

ব্যবস্থা দিল, এবং সে স্বয়ং সেই বন্ধুবরের জন্য ঘটকালী করিতে সম্মত হইল; ঘটকবিদায়ের জন্য পয়সা চাই, কিন্তু ঘরে পয়সা নাই, তখন বিরহপীড়িত, বিপত্নীক রজকবন্ধুর পরামর্শে শ্রোতাদিকের নিকট পয়সা ভিক্ষা চাইতে আরম্ভ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের করুণা উদ্রেকের অভিপ্রায়ে হাস্যরসের এক গান ধরিল, অনেকে তাহাকে দুই একটি করিয়া পয়সা ভিক্ষা দিল। পয়সা উপায়ের জন্য এইরূপে মধ্যে মধ্যে সঙ দিয়া এবং একটা গান পুনঃ পুনঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া আবৃত্তি করিয়া পালা এত দীর্ঘ করিয়া ফেলে যে, দুই রাত্রির কম তাহা শেষ হয় না। অনেক গৃহস্থ একরাত্রে পালা শেষ না হইলে বাড়ীতে উপর্য্যুপরি দুরাত্রি গান দিয়া পালা সাঙ্গ করান, কারণ পল্লীগৃহিণীদিগের বিশ্বাস, যদি পালার শেষ পর্য্যন্ত গাহানো না হয়, তবে মনসাদেবী রাগ করেন, এবং বাড়ীতে সাপের অত্যন্ত উৎপাত ঘটিয়া থাকে। শাখাপল্লব এবং সঙ বাদ দিলে মনসার ভাসানের উপাখ্যান ভাগ যেরূপ দাঁড়ায়, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"মহাদেবের মানসকন্যা পদ্মাবতী কৈলাসে পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, পার্ব্বতী পদ্মাবতীর রূপযৌবনদর্শনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতা হইলেন, কারণ সাধারণ রমণীবর্গের ন্যায় পুরুষ জাতীর প্রতি তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল না, বিশেষতঃ এই রূপ-যৌবন-সম্পন্না যুবতী যে তাঁহার সংসারবিরাগী স্বামীর মানসকন্যা, তদ্বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অতএব কৈলাসে তাঁহার স্থান হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া মহাদেব মর্ত্ত্যলোকে গিয়া বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পদ্মাবতী অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহেশ্বরকে বলিলেন "হে পিতঃ আমি কিরূপে মর্ত্ত্যবাসীর নিকট দেবপূজা লাভ করিব তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।" কন্যার বিনয়ে মহাদেব প্রীত হইয়া বলিলেন "বাঙ্গলামুলুকে চাম্পাই নগরের চাঁদ সদাগর একজন শ্রেষ্ঠ বণিক, সে তোমার পূজা করিলেই পৃথিবীতে তোমার পূজা প্রচলিত হইবে।"

পদ্মাবতী চাম্পাই নগরে উপস্থিত হইয়া চাঁদ সদাগরকে বলিল "সদাগর, তুমি ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর—তুমি আমার পূজা কর, তোমার ছয় ছেলে আছে, বারো ছেলে হইবে, তোমার ধন অক্ষয় হইবে।"—বোধকরি চাঁদ সদাগর পদ্মাবতীকে জানিত, তাই তাহার ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল ঃ—

"যে হস্তে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি,
সেই হস্তে পূজিব আমি তু' মনসা কাণী?"

মনসা কিন্তু নড়ে না, চাঁদ সদাগর যদি তাহার পূজা না করে, তাহা হইলে ত তাহার পৃথিবীতে আসাই মিথ্যা। সে সদাগরকে নানারকমে অনুরোধ, উপরোধ করিল, কিন্তু একালের মত সেকালেও ক্ষমতা বা বল প্রকাশ না করিলে মানুষের কাছে পূজা আদায় হইত না। সুতরাং মনসার স্তবস্তুতি সমস্ত বিফল হইয়া গেল, সদাগর গলা উচু করিয়া বলিল "তুই এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যা, নতুবা এই হিন্তালের লাঠি দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" মনসা দেবতাটি একেই ক্রূর প্রকৃতির, তাহার উপর সদাগর এই রকম অপ-

রিক্তও অনেক পয়সা উপায় করে। একে এই পালাটি অতি দীর্ঘ, তাহার উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসরের মধ্যে নূতন নূতন সঙ্‌খাড়া করিয়া ইহারা আরো অনেক সময় অনর্থক ব্যয় করে। পালার মধ্যে এত বেশী সঙ দিবার ইহাদের একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য পয়সা উপায় করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গোটাদুই সতরঞ্চ টাঙ্গাইয়া নীচে মাদুর বিছাইয়া ইহারা আসর জমকাইয়া বসে। একটা কি দুইটা ডাবা হুকা, কয়েক সিলিম তামাক এবং গোটা কত কেরোসিনের টিমি জ্বালাইয়া দিয়াই গৃহস্থ নিষ্কৃতি পাইলেন। মাদুরের উপর বসিয়া একজন লোক ঢোলক বাজাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরা চলিল, তিন চারটি ছোট ছোট চাষার ছেলে শাড়ী পরিয়া পায়ে নূপুর আঁটিয়া, গায়ে পিতলের বিবর্ণ গহনা দিয়া নর্ত্তকীবেশে আসরের মধ্যে নাচিতে আরম্ভ করিল, কখন গ্রীবা বক্র করিয়া, কোমরে হাত দিয়া, রুক্ষপরচুলা কিম্বা তাহার উপর বিন্যস্ত সোলার ফুল স্পর্শ করিয়া, কখন দুই হস্তে নানাভঙ্গীতে অঞ্চল ঘুরাইয়া, একবার ধীর, একবার চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, হয় ত বা একটা বহু পুরাতন, ভদ্রতা-বর্জ্জিত খেমটার গান ধরিতেছে—আর পাড়ার মেয়েরা তাড়াতাড়ি বাতায়ন-বিলম্বিত চিকের আড়ালে আসিয়া বসিয়া কৌতুকপূর্ণনেত্রে তাহাদিগের সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছে—তাহাদের সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে; দেখিতে দেখিতে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা যুবকেরা, এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত নিদ্রা ছাড়িয়া আসরের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া যায়; মেঠোসুরে তাহাদের সেই গ্রাম্যসঙ্গীত নিস্তব্ধ নৈশআকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।

নাচিতে নাচিতে ও গান করিতে করিতে এই সকল কৃত্রিম নর্ত্তকী প্রত্যেক দর্শকের, সম্মুখে গিয়া হাত পাতে, অনেকেই তাহাদের হস্তে এক এক পয়সা ফেরি দেয়। রমণীগণও চিকের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ইহাদের হাতে পয়সা ফেলিয়া দেন; এইরূপে একবারে যত গুলি পয়সা সংগ্রহ হয়, তাহা আসরের মধ্যস্থলে দলপতির সম্মুখে রক্ষিত রেকাবীর উপর জমা করা হয়।

নৃত্য শেষ হইলে দুইটি সঙ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল দলেই ঠিক এক রকম সঙ্ আসে না, কিন্তু সঙ আসিবেই। হয়ত কাপড়ের মোট ঘাড়ে করিয়া দুই ধোপা আসিয়া উপস্থিত হইল, হাতে লাঠি, একজন হয়ত তামাক খাইতে খাইতেই আসিয়া উপস্থিত, তাহাদের একগালে চূণ আর একগালে কালী। গালে চূণকালী লেপিবার কি অভিপ্রায় তাহা তাহারাই বলিতে পারে, বোধ করি তাহারা যে প্রকৃত ধোপা নয়, সঙ মাত্র, তাহাই বুঝাইবার জন্য এরূপ প্রক্রিয়া করা হয়। বিস্তর রহস্যালাপের পর একজন ধোপা তাহার সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যাইতেছে কেন?—সে উত্তর দিল তাহার শ্বশুর কন্যা (অর্থাৎ স্ত্রী) তাহাকে 'মাওড়া' (মাতৃহীন) করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। (এই স্থূল রসিকতায় পুরুষ ও নারীগণের মধ্যে ভারি হাস্যধ্বনি উঠিল) তাহার তত্ত্বাবধান করিবার আর কেহ নাই বলিয়াই এক গান ধরিল। তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী রজকবন্ধু তাহাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের

ব্যবস্থা দিল, এবং সে স্বয়ং সেই বন্ধুবরের জন্য ঘটকালী করিতে সম্মত হইল; ঘটকবিদায়ের জন্য পয়সা চাই, কিন্তু ঘরে পয়সা নাই, তখন বিরহপীড়িত, বিপত্নীক রজকবন্ধুর পরামর্শে শ্রোতাদিকের নিকট পয়সা ভিক্ষা চাইতে আরম্ভ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের করুণা উদ্রেকের অভিপ্রায়ে হাস্যরসের এক গান ধরিল, অনেকে তাহাকে দুই একটি করিয়া পয়সা ভিক্ষা দিল। পয়সা উপায়ের জন্য এইরূপে মধ্যে মধ্যে সঙ দিয়া এবং একটা গান পুনঃ পুনঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া আবৃত্তি করিয়া পালা এত দীর্ঘ করিয়া ফেলে যে, দুই রাত্রির কম তাহা শেষ হয় না। অনেক গৃহস্থ একরাত্রে পালা শেষ না হইলে বাড়ীতে উপর্য্যুপরি দুরাত্রি গান দিয়া পালা সাঙ্গ করান, কারণ পল্লীগৃহিণীদিগের বিশ্বাস, যদি পালার শেষ পর্য্যন্ত গাহানো না হয়, তবে মনসাদেবী রাগ করেন, এবং বাড়ীতে সাপের অত্যন্ত উৎপাত ঘটিয়া থাকে। শাখাপল্লব এবং সঙ বাদ দিলে মনসার ভাসানের উপাখ্যান ভাগ যেরূপ দাঁড়ায়, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"মহাদেবের মানসকন্যা পদ্মাবতী কৈলাসে পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, পার্ব্বতী পদ্মাবতীর রূপযৌবনদর্শনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতা হইলেন, কারণ সাধারণ রমণীবর্গের ন্যায় পুরুষ জাতীর প্রতি তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল না, বিশেষতঃ এই রূপ-যৌবন-সম্পন্না যুবতী যে তাঁহার সংসারবিরাগী স্বামীর মানসকন্যা, তদ্বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অতএব কৈলাসে তাঁহার স্থান হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া মহাদেব মর্ত্ত্যলোকে গিয়া বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পদ্মাবতী অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহেশ্বরকে বলিলেন "হে পিতঃ আমি কিরূপে মর্ত্ত্যবাসীর নিকট দেবপূজা লাভ করিব তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।" কন্যার বিনয়ে মহাদেব প্রীত হইয়া বলিলেন "বাঙ্গলামুলুকে চাম্পাই নগরের চাঁদ সদাগর একজন শ্রেষ্ঠ বণিক, সে তোমার পূজা করিলেই পৃথিবীতে তোমার পূজা প্রচলিত হইবে।"

পদ্মাবতী চাম্পাই নগরে উপস্থিত হইয়া চাঁদ সদাগরকে বলিল "সদাগর, তুমি ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর—তুমি আমার পূজা কর, তোমার ছয় ছেলে আছে, বারো ছেলে হইবে, তোমার ধন অক্ষয় হইবে।"—বোধকরি চাঁদ সদাগর পদ্মাবতীকে জানিত, তাই তাহার ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল:—

"যে হস্তে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি,
সেই হস্তে পূজিব আমি তু' মনসা কাণী?"

মনসা কিন্তু নড়ে না, চাঁদ সদাগর যদি তাহার পূজা না করে, তাহা হইলে ত তাহার পৃথিবীতে আসাই মিথ্যা। সে সদাগরকে নানারকমে অনুরোধ, উপরোধ করিল, কিন্তু একালের মত সেকালেও ক্ষমতা বা বল প্রকাশ না করিলে মানুষের কাছে পূজা আদায় হইত না। সুতরাং মনসার স্তবস্তুতি সমস্ত বিফল হইয়া গেল, সদাগর গলা উঁচু করিয়া বলিল "তুই এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যা, নতুবা এই হিন্তালের লাঠি দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" মনসা দেবতাটি একেই ক্রূর প্রকৃতির, তাহার উপর সদাগর এই রকম অপ-

মান করিল ; অত্যন্ত গরম হইয়া মনসা বলিল "ধর্ম্ম তুই সাক্ষী থাক, আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইব"। সদাগর বলিল "হিন্তাল তুই সাক্ষী থাক, আমি কখনই ও কাণীর পূজা করিব না।"

মনসা চলিয়া গেল।

সদাগরের ছয় পুত্র বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। বাণিজ্য শেষ করিয়া বিস্তর ধন-দৌলতে নৌকা বোঝাই করিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় মনসার মায়ায় 'কুমরা' নদীর মধ্যে ভয়ানক তুফান উঠিল। সদাগর-পুত্রদের ছয়খানি নৌকাই ডুবিয়া গেল, সদাগরের সকল পুত্রই নৌকার মধ্যে ছিল, তাহারাও সেই সঙ্গে ডুবিয়া মরিল।

ছয় পুত্রের মৃত্যুতে এবং ধনসম্পত্তি নাশে শোকাতুর সদাগর ইষ্টদেব মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিল। অতি উৎকট তপস্যা ; মহাদেবের আসন টলিল, তিনি সশরীরে চাঁদ সদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া তুষ্টভাবে বলিলেন "তুমি তোমার পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না, আমার বরে তুমি একটি সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, বংশের গৌরবস্বরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিবে।"

মহাদেবের অব্যর্থ বরে নিয়মিত সময়ে সদাগরের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। সদাগর তাহার নাম রাখিল "লখিন্দর।"

ক্রমে লখিন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তখন চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সেকালেও কন্যার বিবাহের জন্য পিতামাতার পরম দুশ্চিন্তা ছিল ; কিন্তু সদাগর এবং সদাগরপত্নী কোন খানেই পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হইল না, বলিল, "আমার ঘরে ছয় ছয়টি বিধবা পুত্রবধূ আছে তাহাদের মুখ দেখিলে আর ঘরে বধূ আনিতে ইচ্ছা হয় না।"

অবশেষে স্থির হইল যদি কখনও সতী কন্যা পাওয়া যায়, তবে তাহারই সহিত লখিন্দরের বিবাহ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কিরূপে সতীর পরীক্ষা হইবে ?—স্থির হইল যে ছয়টি লোহার কলাই সিদ্ধ করিতে পারিবে, সেই কন্যাই সতী বলিয়া গণ্য হইবে।

নানাস্থলে ঘটক পাঠান হইল, কিন্তু এই প্রকার দুর্লভ কন্যারত্ন লাভের কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না। চাঁদ সদাগরের এই "ধনুকভাঙ্গা পণ" দেখিয়া ঘটকেরা তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, নানাস্থানে ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল ; তখন সদাগর তাহার পত্নীকে বলিল, "কাঞ্চন নগরে আমার এক বেয়াই আছে, তাহার কাছে গিয়া একবার ক'নের সন্ধান করিয়া আসি।"

চাঁদ সদাগর কাঞ্চন নগরে উপস্থিত হইলে, তাহার বৈবাহিক সবাহন সদাগর বিশেষ সমাদরে পা ধুইতে বলিল। চাঁদ ঘোড়ার পীঠে হইতেই বৈবাহিকের হস্তে পাঁচটা লোহার কলাই দিয়া বলিল "যদি আমাকে এই পাঁচটি লোহার কলাই সিদ্ধ করিয়া আনিয়া দিতে পার, তবেই তোমার ঘরে পা ধুইব।"

সবাহন সদাগর কলাই কয়টি হাতে লইয়া "বলিলেন এ আর আশ্চর্য্য কি, আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিদ্ধ করাইয়া আনিতেছি।"

সবাহন কলাই লইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্ত্রী বলিল "আমি কলাই সিদ্ধ করিয়া দিব, কিন্তু ইহা সিদ্ধ করিতে লাগিবে :—

"বার গাড়ী কাঠ যে গো আর বার ঘড়া জল।"

কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা সবাহন সদাগরের পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কাঠ ও জল সংগ্রহ হইলে সবাহনের স্ত্রী কলাই সিদ্ধ করিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার অবিবাহিতা কন্যা বেহুলা সুন্দরী আসিয়া বলিল "মা তুমি কলাই সিদ্ধ করিয়ো না, যে সতীর কন্যা সতী হইবে কেবল সেই কলাই সিদ্ধ করিতে পারিবে—আমাকে দাও আমি সিদ্ধ করিয়া দিতেছি।"

শুদ্ধ শরীরে কলাই সিদ্ধ করিতে হইবে, বেহুলা জলে নামিয়া ডুব দিল ; ইতি মধ্যে মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে নদীতে নামিল, এবং বেহুলার হস্ততাড়নে বিক্ষিপ্ত জল তাহার গাত্রে পতিত হইল। মনসা অভিশাপ দিল 'তুই যে কাজ করিবার জন্য স্নান করিতে আসিয়াছিস, তাহা সিদ্ধ হইবে, কলাই সিদ্ধ করিতে পারিবি বটে কিন্তু বাসর ঘরে বিধবা হইবি। বাসর ঘরে সর্পাঘাতে তোর স্বামীর মৃত্যু হইবে।"

যাহা হউক স্নান করিয়া আসিলে বেহুলা কলাই সিদ্ধ করিয়া দিলে, চাঁদ সদাগরকে তাহা প্রদান করা হইল ; সবাহন বলিল "বেয়াই, যাহা চাহিলে তাহা পাইলে ত, এখন পা ধোও।"—চাঁদ সদাগর ঘোড়া হইতে না নামিয়াই বলিল—"বেয়াই আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, যদি তাহা পূর্ণ কর, তবে তোমার বাড়ীতে পা ধুইব।"

সবাহন জিজ্ঞাসা করিল "কি প্রতিজ্ঞা ?"

চাঁদ সদাগর উত্তর করিল "তোমার যে কন্যা লোহার কলাই সিদ্ধ করিয়াছে, আমার পুত্র লখিন্দরের সহিত যদি তাহার বিবাহ দেও, তাহা হইলে তোমার বাড়ীতে পা ধুইব।"

সেকালেও কোন গুরুতর কাজ স্ত্রীলোকের পরামর্শ ভিন্ন সম্পন্ন হইত না, সবাহন বলিল "আমি একবার তোমার বেয়ানকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

বেয়ান বলিল "বেয়ায়ের ঘরে আমার এক মেয়ে বিধবা হইয়া আছে, তাহারই শোকে আমি ভাজাভাজা হইতেছি, আবার সেই ঘরে বিয়ে, কখন না।"

সবাহন বলিল "তা বটে, কিন্তু বেয়াই ছাড়ে না যে, এখন পর্য্যন্ত পা ধোয় নি।"

বিবাহের সম্বন্ধটা ভণ্ডুল করিবার জন্য স্বামী স্ত্রীতে অনেক রকমের উপায় খুঁজিতে লাগিল। সুপাত্রে মেয়ের বিবাহ দিতে একালে এ প্রকার কাজ নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু সেকালের নিয়মে সেকালে কাজ হইত, তাই সবাহন সদাগর একালের বরকর্ত্তার ন্যায় সেকালের বরকর্ত্তা চাঁদ সদাগরকে বলিল "বেয়াই, মেয়ের বিবাহ অবশ্য দিতে হইবে, কিন্তু আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, যদি আমার মেয়ের সমান ওজনের বিশুদ্ধ সোণা আমাকে দিতে পার তবেই এ বিবাহে সম্মত হইতে পারি।"

সেকালেই হোক আর এ কালেই হোক এতটা পারিয়া উঠা বড় সহজ নহে, তাহাতে ছয় পুত্রের মৃত্যুতে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থনাশ হওয়াতে চাঁদ সদাগরের আর্থিক অবস্থা

এদানী বড় মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল ; এতখানি স্বর্ণদানে সম্মত হইতে পারিল না। বিফল-মনোরথ হইয়া চাম্পাইনগরে ফিরিয়া যাইতেছে, পথে দাঁড়াইয়া খেলা করিতে করিতে বেহুলা তাহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তাউই মশায়, পা না ধুয়েই যে ফিরে যাচ্ছেন ?"—চাঁদ সদাগর উত্তর করিল "মা, তোমার সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ দিতে চাই, কিন্তু তা হইল না, তোমার বাপ তোমার সমান ওজনের সোণা চাহেন, আমার কি আর অত সোণা দিবার শক্তি আছে ?

বেহুলা বলিল "তাউই মশায়, আপনি ফিরিয়া আসুন, বাবার কথায় সম্মত হইলে আপ-নার কোন অসুবিধা হইবে না, আমি আপনার গলার ঐ হারের চেয়ে ভারি হইব না।"

চাঁদ সদাগর আশ্বস্ত হইয়া বৈবাহিক-গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বলিল "আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, আমি এই হার দিলাম, তোমার কন্যাকে ওজন কর, যদি ইহা অপেক্ষা বেশী সোণা লাগে পরে দিব।"

বেহুলাকে ওজন করা হইল, কিন্তু তাহার ভার হারের ভার অপেক্ষা কম হইল। বেহুলার মা দুঃখ করিয়া বলিলেন :—

হাতের পাতের খাইয়ে বেউলো মানুষ ক'ল্লাম তোকে
এক গাছও হারের ভার হলি নে তোর মাথা খেয়ে।"

মায়ের অর্থলোভটা বেহুলার চক্ষে বোধ করি বড় ভাল লাগে নাই, সে মায়ের কথার উত্তরে বলিল :—

"আগে যদি জান্‌তাম মাগো টাকা নিবা তুমি
হারের অধিক ভার হইয়া থাকিতাম আমি।"

একটা আপত্তি কাটিয়া গেল, কিন্তু সবাহন সদাগর আবার নূতন নূতন আপত্তি তুলিতে লাগিল, শেষে তাহার একটাও টিকিল না। লখিন্দরের সহিত বেহুলার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

চাঁদ সদাগরের উপর মনসার কোপ এখন পর্য্যন্ত প্রশমিত হয় নাই, যেমন করিয়াই হোক চাঁদ সদাগরের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবে ইহাই মনসার চেষ্টা। মনসা ষোড়শী রূপসীর বেশে লখিন্দরের কাছে উপস্থিত হইয়া বেহুলার অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, বলিল বেহুলা 'চোক পুট পুটে, পেট ডাগরা কালো কুৎসিৎ মেয়ে' তাহাকে বিবাহ করা লখিন্দরের ন্যায় সুপুরুষের কখনই কর্ত্তব্য নহে ; তাহার পর নিজের সহিত বিবাহ করিবার জন্য লখিন্দরকে অনুরোধ করিল, বলিল,

"আমায় বিয়ে কররে নখা আমায় বিয়ে কর,
আমি যেমন যুব কন্যা তেমনি তুমি বর।"

লখিন্দর কিন্তু পিতার অনভিপ্রায়ে সেই অজ্ঞাত কুলশীলা যুবতীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে, বেহুলাকে না দেখিয়া কখন বিবাহ করা

হইবে না। কিন্তু বেহুলা বড় ঘরের মেয়ে, তাহাকে কিরূপে দেখা যায় ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চাঁদ সদাগর সবাহন সদাগরের বাসস্থান কাঞ্চননগরে মহাসমারোহে এক হাট বসা-ইল এবং লখিন্দরকে সেই হাটের মালিক করিয়া দিল। লখিন্দর যথারীতি ব্যবসায় করিতে লাগিল, কিন্তু হায়, তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, অনেকদিন কাটিয়া গেল, বেহুলার দর্শন মিলিল না।

কাঞ্চনী হেড়েনীর বাড়ী কাঞ্চননগরে। সে রসিকা, চঞ্চলা, সুন্দরী ; কাঞ্চনী দুবেলা লখিন্দরের হাট পরিস্কার করিত; এবং লখিন্দরের যৌবন, ঐশ্বর্য্য এবং কৌমার্য্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাট ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে লখিন্দরের প্রতি দুই একটা রঙ্গোক্তি বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করিত না। অনেক বিবেচনার পর লখিন্দর কাঞ্চনীকেই উপযুক্ত দূতী বলিয়া মনে করিল, কিন্তু বেহুলাকে একবার হাটে আনাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কাঞ্চনী এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, বলিল "বেহুলা বড়ঘরাণা, তাহাকে হাটে আনিলে আমার মাথা থাকিবে না।" লখিন্দর তাহাকে বিশেষ সাহস দিল এবং বেহু-লাকে প্রলোভিত করিবার জন্য তাহার হস্তে একটি অতি সুন্দর স্বর্ণ পুত্তলিকা অর্পণ করিল।

যথাকালে কাঞ্চনী সেই সুবর্ণ পুত্তলিকা লইয়া বেহুলার নিকট উপস্থিত হইল। বেহুলা সেই পুত্তলিকাটি লইবার জন্য আবদার করিল ; কাঞ্চনী বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে, সে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে তাহার সঙ্গে হাটে গেলে এরকম পুতুল অনেক পাওয়া যায়। বেহুলা হাটে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া মায়ের অনুমতি আনিতে গেল, মা বলিলেন :—

"ও হাটে যেয়োনা বেউলো, বেউলো আমার মা,
চাঁদের বেটা দুর্ল্লভ নখা দেখ্‌লে ছাড়বে না।"

বেহুলার মায়ের এই ভয়ের কারণ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পল্লীবাসী গৃহ-স্থের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি হইলে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বর-ক'নের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অকল্যাণসূচক, হয়ত এই কার-ণেই বেহুলার মা, বেহুলাকে হাটে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেহুলা সে নিষেধ মানিল না, সে কাঞ্চনীর সঙ্গে লুকাইয়া হাটে গেল ; লখিন্দর দেখিল বেহুলা দেখিতে রাজ-কন্যার মত দিব্য রূপসী মেয়ে, তাহার আর বিবাহে কোন আপত্তি থাকিল না।

বিবাহ হইয়া গেল। পদ্মাবতী বেহুলাকে যে অভিশাপ দিয়াছিল, সে কথা সকলের মনে ছিল ; বেহুলার পিতামাতা লখিন্দরকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা সাতালি পর্ব্বতের উপর এক লৌহময় "নির্ম্মল বাসর ঘর" নির্ম্মাণ করাইলেন। কিন্তু মনসার প্ররোচনায় বিশ্বকর্ম্মা সেই বাসর গৃহে একটি সূচবৎ ছিদ্র রাখিয়া দিলেন।

নববিবাহিত দম্পতি সেই গৃহে শয়ন করিল। অনেকরাত্রে উভয়ে নিদ্রাগত হইলে কাল-নাগিনী অতি সূক্ষ্ম দেহধারণ করিয়া সেই ছিদ্রপথে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে রত্নদীপ জ্বলিতে-ছিল, সুসজ্জিত পালঙ্কে, প্রস্ফুটিত কুসুমদাম বিস্তৃত শয্যায় নবদম্পতি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

কালনাগিনী লখিন্দরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল, তাহাকে দংশন করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; পদ্মাবতীকে ডাকিয়া বলিল "এমন রূপবান পুরুষ, আমি বিনা-দোষে ইহাকে কিরূপে দংশন করিব।" পদ্মাবতী বলিল "যদি সে তোমাকে আঘাত করে তাহা হইলে তাহাকে দংশন করিও।" কালনাগিনী ইহাতে সম্মত হইল।

পদ্মাবতী মায়াজাল বিস্তার করিয়া মশক সৃষ্টি করিল। লখিন্দরের হাতের উপর গিয়া একটি মশা বসিল ; লখিন্দর ঘুমের ঘোরে হাত ঝাড়িল, কালনাগিনীর গায়ের উপর গিয়া হাত পড়িল, নাগিনী ধর্ম্মকে ডাকিয়া বলিল "ধর্ম্ম তুই সাক্ষী, আমাকে মারিল।" দ্বিতীয় বার লখিন্দরের হাত নাগিনীর গাত্রস্পর্শ হইবামাত্র কালনাগিনী তাহাকে দংশন করিয়া চলিয়া গেল।

দংশনজ্বালায় অস্থির হইয়া লখিন্দর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তীব্রবিষে তাহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হইয়া গেল, সর্পাহত যুবক বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল, বেহুলা আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সময়ে কাঞ্চননগরে গোঁড়া বিনোদ রোজার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহার ঝাড়া, ফোঁকা, জলপড়া অব্যর্থ। বিনোদ রোজার কাছে লোক ছুটিল। দূর হইতে বেহুলার ক্রন্দনধ্বনি বিনোদ রোজার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে বলিল ঃ—

"আর কেঁদনা আর কেঁদনা বেহুলা সুন্দরী
আমি গোঁড়া বিনোদ রোজা আস্‌চি তোমার বাড়ী।"

পদ্মাবতী দেখিল বড় বিপদ, বিনোদ রোজা ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেই লখিন্দর বাঁচিয়া উঠিবে। তাহা হইলে তাহার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। পদ্মাবতী পথিমধ্যে বিনোদ রোজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অর্থদ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। বিনোদ রোজা আসিয়া উল্টা মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িতে লাগিল, সুতরাং কোন ফল হইল না, রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই লখিন্দরের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল।

সেকালে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহের সৎকার করা হইত না, পল্লীগ্রামের অনেক স্থলে এখনো হয় না ; লখিন্দরের মৃতদেহ মাড়ে করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইল। বেহুলা বলিল "আমার স্বামী যখন পৃথিবী ছাড়িয়া গেলেন, তখন আমি কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব, স্বামীর দেহরক্ষা করিয়া আমিও মাড়ের উপর ভাসিয়া যাইব।" পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া বেহুলা মাড়ের উপর উঠিল, উৎসবপূর্ণ বিবাহভবন নিরানন্দময় শ্মশানে পরিণত হইল।

মাড় ভাসিতে ভাসিতে চলিল, কত দিন রাত্রি কাটিয়া গেল, কত নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাড় তমোলুকের ঘাটে আসিয়া লাগিল।

রাত্রে শিবদুর্গা দূর আকাশপথে স্বেচ্ছাবিহারে যাইতেছিলেন, ভগবতী দেখিলেন নদীকূলে মাড়ের উপর বসিয়া একজন রমণী পতিশোকে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। শিবের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু রমণীর করুণ রোদনে ভগবতীর হৃদয় বিগলিত হইল ; কাজেই পার্ব্বতী সহ মহাদেবকে সেই নদীতীরে আসিতে হইল। বেহুলার পতিভক্তি দেখিয়া

তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইলেন, বলিলেন, মনসার পূজা করিলেই অমঙ্গল কাটিয়া যাইবে, লখিন্দর নবজীবন লাভ করিবে। বেহুলা ভক্তিভরে মনসার পূজা করিল। মনসা প্রীত হইয়া লখিন্দরকে পুনর্জ্জীবন দান করিলেন। চাঁদ সদাগরের আবার সোণার সংসার হইল। মনসার ক্ষমতা দেখিয়া চাঁদ সদাগর আর "মনসাকাণী'র পূজার উপেক্ষা করিতে পারিল না।"—দেখাদেখি সকলেই মনসা পূজা ধরিল ; সকলে বুঝিল মনসা বড় জাগ্রত দেবতা।

ইহাই বেহুলার পালা বা মনসার ভাসানের উপাখ্যান ভাগ। বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই উপাখ্যানের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। গায়কের মুখে মুখে চলিয়া আসাতে বোধহয় এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। চাষার দল এই পালার অভিনয় করিবার সময় ইহাতে এত সঙ্‌, ভাঁড়, আনিয়া ফেলে যে, পালা অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পালা গাহিবার বায়না পাঁচশিকা হইলেও ইহারা যে এক আসরে চারি পাঁচ টাকা উপায় করে, তাহার কারণ এই যে, একটা না একটা উপলক্ষ করিয়া ইহারা শ্রোতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া পয়সা ভিক্ষা করে। লখিন্দরের জন্ম হইল, তাহার নাড়ী কাটিতে হইবে ভিক্ষা দেও, চাঁদ সদাগর অশ্বারোহণে কাঞ্চননগরে বৈবাহিক সম্ভাষণে আসিয়াছেন, ঘোড়ার সহিসকে বকসিস্ দেও, লখিন্দরের বিবাহ হইবে ঢুলি বাজ্যকর আসিয়াছে, তাহাদিগকে শিরোপা দিতে হইবে ইত্যাদি। পল্লীরমণীদিগের বিশ্বাস দুই এক পয়সা করিয়া না দিলে গান জমিতে পায় না, তাঁহারা যথাশক্তি পয়সা, পুরাতন বস্ত্র, চাউল প্রভৃতি দান করেন।

বেহুলার পালা পল্লীগ্রামের পুরুষ ও রমণীগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী। সংসারের সকল কাজ শেষ হইলে, নিদ্রা এবং বিরাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রাত্রির পর রাত্রি বেহুলার পালা শুনিয়া ক্লান্তিবোধ করেন না। পল্লীগ্রামে রমণীগণের নৃত্যগীতাস্বাদনের কোন সুবিধা নাই, যথেষ্ট অর্থব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলে যাত্রা দিয়াও উঠিতে পারে না, বেহুলার গানে তাহাদের সেই অভাব মোচন হয় ; বিশেষতঃ ইহাতে এমন একটি করুণ রস আছে, একটি অনায়াস-লব্ধ সহজ সরলভাব আছে, যাহা পল্লীগ্রামের গৃহলক্ষ্মীগণের নিত্য অভ্যস্ত। তাঁহারা ইহাতে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপ বাহুল্যবর্জ্জিত গার্হস্থজীবনের ছবি প্রতিফলিত দেখিতে পান ; লখিন্দরের মত বালক, বেহুলার মত বালিকা, মনসার মত দেবতা তাঁহাদের অপরিচিত নহে। তাঁহারা এই গানের ভিতর দিয়া তাঁহাদেরই ন্যায় পল্লীসমাজের একটি বহুদূরবর্ত্তী মধুর চিত্র সন্দর্শন করেন, এবং ইহা তাঁহাদের নিকট পরমসুন্দর, অনিন্দনীয় বলিয়া বোধহয়।

নারী মঙ্গল।

১

জানি আমি নারী তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; স্নকোমল কান্ত'পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !)
হেরি সখি মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা ;
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা !
কিন্তু যবে হেরি সখি ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থের মধুরতর চিকন রঙ্গিমা ;
ভাবের সে সমাবেশ ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা !)
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর, সরে না গো বাণী !
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি ?

২

স্নকেশিনি, স্নহাসিনি, চম্পকবরণি,
হে স্নন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী
পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী)
যাও অর্দ্ধ যামিনীতে—আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে ; বধূ বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে ! নূপুর গুর্জ্জরী
নাচে মরি ; নাচে মরি কঙ্কণ কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী !
কি উৎসব ! হাসে দীপ; হাসে নেত্র-তারা ;
হাসে অলকের পুষ্প ; ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলি ; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে !
রূপে ভোর পতি তব, তোমার স্নষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা !

৩

নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের থালা, চন্দনের বাটী,—
অর্চ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী !
বধূর স্নমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আমরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি !—ত্যাজি শাটী,
পরি এক আটপৌরে শাড়ি, হে স্নন্দরি,
কোথা যাও ? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে !
পশিয়া রন্ধন-গৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
(স্নস্বাদু !) রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে !
শব্দ ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা,
তুমি সখি অর্থময়ী ভাবময়ী গীতা !*

৪

তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে রচে "মাধবিকা"—
চিকণ গাঁথনি ! চারু কল্পনার ডোর !
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা।
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে মেঘে, বর্হ তুলি নাচিছে শিখিনী !
হৃদি-কদম্বের-শাখে দোলাইয়া "দোলা"
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণি !
তাই সখি বঙ্গ-কবি "চিত্রা"র উদ্যানে
বসিয়া "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি ;
নাহি কাল, দেশ !") চাহি, তব মুখ-পানে,
"অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি !"
"অন্তর মাঝারে তার একা একাকিনী"
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী !

৫

তুমি মোর স্পর্শমণি। তোমার দুহাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণদুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে !
গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে !
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে !
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে !
আমারো ছিল গো সখি মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ !

৬

সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে

* গীতা = সঙ্গীত। দোহাই পাঠকের ; আমার এ শাদাসিধে কবিতায় কোন প্রকার আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ নাই।

শোভিতে মন্দার-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষমোহিনী ! প্রবাল-শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল !—চাহি তব পানে,
হর্ষ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-নয়ানে
লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় !
ছিলে কি গো কল্পলতা ইন্দ্রের উদ্যানে
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু ! চাহি তব পানে
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নর্ত্তন শিখিত !
আকুলি সে দেব-ভূমি, স্বর্গের শেফালি !
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ ফুটিতে কি আলি ?

৭

তার পরে, বুঝি কোন দুর্ব্বাসার শাপে,
নারী হয়ে জনমিলে অবনি-মাঝার ?
তবু পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে !
তবু সখি, তোমার ও বদন-মণ্ডলে
উছলে, স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ !
কি বলিব ? তোমার ও বসন-অঞ্চলে
বাঁধিয়া এনেছ, সখি, স্বর্গের বিভব !
কি বলিব ? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে "হের দেখ দরিদ্রের ঠাট !"
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,
তুমি মোরে রত্নময়ি ! করেছ সম্রাট !*
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার !
কে পায় মরতে বল হেন উপহার ?

৮

তাই সখি তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে "একি !
"নির্জ্জনে কেমনে থাকে !"—হে কবি-প্রেয়সি
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি ?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদানপ্রদান !
তুমি একা কথা কও ? দু চক্ষু চঞ্চল
কথা কয়, কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল,
কথা কয় স্মিতমুখে কেশের কুন্তল,
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল !
কি উৎসব ! রূপ-রাজ্যে একি স্নমঙ্গল ?
একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল !

৯

প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা !
"নির্জ্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে"
এই ভাবি হয় তারা বিস্ময়েতে সারা !
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র নগর সে যে, সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন দৃশ্য নয়ন রঞ্জন !
বসি তব রূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ
হেরি সখি ; সীমাশূন্য সে নীল-বিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ,
দেব-বৃন্দ, দেব-বধূ, আলোক-বিমানে !
কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ?
জীব রাজ্য তরু রাজ্য নর নারীময় !

১০

বিস্ময়-বিস্ফার নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে
"বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহঃ,
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?
তার এত মাতৃভক্তি ! বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি ! দেখেছ কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত ?"—ওরূপ-অনলে
(হোমানলে) পুড়ায়েছি "আমিত্বের' দেহ !
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে !
স্বজনি লো তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী ;
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য কুম্ভ-মেলা-দিনে, সরমে ভরমে
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মাবধূ !—গড়েছে মন্দির
ভিতরে, বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির !

১১

লোকে বলে "সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার !
দু সন্ধ্যা জোটেনা অন্ন, দশা যার এই,
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার !"
"সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ,
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে !
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন,
ললাট মণ্ডিয়া দেয় স্নমাল্য-রতনে ;"
অয়ি যাদুকরি ! এরা জানে না তোমার
যাদুমন্ত্র—কবিতায় কল্পনায় দীক্ষা,
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা !
অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য !—দীন আমি পথের ভিখারী,
বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি !

১২

লোকে বলে "এর হায় এমনি স্নরীতি,

* সম্রাট = সম্রাটের ন্যায় অতুল ধনশালী।

পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা!) দুইটি বৎসর!
(ধৈর্য্যের আশঙ্কা-স্থল, বন্ধুতার ভীতি!)
তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ অপ্রীতি
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে।
অদ্ভুত আলাপী!—বুঝি যাদুমন্ত্র জানে!"
আমি হই হেসে সারা শুনে এ ভারতী!
স্বজনি, জানে না এরা—নির্ব্বাক নীরবে
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে!
মুগ্ধ হয়ে, শোনে শ্রোতা—মোর অন্তঃপ্রাণী;
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা,
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা!

১৩

লোকে হাসে হেরি মম বিধবার রীতি,
আতপ-তণ্ডুল-দুগ্ধ-উদ্ভিদের রসে
এ দেহ পালন! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি
নাহি মম! একি রঙ্গ হায় এ বয়সে!
"পশু পক্ষী, দাস, দাসী—জীব সমুদয়"
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা;
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হযে বয়
জীব-দুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ি,
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য তুমি লইয়াছ কাড়ি!
বাকল-বসনা "শোভা"—তাপসী সরলা,
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা!

১৪

কেহ বলে "আছে এর শিররোগ ব্যাধি;"
কেহ বলে "এ কবিটি নিশ্চয় পাগল;"
"ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল;"
এই রূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী!
শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে,
তারা বলে "এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস; হের ওর রক্তিম নয়ানে
মাদকতা!"—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে!
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে; আমি হয়ে ভোর,
পিই তাহা—সুধামুখি! নিভৃত নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে!—অপরাধ ঘোর
এই মাত্র মোর—ওগো নিন্দা, দৈত্যবালা!
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর!

১৫

আলু থালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে; ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতি স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!
উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে!
হে নারি অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা ভিতরে!
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে, তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে!

১৬

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া; ধন্য এ যতন!
নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা;
তিমির পুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা!
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে;
ঘোরা তমস্বিনী নিশি বহিছে ঝাটিকা!
কবি-চিত্ত-বেলা-ভূমে সৌন্দর্য্যের শিখা
কে জ্বালিল? হে নারি, মোহিনী-মূর্ত্তি ধরে'
শান্তি শান্তি উচ্চারিলে,—আইল অমনি
সাগর-সঙ্গমে মরি অর্থ-সুরধুনী!

১৭

নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী;
ছিল না উৎসব; যত ঐশ্বর্য্য বিভব
ছিল গুপ্ত; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী!
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায়;—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী!
সে দিন কি ভুলিয়াছি? ভোলা কি গো যায়?
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি।
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী;
বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভুত, বিরাট!
বিচিত্র-ফুল্ল-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি; গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি!

পিসি মা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠমাস। বেলা দুই প্রহর। চারিদিকে রো'দ চম্ চম্ করিতেছে। পবনদেব থাকিয়া থাকিয়া আগুণভরা হল্‌কা চালাইতেছেন—গা যেন ঝলসিয়া যাইতেছে। আমপাকানে রৌদ্রে রাশিকৃত আম্র পাকিতেছে, আর বেশীর ভাগ পাকিতেছে মানুষের গা। নদীখালে জল শুকাইয়া গিয়াছে—পূর্ণ জুয়ার ছুটিয়াছে লোকের শরীরে। পশুপক্ষী সব নীরব—কেবল ঘুঘুর করুণবেদনাপ্লুত সুর, চাতকের উদাস প্রাণের বিষাদমাখা 'জল জল' রব মাঝে মাঝে সেই নীরবতা-ভঙ্গ করিয়া দিতেছে।

নন্দীগ্রামের বোসেদের বাড়ীতে লোকজন বড় কেউ নাই। লোকের মধ্যে সরোজকুমার আর তাহার বুড়ী পিসি মা। প্রকৃতপক্ষে বুড়ী সরোজের পিসি মা নয়—তাহার মায়ের পিসি মা। মায়ের কথার প্রতিধ্বনির মত সরোজ শিশুকাল হইতেই তাহাকে পিসি মা বলিয়া আসিতেছে। উপরন্তু বুড়ী শুধু সরোজের পিসি মা নয়, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোকেরই অযাচিত 'প'ড়ে পাওয়া' পিসি।

গ্রামের এ হেন 'যোগরূঢ়া' পিসি মা এই 'রৌদ্রময় নিশীথের' সময় খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া দুয়ারে পা মেলিয়া বসিয়া আছেন। পাশে তাঁহার প্রিয় বিড়াল গৌরমণি বহুযত্নের সহিত মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন—একটু আগেই একটা ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীকে তিনি ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার দুহিতাকে দান করিয়াছেন। দুহিতাটী লেজ ফুলাইয়া, থাবা মারিয়া মায়ের দানের দোষগুণ বিচার করিতেছেন। উঠানে একটা কেলে কুকুর আমূল জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে; টোস্ টোস্ করিয়া লাল ভূমিপৃষ্ঠে গড়াইয়া আসিয়া পড়িতেছে—পৃথিবীর এমনই জলের টান্!

ঘরের মধ্যে বিছানার উপর সরোজের সমবয়স্ক গ্রামের সাত আটটী বালক, একজন আর একজনের উপর পা তুলিয়া দিয়া সুপ্তিমগ্ন। গ্রীষ্ম ও নিদ্রার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। যাহাহউক নিদ্রারই জয়—তাই এত গ্রীষ্মে এত ঘুম। সকলেই নিদ্রিত, জাগিয়া আছে শুধু সরোজকুমার এবং সরোজের পাখাখানি।

সরোজের পিসি মা অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া সরোজকে বলিয়াছে বাবা আজকালকার রো'দে কোথাও বেরুস নি; ঘরের মধ্যে সাথী সঙ্গীদের নিয়ে যা ইচ্ছে করিস্। চারিদিকে যে 'ইন্‌খেলাপী' জ্বরের প্রাদুর্ভাব! (সরোজের পিসি influenza জ্বরকে 'ইন্‌খেলাপী' জ্বর বলিয়া থাকেন) বাবা! এ জ্বরে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু যে কাহিল হয় সে মরারই দাখিল। কিছুদিন হইল তিনি নিজে সে রোগের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এত বয়স হইল কত রকম জ্বরে ভুগিয়াছেন, তার উপর সব কাজই করা চলিয়াছে কিন্তু এ জ্বরে এমন কাহিল

করে ! এখন পর্য্যন্ত বুড়ী একটু হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই সে সরোজকে এত করিয়া অনুরোধ করিয়াছে। সরোজও তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করে নাই, যেহেতু খেলা ইত্যাদি যা কিছু সবই ঘরের মধ্যে চলে।

ঘরে সরোজ পড়িতেছে, বাহিরে বুড়ী ও নিদ্রার মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছে। ঘুম ঘাড় ধরিয়া খানিকটা ঝুঁকাইয়া দিতেছে, বুড়ী ঝাড়া দিয়া আবার উঠিয়া বসিতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ চলার পর নিদ্রা একবার এমন সজোরে ঘাড়ে চড়িলেন যে, বুড়ী একেবারে ভূমিতে ধুপুস্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল কেহ দেখিতে পাইল কি না। অমনি একখানি সরু গলায় সুর বাজিয়া উঠিল 'অ্যাঁ গিন্নি ক'ল্লে কি ? বরের সাম্‌নে লজ্জার মাথা খেয়ে প'ড়ে গেলে ? আর কেহ না দেখ্‌তে দেখ্‌তে উঠে পড়।' এদিকে সরোজ ভয়ানক হাসিল, সকল বন্ধুবান্ধবকে উঠাইয়া হাসিল। বুড়ী বলিল 'আমি ত আর তোদের মত যুবা নই; ঘুমের ঘোরে প'ড়ে গেলুম তা আর হাসলে কি হবে বাপু ?'

এখন নবাগত সরু সুরখানির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনিও সরোজের বন্ধুবর্গের মধ্যে একটী। বুড়ী, নামে পিসি মা হইলেও সম্পর্কে দিদিমাই আছেন ; সুতরাং ছেলেরা ঠাট্টা তামাসা করিতে ছাড়ে না। সকলের মধ্য হইতে এই নবাগত বন্ধুটীই সম্প্রতি বুড়ির বর মনোনীত হইয়াছেন ; কারণ ছেলের যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ ! গলাখানি ত নয় যেন ঢোলের সঙ্গী শানাইটী ! বরটী আসিয়াই নারিকেলদড়ি সংলগ্ন একটী বৃহৎ ভাঙ্গা তালা বুকে ঝুলাইলেন। বলাবাহুল্য এটী চেন ঘড়ি। ভাঙ্গা 'ব্রশে' মাথা আঁচড়াইয়া চাঁচা গলায় বলিলেন 'কৈ হে কন্যাকর্ত্তা, দুয়ারে যে বর হাজির, কন্যা সম্প্রদান করবার দেরি কত ?' সরোজ প্রভৃতি অন্যান্য ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল 'আসুন, আসুন ; আপনারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি।' এই বলিয়া বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কেহ তাড়াতাড়ি উঠান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া কন্যার চুলে গুঁজিয়া দিলেন। কেহ শঙ্খ ঘণ্টা লইয়া পুরোহিত সাজিলেন। কেহ কন্যাকে কুলার বাতাস করিতে লাগিল। মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। বাজনার রোলে, ছেলেদের গোলে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সময় বরকে একটা বাঁশে ঝুলাইয়া আনিয়া কন্যার সম্মুখে বসান হইল। শুভক্ষণে শুভলগ্নে মহাসমারোহের সহিত সরোজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বুড়ী বলিল 'দেখত বাপু, ছেলেগুলো যেন আমায় নিয়ে কি করে !'

বিবাহ সমাপনান্তে ভোজনের গোলমাল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল 'ও কন্যে, নিজে পরিবেশন ক'রে খাওয়াও না ; কেমন কর্ম্মিষ্ঠি দেখা যাক্।' ভয়ানক জ্বালাতন আরম্ভ হইল। শেষে কন্যা উত্যক্ত হইয়া কাহারও হাতে একটি পাকা বেল দিলেন, কাহারও হাতে একটু কুলের আচার ; কাহারও হাতে একটু আমের চাট্‌নি ; কেহ বা মুড়ি লইয়া গালে পুরিল। এইরূপে ভোজনকাণ্ড শেষ হইল। বরকে পরিতোষ করিয়া খাওয়ান হইল। এমন সময় মরীচিমালী নিজের অসহ্য উত্তাপে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন।

মেঘমালা সিন্দূররাগে অনুরঞ্জিত হইয়া আকাশের উপর ভাসিয়া চলিল। সমীরণ সারাদিনের পর এখন একটু ঠাণ্ডা হইয়া মনের হরষে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে বৃক্ষশাখা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমনই আমোদ আহ্লাদে সেদিনকার সেই দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল। বালকের দল স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমনোন্মুখ হইল। যাইবার সময় সকলে বলিল 'পিসি, আজ তোমাকে অনেক জ্বালাতন করিলাম ; কিছু মনে ক'রো না।' পিসি বলিলেন 'বাবা, মনে ক'রব কি ? সরোজ আমার বেঁচে থাকুক, তোরা যেন চিরদিন এম্নি ক'রে জ্বালাতন করিস। সরোজের বিবাহের দিন যখন এমনি করবি, তখন আমার কত আনন্দ হবে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দশটা। আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে ; বাতাস মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিয়া হুহু করিয়া বহিতেছে। বৃষ্টির পতন-শব্দে ভেককুলের গ্যাঁ গোঁ রবে রজনী প্রতিধ্বনিত।

জল ঝড় দেখিয়া গৃহস্থেরা সকলে দুয়ারে খিল দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অসহ্য গ্রীষ্মে, দিবা নিদ্রায় রাত্রিতে নিদ্রাদেবীর সঙ্গে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আজ শীতল বাতাসে, বৃষ্টির ঝঙ্কারে, মেঘের গুরু গরজনে সকলেই অচিরে নিদ্রামগ্ন।

কেবল সরোজদের গৃহের মধ্যে সরোজ ও তাহার পিসি মা এখনও জাগ্রত। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। গৃহকোণে একটী মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সরোজ। আমি তোমাকে এত করিয়া বলি, তবু কেন যে তুমি শোন না বলিতে পারি না। আমিত আর কায়স্থের ঘরের অরক্ষণীয়া মেয়ে নই যে বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছ।

পিসি মা। কেন তোর কি আর বিবাহের সময় হয় নি ? বাপ মা থাক্‌লে এত দিন যে কোন কালে বিবাহ হ'য়ে যেত।

সরোজ। বিবাহের বয়স হয় নাই আমি তা বলছি না, এবং বাপ মা থাকলে বিবাহ যে এতদিন হ'য়ে যেত তাও জানি। কিন্তু এখন আমি কি ক'রে বিবাহ করি বল দেখি ? শুইবার একখানি ভাল ঘর নাই, দাঁড়াবার একটু জায়গা নাই, বাড়ী জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এমন অবস্থায় এত তাড়াতাড়ি বিবাহের দরকার কি ? পরীক্ষাটা দিই, পাশ হ'লে এক বৎসর একটা চাকরি নিয়ে বাড়ী ঘর মেরামত ক'রে বিবাহ ক'রবো। বলছি না ত বিবাহ ক'রব না।

পিসি মা। কেন তোকে ওসব কিছুই ভাবতে হবে না, শ্বশুর হ'লে টাকা দিয়ে পড়াবে, বাড়ী ঘর সব মেরামত ক'রে দেবে ; তা হ'লে নির্ভাবনায় পড়া শুনোও ক'রতে পারবি।

সরোজ। ঐ ত তোমরা বোঝ না। কত আর ব'লব বল। বিয়ে হ'লে নানারকম দুর্ভাবনা এসে পড়ে। সেদিন এত ক'রে বুঝিয়ে দিলাম অন্ততঃ এ বৎসরটা নয়—তার পর যা হয় হবে। তখন তুমি বেশ বুঝলেও আবার সব উল্টে পাল্টে গেল।

পিসি মা। আমি বলি, আর কি বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রবি? সকাল সকাল বিয়ে হ'ক, ছুটা ছেলে পিলে হ'ক, বাড়ীতে গোলমাল হ'ক, আর কি চিরকালই একলা থাকৃতে পারি? আর দেখ্না ঘোষেদের সূর্য্যকুমার সকাল সকাল বিয়ে ক'রেছিল—সময়ে সোণার চাঁদ বেটাটী হ'ল, তাইত আজ মুঠোমুঠো টাকা রোজকার ক'রে বাবাকে দিচ্চে। আর গাঁয়ের সবাই ত আমাকে বলে 'ও মা আর বিয়ে না দিলে কি ভাল দেখায় গা? তুমি মন কর না ব'লেই ত হয় না। সরোজ কি আর নিজে লাফাবে বিয়ে ক'রব ব'লে! সরোজের ছোট্ট, গাঁয়ের কোন্ ছেলের বিবাহ হ'তে বাকী আছে বলত?'

সরোজ। তা বেশ গাঁয়ের লোকের কথাতেই যদি বিয়ে হয় তবে তাই হ'ক। আমি ব'ললাম এখন হবে না, আর গাঁয়ের লোক তোমার কাণে যাদুমন্ত্র প'ড়ে দিলে তুমি নেচে উঠ্লে। গাছে উঠাতে সবাই আছে, নামাতে কেউ নাই। তুমি যেমন ক'রছ যেন বিয়ে আর কখনও হবে না। 'সে দিন শ্যামপুর হ'তে আমায় দেখ্তে আসবে সংবাদ এলো, আমি এত ক'রে ব'ললাম লিখে দাও আমি এখন বিয়ে ক'রব না। তুমি আমায় লুকিয়ে তাদের লিখ্লে 'তোমরা এসে পাত্র দেখে যাবে।' ভদ্রলোকেরা কষ্ট ক'রে এলো—বিয়ে দিতে কত জিদ্ ক'রলে—কৈ, পারলে কি? মাঝে থাকৃতে একটা মনোবিবাদ হ'য়ে গেল। আবার আর এক জায়গায় লিখেছ পাত্র দেখে যেতে। তাদেরও সঙ্গে বিবাদ হ'ক! ভদ্রলোকদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কি বড় ভাল দেখায়? আমি বিবাহ না ক'রলে কৈ গ্রামের কেউ বিয়ে দিয়ে দিক্ দেখি?

পিসি মা। তাই তোর মনের ভাবটাই খুলে বল্না কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারি।

সরোজ। মনের ভাব আবার কতবার ব'লতে হবে? বলেছিই ত এখন বিবাহ ক'রব না। আর এমন ক'রে যদি জ্বালাতন কর—একেবারেই বিয়ে ক'রব না। তোমার দশ জন মন্ত্রী, দেখি মন্ত্রীদের সাহায্যেই বা কি ক'র্তে পার।

বুড়ি মর্ম্মাহতা হইয়া বলিল—'তবে তুই বিয়ে ক'রবি না? আমি এত হাঁকুপাঁকু ক'রলে আর কি হবে? আর যদি তোকে কখনও বিয়ের সম্বন্ধে বলি তখন তার কথা। মর পোড়া মন বুঝেও বুঝে না কেন? আমার যদি কপালে সুখ থাকবে, তবে তেমন সোণার ভাইই বা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে কেন? দুঃখ পাব ব'লেই ত সব হারিয়ে এ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে আছি! আমারই ত যাবার কথা! তা হ'লে এত যন্ত্রণা ভুগ্তে হ'ত না'—বৃদ্ধার চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বহুদিনের দমিত শোকাবেগ আজ নবীভূত হইয়া হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। বাহিরের বিষাদময়ী প্রকৃতির সহিত বুড়ীর হৃদয়ের অবস্থা মিলিয়া গেল। প্রাণে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

আর দুজনের মধ্যে কোন কথা হইল না। প্রদীপটী এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল এইবার তৈলাভাবে নিভিয়া গেল। গৃহের মধ্যে অন্ধকার গম্ গম্ করিতে লাগিল। একটা টিক্‌টিকি দেওয়ালের উপর হইতে শব্দ করিল—'ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্'।

কতক্ষণ পরে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া বৃদ্ধার গাত্রে স্বীয় মন্ত্রপূত অঙ্গুলি স্পর্শ করাইল—মোহনমন্ত্রে সব ভুলিয়া বুড়ী ঘুমাইয়া পড়িল।

সরোজের সে রাত্রে একটুও ঘুম হইল না। বৃদ্ধার দীর্ঘনিশ্বাস, দীনঅশ্রু, শত শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান দংশন করিতে লাগিল। সে আজ রাগের মাথায় এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধাকে সে জ্ঞাতসারে কখনও মনে কষ্ট দেয় নাই। আজ নূতন তাই বুঝি এত মনোভঙ্গ! ...থ।

আহা বুড়ির আর কে আছে? নিজের পেটের কোন পুত্র কন্যা নাই। অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া ভ্রাতৃকন্যার গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল আশা ছিল—তবু নাতি নাতিনীদের লইয়া একটু মনের সুখে থাকিব। সরোজ প্রভৃতি বুড়ীর মা[illegible] করা ছেলে; জনয়িত্রী কেবল প্রসব করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু হা অদৃষ্ট! কি তোমার বক্র শাসননীতি। সরোজের মা, বাপ, ভাই, ভগিনী সকলেই একে একে অকালে কাল-কবলে হইল! রহিল কেবল সরোজকুমার—আর রহিল যাহার আগে যাওয়া উচিত ছিল, যে গেলে পৃথিবীর দুঃখের ভার কথঞ্চিৎ লঘু হইত। প্রকৃতি! মা একি তোমার রঙ্গের [illegible] তুমি সর্ব্বোত্তম কুসুমকে কীটদষ্ট করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভূমে নিপাতিত কর? কে জানে—কে বুঝিবে?

বুড়ী প্রভাতে যে সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিল এই [illegible] অপরাহ্নে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! প্রকৃতির যে মোহন-মূরতি দেখিয়া প্রাণে বল পাইয়াছি[illegible] তাহা' এখন ঘন তমসায় আবৃত হইয়া গেল। তবু কুহকিনী আশা মরিল না—সে এই ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সরোজকে লতার মত জড়াইয়া রহিল। কিন্তু হায়, সে আশা-লতাটীও বুঝি এইবার ছিঁড়িয়া যায়!!

সরোজ পাটনায় পড়ে। অনেক দিন হইতে সরোজের বিবাহের কথা হইতেছে। সরোজ নানা কৌশলে বরাবর সে সব প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়া আসিতেছে। বন্ধুবান্ধবদের জীবন দেখিয়া সরোজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বাল্যকালে বিবাহ করিলে পড়াশুনা বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। পড়া শুনা শেষ করিয়া বিবাহ করিবে—ইহাই সরোজের একান্ত ইচ্ছা। এমন সময় হঠাৎ গ্রামে রাষ্ট্র হইল সরোজ খৃষ্টান্ হইবে।

সরোজের খৃষ্টানী লক্ষণের মধ্যে সে দিনক্ষণ দেখিয়া কোথাও যায় না, সকল ব্রাহ্মণবাড়ী খায় না, দুর্গাপূজার সময়ে বলিদানের পাঁটার মুণ্ড ধরিতে চায় না ইত্যাদি। পাড়াগাঁয়ের Lady Parliament যে স্নানপুকুরের ঘাট, সেখানে এ বিষয়ের একটী ভারি 'গরম' আলোচনা চলিতে লাগিল। "ও মা, ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্নার কথা গা! ছেলেটা বাপ পিতামহের কুলে কালি দিতে ব'সল!" সরোজের পিসি মা ঘাটে আসিলেই চারিদিক্ হইতে সমস্বরে বামাকণ্ঠ বাজিয়া উঠে—'দেখ পিসি এবার তুমি বিয়ে না দিয়ে ওকে কোথাও যেতে দিও না। এমনি কি ছেলের জিদ্! তুমি মানুষ মুনুষ ক'ল্লে তুমি বুঝি কেউ নও? ও গো কলিকালের ছেলে! খৃষ্টান হবে তাই বিয়ে করতে চায় না।' সরোজের পিসি মা ভাবিল 'তাইত'।

তাই সে এবার নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়াছে সরোজের বিবাহ দিবেই দিবে। সরোজ

এত করিয়া বুঝাইয়া বলে—'না পিসি আমি খৃষ্টান্ হ'তে যাব কেন?' আগে আগে বুড়ী সরোজের সব কথাতেই বিশ্বাস করিত আজ কাল তাহার এমন সরল কথাতেও মনের কোণে কেমন একটু সন্দেহের ছায়া থাকিয়া যায়।

বুড়ী মনে মনে আঁটিয়াছিল এবার সরোজের বিবাহ দিবে।. সবই ত গেছে তবু যদি আঁধার মেঘের কোলে বিদ্যুতের ক্ষণিক উন্মে... মত এই দুঃখের সংসারেও একটু সুখের আলো ফুটাইতে পারে! প্রাণের সাধ ছিল স...জের বউটী আসিয়া বুড়ীর বৃদ্ধাবস্থার একটি কোমল সঙ্গিনী হইয়া বাড়ীতে ঘুরঘুর ক...রা বেড়াইবে, সরোজকে পানটী সাজিয়া দিবে, বিছানা করিয়া দিবে। তা দেখি...ড়ী তবু কতকটা মনের সুখে মরিতে পারে। কিন্তু আজ তার সব সাধে ছাই প...

সরোজকুমার! বুড়ীর ...ষ্ট দিয়া তুমি আজ ভাল করিলে না!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ ২০শে বৈশাখ—সরোজের ...য় ফিরিয়া যাইবার দিন। সরোজের বন্ধুরা সব সরোজকে বিদায় দিতে আসিয়া... ...ীষ্মাবকাশে প্রায় আড়াই মাস সরোজ বাড়ীতে ছিল। বাড়ীতে কত ছেলে আসিত— ...ালমাল ছিল। চলিয়া গেলে সরোজের পিসিমা কেমন করিয়া বাড়ীতে টিকিবে, তাই ...য়া বুড়ী গত রাত্রে চক্ষে পাতায় করিতে পারে নাই। সরোজকে কত অনুনয় করিয়া বলিল "বাবা যখন যেমন থাক চিঠিপত্র দিতে ভুলো না। আমি এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে পড়িয়া থাকি কেউ জিজ্ঞাসা করবার লোক নাই। শরীরের কথা ত ব'লতে পারা যায় না—কখন কি হয়—মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিও। মাসে দুখানি ক'রে চিঠি দিও, বেশী চাই না। কেন বাবা আমার চিঠি দিতে দেরি করিস্? আমার প্রাণটা তোর কাছে প'ড়ে থাকে। একটী টিক্‌টিকি ডাকলে—একটা কাক মাথার উপর দিয়ে ডেকে গেলে, মনের মধ্যে কত ভাঙ্গি কত গড়ি! ওমা ছেলে আমার কেমন আছে! তোদের কি বাড়ী হ'তে বেরুলে কিছুই মনে থাকে না? সব ভুলে যাস্? ডাক হরকরা এলে মনে হয় তোর চিঠি আস্‌চে। তাড়াতাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেসা করি হ্যাঁগা সরোজের চিঠি আছে কি? যখন সে বলে 'না গো নেই' তখন ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরে আসি। বাবা এবার আর এমন করিস্ না।"

সরোজের হৃদয়-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া আসিল—সে বেশী কথা বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'না ক'রব্ না।

সরোজের যাবার সময় হইল। বুড়ী বলিল "বাবা এইখানে মা বসুমতীকে প্রণাম কর, মা ভগবতীকে প্রণাম কর। হে মা মঙ্গলচণ্ডি, হে মা ভগবতি, ছেলের আমার একটা কূল কিনারা দাও মা। তোমায় আমি ষোল আনার ভোগ দেব।"

সরোজ বন্ধুদের নিকট বিদায় লইল তারপর পিসিকে একটী প্রণাম করিল। পিসি

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল 'দেখিস্ বাবা যা ব'লেছি ভুলিস্‌নে। তোর মুখ চেয়েই আমার থাকা—আবার কতদিনে চাঁদমুখখানি দেখতে পাব!' এই বলিয়া সরোজের চিবুক ধরিয়া একটী চুমা খাইল।

সরোজ আর ফিরিয়া তাকাইতে পারিল না—দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বুড়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর গেল—যতক্ষণ সরোজকে দেখা গেল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। শেষে সরোজ অদৃশ্য হইয়া গেলে তাহার মুখের ছবিখানি বুকে ধরিয়া বাড়ী ফিরিল।

সরোজ রাস্তায় কত কি ভাবিল। চিন্তাস্রোত শতমুখী হইয়া কত দিকে ছুটিল—সে চিন্তা-সূত্রের খাই পাওয়া যায় না—সব গোলমেলে সব এলোমেলো। সুতরাং আমরা পাঠককে তাহার কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ দিতে পারিলাম না।

সরোজ রাস্তার মধ্যে নদী পার হইল, নদীর ক্ষুদ্রবীচি বক্ষে সোণালী রবি-কিরণের খেলা দেখিল, সবুজ মাঠে গো-বৎসের ছুটাছুটী দেখিল, রাখাল-বালকের মেঠো সুরের গান শুনিল, গাছে কোকিলের কুহুতান শুনিল—অবশেষে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দে কুলিদের কোলাহলে, ক্ষণকালের জন্য সরোজের সব চিন্তা মন হইতে মুছিয়া গেল। সরোজ টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিল—গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরোজের পাটনায় আসিবার দিন হইতে আজ এক বৎসরের উপর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জগৎ কত অগ্রসর হইয়াছে প্রকৃতির উপর দিয়া কত পরিবর্ত্তনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সরোজ এবার যে পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাতে পাশ হইয়াছে। বাড়ী যাইবার গাড়ী ভাড়া ইত্যাদিতে কিছু টাকার দরকার, তাই সরোজ একটী Private tuition লইয়া দুই মাস কাজ করিতেছে তাই এতদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই। দু একদিনের মধ্যে বাড়ী যাইবে।

সরোজের প্রকৃতি, সে বড় কাহাকেও চিঠিপত্র দেয় না। বিশেষতঃ এবার পরীক্ষার গোলমালে প্রায় দুই মাস কোথাও চিঠি লিখিতে পারে নাই। দুই মাস পূর্ব্বে বাড়ী হইতে পিসিমার একখানি পত্র পাইয়াছিল—আজ দিব কাল দিব করিয়া এ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নাই। সরোজ মনে করিল শীঘ্রই ত বাড়ী যাইতেছি আর পত্র দিয়ে লাভ কি? আসিবার দিন পিসিমার কাতর অনুনয়ের কথা স্মরণ করিয়া এবার ইহার আগে সে বাড়ীতে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছিল।

পিসিমার 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' জ্বরকে বড় ভয় তাই সরোজ বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার একটা 'অব্যর্থ মহৌষধ' কিনিয়া লইল। পিসিমা আফিং খায় কিছু আফিং কিনিয়া লইল। আর প্রতিবার আসিবার সময় পিসিমা বলিয়া দেয় 'বাড়ীতে আসিস্, কি যে জলখাবার খেতে দিই ঠিক্ পাই না; তোদের ওখানে খুব ঘি ময়দা সুজি সস্তা, বাড়ী আসিবার সময়

কিছু কিছু সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিস্। তাই সরোজ সে সবও সঙ্গে লইল। প্রতিবারেই পিসিমা বলিয়া দেয়, কিন্তু কোনবারেই লইয়া যাওয়া হয় না। সরোজ মনে করিল এবার পিসি এ'সব লইয়া যাইতে দেখিয়া কত সুখী হইবে।

২৯শে আষাঢ় সরোজ বাড়ী রওনা হইল। এবার সরোজ 'পাশ পাইয়াছে' পিসিমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না। এইরূপ কত সুখের স্মৃতি লইয়া সরোজ ট্রেণে উঠিল। কত লোক উঠিল নামিল, সরোজ বেঞ্চির একটী পাশে চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চারিদিকের প্রকৃতির শোভা দেখিতে ছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। নীলাকাশে অজস্র নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে তাহাদের তরল কম্পিত কিরণকণা পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিয়া বাতাসের উপরেই মিলাইয়া গেছে। অদূরে পর্ব্বতমালা কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড দৈত্যের ন্যায় অলসভাবে শুইয়া আছে। প্রকৃতি নিস্পন্দ নীরব। কেবল ট্রেণের অবিরাম ঘটক্ ঘটক রব সেই নিস্তব্ধতার উপর শব্দের একটী তরঙ্গ উঠাইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির এই গভীর সুপ্তি মাঝে সরোজের নিদ্রাকর্ষণ হইল। কতক্ষণ ঘুমাইল জানে না, হঠাৎ উঠিয়া দেখে—পাণ্ডুরবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদখানি আকাশের পথহীন পুষ্পিত প্রান্তরে ধীরে ধীরে আন্‌মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর তাহার কোল হইতে খানিকটা জোছনাবসন বায়ুভরে উড়িয়া একটী ক্ষুদ্র তটিনীর লহরীবালার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া গেল। চির-পুরাতন নিত্য-নূতন তপনদেব উদয়সাগরে ভাসিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা হইল। সরোজ নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গাড়ি হইতে নামিল।

দোকানে আহারাদি সমাপন করিয়াই সরোজ বাড়ীর দিকে চলিল কারণ আজকাল প্রায়ই বৈকালে মেঘ ঝড় হইয়া থাকে। অনেকটা রাস্তা চলিতে হইবে, বেলাবেলি বাহির না হইলে বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে—সরোজ একলা।

যখন বাড়ী পৌঁছিতে আর একক্রোশ বাকী আছে তখন সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমদিকে একটু কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইতে না মিলাইতেই আকাশ ঘনঘটার তমোঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল—অন্ধকার দ্বিগুণতর গাঢ় হইয়া পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল। পথঘাট কিছুই দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দেখিতে দেখিতে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সরোজ ভিজিতে ভিজিতে প্রাণপণে চলিতে লাগিল। বাড়ীতে গেলেই পিসিমা গরম জল করিয়া পা ধুয়াইয়া দিবে 'আহা কত কষ্ট হ'য়েছে বাছার আমার!' বলিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিবে।

যখন সরোজ গ্রামে ঢুকিল তখন কেবল টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে অশ্বত্থ গাছে পেচকেরা বিকট চীৎকার সহকারে পাখা ঝাড়িতেছে গ্রামের প্রান্তভাগে শৃগাল ডাকিতেছে। জলঝড়ে লোকজন কেহ রাস্তায় নাই সরোজ বরাবর বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সরোজ দেখিল ঘরে তালা লাগান। তবে বুঝি পিসি কোন গ্রামান্তরে গিয়াছে অথবা কাহারও বাড়ীতে গিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

জিনিষপত্র দুয়ারে ফেলিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী মিত্রদের বাড়ী গেল। সেইখানেই সরোজের পিসি কাজকর্ম্ম সারিয়া গিয়া বসিত। দুয়ারে কপাট ছিল, সরোজ 'কাকিমা, কাকিমা' বলিয়া ডাকিল। শীঘ্র মিত্রগৃহিণী কপাট খুলিয়া দিলেন। সরোজ আগ্রহের সহিত বলিল 'কাকিমা তোমরা সব ভাল আছত? পিসি তোমাদের ঘরে ব'সে গল্প কর'ছে বুঝি? কিছু ব'লো না আমি হঠাৎ গিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়াব।' কাকিমার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। সরোজ চমকিয়া উঠিল। কাকিমার দশ বৎসরের মেয়ে ননীর অসুখের কথা শুনিয়াছিল—সে ভাল আছে তো?

'আজ একমাস হ'ল তোর পিসি মারা গেছে সরোজ' বলিয়া কাকিমা কাঁদিয়া উঠিলেন। সরোজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল।

কাকিমা বলিলেন 'সরোজ কি ক'রবি বল্ সংসারের ত বাবা কিছুই স্থায়ী নয়। তুই জ্ঞানবান ছেলে তোকে আর বেশী কি ব'লব।' এই বলিয়া হাত দিয়া সরোজের চোখের জল মুছাইয়া দিলেন। তারপরে বলিলেন, 'সরোজ সমস্ত দিন তোর ভাল খাওয়া দাওয়া হয় নি এখন কিছু খা। ভিজে কাপড় ছাড় অসুখ ক'রবে।'

অনেকক্ষণ পরে সরোজ বলিল—'না কাকিমা আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।' কাকিমা বলিলেন 'তা কি হয় বাবা, আর কিছু না খাস্ একটু দুদ খা। আমার মাথা খাস্ একটু খা—খেয়ে আমার ঘরে শুয়ে থাক্। তোর ভাবনা কি—তুইত সরোজ আমাদেরই।'

কাকিমার বিশেষ পীড়াপীড়িতে সরোজ হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একটু দুধ খাইল। পরে কাকিমার সঙ্গে তাঁহার ঘরে গিয়া শুইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল—কাকিমা ঘুমাইয়া পড়িলেন। সরোজ তখনও বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছিল।

হায়! আজ সরোজের পিসি কোথায় গেল! সরোজের পাটনায় যাইবার দিন বুড়ী বলিয়াছিল বাবা আবার কতদিনে তোর চাঁদ মুখখানি দেখ্‌তে পাব। আজ সরোজ পাশ করিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে কিন্তু বুড়ীকে আর সে মুখ দেখিতে হইল না—সেই চুম্বনই শেষ চুম্বন হইল!!

আজ কেবলই সরোজের মনে সেই রাত্রির কথা জাগিতেছিল—সেই রাত্রি যে রাত্রিতে সে তাহার পিসিকে বকিয়াছিল। সে আজ পিসির আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—পিসি, তুমি শুধু সরোজকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া জানিয়া গেলে! আমি তোমার বৃদ্ধাবস্থায় সেবা করিতে পারিলাম না—তোমার ঋণ কিয়ৎ পরিমাণেও শুধিতে পারিলাম না!

হায়! মানুষ যদি আপনার হৃদয় খুলিয়া দেখাইতে পারিত! যদি প্রেতাত্মার সহিত

কথাবার্ত্তা করা সম্ভব হইত! যদি আজ সরোজ কোন রকমে তাহার পিসিকে বুঝাইয়া দিতে পারিত যে সরোজ অকৃতজ্ঞ নয়!!

চন্দ্রিকাকিরণ গগনপ্রাঙ্গণে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, দোয়েলের মধুবর্ষী সুরে তরুকানন প্রতিধ্বনিত হইবার পূর্ব্বেই, যখন আকাশ অযূত তারকাচ্ছন্ন—সরোজ ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। নিঃশব্দে সুপ্ত গ্রামখানি অতিক্রম করিয়া গেল। কোথায়?—সে জানে না।

হায়! সরোজ কিরূপ পূর্ণহৃদয়ে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল—যাইবার সময় কি ভয়ঙ্কর শূন্যহৃদয় বহন করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিল!

সংসারের অবলম্বন এমনই ক্ষণভঙ্গুর! পৃথিবীর আশ্রয়তরু এমনই কীট-জীর্ণ! আশার ছলনে ভুলিয়া মানুষ এমনই প্রতারিত হয়!!

পাঠক, পাঠিকা, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, সরোজ আর যেন সংসারের কুহকে মুগ্ধ না হইয়া এমন স্থানে প্রাণের আশা নিবদ্ধ রাখিতে পারে যেখানে

নাহি মৃত্যু নাহি জরা, কেবলই প্রাণের ধারা,
ঝরিতেছে অবিরাম ঝর্ ঝর্ ঝর্
নাহি অন্ত অবসান, কেবলই অনন্ত প্রাণ,
খেলিতেছে চারিধারে তর্ তর্ তর্॥

পুরাবৃত্ত তত্ত্ব।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা যেমন সুখকর, নবীন ইতিবৃত্তের আলোচনা তেমন সুখকর নহে। পুরাবৃত্তের আলোচনায় আমরা সভ্যতম জনপদসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তৃতি ও উন্নতির কারণসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভিজ্ঞাত হইতে পারি, নবীনইতিবৃত্তের আলোচনায় আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হই। বৃক্ষ, বৃক্ষের মূল, বৃক্ষের প্রকৃতি প্রভৃতি না বুঝিলে যেমন তাহার ফলের প্রকৃতি সহজে বুঝা যায় না, প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান না লইয়া নবীন ইতিবৃত্তের আলোচনা করিতে গেলে সমাজ ও দেশের মৌলিকতা তেমনি বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায় না; এই জন্য পুরাবৃত্তের আলোচনা শিক্ষিত সমাজে বড়ই প্রীতিকর ও বিশেষ উপকারী। পুরাবৃত্তের আলোচনায় আমরা কেবল প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই এমত নহে, এই আলোচনায় আমরা আমাদের উর্দ্ধগমন বা অধঃপতনের মৌলিক কারণগুলির বিশ্লেষণ করিতে সম্যক প্রকারে সমর্থ হই। পীড়িত সমাজের পক্ষে প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা অব্যর্থ মহাভেষজ তুল্য; অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থানের পক্ষে ইহা মহামন্ত্র স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাস এজন্য বড়ই প্রয়োজনীয় পাঠ্য, দেশের

প্রাচীন ইতিহাস এজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। য়িহুদীর সর্ব্ব প্রাচীন ইতিহাস এই জন্য বাইবেল বলিয়া খ্যাত; হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত ঠিক এই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের পঞ্চম অঙ্গ। শ্যামের শিক্ষিত "সাধু"গণ পুরাবৃত্তের পূজা করে; রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা প্রাচীন জেরুজেলমের ইতিবৃত্তকে বিবি মরিয়মের মূর্ত্তির সম্মুখে রাখিয়া ইটালীদেশে প্রতি রবিবারে পুষ্প ও সুগন্ধি দ্বারা উৎসর্গীকৃত করে এবং সুইডেনের প্রাচীন ইতিহাস তথায় বাইবেলের তুল্য আদর পাইয়া থাকে। মুসলমানের অতি প্রাচীন ইতিহাসের প্রবাদবাক্য কোরাণের ন্যায় গৃহীত হয়, ইহা "হদিশ্ সরিফ্" নামে খ্যাত। এই হদিশ্ সরিফ্ কোরাণের ন্যায় পূজ্য। শিখের উৎপত্তির বিবরণী "গ্রন্থ সাহেব" নামে প্রসিদ্ধ, অমৃতসহরের সুবর্ণ মন্দিরে ইহার নিত্য আরতি হইয়া থাকে। পুরাবৃত্তের আলোচনায় শিবজির "শিবজিত্ব" এবং ম্যাট্শিনির "ম্যাটশিনিত্ব" জগতে এক অদ্ভুত নবীন শক্তির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লাফায়েৎ, রণজিৎ সিংহ, হয়দর আলী, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির শক্তি, সামর্থ, দিগ্বিজয় ও পরাক্রমের একইমাত্র মূল—পুরাবৃত্তের সম্যক্ আলোচনা। এই জন্যই বুঝি বিশ্ববিখ্যাত গিবন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রমজাল এবং কাপুরুষতাকে বিনাশ করিতে ইতিহাস যেমন সমর্থ, কোনও স্বর্গস্থ দূত তেমন সমর্থ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ইতিহাস মহাজ্ঞানের আকর; চরিত্রকে উন্নত করিতে এতদপেক্ষা অধিকতর সহায় আর কিছুই নাই। ইতিহাস, আধ্যাত্মিক বলের অন্যতম প্রধান উত্তেজক; ধনশালী বিস্তৃত জনপদের বিনাশ, মহাপ্রতাপবান নরপতিদিগের দুর্গতি ও মৃত্যু এবং জগতের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন, এই সকল নিয়ত পাঠ করিয়া কাহার মনে জগতের নশ্বরতাব্যঞ্জক ভাবের উদয় না হয়? ইতিহাস, বৈরাগ্যের ভিত্তি।" হিউম বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্রকে মহৎ করিতে ইতিহাসই মহামন্ত্র।" রাজা স্যার টি মাধব রাও সদতই বলিতেন, "ইতিহাস তরুতে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এই চারি ফল ফলে, ইহা কল্পতরু, ইহার প্রসাদে অসম্ভব সম্ভবপর হইয়া থাকে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় পুরাবৃত্তের আলোচনা দিনে দিনে কম হইয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইতেছি। দ্বাদশবর্ষকাল পূর্ব্বে পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্গসমাজ বেশ উৎসাহ ও সামর্থ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এখন ধর্ম্মধ্বজীদিগের প্রলাপপূর্ণ ধর্ম্মান্দোলনে এবং বহুসংখ্যক বাবু-ক্রেসীপরায়ণ রাজনৈতিকের চীৎকারে পুরাতত্ত্বের ক্ষীণ স্বর আর প্রায়ই শুনা যাইতেছে না। যে দেশে স্বদেশবৎসলতার প্রাচুর্য্য থাকে, যে সমাজে জাতীয় মহিমার প্রতি লোকের দৃঢ় আস্থা থাকে, সেই দেশেই পুরাবৃত্তের যথেষ্ট আলোচনা হয়। অধঃপতিত, বিদেশীয় পাদুকাতলে শায়িত, চিরপরাধীন কাঙ্গালী বাঙ্গালী আবার যদি কখন 'মানুষ' বলিয়া পরিচিত বা পরিগণিত হয়, তাহা হইলে পুরাবৃত্তের আলোচনা এবং পুরাবৃত্তের উপদেশানুসরণ করিয়াই হইবে, ইহাই সাধারণ মত। সারমেয় তাড়িত মেষ শিশুর ন্যায় আমরা দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কর্ত্তিতকণ্ঠ রোহিত মীনের ন্যায় অপমান ও নির্যাতনে ছট্ ফট্ করিতেছি; "জনকতক প্রহরীর ভয়ে আমাদের নয়নে ধাঁধা লাগিয়াছে," কিন্তু আমরা

যদি পুরাবৃত্ত-বিজ্ঞান বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের এদশা ঘুচিয়া যায়, ইহাই আমাদের ধারণা। পুরাবৃত্তে যে শিক্ষা আছে তাহার অনুসরণ করিলে, কেবল ইহলোকে নহে, পরলোকেও আমাদের "সুন্দর গতি" হইতে পারে। পুরাবৃত্ত যিনি বুঝেন তিনি বিশ্বসংসারকে বুঝিতে পারেন এবং প্রকৃতির দুর্ব্বদ্ধ নিয়মগুলিও তাঁহার নিকটে অার অভেদনীয় প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয় না। পুরাবৃত্তের এত গৌরব বলিয়া, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তকার গৌরবে লিখিয়াছিলেন "আমি জগতের শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে কর প্রার্থনা করি।" আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত সম্প্রতি প্রাচীন পুরাবৃত্তকারদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Our Conscript forefathers were not born of blood Royal, but they had kingdoms that knew no bounds: Their sway extended over the wide dominions of human thoughts." বাস্তবিক পুরাবৃত্তকার মানবসমাজের হৃদয়ের উপরে রাজত্ব করেন; যাঁহার পুরাবৃত্তে এ গুণ নাই, তাঁহার গ্রন্থ "পুরাবৃত্ত" নহে। যে লেখকের এ গুণ নাই, তাঁহার পক্ষে পুরাবৃত্তে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙ্গালাদেশেও অনেকে অনেকবার লেখনী চালাইয়াছেন, অকারণে 'পেন্' চালাইয়া বহুশত হংসবংশধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গসমাজ যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা মিলে নাই; দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় সে আশা-বুদ্বুদ নিরাশাবারিধিতে মিশিয়া গিয়াছে।

পারস্য সাহিত্যের অনুপম কবি, জগৎপ্রসিদ্ধ মোলানা সেখ সাদি লিখিয়াছেন—

হর্‌চে বুয়দ্ দর্ জাঁহা সনতে পর্‌বর্দ্দীগার।
জল্ বয়ে সানা দরো হস্‌ৎ বসে আস্‌কার॥
চশম্ কুজা বা সদৎ দিদায়ে মানী বেয়ার।
বর্গে দরখ্‌তানে দর্ নজরে হুশীয়ার॥
হর্ বরখে দফ্‌তরেস্ত্ মার্ফতে কির্‌দ্‌গার॥
(গোলেস্তা।)

এরূপ অনুপম কবিতা কেবল সেখ সাদির লেখনীতেই শোভা পায়। এমন মনোহর শ্লোক জগতে অতি বিরল, ইহার অক্ষরে অক্ষরে লেখকের হৃদয় ও মনের জীবন্ত পরিচয় দিতেছে। এমন উচ্চ ভাবের ও উচ্চ অঙ্গের কবিতা, পৃথিবীতে অধিক নাই। সেখ সাদীর "চশম্ কুজা বা সদৎ দিদায়ে মানী বেয়ার" এই পংক্তি এক্ষণে প্রবাদ-বাক্য হইয়া গিয়াছে, এই প্রবাদ-বাক্য প্রত্যেক পুরাবৃত্তকারের নীতি ও ভিত্তি হওয়া আবশ্যক। আমিও সেখ সাদির ন্যায় বলিতে পারি, দিব্য চক্ষু যাঁহাদের লাভ হয় নাই, পুরাবৃত্তের খনি হইতে তাঁহারা রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করা কেবল আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান পুরুষদিগের পক্ষেই শোভা পায়। পুরাবৃত্তের প্রত্যেক পৃষ্ঠা বিজ্ঞানের হিরণ্ময় দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়; ত্রিবিধ দুঃখ—অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখ—বিনাশ করে, এবং পরিণামে ব্যক্তি বিশেষকে

বা মানবসমাজকে ইহজগত হইতে উন্নত জগতান্তরে লইয়া গিয়া ব্রহ্মানন্দে মিলাইয়া দেয়। কথাগুলি অনেকের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু আমি ধীরে ধীরে পাঠককে তাহা বুঝাইয়া দিব। সাংসারিকবিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ইহলোক এবং পরলোক, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য 'যোগ' এবং 'মায়া', পুরাবৃত্ততত্ত্বে কেমন অদ্ভুতরূপে লুক্কায়িত রহিয়াছে; প্রকৃতি সুন্দরী এই পুরাবৃত্ততত্ত্বে কেমন পূর্ণভাবে প্রকাশিতা হইয়া রহিয়াছেন; এই প্রস্তাবে আমি পাঠককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পুরাবৃত্ততত্ত্বের এই অভিনব ব্যাখ্যা আমার নিজের নহে, ইহা ব্রহ্মবাদী সনাতন আর্য্য পিতামহদিগের অভিমতের সংক্ষিপ্ত সারাংশ মাত্র। গীতা, যোগবাশিষ্ঠ ও বেদান্তশাস্ত্র এই মতের স্রষ্টা, পুরাণ ইহার প্রচারক, ভাগবত ইহার ব্যাখ্যাকারী।*

কিন্তু "পুরাবৃত্ত" বলিলে আমরা কি বুঝি প্রথমে তাহার আলোচনা করা উচিত; পুরাবৃত্তের শব্দার্থটা প্রথমেই বুঝিয়া লওয়া উচিত। পুরাবৃত্ত সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে এবং ধাতুমালার মতে ইহার অর্থ; প্রাচীন ঘটনার দ্বিরাবৃত্তি। অথবা পুরাকালের বিবরণী। যাহাতে প্রাচীনকালের ঘটনাসমূহ লিখিত হইয়াছে অথবা আবৃত্ত করা গিয়াছে, তাহারই সাধারণ নাম পুরাবৃত্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মটিকে একটু ঘুরাইয়া লইলে, ইহার অন্য একটি অর্থ পাওয়া যায়; উদ্দেশ্য এক হইলেও এই অর্থ ঠিক মূল ব্যাকরণসঙ্গত হয় না। পুরাবৃত্ত বলিলে এই বুঝিতে হইবে, সংসারের শৈশব অবস্থা হইতে ইহার উন্নতিকাল পর্য্যন্ত, ইহার ভাগ্যচক্র যেরূপ ঘুরিয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত যাহাতে আবৃত্ত করা হইয়াছে তাহাই পুরাবৃত্ত; উভয়েরই এক অর্থ, কিন্তু ইহা নিয়মাতীত অর্থ। এই হিসাবে, জগতের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু পুরাবৃত্তে ও ইতিহাসে বিভিন্নতা আছে, উভয়ে এক জাতীয় হইলেও লিঙ্গভেদ আছে। ইতিহাস কেবল মানবসমাজের চিত্র দেখায়, ইহার সীমা মানবসমাজের চিত্রের সীমায় যাইয়া মিশিলে আর অগ্রে যাইতে সমর্থ হয় না; পুরাবৃত্ত কেবল মানবসমাজের চিত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত হয় না, ইহা চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ এই তিন জগতের প্রকৃতি ও চিত্র ঐতিহাসিক তুলিতে আঁকিয়া দেখাইয়া থাকে। পুরাবৃত্তের যে অংশ মানবসমাজ লইয়া বদ্ধ তাহারই নাম ইতিহাস; যে অংশ উদ্ভিদ জগত অধিকার করিয়াছে, তাহার নাম বটানি; যে অংশ জলস্থলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ তাহার নাম জিয়লজি; জীবতত্ত্বের অংশ বাইয়লজি নামে প্রসিদ্ধ এবং Ethnology ও Ethnography প্রভৃতিও ইহারই অন্যতম অংশ বিশেষ। পুরাবৃত্তের প্রথম ফর্মূলার নাম Evolution, ইহা Physical Geography নামক পুরাবৃত্তের অংশ বিশেষে ইংরাজী পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ফর্মূলা Indestructibility of

* এই প্রস্তাবে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, আমার অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কয়েকটি ইংরাজী বক্তৃতাতে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময়ের ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উদ্ধৃত অংশে এই সকল কথার বোধ হয় ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছেন।—লেখক।

matter অর্থাৎ "পদার্থের পরিবর্ত্তন আছে, বিনাশ নাই।" তৃতীয় অথবা শেষ ফর্ম্যুলা (Formula) এই যে Immateriality of soul অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তৃতি, উন্নতি ও অধঃপতন এবং পুনরুত্থান ইত্যাদি অনাদি কালের আবর্ত্তনে কিরূপে ঘুরিতেছে ঘুরিয়াছে; ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মানব এবং মানবসমাজ কি প্রকার তালে তালে নাচিতেছে, ভাসিতেছে, কখনও ডুবিতেছে, কখনও উঠিতেছে; এই সকল কথা পুরাবৃত্ত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতেছে। এই তিন ফর্ম্যুলা হইতে আরও অনেক শাখা-ফর্ম্যুলা ও উপশাখা-ফর্ম্যুলা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা পরে বুঝাইব। পুরাবৃত্তের সর্ব্বশেষ উপদেশ এই যে, "যাহা আছে তাহার বিনাশ নাই, যাহা ছিল না তাহার জন্ম নাই, যাহা জন্মে নাই তাহা আর জন্মিতে পারে না এবং মৃত্যুই জীবের শেষ অবস্থা নহে।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে, ইঙ্গিতে পুরাবৃত্ত আরও একটা শিক্ষা দিতেছেন, সেই মহাশিক্ষা এই—"যথায় ধর্ম্ম তথায় জয় ও সুখ।" এই উভয় শিক্ষার কথা গীতায় আছে।

এই সকল মহাবিজ্ঞানসিদ্ধ কথার বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা একদিনের কর্ম্ম নহে; ন্যায়শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদিগের ইহাতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িয়াছে; বেদান্তিকেরা এই জন্য দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখনও ইহার কূল কিনারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্যসাধন জন্য পুরাবৃত্তের যে অংশ "ইতিহাস" নামে প্রসিদ্ধ, তাহারই আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইব। মূল ফর্ম্ম্যুলাগুলির বিশ্লেষণ, ইতিহাসের সাহায্যেই করিব, এরূপ মনে করিয়াছি। প্রসঙ্গের বিষয় অতি প্রশস্ত, কিন্তু "ভারতীর" কলেবরে (বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায়) অনতি প্রশস্ত প্রবন্ধই শোভা পায়।

এক্ষণে পুরাবৃত্তের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমরা সত্যের নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিব। পুরাবৃত্তের একটি প্রধান শিক্ষা এই যে, "ক্ষুদ্র হইতে মহৎ হয় অথবা তরল হইতে কঠিন হয়।" ইহাতে বোধ হয় "বীজাদঙ্কুর" ন্যায়ের তর্ক উঠিতে পারে; অনেকে বলিবেন, বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ? বাস্তবিক এই অন্ধকারময় নৈয়ায়িক প্রহেলিকা লইয়া বড়ই তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ না হইলে বীজ হয় না, আবার বীজ না হইলে বৃক্ষ কোথা হইতে হইবে? কিন্তু বীজ হইতেই বৃক্ষ ইহাই মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। "বৃক্ষ না থাকিলে বীজ প্রথমে কোথা হইতে আসিল" এই তর্কের উত্তরে পুরাবৃত্ত বলিতেছে, বীজ অনাদি; যেমন পরমাণু, কাল, আত্মা ইত্যাদি অনাদি। তাহাতেই বলিতেছি, ক্ষুদ্র হইতেই মহৎ, যেমন বীজ হইতে মহীরুহ। নিদাঘের মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের বিশ্বগ্রাসী রৌদ্রে, তৃষিত কণ্ঠে ও অর্দ্ধদগ্ধ কলেবরে, পরিশ্রান্ত হইয়া পথিক যখন অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থ মহরুহের জীবনানন্দদায়িনী ছায়ায় বসিয়া শান্তি লাভ করে, যখন তাহার আকাশ-আবরণী শাখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিপুলবপু তরুবরের পরোপকার স্মরণকরতঃ মনে মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তখন কি সে ভাবিয়া দেখে, এই প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজের ভিত্তি কোথায়? একবার বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বরোচ

নগরের জগৎবিখ্যাত 'কুবের বট দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই অনুপম বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক বসন্তসখার চঞ্চু হইতে একটি অভগ্ন অথচ সুপক্ক অশ্বত্থ ফল ধরাতলে পড়িয়া গেল। দ্বিখণ্ড করিয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্রফলে ৩৮৯টি বীজ রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্রফল ৩৮৯টি কুবের বটের জন্মদাতা! একথা ভাবিলে ও বুঝিলে জগতে "নিরাশা" নামে আর কোনও বস্তু থাকে না। এইরূপে সংসার, মানব এবং মানব সমাজ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; যে প্রকৃতিতে এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, তাহারই নাম Evolution; Evolution একটা Theory নহে, কেননা যাহা কিছু Theoretical তাহাই অনুমান ও খেয়ালসিদ্ধ; Evolution এখন practical জিনিষ, কেননা ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; পুরাবৃত্তের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এই দুই ভাগ ইহার practicalত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মানব সমাজের Evolution, ইতিহাস দেখাইয়া দেয়। এইরূপে ক্ষুদ্র হইতে মহতের সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারউইন Evolution প্রকৃতির নীতিকে Biologyতে অর্থাৎ জীবতত্ত্বে লইয়া গিয়া বানরজাতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহারাই মানবজাতির আদিপুরুষ; কথাটা হাসির কথা হইলে হইতে পারে কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বানর ও নরের প্রকৃতি যাঁহারা দেখিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিয়তই বলিয়া থাকেন বানরই বুঝি বা নর? অনেকে বলেন, Monkey, man কি? জীবতত্ত্বে, উদ্ভিদতত্ত্বে, অধিক কি প্রস্তর ও ধাতুতত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র হইতেই মহৎ; তিলে তিলে বাড়িয়া বাড়িয়া যেমন তিলোত্তমা, বিন্দু বিন্দু বাড়িয়া যেমন জ্যবণমুনির হংসকুণ্ডের জলরাশি, সেইরূপ ক্ষুদ্র বাড়িয়া বাড়িয়া মহৎ হয়; একেবারে বাড়িলে বালুকারাশির উপরিস্থিত সেতুর ন্যায় তাহা টিকেনা; ক্ষণমাত্র স্থায়ী ভূমিকম্পের ন্যায় তাহা কেবল অনিষ্টেরই কারণ হয়। কেহই একেবারে বড় হয় না; Rome was not built in a day, এই প্রবাদ বাক্য বড়ই সমীচিন। বৃদ্ধি ও পরিণতির বীজ ও শক্তি থাকিলে, ক্রমে ক্ষুদ্র মহত্বে পরিণত হইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করে। নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া একবার মহত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিলে, তাহার যদি পতনও হয়, তাহা হইলেও তাহার একেবারে বিনাশ হয় না, পরিবর্ত্তন হয়; সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার মহত্বের বীজ থাকিয়া যায়; স্ফূরণ-শক্তির একটু উদ্ভব হইলেই আবার মহত্বে আসিয়া পৌঁছে। বিনাশ হইলেও বীজ এবং শক্তি থাকিয়া যায়, এই নীতির উপরে নির্ভর করিয়া জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি, এই জন্যই অনেকে "সংস্কার" ও "পূর্ব্বজন্ম" মানেন। যাঁহারা ইহা মানেন না, তাঁহাদিগকেও ইহা প্রকারান্তরে মানিয়া চলিতে হয়। কালিদাস, সেক্সপিয়র, টাসো, সাদি, বেদব্যাস, প্লেটো প্রভৃতি মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি এখনও পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অস্ফুটভাবে লুক্কায়িত আছে; স্ফূরিত হইলে দ্বিতীয় কালিদাস, দ্বিতীয় সাদি, ইত্যাদির উদ্ভব অসম্ভব নয়। কিন্তু এই স্ফূরণ অতি কমই হয়। যাঁহারা একবার মহত্বে অথবা সর্ব্বোচ্চসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের (সাংসারিক ভাবে বলিতে হইলে) পতন হয়; ধর্ম্ম জগতে এই "পতনের" নাম "জীবন্মুক্তি"; যে মানব

কাহার মাতা ? এক মায়াজালের কুহকে মুগ্ধ হইয়া, অসৎকে সৎ, অনিত্যকে নিত্য করিয়া তুলিতেছি। পুরাবৃত্ত হইতে এই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে, পাঠককে মানবজীবনের উচ্চঅঙ্গে লইয়া যায়, এই উচ্চঅঙ্গে গিয়া রাজশ্রী জনক যোগী হইয়াও রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই উচ্চ অঙ্গে যাইলে মনুষ্য সংসারে "পদ্ম পত্রে বারি"র ন্যায় অমিলিত অবস্থায় অবস্থান করে; তৈল ও জল একত্র থাকিলেও যেমন মিশে না, পুরাবৃত্তপাঠক বিবেকী সংসারী হইয়াও, সংসারের মায়ায় মিশে না। এই সংসার 'একটি শূন্য ০ মাত্র; শূন্যের কোনও অর্থ নাই; কিন্তু শূন্যের প্রথমেই যদি ১ অঙ্ক বসাইয়া দাও তাহা হইলে ১০ হয়; এই সংসার শূন্য, এই শূন্যময় অসার সংসারের জীবনে যিনি ১ একমেবদ্বিতীয়ং ঐ একমাত্র মহাপুরুষকে (ভগবানকে) সারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শূন্যময় সংসারে থাকিলেও তাঁহার পক্ষে এই সংসার ১০ দশগুণ সহায় বলিয়া বোধ হয়। পুরাবৃত্তের ভূগোলের আলোচনায় দেখিতেছি, অসংখ্যাসংখ্য প্রাচীন জনপদের নাম নিশানা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, অসংখ্যাসংখ্য নূতন জনপদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমিকম্প, জলকম্প, উল্কাপাত, আগ্নেয় প্রস্রবণ, প্রবলবায়ু, সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতিতে নিয়তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জঙ্গল সহর হইতেছে, সহর জঙ্গল হইয়া গিয়াছে; জল স্থল হইয়া গিয়াছে; স্থল জল হইয়া গিয়াছে; উচ্চ নিম্ন হইতেছে, নিম্ন উচ্চ হইতেছে; সুতরাং পরিবর্ত্তনই সংসারের নিয়ম। এই অসত্য ও অনিত্য সংসারে পরিবর্ত্তনই কেবল সত্য ও নিত্যভাবে দেখা যায়। প্রকৃতির ইহাই বিধি, তবে তুমি কেমন করিয়া এই বিধির বৈপরীত্য করিতে চাহ ? মানবসমাজের উন্নতি ও দৃঢ়তা পরিবর্ত্তনে, ভারতকে উন্নত করিতে হইলে ইহার সমাজের পরিবর্ত্তন আবশ্যক; যে ব্যক্তি এই পরিবর্ত্তনের প্রতিরোধক সে ব্যক্তি দেশের শত্রু। পুরাবৃত্তের এই তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে আমরা পরিবর্ত্তনের আশ্চর্য্য শক্তি ও মহিমা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি।

পুরাবৃত্তের আর একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই যে, যেখানে অত্যাচার ও অনিয়ম সেইখানেই পতন। যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই নূতন শক্তির আবির্ভাব। আওরঙ্গজেব অত্যাচারী না হইলে শিখ ও মহারাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রয়োজন ছিল না; রোমাণ কাথলিকের ধর্ম্মধ্বজতা না বাড়িলে মার্টিন লুথারের আবশ্যকতা ছিল না; বঙ্গদেশ, শাক্ত কর্ত্তৃক পীড়িত না হইলে চৈতন্যের আবির্ভাব হইত না; ইত্যাদি। হিন্দু শাস্ত্রমধ্যে লিখিত আছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

মহম্মদ ও খৃষ্টের ধর্ম্ম তাহাই শিক্ষা দেয়; যেখানে ভক্ষক, সেখানে আশু রক্ষকের আবির্ভাব হয়। যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই রাজার দুর্গতি ও পতন। যে প্রজা, রাজাকে অত্যাচারী হইতে দেয়, সে প্রজা রাজার শত্রুর কার্য্য করে। এই জন্য আমেরিকা স্পেনের

রাজার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়া স্পেনকে উচ্ছন্নাবস্থায় আনয়ন করিয়াছিল এবং এই জন্যই বহুশত প্রাচীন সাম্রাজ্য অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্রোড্ বলেন "অত্যাচারের ফল ফলে, কখন তাহা অদৃশ্য হয় না। একদিন না একদিন এজন্য অত্যাচারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সে যদি তাহা না করে তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার বংশধরদিগকে অথবা সমাজ দেশ কিম্বা সমগ্রজাতিকে এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" সুবিখ্যাত পারস্য লেখক বুলবন লিখিয়াছেন "অত্যাচার করিয়া রাজত্বকে দৃঢ় রাখিয়াছে এমন সমাচার কোনও স্থানেই শুনি নাই। যেখানে অত্যাচার সেইখানেই রাজার দুর্গতি ও পতন।"

পুরাবৃত্তের আর একটি শিক্ষা এই যে, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই উন্নতি ও সুখ। গীতায় আছে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতির্মতি র্মম॥

অর্থাৎ, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ (ধর্ম্ম) এবং ধনুর্ধর পার্থ (উৎসাহ) বর্ত্তমান, সেইখানেই শ্রীবিজয় নীতি সুমতি ইত্যাদি অবস্থান করে। ধর্ম্মহীনতায় শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে জয় বা শ্রী নাই। ধর্ম্মহীন হইলে বুদ্ধিহীন হয়, বুদ্ধিহীন হইলে—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ॥
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥"

এইরূপে দেখা যাইতেছে, পরিবর্ত্তন, ধর্ম্ম, উৎসাহ প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্য আপনার দেশ, সমাজ ও জাতিকে উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। উন্নতির উপায় সমূহ পুরাবৃত্ত আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়।

এক্ষণে এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। স্বীকার করি, ইহাতে অনেক কথা বলিতে বাকী রহিল। "আসিয়ার ভাগ্যচক্র" নামক প্রবন্ধে পরে বাকী কথার মীমাংসা করিব। ভরসা করি, বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ পুরাবৃত্তের আলোচনায় অধিকতর মনোযোগী হইয়া স্বদেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সমাজের উন্নতি কল্পেও বদ্ধপরিকর হইবেন।

দেশ বিদেশ।

যাত্রা।

যে যেথানে দূরে
পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালী সহজে বিদেশে যাইতে চাহে না। শরতের মধুর ছবির সহিত প্রকৃ-
অদূরে থাকে, এই সুখের সময়ে বাড়ীতে আসিয়া জুটে। আনন্দ কোলাহল জাগা-
তির মধুর পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে মিশিয়া, যথন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রবাসীদিগকে দীর্ঘ
ইয়া দেয়—স্বামী-স্ত্রী, ভাই ভগিনী, পিতাপুত্র, যথন অনেকদিনের পর যথন, কত
বিরহের পর গৃহে পাইয়া আনন্দের প্রস্রবণে ডুবিতে থাকেন—বহুকালের হইয়া উঠে, কত
প্রাণের লুক্কায়িত নীরবে পুষ্ট, ছায়াময়ী আশাটী ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া যে
স্নেহ, কত প্রেম, কত প্রীতি, অনেকদিন ধরিয়া অজ্ঞাত ভাবে কত হৃদয়ে সঞ্চিত চারিদিক
সময়ে সহস্রা শতমুখে সহস্র জ্যোতির্ম্ময় ধারায় প্রবাহিত হইয়া স্নেহাধারদিগকে গৃহত্যাগ
হইতে প্লাবিত করিয়া দেয়, সেই সময়ে আমি দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার জন্য
করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমি যাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তাঁহারা আমার পরমাত্মীয়। তাঁহা
দের প্রীতি, যত্নে ও স্নেহে ও সদাপ্রফুল্ল হাসিমাখা মুখ দেখিয়া আমার প্রবাসের কষ্ট নবোদিত
সূর্য্যের ধীর প্রসারিত কিরণমালার মুখে ঘনচ্ছাদিত, পর্ব্বত সানুদেশবেষ্টিত প্রভাতী কুয়াসার
ন্যায় কে জানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এত দূরে সুদূরপ্রসারিত পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত—
এই বহুজনপূর্ণ নগরীর মধ্যে এক নিভৃত কোণে, স্নেহ ভালবাসা সহৃদয়তার পাত্র পরিপূর্ণ
করিয়া এ অধমের জন্য এতগুলি লোক যে হাসিমাখা মুখে দাঁড়াইয়াছিল তাহা ত আগে
জানিতাম না।

দেশ ছাড়িয়া হৃদয়ের যে অংশ শূন্য করিয়া আসিয়াছি—এখানে সেই শূন্য অংশ অযাচিত-
স্নেহে শতগুণে পরিপূরিত হইয়াছে। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দূর প্রদেশে নূতন পরিজনবর্গের নবো-
চ্ছাসিত বৈচিত্র্যপূর্ণ স্নেহ-তরঙ্গের ধীর নিমজ্জনের সুখের সহিত, দেশের সেই চির-অভ্যস্ত,
চির-পরিচিত চির-প্রবীণ, আজীবন-পুষ্ট অতীত সুখের স্মৃতির সহিত মিশাইলে কি যে এক
অপূর্ব্ব সুখ সংযোগ হয় তাহা ঠিক্ ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিতে পারিবে না।

বন্ধুগণকে অশ্রুপূর্ণ আলিঙ্গনের সহিত বিদায় দিয়া আমি ত হৃদয়ের ভার লইয়া গাড়িতে
উঠিয়া বসিলাম। ক্রমশঃ দুরাপসৃত ষ্টেসনস্থ আলোকমালার সহিত তাঁহাদের মুখ আর দেখা
গেল না, তখন নিরুপায় হইয়া কাজেই নিভৃত চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম।

উপরে শয্যা বিছাইয়া নিদ্রার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিলাম। ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া
সেই ধাবমান কক্ষের ইতস্ততঃ বিকীর্ণ প্রদীপ্ত গ্যাসালোকে চক্ষু বুজিলাম। গাড়ি দেখিতে
দেখিতে হুস্ হুস্ শব্দে হুগলী ছাড়াইল।

হুগলী হইতে আমার অধিকৃত কক্ষে একটী পরিচিত মুখ প্রবেশ করিয়াছিল। লোকটী দক্ষিণপ্রদেশী মারহাট্টা, অনুমানেই বুঝিলাম। তিনি নিজের জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া আমার ন্যায় উপরের শয্যা দখল করিলেন।

সর্ব্ব প্রথমেই তিনি আমার গন্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া আলাপের পথ উন্মুক্ত করিলেন। আদব কায়দা—Introduction এর কেতা কিছুই নাই—কেবল সহজভাবে সরল কথায় দুই চারিবার বাক্যালাপের পরই তাঁহার সহিত আমার বেশ বনিয়া গেল। আমি তাঁহাকে মারহাট্টী বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—তাহাই ঠিক। তিনি জুনাগড়ে থাকেন, প্রায় সাত বৎসরের পর বাড়ী ফিরিতেছেন।

লোকটী বড় সুন্দর প্রকৃতির। সামান্য বাক্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা দেখা দিল। ইংরাজি ও সংস্কৃত জানেন, বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন—বলিতে পারেন না। বয়স ৩৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ নয়। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কলিকাতায় খুল্লতাতের নিকট ব্যবসা ব্যপদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "মহাশয়! আমি ৫০০ শত টাকা পৈত্রিক পুঁজি লইয়া একক ব্যবসা আরম্ভ করি। খুড়া মহাশয় আমাকে কেবল ব্যবসার উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়াছিলেন, কিন্তু মূলধন এক কপর্দ্দকও দেন নাই। আমি আজ ৮ বৎসর কারবার করিতেছি, সমস্ত খরচখরচা বাদে এই কয়বৎসরে, প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি।" আমি এই চাকরীগত-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে আজন্ম পরিপুষ্ট হইয়াও মনে মনে এই নবীন যুবকের আত্ম-নির্ভরতা ও উদ্যমশীলতার শত শত প্রশংসা করিলাম।

গাড়ী আসানসোল ছাড়াইলে আমি মুড়ি দিয়া শুইলাম। অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে, কিন্তু সহসা কি এক, সুন্দর তানলয়পূর্ণ স্বরলহরীতে আমার সেই নবাগত তন্দ্রা শীঘ্রই চঞ্চল হইয়া উঠিল। দেখিলাম অতি মধুর স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণের সহিত কে সেই গভীর রাত্রে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

জুনাগড়ী মহাশয়, সেই গভীর রাত্রে গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্লোকের পর শ্লোক-গুলি স্পষ্ট, বিশ্রুত, ও প্রকৃতভাবে উচ্চারণ করিয়া—মুণ্ডিত, শীর্ষ-শোভিত, উষ্ণীষ-বিরহিত মস্তকটী নাড়িয়া নাড়িয়া চিরাভ্যস্তভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পঠনভঙ্গী, একাগ্রতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

মধ্যরাত্রে গীতাপাঠ শেষ হইলে জয়দেবের দশাবতারের স্তোত্রটী সুরের সহিত গান করিয়া ক্ষণকালের জন্য সুরের তরঙ্গে কোমল কলকণ্ঠ-নিনাদে সেই নির্জ্জনকক্ষে অমৃতউৎস সৃজন করিয়া জুনাগড়ী মহাশয় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এটি তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। এই কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে, তিনি নিয়মিতরূপে প্রতিদিন রাত্রেই একবার করিয়া গীতা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

রাত্রি গভীর ও নিস্তব্ধ। উপরে স্থিরজ্যোতিঃ নক্ষত্রপূর্ণ নীলাকাশ, তাহার নীচে দুস্তর প্রান্তর, ও সূচীভেদ্য অন্ধকার। কেবলমাত্র এঞ্জিনের দ্রুতগমনজাত দীর্ঘশ্বাস ও কর্ণবিদারী

সঙ্কেতধ্বনি সেই গম্ভীর মৃতবৎ নিস্তব্ধতা ক্ষণেকের জন্য বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে। বেশ শীতল হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি একটু চক্ষু বুজিলাম। নিদ্রাও তখনি কৃপা করিয়া সকল চিন্তা ডুবাইয়া দিল।

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ডাক মোকামায় পৌঁছিল। রাত্রে ভাল নিদ্রা না হওয়াতে ও অভ্যাসগুণে, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিলাম। ক্রমে ক্রমে সমস্ত সুষুপ্ত-প্রকৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। নিদ্রিতা প্রকৃতি মধুর প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালায় স্নাত ও পরিসিক্ত হইয়া বালার্ককরোচ্ছ্বাসিত তৃণশষ্পময় শ্যামল আবরণ দ্বাদশ ঘণ্টার জন্য লোক-লোচনের প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিল।

জুনাগড়ী মহাশয় তখনও নাক ডাকাইয়া বেশ নিদ্রা দিতেছেন। একবার মনে হইল তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া প্রকৃতির এই সুন্দর শোভা দেখাই, এই বিমল আনন্দ-উপভোগের অযাচিত অংশ প্রদান করি, কিন্তু একটু ভাবিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

প্রাতরাশের আয়োজন ক্রমে শেষ করিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল। সময় ও রেলগাড়ী কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, কত যাত্রী উঠাইয়া নাবাইয়া গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিল।

মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী এলাহাবাদের দিকে ছুটিল। মধ্যাহ্ন-আলোকে পরিস্ফুট, সেই দুইদিকে প্রসারিত প্রান্তরের মধ্যে ক্রমে একদিকে বিন্ধ্যগিরির শ্যাম কলেবর, ও অপরদিকে আরঙ্গীবের কীর্ত্তিকলঙ্ক বহুদূরদৃষ্ট স্মৃতিময়ী মিনারের উচ্চ স্তম্ভগুলি দেখিয়া বুঝিলাম বেনারস ছাড়াইয়া গেলাম। তার পর মাঠের সেই শূন্যবিস্তৃতির মধ্যে চুনারের প্রস্তর দুর্গ নয়নপথে পতিত হইল। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদের পথে, অমন সুন্দরস্থানে অমন একটী দুর্গ আর কোথাও নাই।

চুনার ইংরাজ-প্রদত্ত নাম। সেই নামই এখন চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দুনাম "চরনাদ্রি গড়" "চণ্ডালগড়"। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর একটী শাখা, গঙ্গার গর্ভে বরাবর নামিয়া গিয়াছে। এই মনোহর স্থানে চুনারের প্রস্তরময়ী দুর্গ আজও অতীত কীর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুর্গের পরিধি দেড় মাইলের উপর। বাড়ীঘরগুলির অধিকাংশই আধুনিক, কিন্তু, তত্রাচ ইহাতে ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ অনেক প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী বলে—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ সহোদর "বৈরাগ্যশতক" প্রণেতা রাজর্ষি ভর্ত্তৃহরি এই স্থানে নির্জ্জন যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। আরও শোনা যায়—চৌহান কুলচূড়ামণি, হিন্দুর শেষ সূর্য্যস্বরূপ পৃথ্বীরাজও এই স্থান দখল করিয়া কিছুদিন বসবাস করেন। তারপর ইহা পাঠান বাদশাহ সের খাঁর হস্তগত হয়।

সেরখাঁর হাত হইতে হুমায়ুন এই দুর্গ কাড়িয়া লন। ১৫৭৫ অব্দে আকবরসাহ পুনরায় এই দুর্গে নিজ পতাকা উড্ডীন করেন। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইহা অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদতআলির হাতে পড়ে। সাদতআলির বংশধরদিগের নিকট হইতে

কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ কিছুদিনের জন্য এই দুর্গ কাড়িয়া লন। তারপর চেৎসিংহের সর্ব্বনাশের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহাতে অধিকার স্থাপন করেন। এইখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। আজও দুর্গের উচ্চস্তরে তাঁহার ব্যবহৃত সুধাধবলিত বাটীটি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চুনারের অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ "দুর্গাকুণ্ড"। তাহার পর "কামাক্ষী" দেবীর মন্দির। এই সকল স্থানে চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের কয়েকখানি প্রস্তরলিপি সংগৃহীত হইয়া লক্ষ্ণৌএর যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। দুর্গাকুণ্ডে পূজার সময়ে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। চুনারের বালুকাপ্রস্তরের অনেক শিল্পদ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি মির্জ্জাপুর ছাড়াইল। মির্জ্জাপুর গঙ্গার ধারে অতি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। সহরটী নিতান্ত ছোট নয়। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীঘর সবই পাথরের। কাণপুরের সহিত প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে এ প্রদেশে মির্জ্জাপুর তুলা, গম, চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান ছিল। এক্ষণ কাণপুর অনেকটা বাণিজ্যপ্রাধান্যতা মির্জ্জাপুরের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। অদূর হইতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের লোহিত পতাকা বায়ুভরে শূন্যে উড়িতেছে দেখিতে পাইলাম। নৈনি ছাড়াইয়া প্রায় বেলা তিনটার সময় গাড়ী এলাহাবাদ পৌঁছিল। কিছুক্ষণ আগে ষ্টেশনটী প্রায় জনশূন্য ছিল, কিন্তু গাড়ী আসিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই এক রুদ্ধ নগরীর জনতার দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে ষ্টেশন একটী প্রশস্ত রাজপথের জনতায় পূর্ণ হইল। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহে না, চাকর খুঁজিতে, কুলি ডাকিতে, লগেজ নামাইতে বন্ধুবান্ধবকে অন্বেষণ করিতে, সকলেরই মুখে এক বিষম উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। ক্ষণকালের জন্য সেই ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর একটা বিরাট ব্যস্ততার ছায়া পড়িয়াছে।

এই সময়ে আমি মারহাট্টী বন্ধুটীর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি অতি দুঃখিত মনে আমায় বিদায় দিলেন। অত অল্পকালের আলাপ যে বিদায়কালে উভয়েরই মুখে একটা মলিনতা ও বিশুষ্ক ভাবের ছায়া আনিয়া দিতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। বন্ধুটী প্রয়াগসঙ্গম দেখিবেন এই উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে নামিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বোম্বে প্লাটফরমের দিকে চলিলাম।

সুখের বিষয় বোম্বের গাড়ীতে ভিড় কম। আমার কামরায় কেহই উঠিল না। দেখিতে দেখিতে দিল্লীর গাড়ী বাঁশী দিয়া ধূমরাশিফুৎকারের সহিত গম্ভীরভাবে সদর্পে সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে সেই বিরাট জনতার যবনিকাপাত হইল।

খানিক পরে জব্বলপুর মেল ছাড়িল। বোম্বে, পুনা ও মধ্য প্রদেশ যাত্রীরা এই গাড়ীতে। জব্বলপুর মেল সকল মাটী মাড়াইয়া চলে। গাড়ীগুলি একই কোম্পানীর হইলেও এগুলির বন্দোবস্ত তত ভাল বোধ হইল না। গাড়ী আসিয়া নৈনিতে পৌঁছিলে একটী হিন্দুস্থানী যুবক আমাদের গাড়ীতে ঢুকিলেন। ইনি মাণিকপুরে ওকালতী করেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন গ্রাডুয়েট। লোকটী গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও বেশ সামাজিক। বাঙ্গলাদেশ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। লোক-জন, পথঘাট, ঘরবাড়ী, লাটপ্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বাঙ্গালীসমাজ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে উত্তরগুলি শুনিয়া কলিকাতা সম্বন্ধে তাঁহার একটা উৎকৃষ্ট ধারণা হইল, কিন্তু তিনি কলিকাতা না দেখিয়াই বোম্বেকে প্রাকৃতিক সমাবেশ অনুসারে প্রাধান্য প্রদান করিলেন। তাঁহার এ প্রকার সহজ সিদ্ধান্ত কতদূর ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না।

বারগড় হইতে বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণী দেখা দিল। এই পর্ব্বতমালা এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া মধ্যপ্রদেশে ও মধ্যভারতবর্ষে সাতপুরা শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার রেলপথ বাঁকাচোরা, একদিকে পাহাড় অপরদিকে তরুলতা ও শস্যবিহীন বৃহৎ মাঠ, ইহাদের মধ্যে দিয়া অজাগরগতিতে বাঁকিয়া ঘুরিয়া গাড়ী চলিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যের অস্তগমন বড়ই মনোরমদৃশ্য। কাশ্মীরের পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চি-মাদ্রি, হিমালয়ের উচ্চশিখরে কখন সূর্য্যাস্ত দর্শন করি নাই, তাহার সৌন্দর্য্যই বা কি কল্প-নায় আনিতে পারি না, কিন্তু এখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে পথের সমস্ত কষ্ট ভুলিলাম। শ্যামল তরুলতাবেষ্টিত, গগনস্পর্শী দূরপ্রসারিত গিরিরাজির শিরদেশে রক্তিম কিরণছটা বিকীরণ করিয়া মরীচিমালী ধীরে ধীরে নীচে ডুবিতেছেন—সে দৃশ্য বড়ই প্রাণস্পর্শী। সমস্ত জগৎ যেন তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই মঙ্গলময়ের সান্ধ্য আরতির জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

গাড়ী মাণিকপুরে আসিল। হিন্দুস্থানী প্লীডারটী নামিয়া গেলেন। মাণিকপুর ইণ্ডিয়ান মিড্‌ল্যাণ্ড ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের সংযোগস্থলে। চিত্রকূটের যাত্রীরা এখান হইতে নামিয়া যান। এই পথেই ঝাঁসি যাওয়া যায়। বর্ত্তমান মাণিকপুর নগরটী প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত। অনেক প্রাচীন ভগ্নপ্রাসাদের কারুকার্য্যের চরমোৎকর্ষ-পরিচয়, ভারত-শিল্পীর শিল্প-কৌশলের পূর্ণ নিদর্শন, কালপরিবর্ত্তনে বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবার কতকগুলি বা বহুদূরে নীত হইয়া অনেক অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে। লক্ষ্ণৌএর ইমাম-বাড়ায়, আমি প্রাচীন মাণিকপুর হইতে আনীত গ্রথিত প্রস্তরের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত প্রশংসাই করিয়াছি।

মাণিকপুর অজয়গড়ের হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী ছিল। খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই রাজবংশ, মহা প্রতাপে এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আজ কালবশে, কোথায় বা তাঁহারা—আর তাঁহাদের গৌরবকীর্ত্তি! কোথায় বা জৈৎপুররাজ বীর গামন-সিংহ আর কোথায় তাঁহার ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদ ও স্মরণস্তম্ভ! ক্ষীণপ্রবাহিনী কেইন নদী, বিশীর্ণা গতিতে কালের অতীত ইতিহাস কুক্ষিগত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর তাহার অপর পারে, ভূরাজগড়ের প্রস্তরদুর্গ আজও ইংরাজের গোলাগুলি খাইয়া অতীত স্মৃতিচিহ্ন লইয়া মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

মাণিকপুরের তিনটী ষ্টেশন পরে সট্‌না। যখন সট্‌নায় পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা। বাহাদুরী করিয়া গরম কাপড়গুলি ট্রাঙ্কের মধ্যে পূরিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া হার মানিয়া সেগুলি বাহির করিতে হইল। পাহাড়ে শীত এখানে হাড়ে হাড়ে বসিতেছে—একপাত্র চা'র বড়ই প্রয়োজন বোধ করিলাম। চা খাইয়া শরীরটা যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইল, গাড়ী অনেকক্ষণ থামিবে দেখিয়া ও ক্ষুধার উদ্রেক অনুভব করিয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাও সারিয়া লইয়া আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয্যাদখল করিলাম। শেষ ঘণ্টা দিল, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে—এমন সময়ে জনৈক মিলিটারী সস্ত্রীক গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে নেটিভ আছে জানিতে পারিলে সাহেব এ নিগ্রহ ভোগে রাজি হইতেন কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিলেও বর্ত্তমানে গাড়ী ছাড়িবার মুখে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কক্ষ পাইয়া তিনি যে সুখী হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। একটী গ্লাডষ্টোন ব্যাগের উপর বড় বড় অক্ষরে "F. G. Lister Capt. Bo. Inf." এই দেখিয়া সাহেবের নামটী বিনা বাক্যালাপেই জানিয়া লইলাম।

সাহেব চুরুট ধরাইলেন, লেডি-পার্শ্বে গিয়া বেঞ্চের বিস্তীর্ণ শয্যায় কোমল দেহভার ন্যস্ত করিলেন। দুইজনের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথাবার্ত্তা ও মাঝে মাঝে হাস্যের তুফানও উঠিতে লাগিল। মেম সাহেব তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার কথা অনেক বলিলেন। তিনি সহায়তা না করিলে তাঁহার প্রিয়তম "ফ্রেড্" আজ নিশ্চয়ই গাড়ী ফেল হইতেন এ গর্ব্বটাই তাঁহার কথোপকথনের সর্ব্বত্রেই ব্যাপ্ত। রাত্রি বাড়িতেছে দেখিয়া সাহেব জিনিসপত্র সরা-ইয়া সেই বেঞ্চের উপর নিজের জন্য শয্যা বিছাইলেন; তাঁহার প্রিয়তমা Maryকে শয়নের জন্য অনুরোধ করিয়া নিজে আর একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া শিস্ দিতে দিতে "Auld Auld Scottie fawn" বলিয়া গান ধরিলেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিদ্রাদানই শেষ সিদ্ধান্ত করিলাম।

সট্‌না চলিয়া গেল। এখানে নামিবার ইচ্ছা ছিল। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ সট্‌নার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেবের উল্লিখিত বিখ্যাত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি "ভারতস্তূপ" সট্‌না হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে। আমাদের কলিকাতার বন্ধুগণ হয়ত স্থানীয় যাদুঘরের ডানদিকের প্রথম ঘরটিতেই এখানকার এক প্রাচীন বৌদ্ধমঠের বহুদূরপ্রসারিত লোহিতপ্রস্তরনির্ম্মিত তোরণদ্বার দেখিয়াছেন। প্রাচীনত্ব ছাড়া সট্‌নার গৌরবের আর কিছুই নাই। বিত্তমানকালে ইহা একটী স্বাস্থ্যকর মিলিটরি ষ্টেশন।

জব্বলপুরের আগের ষ্টেশন "দিউরী"। "দিউরী" পর্য্যন্ত বেশ ঘুমাইলাম। "দিউরী" ছাড়িল, জব্বলপুরে পৌঁছিবার বেশী বিলম্ব নাই। আমি মালপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইলাম। উপর হইতে সমস্ত প্যাক করিয়া নীচে নামাইয়া সাহেবের এক পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। মেম্ সাহেব বেশ কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা দিতেছেন, সাহেব জাগিয়া আছেন। আমার প্রস্থানোদ্যোগ

সাহেব আগেই ঈষৎ, অপাঙ্গে দেখিতেছিলেন এখন সহৃদয়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "Babu ! is this your destination" আমি হাঁ বলিয়া একটী ধন্যবাদ ছাড়িয়া চুপ করিলাম। তাঁহার সেই শ্বেতবর্ণ মুখের রক্তপুষ্ট ওষ্ঠাধর দুইটি কেবল এই কয়েকটী কথা কহিয়াই আবার পূর্ব্বমৌন অবলম্বন করিল। প্রতিজিজ্ঞাসায় জানিলাম সাহেব বোম্বাইযাত্রী।

জব্বলপুরের ভূতপূর্ব্ব Extra Assistant. কমিশনার বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই আমাদের জব্বলপুরের অবস্থান নির্দ্দেশ হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য বুদ্ধির দোষে সব বন্দোবস্ত ঠিক্ থাকিলেও বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। হাবড়া হইতে একখানি তার করিবার ইচ্ছা হইলেও ব্যস্ততার জন্য তখন তাহা করি নাই। তবু জব্বলপুরে পৌঁছিয়া ষ্টেশনের চারিদিকে একবার দেখিয়া লইলাম। কোন বাঙ্গালীর মুখই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমার আত্মীয়েরা জ্যোতিষজ্ঞ হইলে নিশ্চয়ই প্লাট্ফরমে পরিচিত মুখ দেখিতে পাইতাম।

যাই হ'ক তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। তত রাত্রে সুষুপ্তিকাতর অপরিচিত নিদ্রিত নগরীর মধ্যে গিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী অন্বেষণ করার কষ্টভোগ অপেক্ষা, ষ্টেশনের বিশ্রামগৃহে রাত্রি কাটানই যুক্তিসঙ্গত ভাবিলাম। আর এক পাত্র চা উদরস্থ করিয়া সেই বিশ্রামকক্ষের বেত্রময় কাষ্ঠাসনের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া সুদূরস্থিত শস্যশ্যামল বাঙ্গলাদেশ ও দুরন্ত শীতপূর্ণ পাহাড়বেষ্টিত প্রবাস-পথ এই দুইএর চিন্তা একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলাম।

প্রভাত হইলে ভৃত্য আসিয়া জাগাইয়া দিল। দ্বারে গাড়ী প্রস্তুত। বেচারি কোম্পানীর নিমক্ভোজী হইয়াও পুরস্কারের আশায় আমার অর্দ্ধেক কার্য্য সারিয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বস্থ কক্ষে গিয়া মুখ হাত ধুইলাম। তার পর যখন গাড়ীতে উঠিয়া সহরের মধ্যে চলিলাম, তখনও পূর্ব্ব-গগণ বালার্কের মধুর ছটায় সম্পূর্ণ রক্তরঞ্জিত হয় নাই, তখনও পাখীরা গাছের ডালে বসিয়া প্রভাতীর গান বন্ধ করে নাই, তখন সবেমাত্র নিদ্রিত নগরী সমস্ত রাত্রের পর সজীবতায় ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। এত প্রভাতে—হৃদয়পোরা সুখস্মৃতি লইয়া, অপরিচিত রাজপথের উপর দিয়া কচিৎ দুই একটী প্রভাত-সমীরসেবী পান্থের বক্রদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, প্রবাস-আশ্রয়ে যাওয়ার যে কি একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, তাহা তখনই কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

জব্বলপুর।

তত প্রভাতে গিয়া সদর দরজায় ঘন ঘন আঘাত করাতে ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক অপরিচিত পুরুষকে এইরূপ অসময়ে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। এমন সময়ে শ্রীমান সুরেন্দ্রকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে সহসা, সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন! দীর্ঘ যাত্রা ও ক্লান্তির সহচর কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া আমি পরিজনমহলে সংক্রামকরূপে পরিব্যাপ্ত অস্ফুট আনন্দের অংশলাভ করিলাম।

প্রথমদিন বিশ্রামেই কাটিল। দ্বিতীয়দিনে সহরটী ঘুরিয়া আসিলাম। তৃতীয়দিনে "ভৃগুক্ষেত্র" গমনের আয়োজন স্থির হইল। ভৃগুক্ষেত্রে যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে কখন দেখি নাই, সেগুলি বলিবার পূর্ব্বে তোমায় সহরের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিব।

জব্বলপুর আধুনিকতায় পরিপূর্ণ। প্রাচীনত্বের অতি অল্প নিদর্শনই ইহাতে আছে। চারিদিকে প্রকৃতি প্রস্তরময় প্রাচীর দিয়া এই ক্ষুদ্র নগরীটিকে বেষ্টন করিয়াছেন। নিজ সহরের যে দিকের বাহিরেই যাওয়া যায়, সেই দিকেই পাহাড়। সহরের বাহিরে ছাউনী—এদিকে আগাগোড়াই পাহাড়। সহরের পশ্চিমে একসময়ে প্রাচীন ঐশ্বর্য্যাদিপূর্ণ, বর্ত্তমানে সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত "গড়া" গ্রাম। এই গড়াই দুর্গাবতীর গড়মণ্ডলের এক অংশ। যখন গড়মণ্ডলের বৃত্তান্ত বলিব, তখন এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানাইব।

সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানে মধ্যপ্রদেশের সিবিলবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটী উচ্চ আদালত আছে, অনেক মাজিষ্ট্রেট, তশীলদার ও আসিণ্টাণ্ট কমিশনার এখানে কাছারি করেন। জব্বলপুর Non-Regulated Provinceএর সীমাভুক্ত, মধ্যপ্রদেশের চিফ্-কমিশনার সাহেবের অধীন। পশ্চিমের ছোটলাট ম্যাক্ডনেল সাহেব ও আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর ম্যাকেঞ্জি সাহেব জব্বলপুর সহরের অনেক উন্নতি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। রাস্তাঘাট প্রশস্ত না হইলেও পরিষ্কার। অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুই অধিক। মুসলমানও যথেষ্ট। এ ছাড়া পাহাড়ী জাতির এক অংশ ক্রমশঃ সংঘর্ষণে সভ্য হইয়া সহরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী তা নয়। প্রায় ৬০।৭০ ঘর বাঙ্গালী এখানে কার্য্য ব্যপদেশে অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে আবার দুইচারিজন এখানে বাড়ীঘর করিয়া বসবাস করিতেছেন। বাবু নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের মধ্যে একজন। তিনি এই প্রদেশের কমিশনার ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার দবদবায় জব্বলপুর প্রদেশ থরহরি কাঁপিয়াছিল। বাঙ্গালী হইয়া অত স্বাধীন প্রকৃতির সহিত চাকরি করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে।

দেখিবার উপযুক্ত বড় বড় বাড়ীঘর জব্বলপুরে কিছুই নাই। হাইকোর্ট, ও সরকারী হাঁসপাতাল, ও রাজা গোকুল দাসের বাড়ী এখানকার দর্শনীয় বস্তু। জব্বলপুরে বাণিজ্য ব্যবসা খুব উচ্চ স্রোতে চলিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র নগরী হইতে প্রায় দেড় কোটী টাকার উপর মাল আমদানী রপ্তানীতে চালান হইয়া থাকে। দেশীয় ব্যবসাদারদের মধ্যে রাজা গোকুল দাস সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার কাপড়ের কলটী আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আমাদের বাঙ্গলার ধনকুবেরেরা কবে এই পথের অবলম্বী হইবেন?

ঠগীজেল ও শিল্পবিদ্যালয় (School of Industry) এখানকার প্রধান দর্শনীয় বস্তু। কর্ণেল হিউজ্ হ্যালেট্ সাহেবের আমলে ঠগীজেলের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। "ঠগ" কথাটা শুনিলে আজও মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই গুপ্ত নরঘাতক সম্প্রদায়, মধ্যপ্রদেশের মধ্যেই কিছু অধিক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত কর্ণেল শ্লিমান ঠগী ব্যাপারের চূড়ান্ত অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলা দুরন্ত ঠগকে এই জেলের ভিতর বন্দী

করেন। তাহাদেরই সন্তান সন্ততিরা এখন এই জেলের মধ্যে বাস করিতেছে। এখনও প্রায় তিন শত বা ততোধিক ঠগ-সন্তান এই জেলের ভিতর চিরআবদ্ধ থাকিয়া তাঁবু ও কার্পেট-নির্ম্মাণ শিল্পে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আজও সাহস করিয়া তাহাদের বাহিরে ছাড়িয়া দিতে রাজি নন। ভয়—পাছে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিততৃষ্ণা বাহ্য-জগতের সহিত সংমিশ্রণে আবার জাগিয়া উঠে!

জব্বলপুরের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বাঙ্গালীসমাজ এই দূরদেশে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও বিদেশে বসিয়া শারদীয়া পূজার পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। অন্যান্যবার পূজার সময়, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শহজাঁহাপুর, কানপুর, আগরা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে কাটাইয়াছি। কিন্তু এখানে বাঙ্গালীরা দুর্গাপূজা লইয়া যেরূপ মাতিয়া উঠেন, আর কোথাও সেরূপ অনুপ্রাণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন দিন মহাসমারোহে উৎসব হইয়া থাকে। বেনারস হইতে পুরোহিত ও কারিগর আসিয়া প্রতিমার গঠন ও পূজার কার্য্যে ব্রতী হয়।

এবার পূজার প্রথমদিনে আমরা নাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। নাচের সভা ভারী গরম। সহরের ইংরাজ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বড় বড় লোকে সে স্থান পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী কমিশনার, সিবিল জজ হইতে কালেজের প্রোফেসরে সে স্থান পরিপূর্ণ। কমিশনার সাহেব, তাঁহার সহকারী পুলিশ সাহেব, সিবিল সার্জ্জন, কালেজের প্রিন্সিপাল সাহেব ও অনেক মিলিটারী সাহেবে সেই "নাচ-মণ্ডপ" পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলকেই পশ্চিমের প্রথামত "পুষ্পগুচ্ছ," "আতর" দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। অনেক উচ্চ পদস্থ ইউরোপীয় মহিলাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় ইংরাজবাঙ্গালীর এরূপভাবে সম্মিলন অতি অল্পই দেখা যায়। এ মিলনটা সামাজিকতার উপর। এত অন্তরঙ্গভাবে মেশামেশি উভয় সমাজেরই মঙ্গলকর। যে দ্বেষাদ্বেষী আজকাল চলিতেছে তাহাতে ইহা অতি দুর্ল্লভ দর্শন। এ প্রকার সম্মিলনে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক।

পরদিন প্রাতেই "পঞ্চবটী" পাহাড়ে উঠিবার কথা স্থির হইল। রাত্রেই টাঙ্গাওয়ালাকে ডাকাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। যে কয় ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সুখস্বপ্নেই রজনী ভোর হইল। সূর্য্য উঠিলেই, প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির ক্রোড়ে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিবে ইহা অপেক্ষা সুখের কল্পনা আর কি হইতে পারে?

পঞ্চবটী পাহাড়।

টাঙ্গাওয়ালা রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। আমরা সেই ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতকৃত্য সমাপন করিয়া লইলাম। আবশ্যকমত বস্ত্রাদি ও খাদ্য দ্রব্য লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। প্রায় আট ক্রোশ রাস্তা চলাফেরা করিতে হইবে, কাজেই এত সতর্কতা—এত আয়োজন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ধীর প্রখর গতিতে নাচিতে নাচিতে অশ্বরাজ আমাদের বহিয়া লইয়া চলিল। শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকুমার আমাদের পথপ্রদর্শক। ভবিষ্যৎ-দৃশ্যের সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা "মদনমহল" পাহাড় ছাড়াইয়া "পিস্‌-নারি পাহাড়ে"র কোলে উপনীত হইলাম। সহর হইতে রাস্তাটী বরাবর পশ্চিমমুখে গড়া-গ্রামের মধ্য দিয়া মিরগঞ্জের পাশ দিয়া পাহাড়ে পৌঁছিয়াছে। আমরা কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত অকর্ষিত ক্ষেত্র ছাড়াইলাম। গাছের উপর নানাবিধ ফল ফুল, দুই পার্শ্বে ছায়ার ক্রোড়ে শাখাবহুল বিশাল বিটপীরাজি—তাহার উপর দলে দলে বানর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

সহর হইতে পাহাড়ে যাইবার দুইটী রাস্তা আছে। এক বরাবর টাঙ্গা করিয়া সরকারী সড়কের উপর দিয়া, অপরটী রেলযোগে "মিরগঞ্জ" ষ্টেশনে নামিয়া। আমরা প্রথমোক্তটীই পছন্দ করিলাম। প্রায় ৫।৭ মাইল আসিবার পর রাস্তা উচু নীচু বোধ হইতে লাগিল। আমা-দের বামদিকে গগনস্পর্শী শ্যামল তরুলতাচ্ছাদিত বড় বড় গ্রানিট-স্তূপপূর্ণ বিস্তৃত পাহাড় ও ডানদিকে জোয়ার, বজ্‌রা, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র। আট ঘটিকার সময় আমরা "পঞ্চবটী"র কাছে পৌঁছিলাম। এই সময়ে চড়াই, ওতরাই বড় বেশী বলিয়া বোধ হইল।

ক্রমশঃ গন্তব্য স্থানের যত নিকট যাইতে লাগিলাম ততই দেখা গেল—দুই দিকে পাহাড় ভেদ করিয়া সরকারী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য সরকার বহুব্যয়ে এই সড়ক নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শেষ আমরা নর্ম্মদার দূরশ্রুত স্রোতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কুল-কুল কুল! মরি কি মধুর ধ্বনি! পর্ব্বতবক্ষ প্রবাহিনী মন্থর-গতিশীলা স্থির-তরঙ্গময়ী প্রসন্নসলিলা নর্ম্মদা যেন এ দীন সন্তানগণের স্নেহময় অভ্যর্থনার জন্য মৃদুধ্বনি করিতেছেন। গাড়ি আর চলিল না। কারণ পথ শেষ হইয়াছে। পথের প্রথম অবস্থায় তাহাকে অনন্তের দীর্ঘতা দিয়াছিলাম। এক্ষণে অনন্তকে সানন্ত হইতে দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইতে হইল। যাই হ'ক আমরা রাজা গোকুল দাসের ধর্ম্মশালার নিম্ন দিয়া ক্রমশঃ নদীগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

কেবল বালুকারাশি! কেবল জলস্রোত! বিধৌত তরঙ্গভঙ্গ-প্রহত নানাবর্ণের উপলখণ্ড—উপলপূর্ণ নদীসৈকতে অবতরণকালে প্রতিপদে পদস্খলন হইতে লাগিল, কখনও বা জুতা ও মোজার মধ্যে রাশি রাশি বালি ঢুকিতে লাগিল, কখন বা পদদ্বয় বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রতি পদক্ষেপে নূতন শক্তি, প্রতি আবর্ত্তনে নূতন উৎসাহ, প্রতি পদস্খলনে অদম্য দৃঢ়তা। আমাদের মনে তখন কেবল—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই"

এই কথা কয়েকটী জাগিয়া উঠিতে লাগিল। যে স্থানটীতে আমরা উপস্থিত হইলাম, তাহার অদূরেই নর্ম্মদাসঙ্গম। এক দিক দিয়া নর্ম্মদা বহিয়া যাইতেছে ও অপরদিকে "বানগঙ্গা" ও "সরস্বতী" নামক দুইটী নদী নর্ম্মদার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল নর্ম্মদাক্ষেত্রে পবিত্র তীর্থ। প্রয়াগসঙ্গমের নিম্নেই ইহার স্থান। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে যখন নদীর জল

সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন এই পাহাড়ের সানুদেশে ক্ষুদ্র প্রান্তর-মধ্যে এক বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময়ে যাত্রীদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য সরকারী খরচে এক অল্পদিনস্থায়ী প্রস্তর-সেতু নির্ম্মিত হয়।

বানগঙ্গা ও সরস্বতীর গর্ভ অনেক স্থলেই শুষ্ক দেখিলাম। কেবল স্রোত-বিতাড়িত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ও স্তূপাকার আর্দ্র বালুকায় নদীর গর্ভ পরিপূর্ণ। কোথাও বা ক্ষুদ্র গিরিনদীর স্বচ্ছসলিলময়ী জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র প্রবাহ। আমরা অঞ্জলি পূরিয়া সেই পবিত্র জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম।

এইবার "চড়াই"এর পালা। "উতরাই" এর মুখে বেশ হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে গমন করা হইয়াছিল। কিন্তু এবার পাহাড়ের উচ্চতা দেখিয়া আমাদের হৃদয় দমিয়া গেল। এটা কেবল অনভ্যাসের ফল। আমরা তিনজনেই সুবিধাজনক পথ খুঁজিতে লাগিলাম। একজন পাহাড়ী এই বিজন পর্ব্বতে আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, সে অবশেষে আমাদের এক সহজগম্য পথে লইয়া গেল।

নদীগর্ভ হইতে ক্রমশঃ আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। কি আনন্দ! কি উৎসাহ! কে যেন সর্ব্বদাই কাণের কাছে গাইতেছে "আগে চল্ আগে চল্ ভাই।" এ গান, এ অমর কবির অমর গাথা শুনিয়া কি পিপাসু-হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর আমরা এক বিটপী-বহুল উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

নিম্নে বালুকা ও কঙ্করময় পথ। কোথাও বা তৃণ-বহুল—কোথাও বা তৃণ-বিরল। উপরে নীলাকাশে শুভ্র তুলারাশিবৎ মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ ধাবমান, চারিদিকে পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণের মধুর কূজন, আর দক্ষিণে পশ্চিমে চির-সমুন্নত গগনস্পর্শী পাহাড়শ্রেণী। নানাবিধ বনজ-ফুলে মধুর প্রভাতের মৃত-সঞ্জীবনী হিল্লোল লাগিয়া সুমধুর গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। আর গভীর নির্জ্জনতা আমাদের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ নৃত্য করিতেছে। খানিক দূর গিয়া সেই নির্জ্জন উপত্যকার মধ্যে আমরা একটী বিষয়ে বড়ই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। সেই নির্জ্জন স্থানে দুইটী সমাধি দেখিয়া আমাদের মনে কি এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। মৃত্যুর চির-নির্জ্জনতার সঙ্গে এই পার্ব্বত্য-নির্জ্জনতা মিশিয়া এক কি অদ্ভুত বিভীষিকার সৃজন করিয়াছে! মৃত্যুর পর জীবনের অনন্ত গতির সহিত এই পাহাড়গুলির ও নীলাকাশের অনন্ত ভাব মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত কাহিনী প্রচার করিয়াছে।

সমাধিদ্বয় দুইটী ইউরোপীয় যুবকের! হতভাগারা ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণার হস্ত হইতে শোচনীয় পরিণামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, এখানে চির-বিশ্রাম লাভ করিতেছে। একটী সমাধি পুরাতন—আর একটী অতি নূতন। সবেমাত্র দ্বিতীয়টীর উপর দিয়া একটী বৎসর ষড়ঋতু লইয়া একবার আবর্ত্তন করিয়াছে।

যদি জীবনের নশ্বরতা দেখিতে চাও এইখানে আসিয়া এই নির্জ্জন সমাধি দুইটীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর! যদি মৃত্যুর চির-নির্জ্জনতা, অনন্ত বিশ্রামের চির-পবিত্রতা দেখিতে চাও, এই নির্জ্জন সমাধির প্রতি দৃষ্টিপাত কর! প্রকৃতির কোমল-ক্রোড়ে—প্রকৃতির প্রিয়-সন্তান কত আদরে ঘুমাইতে পারে যদি দেখিতে চাও, এই নির্জ্জন সমাধি দেখ! দুঃখময় শোচনীয় স্মৃতির পবিত্র গাথা যদি স্বচ্ছসলিলা, নির্ঝরিণীর কলতানের সহিত এক সুরে বাঁধিয়া শুনিতে চাও ত একবার এখানে আইস! যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু নশ্বর, যাহা কিছু শোকের, যাহা কিছু সুখের—এইখানেই তাহার পবিত্র প্রেম-মন্দির। প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রকৃতির সন্তানকে শোয়াইয়া তাহার উপর—তাহার স্নেহময় আত্মীয়ের সাদা, কাল, লাল, পীত, পাটল, ধূমল প্রভৃতি নানাবর্ণের উপলখণ্ড ধীরে ধীরে সাজাইয়া দিয়াছে। সেই উপলখণ্ডের শেষ শিয়রে মনুষ্যের হস্তখোদিত শোচনীয় কাহিনী! ইহাদের একটীতে লেখা আছে ঃ—

"Here lies the remains of
Richard Bodington, Esqr.
Who was attacked by bees
and drowned in the river
Nerbudda, near this spot.
On the 10th of May
1859. A. D.
Aged 29 years.
Erected by his Colleagues in memory of his
virtuous and manly character."

অদ্ভুত কাহিনী—অদ্ভুত ভাষায় লিপিবদ্ধ। এক হতভাগ্য জীবনের শোচনীয় কাহিনী! এক সম্যক-অপরিস্ফুট জীবনমুকুলের খেদময় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস!

মৌমাছি-দ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যের অপমৃত্যু! বড়ই শোচনীয় কাহিনী! নর্ম্মদাতীরস্থ মর্ম্মর পাহাড়ে ও জঙ্গলের অন্যান্য স্থানে পাহাড়-গাত্রে অনেক মৌমাছির বাসস্থান আছে। ইহারা বড় বড় চাকের মধ্যে অবস্থান করে। আমাদের দেশে বড় ভিমরুলের চাক যত বড়, ইহার এক একটী চাক তাহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ। মৌমাছিগুলি বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্রকায় শ্রেণীর নহে। দেখিতে বড় ও বেশী বিষাক্ত। ধূম ইহাদের পরমশত্রু। কোন প্রকার ধোঁয়া দেখিলেই ইহারা মহা উত্তেজিত হইয়া চাক হইতে বাহির হয়।

বোডিংটন সাহেবের সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত গল্পটী জব্বলপুরের কোন প্রাচীন অধিবাসীর মুখে শুনিয়াছি। সাহেব জি, আই, পি, রেলপথের একজন এঞ্জিনিয়ার! পঞ্চবটী পাহাড়ের উপর শিকার করিতে গিয়াছিলেন। পাহাড়ে এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় জলবিহারী সুন্দরপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়—সাহেব ইহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছিলেন। সঙ্গীরা নিষেধ করিলেও তিনি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। যখন পর্ব্বতের চাক হইতে

মৌমাছির দল বন্দুকের ধূম দেখিয়া দলে দলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন নিরুপায় হইয়া সাহেব নর্ম্মদায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিলেন। নর্ম্মদার গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটিল।

আর একবার কাপ্তেন ফরসাইথ নামক একজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ এই প্রকার পাহাড়ী মধু-মক্ষিকার হস্তে পড়েন। সাহেব মান্দলা বিভাগের পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া যাত্রা করিতেছিলেন। পথে মৌছিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার জীবন রক্ষা হইল বটে কিন্তু ভয়ানক জ্বর হইয়া অনেক দিন ধরিয়া শয্যাগত থাকিতে হইল। সঙ্গে মোট বহিবার জন্য একটা পনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সঙ্গের লোকেরা যে যেখানে পারিল ছুটিয়া পলাইল। সাহেবের সঙ্গে একটী হস্তী ছিল, সেটাও আক্রান্ত হইয়া দিনকয়েক ধরিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিল।

এমন বিপদজনক মৌচাক ভাঙ্গিয়াও পাহাড়ীরা মধুর ব্যবসা করিতে ছাড়ে না। অন্ধকার রাত্রিতে পাহাড়ের গায়ে দড়ির সিঁড়ি লাগাইয়া ইহারা চাকে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দেয়। মৌমাছিগুলি উড়িয়া গেলে অগ্নি নিবাইয়া দিয়া চাক সংগ্রহ করে। এ প্রদেশের পাহাড়ীদের মধুর ব্যবসা একটী প্রধান জীবিকার মধ্যে গণ্য।

ইহার পর আর একটী ইংরাজের গোর। ইহারও নর্ম্মদায় পড়িয়া অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। সাহেব নাকি নর্ম্মদা প্রপাতে নামিতে গিয়া জীবন হারান। গোরের উপর লেখা আছে—

"2nd Battalion Scotts Rifle
Sacred to the memory of
No 2937—Private James Goudie
(D. company.)
Who was drowned in the Nerbudda
on the 17th June 1894
aged 26 years
Erected by Officers."

যুবক গৌডির অপমৃত্যুতে ও এই শোচনীয় স্মরণচিহ্ন দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। শুনিতে পাই ইংরাজী দর্শকেরা ঐ নিভৃত কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উপত্যকা হইতে এক একটী উপলখণ্ড সাজাইয়া দেন। আমরাও সেই প্রথার অনুসরণে গুটিকত মসৃণ শ্বেত-মর্ম্মর সেই দুইটী গোরের উপর বিছাইয়া দিয়া 'ভৃগুক্ষেত্রে'র দিকে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে চলিল সেই নীরব শোকময় কাহিনীর অস্ফুট স্মৃতি। আগামী বারে "ভৃগুক্ষেত্রে" যাহা দেখিয়াছি তাহাই তোমায় বলিব।

কাহাকে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যখন জ্ঞান হইল, দুইটি সোৎসুক নয়নের সস্নেহ দৃষ্টি নয়নে স্থাপিত দেখিলাম। বুঝিলাম আমার সেই মোহের অবস্থা—যে অবস্থায় আমি আত্মহারা হইয়া অতীতে বর্ত্তমানে মিশাইয়া ফেলি, বাল্যের স্মৃতিগঠিত যৌবনস্বপ্নে একে অন্য ভ্রম করি,—এ আমার সেই মোহের অবস্থা; তাই মিষ্টার জির নয়নে আমার বাল্যসখার স্নেহদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু তখনি সে ভ্রম ভাঙ্গিল; বুঝিলাম ইনি তিনি নহেন—ডাক্তার। আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন—"Thank God, the danger is past, she is allright now."

দিদি আমার পাশেই বসিয়াছিলেন; তিনি এক চামচ ঔষধ আমার মুখের কাছে ধরিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—"মণি এইটুকু খেয়ে ফেল!"

আমি বলিলাম "আমার হয়েছে কি,—ওষুধ খাব কেন?"

ভগিনীপতি বলিলেন—"না কিছুই হয়নি—ওষুধ না—সরবৎ দেওয়া যাচ্ছে—খেয়ে ফেল দেখি,—I say B—জি একবার এখন দেখতে আসতে চায়; আসতে পারে কি?" ডাক্তার বলিলেন—"এখনো বোধ হয় কিছুক্ষণ disturb না করাই ভাল,—If she gets a little sound sleep the nervous system will recover its natural balance. এখন আমরাও যাই—আমারো আর এখানে থাকার আবশ্যক দেখিনে। আপনার স্ত্রী উঁহাকে এখন ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করুন। যদি বলেন কাল একবার আমি বরঞ্চ দেখতে আসব—আসতে পারি কি?"

ভগিনীপতি বলিলেন—"নিশ্চয়ই। আজ আপনি না থাকলে কি বিপদেই পড়তে হোত—I don't know how to thank—"

আর শুনিতে পাইলাম না, তাঁহারা চলিয়া গেলেন।—এতক্ষণ যেন কি একটা অজ্ঞাত জ্বলন্ত লৌহভার আমার হৃদয়ে রুদ্ধ হইয়াছিল, সহসা অশ্রুস্রোতে গলিয়া বাহির হইয়া উঠিল, আমি দুইহাতে দিদির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া—তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"দিদি আমি কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি?" দিদি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মি মণি আর কথা ক'সনে—ডাক্তার ঘুম'তে বলেছে—চুপ করে থাক—এখনি ঘুম আসবে।"

আমি থামিলাম, কিন্তু অশ্রুধারা থামিল না; শত ধারায় উথলিয়া উঠিতে লাগিল, অথচ এ দুঃখ যে কেন—কেন যে কাঁদিতেছি তাহা কিছুই বুঝিলাম না; সুখ দুঃখ কিছুরই অনুভূতি আমার তখন ছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে—ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে কাঁদিতে, দিদির স্নেহাদরের মধ্যে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটিল; অথচ

সুনিদ্রা নহে; ঘুমাইয়াও মনে হইতেছিল যেন জাগিয়া আছি—অথবা জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছি;—মাথার মধ্যে কত রকম দৃশ্য কত রকম ঘটনা ছায়াবাজির মত একটির পর একটি কেমন অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই যেন কে ছিল কে নাই, একজনের সহিত গল্প করিতেছিলাম—সে আর একজন হইয়া পড়িল,—কাহার বাড়ীতে যেন নিমন্ত্রণে যাইব—সাজ সজ্জা করিতেছি—কিছুতেই সজ্জা শেষ হইতেছে না;—বাড়ীর বাহির হইয়াছি গাড়ি খুঁজিতেছি—কিছুতেই খুঁজিয়া মিলিতেছে না; অবশেষে পায়ে চলিতেছি—পথ ফুরাইতেছে না; যদি বা পথ ফুরাইল কাহার বাড়ী যাইতে কাহার বাড়ীতে আসিয়াছি,—এই রকম সব হিজিহিজি স্বপ্ন;—শেষ স্বপ্নটি কেবল বেশ স্পষ্ট—এত স্পষ্ট—যে তাহা এখনো আমার জ্বলন্ত মনে আছে। স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহ দৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম; কিন্তু মনে হইল এ সে নহে; নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু নত করিলাম—তাঁহার চরণে দৃষ্টি পড়িল—অমনি হৃদয় আনন্দে মগ্ন হইয়া উঠিল—আমি আহ্লাদের আবেগে বলিয়া উঠিলাম—"এ সেই সেই!" ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম বেশ আলো হইয়াছে। এইরূপ স্বপ্নময় ঘুম সত্ত্বেও জাগিয়া অনেকটা সুস্থবোধ করিলাম!

মনে পড়িল,—ক্রমে সবই মনে পড়িল,—দুজনের এক একটি কথা আবার যেন নূতন করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে লাগিলাম। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম—আপনাকে আপনি ভিন্ন বলিয়া অনুভব করিলাম;—বুঝিলাম কাল যাহা ছিল—আজ আর তাহা নাই—কাল যে আমি ছিলাম—আজ আর সে আমি নহি। হৃদয়ে নৈরাশ্য বেদনা জাগিল; কিন্তু এ নৈরাশ্যে ঔপন্যাসিক করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি করিলাম না; কিম্বা, সে যেমনই হৌক তবু আমার দেবতা—তবু তাহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় গর্ব্বাহত নিরাশক্ষুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল, কেবল তাহার উপর নহে; নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম—কি করিয়া আমি এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে বিকটতর একটা আনন্দ জন্মিল এই যে, সে ভ্রান্তি হইতে আমি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুলনায় ডাক্তারের প্রতি খুব শ্রদ্ধা জন্মিল—তাঁহার করুণ সহৃদয় ভাবে পুরুষোচিত মহত্ত্ব দেখিতে লাগিলাম।

আমাকে সুস্থ দেখিয়া দুপরের পর দিদি অসুখের কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"অনেক দিন তোর হিষ্টিরিয়া হয়নি,—ভেবেছিলুম একেবারে সেরে গেছে, আবার রাত জেগে নভেল পড়েছিলি বুঝি? তোর সঙ্গে যদি কিছুতে পারা যায়! আচ্ছা নিজের জন্য না হোক আমাদের কষ্ট মনে ক'রেও কি সাবধান হতে নেই।"

আমি বলিলাম—"কই অসাবধান ত আমি মোটেই হই নি—"

দিদি। "তবে অমনতর হঠাৎ হোল কেন? কাল যে ভাবনা গেছে—তা আর কহতব্য

নয়। হঠাৎ দরজার কাছে এসে দেখি—তুই পড়ে, আমি চেঁচিয়ে উঠতেই এঁরা ওঘর থেকে এসে পড়লেন, ভাগ্যিস ডাক্তার কাছে ছিল—তাই রক্ষে। (এইখানে তাঁহার নাম ধরিয়া বলিলেন) আহা সে বেচারার যে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল সে আর কি বলব—তাপর তোকে ত ঘরে উঠিয়ে আনা গেল, সে একবার দেখেও যেতে পারলে না, শুনলুম নাকি ভারী বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী গেছে।"

আমি বলিলাম—ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম—"বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী যেতে পারেন কিন্তু সে আমার অসুখের জন্যে নয়—নিজে ধরা পড়েছেন—সেই জন্যে। দিদি আমরা নিতান্তই ভুল বুঝেছি,—প্রতারিত হয়েছি"—বলিতে বলিতে নয়ন অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল, অগ্নিময় ক্রোধাশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। দিদি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—

"তোর কথা ত কিছুই বুঝতে পারছিনে—কাল কি তোকে ঐ ভাবের কথা কিছু বলেছে নাকি? কাঁদিস নে আবার অসুখ করতে পারে—স্থির হয়ে সব বল দেখি কি হয়েছে।"

স্থির হয়ে না পারি অস্থির ভাবেই সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। দিদি শুনিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন—"তবু ভাল এই ব্যাপার? আমার এমন ভয় হয়েছিল—যে না জানি কি!"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"না জানি কি! একজনের সঙ্গে বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়ে অন্য জনের সঙ্গে প্রেমের ভাণ—একি সামান্য ব্যাপার হোল?

দিদি। না ভাণ হতেই পারে না; তোকে যে সে ভালবাসে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ও বিলাতের কথা ছেড়ে দে। প্রথমতঃ কথাটা কতদূর সত্যি মিথ্যে তার ঠিক নেই। তাপর ধর যদি কারো সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েই থাকে, কিন্তু বিয়ে ত আর হয় নি—তা হলে আর এতই রাগের কারণ কি? সব দেশেইত এমন কত শত engagement গড়ছে আবার ভাঙ্গছে—এই সেদিন যে আমার মামাত দেওরের গায়ে হলুদ হয়েও বিয়ে ফিরলো—আর এ তো বাঙ্গালী ইংরাজের engagement, দুজনের স্বভাব দুজনের অবস্থার পার্থক্য একবার ভেবে দেখ দেখি, কোন একটা মোহের মুহূর্ত্তে দুজনে আজন্ম একত্র শপথ করতে পারে,—কিন্তু তার পর-মুহূর্ত্ত থেকেই অনুতাপ করার কথা—বিয়ে করার যথার্থ উদ্দেশ্য যা পরস্পরের সুখ, এ বিয়েতে আমার ত মনে হয় তার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য। এ অবস্থায় আমিত বলি, কথা রাখার চেয়ে ভাঙ্গাই ভাল। নিজের আহাম্মকীতে" যেন নিজেকেই সে অসুখী করলে কিন্তু আর একজনের চিরজীবনের সুখাসুখও যখন—

আমি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে শুনিতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু তার সুখ-দুঃখ ভেবেই কি এ বিয়ে ভাঙ্গা হয়েছে? সে ভ্রান্তনারী সর্ব্বত্যাগী হয়ে এখনো পূর্ণ বিশ্বাসভরে তার পথ চেয়ে আছে, আর সে কি না গোপনে গোপনে আর একজনকে ভালবাসা জানাচ্ছে বিবাহ-প্রস্তাব করছে—এতে কি সে পুরুষের খুবই সাধুতা দেখতে পাচ্ছ; দিদি তুমি এমন প্রশান্তভাবে এ ঘটনা কি করে দেখছ আমি ত ভেবেই পাইনে।" দিদি বলিলেন "আমার ভিতরকার কথাটা কি জানিস, আমি অন্তর থেকে তাকে এতে দোষী বলে বিশ্বাস করতে

পারছিনে। বিলাতের মেয়েদের কুহক ত প্রসিদ্ধ কথা, আমার মনে হচ্ছে নেহাৎ কোনরূপ একটা পাকে চক্রে পড়ে বেচারার এমনতর বিভ্রাট ঘটেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই এর এমন একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে যে তখন সে মেয়ের চেয়ে তার উপরেই মায়া করবে।"

আমি। তুমি বুঝি ভেবেছ এসব কথা আমি তার কাছে তুলতে যাব?"

দিদি। তোর তুলতে হবে না সে নিজেই তুলবে সেজন্য ভাবনা নেই, না, হয় আমরা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে—তার সঙ্গে বুঝি আর এ কথা তোলা যায় না?"

আমি। বিয়ে স্থির এখনো হয়নি, আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।"

দিদি বিস্ময়ে রাগে বলিলেন "তুই ক্ষেপেছিস নাকি, এই সামান্য কারণে বিয়ে বন্ধ হবে; ওকথা মনেও আনিস্‌নে, তাহলে সমাজে কি কলঙ্কের সীমা থাকবে; সে পুরুষমানুষ তার কি, তোর সঙ্গে না হলে এখনি অন্য আর একজন দেখে মেয়ে দেবে, আর তোর নামে এ থেকে এত কথা উঠবে যে পরে বিয়ে হওয়াই ভার হবে।

আমি। নাইবা বিয়ে হল, আমি তার জন্যে কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।

দিদি! তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখ তুই যে এমন করে নিজের চিরজীবনের সর্ব্বনাশ করতে চাচ্ছিস সেকি কোন একটা ন্যায়ের অনুরোধে? আমি ত এতে অন্যায় ছাড়া ন্যায় দেখতে পাচ্ছিনে। তুই যেজন্য তাকে দোষী করছিস—এতে তোরও সেই ঠিক একই রকম অন্যায় করা হচ্ছে। যে তোকে প্রাণপণে ভালবাসছে, মিথ্যা কারণে তাকে তুই চিরঅসুখী করতে যাচ্ছিস?

আমি। মিথ্যা কারণ!

দিদি। নিশ্চয় বলছি মিথ্যা কারণ। তার কাছে আসল ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবি—তার তেমন দোষ নেই। অন্ততঃ তার এতে কি বলার আছে সেটা শোন—শুনে তারপর যা হয় স্থির করিস, খুনী যে তার বক্তব্য না শুনে বিচার হয় না; আর তুই তারপক্ষে একটা কথা না শুনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিস, তোর দেখছি অত্যন্ত কঠিন হৃদয়!

আমি নিরুত্তর হইয়া গেলাম।—কি করিয়া আমার মনের ভাব তাঁহাকে বুঝাইব; তিনি সাংসারিক চক্ষে এ ঘটনা দেখিতেছেন, তাঁহার অভিজ্ঞ হৃদয় বলিতেছে "সংসারে এরূপ ঘটিয়াই থাকে, দোষেগুণে মানুষ অতএব মানুষে দেবতা চাহিলে তোমাকে নিরাশা সার করিতে হইবে, তুমি শুধু দেখ সে নিতান্ত ঘৃণ্য দোষ করিয়াছে কি না? যদি না করিয়া থাকে তবেই সে ক্ষমা পাইবার পাত্র।" আমার নবীন হৃদয়ের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষায় উচ্চতর আদর্শে ইহাতে কোন সান্ত্বনা নাই। আমার মনে—যে আমার ক্ষমার পাত্র সে আমার প্রণয়ী আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে; আমাতে স্বামীতে আমি সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হোক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব। অন্যে শুনিলে ইহা বৃথা কল্পনা বলিয়া উপহাস করিবে—কিন্তু আমার অনভিজ্ঞ হৃদয়ে ইহা আকাশকুসুম নহে; প্রকৃত সত্য, কিন্তু এ সত্য আমি অন্যকে কি করিয়া বুঝাইব? কেবল তাহাই নহে, আমার স্বামীর বর্ত্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাঁহার জীবনের কোন ভাগ যে আমাছাড়া ছিল বা কখনো তাহার সম্ভাবনা আছে আমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়,—পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।

আমার এ আকাঙ্ক্ষায়, সহানুভূতি কে করিবে? আমি কি করিয়া বুঝাইব যে আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি—বিবাহ করিতে পারি—তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না; তাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিতে গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু তাহা ভ্রমক্রমে; মোহভঙ্গে পরিত্যক্ত বিসর্জ্জিত ভগ্ন অঙ্গহীন মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে হৃদয়ের শোভা হইবে না। জীবন পর্য্যন্ত তাহাতে বিকৃত বিরূপ হইয়া পড়িবে—রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে? তাই নিরুত্তর হইয়া গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিদি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল, তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়া নিজেই সে কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"ডাক্তার আমাকে যা বলেছিল—তুমি তা শুনেছিলে—না?" এই প্রথম আমাকে তিনি 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কালিকার বিবাহ প্রস্তাবের পর আর আপনি বলিয়া সম্ভাষণ বোধ করি তাঁহার সঙ্গত মনে হইল না। অথবা এইরূপ সম্বোধনে এখন অধিকার জন্মিয়াছে বিবেচনা করিলেন। আমি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম—শুনিয়াছি। তিনি তখন বলিলেন "তুমি ভেবে নিয়েছ কি একটা, I am so sorry,—গুরুতর ব্যাপার কিন্তু আসলে তেমন কিছুই নয়—সামান্য flirtation মাত্র, বিলাতে ত এমন সারাদিনই হয়ে থাকে—"

আমি ক্রোধ চাপিয়া সহজ গম্ভীরভাবে বলিলাম—"কিন্তু ডাক্তারের কথায় ত উল্টোই মনে হ'ল।"

"Oh! the meddling fellow——He is a puritanic hypocrite of the first water! অন্যের সম্বন্ধে একটা কথা পেলে হয়—তিলকে তাল করে তোলে।"

আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম একজন পরিত্যক্ত অসহায় রমণীর পক্ষ গ্রহণ করে যে সে হিপক্রিট, তবে যে বিশ্বস্তহৃদয় রমণীকে ফাঁকি দেয় তাহাকে অভিধানে কি নামে সম্বোধন করে—বোধ করি Honorable man!

কথাটা বোধ করি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, বলিয়াই যদিও আমি অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—তাহার পর বলিলেন—"আমি ফাঁকি দিই নাই, যদি বিবাহ করিতাম তাহলেই বরঞ্চ ফাঁকি দেওয়া হইত। কেননা আমি তাহাকে কোন জন্মেই ভালবাসিতে পারিতাম না।

"তবে engaged হইলেন কেন?"

"ঠিক engaged হই নাই তবে তবে—একটা ভুল বোঝা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে আমার দোষ নয়, বলিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তুমি যখন এতদূর শুনিয়াছ, না বলিলেও উপায় নাই।"

বলা বাহুল্য তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে সেই ইংরাজ ললনারই উপর বর্ত্তমান সমাজ প্রথায় দোষ অধিক পৌছায়। সেই তাঁহাকে প্রথমে অনুরাগ দেখাইয়াছিল—তাঁহাকে তাহাদের বাড়ীতে ক্রমাগত যাইতে বলিত, না গেলে দুঃখ করিত, কোথাও যাইবার আবশ্যক হইলে তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিত ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন পুরুষের পক্ষে এরূপ আহ্বান উপেক্ষা করা নিতান্ত অসৌজন্য কাজ, তিনি তাই এইরূপে তাহার ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, অবশেষে যখন বুঝিলেন তাহার প্রত্যাশা বড় অধিক সে বিবাহ আশা করে, তখন ক্রমশঃ সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার কথার এই সারমর্ম্ম। জানিনা এই বিবরণে অন্য সকলে সেই মুগ্ধা অভিযুক্তা রমণীকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমার কিন্তু এ কথায় তাহার উপর বরঞ্চ মমতা হইল এবং অভিযোগীর উপর যে বড় শ্রদ্ধা বাড়িল—তাহাও নহে।

আমি বলিলাম "কিন্তু আপনি তাহাকে ভুল বুঝিতে দিলেন কেন; আপনার পক্ষে যাহা flirtation তাহার পক্ষে তাহা জীবন্ত অনুরাগ, আপনার খেলা তাহার মৃত্যু, এরূপস্থলে বিবাহই আপনার উচিত কার্য্য।"

"তুমি কি মনে কর—দৈবাৎ একটা অন্যায় করিয়াছি বলিয়া সেই অন্যায়কে চিরস্থায়ী করাই কর্ত্তব্য?—আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি, কেবল আমার কষ্ট নহে—আমার ভাই, বোন, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের চিরকষ্ট, দেশের সহিত আজন্ম বিচ্ছেদ; এবং এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট বহন করিব যাহার জন্য তাহারো চিরকষ্ট, কেননা তাহার প্রতি আমার এমন ভালবাসা নাই যাহাতে তাহাকে সুখী করিতে পারি—এ অবস্থায় তুমি কি আমাকে বিবাহের পরামর্শ দিতে?"

কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হইল, বলিলাম—"কিন্তু তবে সে কেন এখনো বিবাহের প্রত্যাশা করিতেছে—অন্ততঃ তাহাকে পরিষ্কার করিয়া মনের ভাব জানাইয়া মুক্তি লওয়া উচিত ছিল।"

"আমি ত মনে করিয়াছিলাম যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব জানিতে দেওয়া হইয়াছে, তবে এখনো যদি ভুলভ্রান্তি থাকে আমার বিবাহের খবর পাইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

কথাটা বড় খারাপ লাগিল, বাস্তবিক সে যদি ইঁহাকে ভালবাসে—আর বিবাহের আশা করে তাহা হইলে এই খবরে তাহার কিরূপ হৃদয়দাহ হইবে, তাহার ভালবাসা আমার

আগে, তাহার অধিকার আমার আগে, আমি কোন্ প্রাণে তাহার এরূপ যন্ত্রণার কারণ হইব—! আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম "আপনি ন্যায় অন্যায় কি করিয়াছেন জানি না, তাহার বিচারক ভগবান—আমরা নহি, তবে যে রমণী আপনাকে এতদূর ভালবাসে তাহার সুখের পথে আমি কাঁটা হইব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।" তিনি যেন বজ্রাহত হইয়া খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, আমার কাছ হইতে এরূপ কথা শুনিবেন—ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত। কিছু পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ছলনার অভিযোগ দিতেছ, আমি আর যাহাকেই ছলনা করিয়া থাকি—তোমাকে করি নাই—কিন্তু তুমি আমাকে ছলনা করিয়াছ, তুমি আমাকে না ভালবাসিয়াও ভালবাস এইরূপ বুঝিতে দিয়াছ! যদি সত্য সত্য আমাকে ভালবাসিতে, তাহা হইলে কখনই এই সামান্য অপরাধে বিবাহ ভাঙ্গিতে চাহিতে না, আমার অবস্থা বুঝিয়া বরঞ্চ মমতা করিতে—Oh my God—have I lived to hear this!"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিলাম,—যখন দিদি আসিলেন তখন তাঁহার সহিত দু একটা কথা কহিবার পর তিনি বলিলেন "আজ রাত্রেই একটা মোকদ্দমায় মফঃস্বলে যাইতে হইতেছে, হয়ত ঘণ্টাখানেক থাকিতে হইবে—আশা করি চিঠিপত্র পাইব" তাহার পর বিদায় গ্রহণ কালে আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে আমাকে বলিলেন, অতি ব্যথিতকরুণ কণ্ঠে বলিলেন "কি আর বলিব my life and death are in your hands—এই বুঝিয়া বিবাহ ভাঙ্গিবার কথা মনে করিও।"

ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হলওয়েল যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্ধকূপহত্যাকাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, এত কথা কখনই একেবারে মিথ্যা কথা হইতে পারে না! কিন্তু হলওয়েলের সত্যনিষ্ঠা কতদূর প্রবল তাহার পরিচয় পাইলে, তাঁহার কথায় আর আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে হলওয়েল অন্ধকূপহত্যার প্রধান প্রচারক, সেই হলওয়েলই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিবার সময়ে ঢাকার হত্যাকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,—"নবাব মীর-

জাফর খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা আর কি বলিব? তিনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নওয়াজেস-মহিষী ঘসেটি বেগম, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গকে ঢাকার রাজকারাগারে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করাইয়াছেন!"* উত্তরকালে কলিকাতার ইংরাজ-দরবার অর্থাৎ হলওয়েলের স্বদেশীয় সহযোগীগণ এই হত্যাকাহিনীর তথ্যানুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, হলওয়েলের হত্যাকাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা।† যিনি মীরজাফরের পদচ্যুতি সমর্থন করিবার জন্য এমন মিথ্যা হত্যাকাহিনী রচনা করিয়া স্বজাতিসমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনিই অন্ধকূপহত্যাকাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন! তাহাও যে এইরূপ সর্ব্বৈব মিথ্যাকাহিনী নহে, তাহার প্রমাণ কি?

হলওয়েল আপন ব্যয়ে অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কেন; সেই পবিত্র সমাধিস্তম্ভ ইংরাজেরাই স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মমতাবোধ করেন নাই কেন, এ সকল কথার রহস্য নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হলওয়েলের হত্যা-কাহিনী রচনা করিবার বাহাদুরী বুঝিতে পারিয়া সেকালের ইংরাজদরবারের সদস্যগণ কি অন্ধকূপহত্যাকাহিনীর সত্যতাবিষয়েও সন্দিহান হন নাই; এবং তাহাই কি উত্তরকালে অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভবিলোপের সহায়তা করে নাই?

সিরাজদ্দৌলার অদৃষ্টবিড়ম্বনা! ঘসেটি বেগম সিরাজদ্দৌলার জননীর সহিত সসম্ভ্রমে রাজান্তঃপুরে বসতি করিলেন, পলাসীর যুদ্ধাবসানে মীরজাফরের সুশাসনে ঢাকায় কারারুদ্ধ হইলেন, মীরজাফরের দেহাবসানের পরেও সশরীরে জীবিত রহিলেন, অথচ ইতিহাসে তাহার সমুচিত সমালোচনা না হওয়ায় কল্পনাকুশল বাঙ্গালী কবি অবলীলাক্রমে সিরাজশিবিরে ঘসেটি বেগমের প্রেতাত্মাকে উপনীত করিয়া তাঁহার মুখে সিরাজদ্দৌলাকে শুনাইয়া দিলেন:—

"সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্য-কামিনী;
হরি মম রাজ্যধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর্।"‡

এই কবি-কাহিনীর ভিত্তিমূল কোথায়? অথচ এই সকল কাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া কত করতালি আকর্ষণ করিতেছে, সিরাজ-চরিত্র কত ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে!

---

* Long's selections from the Records of the Govt. of India, vol. I.

† In justice to the memory of the late Nabob Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible massacres wherewith he is charged by Mr. Holwell in his address to the proprietors of East India Stock (page 46) are cruel aspersions on the character of that prince, *which have not the least foundation in truth* Letter to Court, 30 September, 1766 supplement.

‡ পলাসির যুদ্ধকাব্য—তৃতীয় সর্গ; দ্বিতীয় স্বপ্ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইংরাজের সর্ব্বনাশ!

ইংরাজবণিকের দর্প চূর্ণ করাই সিরাজদ্দৌলার একমাত্র অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবামাত্র, তিনি আর অধিকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি ২রা জুলাই সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;—মহারাজ মাণিকচাঁদ তিন সহস্র সিপাহী সাহায্যে কলিকাতার শাসনভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় ইংরাজ রাজশক্তির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না;—তাহার নাম পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।*

পথশ্রম দূর করিবার জন্য হুগলীতে বিচিত্র পটমণ্ডপ সুবিস্তৃত হইয়াছিল। সেখানে আসিতে না আসিতে, অভ্যর্থনার সমারোহে জনস্থল টলমল করিয়া উঠিল। সেকালের বাদশাহ্ বা নবাবেরা যেখানে ছাউনী ফেলিতেন, সেই স্থান বহুজনাকীর্ণ রাজনগর হইয়া উঠিত। চারিদিকে যথাযোগ্য দূরস্থানে পাত্রমিত্র ও সামন্তবর্গের পট্টাবাস, তাহার বাহিরে চক্রাকারে সেনানিবাসের সহস্র সহস্র বস্ত্রগৃহ, তাহার পার্শ্বদেশে অগণিত বিপণিশ্রেণী;—কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুরচিত কনকপদ্মবিভূষিত নবাবের গর্ব্বোন্নত পটমণ্ডপ;—সেই হস্ত্যশ্বপদাতিসেনা, সেই প্রহরগণনানিপুণ প্রহরীদল, সেই সর্ব্বজনভৈরব মোগলবিভবের সমুজ্জ্বল চিত্রপট শ্মশানভূমিকেও নন্দনশোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত! দ্বারে দ্বারে দৌবারিকদল করালকৃপাণস্কন্ধে নিঃশব্দে পদচালনা করিয়া বেড়াইত, প্রভাতে সায়াহ্নে রাজ-বৈতালিকগণের তানলয়সংযুক্ত সুমধুর যন্ত্রসংগীত বায়ুভরে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া চলিত। তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথ সময়েও প্রদীপ্ত প্রদীপালোকে চারিদিক ঝলমল করিত!

হুগলীর পটমণ্ডপে সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। সে দরবারে ওলন্দাজ ও ফরাসি-বণিক্‌গণ গললগ্নীকৃতবাসে আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য সসম্ভ্রমে উপঢৌকনহস্তে উপনীত হইলেন। ওলন্দাজেরা ৪॥ লক্ষ এবং ফরাসিরা ৩॥ লক্ষ টাকা 'নজর' প্রদান করিলেন। অতঃপর ইংরাজদিগের কথা উত্থাপিত হইল। তাঁহাদিগকে একেবারে দেশ-বহিষ্কৃত করা যে সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় নহে, সে কথা বুঝাইয়া দিয়া তিনি ওয়াটস্ এবং কলেট সাহেবকে মুক্তিদান করিলেন, এবং হলওয়েলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মীরমদন ইতিপূর্ব্বেই নবাবের অজ্ঞাতসারে হলওয়েল এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে বন্দীবেশে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং আপাততঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইতে পারিল না। যাঁহারা পল্‌তায় পলায়ন করিবার অবসর না পাইয়া ইতস্ততঃ লুকাইয়া রহিয়াছেন, সেই সকল ইংরাজ সওদাগরেরা যদি কেবল মাত্র সওদাগরি করিবার

---

* নবাবের আদেশে কলিকাতার নাম হইল "আলিনগর"! এখন "আলিপুরে" তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।

জন্য কলিকাতায় বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা অনায়াসে নগরপ্রবেশ করিতে পারিবেন ;—এইরূপ সাধারণ রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া সিরাজদ্দৌলা হুগলী হইতে ছাউনী উঠাইয়া পুনরায় রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।* পলায়নপরায়ণ ইংরাজগণ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংরাজবন্ধু উমাচরণের বদান্যতাগুণে অন্নজল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা সমুচিত সমারোহে ১১ই জুলাই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিজয়োৎসবের আনন্দকোলাহলে, নাগরিকদিগের উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যগীতে, মঙ্গলবাদ্যের মধুর নিক্বণে, ঘন ঘন কামানগর্জ্জনের গুরুগম্ভীর রবে এবং নবাব-সেনার সগর্ব্ব আস্ফালনভরে মুরশিদাবাদ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল! সেই আনন্দকোলাহলের মধ্যে রত্নচতুর্দ্দোলারোহণে পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধীশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন নগরপ্রদক্ষিণ করিয়া বেগমমহলে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে হলওয়েলের কারাকক্ষ তাঁহার নয়নগোচর হইল। সহসা বাদ্যোদ্যম নীরব হইয়া গেল, দোলারোহণ পরিত্যাগ করিয়া সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং পদব্রজে কারাগারদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, পার্শ্বস্থ চোপদারকে দিয়া তৎক্ষণাৎ হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীদিগের শৃঙ্খলমোচন করাইয়া, তাঁহাদিগকে যথেচ্ছদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, পুনরায় দোলারোহণ করিলেন।†

ইংরাজদিগের পক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আর কোনরূপ প্রতিবন্ধক রহিল না। পূর্ব্বকাহিনী বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ধীরে ধীরে কলিকাতায় শুভাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বভাবদোষে অতি অল্পদিনের মধ্যেই "জন বুলের" সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! একজন মদিরাসক্ত সার্জ্জন সাহেব একদিন একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করিয়া বসিলেন। একালে এরূপ ঘটনায়,—আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়া,—ইংরাজমাত্রেই বিনাদণ্ডে বা যৎসামান্য দণ্ডে পরিত্রাণলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; সেকালে মুসলমান রাজদরবারে ইহাতে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। রাজা মাণিকচাঁদের আদেশে একের অপরাধে ইংরাজমাত্রেই কলিকাতা হইতে তাড়িত হইলেন।‡ ইংরাজের কপাল ভাঙ্গিল ; তাঁহাদের জন্য আর কলিকাতায় স্থান হইল না ; কেবল হেষ্টিংস প্রভৃতি কয়েকজন কুঠিয়াল কাশিমবাজারে বসিয়া রহিলেন, তদ্ভিন্ন আর আর ইংরাজেরা,—যে যেখানে ছিলেন,—সকলেই আসিয়া পল্‌তার বন্দরে সমবেত হইতে লাগিলেন!

* Two or three days before his departure, he published leave to such as had escaped the dungeon to return to their houses in the town, where they were supplied with provisions by Omichand, whose intercession had probably procured their return.—Orme, vol. II. 80.

† He ordered a Suttaburdar and Chopdar immediately to see our irons cut off, and to conduct us wherever we chose to go ; and to take care that we received no trouble nor insult.—Holwell.

‡ Orme, vol. II. 80.

এতদিনের পর ইংরাজের প্রবল প্রতাপ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল ; কাশিমবাজার গেল ; কলিকাতা গেল ; কলিকাতার ইংরাজদুর্গের উপর রাজা মাণিকচাঁদের বিজয়পতাকা সগৌরবে আকাশে অঙ্গবিস্তার করিল ;—ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া পল্‌তার পলায়িত জাহাজে সম্মিলিত হইতে লাগিল।

সকলই ফুরাইল! তথাপি এ সকল শোচনীয় কাহিনী সহসা মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবারের কর্ণগোচর হইতে পারিল না! তাঁহারা সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া ১৫ জুলাই তারিখে কাশিমবাজার অবরোধের প্রথম সংবাদ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তেমন বিচলিত হইবার কারণ ছিল না ;—বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রায় মধ্যে মধ্যেই সেরূপ সংবাদ আসিত ; আবার হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই শুনা যাইত যে, "গোলযোগ মিটমাট হইয়া গিয়াছে ; সময়োচিত উপঢৌকন দিয়া সকলকেই শান্ত করিয়াছি ; বাণিজ্য-ব্যবসায় একরূপ ভালই চলিতেছে!" * সুতরাং কাশিমবাজারের সংবাদ পাইয়াও, মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবার কেবল কলিকাতায় সেনাবল বৃদ্ধি করিবার জন্য মেজর কিলপ্যাট্রিকের সঙ্গে ২৪০ জনমাত্র গোরা পল্টন পাঠাইয়া দিয়া, দ্বিতীয় সংবাদের অপেক্ষায় কথঞ্চিত নিশ্চিন্তমনেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৫ই আগষ্ট তারিখে রণপলায়িত ম্যানিংহাম সাহেব মাদ্রাজের বন্দরে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার মুখে মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবার কলিকাতার কথা, সিরাজদ্দৌলার কথা, ইংরাজের সর্ব্বনাশের কথা ;—এক সঙ্গে সকল কথাই শুনিতে পাইলেন! সে সংবাদে মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! সকলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন ;—"হায়! হায়! কি হইল? এতদিনের এত আশা,—সকল আশাই এক ফুৎকারে নির্ম্মূল হইয়া গেল!" †

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস চলিয়া গেল। তখন লোক ডাকাইয়া, সভা বসাইয়া, যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রবল বিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ; কেহ কেহ প্রতিহিংসাসাধনের জন্য বীর প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিবার উত্তেজনা করিতে লাগিলেন ;—কিন্তু তখন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষীণবল, ফরাসি-সমর-শঙ্কায় নিরন্তর চিন্তাক্লিষ্ট, তাহাতে সহসা কিংকর্ত্তব্য স্থির হইয়া উঠিল না!

এদিকে মেজর সাহেব ভাগীরথী-মুখে প্রবেশ করিয়াই পল্‌তার বন্দরে আসিয়া পলায়িত ইংরাজ-জাহাজের সন্ধান পাইলেন! তিনি আর ২৪০ জন গোরা লইয়া একাকী কি করিবেন? সকলকে যথাশক্তি আশা ভরসায় উৎসাহিত করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পল্‌তার বন্দরেই জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ফেলিলেন! পলায়িত ইংরাজগণ তখন পর্য্যন্তও জীবিত,—কিন্তু সকলেই একরূপ জীবন্মৃত! অনেকে চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, যাঁহারা সুস্থ সবল, তাঁহা-

* Thornton's History of British Empire, vol I. 197

† On the 5th of August news arrived of the fall of Calcutta, which scarcely created more horror and resentment than consternation and perplexity.—Orme, vol II.

রাও ভগ্নহৃদয়ে মলিনমুখে সতৃষ্ণনয়নে অকুল সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কতদিনে মান্দ্রাজ হইতে সেনাদল আসিবে—কেবল সেই চিন্তায় শীর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন !

দুর্দ্দশার দিনে দুর্ম্মতি আসিয়া ইংরাজদিগের দুঃখদৈন্য দ্বিগুণ করিয়া তুলিল ! কেন তাঁহাদের এরূপ শোচনীয় দুর্গতি উপস্থিত হইল,—সেই কথা লইয়া তুমুল গৃহকলহ উপস্থিত হইল ! নব্যতন্ত্রের ইংরাজ-যুবকেরা ইংরাজ-দরবারের উপরেই সকল অপরাধ আরোপ করিতে লাগিলেন ! যাঁহারা দরবারের সদস্য, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরকে অপরাধী করিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না ! এই সূত্রে ইংরাজদিগের মধ্যে দিবানিশি বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল ; কথায় কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল ; সর্ব্বপ্রকার সমবেদনা দূরীভূত হইয়া গেল ; অবশেষে অনেকেই বলিতে লাগিলেন যে,—"যাঁহারা উৎকোচ-লোভে কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং যাহাকে তাহাকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য কোম্পানীর নামাঙ্কিত পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারাই সকল অনর্থের মূল!" * এই গৃহকলহ উপলক্ষে ইংরাজদিগের ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকগণ অনেক যুক্তি তর্ক উপস্থিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এ সকল কথা নিতান্তই অমূলক ! এতকালের পর সে সকল অভিযোগের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। যাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজ-দরবারের সদস্যদিগের ব্যবহারগুণেই নবাব সিরাজদ্দৌলা এতদূর উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার করিব,—না, পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকদিগের কথাই অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইব ? ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি বলেন,—"যুবকদলের অভিযোগে কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন। বৃদ্ধদিগকে পাকেচক্রে পদচ্যুত করিবার জন্যই যুবকদল এই সকল অমূলক অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন !" † কাহার কথা সত্য, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই; অথচ সিরাজদ্দৌলাই যে সকল অপরাধে অপরাধী, তাহা চিরদিনের মত মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।

পল্‌তায় পলায়ন করিয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা হইল ;—কিন্তু ইংরাজদিগের দুর্দ্দশার আর অবধি রহিল না ! একে নিদারুণ গ্রীষ্মকাল, তাহাতে একেবারে নিরাশ্রয় ;—একে রোগক্লিষ্ট, তাহাতে আবার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ;—একে সকলেই মর্ম্মপীড়িত, তাহাতে আবার প্রতিদিনই খাদ্যাভাব ! জাহাজের ভাণ্ডার শূন্য ; তহবিলে তঙ্কার অনটন, নিকটে হাট বাজারের অসদ্ভাব ;—ইচ্ছা থাকিলেও মাণিকচাঁদের ভয়ে দোকানী পশারী জাহাজের কাছে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না ! আর কিছুদিন এরূপ দুর্দ্দশার প্রতিকার না হইলে, সকলকেই একে একে ভাগীরথী-গর্ভে জীর্ণ-কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে হইত ! মাণিকচাঁদের

* Orme, vol II. 82-83.

† Orme, vol. II. 81

ভয়ে সকলেই জড়সড় ;—কেবল ফরাসী আর ওলন্দাজ আর ইংরাজের বিপদের বন্ধু কৃষ্ণকায় 'নেটিভ' (বাঙ্গালী) বণিকেরা গোপনে গোপনে যাহা কিছু অন্নজল পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতেই কোনরূপে কায়ক্লেশে ইংরাজের দিনপাত হইতে লাগিল ! *

চতুর লোকে একবার একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইলেই যথেষ্ট হয়। তাহার পর সে আপন কৌশলে সহজেই বসিবার স্থান করিয়া লইতে পারে। ইংরাজদিগেরও তাহাই হইল। যদি সিরাজদ্দৌলা পল্‌তা পর্য্যন্ত সসৈন্যে শুভাগমন করিতেন, তবে হয়ত সকলেই চোরের মত পলায়ন করিবার পথ পাইতেন না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ তাড়াইবার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ না করিয়া, কেবলমাত্র উদ্ধত-ব্যবহারের শাস্তি দিয়াই নিরস্ত হইলেন। ইহাতেই ইংরাজেরা পল্‌তায় পলায়ন করিয়া হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ইংরাজদিগকে নির্ব্বাসিত করাই সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় ছিল ;—কেবল দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই তিনি ইংরাজদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারেন নাই ! † এ কথা একেবারে মিথ্যা কথা। সিরাজদ্দৌলার মনে সেরূপ কল্পনা উদিত হইলে ইংরাজ তাড়াইতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব ঘটিত না, এবং হেষ্টিংস ও ডাক্তার ফোর্থ প্রভৃতি ইংরাজ কুঠিয়ালগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে অক্ষতশরীরে কাশিমবাজারে অবস্থান করিবার অবসর পাইতেন না !

ইংরাজেরা শতবর্ষ বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন ; ইংরাজেরা জঙ্গল কাটিয়া কলিকাতায় সুবিচিত্র ইন্দ্রপুরী রচনা করিয়াছেন ; ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রখাত খনন করাইয়া কত লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়া দিয়াছেন ;—সুতরাং আত্মীয়তাসূত্রেই হউক, আর চিরকৃতজ্ঞ বাঙ্গালীজাতির স্বভাবসুলভ পরোপকার প্রবৃত্তির জন্যই হউক, এ দেশের অনেক গণ্যমান্য লোকে ইংরাজের দুঃখদুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে উমাচরণ ইংরাজবন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দগুণে সর্ব্বস্বান্ত, মর্ম্মপীড়িত, শোকগ্রস্ত পথের ফকির সাজিয়াছিলেন, তিনিও দুর্দ্দশার দিনে সাশ্রুনয়নে নবাবদরবারে ইংরাজের হইয়া কত কাকুতি মিনতি জানাইতে লাগিলেন ! হেষ্টিংস এবং ডাক্তার ফোর্থ সাহেব কাশিমবাজারে বসিয়া গোপনে গোপনে মন্ত্রীদলের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন ; যে সকল আর্ম্মানী বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রপথে গতিবিধি করিতেন, তাঁহারাও ইংরাজদিগকে রাজধানীর গুপ্তসংবাদ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এই সকল চেষ্টায়

* "The remains of our unfortunate colony were now lying on board a few defenceless ships at Fulta, the most unwholesome spot in the country, about twenty miles below Calcutta, and destitute of the common necessaries of life : but, by the assistance of the French, and the Dutch, to whose humanity they were much indebted on this occasion, and partly by the assistance of the *natives*; who both from interest and attachment, privately supplied them with all kinds of provisions, they supported the horror of their situation till August."—Ive's Journal.

† Orme vol. II. 79.

কালক্রমে ইংরাজের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হইবার সদুপায় হইতে লাগিল।* দেশের লোকে বুঝিতে পারিল যে, আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ইংরাজেরা আবার এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য নবাবের সনন্দলাভ করিবেন, সুতরাং দেশের লোকের আনুগত্য দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল।

মেজর সাহেব পল্‌তায় আসিয়া এই সকল শুভলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আশা হইল, সাহস হইল;—সময় পাইয়া মাণিকচাঁদকে হস্তগত করিবার আয়োজন হইল; এবং নবাবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বিনীতভাবে আবেদনপত্র লিখিত হইতে লাগিল! রাজা মাণিকচাঁদ ইতিহাসে চতুর-চূড়ামণি বলিয়া সুপরিচিত। নবাব-দরবারের স্রোত কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে সর্ব্বদাই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যাইত; তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সে স্রোত আবার ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন তিনিও ইংরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপনের জন্য অসম্মত হইলেন না। ইংরাজেরা নবাবের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই পত্রে অন্ধকূপহত্যার জন্য কোন প্রকার আর্ত্তনাদ করা হইল না; আবার যাহাতে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার কথাই বিবিধবিধানে বিবৃত হইল। যতদিন সনন্দ না আসিতেছে, ততদিন অন্ততঃ অন্নাভাবে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা হইল। ওলন্দাজদিগের গভর্ণর বিস্‌ডম্‌ সাহেবের যোগে এই আবেদনপত্র নবাবদরবারে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

ভরসা পাইয়া ইংরাজ কুঠিয়ালগণ জাহাজের উপরেই মন্ত্রীসভার বৈঠক বসাইতে আরম্ভ করিলেন। সে বৈঠকে 'অনরেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত রোজার ড্রেক" সাহেব বাহাদুর সভাপতি, এবং ওয়াট্‌স্‌, হলওয়েল ও মেজর কিলপ্যাট্রিক সদস্যের আসন গ্রহণ করিলেন।†

২২শে আগষ্টের বৈঠকে, সভাপতি মহাশয় সকলকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে,—আর ভয় নাই; মান্দ্রাজ হইতে শীঘ্রই গোরাপল্টন আসিতেছে; কিন্তু সেই দিনই সংবাদ আসিল যে, ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের আবেদনপত্রখানি নবাবদরবারে পাঠাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন পত্রখানি কিরূপে নবাবের নিকট প্রেরিত হইতে পারে, তাহার জন্য পরামর্শ চলিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন কলিকাতা অঞ্চল হইতে খোজা পিত্রু এবং এব্রাহিম জেকব্‌স্‌ নামক দুইজন আরমানী বণিক পল্‌তায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ-হিতৈষী উমাচরণের নিকট হইতে একখানি গুপ্তলিপি আনিয়াছিলেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই পত্র পঠিত হইল। হায়! উমাচরণ;—সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "চিরদিনও যেমন, এখনও সেইরূপ ভাবে তিনি ইংরাজের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।" আর ইংরাজেরা যদি রাজা রাজবল্লভ, রাজা মাণিকচাঁদ, জগৎশেঠ, খোজা বাজিদ প্রভৃতি পাত্রমিত্রের সঙ্গে গোপনে গোপনে চিঠিপত্র চালাইতে চান, তিনি তাহাও যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া সদুত্তর আনাইয়া দিবেন।* ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যে ইংরাজেরা এবং যে হলওয়েল সাহেব উমাচরণকে নিতান্ত কুটিলহৃদয় পরমপাষণ্ড অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ বলিয়া পৃথিবীর নিকট পরিচিত করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিপদের দিনে সেই উমাচরণকে ততদূর অবিশ্বাস করেন নাই! ইংরাজেরা সময় পাইয়া উমাচরণের সঙ্গে জাল জুয়াচুরি করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই; কিন্তু পদে পদে বিড়ম্বিত হইয়াও সেই উমাচরণ আজীবন ইংরাজের কল্যাণকামনায় সহস্র বিপদেও ইংরাজদিগকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ করেন নাই। ইতিহাসে এ সকল কথার যথাযোগ্য সমালোচনা হয় নাই বলিয়া, বাঙ্গালী কবি লিখিয়া রাখিয়াছেন:—

"——যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ ফণা আস্ফালিয়া।"†

উমাচরণের সহায়তাগুণে রাজা মাণিকচাঁদ সহজেই বশীভূত হইলেন। একদিন যে মাণিকচাঁদ ইংরাজ-দলনে অপরিসীম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রৌষধিগুণে সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। ৫ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে স্বয়ং মাণিকচাঁদের পত্র ইংরাজ-দরবারে সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। সে পত্রে ইংরাজ আবার সাহস পাইলেন; রাজা মাণিকচাঁদ যে যথাশক্তি ইংরাজের সহায়তা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন পাইতে বিলম্ব হইল না;—পল্‌তায় বাজার বসিল, ইংরাজের অন্নকষ্ট দূর হইয়া গেল।‡

রাজা মাণিকচাঁদ এত সহজে ইংরাজের বশীভূত হইলেন কেন, ইতিহাসে সে রহস্য মীমাংসিত হয় নাই। মাণিকচাঁদ যেরূপ চরিত্রের লোক, বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিতে চিরদিন ক্ষিপ্রহস্ত। সিরাজ যখন সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, জগৎশেঠ এবং খোজা বাজিদ কৃতাঞ্জলি হইয়াও যখন সিরাজদ্দৌলাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই, মাণিকচাঁদ তখন নবাবের নিকট সরফরাজ থাকিবার আশায় সবিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইংরাজদলনে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতা জয় করা হইল, কলিকাতার নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল, কলিকাতার সৌধধবল ইন্দ্রপুরী হইতে ইংরাজ গৃহতাড়িত হইল;—মাণিকচাঁদ বুঝিলেন যে, আর বিনাযুদ্ধে "আলিনগরে" ইংরা-

* Long's selections from the Records of the Government of India.

† এই বৈঠকের আনুপূর্ব্বিক কার্য্যবিবরণী Long's selections from the Records of the Government of India নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

* Consultation on board the Phœnix Schooner, Fulta, August 22, 1756.

† পলাসির যুদ্ধকাব্য।

‡ The same day there came another letter to the Major by Coja Petross and Abraham Jacobs from Raja Manik Chand of the 2nd. inst. at Allinagore (Calcutta) with many compliments and the strongest assurance of his assistance. He sent at the same time a boat with a *dustick* with orders for the opening a bazar and for the supplying us with provisions of all kinds.—Consultations, 5 September, 1756.

জের পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু মাণিকচাঁদ জানিতেন যে, বিপদে পড়িয়া বৃটীশসিংহ কিছুদিনের জন্য লাঙ্গুল প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেও, অবসর পাইবামাত্র আবার বীরদর্পে কলিকাতার উপর হুঙ্কার করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে, এবং সে আক্রমণে মাণিকচাঁদেরই সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি সেই জন্য মূলাজোড়ে এক নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে ধনরত্ন ও স্ত্রীপুত্রাদি সুরক্ষিত করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে আবার বাতাস ফিরিয়া গেল! সিরাজদ্দৌলার মতি গতি শান্তভাব অবলম্বন করিল; ইংরাজদিগের পুনরাগমনের আশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; সুতরাং তাঁহাদের করুণক্রন্দনে উপেক্ষা প্রদর্শন করা মাণিকচাঁদের নিকট বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। উমাচরণ অনুরোধ জানাইবামাত্র মাণিকচাঁদ ইংরাজদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন!

নবাব-দরবারে ইংরাজদিগের কাতর নিবেদনে শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। এমন সময়ে কাশিমবাজার হইতে সহসা সম্বাদ আসিল যে,—"মুরশিদাবাদে বড়ই গোলযোগ! বাদশাহ পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গকেই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী সনন্দ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তদনুসারে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, অনেকেই তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন। আর সে সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার প্রবল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে;—তাঁহার রত্ন-সিংহাসন যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে।*

এই সংবাদ পাইবামাত্র ইংরাজদিগের পূর্ব্বসংকল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—আর কেন? সময় থাকিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও। ইংরাজ-দরবার তাহাই করিলেন। তাঁহারা শওকতজঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার জন্য এবং সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য "নজর" পাঠাইয়া পত্র লিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।†

সিরাজদ্দৌলা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না; তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ কাকুতি মিনতি চলিতে লাগিল। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও এই রাজবিদ্রোহীতার সন্ধান পাইতেন, তবে হয়ত পল্তার বন্দর ইংরাজের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিত না।

এদিকে মাদ্রাজনিবাসী ইংরাজগণ দুইমাসের মধ্যেও তর্কবিতর্ক শেষ করিতে পারিলেন না। ইংরাজের ফৌজ অপ্রচুর; চিরশত্রু ফরাসী হয়ত শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে;—এমন সময়ে মাদ্রাজ হইতে পল্টন পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না সে বিষয়ে বিষম মতভেদ

* Mr. Warren Hastings writes from Cossimbazar that great preparations were there making for a war with Shocut Jung, the Nabob of Pyrnea, who has had the Nabobship of Bengal, Bahar and Orissa conferred upon him by the king of Dily.—Consultations, 5 September 1756.

† The Board agreed to send a letter in Persian to the Pyrnea Nabob with presents, hoping he might defeat Sirajed Dowla.—Consultations, 15 September, 1756.

উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল,—অবশেষে স্থির হইল যে, অন্যান্য প্রদেশের ভাগ্যে যাহা হয় হউক, সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার উদ্ধারসাধন করাই কর্ত্তব্য। এই সময়ে বিখ্যাত ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব মাদ্রাজ-দরবারের সদস্য ছিলেন, তিনি এইসকল তর্কযুদ্ধের সবিস্তার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।* কলিকাতার উদ্ধারসাধন করা স্থির হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সেনাপতি করা হইবে, তাহা সহজে স্থির হইল না।

পিগট সাহেব মাদ্রাজের গভর্ণর। পদগৌরবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সেনানায়কদিগের মধ্যে কর্ণেল অল্ডারক্রন্ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের যুদ্ধকলহে তাঁহারও কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই। কর্ণেল লরেন্সের যোগ্যতা আছে, অভিজ্ঞতাও আছে,—সকল বিষয়েই তিনি পরিপক্ক। কিন্তু তিনি হাঁপানী রোগে জর্জ্জরিত,—বাঙ্গলার জলবায়ু তাঁহার ধাতুতে সহ্য হইবে না। এইরূপে যখন একে একে সকল সেনাপতি পশ্চাদ্‌পদ হইলেন, তখন কর্ণেল ক্লাইবের উপর অগত্যা এই ভার ন্যস্ত হইল। যাঁহারা ক্লাইবের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিলেন যে ইংরাজভাগ্যে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল!

কর্ণেল ক্লাইবের নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে তাঁহার গর্ব্বোন্নত বীরপ্রকৃতি যে সুবৃহৎ চিত্রপট বিরাজিত রহিয়াছে,† তাহার প্রত্যেক তুলিকাসম্পাতে আজিও যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক তীব্রতেজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কত সুলেখক তাঁহার বীরকীর্ত্তির বর্ণনা করিয়া সাহিত্যজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কর্ণেল ক্লাইব 'আজন্মসৈনিক,'—এত সাহস, এত বীরদর্প, এত প্রত্যুৎপন্নমতি একাধারে আর কাহারও জীবনে বিকশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

মাদ্রাজ-দরবার স্থির করিয়া দিলেন যে, সেনাপতি ক্লাইব কলিকাতার ইংরাজদরবারের আজ্ঞাবহ হইবেন না; স্বাধীনভাবে সকলকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সসৈন্যে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বরের নৌসেনাপতি আড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌কেও সেই সঙ্গে প্রেরণ করা স্থির হইয়া গেল।

ভারতভাগ্যবিধাতা মহাবীর ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ পাঁচখানি রণপোত লইয়া ১৬ই অক্টোবর মাদ্রাজের উপকূল ছাড়িয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কোম্পানী বাহাদুরের পাঁচখানি জলযান মালপত্র বহিয়া চলিল। ৯০০ গোরাপল্টনের সঙ্গে ১৫০০ কালা সিপাহী সগর্ব্বে বঙ্গোপসাগর বিকম্পিত করিয়া বৃটীশের রণবাদ্যনিনাদে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে জাহাজে পদার্পণ করিল। জাহাজ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল;—যতদূর দৃষ্টি চলিল, বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া ইংরাজ নর নারী রুমাল উড়াইয়া উৎসাহবর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

একজন বাঙ্গালী-কবি শ্রুতিসুমধুর সংস্কৃত কবিতায় নব্যভারতের ইতিহাস সংকলন করিয়া

* Orme, vol. II. 84-89.

† Calcutta—its highways and by-paths.

গিয়াছেন। * তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্যের প্রাখর্য্য রক্ষার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"অনুকূলোঽভবদ্বায়ুঃ প্রয়াণে ক্লাইবস্য হি।" কিন্তু প্রভঞ্জন অনুকূল হইতে পারিলেন না ; বায়ুবেগে জাহাজগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। আড্‌মিরাল পোকক ২৫০ গোরা লইয়া 'কম্বরল্যাণ্ড' নামক সুবৃহৎ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন ; এবং 'মার্‌ল্‌বরা' নামক আর একখানি কোম্পানীর জাহাজে অধিকাংশ গুলিগোলা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল ; এই দুইখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় জাহাজ যে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর সন্ধান মিলিল না ! অবশিষ্ট জাহাজগুলি অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া অবশেষে বালেশ্বরের বন্দরের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

সিরাজ না শওকতজঙ্গ,—কাহাকে চাও ?

ইংরাজদিগের যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়, তাহাতে এদেশের লোকের ধারণা ছিল যে, ইংরাজদমন করা বোধ হয় মানুষের সাধ্য নহে। দাক্ষিণাত্যে বৃটীশ "বেয়নেটে" ফরাসী সেনা উপর্য্যুপরি পরাজিত হইতেছিল ; সে সংবাদে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা বাহুবলে সেই অজেয় মহাশক্তিকে মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া মহাসমারোহে রাজধানী প্রত্যাগমন করায় দেশের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল ;—যাঁহারা আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্য দরিদ্রের মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না, সেই সকল পাত্রমিত্রদল বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষ আশা শওকতজঙ্গ ;—কিন্তু অতঃপর তিনিও যে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং সিরাজদ্দৌলা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তহৃদয়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলার কপালে নিরুদ্বেগ হইবার অবসর ঘটিল না। একমাসকালও নির্ব্বিবাদে কাটিল না। পূর্ণিয়াধিপতি শওকতজঙ্গ সসৈন্যে মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন ;—এইরূপ জনরব আবার দেশরাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল। গুপ্তচরসহায়ে সিরাজদ্দৌলা শীঘ্রই সংবাদ পাইলেন যে, এই জনরব অলীক জনরব নহে। দিল্লীর বাদশাহ দীর্ঘকাল রাজকর না পাইয়া অবশেষে মন্ত্রীদলের মন্ত্রণাক্রমে শাহজাদাকেই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন ;—তদনুসারে শাহজাদা সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শাহজাদা ও শওকতজঙ্গ যুগপৎ রাজধানী আক্রমণ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলে শাহজাদার নামে শওকতজঙ্গ রাজ্যশাসন করিবেন। সিরাজ নীরবে এই রণসমাচার লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না ;—তিনিও সিংহাসন রক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

* লঘুভারতম্।

সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে তাঁহার মন্ত্রীদলের চক্রান্তবলেই এই অভিনব অভিযানের সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিয়া শওকতজঙ্গকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া দিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা যে কিরূপ স্বদেশহিতৈষী পরিণামদর্শী বীরপুরুষ, সিরাজদ্দৌলা তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আর কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। শওকতজঙ্গ কুক্রিয়াসক্ত তরুণযুবক, তাঁহার মন্ত্রীদল স্বার্থলুব্ধ চাটুকার মাত্র,—তাঁহাকে পরাজয় করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু শাহজাদা যদি শওকতজঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন, তবে সে সম্মিলিত শক্তি পরাজয় করা বড়ই অসাধ্য হইয়া উঠিবে। যদিও দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি বাদশাহের নামের ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি সর্ব্বথা বিলুপ্ত হইয়াছিল না। সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে, সেই বাদশাহের নামের দোহাই দিয়া বাদশাহজাদা সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান হইলে এ দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই মুহূর্ত্তমধ্যে বাদশাহের পক্ষে ঢলিয়া পড়িবে, সিরাজকে হয়ত বিনাযুদ্ধে তাঁহার আত্মপক্ষীয় পাত্রমিত্রেরাই বাদশাহের নিকট বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং তিনি আর কালক্ষয় না করিয়া শাহজাদার শুভাগমনের পূর্ব্বেই পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদলনে কৃতসংকল্প হইলেন।

শওকতজঙ্গ রাজবিদ্রোহী। তথাপি শওকতজঙ্গ পরমাত্মীয়। আলিবর্দ্দীর বংশধর বলিয়া তিনিও লোকসমাজে সবিশেষ সুপরিচিত। সুতরাং সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে পাত্রমিত্রগণ নানারূপ চক্রান্ত করিয়া সিরাজদ্দৌলার মনোরথ পূর্ণ করিবার অবসর প্রদান করিবেন না। সিরাজ সেইজন্য এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন।

পূর্ণিয়া প্রদেশে বীরনগরে একজন ফৌজদার থাকিত। সেই পদ শূন্য রহিয়াছে দেখিয়া সিরাজদ্দৌলা রাসবিহারী নামক একজন অনুগত ব্যক্তিকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া শওকতজঙ্গের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।* সিরাজ যাহা চাহেন, তাহাই হইল। শওকতজঙ্গ পত্রপাঠ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমি বাদশাহী সনন্দ পাইয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। তুমি আমার নিতান্ত পরমাত্মীয়। তোমার প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা নাই। যদি প্রাণ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন নির্জ্জন পল্লীতে পলায়ন করিতে চাও, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না। বরং তুমি অন্নবস্ত্রে কষ্ট না পাও, তাহারও ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছি। আর বিলম্ব করিও না ;—পত্রপাঠ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন কর। কিন্তু সাবধান ! রাজকোষের কপর্দ্দকেও হস্তক্ষেপ করিও না। যত শীঘ্র পার প্রত্যুত্তর পাঠাইও। সময় নাই। অশ্ব সুসজ্জিত। আমিও রেকাবদলে পা তুলিয়া দিয়াছি। কেবল তোমার প্রত্যুত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব।" †

সিরাজদ্দৌলা যথাকালে এই উদ্ধতলিপি নবাব-দরবারের পাত্রমিত্রদিগের কর্ণগোচর

* Stewart's History of Bengal.
† Stewart's History of Bengal.

করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, অতঃপর কেহ আর যুদ্ধযাত্রাকালে বাধা প্রদান করিবে না, এবং রাজবিদ্রোহী শওকতজঙ্গের সপক্ষ হইয়া বাদানুবাদ করিতে সাহস পাইবে না। কিন্তু কথা উঠিতে না উঠিতেই প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। মন্ত্রীদল বুঝিলেন যে, শাহজাদা শুভাগমন করিতে এখনও অনেক বিলম্ব; তিনি সশরীরে শুভাগমন না করিলে প্রকাশ্যে শওকতজঙ্গের পক্ষাবলম্বন করা বিড়ম্বনামাত্র;—ইহার মধ্যেই যদি সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধযাত্রা করেন, তবে শওকতজঙ্গের সকল চক্রান্তই চূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা সকলেই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে সিরাজদ্দৌলাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। জগৎশেঠ মুখপাত্র হইয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—"দিল্লীশ্বরই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার স্বামী; সুবাদার তাঁহার সনন্দবলে শাসনভার পরিচালন করেন। সিরাজদ্দৌলার সনন্দ নাই; শওকতজঙ্গ সনন্দ পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কে রাজা কে প্রজা তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।" সিরাজ বুঝিলেন যে চক্রান্ত বড়ই কুটিলপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন; কেহ কেহ এরূপও রটনা করিতে লাগিলেন যে, নবাব ক্রোধকম্পিতকলেবরে জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন, তাহাতেই সভাভঙ্গ হইয়া গেল। * বলা বাহুল্য, সিরাজদ্দৌলার আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ রহিল না;—তিনি বাহুবলে পূর্ণিয়া আক্রমণের জন্য সসৈন্যে ধাবিত হইলেন।

শাহজাদা শুভাগমন করিবার পূর্ব্বে পূর্ণিয়া আক্রমণ করিতে হইলে পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে একসঙ্গে আক্রমণ করা আবশ্যক;—উত্তরে হিমালয়, সে পথে আক্রমণ করাও অসম্ভব, পলায়ন করাও অসম্ভব। সিরাজদ্দৌলা তিনদিক হইতে তিনদল সেনাসহায়ে পূর্ণিয়া আক্রমণ করাই স্থির করিলেন; কিন্তু বিশ্বস্ত রণকুশল তিনজন সেনাপতি কোথায়? জগৎশেঠকে করারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করায় মীরজাফর সর্ব্বসমক্ষে অসিস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি আর সিরাজদ্দৌলার জন্য অস্ত্রধারণ করিবেন না। বিদ্রোহের স্পষ্ট সূচনায় সিরাজদ্দৌলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগৎশেঠকে কারামুক্ত করিতে হইল, মীরজাফরকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতে হইল, এবং রাজা মাণিকচাঁদকে কলিকাতা প্রদেশে রাখিয়া অন্যান্য দলবল লইয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিতে হইল। একদল স্বয়ং নবাবের সঙ্গে রাজমহলের পথে ধাবিত হইল, এই দলে মীরজাফরকে সেনাপতি করিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিলেন। একদল রাজা রামনারায়ণের আজ্ঞায় পাটনা হইতে পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিয়া শাহজাদার গতিরোধের আদেশ প্রাপ্ত হইল, আর একদল মহারাজা মোহনলালের আজ্ঞায় জলঙ্গী বহিয়া, পদ্মা উত্তীর্ণ হইয়া, সরদহ হইতে রাণী ভবানীর রাজ্যের ভিতর দিয়া স্থলপথে পূর্ণিয়া আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত হইল। †

শওকতজঙ্গ ইন্দ্রিয়াসক্ত গর্ব্বোন্মত্ত অকর্ম্মণ্য তরুণ যুবক। তিনি কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া নিজেই সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া নবাবগঞ্জ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। জীবনে একদিনের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই, ধূমপুঞ্জে আকাশ অন্ধকার করিয়া কামানমুখে মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ হইলে, কোথায় কেমন করিয়া সেনাসমাবেশ করিতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অথচ প্রবীণ সেনানায়কগণ কোন বিষয়ে পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলে শওকতজঙ্গ স্পষ্টই বলিয়া উঠেন যে,—তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনাচালনা করিয়াছেন। শওকতজঙ্গ প্রভু,—সেনানায়কগণ পদানত ভৃত্য। তাঁহারা আর কি করিবেন? সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া পটমণ্ডপে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

* ওয়ারেণ হেষ্টিংশ এই কথা রটনা করিয়া গিয়াছেন;—ইহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

† Stewart's History of Bengal.

তথাপি শওকতজঙ্গের প্রবীণ সেনাপতিগণ তাঁহার পক্ষে অনুকূল স্থানেই যুদ্ধভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প সেনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখীন হইবার পক্ষে সেরূপ যুদ্ধভূমি সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্মুখে বহুক্রোশবিস্তৃত জলাভূমি, তাহার উপর দিয়া শত্রুদলের গোলন্দাজ বা অশ্বারোহীদিগের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই;—সেই জলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার উপযোগী একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ, তাহার মুখে অল্প কয়েকশত সেনা সমাবেশ করিলেই শত্রুসেনা ব্যূহভেদ করিতে পারিবে না। এমন অনুকূল স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াও শওকতজঙ্গ বুদ্ধির দোষে ব্যূহ রচনা করিতে পারিলেন না। তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনা-সমাবেশ করিয়াছেন,—সুতরাং তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবে কে? তিনি দুই দুই ক্রোশ ব্যবধানে এক এক সেনাপতির পটমণ্ডপ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

শওকতজঙ্গ যখন মহাসমারোহে যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, তখন মোহনলালের সেনাদলের সঙ্গে মীরজাফরের সেনাদল মিলিত হইয়া মার মার শব্দে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কেহই তাহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা ক্রমে জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া মোহনলালের সেনাদল গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ গোলাই অর্দ্ধপথে পঙ্কসলিলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। যে দুই একটি গোলা ক্কচিৎ শওকতজঙ্গের সেনানিবাসে পতিত হইতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শওকতজঙ্গ বাহাদুর হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! সেনাদল ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, অবসর পাইয়া মোহনলাল ক্রমেই সেই সঙ্কীর্ণ পথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন,—এমন সময়ে একজন প্রবীণ আফগান সেনাপতি শওকতজঙ্গের সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন;—জাঁহাপনা! এ কিরূপ সমর-কৌশল? আমরা দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মোল্কের অধীনে অনেক যুদ্ধ বুঝিয়াছি; কিন্তু এমন যুদ্ধ ত কখনও দেখি নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে; যে যেদিকে পারিতেছে সে সেইপথেই পলায়ন করিতেছে! এমন করিয়া কতক্ষণ শত্রুসেনার গতিরোধ করিবেন? গোলন্দাজদিগকে সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী রাখিয়া যথাশাস্ত্র যুদ্ধব্যাপারে অগ্রসর হউন।"

শওকতজঙ্গের তরুণহৃদয়ে এই উপদেশবাক্য তীব্র তীরের মত বিঁধিয়া পড়িল। তিনি স্ফুরিতাধরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ;—"যাও! যাও! আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে আসিও না। নিজাম-উল-মোল্‌ক গাধা! তাই সে তোমাদের কথা শুনিয়া সেনাচালনা করিত। আমি এই বয়সে এমন তিনশত যুদ্ধ বুঝিলাম, আজ কিনা তুমি আমাকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছ!" আফগান সেনাপতি সসম্ভ্রমে সরিয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামক একজন হিন্দু সেনাপতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আর শওকতজঙ্গের আদেশের অপেক্ষা করিলেন না। যে সকল পদাতিসেনা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার কামান চালনার প্রতিবন্ধক হইতেছিল, তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া শ্যামসুন্দর কামান লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। শ্যামসুন্দর একজন প্রভুভক্ত মসিজীবী হিন্দু ;—যুদ্ধব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। শত্রুসেনার আগমনসংবাদে তিনি লেখনী ত্যাগ করিয়া গোলন্দাজদলের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত শ্যামসুন্দর এরূপ বীরপ্রতাপে অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, রণপণ্ডিত মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধপথে অশ্বরশ্মি সুসংযত করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামসুন্দরের কামান ভীমকলরবে ঘন ঘন অনলবর্ষণ করিয়া মোহনলালের সেনাপ্রবাহ আলোড়িত করিয়া তুলিল।

শ্যামসুন্দরের বীরপ্রতাপে শওকতজঙ্গ এতই উত্তেজিত হইলেন যে, তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া অশ্বসেনাকেও অগ্রসর হইবার আদেশ প্রচার করিলেন। পুরাতন অশ্ব-সেনানায়কগণ নবাবের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশ্বসেনা অগ্রসর হইলে একজনও প্রত্যাগমন করিবে না ; উভয়পক্ষের গোলাবর্ষণে মধ্যপথে পঞ্চত্বলাভ করিবে। শওকতজঙ্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন ; "হিন্দু শ্যামসুন্দর কেমন বীরপ্রতাপে অগ্রসর হইতেছে,—সে মরিল না,—আর তোমরা মুসলমান বীরপুরুষ! তোমরাই মৃত্যুভয়ে জড়সড় হইয়াছ? বুঝিলাম তোমরা সকলেই কাপুরুষ।" সেনাপতিগণ সে ধিক্কার সহ্য করিতে পারিলেন না ; পলকমধ্যে দলে দলে অশ্বারোহণ করিয়া সমর-তরঙ্গের মধ্যে সগর্ব্বে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন! শওকতজঙ্গ ভাবিলেন যে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন ;—যেরূপ বীরপ্রতাপে অশ্বসেনা অগ্রসর হইল, তাহারা অপর পারে উত্তীর্ণ হইতেই যাহা কিছু বিলম্ব ;—নচেৎ যুদ্ধজয়ে আর সন্দেহ কি? তিনি তখন বিজয়োৎফুল্ল-হৃদয়ে পটমণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পানপাত্র উঠাইয়া লইলেন। সারঙ্গী সারঙ্গ ধরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল ; তাহার সহচরীগণ সেই সুরে সুর মিলাইয়া কটাক্ষে কুটিল সন্ধান পূরণ করিতে বিলম্ব করিল না ;—শওকতজঙ্গ সুরা ও সঙ্গীত-মোহে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

এদিকে অশ্বসেনা জলাভূমি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবামাত্র পঙ্কসলিলে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিতে লাগিল। যুদ্ধ হইল না, কেবল অনবরত নরহত্যায় যুদ্ধভূমি রুধিররঞ্জিত হইতে লাগিল। এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় কে কতক্ষণ মৃত্যু-

কামনায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?—সেনাদল একে একে পশ্চাদপদ হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ ভাবিলেন যে এই সময়ে শওকতজঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে হয়ত সেনাদলের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহারা তাড়াতাড়ি নবাবের পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। নবাব তখন সংজ্ঞাশূন্য, উষ্ণীষ খসিয়া পড়িতেছে, অসি কক্ষচ্যুত হইয়াছে, হস্তপদ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে, পটমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া নূপুর কঙ্কণ রুণুঝুণু বাজিয়া উঠিতেছে। তথাপি সেনাপতিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না ;—তাঁহারা ধরাধরি করিয়া শওকতজঙ্গকে হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইলেন এবং সেইরূপভাবেই তাঁহাকে রণভূমে আনয়ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেনাদলের সাহস হইবে কি, তাঁহার দৃষ্টান্তে সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। শত্রুশিবির হইতে মুহুর্মুহুঃ লৌহপিণ্ড ছুটিয়া আসিতেছে, সাহসী সুচতুর প্রভুভক্ত ফৌজদারী ফৌজ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড পীড়নে ধরাশায়ী হইতেছে। সেনাপতিগণ অনন্যোপায় হইয়া নবাবকে চেতন করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন ;—কিন্তু হায়! শওকতজঙ্গ তখন একেবারে সংজ্ঞাশূন্য ; কেবল চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে "বহুত আচ্ছা বিবিজান" বলিয়া সংগীতের তালরক্ষা করিতেছেন।

হায়! সিরাজদ্দৌলা! এই শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া তোমাকে রসাতলে দিবার জন্য যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহারাই আজ ইতিহাসের নিকট সম্মানাস্পদ ;—আর তুমি তাহাদের রাজা আশ্রয়দাতা প্রতিপালক হইয়াও শতকলঙ্কে কলঙ্কিত!

শওকতজঙ্গকে বহুক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না। অব্যর্থ-সন্ধাননিপুণ সিরাজ-সৈনিকের গুলি আসিয়া তীরবেগে তাঁহার ললাট ভেদ করিল ; শওকতজঙ্গের সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল!

পূর্ণিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। মহারাজ মোহনলাল তাহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে রাজপদ মন্ত্রীপদ বিতরণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সিরাজ রাজকোষ হস্তগত করিয়া শওকত-জননীকে সসম্ভ্রমে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন ; সেখানে সিরাজ-জননীর সহিত শওকত জননী অন্তঃপুরে স্থানলাভ করিলেন।

অবসান।

মিলনান্তে।

আমি যে তাহার পানে চাহিয়া থাকি না
নিমেষবিহীন হয়ে আপনা ভুলিয়া,
পাগল না হই শুনে তার কণ্ঠবীণা,
পরশ-আবেশে আঁখি আসেনা ঢুলিয়া,
সে কি হায় ভালবাসা শুকায়েছে বলে,
লুকায়েছে ইন্দ্রজাল তাই অবসাদ ?
না গো না, অনেক দিন এ হৃদয়তলে
বহেছে সুখ-লহরী, আসেনি বিষাদ,
বহুদিন বদ্ধ আছি মিলন-পিঞ্জরে ;
তার হাসি, তার কথা, মোহন চাহনি
তীব্র মদিরার মত দিবস রজনী
করি' পান, আছি ভোর উন্মাদনা জ্বরে।
বুকে সে আছে কি ভুমে, বুঝিতে পারি না ;
সহসা যদি সে চুমে, তবু শিহরি না।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিরহান্তে।

বিরহবৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উন্মাদমন্ত্রে কেন বাজিলি না ?
কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গ পানে
ছুটিয়া গেল না ঊর্দ্ধে উদ্দাম পরাণে
বসন্তে মানসযাত্রী বলাকার মত ?
কেন তোর সর্ব্ব তন্ত্রী সবলে প্রহত
মিলিত ঝঙ্কার ভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্ত্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিল না বাজি ? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল ? তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশনিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছিন্ন তার
সে দিনের মত ক'রে বাজেনাক আর ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

JOTIND NATH
39,

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অষ্টম অধ্যায়।

কলিকাতার পুনরুদ্ধার।

পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদলনের জন্য সিরাজদ্দৌলা কিছুদিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের কোন সন্ধান লইবার অবসর পাইয়াছিলেন না। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে অনেকের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলিকাতায় পুনরাগমনের পথ সহজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রগণ যখন সিরাজদ্দৌলাকে অনুনয় বিনয় করিয়া সেই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। সকলেই শুনিল যে, ইংরাজেরা শীঘ্রই কলিকাতায় পুনরাগমনের অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হইবেন।

সিরাজদ্দৌলার বাহুবল ছিল, বুদ্ধিকৌশল ছিল, প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অদম্য হৃদয়বেগ ছিল। বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যে আব্দার ধরিয়া বসিতেন, কেহ তাহা ছাড়াইতে পারিত না ; যুবক সিরাজদ্দৌলাও যখন যাহা করিতে চাহিতেন, কেহ তাহাতে বাধাপ্রদান করিতে পারিত না। পাত্রমিত্রগণের কুটিল ব্যবহারে তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন হৃদয় ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল ; নিজে যাহা বুঝিতেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলেই সন্দেহ হইত যে, তাহার মধ্যে হয়ত কোন গুপ্তকল্পনা লুক্কায়িত আছে। লোকের ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে এইরূপে অনেক সন্দেহের বীজ নিক্ষিপ্ত হইলেও, স্বভাবসুলভ সরল বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, অথবা কোরাণ শপথ করিয়া পরম শত্রুও যাহা বলিত, তিনি অবলীলাক্রমে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন। এরূপ সরল বিশ্বাস না থাকিলে সুচতুর সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে প্রতারিত করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু সিরাজ-চরিত্রের যাহা সদ্গুণ তাহাই তাঁহার শত্রুদলের হাতে পড়িয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ সহজ করিয়া দিল। সকলেই বুঝাইলেন যে, ইংরাজবণিকের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, তাঁহারা আর অতঃপর উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দান করিবেন না, অতএব তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পুনরাগমন করিবার অনুমতি প্রদত্ত হউক। সিরাজদ্দৌলাও বলিলেন—তথাস্তু! শওকত জঙ্গের পরাজয়ের পর আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্যই যে দশজনে মিলিয়া ইংরাজকে আবার এদেশে আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—সময় থাকিতে সিরাজদ্দৌলা তাহার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিবার অবসর পাইলেন না।

এ দিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ,—সকলেই সিরাজদ্দৌলার বাহুবলের ও শাসনকৌশলের পরিচয় পাইয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের উভয়শঙ্কট

উপস্থিত হইল। কার্য্যানুরোধে তাঁহারা সকলেই সিরাজদ্দৌলাকে চিনিয়াছিলেন; সিরাজও তাঁহাদের সকলকেই চিনিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওয়া অথবা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহঘোষণা করা;—মন্ত্রীদলের পক্ষে উভয় পক্ষই তুল্যরূপ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুতরাং ইংরাজদিগের আগমন-সংবাদে তাঁহারা সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া যাহাতে ইংরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘনীভূত হয়, তাহার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরাজদিগের কথাবার্ত্তা, চিঠিপত্র, সকলই চলিতে লাগিল; নবেম্বর মাসের শেষে মেজর কিলপ্যাট্রিক তাঁহাকে স্পষ্টই লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "জগৎশেঠই ইংরাজের একমাত্র ভরসাস্থল; সুতরাং ইংরাজেরা যে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছেন, এ বিষয়ে যেন শেঠজীর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে।" শেঠজীর আর সন্দেহ রহিল না;—তিনি কায়মনোবাক্যে ইংরাজদিগের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত হইলেন।

এদেশে একটি পুরাতন প্রবাদ আছে যে,

"স্বকার্য্য সাধিতে খল তোষামোদ করে,
তাহে মুগ্ধ হয় যত বোধহীন নরে।"

শেঠজী সে পুরাতন প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যে ইংরাজেরা একবৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করিয়া জগৎশেঠের আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার প্রত্যাশায় গোপনে গোপনে বাদশাহের দরবারে অর্থবৃষ্টি করিতেছিলেন; তাঁহারাই যখন কার্য্যানুরোধে শেঠজীকে আকাশ হইতেও উচ্চস্থানে উঠাইতে লাগিলেন, তখন শেঠজী একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলেন! ভবিষ্যতের যবনিকা যে কি ভীষণ দৃশ্যপট আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাইয়া, গতানুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া হতভাগ্য উমাচরণও কায়মনোবাক্যে ইংরাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। দিন যাইতে লাগিল;—কিন্তু দিন দিনই ইংরাজের আশালতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুরচূড়ামণি মাণিকচাঁদ অতীব সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল যে, পূর্ণিয়ার যুদ্ধেই সিরাজের সর্ব্বনাশ হইবে;—যখন তাহা হইল না, তখন তিনি গোপনে গোপনে ইংরাজের সহায়তা করিয়া, বাহিরে কলিকাতা রক্ষার জন্য বাহাড়ম্বর দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। *

পাদরী বেণ্ট্‌ একজন চুঁচুড়ার পাদরী সাহেব। তিনি ইংরাজদিগের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ কলিকাতায় বাস করিবার উপলক্ষে তথাকার গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন।

* And yet Omichand and Manikchand were at this time in friendly correspondence with the English, they (negotiated at this time between the Nawab and the English) understanding how to run with the hare and keep with the hound.—Revd. Long.

তাঁহার পত্রে পল্‌তার ইংরাজেরা জানিতে পারিলেন যে, "মাণিকচাঁদ নদীর দিকে অনেক-গুলি তোপ সাজাইয়া আসর জমকাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকলই বাহাড়ম্বর! দুর্গে দেড়হাজারের অধিক সিপাহী নাই। কামানগুলি অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। টানার দুর্গে কেবল ২০০ সিপাহী আছে; হুগলীতে দুর্গমধ্যে ৫০ জন এবং বাহিরে ৫০০ জনের অধিক পল্টন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" *

উমাচরণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "লোকে নবাবের ভয়ে কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না; কিন্তু ইংরাজদিগের পুনরাগমনের জন্য খোজা বাজিদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সওদাগর-গণ একান্ত উৎসুক।" † হলওয়েল সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, "কলিকাতার দুর্গ একরূপ অরক্ষিত। তাহার চারিটি বুরুজই অকর্ম্মণ্য। কলিকাতার লোকে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের বিশ্বাস যে নবাব-দরবার হইতে ইংরাজাগমনের অনুমতি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কেহ আর কলিকাতা রক্ষায় মনোযোগ দিতেছে না। ‡ এই সকল সংবাদে পল্‌তার ইংরাজদল আশায় আনন্দে মান্দ্রাজের সেনাদলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ পুরাতন বন্ধু। কিছুদিন পূর্ব্বে এই উভয় বন্ধু মিলিত হইয়া মালাবার উপকূলের এক লাভজনক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে সুবর্ণদুর্গের বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধজাহাজের আড্ডা ছিল; অংগ্রীয়া নামক একজন মহারাষ্ট্র-বীর তাহার নৌসেনাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কালক্রমে মহারাষ্ট্রশক্তিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সমুদ্রবক্ষে যাহার তাহার অর্ণবপোত লুণ্ঠন করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে কি মহারাষ্ট্রীয়সেনা কি ইউরোপীয় বণিক, সকলেই সমানভাবে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া নিরুদ্বেগে সমুদ্রকূলে বসিয়া রহিয়াছেন; সেই সুযোগ পাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্থবলে তাঁহাদের সহায়তা ক্রয় করিলেন; এবং সেই সমবেতশক্তি সুবর্ণদুর্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। হিন্দুদিগের নৌসেনাবল প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এই উপলক্ষে তাহা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ যথেষ্ট অর্থ লুণ্ঠনের অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা মোট ১৫০০০০০ টাকা পাইয়াছিলেন। §

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সনের যুদ্ধজাহাজ যখন উড়িষ্যার উপকূলের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন একদিন মহাবীর ক্লাইব মহামতি ওয়াট্‌সন্‌কে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শের বিষয় আর কিছু নহে,—বাহুবলে বাঙ্গলাদেশ

* Long's selections from the Records of the Government of India, vol. I.

† Omichand writes from Chinsura that Coja Wazed and other merchants would be glad to see the English return, were it not for the fear of the Nabob.—Revd. Long.

‡ Ibid,

§ The enterprise succeeded and the prize-money amounted to £150000.—Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, 1772.

লুণ্ঠন করিতে পারিলে কে কিরূপ ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, তাহারই কথা! ওয়াট্‌স্‌ন্‌ সুবর্ণদুর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাহিলেন; ক্লাইব তাহাতে সম্মত হইলেন না;—সে যাত্রা ক্লাইবের ভাগ কিছু কম হইয়াছিল! অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সে যাত্রায় যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে ভাগ হইবে,—সমান সমান! *

যাঁহারা ক্লাইব এবং ওয়াট্‌স্‌নকে বাঙ্গলাদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কোনরূপে কলিকাতার বাণিজ্যাধিকার পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে বিনা-রক্তপাতে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাবের নিকট হইতে সিরাজদ্দৌলার নামে সুপারিশপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর সেই সকল আদেশ পালন করিবার জন্য যাঁহারা সসৈন্যে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিলেন, তাঁহারা সেনাসাহায্যে বঙ্গভূমি লুণ্ঠন করিয়া কে কত অর্থলাভ করিবেন, সেই চিন্তা লইয়াই বিভোর হইয়া রহিলেন! ইহাতে মীরজাফরের ভাগ্যবৃক্ষে কিরূপ সুধাফল ফলিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা এ সকল গুপ্তমন্ত্রণার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। মেজর কিলপ্যাট্রিক বা পল্‌তার ইংরাজদিগেরও তাহা জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ বাণিজ্যাধিকার লাভ করিবার জন্যই কাকুতি মিনতি জানাইতে লাগিলেন এবং সিরাজদ্দৌলাও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে ক্রটি করিলেন না।

সকল গোলযোগের অবসান হয় হয়, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, ইংরাজবণিক অনেক গোলা বারুদ লইয়া মান্দ্রাজ হইতে পল্‌তার বন্দরে আসিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছেন! এই সংবাদ আসিতে না আসিতেই সেনাপতি ওয়াট্‌স্‌নের নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজদূত উপনীত হইল।

ওয়াট্‌স্‌নের পত্রখানি এইরূপ:—

FROM ON BOARD HIS BRITANICK MAJESTY'S SHIP KENT,
AT FULTA, THE 17*th December*, 1756.

"The King, my master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet, to protect the East India Company's trade, rights and privileges. The advantages resulting to the Mogul's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects, are too apparent to need enumerating: how great was my surprise, therefore, to hear you had marched against the said Company's factories, with a large army, and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects, amounting to a large sum of money, and killed great numbers of the King my master's subjects.

"I am come down to Bengal to re-establish the said Company's servants in their former factories and houses, and hope to find you willing to restore them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benefit of having the English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered and by that means put an amicable end to the troubles, and secure the friendship of my King, who is a lover of peace and delights to act in equity. What can I say more?"*

* After they had been sometime at sea, a Council was held on board Admiral Watson's ship to settle the distribution of prize-money.—Clive.

নবম অধ্যায়।

কে শান্তিপ্রিয়,—মুসলমান সিরাজ, না খৃষ্টীয়ান ইংরাজ?

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌স্‌ন্‌ পল্‌তায় পদার্পণ করিয়াই বীরদর্পে কলিকাতা পুনরধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যে মনে মনে লঙ্কাভাগ করিয়া তাহার কানাধন লুণ্ঠন করিবার জন্যই এতদূর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, পল্‌তার ইংরাজেরা তাহার গুপ্ত সমাচার জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিতে নিতান্ত অসম্মত;—নবাব যখন বিনাযুদ্ধেই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আর অনর্থক নরহত্যায় লিপ্ত হইবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন যে যুদ্ধে জয় পরাজয় এবং সৈন্যক্ষয় হইবার অনিশ্চিত ফলাফল পরিহার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ধীরভাবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বিনাযুদ্ধে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিতে পারা যাইবে। ক্লাইব সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ত আর কলিকাতার রণপলায়িত কাপুরুষ ইংরাজ-দরবারের আজ্ঞাধীন হইয়া বঙ্গদেশে শুভাগমন করেন নাই? সুতরাং তাঁহারা কেহই ক্লাইবের গতিরোধ করিতে পারিলেন না; কলিকাতা আক্রমণ করাই স্থির হইয়া গেল! মহাবীর ক্লাইব তখন গর্ব্বোন্নত মস্তকে অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন, এবং সেই পত্র সিরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য মানিকচাঁদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলাবাহুল্য মানিকচাঁদের সাহসে কুলাইল না; তিনি কিছুতেই সে উদ্ধতলিপি নবাবের নিকট প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন না। যথাসময়ে সেই

* Ive's Journal.

পত্রখানি সিরাজদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হইলে সন্ধির আশা, শান্তির আশা, ইংরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা,—সকল আশাই নির্ম্মূল হইত ; নবাবসেনা ভীমকলরবে কলিকাতাভিমুখে ধাবিত হইয়া ক্লাইবের সমরপিপাসা শান্ত করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিত না। পল্‌তার ইংরাজগণ সমর-বিরোধী ; তাঁহাদিগের সুহৃৎ মাণিকচাঁদও সমরবিরোধী ;—সুতরাং সে পত্র ক্লাইবের নিকট পড়িয়া রহিল।

ক্লাইব ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ময়দাপুরের ময়দানের নিকটে জাহাজ লাগাইয়া স্থলপথে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীতীরে বজ্‌বজ্‌ নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। ওয়াট্‌স্‌ন্‌ জলপথে সেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন, এবং যদি কেহ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়নের আয়োজন করে, স্থলপথে ক্লাইব তাহাদের ভবযন্ত্রণা দূর করিতে ত্রুটি করিবেন না ;—এইরূপ সংকল্পেই যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হইল ! কিন্তু যুদ্ধের উপক্রমেই গৃহকলহের সূত্রপাত হইল। স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে, কামান টানিবার জন্য, বারুদ টানিবার জন্য, রসদ টানিবার জন্য, গোরু ঘোড়া মহিষের প্রয়োজন। কলিকাতার পলায়িত ইংরাজগণ এই সকল জীবজন্তু সংগ্রহ করিয়া না দিলে ক্লাইবের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই নবাবের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। ক্লাইব তাঁহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া স্বয়ং অধ্যবসায়বলে সমস্যাপূরণ করিতে অগ্রসর হইলেন ;—দুইটিমাত্র কামান এবং একখানিমাত্র বারুদের গাড়ি সজ্জীভূত হইল ; পদাতিকগণ পর্য্যায়ক্রমে তাহা টানিয়া লইতে লাগিল। এইরূপ অসম সাহসে অকুতোভয়চিত্তে অপরাজিত উৎসাহে ক্লাইবের সেনাপ্রবাহ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, ওয়াট্‌স্‌ন্‌ জলপথে ধীরে ধীরে উজান বহিয়া চলিতে লাগিলেন। *

ময়দাপুর হইতে বজ্‌বজিয়া আটক্রোশ। পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায়, বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া সেই আটক্রোশ আসিতেই ইংরাজ-সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। দুর্গটি নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন, তন্মধ্যে সিপাহীর সংখ্যাও যৎসামান্য ;—তথাপি ওয়াট্‌স্‌ন্‌ না আসিলে, একাকী ক্লাইব দুর্গাক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না। সকলেই পথশ্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রহরী পর্য্যন্ত না রাখিয়া, সকলেই একে একে অনাবৃত ভূতলশয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ইংরাজেরা সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এই সংবাদে মাণিকচাঁদ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে, সন্ধিও হয় হয় হইয়াছে ;—সুতরাং তিনি মোটেই যুদ্ধকলহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি নবাবের লবণের মর্য্যাদা রক্ষার

* This arose from the continued apprehensions of the Council at Fulta, who, clinging to their first fear with more than martyr's steadfastness, did not venture to provide a single beast either of draught or burden, lest they should incur the Subahdar's resentment.—Thornton vol. I. 204.

জন্য লোক দেখাইবার মত বাহাড়ম্বর করিতে হইল, মাণিকচাঁদ স্বয়ং সসৈন্যে বজ্‌বজিয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মাণিকচাঁদ গোলাবর্ষণ করিয়া সুপ্তসিংহকে প্রবোধিত করিতে না করিতে উভয়দলে শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে পরীক্ষায় রাজা মাণিকচাঁদ বীরোচিত কর্ত্তব্যপালনের জন্য ব্যাকুল হইলেন না ;—ইংরাজেরা দুই চারিটি গোলা ছাড়িতে না ছাড়িতেই মাণিকচাঁদ পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা পরিহাসচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "মাণিকচাঁদের উষ্ণীষের নিকট দিয়া শন্‌ করিয়া বন্দুকের গুলি চলিয়া গেল, আর তিনি অমনি চম্পট।" * তিনি আর সে অঞ্চলে মুহূর্ত্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারিলেন না ; বজ্‌বজ্‌ ছাড়িয়া, কলিকাতা ছাড়িয়া, একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিলেন ! মাণিকচাঁদের পলায়নকাহিনী সবিশেষ বিস্ময়-পরিপূর্ণ ;—ইতিহাস তাহার রহস্যনির্ণয় না করিয়া তাঁহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়াছে ; কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত মাণিকচাঁদের যে নূতন সখ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত কি ইহার কোনই সংস্রব ছিল না ? †

ইহার পর আর যুদ্ধ করিতে হইল না। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌স্‌ন্‌ ২রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা-দুর্গের নিকটস্থ হইলে, দুর্গাধিকারী সিপাহীদল দুই চারিটি গোলা চালনা করিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল ;—মহাবীর ক্লাইব সদর্পে কলিকাতার শূন্যদুর্গে বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়া দিলেন।

দুর্গজয় সুসম্পন্ন হইল, রণকোলাহল শান্তিলাভ করিল, কিন্তু ইংরাজসেনানায়কদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌স্‌ন্‌ উভয়েই চতুরচূড়ামণি ;—চতুরে চতুরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। উভয়েই বুঝিলেন যে দুর্গ যাঁহার হস্তে থাকিবে, লুটের ধনে তাঁহারই আধিপত্য জন্মিবে। সুতরাং ওয়াট্‌স্‌ন্‌ দুর্গদখল করিবার জন্য কাপ্তান কূটকে এক পরোয়ানা প্রদান করিলেন। কাপ্তান কূট পরোয়ানা লইয়া দুর্গদ্বারে উপনীত হইবামাত্র ক্লাইব তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "ওয়াট্‌স্‌নের অধিকার মানি না ; আমি দুর্গাধিপতি,—যদি আজ্ঞাপালন করিতে ইতস্ততঃ কর, এখনই কারারুদ্ধ করিব !" কূট সাহেব কূটকৌশলে পরাস্ত হইয়া ওয়াট্‌স্‌ন্‌কে পরোয়ানা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ওয়াট্‌স্‌ন্‌ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন ;—তিনি কাপ্তান স্পিককে পাঠাইয়া দিলেন ; স্পিক আসিয়া ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার আজ্ঞায় দুর্গাধিকার করিয়াছ ?" ক্লাইব বলিলেন যে তিনিই প্রধান সেনাপতি, সুতরাং দুর্গাধিকারে তাঁহারই একমাত্র ক্ষমতা,—ওয়াট্‌স্‌নের কোন ক্ষমতা নাই। এই সংবাদে

* Ive's Journal.

† The Government (in 1763) agreed to entertain on the Company's pay the son of the deceased Manickchand, who was useful to them in various ways during the preceding 30 years though he led the Nawab's troops against the English at the battle of Budge-Budge.—Revd. Long.

ওয়াটস্‌ন্‌ বলিয়া পাঠাইলেন যে, ক্লাইব সহজে দুর্গাধিকার পরিত্যাগ না করিলে "তাঁহাকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিব";—ক্লাইব বলিলেন, 'তথাস্তু; কিন্তু এই আত্মকলহের জন্য ওয়াট্‌স্‌ন্‌ দায়ী'! অবশেষে কাপ্তান লাথাম ও স্বয়ং ওয়াট্‌স্‌ন্‌ও দুর্গমূলে শুভাগমন করিলেন, এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর উভয়পক্ষে সন্ধি হইয়া ক্লাইবের হস্তেই দুর্গাধিকার সমর্পিত হইল।* পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দুর্গজয়ের কাহিনী লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু এরূপ গৃহকলহের দৃষ্টান্ত বোধ হয় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয়দলের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য ড্রেক সাহেবকে কলিকাতার শাসনভার প্রদান করা হইল; তিনি পুনরায় কলিকাতার কর্ত্তা হইয়া সগৌরবে আসনগ্রহণ করিলেন।

ইংরাজেরা দুর্গপ্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গমধ্যে কোম্পানীর দ্রব্যজাত যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে,—কিছুই অপহৃত বা বিলুণ্ঠিত হয় নাই। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যে সকল বাড়ীঘর ছিল, তাহাই কেবল সিপাহীরা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্বীকার বাক্যই সিরাজদ্দৌলার দোষক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যে ইংরাজদিগকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন না, তাহা কেবল মুখের কথা নহে, তাঁহার এই সকল কার্য্যই তাহার অকাট্য প্রমাণ, কিন্তু ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ অনেকে স্বপ্রণীত গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছেন।

দুর্গ হস্তগত হইল। দেশের লোকে দলে দলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইংরাজ-বাণিজ্য পুনঃসংস্থাপনের সূত্রপাত হইল। ক্লাইবের কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ হইয়া গেল; কিন্তু লঙ্কাভাগ ত হইল না! কলিকাতা ইংরাজের রাজধানী; তাহা লুণ্ঠন করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং দেশ লুণ্ঠনের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! অবশেষে হুগলী লুণ্ঠন করা স্থির হইল। হুগলী বহুদিনের পুরাতন স্থান; ফৌজদারের রাজধানী; বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তিভূমি;—সেখানে অবশ্যই অগণিত ধনরত্ন পুঞ্জীকৃত থাকা সম্ভব। মেজর কিলপ্যাট্রিক বহুদিন নিকর্ম্মা বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার উপরেই লুণ্ঠনের ভার সমর্পিত হইল। পদাতিক গোলন্দাজ, ভলণ্টিয়ার,—লুণ্ঠনলোভে ইংরাজমাত্রেই হুগলীর দিকে ছুটিয়া চলিল। হুগলীর দুর্গ এবং রাজধানী লুণ্ঠিত হইল; তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া ইংরাজসেনা যতদূর পারিল লোকের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।†

ওয়াট্‌স্‌ন্‌ এবং ক্লাইব বঙ্গদেশে শুভাগমন করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলার নিকট সন্ধির প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলাও সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে কথায় কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া, ইংরাজেরা বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তথাপি সিরাজদ্দৌলা তাহাতে উত্যক্ত না হইয়া পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে:—

* Evidence of Lord Clive before the Committee of the House of Commons, 1772.

† The fort and city were plundered, and as many of the magnificent houses destroyed, as the short time would permit.—Ive's Journal.

January 23, 1757.

You write me, that the King your master sent you into India to protect the Company's settlements, trades, rights and privileges: the instant I received this letter, I sent you an answer; but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again.

I must inform you, that Roger Drake, the Company's Chief in Bengal, acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority; he gave protection to the King's subjects who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid, but to no purpose. On this account, I was determined to punish him, and accordingly expelled him my country: but it was my inclination to have given the English Company permission to have carried on their trade as formerly, had another Chief been sent here: for the good therefore of these Provinces, and the inhabitants, I send you this letter; and if you are inclined to re-establish the Company, only appoint a Chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce upon the same terms as heretofore enjoyed. If the English behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection, and assistance." *

এই পত্রে সিরাজচরিত্রের যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত ইতিহাস-বর্ণিত সিরাজদ্দৌলার কত প্রভেদ! কিন্তু ইংরাজেরা সে সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয়প্রদান করিতে পারিলেন না। এই পত্র যখন ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, তখন তাঁহারা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া, হুগলী বিপর্য্যস্ত করিয়া, বীরসিংহ হইয়া বুটীশদুর্গে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুতরাং ওয়াট্‌স্‌নের শান্তমূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া গেল;—তিনি এবার সিংহবিক্রমে প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন যে:—

"You told me in your letter, that the reason of your expelling the English out of these countries was, the bad behaviour of Mr. Drake, the Company's Chief in Bengal. But besides that, Princes and Rulers of States, not seeing with their own eyes, nor hearing with their own ears, are often misinformed, and the truth (is) kept from them by the arts of

* Ive's Journal.

crafty and wicked men; was it becoming the justice of a Prince to punish all for one man's sake? Or to ruin and destroy so manoy innocent people as had no way offended, but who, relying on Our Royal Phirmaund, expected protection and security both to their property and lives, instead of oppression and murder, which they unhappily found? Are these actions becoming the justice of a Prince? No body will say, they are. They can only then have been caused by men, who have misrepresented things to you through malice, or for their own private ends; for great Princes delight in acts of justice, and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the fame of a great Prince, and lover of justice, shew your abhorrence of these proceedings, by punishing those evil counsellors who advised them; cause satisfaction to be made to the Company, and to all others who have been deprived of their property, and by these acts turn off the edge of the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. Drake, as it is but just that the master alone should have a power over his servant, send your complaints to the Company, and I will answer for it they will give you satisfaction.

Although I am a soldier as well as you, I had rather receive satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects."*

এই পত্রখানি যখন সিরাজদ্দৌলার হস্তগত হইল, তৎপূর্ব্বেই হুগলীর লুণ্ঠনকাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহারে চিরদিন যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, ওয়াট্সনের পত্রেও তাহাই হইল। সিরাজদ্দৌলা মুসলমান,—ওয়াট্সন্ সুসভ্য খৃষ্টীয়ান; সুতরাং মুসলমান-নবাব খৃষ্টীয়ান সওদাগরের ধর্ম্মনীতির যুক্তিতর্ক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা বাক্য-নবাব; 'যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহার অনুকরণ করিও না'—এই নিগূঢ় নীতি-রহস্যের উপাসক; পরকার্য্য সমালোচনায় প্রগাঢ় পণ্ডিত; আত্মকার্য্য লইয়া কেহ সমালোচনা করিতে চাহিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন; কার্য্য যেরূপ হয় হউক, বাক্যে তাহার দোষক্ষালনের সময়ে সকলেই পঞ্চমুখে ইংরাজের গুণগান করিতে লালায়িত;—সিরাজদ্দৌলা তরুণযুবক, তিনি ইংরাজ-চরিত্রের এইরূপ সমালোচনা

* Ive's Journal.

করিয়া ইংরাজের নামে শিহরিয়া উঠিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা পদাশ্রিত বণিক হইয়াও হুগলীর নিরপরাধ নাগরিকদিগকে (কেবলমাত্র লুণ্ঠন-লোভেই) হত্যা করিয়া, তাহাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া দস্যুতস্করের ন্যায় অর্থশোষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিনা তরবারির শোণিত-কলঙ্ক ধৌত করিতে না করিতেই লেখনী গ্রহণ করিয়া প্রবীণ ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় কলিকাতা লুণ্ঠনের জন্য সিরাজদ্দৌলাকে তিরস্কার করিতে বসিয়াছেন। যুদ্ধকলহে একজনের অপরাধে চিরদিনই দশজনের দণ্ড হইয়া থাকে। এক রাবণের অপরাধে সমগ্র রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল; এক নেপোলিয়নের অপরাধে অগণ্য ফরাসীসেনার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; ইংরাজরাজ্যেও এক নরপতির কল্পিত অপরাধে অসংখ্য নাগরিকের শোণিত-প্রবাহে শ্বেতদ্বীপ রুধিরচর্চ্চিত লোহিতবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার ইংরাজেরা দশজনে মিলিয়া, সভা করিয়া, মন্তব্য লিখিয়া, নবাবদূতকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া কি সমুচিত অপরাধ করেন নাই;—না, সে অপরাধ কেবল একজনের অপরাধ? যাঁহারা অপরাধী ড্রেক সাহেবের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লড়িবার জন্য যুদ্ধশিক্ষা করিয়া টান্নার দুর্গাক্রমণে, উমাচরণের সর্ব্বনাশ সাধনে অতিমাত্র প্রশংসনীয় বীরকীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া কার্য্যকালে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে নিরপরাধ হইলেও আত্মকার্য্যেই অপরাধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে;—রাজার অপরাধে প্রজার, সেনাপতির অপরাধে সেনাদলের, নানারূপ দণ্ড হইয়া থাকে। যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিলে, তাহাতে রাজদুর্গের সঙ্গে সঙ্গে কত কাঙ্গাল-কুটিরও ভস্ম হইয়া যায়;—কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? ওয়াট্সন্ কোন লজ্জায় সত্যসঙ্কোচ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সিরাজদ্দৌলা পরের কথায় নির্ভর করিয়া ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন? কলিকাতা হইতে নবাবদূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার কথা কলিকাতার ইংরাজেরাও অস্বীকার করেন নাই; ওয়াট্সন্ কি গলাবাজিতে সকল কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন? ওয়াট্সন্ যাহাই বলুন, ইংরাজের কাগজপত্র তাহার পক্ষসমর্থন করে না। ড্রেক সাহেব যেরূপ উদ্ধত ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়াট্সন্ বলেন যে তজ্জন্য কোম্পানীর কাছে করজোড়ে নালিশ করাই সিরাজদ্দৌলার কর্ত্তব্য ছিল। সিরাজদ্দৌলা আর তাহার কি প্রত্যুত্তর দিবেন? তিনি যে দেশের নবাব, ড্রেক সাহেব সেই দেশের একদল সওদাগরের গোমস্তা মাত্র; অথচ সেই দেশে বসিয়া তাঁহাকে ইহাও শুনিতে হইল যে, কোম্পানীর নিকট নালিশ না করিয়া নিজে নিজে ড্রেক সাহেবকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে! শাসনক্ষমতা সংস্থাপনের জন্য, আত্ম-মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনমান রক্ষা করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আত্ম-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না; মুসলমান-নবাব উত্ত্যক্ত হইয়াও কতদূর ক্ষমাশীল হইতে পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্য ওয়াট্সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"You have taken and plundered Hughley, and made a war upon my

subjects: these are not acts *becoming merchants!* I have, therefore, left Muxudabad, and am arrived near Hughley; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. *Nevertheless*, if you have a mind to have the Company's business settled upon its ancient footing, and to give a currency to their trade, send a person of consequence to me, who can make your demands, and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a Perwannah for the restitution of all the Company's factories, and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the English, who are settled in these Provinces, *will behave like merchants, obey my orders, and give me no offence*, you may depend upon it I will take their loss into consideration and adjust matters to their satisfaction.

You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore, if you will, on your part, relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, in order to gain your friendship, and preserve a good understanding for the future with your nation.

You are a Christian, and know how much preferable it is to accomodate a dispute, than to keep it alive; but if you are determined to sacrifice the interest of your Company, and the good of private merchants to your inclination for war, it is no fault of mine: to prevent the fatal consequence of such a ruinous war, I write this letter." *

এই পত্রের ছত্রে ছত্রে যেরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবীণ নরপতির শান্তপ্রকৃতির ঔদার্য্যগুণ প্রকাশিত রহিয়াছে, সিরাজদ্দৌলা তরুণযুবক হইয়াও যে সেরূপ উন্নত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার পক্ষে সবিশেষ গৌরবের কথা। রাজা হইয়া প্রজার সঙ্গে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হওয়া রাজার পক্ষে সর্ব্বথা অকল্যাণের কথা;—তাহাতে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি, একের অপরাধে দশের সর্ব্বনাশ এবং দেশের সমূহ অমঙ্গল। একথা সিরাজদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াই—সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ইংরাজদিগের ব্যবহারের তুলনা কর। কে শান্তি প্রিয়, —মুসলমান সিরাজ, না খৃষ্টীয়ান্ ইংরাজ?

* Ive's Journal.

দশম অধ্যায়।

আলিনগরের সন্ধি।

মুসলমান ইতিহাস-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ইংরাজেরা যখন হুগলী লুণ্ঠনে অবসরশূন্য, ঠিক সেই সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ পাইলেন যে, স্বদেশে ফরাসীদিগের সঙ্গে আবার সমরকলহ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ এবং ফরাসী শান্তভাবে জীবনধারণ করিতে শিখিল না। ইহাদের মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসর কেবল যুদ্ধকলহ চলিয়া আসিতেছে। কখন কখন রণশ্রান্ত হইলে, পরামর্শ করিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য উভয়েই কিছুদিনের মত সন্ধিসংস্থাপন করে;—কিন্তু কিছুদিন বিশ্রামলাভ করিয়াই পুনরায় সমর-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে।" *

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইংরাজদিগের মত ফরাসীরাও ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বাহুবল সুবিস্তৃত করিতেছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঙ্গালাদেশে তিনশত গোরা এবং অনেকগুলি সুশিক্ষিত গোলন্দাজ রাখিতেন। এদেশের লোকের নিকট ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীরাই বীরকীর্ত্তির জন্য সমধিক সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বদেশে ফরাসীজাতির সহিত সমর-কোলাহল উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। চিরশত্রু ফরাসীসেনার সঙ্গে নবাবের সৈন্যদল মিলিত হইলে, ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইতে কতক্ষণ? ক্লাইব তাহা বুঝিতেন। তিনি বিলাতের সংবাদ পাইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, এবং এই দুঃসময়ে সহসা গায়ে পড়িয়া সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে কলহের সূত্রপাত করিয়া যে সমূহ অমঙ্গল আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। † তাড়াতাড়ি উমাচরণ এবং জগৎশেঠের শরণাগত হইয়া কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে অকস্মাৎ হুগলী লুণ্ঠনের সমাচার শুনিয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধোন্মত্তহৃদয়ে কলিকাতাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন; ইংরাজগণ সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইলে কি হইবে? নবাব কি আর সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন? সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এতদিনে ইংরাজের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। ‡ সিরাজদ্দৌলা 'নরশোণিত-লোলুপ নৃশংস নরপতি' হইলে তাহাই হইত। কিন্তু তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া শান্তি সংস্থাপনের জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকগণ সে কথা স্বীকার না করিলেও, কর্ণেল ক্লাইব নিজেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে,

* Mustafa's Mutakherin, I. 759.

† Thornton's History of the British Empire, vol. I, 208.

‡ The English were now very desirous to make their peace with that formidable ruler; but the capture of Hoogly, undertaken *solely with a view to plunder*, had so augmented his rage, that he was not in a frame of mind to receive from them any proposition.—Mill, vol. II. 157.

সন্ধির জন্য তাঁহাকে সবিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় নাই ;—স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাই সর্ব্বাগ্রে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সকল আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছিলেন। *

সিরাজদ্দৌলা সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন কেন ? ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি,—সে ত কেবল বালির বাঁধে সমুদ্রতরঙ্গের গতিরোধ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস ! যদি সত্যসত্যই সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তথাপি কয়দিন তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে ? স্বদেশের নিকটতম প্রতিবাসীর সঙ্গে যাহাদিগের কলহবিবাদ ছয়শত বৎসরেও শান্তিলাভ করিল না, বিদেশে তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা কয়দিন প্রতিপালিত হইবে ? সন্ধিপত্র ত কেবল ইংরাজের মুখের কথা ;—তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি ? এই ত সেদিন তাঁহারা বিপদে পড়িয়া সন্ধির প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু সেকথা পুরাতন না হইতেই লুণ্ঠন-লোভে হুগলীর কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন ! সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াও ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হয় নাই,—কত বহুমূল্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, কত নিরন্ন কাঙ্গালকুটির দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, হুগলীর ইতিহাসবিখ্যাত সমৃদ্ধজনপদ শ্মশানভস্মে পরিণত হইয়াছে ! আজ না হয় আবার ফরাসী-সমর-শঙ্কায় চিন্তাকুলহৃদয়ে খৃষ্টীয়ান ইংরাজ নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব মেষশাবকের ন্যায় করুণকণ্ঠে "শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিয়া কাতর ক্রন্দনে নবাব-দরবারের শরণাপন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু সময় পাইলেই তাঁহারা যে আবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি ?

যদিও অনেকে এই সকল কথা উপস্থিত করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে বাধা দিবার আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না, তথাপি সিরাজদ্দৌলা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কলিকাতায় শিবির-সংস্থাপন করিয়াই সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা কি ইংরাজ-ভয়ে ভীত হইয়াই সন্ধির জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন ? কেহ কেহ বলেন যে, তাহাই একমাত্র কারণ। কিন্তু ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপ বিপদবেষ্টিত, তাহাতে ভীত হইবার কারণ ছিল না ;—তাঁহাদের সেনাবল অল্প ; তাহারও কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরে তরঙ্গতাড়িত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে ; যাহারা বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারাও সকলে জীবিত নাই ; আর যাহারা জীবিত, বাঙ্গালার জলবায়ু অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে ! ইহাদের ভয়ে ভীত হইবার কারণ ছিল না ;—তথাপি সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন ?

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে ভাল মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না ; তাঁহার বাল্যসংস্কারের সহিত যৌবনের অভিজ্ঞতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজদমন করিতে না পারিলে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে না। নবাব আলিবর্দ্দীও অন্তিম সময়ে

* According to Orme (vol. II. 129) it was Clive who proposed negotiations.—Clive himself represented the overture as coming from the Subahdar.—Thornton's History of the British Empire, vol. I. 209.

তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা সে কথার ক্রমশঃ পরিচয় পাইতে লাগিলেন, এবং দিব্যনেত্রে ইংরাজের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আতঙ্কযুক্ত হইলেন। আজ হুগলী বিপর্য্যস্ত হইল, কাল হয়ত অন্য কোন স্থান বিধ্বস্ত হইবে। সিরাজ দেখিলেন যে, ইংরাজ দ্বিতীয় বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত করিবে ;—কত সম্পন্ন জনপদ শ্মশান হইবে, কত নিরীহ নাগরিক হাহাকার করিবে, কত রুধিরকর্দ্দমে বঙ্গভূমি কলঙ্কিত হইবে ; এবং এত করিয়াও একদিনের জন্য শান্তিসুখ উপভোগ করিবার অবসর ঘটিবে না ! ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার দুইটিমাত্র সদুপায় ;—হয় শত্রুতাসাধনে, না হয় মিত্রতাবন্ধনে ; হয় করাল কৃপাণমুখে, না হয় লেখনীসাহায্যে। আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া শত্রুতাসাধন করিয়া দেখিলেন ;—তাহাতে হিতে বিপরীত হইল ; ইংরাজ দমন হইল না ; বরং চিরশত্রুতার সূত্রপাত হইল। সুতরাং মিত্রতাবন্ধনে ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার জন্যই সিরাজদ্দৌলা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাহিতৈষণা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া কুচক্রী মন্ত্রীদল তাঁহার প্রস্তাবে নানা প্রকারে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ; কিন্তু সিরাজদ্দৌলা বিচলিত হইলেন না।

নওয়াজেস মোহম্মদ এবং শওকতজঙ্গের পরলোকগমনে কুচক্রীদলের সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল। ইংরাজ একমাত্র শেষ সম্বল। তাঁহারা যদি সিরাজের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সিরাজ নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাতে দেশের কল্যাণ, কিন্তু দুষ্টদলের সর্ব্বনাশ। নবাব এতদিন বিপদবেষ্টিত বলিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন ; সুতরাং সিরাজদ্দৌলাকে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর প্রদান করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহারা ইংরাজের সঙ্গে চিরশত্রুতা সঞ্জীবিত রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত রাখিবার জন্যই সন্ধির প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন ; এবং জানিতেন বলিয়াই আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইলেন না।

ইংরাজেরা সন্ধির জন্য ব্যাকুল ; সিরাজদ্দৌলাও সন্ধির জন্য লালায়িত ! এ সন্ধির গতিরোধ করিবে কে ? তখন কুচক্রীদলের কুমন্ত্রণা আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য প্রতিবাদে পরাজিত হইয়া অপ্রকাশ্য কৌশলবলে সিরাজদ্দৌলার শান্তি-পিপাসার গতিরোধ করিবার আয়োজন হইল !

সেকালের কলিকাতা সহরে বণিকরাজ উমাচরণের রাজবাটীই সর্ব্বাপেক্ষা পরম রমণীয় স্থান বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার দীপালোকবিভূষিত সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যানেই সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। চারিদিকে গর্ব্বোন্নতমস্তকে সশস্ত্র সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান,—যথাযোগ্য রাজপরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অমাত্যদল যথাস্থানে করজোড়ে উপবেশন করিয়াছেন,—মধ্যস্থলে সিংহাসন, তাহার উপর সুবিস্তৃত মসনদ, কনকদণ্ডের উপর বিবিধ রত্নরাজি-বিজড়িত বিচিত্র চন্দ্রাতপ,—সেই স্বর্ণসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া সিরাজ-

দ্দৌলার যৌবনোন্নত সুকুমার দেহকান্তি সদ্যোজাত প্রফুল্ল চম্পকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে ;—ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়ালস্ এবং স্ক্র্যাফ্টন্ দরবারে পদার্পণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সৌভাগ্য-গর্ব্বের ফলিত জ্যোতিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! এই রত্ন-সিংহাসন যাঁহার পাদপীঠ, এই সুশিক্ষিত দৃঢ়োন্নত বীরমণ্ডলী যাঁহার সেনানায়ক, এই বিবিধ বিদ্যাবিশারদ মন্ত্রীদল যাঁহার মন্ত্রণাসহায়, এই বিভবচ্ছটা যাঁহার রত্নমুকুট সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে,—সর্ব্বনাশ! ইংরাজ-বণিক কোন্ সাহসে তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাদিগের মনে হইল,—এ সকল বুঝি ইন্দ্রজাল! এ সকল বুঝি কেবলমাত্র ইংরাজদিগকে ভয় দেখাইবার বাহাড়ম্বর! তখন তাঁহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্যই তিনি সশরীরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইংরাজেরা বলিলেন যে, তাঁহারাও সন্ধির জন্য লালায়িত হইয়াছেন; যুদ্ধকলহে তাঁহাদিগের বাণিজ্যবিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছে। সিরাজদ্দৌলা তখন ইংরাজদিগকে সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেওয়ানের পটমণ্ডপে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহারা সহাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া বিদায়-গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কুচক্রী-মন্ত্রীদলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা সুকৌশলে সন্ধির প্রস্তাব চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যে দুইজন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রতিনিধি সাজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া; নবাব-দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুঠিয়াল সিবিলিয়ান;—সিরাজদ্দৌলার নামে তাঁহাদের অন্তরাত্মা সহজেই কাঁপিয়া উঠিত। মন্ত্রীদল অনন্যোপায় হইয়া, এই ইংরাজযুগলের মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার করিয়া কার্য্যোদ্ধারের আয়োজন করিলেন!

ইংরাজেরা দরবার হইতে বাহির হইবামাত্র সুচতুর উমাচরণ আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের কাণে কাণে নিতান্ত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"দেখিতেছ কি? প্রাণ বাঁচাইতে চাহ ত এখনই পলায়ন কর। সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত হইয়াছ? এ সন্ধি নহে;—ইহা কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল। নবাবের সেনাদল আসিয়াছে, কিন্তু কামানগুলি এখনও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে; সেইজন্য তোমাদিগকে সন্ধির কথা উঠাইয়া প্রতারিত করিতেছে। কামান আসিলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না! তোমরা কয়জন? সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে?" ইংরাজদ্বয়ের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এই সাদর সম্ভাষণ, এই সন্ধির শান্তি-সূচনা,—এ সকলই কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল? এখন উপায় কি? মুখের ভাব দেখিয়া উমাচরণ বুঝিলেন যে,—ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর উপায় কি? দেওয়ানের পটমণ্ডপে গমন করিলেই বন্দী হইতে হইবে! এখনও সাবধান হও। মশাল নিভাইয়া দিয়া আঁধারে আঁধারে দুর্গমধ্যে পলায়ন কর।" যে কথা, সেই কাজ;—ইংরাজেরা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, সিরাজদ্দৌলা কি কামান না লইয়া রিক্তহস্তে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন?

সিরাজদ্দৌলা এই কুটিল চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; কিন্তু সে রজনীতে ইংরাজ-শিবিরে একজনও ঘুমাইবার অবসর পাইল না। ক্লাইব তপ্তাঙ্গারের ন্যায় প্রদীপ্ত প্রতাপে ওয়াট্‌সনের নিকট ছুটিয়া চলিলেন;—ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইয়া আপন পদাতিকসেনার সহিত সম্মিলিত করিলেন; এবং রজনী তিন ঘটিকার সময়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সসৈন্যে নবাব-শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব-শিবিরে ৬০০০০ সিপাহী এবং ১৮০০০ অশ্বারোহী ৪০টি কামান লইয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন;—তাহারা জাগিয়া উঠিলে যে ইংরাজের কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ক্লাইব তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না!

একে নিশাকাল; তাহাতে নিদারুণ শীত। সকলেই নিঃশব্দ নিঝুম। সেই নৈশনীরবতা আলোড়ন করিয়া ইংরাজের কামানগুলি ভীম ভৈরবরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্; গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্; গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্;—ইংরাজের কামান ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল, গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্। সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া সিপাহীসেনা কামান-গর্জ্জনের কারণ বুঝিতে পারিল না! তাহারা তুমুল কোলাহলে নবাব-শিবির আকুল করিয়া তুলিল; এবং যে যেখানে ছিল, হাতিয়ার বাঁধিয়া, মশাল জ্বালাইয়া, কামানের নিকটে দাঁড়াইতে লাগিল। তখন নবাব-শিবিরের কামানগুলিও প্রচণ্ড বিক্রমে অনলবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না!

সিরাজদ্দৌলা গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভাত হইলেও ভাল করিয়া দৃষ্টি-সঞ্চালনের উপায় হইল না;—ঘন ঘনাকারে ধূমপুঞ্জ দিঙ্মণ্ডল আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার উপর কুজ্ঝটিকায় চারিদিকে সমাচ্ছন্ন; নিকটে কি দূরে, কোনদিকেই নয়নসঞ্চালনের সুবিধা নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া উভয়পক্ষের কামানগুলি কড়্ কড়্ করিয়া উঠিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে আহতের আর্ত্তনাদে চারিদিক আকুল করিয়া তুলিতেছে! সকলেই বুঝিল যে লড়াই বাধিয়াছে;—কিন্তু সহসা লড়াই বাধিবার কারণ কি সে কথা কেহই বুঝাইতে পারিল না।

৭টা বাজিয়া গেল। তথাপি সেই কুজ্ঝটিকা, তথাপি সেই ধূমপুঞ্জ, তথাপি সেই কামান-গর্জ্জন। কে কোথায় ছিটাইয়া পড়িয়াছে;—শত্রু নিকটে কি দূরে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না; কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানেরা কামানে অগ্নিসংযোগ করিতেছে, আর প্রদীপ্ত লৌহপিণ্ডরাশি তীব্রতেজে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। যখন দিবালোক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, ক্লাইবের-সমর-পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তাঁহার গর্ব্বোন্নত গোরাসৈন্য দূরপথে হেটমুণ্ডে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতেছে;—আর মুসলমান অশ্বসেনা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোড়া ছুটাইয়া ধাবিত হইতেছে। ইংরাজদিগের দুইটি

কামান মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে ;—এখানে, ওখানে, সেখানে, চারিদিকে ইংরাজ-সেনার বীরমুণ্ড রুধিরকর্দ্দমে ধরা-বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! একে সামান্য সেনাবল লইয়া ক্লাইব এবং ওয়াট্‌স্‌ন্‌ বঙ্গ-দেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন ; তাহাতে ক্লাইবের অবিমৃষ্যকারিতায় একদিনেই ১২০ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইয়াছে, এবং শতাধিক সিপাহীসেনা কালকবলে নিপতিত হইয়াছে! নবাব-শিবিরেও হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে ;—কত হতভাগা আর নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিবার অবসর পায় নাই ; কত সিপাহী শত্রুমিত্রের যুগপৎ অনলবর্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে!

সহসা এই যুদ্ধকোলাহল উপস্থিত হইল কেন? সিরাজদ্দৌলা তাহার কারণানুসন্ধান করিতে বসিয়া মন্ত্রীদলের মন্ত্রণার বাহাদুরী বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মীরজাফরের ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনিও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন। এই সেনাপতি, এই প্রভুভক্ত মন্ত্রীদল লইয়া ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস হইল না ;—সিরাজদ্দৌলা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

যে সিরাজদ্দৌলা আবাল্য ইংরাজদলনে কৃতসংকল্প, তিনিই যে আবার সন্ধির জন্য সরল-ভাবে লালায়িত হইয়াছেন, ইংরাজেরা সে কথায় সহসা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। ক্লাইব রণভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল ; কিন্তু ওয়াট্‌সন্‌ তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—

"I am fully convinced that the Nabob's letter was only to amuse us in order to cover his retreat, and gain time till he is reinforced, which may be attended with very fatal consequences. For my own part, I was of opinion that attacking his rear when he was marching off, and forcing him to abandon his cannon, was a most necessary piece of service to bring him to an accomodation ; for till he is well thrashed, don't, sir, flatter yourself he will be inclined for peace. Let us, therefore, not be overreached by his politics, but make use of our arms, which will be much more prevalent than any treaties or negotiations."

ক্লাইব কিন্তু ওয়াট্‌স্‌নের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। মন্ত্রীদলের কুমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ক্লাইব যাহা চাহিলেন, তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধিপত্র সুস্থির করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজদিগের অনুরোধ-রক্ষার জন্য মীরজাফর এবং রায় দুর্ল্লভকেও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল। ইতিহাসে ইহারই নাম,—'আলিনগরের সন্ধিপত্র।'

এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজবণিক বাদশাহী ফরমাণের লিখিত সমুদায় বাণিজ্যাধিকার পুনঃ-

প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার দুর্গসংস্কারের অনুমতি প্রদত্ত হইল ; কলিকাতায় টাকশাল বসাইয়া বাদশাহের নামে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল ; এবং কলিকাতা লুণ্ঠনসময়ে ইংরাজদিগের যাহা কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, সিরাজদ্দৌলা তাহাও পূরণ করিবার জন্য সম্মতিদান করিলেন।

তত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যখন বিন্দির মা মিত্রগৃহিণীর নিকট আসিয়া মৃণালিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার প্রথম প্রস্তাব করিল, তখন তিনি রৌদ্রে বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন ; সুতরাং প্রথমে কথাটা তাঁহার কাণে পৌঁছিল না।

বিন্দির মা পুনরায় কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কি বলেন? মা ঠাকরুণ অনেক ক'রে বোলে দিয়েছেন—তা মেনাদিদি এখানে রয়েছেও ত অনেক দিন।"

মিত্রগৃহিণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ; কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "ওমা বল কি গো, এখন আমি কি কোরে বৌমাকে পাঠাই—, আমারই শরীর দেখ্‌ছ ত, কখন আছি কখন নাই—।"

পার্শ্বে এতক্ষণ ওপাড়ার "মেজ ঠাকরুণ" বসিয়া বসিয়া গ্রামের সমস্ত লোকের দোষগুণ বর্ণনা করিয়া মিত্রগৃহিণীকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন, এবং তাহার সহিত গৃহিণীর নিকট হইতে কয়েকটা আলু ও পটোল বিনামূল্যে আদায় করিয়া প্রাতঃকালের আহারের ভবিষ্যৎ সুখচিত্র মনে মনে কল্পনা না করিতেছিলেন, এমন নয়।

এই জন্য অকস্মাৎ মৃণালিনীর মাতার পুরাতন ঝি মৃণালিনীকে লইয়া যাইবার জন্য অসময়ে আসিয়া মেজ ঠাকরুণের ঔদারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত দেওয়াতে, তিনি ঝিয়ের উপর আন্তরিক চটিয়াছিলেন।

তিনি আর থাকিতে না পারিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "আহা—মেয়ে, তোকে কত বলি, শরীরের দেখ্। ভাগ্যিদোষে সকলেই গেছে—এক ছেলে আছে তার জন্যও ত সংসারটা দেখ্‌তে হয়—।" এই বলিয়া চক্ষে বস্ত্রমার্জ্জন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তুলিলেন। বিন্দির মা এত দুঃখেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না ; কারণ, যে মিত্রগৃহিণীর শারীরিক অসুস্থতা লইয়া এত কথা হইল, তিনি একটি প্রকাণ্ড তৈলপাত্রবিশেষের ন্যায় অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসুন্ধরাকে পীড়ন করিতেছিলেন।

বিন্দির মা বলিল—"প্রায় দু বচ্ছর হোল দিদিকে পাঠান নি, কতবার লোক এসে ফিরে গেছে, কিন্তু এবার একবার দয়া কোরে পাঠিয়ে দিন, বাবুর বড় ব্যায়ারাম হোয়েছে—তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমায় আসবার সময় কত কোরে—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিত্রগৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর আদিখ্যেতায় কাজ নাই। আমি কি তাঁকে চিনি না, কোন্‌মুখে মেয়ে নিয়ে যেতে লোক পাঠান? মনে নেই রথের তত্ত্বর কথা? জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব অমনি কোরে দিতে হয়? শীতের তত্ত্বে কি ঐ শাল? একবার মুখের কথা বোলেছিলাম বোলে, আমায় কম গালাগাল দিয়েছিল?"

মেজ ঠাকরুণ অমনি বলিয়া উঠিলেন "আহা—তুই মেয়ে, ভালমানুষ কি না, তাই সব সহি কোরেছিলি। মাগো মা—শীতের সময় জামাইকে কি ঐ তত্ত্ব করে—আমরা যে এত গরীব তবু আমরা নিজের হাতে প্রাণ থাক্‌তে কখনও এমন জিনিষ দিতে পারি না।"

মিত্রগৃহিণী পূর্ব্বস্বরে বলিলেন "বলত মেজ মাসি, আমার প্রবোধ কি ভেসে এসেছিল? যদি ভালরকম কুটুম্বিতা না কোরতে পারবি তা বাপু কেন আমার ঘরে এলি? তাঁকেও তখন আমি বারবার বোলেছিলাম,—গরীবের ঘরে কাজকারবার কোর না—কোর না। তা আমার কথাই বা শোনে কে? বোল্লেন কি না—মেয়েটি লক্ষীমন্ত—মেয়ে দেখেই দিচ্চি। আরে আমার সাতলক্ষীর লক্ষীর ধন রে—।"

বিন্দির মার কাছে প্রত্যেক কথা যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত বোধ হইতেছিল,—একবার জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু ভাবিয়া দেখিল আজ জোর করিবার সময় নহে।

সে প্রথমে অনুনয় বিনয় করিল, চোখের জল ফেলিল, হাতে পায়ে ধরিতেও ত্রুটি করিল না, কিন্তু কিছুতেই মৃণালিনীর শ্বাশুড়ির মন নরম হইল না।

অবশেষে বলিল "মা, আমি তামা তুলসী হাতে নিয়ে দিব্বি করছি ছুদিন পরেই আবার দিদিকে রেখে যাব,—কেবল ছুটী দিনের জন্য নিয়ে যেতে দাও, বাবু অনেক ছুঃখ ক'রে একবার দেখা করতে চেয়েছেন—।"

প্রবোধের মাতা ভ্রূকুটি সহকারে বলিলেন—"আমি তোমাদের সকলকেই চিনি। কই বাছা সব তত্ত্বই কোর্ব্বে বোলেছিলে, কটা কোরেছ শুনি। প্রবোধকে যে ঘড়ীর চেন দেবার কথা ছিল, তাই বা কই? বিয়ে ত আজ সাড়ে তিন বচ্ছর হোল হোয়ে গেছে; মিথ্যে অসুখের নাম কোরে মেয়ে নিয়ে যেতে চান ত আগে সব তত্ত্ব চুকিয়ে দিন—পাড়ার লোকের কাছে কি আর আমার মুখ দেখাবার যো আছে?"

মেজ ঠাকরুণ সুবিধা বুঝিয়া বলিলেন, "তা আর একবার কোরে বোলতে, মেয়ে? হা তত্ত্ব জো তত্ত্ব কোরে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছল, কিন্তু কোথায় বা কি?"

প্রবোধের মাতা মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "খ্যামতা আছে যে দেবে? না বাছা তোমাদের কারসাজি চোল্‌বে না। একে আমার প্রবোধ বাড়ি নাই, তাতে আবার আমার এই ত অবস্থা। বৌমা গেলে কে যে মুখে জল টুকু তুলে দেবে তার ঠিকানা নাই। ঐ ঘরে বৌমা আছে দেখা করে যাও।"

রাগে ও ক্ষোভে বিন্দির মার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিছু না বলিয়া সে ধীরে ধীরে পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া গেল।

মেজ ঠাকরুণ বলিলেন "তা তুমি মেয়ে চালাক কি না, তাই বৌর বাপের চালাকিটা ধোরে ফেল্লে—আমরা হোলে কি আর পার্ত্তুম?"

প্রবোধের মাতা বলিলেন "চালাকি না জুয়োচুরি! তিনি যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন তবে বুঝতেন, তাঁর এ সম্বন্ধে কত ঝক্কি। গরীবের সঙ্গে আমাদের কারকারবার চলে? না আছে তত্ত্ব—না আছে তাবাশ—।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিন্দির মা মৃণালিনীদের অনেক কালের ঝি। সে মৃণালিনীকে হইতে দেখিয়াছে—তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সুতরাং "মেনাদিদি"র স্নেহের উপর যে তাহার যথেষ্ট দাবীদাওয়া ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিন্দির মা ঘরের ভিতর গিয়া দেখিল, মৃণালিনী ছুই হাত ঘোমটা টানিয়া দরজা ধরিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মৃণালিনীর ছুঃখ আরও বর্দ্ধিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ঝি আর আমি এখানে থাক্‌বো না, আমাকে নিয়ে চল্।"

বিন্দির মা মৃণালিনীকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া দেখে যে, নিজেকেই সান্ত্বনা করিবার জন্য অপর একজনের প্রয়োজন। সে মৃণালিনীকে জন্মিতে দেখিয়া আজ ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছে—তাহার কষ্ট বিন্দির মা কি করিয়া সহ্য করিবে? আজও বিন্দির মার সে কথা মনে পড়ে, যখন মৃণালিনী হইবার ছুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার সংসারের একমাত্র স্নেহবন্ধন বিন্দি—বিন্দুবাসিনী যে বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল! তাহার পর মৃণালিনীকে লইয়া সে সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া—বহুকালসঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু অর্পণ করিয়া অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল!

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বিন্দির মা বলিল "দিদি কাঁদিস্ নে। দেখ্‌লি ত কত বল্লুম কিন্তু তোর শাশুড়ি কোন মতেই রাজী হোল না—"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ঝি, বাবা ভাল আছেন?"

বিন্দির মা এ প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ কি বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে বলিল "হাঁ আজকাল একটু ভাল আছেন—মধ্যে একটু অসুখ করিয়াছিল—" অসুখটা যে কি তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে সাহস হইল না!

মৃণালিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "মা কেমন আছেন?"

বিন্দির মা বলিল "মাও ভাল আছেন। তাঁরা ছুজনেই তোমাকে দেখবার জন্য বড় কাতর হোয়েছেন কিন্তু দেখ্‌লে—"

এই কথা শুনিয়া মৃণালিনীর চোখের জল উথ্‌লাইয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ঝি, তোর পায়ে পড়ি আমাকে নিয়ে চল, আমি এখানে থাক্‌লে বাঁচব না। আচ্ছা ঝি,

এক কাজ কোরলে হয় না, চল্না কাউকে কিছু না বোলে আমরা রাত্তিরে পালিয়ে যাই ?"

বালিকার অজ্ঞতা দেখিয়া ঝি একটু হাসিল—বলিল "সে কি হয় দিদি ? আচ্ছা আমি আর একবার তোমার শাশুড়িকে বোলে দেখ্ছি।" এই বলিয়া সে বাহিরে আসিয়া পুনরায় প্রবোধের মাতার নিকট প্রস্তাব করিল।

রন্ধননিপুণা পাঠিকাবর্গ যদি উত্তপ্ত তৈলকটাহে জলবিন্দু নিক্ষেপের অতর্কিত পরিণাম দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিন্দির মার কথায় মিত্রগৃহিণীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

বিন্দির মা একটু রুক্ষস্বরে বলিল "তোমার যেন বৌ, কিন্তু বাপমায়েরও ত মেয়ে বটে, তাঁদের দিকেও ত একবার দেখ্তে হয়।"

গৃহিণী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "অমন মেয়ে ঘরে তুলেছি এই ভাগ্যি। খোঁজ খবর নাই, তত্ত্বকরা নাই, কোন্ হিসাবে মেয়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্—দূরহ বাড়ী থেকে।"

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিবে, বিন্দির মা এতটা আশঙ্কা করে নাই—সুতরাং তাহার গায়ে অপমানটা বড় বিঁধিল। সে কৈবর্ত্তের মেয়ে, সুতরাং ছাড়িয়া কথা কহিবে কেন ? বিশেষতঃ যখন দেখিল মৃণালিনীকে লইয়া যাইবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন সে কোমর বাঁধিয়া শব্দসাগর মন্থন করিয়া সর্ব্বপ্রকার অশাস্ত্রীয় সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে একবার মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু অধিক অপমানিত হইবার আশঙ্কায় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল।

কিন্তু কলহের সময়ও সে যে দ্বারের পার্শ্ব হইতে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে না পাইতেছিল, এমন নহে, এবং যখন সে উত্তপ্ত হৃদয়ে ও অনাহারে সেই মধ্যাহ্ন সময়ে পুনরায় কম্পিত পদে গ্রাম্যপথ দিয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাইতেছিল, তখনও তাহার বোধ হইতেছিল যেন বহুদূর হইতে একটি করুণ-বিলাপধ্বনি সমস্ত পল্লীখানিকে কাঁপাইয়া দ্বিপ্রহরের শ্রান্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

যাইতে যাইতে সে অনেকবার অনিশ্চিত হৃদয়ে পথে দাঁড়াইয়া ছিল, অনেকবার ভাবিয়াছিল আর একবার মৃণালিনীর শাশুড়ির নিকট গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখে কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ব্যবহারের কথা স্মরণ হওয়াতে সে আরও দ্রুতপদে চলিতেছিল।

এই প্রকারে অতি কষ্টে সে পাঁচক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। যতটা ক্রোধের সহিত বিন্দির মা মৃণালিনীর শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, এখন তাহা অনেকটা উপশমিত হইয়াছিল। দুঃখে অঝোরে তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

সে যে বড় গর্ব্ব করিয়া মৃণালিনীর পিতাকে বলিয়া আসিয়াছিল যে, যে করিয়াই হউক সে মৃণালিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। তাহার কষ্টের বিশেষ কারণ এই যে, চিন্তামণি

কবিরাজকে চুপি চুপি মৃণালিনীর পিতার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আরোগ্য সম্বন্ধে আশা করা দুরাশা মাত্র !

বিন্দির মা তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃণালিনীর পিতা হরকালী দে হুগলী-জজআদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার বেতন যে বড় অধিক ছিল, তাহা নহে ; তবে হুগলী ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে অমরপুর নামক একটি গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল, তথায়ই স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা লইয়া কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতেন।

মৃণালিনী যখন ৮ বৎসরের, তখন গ্রামের সকল লোকেই হরকালীকে বলিত "দাদা তোমার এ মেয়ে পার কোরতে টাকা খরচ হবে না, কত বড় লোকে এসে সেধে মেয়ে নিয়ে যাবে।"

বস্তুতঃ গ্রামে তেমন সুন্দরী কন্যা কাহারও ছিল কি না সন্দেহ। কন্যার প্রশংসা শুনিয়া মৃণালিনীর মাতা কেবল প্রার্থনা করিতেন যে, তিনি "বড়ঘরের" জন্য বড় বিশেষ লালায়িত নহেন, তবে সেখানেই 'মৃত্যু' পড়ুক—সে সুখী হইলেই যথেষ্ট হইল।

দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে অনেক জায়গা হইতে সম্বন্ধও আসিয়াছিল ; কিন্তু যখন কুলপুরোহিতগণ দুটা পাশ, তিনটা পাশের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া তাহার সহিত দুই তিন সহস্র রৌপ্যমুদ্রার দাবী করিয়া সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দিত, তখন হরকালী বাবু চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেন। তিনি দেখিলেন যে পাড়ার লোকে যে বিনাব্যয়ে না হউক, অন্ততঃ অল্পব্যয়েও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা জানাইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কাল বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ ৩৫৲ টাকা বেতনের চাকরি করিয়া যে তিনি এত টাকার চতুর্থাংশও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই !

মৃণালিনী যখন ১০ বৎসরে পড়িল, তখন তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বহু অনুসন্ধানের পর পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে পাঁচক্রোশ দূরে——গ্রামে একটি সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র কন্ট্রাক্টরের কার্য্য করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনরব। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রবোধচন্দ্র এণ্ট্রেন্স পাশ হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ওভারসিয়ারি পাঠ করিতেছিল। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সর্ব্ববিষয়েই ভাল ; সুতরাং হরকালী বাবু যখন ১৫০০ হাজার টাকার দাবীর কথা শুনিলেন, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। আট বৎসর চাকরি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা এবং পৈতৃক ভদ্রাসনের কতকাংশ বন্ধক দিয়া মৃণালিনীর বিবাহ দিলেন।

হরকালী বৈকুণ্ঠ মিত্রকে ভাল লোক বলিয়া দেখিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় প্রথমে তাঁহার স্ত্রীকে চিনিতে পারেন নাই।

বৈকুণ্ঠ বাবুর স্ত্রী ধনীর কন্যা, এইজন্য স্বামীর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তিনি স্বয়ংই যে একজন বড়লোক, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য বৈকুণ্ঠ বাবু যখন হরকালীর কন্যার সম্বন্ধের কথা তুলিলেন, তখন তিনি নথ নাড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া "সেরেস্তাদারের" মেয়েকে গৃহে আনয়ন করিতে বিশেষ আপত্তি করিলেন, এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণা হইলে কি হয়, বৈঁচি হইতে বন্ধুদিগের বাটি হইতে যে কন্যার সম্বন্ধ আসিয়াছে, তাহা যে লক্ষগুণে ভাল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কারণ তাহারা বড়লোক, সুতরাং "দিইবে থুইবে" ভাল।

কিন্তু শত বাক্যঝঙ্কারেও মিত্রগৃহিণীর আপত্তি টিকিল না। পাড়ায় পাড়ায় যখন রাষ্ট্র হইল যে প্রবোধের মাতার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া, বৈকুণ্ঠ বাবু পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তখন অপমানে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য গৃহিণী বারবার বসুন্ধরার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম সুশ্রী বধূটি দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন "টাকা লইয়া কি হইবে? টাকা লইলে এমন বৌ ত হইত না।" কিন্তু পাড়ার সম্মানিতা মহিলাবর্গ, বিশেষতঃ মেজঠাকরুণ আসিয়া যখন হরকালী দের দরিদ্রতার সহিত বন্ধুদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের তুলনা করিয়া, প্রকারান্তরে স্বামীর নিকট মিত্রগৃহিণীর অপমানের কথা উত্থাপন করিতেন, তখন পুরাতন কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁহার ক্রোধ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত।

তাহার পর যখন জামাই-ষষ্ঠীর প্রথম তত্ত্ব আসিল, তখন তাহা দেখিয়া গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। যাহারা তত্ত্ব আনিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্ভাষণে অভিহিত করিতে ত্রুটি করিলেন না, এবং রথের তত্ত্ব, শীতের তত্ত্ব, দোলের তত্ত্ব, চড়কের তত্ত্ব প্রভৃতি হিন্দুদিগের বারমাসের তের পার্ব্বণের প্রত্যেকটিতে যদি মনোমত দ্রব্য না আসে, তবে তিনি যে হরকালীকে "নাকের জলে চোখের জলে" করিবেন—এ প্রকার ভয় দেখাইলেন।

কিন্তু রথ গেল, শীত গেল, দোল ও চড়ক—গেল কোনও তত্ত্বই আসিল না। তাহার উপর যখন প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত, তখন প্রবোধের মাতার ক্রোধ ও অপমানের সীমা থাকিত না। তিনি বলিতেন "কি কোরব বল, আমার কি দোষ, তখনই বোলেছিলাম—ওরা গরীব, না পায় পোরতে, না পায় খেতে—ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রে কখনও সুখ হবে না।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই "আহা আহা, করিত, এবং তাহার ফলে মেজঠাকরুণ সেদিবস ৪টা আলুর স্থলে ৮টা আলু পাইতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহারা ভাবিত না হরকালী দিবে কোথা হইতে?

বিবাহের কিছুদিন পরেই বৈকুণ্ঠ বাবু অকস্মাৎ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কিছুদিন প্রবোধের মাতার শোকের মাত্রাটা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহা আপনা আপনি কমিয়া আসিল।

এদিকে কিছুদিন পরে প্রবোধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারভাঙ্গায় একটা ওভারসিয়ার-পদ গ্রহণ করিল, বেতন ৩০৲ টাকা মাত্র। কিন্তু তাহার মাতা সকলকে বলিয়া বেড়াইতেন তাঁহার পুত্রের মাহিনা ৮০৲ টাকা। ২০ গণ্ডা টাকা মাহিনার কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনীগণ ধন্য ধন্য করিত, তাহাতে অহঙ্কারে মিত্রগৃহিণীর বক্ষস্ফীত হইয়া উঠিত। তবে এ চাকরীর একটা দোষ ছিল—প্রবোধ বড় একটা ছুটি পাইত না সুতরাং প্রায়ই তাহার বাটি আশা ঘটিত না।

কিন্তু তাহার মাতা ইহাতেও একটা সুবিধা দেখিয়াছিলেন। মৃণালিনী এক বৎসরের পর দিনকতকের নিমিত্ত শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। তাহার কয়েক মাস পরে যখন পুনরায় "ঘর" করিতে আসিল, তখন প্রবোধের মাতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আর শীঘ্র বধূকে পাঠাইবেন না। বিনাবাধায় হরকালী দের প্রতারণার নিমিত্ত তাঁহাকে জব্দ করার ইহাই মহাসুযোগ।

এইজন্য দুই বৎসরের মধ্যে যতবার মৃণালিনীকে লইয়া যাইতে লোক আসিয়াছে, তিনি ততবার তাহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।

এই প্রকারে শেষবার বিন্দির মা কি প্রকার অপমানিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিন্দির মা চলিয়া যাইবার পর মৃণালিনী অনুচ্চস্বরে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাবার পীড়ার কথা, মার দুঃখের কথা এবং পরিশেষে বিন্দির মার অপমানের কথা ভাবিতে লাগিল! ঝি না খাইয়া এতটা পথ রাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহা তাহার নিকট বড় সামান্য বিষয় বলিয়া বোধ হইল না।

অকস্মাৎ চাতাল হইতে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন "বলি বৌমা, জল তুল্‌তে হবে না, খালি কাঁদলে ত আর বাপের বাড়ি যাওয়া হয় না—আর আমিও বলি, এমন বাপের বাড়ি যেতে লজ্জাও হয় না, কি বল গা?"

শেষোক্ত প্রশ্নটি মেজ ঠাকরুণকে করা হইল। বলা বাহুল্য তিনি তখনও অপ্রত্যাশিত আলু পটোলের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, এবং মনে মনে বিন্দির মাকে গালি দিয়া ভাবিতেছেন, আজ কোথা হইতে এই সর্ব্বধ্বংসকারিণী, অক্ষিখাদিকা, সন্তানবিরহিতার কন্যা আসিয়া এত গোলযোগ বাধাইয়া গেল!

মিত্রগৃহিণীর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা আর একবার ক'রে বোল্‌তে, সেখানে খাবে কি? আহা, তুমি মেয়ে বড় ভালমানুষ কি না, তাই এত যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ!"

গৃহিণী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আর কি করি বল,—গরীবের মেয়ে এসে পোড়েছে, কিন্তু তখনই বারণ ক'রেছিলাম—তা তিনি ত শুনলেন না।"

মেজঠাকরুণ কি করেন, অনেকগুলি অসংলগ্ন "হাঁ" "তা বৈকি" "আহা" শব্দ উচ্চারণ

করিয়া মিত্রগৃহিণীর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন, এবং বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ আহারীয়ের সংস্থান করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

মৃণালিনীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন বিপুল কৃষ্ণবর্ণ বপুখানি লইয়া অতিকষ্টে উঠিয়া গৃহান্তরে গেলেন। গিয়া দেখেন মৃণালিনী তখনও দরজার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছে। তাঁহার আর সহ্য হইল না, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "তুমি বাছা দিনরাত কেঁদে কেঁদে অমঙ্গল ডেকে এনো না! গরীবের মেয়ে গরীবের মত থাকবে, এত বাড়াবাড়ি কেন বল দেখি? তত্ত্ব নেই তাবাশ নেই—আমার কিসে মানসম্ভ্রম থাকে তার দিকে দেখা নাই, তার পরেই হঠ্ বল্লেই হঠ কোরে নিয়ে যাবে নাকি? এই ত আজ তোমার বাপের বাড়ির লোকই আমায় সব্বাইয়ের সাম্‌নে কি অপমানটাই না কোরে গেল—এ সব কি তোমার বাপ মায়ের শেখান নয়? ওই যে বলে—"বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কোর"—যাও, ওঠো, রান্নাবান্নার চেষ্টা দেখ—আমি ত তখনই তাঁকে ব'লেছিলাম—!"

মৃণালিনীর প্রতি এ প্রকার সম্ভাষণ আজ নূতন নহে। প্রথম যখন সে শ্বশুরালয়ে আসে, তখন বৈকুণ্ঠ বাবু জীবিত ছিলেন, এবং প্রবোধ তখনও বিদেশে যায় নাই, সুতরাং সকলের নিকট হইতে নববধূজনোচিত সমাদরপ্রাপ্তি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একবৎসরের পর যখন সে আবার শ্বশুরালয়ে আসিল, তখন দেখিল, সমস্ত বিষয়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অজানিত আত্মীয় ও অনাত্মীয়বর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন আদর করিয়া মৃণালিনীর পিতামাতার অদর্শনজনিত কষ্টের লাঘব করিতেন, সে সদাশয় শ্বশুর আর জীবিত নাই! এবং রাত্রিতে যখন সে অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদুস্বরে ও সলজ্জভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বাড়ি পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুযোগ করিত, তখন প্রবোধচন্দ্র ব্যাকুল ও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বিংশতিবার ঢোঁক গিলিত, এবং নিজের অক্ষমতা সম্পূর্ণ বুঝিয়াও, শীঘ্রই মৃণালিনীকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবে, তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিত। কিন্তু এখন আসিয়া দেখিল সে স্বামীও বহুদূরে "ছাইভস্ম" ও "অপ্রয়োজনীয়" কার্য্যে গিয়াছেন। আছেন কেবল শ্বশ্রূঠাকুরাণী—কিন্তু তিনি দিবারাত্র পল্লী মাতাইয়া দেশ কাঁপাইয়া বধূর দোষ এবং তাহার পিতার দারিদ্র্যের কথা ঘোষণা করিয়া অনির্ব্বচনীয় আত্মসুখ লাভ করিতেন।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র, শ্বশুরালয়ে আসিয়া অকস্মাৎ কেন যে তাহাকে এতটা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে, মৃণালিনী প্রথমে তাহার কারণ ভাবিয়া পায় নাই। পল্লীনিবাসিনী সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কথা কহা, দ্রুত বাসন মাজিতে না পারা, প্রতিদিন ১৫ কলসি জল তুলিতে না পারা, রন্ধন করিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলা, এবং "কাক কোকিল ডাকিবার" পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া দুই হাঁড়ি "গোলা" না দেওয়া যে কিসে "বড়মানুষির" লক্ষণ এবং তাহাদিগের সহিত পূজার তত্ত্ব, চড়কের তত্ত্ব, বা আমসন্দেশের যে কি অভেদ্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তাহা কোন ক্রমেই প্রবেশ করিত না।

তাহার মনে হইত যে, বিবাহের পরও সে দ্বিপ্রহরে কতকগুলি বালিকার সহিত নিজের গ্রামে দত্তদের আমবাগানে অপক্ক আম লবণসহযোগে অনুপম তৃপ্তির সহিত খাইতে গিয়াছে, কতবার সে নন্দীর পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া "ফেনা" তুলিয়া দিয়াছে, কাট্‌না কাটিতে গেলে কতবার তাহার মাতা দাঁত কাটিয়া যাইবার ভয়ে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়াছেন, রন্ধন করিবার কথা বলিলে কতবার তাহাকে "ছেলে মানুষ" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, এবং "কানাচে" রৌদ্র আসিবার পরও তাহাকে শয্যা হইতে তুলিতেন না! এই জন্য অতর্কিতভাবে যখন তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী রুক্ষস্বরে তাহাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে মনে মনে ভাবিল, বুঝি একবৎসরের মধ্যেই তাহার বাল্যচপলতার সময় অজানিতভাবে কোন দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে; বসন্তের পুষ্পময়ী সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতে না ভাবিতে যেমন কখন বসন্ত চলিয়া গিয়া কোথা হইতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ আসিয়া পড়ে সেই রকম যেন কখন মৃণালিনী বালিকা হইতে গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে জানিয়াও জানিতে পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কষ্টে জর্জ্জরিত এবং দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া বিন্দির মা ধীরে ধীরে বিষণ্ণবদনে হরকালী বাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

হরকালী মুদ্রিত নয়নে শয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী মস্তকের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতে করিতে চক্ষু মুছিতেছিলেন। দারুণ পৃষ্ঠব্রণ ক্ষতে আক্রান্ত হইয়া তিনি অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছেন, বিশেষতঃ আজকাল কবিরাজের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া হরকালী দরজার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "কে ও মেনা এলি? আয় মা—দেখে যা—।"

বিন্দির মা আর থাকিতে পারিল না, বালিকার ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "বাবা, মেনাদিদিকে পাঠালে না—।"

হরকালী ধীরে ধীরে বলিলেন "তা ত আমি ব'লেছিলাম। আমি যে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অগাধ দেনার জলে ডুবেছি—আমার যে বাড়ী বাঁধা—তাকি তার শাশুড়ি জানে না—?"

বিন্দির মা এবং হরকালীর স্ত্রী উভয়েই সশব্দে কাঁদিতেছিলেন।

হরকালী বলিলেন "আর কাঁদছ কেন? অনেক ভেবে চিন্তে দেখে শুনে সোনার পুতুলটিকে দিয়েছিলাম—কে জানে তার শেষ এই হবে? বড় কষ্ট রইল একবার তাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না—যাবার সময় একবার তাকে কোলে নিতে পারলেম না—সে যে এখনও দুধের মেয়ে—"

বিন্দির মা কাঁদিয়া বলিল "বাবা আর বোল না—।"

হরকালী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"না বোল্লে কি কপাল বন্ধ থাকে? এই যে মেনা হওয়া পর্য্যন্ত কিসে সে সুখে থাকে, দিনরাত তার প্রার্থনা কোরে আসছিলাম তার কি হোল? কপাল—কপাল—। আর আমি চল্লুম কিন্তু কালী যেন মেনাকে চিরসুখিনী করেন—।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় "হরিবোল" ধ্বনিতে ক্ষুদ্র অমরপুর গ্রামখানির পথঘাট প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

অনেক রাত্র অবধি হরকালীর পত্নী এবং বিন্দির মার রোদনধ্বনি নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছিল।

পাড়ার লোক যে শুনিল সেই চক্ষের জল ফেলিল। হরকালী দরিদ্র হইলে কি হয়, তাঁহার গুণে কি ধনী কি দরিদ্র সকল প্রতিবাসীই মুগ্ধ ছিল; বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই আন্তরিক দুঃখিত হইল।

লোকে বলে সকলের আগে মৃত্যুসংবাদ গিয়া পৌঁছে, কিন্তু কেহ সংবাদ দিবার ছিল না বলিয়া মৃণালিনী পিতার মৃত্যুর কথা দিনকতক পরে শুনিল। শুনিয়া কথাটা প্রথমে তাহার বিশ্বাস হইল না, কিন্তু যখন দুইবার গ্রামের রামহরি ঠাকুরদার পত্রখানি পড়িয়া দেখিল, তখন আর তাহা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আজ বালিকা সমস্ত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া পিতার জন্য বালিকার মতই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরকালীর মৃত্যুসংবাদে মিত্রগৃহিণী মনে মনে কতকটা আনন্দ অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, "যেমন সে ফাঁকি দিয়া নিজের কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিল, তেমনি তাহাকে জব্দ করিয়াছি—নিয়মমত তত্ত্বতাবাস কোর্‌লে—দিলে থুলে, মেয়ের মুখ দেখিতে পাইত, কিন্তু যেমন আমার মাথা হেঁট করিয়েছিল, তেমনি আপশোসে মোরেছে—।"

মৃণালিনী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল এমন সময় তাহার শাশুড়ি আসিয়া বলিলেন "বলি, চেঁচিয়ে যে পাড়ার লোক জড় কোরলে! আরত কারুর বাপ মরে না—?"

মৃণালিনী ঘোমটা টানিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "পায়ে পড়ি—একবার মার সঙ্গে দেখা—।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহিণী উত্তপ্ত হইয়া বলিলেন আর কোন গরবে সেখানে যাবে? যাক্—বলি, অমন কোরে চেঁচিও না—চারিদিকে যে শত্তুর হাঁসছে—।"

মৃণালিনী আর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সাহস করিল না। ফুলিয়া ফুলিয়া সমস্ত দিন মাটিতে শুইয়া কাঁদিল—অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িল! মিত্রগৃহিণী সেইদিন পুকুরে স্নান করিতে গিয়া সগর্ব্বে বলিলেন—"আমি অমুখ ঘোষের মেয়ে—আমার চোখে ধুলো দেওয়া? যেমন তত্ব না ক'রে আমার মান রাখে নাই, সেই রকম মেয়ে আটকে রেখে কেমন জব্দ কোরেছি—।"

কতিপয় অনুগ্রহলাভাকাঙ্ক্ষিনী প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা, বলা বাহুল্য তন্মধ্যে আমাদিগের মেজঠাকরুণও ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, তুমি বাছা সেকেলের লোক তুমি আর পার্ব্বে না? তুমি যেমন বৌকে তাঁবে রেখেছ, এমন কটা লোকে পারে?

কতিপয় অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূ ঘাটের অপর পার্শ্বে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন আর একজনের গাত্রপীড়ন করিয়া বলিল "মরণ আর কি? এমন রায় বাঘিনীটাকে যম কি ভুলে রয়েছে?" এই কথা শুনিয়া অপর কয় জন সমস্বরে ও অনুচ্চে মিত্রগৃহিণীর বদনে অগ্নিদেবের অবস্থিতি প্রার্থনা করিল!

শোক কিছু চিরকালের জন্য নহে। হরকালীর মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম প্রতিবাসীগণ দিন কয়েক দুঃখ প্রকাশ করিয়া একেবারে তাঁহার কথা বিস্মৃত হইল। কিন্তু বিন্দির মা এবং মৃণালিনীর মাতার ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যখন হরকালী পত্নীর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি বংশবন অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রপল্লীখানিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিত, তখন বৃদ্ধাগণ অর্দ্ধসুপ্তাবস্থায় মশককুলের উদ্দেশ্যে বৃথা চপেটাঘাত করিয়া বলিতেন "বড্ড শোকটা লেগেছে, কিন্তু এত বাড়াবাড়িটাও ভাল নয়—।"

বিন্দির মা অনেক বুঝাইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিল, কিন্তু মৃণালিনীর মাতাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। বিশেষতঃ মৃণালিনীকে দেখিবার জন্য তাহার মাতা বড়ই ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, এবং তাহারই জন্য দিবারাত্র অশ্রুজল ফেলিতেন! হরকালীর মৃত্যুর সময় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং মৃণালিনীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অত্যাচারের কথা স্মরণ হইলে, বিন্দির মা নিজের চোখের জলই ধরিয়া রাখিতে পারিত না!

কাঁদিতে কাঁদিতে দুইমাস অতিবাহিত হইয়া গেল! এখনও মৃণালিনীর মাতা কন্যাকে একবার দেখিবার জন্য প্রত্যহ ক্রন্দন করিতে থাকেন। বিন্দির মা বিধবার সে অনুযোগ আর সহ্য করিতে পারিল না—একদিন অনেক সান্ত্বনা করিয়া মৃণালিনীর মাতাকে বলিল "মা যদি আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে হই, তবে এবার যে কোরে হোক মেনাদিদিকে নিয়ে আস্‌বই আসব—।"

হরকালীর পত্নী আশ্বস্তা হইলেন, কিন্তু কি উপায়ে যে মৃণালিনীকে বিন্দির মা লইয়া আসিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, জিজ্ঞাসা করাতে বিন্দির মাও কিছু বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া যে মৃণালিনী আদৌ সুখিনী হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এত কষ্টেও যদি সে এক একবার পিতামাতাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহার কোনও দুঃখ থাকিত না।

দুইটা বৎসর মাত্র শ্বশুরালয়ে আসিয়া, তাহার বোধ হইত যেন কতকাল হইল সেই কবে—আসিয়াছে, এতকাল বাবা ও মাকে না দেখিয়া সে কি করিয়া জীবিত আছে;

এই প্রশ্ন করিয়া সে মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইত! কিসের দোষে যে তাহার কপালে এত দুঃখ, তাহাও সে বুঝিতে পারিত না! আজও তাহার সেই বৈশাখী ব্রতের কথা মনে পড়ে, যখন সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একখানি রক্তাক্ত চেলি পরিয়া ভক্তিভরে তুলসীমণ্ডপের কাছে বসিয়া মাতার সহিত "দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী" হইতে এবং "কৌশল্যার মত শাশুড়ি" পাইবার জন্য কতবার প্রার্থনা করিয়াছিল! হায়, কোথায় গেল তাহার সে ব্রত, কোথায় গেল বা মাতার সেই স্নেহসম্ভাষণ!

সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু বহিয়া জল পড়িত, কেহ তাহা দেখিতে পাইত না; শাশুড়ির তীব্র তিরস্কারে তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইত, কিন্তু কেহ তাহা জানিতে পারিত না, প্রত্যহ নীরব-রোদনে তাহার বালিশ আর্দ্র দেখা যাইত! এত তিরস্কারেও সে একটি কথাও বলিত না! এই যে জীবনের তেরটী সুদীর্ঘ বৎসর, ইহার মধ্যে সে একদিনও মাতার নিকট তিরস্কৃত হয় নাই, সুতরাং শাশুড়ির চীৎকার তাহার নিকট অভিনব হইলেও, সে ভাবিত বুঝি এই গঞ্জনা সহ্য করা "গৃহিণীত্ব" লাভের অন্যতম উপায়! কিন্তু পিতামাতার দারিদ্র্যের কথা শুনিলে তাহার হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিত; নিজে সে সমস্ত ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারে; কিন্তু মিত্রগৃহিণী যখন সকলকে শুনাইয়া তাহার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া গালি দিতেন, তখন মৃণালিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়টি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইত!

সুদূর প্রবাস হইতে সে মধ্যে মধ্যে প্রবোধের পত্র পাইত—তাহাতে অনেক কথা থাকিত, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য পাঠক পাঠিকাবর্গের অত্যধিক কৌতূহলপ্রকাশ করা অনুচিত। তবে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সে একবৎসর ধরিয়া ছুটি পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনও মতেই পাইতেছে না, এবং মৃণালিনী যে পত্রের উত্তর দেয় না, ইহার অপেক্ষা অধিক কষ্টের বিষয় নাই।

মৃণালিনী পত্রের শেষভাগ পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত! সে খুব ভাল লিখিতে জানিত না বটে; কিন্তু যাহাই হউক সে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৫ জায়গা কালির ফোঁটা ফেলিয়া "পোড়া" কলমের দোষ দিয়া, মাথায় কলম পুঁছিয়া ভাল করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য অক্ষরগুলির উন্নতি না হইয়া বরং আরও অবনতি ঘটিত এবং "শ" "স" "ই" "ঈ" "ক" "ব" প্রভৃতি সমবায়সাধন করিয়া "কবে অশীবে আমারর্পনাম যানীবে" এই প্রকারে পত্রশেষ করিয়া পাড়ার ময়রাগৃহিণীর হস্তে সেখানিকে ডাকে ফেলিয়া দিতে বলিত, তথাপি যে কেন প্রবোধ পত্র পান না তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না!

একদিন মৃণালিনী গোপনে মোদকরমণীর নিকট চিঠিখানা দিয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ জল লইতে বাহিরে আসিয়া দেখে মিত্রগৃহিণী ময়রাগৃহিণীর নিকট চিঠিখানা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন। অকস্মাৎ বধূকে দেখিয়া শাশুড়ি কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া বলিলেম "চিটি লেখালেখি কি? আজকালকার মেয়ে কি না—লজ্জাও করে না।"

প্রবোধ যে কেন চিঠি পায় না, মৃণালিনী তাহা কতক বুঝিতে পারিল। কিন্তু ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিবার কুবুদ্ধি তাহার এখনও হয় নাই। পাছে নিজের অত্যাচারের কথা পুত্রের নিকট বর্ণনা করে, এই ভয়ে প্রবোধের মাতা বধূর চিঠিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। মৃণালিনী কখনও আভাসেও সেকথা লেখে নাই, সুতরাং ভাবিল বুঝি চিঠি লেখা বড় দোষের কথা। সেই অবধি সে আর কোথায়ও চিঠি লিখিতে সাহস করিত না।

গুরুতর পরিশ্রমে তাহার মধ্যে মধ্যে অসুখ করিত। একদিন জ্বরে আর উঠিতে পারিতেছে না, এমন সময় শাশুড়ি ঠাকুরাণী বৃহৎ দেহখানি দোলাইতে দোলাইতে আসিয়া মুখবিকৃত করিয়া বলিলেন "কি গো বড়মানুষের মেয়ে, সুয্যি যে মাথায় উঠল এখনও ওঠা হয় নি কেন?"

মৃণালিনী তিন হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিল "আজ অসুখ করেছে—।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী সপ্তমে উঠিয়া বলিলেন "আ মোরে যাই, কি সোহাগ রে—কোথায় একটু সর্দ্দি হয়েছে—তা আর ওঠবার ক্ষমতা নাই! ওঠ রান্নাবান্নার চেষ্টা দেখ, কত আদিখ্যেতাই শিখেছ—তবু যদি হরকালী দে সেরেস্তাদার না হোত।"

এই বলিয়া ভূতল কাঁপাইয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন। আর কিছুতে না হউক, শেষ কথায় পিতার প্রতি বিদ্রূপটা মৃণালিনীর প্রাণে বড় লাগিল। পরলোকগত পিতার স্নেহমুখখানি আবার মনে হওয়ায় অভাগিনী ভাবিল বুঝি মরিলে ইহা অপেক্ষা সুখ পাওয়া যায়! সে ভাবিল অকারণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গালি প্রদান করার অধিক নৃশংসতা বুঝি আর নাই! আজ আর কাঁদিতে সাহস হইল না—আজ প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি যে করিয়া হউক রন্ধন করিবে স্থির করিল।

অতি কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে রন্ধন-গৃহে গেল।

এদিকে মিত্রগৃহিণী চাতালে আসিয়া মেজঠাকরুণকে বধূর দোষের কথা অবগত করাইতেছিলেন, এমন সময়ে রন্ধনগৃহে একটা গুরুভারদ্রব্য পতনের শব্দ হইল। মিত্রগৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "কি বৌমা হাঁড়িটা ভাঙ্গলে? এমন মেয়েও ত বাছা কোথাও দেখি নি, এই সেদিন পূর্ণিম্মের সময় নূতন হাঁড়ি কেড়েছি—।" এই বলিয়া রন্ধনগৃহের দিকে আসিলেন, ব্যাপারটা কি তাহা দেখিবার জন্য মেজঠাকরুণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

আসিয়া দেখেন, মৃণালিনী অচৈতন্য হইয়া মেজের উপর পড়িয়া আছে। মেজ ঠাকরুণ আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি আসিয়া মুখে জল দিতে লাগিলেন—গায়ে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন "ও বাবা গা যে পুড়ে যাচ্ছে, এ যে কাঠফাটা জ্বর হোয়েছে।"

মিত্রগৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "হাঁ জ্বর হবে কেন? সব ভিরকুটি" মেজঠাকরুণ আজ আলুপটোলের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ছিঃ ছিঃ এই

দুধের মেয়ে—তাকে এত জ্বরে এমনি ক'রে খাটান ?" তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে মৃণালিনীর চেতনা হইল, ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া চারিদিকে দেখিল, মেজঠাকরুণ দেখিলেন চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ।

অতি যত্নে মেজঠাকরুণ মৃণালিনীকে শয্যাগৃহে শয়ন করাইয়া দ্রুতপদে পাড়ার প্রাচীন লোকনাথ কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন। কবিরাজ দেখিয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন—পীড়া সাধারণ নহে—মহা জ্বরবিকার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বধূর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী যে আদৌ চিন্তিত বা দুঃখিত হইলেন তাহা নহে, কারণ "বড়ঘরের" সহিত কুটুম্বিতা করিবার আশাটা তিনি তখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মেজঠাকরুণের শুশ্রূষায় এবং লোকনাথ কবিরাজের চিকিৎসায় মৃণালিনী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন জনৈক প্যায়দা একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানি ইংরাজিতে লিখিত; গ্রামের জয়কৃষ্ণ মুহুরি ইংরাজি জানেন। তাঁহার দ্বারা চিঠিখানা পড়ান হইল। চিঠির ভাবার্থ জানিয়া মিত্রগৃহিণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

চিঠিখানি কোনও উকীলের প্রেরিত—তাহার ভাবার্থ এই যে, বৈকুণ্ঠ বাবু জীবিতাবস্থায় একটী কোম্পানীর অধীনে ৫০০০ হাজার টাকার একটা কনণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন। কিন্তু টাকা আদায় করিয়া কোম্পানীর নিকট তাহা জমা না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এতদিন পরে তাঁহার চাতুরী ধরা পড়িয়াছে, অতএব যদি তাঁহার পুত্র অথবা অপর কেহ এক মাসের মধ্যে উক্ত টাকা না পরিশোধ করেন, তবে প্রকাশ্য আদালতে মোকদ্দমা আনীত হইবে।

মিত্রগৃহিণী বিশেষ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে প্রবোধের নিকট সংবাদ প্রেরণ করাই স্থির হইল। ঘটনাটি বিবৃত করিয়া তাহাকে অবিলম্বে আসিতে বলা হইল, এবং তাহার সহিত লেখাও হইল যে, বধূমাতার গুরুতর পীড়া। আজ রোগ হইবার দেড় মাস পরে প্রবোধের নিকট মৃণালিনীর পীড়ার সংবাদ প্রথম প্রেরিত হইল। মিত্রগৃহিণী চিঠি লেখাইবার সময় নাকি বলিয়াছিলেন "বৌমার অসুখের কথাটা লিখিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি জানি আজকালকার ছেলে বাপমাকেও শ্রদ্ধাভক্তি করে না, বৌই হোল সর্ব্বস্ব।"

প্রবোধ যথা সময়ে পত্র পাইয়া ছুটির জন্য আবেদন করিল, কিন্তু ছুটি না পাওয়াতে অগত্যা কার্য্যে জবাব দিয়া বাড়ি আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির! মৃণালিনীকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। মেজঠাকরুণ গোপনে প্রবোধকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, কষ্টে ও অভিমানে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এত যে বড় হইয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত প্রবোধ মাতার কথায় বা কার্য্যে কখনও প্রতি-

বাদ করে নাই। আজ কিন্তু সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গম্ভীরভাবে কম্পান্বিত কণ্ঠে বলিল "মা, এতদূর হোয়েছে? বাবা যাবার আগে কি ব'লে গেছলেন মনে পড়ে না? ছিঃ—ছিঃ এত কর কার জন্যে ?"

প্রবোধের মাতা এতটা প্রতিবাদ ও তিরস্কার পুত্রের মুখ হইতে কখনও শুনেন নাই, অথচ নিজের দোষ বুঝিয়া কিছু বলিতেও সাহস করিলেন না।

মেজঠাকরুণ গ্রামসম্পর্কে প্রবোধের "দিদিমা" হয়েন সুতরাং তিনি যে সেই দিন রাত্রে প্রবোধের ঘরে "আড়ি পাতিয়াছিলেন" তজ্জন্য কোনও সুরুচিপ্রিয়া মহিলা দোষ দিতে পারেন না। তাহার ফলে, মেজঠাকরুণ পরদিন ঘোষণা করিলেন যে প্রবোধচন্দ্র সমস্ত রাত্রি মৃণালিনীকে জাগ্রত রাখিয়া এবং আরব্যোপন্যাসের ন্যায় সুদীর্ঘ গল্প করিয়া বধূর পীড়া বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং মার্জ্জনাভিক্ষার উপযোগী যেন কতকগুলি অস্পষ্ট কথাও শ্রুত হওয়া গিয়াছে।

অনেক আপত্তি ও পরামর্শের পর মাতাপুত্রে স্থির করিলেন যে, মোকদ্দমা হইবার পূর্ব্বেই দাবী অনুযায়ী টাকা শোধ করিয়া দেওয়া উচিত। প্রবোধ পিতাকে চিনিতেন সুতরাং তাঁহার দ্বারা যে এ অন্যায়াচরণ হয় নাই, তাহা তাহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে অপরে তাঁহার স্কন্ধে যে দোষ দিতেছে, তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু ইহার জন্য মোকদ্দমা করিতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না—তাহাতে অধিক অর্থব্যয় হইতে পারে এবং তাহার সহিত দেশময় কলঙ্কও রটিবে।

ইতিমধ্যেই স্বগ্রামে যে কলঙ্ক রটিতে বাকি ছিল, তাহা নহে। বৃদ্ধগণ দ্বিপ্রহরের গাছের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বসিয়া "কচেবারোর দান" ফেলিতে ফেলিতে বলাবলি করিতেন, "তখনই বলেছিলাম, বৈকুণ্ঠ মিত্রের এতটাকা হোল কোথা থেকে ?"

মিত্রগৃহিণী যে কোথা হইতে ৫০০০ হাজার টাকা জোগাড় করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। নিজের যে কয়খানি গহনা আছে এবং নগত টাকা যাহাও বা আছে, সমুদয় একত্রিত করিলে ৩০০০ হাজার টাকারও অধিক হইবে না। বাকি দুইহাজার আসে কোথা হইতে? অগত্যা বাড়ীখানি বিক্রয় করাই স্থির হইল। মিত্রগৃহিণী দেখিলেন আজ এত কালের "বড় মানুষি" বুঝি ধরা পড়ে।

তাহারও বড় বিলম্ব হইল না। এক মাসের মধ্যে দশদিন আছে মাত্র, সুতরাং ইহারই মধ্যে যাহা হউক একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রবোধ একদিন সকালবেলায় পাড়ার জনকয়েক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির নিকট গিয়া বাড়ী বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। একজন বাড়ী ক্রয় করিতেও স্বীকৃত হইলেন।

সেইদিন বৈকালেই পাড়ায় পাড়ায়, পুষ্করিণীতে পুষ্করিণীতে, মাঠে হাটে রমণীকমিটির অধিবেশন হইয়া গেল; সেগুলি হইতে যে সমস্ত শ্লেষ ও বিদ্রূপের প্রস্তাব "পাশ" হইল, তাহা সমস্তই যথাযথরূপে মিত্রগৃহিণীর কর্ণে উঠিল। মিত্রগৃহিণী লজ্জায় মরিয়া গেলেন, এক

একবার ভাবিতেছিলেন, এত অপমান সহ্য করার অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়া মরিলে সব যন্ত্রণার শেষ হয়।

পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইবার আর উপায় নাই ;—একদিন স্নান করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু যখন তিনি ঘাটে পৌঁছিলেন, দেখিলেন তাঁহার পরিচিতা সকল মহিলাই কি আলোচনা করিতেছিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকলে চুপ করিয়া গেল! যাহারা প্রত্যহ তাঁহাকে ডাকিয়া কথা কহিত, আজ তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইল না।

একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে শুনাইয়া বলিল, "ওমা এত অহঙ্কার—এত ঠেকার, কেবল বাহিরে শুনতেই এত এত---কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার দেনা শুধতে বাড়ী ঘর গয়নাপত্তর বিকিয়ে যায় ? গলায় দড়ি।"

অপর একজন বলিল, "গলায় দড়ি ব'লে দড়ি। তখন যে গরবে ভুঁয়ে পা পড়্‌তো না, এখন যে পথের ভিখিরি"—আর একজন বলিল, "তা বৈকি জুচ্চুরির পয়সা কি ভোগে হয় ? ধর্ম্ম আছে—ধর্ম্ম আছে।"

যুবতী মহলে বলাবলি হইতেছে, "আমরা ত তখনই বলেছিলাম ওর বড়মানুষি সব ভুয়ো, গরীবের মেয়ে—গরীবের মেয়ে ব'লে অমন সোনার চাঁদ বৌকে কি না যন্ত্রনাটা দিয়েছে! এখন ?"

মিত্রগৃহিণী সমস্ত শুনিলেন ; ক্ষোভে ও অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া বাড়ী আসিলেন, আসিবার সময় পথে যাহার সহিত দেখা হইল, সেই মুখ ফিরাইয়া দশ হাত দূর দিয়া চলিয়া গেল। যাহারা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লইত, মেজঠাকরুন ছাড়া অপর সকলেই আসা বন্ধ করিয়াছে।

আজ এতদিন পরে লজ্জায় ও অপমানে মিত্রগৃহিণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। যে মস্তক উন্নত করিয়া তিনি সগর্ব্বে বেড়াইতেন, দেখিলেন আজ বজ্রাঘাত হইয়া সে মস্তক অবনত হইয়া গিয়াছে। যাহাদের দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, আজ তাহারাই এই মহাসুযোগ পাইয়া প্রকাশ্য বিদ্রূপের দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দিতেছে, অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অহঙ্কারের উপযুক্ত প্রতিশোধ হইয়াছে ; তিনি এতদিন যে সকলকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছিলেন, লোকে তজ্জন্য তাঁহাকে রীতিমত শাস্তি দিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ হরকালী দের মৃত্যুর কথা স্মরণ হইল। তিনি যে কতবার তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তত্ত্বের নিমিত্ত উৎপীড়ন করিয়াছেন, গরীবের কন্যা বলিয়া অকারণ বধূকে যন্ত্রণা দিয়াছেন সে সব কথা একে একে মনে হইল। মনে হইল তিনি এই অর্থের জন্যই বধূকে ইহসংসার ত্যাগ করাইতেছিলেন। এই অর্থের জন্যই পিতার মৃত্যুর সময় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও দেন নাই। শেষ কথা স্মরণ হওয়ায় ভয়ে তাঁহার শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল যেন হরকালী মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিতেছেন!

কোনও গুরুতর মানসিক পীড়া না হইলে মানুষ অনেক সময় নিজের দোষ দেখিতে পায় না। আজ নিজের দারিদ্র্যের কথার সহিত পূর্ব্ব অত্যাচার ও অহঙ্কারের কথা স্মরণ হওয়ায় মিত্রগৃহিণীর ভীষণ অনুতাপ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বধূর নিকট গেলেন।

মৃণালিনী আরোগ্যলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বড় রুগ্ন। সে ঘরের দরজার কাছে বসিয়া একমনে সিকা বুনিতেছিল। মিত্রগৃহিণী তাহার নিকট গিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "মা তোকে বড় কষ্ট দিয়েছি।" আর বলিতে পারিলেন না।

মৃণালিনী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল শাশুড়ির চক্ষে জল। এমন দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই। কতক বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে দুই হাত ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ির পায়ে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইল। মিত্রগৃহিণী সস্নেহে বধূর গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী এতদিন তোমায় চিন্‌তে পারি নি।"

ঠিক এই সময়ে প্রবোধ বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। ব্যাপারটা যে কি তাহা অনুমান করিল। প্রবোধকে দেখিয়া মৃণালিনী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে পলায়ন করিল।

প্রবোধের মাতা অল্প হাসিয়া বলিলেন "চল্ বাবা, এখন রাস্তায় ভিক্ষে ক'রতেও আমার কষ্ট হবে না। তবে এই কয়দিনের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে বৌমাকে একবার অমরপুরে রেখে আস্‌তে হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার তিনদিন পরে সকাল বেলায় বৈকুণ্ঠ মিত্রের বাড়ির দরজা হইতেই একটি বামাকণ্ঠ বাড়ী কাঁপাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কৈ গো, বাড়ির লোকেরা কোথায় ?"

মিত্রগৃহিণী ঘর হইতে বলিলেন "কে গা ?" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন ৪ জন চাকর ও ৩ জন ঝি ভারে ভারে আম, সন্দেশ, মাছ, দধি, ক্ষির ইত্যাদি নাবাইতেছে। গৃহিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী ভুল হোয়েছে, বাছা এ বাড়ী নয়।"

এমন সময় কোথা হইতে বিন্দির মা কাপড়ে টাকা রেকাবখানা হাতে করিয়া আসিয়া বলিল "হাঁ হাঁ এই বাড়ী ; হরকালী দের বেহানের বাড়ী কি ভুল হবার যো আছে ?"

প্রবোধের মাতা লজ্জিত হইলেন, সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু আজ তত্ত্ব লইবার আকাঙ্ক্ষা আর তাঁহার নাই। তিনি সযত্নে বিন্দির মাকে বসিতে বলিলেন।

যখন অবিরাম ক্রন্দনে উত্যক্ত হইয়া বিন্দির মা মৃণালিনীকে যে করিয়া হউক মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন তাহার মনে মনে একটা মতলব ছিল। যদি কখনও "মেনাদিদির" কাছে যাইতে হয়, তাহা হইলে রিক্ত হস্তে যাইবে না—ইহা তাহার স্থির ছিল। অবশেষে সে নিজের সিন্দুক খুলিয়া বহুকালের ও বহুযত্নের সঞ্চিত

৪০ টাকা বাহির করিল ;—এবং মৃণালিনীকে আনিতে যাইতেছে ইহা ভিন্ন আর কিছু না বলিয়া সে গোপনে গ্রামের সাতজন লোক সংগ্রহ করিয়া এবং সেই ৪০ টাকা লইয়া হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিল। সেখান হইতে ৪০ টাকার আম, সন্দেশ, মৎস্য, দধি, ক্ষীর, কাপড় কিনিয়া সাতজনের স্কন্ধে চাপাইয়া মৃণালিনীর শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। পথে ভাবিতে ভাবিতে গেল "এবার এই তত্ত্ব নাকের উপর ধরব, মাগীকে আচ্ছা ক'রে গালাগালি দেব, আর ঢাক ঢোল নহবৎ বাজিয়ে পাল্কী ক'রে মেনাদিদিকে নিয়ে আসব।"

শ্বশুরালয়ে আসিতে আসিতে পথে মৃণালিনীর শাশুড়ির ভাবী দুরবস্থা এবং মৃণালিনীর গত পীড়ার কথা শুনিয়া বিন্দির মা চমকিত হইল। মৃণালিনীর অসুখের কথা শোনে নাই, তাহার কারণ যে, কেহ সংবাদ পাঠায় নাই।

বিশেষতঃ মৃণালিনীর শাশুড়ির দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া সে আন্তরিক দুঃখিত হইল। একবার ভাবিল এরকম সময় আর এ তত্ত্ব লইয়া গিয়া কাজ নাই। আর একবার ভাবিল দেখি গিয়া মাগীর অহঙ্কার এখনও আছে কি না। অবশেষে যাওয়াই স্থির হইল।

গিয়া দেখিল মৃণালিনীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী আর সে "লোক" নাই। উভয়পক্ষেই অনেক ক্রন্দন অনেক ক্ষমাপ্রার্থনা হইল, মৃণালিনীর ক্রন্দনের অনেক কারণ ছিল সুতরাং সে অনেকক্ষণ চক্ষের জল ফেলিল।

অবশেষে একদিন থাকিয়া বিন্দির মা পাল্কী করিয়া মৃণালিনীকে দিনকয়েকের জন্য অমরপুরে লইয়া গেল।

যাইবার সময় মনে মনে বলিল "দর্পহারী মধুসূদন আছেন। ঠিক তার শাস্তি পেয়েছে" এবং চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিয়া গেল, "দুজন ভাল গণকে হাত দেখে বোলে গেছেন আমার মেনা যে ঘরে প'ড়বে সে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকবে ; আমি এই ব'লে গেলাম আবার যদি তোমাদের ভাঙ্গা ঘরে লক্ষ্মী না ফেরে, তবে যেন আমার গলায় দড়ী দিয়ে ম'রতে হয়।"

* * * *

দুই দিন পরেই বিন্দির মার কথা সত্যে পরিণত হইল।

প্রবোধ পুনরায় এই মর্ম্মে একখানি উকীলের পত্র পাইল যে, পরে অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গেল, যে, বৈকুণ্ঠ বাবুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা, এবং এ প্রকার অপবাদের জন্য কোম্পানী দুঃখিত।

প্রবোধ প্রথম কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দিনকয়েক পরে বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটির অধীনে ১০০ শত টাকা বেতনের একটা ওভারসিয়ারি প্রাপ্ত হইল, সুতরাং প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়ী আসিত।

প্রবোধের মাতা বধূর গুণে মোহিত হইয়াছিলেন, এবং দিবারাত্র স্নেহসম্ভাষণে তাহার যত্ন করিতেন।

বিন্দির মা যখন তখন "মেনাদিদি"কে অমরপুরে লইয়া যাইত, কিন্তু সে বহুদিন পর্য্যন্ত তত্ত্বের কথা ভুলিতে পারে নাই। যখনই সে কথা ভাবিত, তখনই যেন সে হরকালীদের মৃত্যুর শেষাবস্থার সহিত জামাইষষ্ঠী, পূজার ও শীতের তত্ত্বের কি একটা নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাইত।

এখন সে বিষণ্ণবদনে গলার সোনার দানাটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, তত্ত্বের ও তত্ত্বাভিলাষিণী শ্বশ্রূঠাকুরাণীবর্গের বদনে কাল্পনিক অঙ্গারের ব্যবস্থা করিয়া, মানসিক সন্তোষলাভ করে।

কদম্ব-সুন্দরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হে পান্থ, একান্তে এই যমুনা-পুলিনে,
চারিধারে প্রকৃতির গরিমা-ঐশ্বর্য্য,
কি আশ্চর্য্য, হের এই কদম্ব-তরুটি
কি বিশাল !—অশ্বত্থের অন্তরের বন্ধু !
ভীম কান্ত সৌন্দর্য্যের একি সমাবেশ !
কাননলক্ষ্মীর যেন বিরাট স্বপন !
সৌখিন, সৌন্দর্য্য-প্রিয় যেন কোন দৈত্য
পালিয়াছে নিজহস্তে এ যাদু-দুলালে !
কেলি কদম্বের কুঞ্জ যমুনার ধারে
কি সুন্দর ! মনোহর দেব-ব্যূহ যেন !
চারিধারে উচ্চশির সেনার মণ্ডলি ;
তারি মাঝে রাজে এই কদম্ব তরুটি,
মদনমোহন-কান্তি দেবসেনাপতি !
তরুটির পাদমূলে, ধবল মর্ম্মরে,
দেখিছ না ? দেবেন্দ্রের অপ্সরা-স্বপন !
বিচিত্র পাষাণ-মূর্ত্তি ! সীমন্তে সিন্দূর
পাষাণীর, পা দুখানি অলক্তে রঞ্জিত !
গলে বরগুঞ্জমালা !—কদম্বের কুঞ্জ
হয় যবে কুসুমিত, পাগুারা সোহাগে,
শ্রীঅঙ্গে মাখায়ে মরি পুষ্পরেণু কণা,
করে এই অঙ্গনারে পুষ্প-আভরণা !
দুই কর্ণে দেয় মরি কদম্ব-ঝুমুকা
দোলাইয়া ; গলে দেয় কদম্বের মালা ;
বিরচিত কদম্বের পেলব পল্লবে
সর্ব্বাঙ্গে পরায়ে দেয় কদম্বের শাড়ি !
আহা মরি, ফুল-কঙ্কণে, ফুল-নূপুরে
পুষ্পময়ী, চির-আনন্দে আনন্দময়ী,
কে গো এ বসন্ত-লক্ষ্মী বাসন্তী বসনে
এ ব্রজ-ভবনে ?
ব্রজের এ মৌন-বধূ ;
এত' নহে কিশোরী বালিকা, মুকুলিতা
রূপের কলিকা, বাল-রাধিকার সখী !
এ নহে রাধিকা ; পাষাণ প্রতিমা মাঝে
কোথা সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি ? হেরি
যাহা, সারা ব্রজ করে পূজা, "জয় রাধা"
"জয় রাধা" বলি !—প্রৌঢ়ার এ সাজ নহে,
এ নহে যশোদা !—বিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে
হের, যুবতী-লাবণ্য, যুবতীর ভূষা !
দেখিছ না ? কি উচ্ছ্বাস কনক-কলসে
উরসের, কি উচ্ছ্বাস বদন-মণ্ডলে !
হের কিবা গ্রীবা-ভঙ্গী ! তরঙ্গ উথলে
লাবণ্যের, রাজ-হংসী যমুনার জলে !

ইঁহারি নাম কদম্ব-সুন্দরী ! গোপীর
এ মূর্ত্তি ! রাধার সখী ! শুনিতে কি চাহ
তাঁর এ প্রতিমা কেন ? শোন মন দিয়া
শ্রবণ-ললাম সেই সুন্দর কাহিনী !

* * *

বহুদিন, বহুদিন গত ; এক দিন
এই বৃন্দাবনে, বঙ্গের মৈথিল কবি
বিদ্যাপতি, এসেছিলা তীর্থ-দরশনে !
আদরে যতনে তাঁরে সুচতুর পাণ্ডা
দেখাইল কুঞ্জে কুঞ্জে, বিপিনে বিপিনে,
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি, ভক্তের বাসনা !
একি সেই নব বৃন্দাবন ? আহা মরি
চির সাধের স্বপন, কবির !—নবীন
তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল !
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
আকুল নব অলিকুল ! নব শোভন
নিকুঞ্জে, মরি, নব নব প্রেম-বিভোর
একি সেই বৃন্দাবন ? নব যুবরাজ
নবীন নব নাগরী সহ, নিতি নিতি
মিলিয়ে নবীন ভাতি, যথা বিহরিত
নবীন কিশোর ?

একি সেই বৃন্দাবন ?

যথা, রসময়-রাস-রভস্-রস-মাঝে
মরি-, ঋতুপতি রাতি রসিক-বর রাজে !
  রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই,
  রাস-রসিক সহ রস অবগাই ;
  রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গ হি নটই,
  রণরণি কঙ্কণকিঙ্কিণী রটই*
বিদ্যাপতি কবি আনন্দ-সাগরে মগ্ন,
মুখে নাহি বাণী !—তাঁর চির জীবনের
স্বপ্ন, হইল সফল ! কবির উজ্জ্বল

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

আঁখি, হইল আরো উজ্জ্বল ! প্রীতি-মুগ্ধ
কবি, হইয়ে অজ্ঞান (প্রাণের মধুর
কনক-কটোরা ভরি) করিলেন পান
ব্রজের অমিয়া ! তুই সুচির-যৌবনা
অয়ি ব্রজভূমি ! তোর রূপ-পানে ভোর
বহিল কবির নেত্রে পুলকের লোর !

* * *

অয়ি ব্রজ ভূমি, চিরদিন, চিরদিন,
তুই, প্রেম-পিপাসিতা ! বাহু-আলিঙ্গনে
বাঁধিলি কবিরে তাই নিবিড় বন্ধনে !
দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল,
বিরহজনিত দুঃখ সব দূরে গেল !
চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল,
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল !
নয়ন ঢুলাঢুলি, লহু লহু হাস,
অঙ্গ হেলাহেলি, গদগদ ভায ! *

* * *

হেরিলা স্বচক্ষে কবি, সেই বৃন্দাবন,
গোবিন্দের লীলা-নিকেতন, আহা যথা
গোবর্দ্ধন গিরি হ'তে প্রেমের ঝরণা
ঝর্ ঝর্ ঝরে, কি নিদাঘে, কি বসন্তে ;
মরি আদি অন্তহারা মন্দাকিনী-পারা !
আহা সেই পূতবারি, দারুণ ঝঞ্ঝনা,
সর্ব্ব দারুণ যন্ত্রণা, ভয়-দুঃখ-হারী !
ব্রজ-নর-নারী, প্রেম-ঝরণার তটে,
মন্দিরের সন্নিকটে, নয়ন মুদিয়া,
"জয় জয় রাধাবিনোদিয়া" বলি, পিয়ে
সেই বারি, রাত্রি দিবা, আপনা বিসারি,
কবিও করিলা পান অঞ্জলি পূরিয়া !
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি হেরিয়া হেরিয়া,
কুঞ্জে কুঞ্জে চলিলা ছুটিয়া ! সারাদিন

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

চিত্তহারিণী ব্রজকাহিনী, পাণ্ডা-মুখে
শুনিয়া শুনিয়া, কুঞ্জে কুঞ্জে বঙ্গকবি
চলিলা ছুটিয়া, হর্ষে উধাও অস্থির !
রঙ্গে ভঙ্গে গাহিতে গাহিতে গোষ্ঠগীতি
বালগোবিন্দের, কভু যশোদামাতার
প্রীতির গীতি, হাসির কথা, রঙ্গ-গাথা
ক্ষীর-সর-নবনী-চোরের !

কভু কবি

গীত গাহি বলে, কোন্ ছলে, শ্রাবণের
নব জলধর (রঙ্গিণী দামিনী ধনী,
ক্রোড়ে বসি, পরামর্শ দেয় তার কাণে !)
ছেয়ে ফেলে কুঞ্জবনে ঘোর অন্ধকার
বিতানে বিতানে—অবিরল বৃষ্টিধারা
পাতে, অবিরল ঝঞ্ঝা-বাতে, গোপ গোপী
বৃন্দে, করিয়া অস্থির, খেদায় নিকুঞ্জ
বন হ'তে !—শুধু আহা দুষ্ট জলধর
(দামিনীর নর্ম্ম-সখা, শঠ শিরোমণি !)
ফেলে না জলের কণা সে নিকুঞ্জবনে,
যথা মরি শ্রীরাধিকা, সখী ছাড়া হয়ে,
দাঁড়াইয়া বিনোদিনী, একা, একাকিনী
  গুরু গুরু গরজনে দুরু দুরু করি
কাঁপে হিয়া, স্রস্ত বাস, আকুল-কুন্তলা,
বিপদ-বিহ্বলা !—হাস্যমুখে, বনমালী,
সুযোগ পাইয়া, তথা মিলিলা আসিয়া !
মোহন মালিকা হয়ে, বাহু আবেষ্টিয়া,
কণ্ঠ তাঁর বেড়িল রাধিকা, মরি মরি
তমালে বেড়িল যেন সুবর্ণ লতিকা !
  রসবতী রসিক শিরোমণি পাশে
  মনোরথ সিধি, বিধি পূরল আশে।
  চন্দ্রবদনী ধনী, কানু চকোর,
  নব বারিদে জনু চাতক ভোর।

  হিয় মিলনে প্রিয় অতি উতরোল,
  ধক্ ধক্ অন্তর, গদ গদ বোল !*

কভু কবি গীত গাহি বলে "কালিন্দীর
কালো জলে নামিয়াছে উলঙ্গিনী বেশে
গোপিনীরা মহোল্লাসে ! (বিবিক্ত প্রদেশে,
যমুনা-পুলিনে, 'নারী-ঘাট" সেই !—যথা
পুরুষের যাইবার নাহি অধিকার)
কি মধুর জলক্রীড়া ! এ উহার গাত্রে
ফেলিতেছে জল। কলকণ্ঠে, হাস্যালাপে,
সুখ কথা, প্রেম কথা, মিলনের কথা,
দম্পতি-বিবাদ, মানের সংবাদ, কত
কথা, কত কথা বলে ! এ উহার অঙ্গে
পড়ে ঢলে ; নিত্য নব রঙ্গের রঙ্গিণী,
যমুনা তরঙ্গে কেশের তরঙ্গ ঢালি,
বন হরিণীর মত জলের নিকুঞ্জে
বেড়ায় ছুটিয়া !—কম্বু-বিনিন্দিত গ্রীবা
নানাছন্দে, জলে কাঁপাইয়া, শ্রেণী বাঁধি
যমুনাজলহংসিনীর মত, ভাসিতে
ভাসিতে, কতই রঙ্গে যায় সাঁতারিয়া !
কুমুদিনী, কমলিনী, নলিনীর মত
নারী-মুখ-শতদল দেহের মৃণালে
যমুনার জলে, কি সুন্দর !—হে স্বর্গের
অপ্সরারা, আয় তোরা, আয় দেখে যারে,
অপরাজিতার সাথে, সন্ধ্যা মায়াবিনী
গেঁথেছে চম্পকমালা এক পুষ্পহারে !

* * *

হৃদয়ে ধরে না ধৈর্য্য ! একি এ অসহ্য
যৌবন-আবেগ ! আজি নীবীবন্ধ সাথে
খুলিয়া গিয়াছে যেন সমস্ত বন্ধন !
চঞ্চল ও বাহুমূলে, তপ্ত বক্ষতলে,

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

অস্থির চরণে, অঙ্গের লাবণ্যরাশি
কোন্ মন্ত্রবলে, আজি হইয়ে তরল
মিশি গেল, এই চির ঢল ঢল নীল
কান্তি, চঞ্চল তরল যমুনার জলে!
মধুর দৌরাত্ম্য হেরি, কক্ষের কলসী
ভাসিয়া চলিয়া যায়, উধাও, অস্থির!
ধনী তারে কঙ্কণের মৃদু কিনি কিনি
করি, টানি আনে; আহা পাইয়া আঘাত,
অভিযোগে কলসী কাঁদিয়া বলে "উঠ
সখি, চল, ছিছি আলি, একি নাগরালি!"

* * *

স্নানান্তে পুলিনে উঠি মগনা নগনা
গোপাঙ্গনা, দাঁড়াইল বস্ত্র পরিবারে!
একি লীলা! শূন্য ঘাট! কোথায় বসন?
হের, হের, খোঁজ খোঁজ! কোথায় চুনরি?
কোথায় ঘাঘরি? কোথা গেল শাড়ি? কোথা
রূপালি আঙ্গিয়া? কোথা সোণার কাঁচলি?
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল যেন রে
ব্রজে, গোপীদের মাথে!—ছি ছি কি লাঞ্ছনা!

* * *

কে গো ওই বাজায় মুরলী? তরুতলে
ত্রিভঙ্গমূরতি! শ্যামল জলদ কান্তি!
একি রূপ! পীতাম্বর, মদন মোহন!
হেরি তারে গোপিনীরা যে যেখানে ছিল
পলাইল রড়ে জলের ভিতরে! লাজে
আকণ্ঠমগ্ন হয়ে, বিহ্বলা গোপাঙ্গনা
ঢাকিল সুতনু! একমাত্র নারী তথা
দাঁড়ায়ে রহিল! যমুনা-পুলিন হ'তে
নাহি সে সরিল!
সে কি লাজহীনা?
তুমি কি জান না, পাপ-গন্ধর্ব্বের কন্যা
অবলজ্জা! সদা সে গো সাজসজ্জাময়ী
বসন ভূষণ প্রিয়া!—বসন হারালে
তিলমাত্র, গাত্র তার দহে! অঙ্গ তার
কাঁপে শিহরি শিহরি; চক্ষে হায় হেরে
অন্ধকার! কাঁদি কহে, গুমরি গুমরি,
"কি হইল! হায় কি হইল! হে ধরিত্রি
হও গো বিদীর্ণা, পশিব তুহার মাঝে,
আমি উলঙ্গিনী!"
উলঙ্গিনী শ্রীরাধিকা
নয়ন মুদিয়া রহিলা দাঁড়ায়ে; জলে
নাহি গো পশিলা! বংশীধর পীতাম্বর
পানে, জোড় হস্ত করি, কহিলা "হে হরি,
একি এ লীলা আজি তব? তোমার নাম
দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ! আজি কিন্তু
কেন নাথ, ভুলে গেলে পূর্ব্ব-আচরণ?
বস্ত্র হরি নিলে; এবে তাকাইতে তব
পানে, হবে লজ্জা!—নাথ এই কি বুঝেছ
আমি আর, নয়ন খুলিয়া, তব পানে
চাহিতে নারিব? তব পদে হ'ল দীক্ষা,
এতকাল করিলাম প্রেমশিক্ষা; বল
তার, দয়াময় হরি, এই কি পরীক্ষা?
জান না কি এই দীনা রাধা
ভুবন ঈপ্সিত রূপ শ্যামেরি হৃদয় আধা?
মুদিলেও এ নয়ান
জ্বলে আঁখে ও বয়ান
ও মূর্ত্তি-দর্শনে তবে কেমনে গো দিবে বাধা?*
লাজে মরি, ছি ছি, একি রীতি!—বস্ত্রচোর!
থাক তুমি বস্ত্র লয়ে। আমি মনোচোরে
লয়ে, এই ভাবে, উলঙ্গিনী নারী-বেশে
পশিব নগরীমাঝে! হে ব্রজরঞ্জন
থাকে যদি ধর্ম্ম, আর আমার সুকর্ম্ম

* পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী "দেবীর কবিতা ও গান" কাব্যের "বলি শোন্ খুলে" কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

থাকে যদি; বিশ্বনাথ, অগতির গতি,
থাকে যদি মতি, তব পদে, ব্রজমাঝে
অদৃশ্য হইয়া পশিব, হেরিব চক্ষে
সবারে! আমারে কিন্তু কেহ না হেরিবে!
ওহে নিখিলের স্বামী, তুমি মম স্বামী,
আমি কি গো হেথা, দীনা ভিখারিণী হয়ে,
থাকিব দাঁড়ায়ে—তুচ্ছ বসন-অর্থিনী?
নয়নে গরল রাখি, অধরেতে মধু,
নাহি কি ভকতি বঁধু হৃদয়-সরোজে?"
এত বলি প্রেমময়ী রাধা বিনোদিনী
চলিলা নগর-পথ দিয়া, উলঙ্গিনী
সাজে! আহা চরণের, নূপুর-শিঞ্জিনী
ঝিমরি ঝিমরি বাজে! আহা শ্রীঅঙ্গের
কঙ্কণকিঙ্কিণী করে কলরোল, তারা
উতলা পাগল, গৃহে গেলে যেন বাঁচে!
তারা বলে বার বার "ওগো সহচরি,
লাজে হানি বাজ, চল চল গৃহকাজে!"

* * *

প্রেম আহা বিশ্বজয়ী! সুভক্ত-বৎসল
শ্রীহরি, তাঁহার চিত্তে জাগিল করুণা!
কে বুঝে তাঁহার মায়া? মায়াময় তিনি!
সন্ধ্যাকাল! হতেছিল মন্দিরে আরতি,
বাজাইতেছিল শঙ্খ পৌরনারী সবে,
ঘরে ঘরে পথে পথে বিপণি দোকানে
জ্বালাইতেছিল বাতি! ব্রজের মালিনী
যোগাইতেছিল মালা; ব্রজগোয়ালিনী
কলসে বেচিতেছিল দুগ্ধ; মহাহর্ষে
নাচিতেছিল ব্রজবালবৃন্দ! সর্ব্বত্র
চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল পথে ঘাটে মাঠে!
হেনকালে অকস্মাৎ, একি লীলাখেলা,
ব্রজমাঝে নিশুতি আইল! নর নারী
পাষাণপ্রতিমা সম যে যেখানে ছিল
দাঁড়ায়ে রহিল! প্রাণ আছে, জ্ঞান নাই
বুঝিবার! দুইচক্ষু আছে, শক্তি নাই
হেরিবার! ব্রজে আজি পাষাণমূরতি
চারি ধারে, সারা ব্রজ পাষাণের পুরী!

* * *

নগ্নমহিমার মরি সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে
দীপ্তিময়ী ব্রজেশ্বরী, রূপে আলো করি
নগরী, অকুতোভয়ে পশিলা মন্দিরে!
ব্রজের পাষাণ-আঁখি পাষাণ-দৃষ্টিতে
চাহিল; সে নগনারে নারিল লখিতে!
কেবল একটি পক্ষী, পক্ষীকুল-গ্লানি,
বৃক্ষে বসি নেহারিল নগ্না রাধিকারে!
অমনি যুগল চক্ষু দুষ্ট বায়সের
মুদিল, ডুবিয়া গেল চির অন্ধকারে!
দেবাঙ্গনা বরষিল লাজমুষ্টি; মরি
স্বর্গ-বিদ্যাধরী বরষিল পুষ্প-বৃষ্টি
বিজয়িনী রাধিকার শিরে! শ্রীরাধিকা
পরিলেন লাজবস্ত্র; মায়াগ্রস্ত ব্রজ
জাগিল; জাগিল পুনঃ হর্ষ-কলরবে—
যেন কোন মোহময় স্বপ্ন-অবসানে!

* * *

বুঝিলা রাধিকা—কার বলে, এ অকূল
সিন্ধু, তরিলা; ডাকিলা "দীনবন্ধু" বলে;
কৃপাসিন্ধু দেখা দিলা হাসিয়া হাসিয়া!
বন্দি ও চরণ-অরবিন্দ, গোপবধূ
ধুইলা চরণধূলা অর্ঘ্যজল দিয়া!
সুকেশিনী, মরি, নয়ন-জলে ভাসিয়া,
মুছাইলা ধৌতপদ কেশরাশি দিয়া!
যোড়হস্তে প্রেমময়ী কহিলা সুস্বরে!—
"বঁধু কি আর বলিব আমি *

* কবি চণ্ডিদাস হইতে উদ্ধৃত।

মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমপিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে,
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
এ কুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
হৃদয়ের নিধি, পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

* * *

মঙ্গল।

অবর গ্রহ হইতে প্রবর গ্রহের ভেদ। প্রবর গ্রহগণের কক্ষা ভূকক্ষার বহির্ভাগে, তজ্জন্য প্রবর গ্রহগণ ভূকক্ষা ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কখন আসেন না অর্থাৎ তাঁহাদের অধঃ সমাগম কখনই হয় না, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা পৃথিবীর বহির্ভাগে যেদিকে সূর্য্য তাহার বিপরীত দিকে থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের কেবল ঊর্দ্ধ সমাগম ঘটে। ঊর্দ্ধ সমাগমকে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে শীঘ্রোচ্চ বলে। চন্দ্র বুধ বা শুক্রের ন্যায় তাহাদের বিম্বের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না। মঙ্গল যখন রবি হইতে পাদান্তরে থাকেন, তখন তাঁহার বিম্ব স্পষ্ট অর্দ্ধাধিক দেখায় কিন্তু অপর প্রবর গ্রহগণ এতদূরে আছেন যে, তাঁহাদের আলোকিত পূর্ণ বিম্ব প্রায় সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে এবং অর্দ্ধাধিক বিম্ব কখন হইলেও জানিতে পারা যায় না।

মঙ্গলের দূরত্ব ও ভগণাদি। প্রবর গ্রহগণের মধ্যে মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ, এবং রবি হইতে দূরত্ব হিসাবে, প্রধান গ্রহগণের মধ্যে ইনি চতুর্থ, পৃথ্বী ও চন্দ্রকে এক ধরিয়া লও। পঞ্চকুটুম্ব বিশিষ্ট পার্থিব গ্রহপরিবারের মধ্যে আকার পরিমাণে মঙ্গল তৃতীয়। প্রধান গ্রহগণের মধ্যে কেবল বুধ মঙ্গল অপেক্ষা ছোট।

মঙ্গল রবি পরিতঃ ৬৮৬ দি, ২৩ ঘ, ৩১ মি, ১২ সেকণ্ডে একবার ভ্রমণ করেন; সিদ্ধান্ত মতে এই ভগণকাল ৬৮৬ দি, ২৩ ঘ, ৫৬ মি, ২·৩৭ সে।

দস্রত্র্যষ্টরসাঙ্গাক্ষিলোচনানি কুজস্য তু। ৩০॥১। সু, সি।

অর্থাৎ ৪৩, ২০, ০০০ বৎসরে মঙ্গলের ২২, ৯৬৮৩২ ভ্রমণ হয়। এই হিসাবে এক ভ্রমণে ৬৮৬ দি, ৫১ দ, ৫০ প, ৫·৮৭ বিপ, পড়ে।

সূর্য্য হইতে মঙ্গল হারাহারি ১৪, ১৩, ৬৮০০০ মাইল অন্তরে থাকেন। মঙ্গলের কক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্র; বুধের ভিন্ন অপর কোন প্রধান গ্রহের কক্ষা এত উৎকেন্দ্র নহে। মঙ্গল-কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব ০·০৯৩১৬ রবিমণ্ডলের মধ্য হইতে কুজকক্ষার মধ্য ১, ৩১, ৮৪, ০০০ মাইল। এই উৎকেন্দ্রত্ব নিবন্ধন সূর্য্য হইতে মঙ্গলের দূরত্ব যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন ১৫, ৪৫, ৫২, ০০০ মাইল হয়, আর দূরত্ব যখন অত্যল্প হয়, তখন ১২, ৮১, ৮৪ ০০০ মাইল হয়। সিদ্ধান্ত মতে উৎকেন্দ্রত্ব ০·১ এবং কক্ষা পরিমাণ ৮১, ৪৬, ৯০৯ যোজন।

যুগ্মান্তেঽর্থাদ্রয়ঃ খাগ্নী সুরা সূর্য্যা নবার্ণবাঃ।
ওজে দ্ব্যগা বসুযমা রদা রুদ্রা গজাব্ধয়ঃ॥
কুজাদিনামতঃ শৈঘ্র্যা যুগ্মান্তেঽর্থাগ্নিদস্রকাঃ।
গুণাগ্নিচন্দ্রাঃ খনগাদ্বিরসাক্ষীণিগোঽগ্নয়ঃ॥ ২।৩৫।৩৬।সূ॥
কুজস্যাপ্যঙ্কশূন্যাঙ্কষড় বেদৈক ভুজঙ্গমাঃ। ১২।৮৩।সূ॥

অর্থাৎ যুগ্মপাদে মঙ্গলের মন্দপরি ৭৫° এবং অযুগ্ম পাদে ৭২°; অতএব উক্ত পরিধিদ্বয়ের ব্যাসার্দ্ধ যথাক্রমে ৭১৬·২৫ এবং ৬৮৭·৮০ বিকলা। এই অঙ্কদ্বয় অবলম্বন করিলে উৎকেন্দ্রত্ব লাভ হইবে। সূর্য্য সিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে কক্ষা পরিমাণের নিয়ম পাইবেন।

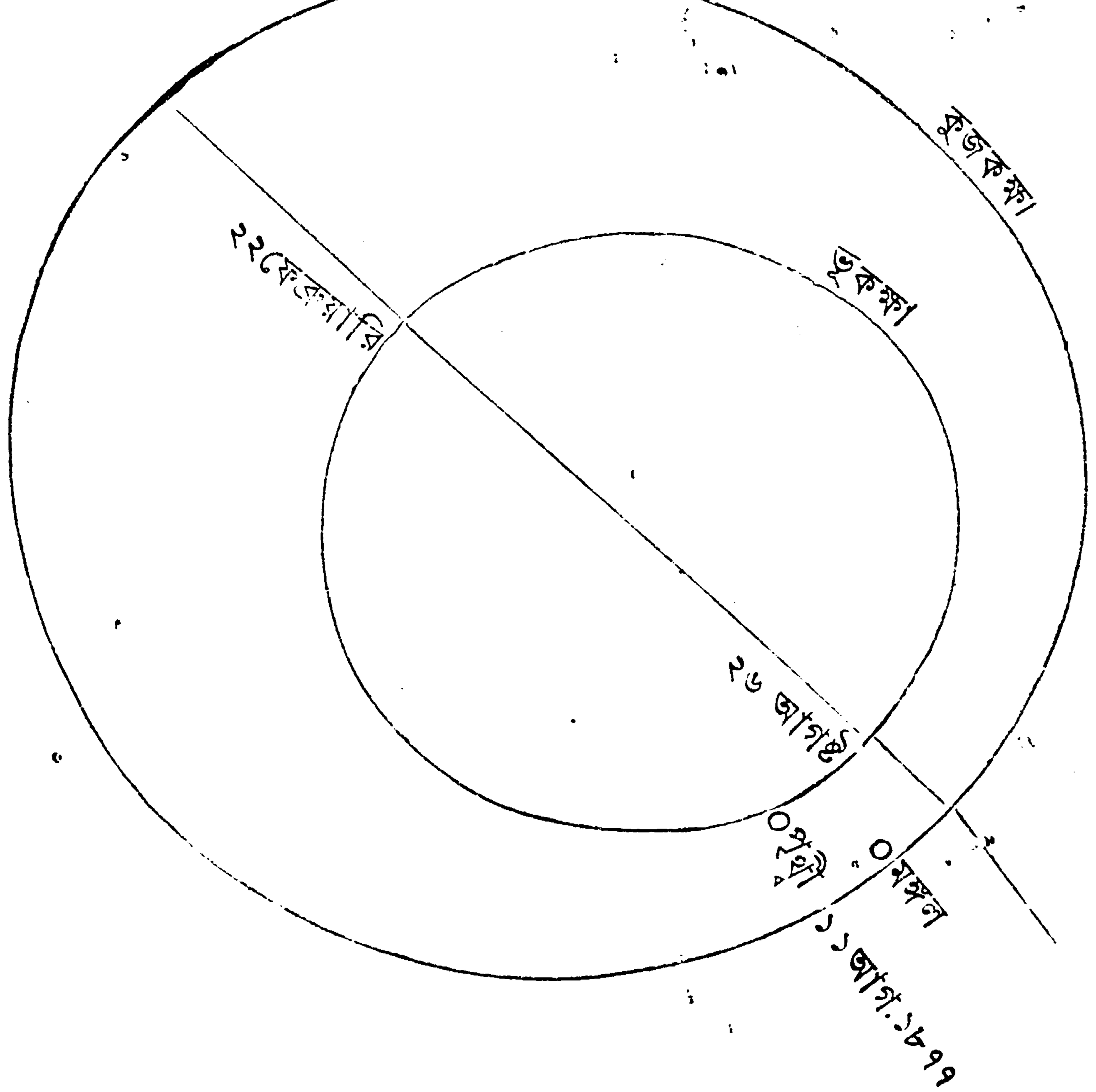

এই চিত্র ভূকক্ষা সম্বন্ধে মঙ্গল কক্ষার অবস্থান ব্যঞ্জক।

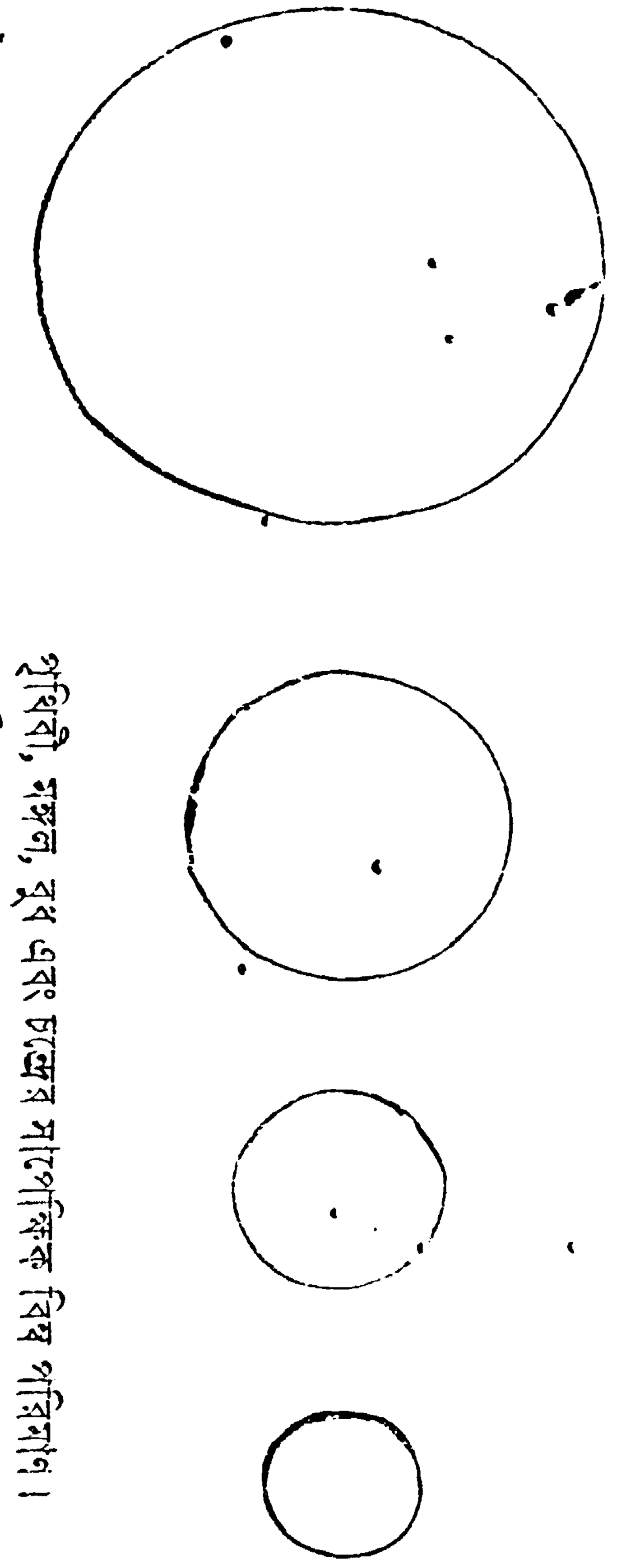

পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ এবং চন্দ্রের সাপেক্ষিক বিম্ব পরিমাণ।

মঙ্গল যখন পৃথিবীর খুব নিকটে আসেন, তখন পৃথিবী হইতে তাঁহার দূরত্ব, প্রায় ৪,৭৮,৮২,০০০ মাইল আর যখন খুব দূরে থাকেন, তখন ৬,২৩,৮৮ ০০০ মাইল হয়। মঙ্গল বিম্বের চাপাত্মক ব্যাস গড়ে ৯"·২৪, মাইল হিসাবে ৪২১১। নিরক্ষ প্রদেশীয় ব্যাস ৯·৪"২ কেন্দ্রগত ব্যাস ৯"·৩৬। ২৭ আগষ্ট তারিখে মঙ্গলের অনুহৈলিক এবং পৃথিবী একরাশিস্থ হন ; ঐ দিবসের আসন্ন সময়ে যদি পৃথ্বী ও মঙ্গলের সমাগম হয়, তবে তখন তাঁহাদের ব্যবধান ৩,৩৩, ৭৫,০০০ মাইল হয়, এতদ্বয়ের ব্যবধান ইহা অপেক্ষা ন্যূন হয় না। যখন ফেব্রুয়ারি কিম্বা মার্চ্চ মাসে সমাগম হয় তখন ঐ ব্যবধান ৬,২০,০০,০০০ মাইল হইয়া উঠে; এই সময়ে পৃথিবী ও মঙ্গল যদি সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকেন, তবে উভয়ের অন্তর ২৪, ৫২, ০০ ০০০ মাইলের অধিক হয়। মাঙ্গল্য বিম্ব যখন খুব ছোট দেখায় তখন চাপাত্মক পরিমাণ ৪·১", আর যখন খুব বড় দেখায় তখন ৩০"৪। সিদ্ধান্ত মতে দৃশ্যমান বিম্ব ২ কলা, যোজন পরিমাণে ৩০। *

কুজাদিত্য যোগ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মঙ্গল ৬৮৬·৯৮ দিনে অর্থাৎ ১ বৎসর ১০½ মাসের কিঞ্চিৎ অধিক সময়ে রবি পরিত: এক ভভ্রম সম্পন্ন করেন। কোন সমাগমরেখা হইতে পৃথিবী এবং মঙ্গল, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মঙ্গল পুনঃ কক্ষার সেই স্থানে যখন উপনীত হন পৃথিবীর তখন দুই ভভ্রমের কিছু বাকি থাকে অর্থাৎ পৃথিবী আরও ৪৩½ দিন ভ্রমণ করিলে তাহার দুই ভভ্রম পূর্ণ হয়। মঙ্গল যে বেগে চলেন, পৃথিবী তাহার দ্বিগুণ বেগে চলেন ; অতএব ৪৩½ দিনের পর অর্থাৎ পূর্ণ দুই বৎসরের অন্তে পৃথিবী যে স্থানে আসেন সে স্থান মঙ্গল হইতে পূর্ব্বঅন্তরের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ। আর ৪৯½ দিন চলিলেই পৃথিবী মঙ্গলের সহিত সমাগম লাভ করেন ; তবেই কুজাদিত্য যোগ হারাহারি দুই বৎসর পঞ্চাশ দিন অন্তর হয়। কিন্তু মঙ্গল কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব জন্য মঙ্গলের কাক্ষ্যাগতির বিষমতা ঘটে সুতরাং ঠিক ৭৮০ দিন অন্তর কুজাদিত্যের ষড্ভান্তর হয় না। নিম্নলিখিত কতিপয় বৎসরের কুজাদিত্যের ষড্ভান্তর দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কতদিন অন্তর উক্ত ব্যাপার ঘটে।

		ব্যবধান				দি	ঘ
১৮৭১ মার্চ্চ	২০, ৪ ঘ. পূ.	দি.	ঘ.	১৮৮৪ ফেব	১\ ১১ পূ.	৭৬৬	৬
১৮৭৩ এপ্রেল	২৭, ৩ „ অ.	৭৬৯	১১	১৮৮৬ মার্চ্চ	৬ মধ্যাহ্ন.	৭৬৫	[illegible]

		ব্যবধান।				দিঃ	ঘ
১৮৭৫ জুন	২০, ৮ „ পূ.	৭৮৩	১৩	১৮৮৮ এপ্রেল	১১ ৬ পূ.	৭৬৭	৬
১৮৭৭ সেপ.	৫, ১২ „ মধ্যরাত্রি	৮০৮	১৬	১৮৯০ মে	২৭ ৭ অ,	৭৭৬	১৩
১৮৭৯ নবে.	১২, ৮ „ অ.	৭৯৭	২০	১৮৯২ অগ.	৩ ১০ অ.	৭৯৯	৩
১৮৮১ ডিসে."	২৭, ৫ „ পূ.	৭৭৫	৯	১৮৯৪ অক.	২০ ১৮ অ.	৮০৮	১৪
				১৮৯৬ ডিসে.	১০ ১৮ পূ.	৭৮২	১২

সূর্য্য হইতে মঙ্গল কতদিনে ষড়ভান্তরিত হন, তাহার গণিত।

$$\text{পৃথিবীর দৈনিক গতি } \frac{৩৬০^\circ}{৩৬৫{\cdot}২৬},$$

$$\text{মঙ্গলের দৈনিক গতি } \frac{৩৬০^\circ}{৬৮৬{\cdot}৯৮};$$

পৃথিবী প্রতিদিন মঙ্গল অপেক্ষা $\frac{৩৬০^\circ}{৩৬৫{\cdot}২৫} - \frac{৩৬০^\circ}{৬৮৬{\cdot}৯৮}$ পরিমাণে অগ্রসর হন ; অতএব যদি একদিনে এতাবৎ চাপাত্মক গতি হয়, তবে পূর্ণ কক্ষাভ্রম কত দিনে হইবে ?

$$\text{অর্থাৎ } \frac{৩৬০^\circ}{৩৬৫{\cdot}২৬} - \frac{৩৬০^\circ}{৬৮৫{\cdot}৯৫} : ৩৬০^\circ : : ১ \text{ দিন} : \text{কতদিন}$$

$$\text{ইষ্টরাশি} = \frac{৩৬০}{\frac{৩৬০}{৩৬৫{\cdot}২৬} - \frac{৩৬০}{৬৮৬{\cdot}৯৮}} = \frac{৬৮৬{\cdot}৯৮ \times ৩৬৫{\cdot}২৬}{৩২১{\cdot}\quad ২৭} = ৭৭৯{\cdot}৯$$

অর্থাৎ হারাহারি প্রায় ৭৮০ দিন অন্তর কুজ্যাদিত্য যোগ হয়।

কক্ষার অবনতি, মণ্ডলের পৃষ্ঠফল ইত্যাদি। মঙ্গল কক্ষার ক্রান্তিবৃত্তে অবনতির পরিমাণ ১° ৫১′ ৬″। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে এই অবনতি ১″৩০′

ভচক্রলিপ্তাশীত্যংশ পরমং দক্ষিণোত্তরং
বিক্ষিপ্যতে স্বপাতেন স্বক্রান্ত্যন্তাদনুষ্ণগুঃ। ১।৬৮
তন্নবাংশ দ্বিগুণিতং জীবস্ত্রিগুণিতংকুজঃ। ১।৬৯

$$\text{অর্থাৎ } \frac{৩৬০ \times ৬০}{৮০} \times \frac{৩}{৯} = ৯০′ = ১″ ৩০′$$

মঙ্গলের কক্ষার অক্ষে তদীয় মণ্ডলের অক্ষের অবনতি ২৮°,৪২′। মঙ্গলের বর্ষমান ৬৬৮ দিন ১৬ ঘণ্টা। আমাদের দিনমান অপেক্ষা মঙ্গলের দিনমান কিঞ্চিৎ অধিক যেমন ১০০তে ১০৩। মঙ্গল মণ্ডলের উত্তরার্দ্ধে গ্রীষ্ম ৩৭২ শীত ২৯৬ দিন ; সুতরাং তদীয় দক্ষিণ গোলে গ্রীষ্ম ২৯৬ এবং শীত ৩৭২ দিন মাঙ্গল্য দিনমানের হিসাবে উত্তর গোলে বসন্ত ১৯১, গ্রীষ্ম ১৮১, বর্ষা ১৪৯, শীত ১৮৭ দিন। দক্ষিণ গোলে ঋতু চতুষ্টয়ের বিপর্য্যাস ঘটে।

দৌরবীক্ষণিক রূপ। যথাযোগ্য দৃষ্টিযন্ত্র সহকারে দর্শন করিলে মঙ্গল মণ্ডলে স্থানে স্থানে অনুজ্জ্বল পীতলোহিত বর্ণ দেখিয়া সেগুলিকে পার্থিব মহাদ্বীপ সদৃশ বোধ হয়। আবার

স্থানে স্থানে আনীলাভা দৃষ্ট হয়, এগুলি সাগরবৎ জলরাশি বলিয়া বিশ্বাস! নিখিল মঙ্গল-মণ্ডলে কৌসম্ভ বর্ণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনুমিত হয়, যে, তত্রত্য ভূমি সাধারণতঃ স্বুবর্ণ-গৌরিক। শুধু চক্ষে মঙ্গলকে যত আরক্তিম দেখায়, দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে তত লাল দেখায় না, এবং দূরবীক্ষণের তেজ যত বেশী বর্ণ তত ফিকে দেখায়। উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া মঙ্গল-মণ্ডলের চিত্র অঙ্কিত করিলে চিত্রদর্শনে তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে জলস্থল দেখিলাম বলিয়া বোধ হইবে। উজ্জ্বলাংশ কৌসুম্ভবর্ণ, তাঁহার মধ্যে মধ্যে লোহিত তাম্র বা হরিত্‌বিন্দু দৃষ্ট হয়। অনুজ্জ্বলাংশ সর্ব্বত্র সমশ্যাম নহে; শ্যামত্বের তারতম্য আছে; এ অংশ মলিন শুক্ল হরিত বা আনীল দেখিতে যেন নিপীতসৌরালোক-দ্রববিশেষ। যদি মঙ্গলে জলের ও স্থলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে তথা পৃথিবীর মত ॥৶০ আনা জল, ।৵০ আনা স্থল নহে, তথা জল ও স্থলের ভাগ সমান। তথা মহাসাগরবৎ জলের অবস্থান অল্পই। তথা প্রায়ই সুদীর্ঘ, আয়ত প্রণালী আকারে জলের অবস্থিতি! মঙ্গল মণ্ডলের উভয় কেন্দ্র পরিসরে যে সমুজ্জ্বল শুভ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা অধুনাতন জ্যোতিষীগণ তুষাররাশি বলিয়া থাকেন এবং তুষার বলিবার কারণ এই যে, মঙ্গল লোকে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে উক্ত তুষারবৎ শুক্লরাশি সূর্য্যের উত্তাপে অপচিত হয় এবং শীতাগমে উহার উপচিতি ঘটে।

মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব বিচার। মঙ্গলমণ্ডলের মানচিত্রে কলঙ্কবৎ যে সকল শ্যাম-ভূমি দৃষ্ট হয় এবং যেগুলি সাগর নামে অভিহিত হয়, সেগুলি বস্তুতঃ জলরাশি কি না তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। চন্দ্রমণ্ডলে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমাভিভূত ছিলেন, মঙ্গলমণ্ডলে সাগর দর্শন তদ্‌বৎ প্রমাদ মাত্র হইলেও হইতে পারে। শ্যামস্থল সকল যে জলরাশি তাহা সুনিশ্চিত নহে; পরন্তু সেগুলি জলময় হইলেও হইতে পারে। জলদ্বারা আলোক নিপীত হয়, স্থলদ্বারা আলোক প্রতিফলিত হয়; কিন্তু কোন কোন শুদ্ধ খনিজ-পদার্থের শ্যামরাগ দ্বারা এবং উদ্ভিদ-আবরিত প্রান্তর দ্বারাও আলোক নিগীর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ আধিভৌতিক ব্যাপার জন্য চন্দ্রমণ্ডলে যেগুলিকে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত জল বলিয়া ভ্রম ছিল, সেগুলি এখন যথাযত পর্য্যবেক্ষণ বশতঃ বহ্বায়ত প্রান্ত-রোপরি শুষ্ক বন্ধুর ভূমিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মঙ্গলমণ্ডলের শ্যাম প্রদেশ সমূহ প্রকৃত সমুদ্র না হইলেও সমুদ্রের সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত সেগুলিকে জলধি ব্যঞ্জক শব্দদ্বারা উল্লেখ করা অসাম্প্রত নহে; কারণ যাবৎ না প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত প্রদেশ সকল জলপূর্ণ নহে, তাবৎ তাহাদের নামান্তর করিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু অদ্যাপি কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই যে ভৌমসাগর ভূমিসাগর হইতে বিষদৃশ; বরং সাদৃশ্য পক্ষেই সম্ভাবনা অধিক।

বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব বিচার। মঙ্গল যে বায়ুমণ্ডল-পরিবেষ্টিত তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণী-কৃত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে যে, এই বিম্বের মধ্য অপেক্ষা উপান্ত উজ্জ্বল-তর, মধ্য হইতে উপান্ত পর্য্যন্ত প্রতিফলিত আলোকের ক্রমবৃদ্ধি দেখা যায়। এ তথ্যের নিদান কেবল বায়ুমণ্ডল। নিপীত আলোকের বৃদ্ধি বায়ুকোষের বেধের অনুলোম অনুযায়ী.

সুতরাং মধ্যস্থলে আলোকের পরিমাণ অল্পিষ্ঠ, উপকণ্ঠে ভূয়িষ্ঠ। অপিচ বেধলব্ধ অন্যতথ্য দ্বারা এ তথ্যের প্রমাণ দৃঢ়ীভূত করা যায়। অক্ষাবর্ত্তনজনিত পরিচ্ছিন্ন শ্যাম চিহ্ন সকল মধ্য হইতে বিম্বান্তে যাইতে যাইতে অস্পষ্ট হয় এবং পরিণামে মধ্যরেখা হইতে ৫০°, ৬০° অন্তরে আসিলে অদৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং তত্রত্য বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা অনুসারে লাঞ্ছনের অস্পষ্টতার ন্যূনাধিক্য ঘটে। চন্দ্রমণ্ডলে এরূপ ঘটনা ঘটে না! বায়ুর অস্তিত্ব পক্ষে তৃতীয় প্রমাণ এই যে মঙ্গলের কেন্দ্রদ্বয়ে যে শুক্ল চিহ্ন আছে, তাহা শীতকালে বাড়ে এবং গ্রীষ্মে ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। বায়ুদ্বারা তুষার বা মেঘরাশি ঘনীভূত না হইলে শুক্লচিহ্ন দুইটির এবম্ভূত পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

যে বায়ু সেবন করিয়া আমরা প্রাণধারণ করি, মঙ্গলমণ্ডলে ঠিক তদ্‌বৎ বায়ু না থাকিতে পারে; ভৌম সাগরের আলোক নিপায়ী দ্রব্যময় পদার্থ ঠিক জল না হইতে পারে, তত্রত্য তুষার রাসায়ণিক ক্রিয়া যোগে অধঃপাতিত, এবং পার্থিব তুষার হইতে ভিন্ন ধর্ম্মশীল তুষার হইতে পারে।

বর্ণপট্টিকার ব্যাকৃতি প্রভাবে ঈদৃশ সংশয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। মঙ্গলের আলোক প্রতিফলিত সৌরালোক মাত্র, সুতরাং আপাততঃ বিশ্বাস হয় যে, মঙ্গলের বর্ণ-পট্টিকা সৌরালোকের বর্ণপট্টিকার প্রত্যুৎপত্তি মাত্র; কিন্তু পার্থিব বায়ুকোষের বর্ণপট্টিকায় নিপীত আলোকের যদ্রূপ রেখা দৃষ্ট হয়, ঠিক তদ্রূপ রেখা ভৌমপট্টিকায় পাওয়া যায়। কোন কোন হৈতুক বলিতে পারেন যে এ কোন বিস্ময়াবহ ব্যাপার নহে এবং এতদ্দ্বারা প্রমাণই বা কি হইল? তাঁহারা বলেন যে মঙ্গল হইতে আমরা যে আলোক প্রাপ্ত হই, তাহা ভূবায়ু দিয়া আইসে অতএব উহাতে যে ভূবায়ুর লক্ষণজ্ঞাপক রেখা থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এ আপত্তির জবাব পরীক্ষকেরাই দিয়াছেন। তাঁহারা একদিনে একক্ষণে চন্দ্রালোকের ও ভৌমালোকের বর্ণপট্টিকা লইয়াছিলেন, তৎকালে চন্দ্র অপেক্ষা মঙ্গল আকাশের অধো-ভাগে ছিলেন। উভয় আলোকই অবশ্য ভূবায়ু দিয়া আসিয়াছিল। ভূবায়ুজনিত চন্দ্রালোকে যে বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা, মঙ্গলের অপেক্ষাকৃত ক্ষিতিজের সামীপ্য প্রযুক্ত তদীয় আলোকে অধিকতর বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু চন্দ্রালোকের বর্ণপট্টিকায় কতিপয় ধ্রুবরেখা ভিন্ন মঙ্গল আলোকের রেখাচয়ের কোন চিহ্নও দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এই দুই আলোকের ভেদ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল নাই, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল আছে। এ বায়ু পার্থিব বায়ু সদৃশ এবং ইহার অধিকাংশ জলীয় বাষ্প বিশিষ্ট। মঙ্গল বায়ুর সান্দ্রত্ব এ পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; ইহা আমাদের প্রাণবায়ুর অনুরূপ।

অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, তত্রত্য সাগর, মেঘ, তুষার যথাক্রমে পার্থিব সাগর আদির ন্যায়। পরন্তু এবম্ভূত কতিপয় খণ্ড সারূপ্য দর্শন করিয়া উভয়গ্রহের ভৌগলিক ও আন্তরিক্ষিক ব্যবস্থার পূর্ণ সাদৃশ্যে সহসা উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মঙ্গল মণ্ডলে ও মহিমণ্ডলে সবিশেষ বিষমতা আছে। ভূগোলের ॥৶০ আনা জলময়, বৃহৎ বর্ষ-

কতিপয় বৃহদ্ দ্বীপবৎ, প্রকাণ্ড আটলাণ্টিক অসীম প্রশান্ত সাগর উভয়ই অগাধ জলপূর্ণ। মঙ্গলে জলের ও স্থলের পরিমাণে অনেক সমতা আছে, জলাপেক্ষা তথা স্থলভাগ বরং অধিক। তথা সার্থক নামধেয় অনেক ভূমধ্য সাগর আছে, অনেক স্থলান্তর্গত হ্রদ আছে, তথা লোহিত সাগরোপম অনেক জল[illegible] আছে, এবং তথা সরল সমান্তর কূলশালিনী নালী প্রণালী সকল নানা ভঙ্গীক্রমে পরস্পর ছেদকরায় মণ্ডল যেন জলজালে আবরিত রহিয়াছে। মঙ্গল সাগরের বর্ণের গাঢ়তায়ও সবিশেষ ভেদ অনুভূত হয়। নিরক্ষ প্রদেশের সাগর তৎপার্শ্বস্থ সাগর অপেক্ষা শ্যামতর। কতিপয় জলরাশি অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। মঙ্গলের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত এখনকার চিত্র মিলাইলে দেখা যায় যে, দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। বর্ণের বরিবর্ত্তন ঘটে, এ পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট কারণ জলের গভীরতা।

বেলুনে আরোহণ পূর্ব্বক নদী হ্রদ বা সাগরের উপর দিয়া গমন কালে জল যদি স্থির এবং স্বচ্ছ থাকে, তবে নদী প্রভৃতির তলা পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায়, বোধ হয় যেন জল নাই। সাগরোপকূল হইতে শত শত ফুট অন্তরে আলোক ও জলের অবস্থা অনুসারে ৪০।৫০ ফুট জল ভেদ করিয়া তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়। এই যুক্তি অবলম্বন করিলে অনুমিত হইবে যে, মঙ্গল মণ্ডলের শুক্লাভ জলরাশির গভীরতা কতিপয় ব্যামমাত্র, ধূসর সাগরগুলি অপেক্ষাকৃত গভীরতর এবং কৃষ্ণসাগর সমূহের গভীরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জলের বর্ণের কারণ কেবল গভীরতা নহে, দেশভেদে জলের বর্ণভেদ ঘটিতে পারে; আবার জল যত লোনা হয়, তত গাঢ়-শ্যাম দেখায়। আবার ভূতলে পীত লোহিত শুক্ল এবং কৃষ্ণসাগর আছে। যদিও এ সকল জলরাশির বর্ণ নামানুরূপ নহে তথাপি তত্তৎ জলের কিয়ৎপরিমাণে পীতাদিবর্ণ দৃষ্ট হয়। ভাগীরথীর মোহানের হরিদ্বর্ণ ভূমধ্য সাগরের অসিশ্যাম, সিনের পীত এবং গঙ্গা যমুনার জলের ভেদ প্রসিদ্ধই আছে। জলের বর্ণের যে ত্রিবিধ কারণ দেখান গেল, তাহা ভূমিসাগরে ও ভৌমসাগরে উভয়ত্র খাটে। যে স্থানের জলের বর্ণ অসান্দ্র, সে স্থান অনূপদেশ বা জলমগ্ন ভূখণ্ড। সেখানে সমুদ্রের আয়তন এবং বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। বিপুল জলপ্লাবনে বহ্বায়ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া যায়, ভূমণ্ডলেও সদৃশ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। ভারি বৃষ্টির পর যেমন অত্রত্য নদীতে আলোহিত বা আপিত পঙ্কিল জল প্রবাহিত হয়, তেমনই ঋতু অনুসারে মঙ্গলজলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

স্থলবর্ণনা। মঙ্গল মণ্ডলের মহাদেশ সকল পীতবর্ণ; তজ্জন্য অঙ্গারকের বহ্নিবৎ পীতকৌসুম্ভ বর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে শুধুচক্ষে তারাগণ হইতে নির্ব্বাচন করা যায়। কিন্তু যাঁহাদিগের তারাগণের সহিত সবিশেষ পরিচয় নাই, তাহাদিগের রোহিণী জ্যেষ্ঠা বা রক্তজ্যোতিতে অঙ্গারক ভ্রম হইতে পারে; বর্ণ সম্বন্ধে ভূমি ও ভৌমতে বিশিষ্টভেদ দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলে পৃথিবী ঈষৎ হরিদ্বর্ণা বলিয়া প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা, কারণ অত্রত্য জল ও স্থল উভয়ই হরিদ্বর্ণ; কিন্তু বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রযুক্ত এই হরিদ্বর্ণ নীলাভ ধারণ করে। বুধ এবং শুক্রলোকের জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ সহকারে আমাদের সাগরকে গাঢ়

হরিৎ, মহাদ্বীপকে ঈষদ্ হরিৎ, মধ্যভূমিকে পীত, কেন্দ্রস্থ তুষাররাশি শুভ্র, মেঘ ধবল, এবং হিমবৃষ্ট শৈলাবলিকে সিতরেখাবৎ দেখেন। মঙ্গলমণ্ডলের সাগর, মেঘ, তুষার অস্মৎসম্বন্ধে উক্তরূপেই অবভাসিত হয়। কেবল স্থলভাগ সকল যব, গোধূম, কলায়াদির ক্ষেত্রময়ত্বাৎ আপীত দেখায়।

মঙ্গলের মরাগত্ব শুধুচক্ষে যত দেখায় তত দূরবীক্ষণে দেখায় না। দৃষ্টিযন্ত্রের শক্তি অনুসারে রাগের তারতম্য ঘটে। ইহার কারণ কি? বায়ুমণ্ডল ইহার কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না; কেন না তাহা হইলে অখিল মণ্ডল সমবর্ণাত্মক হইত এবং মধ্যস্থলের রাগ অপেক্ষা পরিসরের রাগ গাঢ়তর দেখাইত কারণ মধ্যস্থল অপেক্ষা উপান্তের বায়ুকোষের বেধ অধিকতর সুতরাং গ্রহ হইতে প্রতিফলিত রশ্মিজাল মধ্য অপেক্ষা সীমাসমীপে তীব্রতর হইত। তবেই কারণ স্থলে বলিতে হইবে যে মঙ্গল হয় মরুভূমিময়, অথবা বালুকা বা রঞ্জিত মৃণ্ময়, নচেৎ তত্রত্য তরুলতাদি পীতবর্ণ।

প্রথম অনুমান মঙ্গলমণ্ডলের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যদি বলি যে মণ্ডল কেবল খনিজ পদার্থময়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে তদুপরি কোনরূপ উদ্ভিদ নাই,—শৈবাল নাই, অরণ্য, বনস্থলি, ক্ষেত্র, কিছুই নাই; কারণ যদি উদ্ভিদ থাকে তবে আমরা কেবল উদ্ভিদ্ই দেখিতে পাই, প্রকৃত স্থলভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অনির্বচনীয় ভৌতিক পদার্থময় অন্তরীক্ষের প্রবাহ লক্ষ লক্ষ বর্ষ পর্যান্ত ভূতলের ন্যায় মঙ্গলমণ্ডলে শীত, গ্রীষ্ম, তুষার, আসার, কুহ, রস, তাপ, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ উৎপন্ন করিতেছে তাহার একটি তৃণাঙ্কুর প্রসব করিবার শক্তি হইল না? প্রকৃতি নাম্নী জগদ্ধাত্রীর অচিন্ত্যপ্রসবিনী শক্তি প্রভাবে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে অবনীপৃষ্ঠে সাগরগর্ভে শৈলশিখরে কোটি কোটি জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবম্ভুতা বহুপ্রজা প্রকৃতি দ্বিতীয় ভূলোকতুল্য মঙ্গলমণ্ডলে চিরবন্ধ্যা রহিলেন! এমত নিতান্ত অমূলক অসমর্থনীয়। অন্ততঃ মঙ্গলমণ্ডলের বর্ণ সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের উদ্ভিদতত্ত্বের জ্ঞানসীমা পরিবর্দ্ধিত করা বিধেয়; এবং স্বীকর্ত্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে উদ্ভিদ সকল কেবল হরিৎ না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাত্মক হওয়া অসম্ভব নহে। বনস্পতি, ওষধি, তৃণ ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা এখানে দেখি, তাহা অন্যত্র শত শত, সহস্র সহস্র প্রকারের হইতে পারে। এখান হইতে তত্রত্য তরুগুল্ম অনুভূত হয় না, কিন্তু সিদ্ধ হইতেছে যে সালবৎ বৃহৎ বৃক্ষ হইতে শৈবালবৎ আণুবীক্ষনিক উদ্ভিদ্ সমূহের প্রায় পীত বা পীতকৌসুম্ভ বর্ণ। হয় তত্রত্য ফল, পুষ্পের অধিকাংশ লোহিতবর্ণ, নয় বনস্পতি বা ওষধি কেহই হরিৎ নহে সকলই পীত। আমরা মল্লিকা গাছে নীলফুল দেখিলে পার্থিব সংস্কারবশতঃ অবশ্যই চমকিত হইব; কিন্তু রাসায়নিক সংযোগাধীন বা শুদ্ধ পরমাণুর বিন্যাস নিবন্ধন অন্যান্য লোকে বর্ণ-বিপর্য্যাস ঘটিতে পারে।

মঙ্গল মণ্ডলে পরিবর্ত্তন। তথা তরু লতাদি কি ভূতলস্থ যবস, পনস, তাল, ঝাউ প্রভৃতির ন্যায় সম্বৎসর সমভাবাপন্ন থাকে,—না অশ্বত্থ মন্দার, পলাশ, পারুল, শিমূলের

ন্যায় শীতাত্যয়ে জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসন্তাগমে নব-কিশলয় ধারণ করে? এ প্রশ্নের উত্তর অদ্যাপি কেহ দিতে সমর্থ নহেন। মঙ্গলের নিরক্ষ প্রদেশ এবং অয়নান্তবৃত্ত হইতে ২৩½°. চাপাত্মক বিস্তৃতি বিশিষ্ট প্রদেশদ্বয় স্পষ্ট দেখা যায়; ভূগোলে এতাবতী মেখলায় উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন হয় না। অবশিষ্ট ভূভাগের অবস্থা জানা না থাকায় প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অক্ষাংশে উদ্ভিদের সবিশেষ বর্ণভেদের অভাব দেখিয়া বোধ হয় যে তথা উদ্ভিদরাজ্যে সেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না যেমন অত্রত্য উত্তর প্রদেশে ঘটে। যাহা হউক কতিপয় পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে।

মঙ্গলের কোন কোন খণ্ডের সীমা ও আকারগত পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে দেখা যায়। দ্বিতীয় হর্সেলের নামানুসারে যে জলসঙ্কট অভিহিত হইয়া থাকে, সেটির ১৮৩০ অব্দের নক্সা একরূপ, ১৮৬২র নক্সা আর একরূপ এবং ১৮৭৭এ উহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছিল। টর্বি নামক একটি গোলাকার সমূদ্রে কালে কালে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ১৮৬৪ অব্দে মঙ্গল সাগরে তুষারধবলিত দ্বীপপ্রায় একটি উজ্জ্বল বিন্দু দেখা গিয়াছিল, তাহা আর এখন কেহ দেখিতে পান না!

এই সকল পরিবর্ত্তন বাস্তব কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দূরস্থ পদার্থের স্বল্লাংশের আকারাদি দর্শন সম্বন্ধে সকলের চক্ষু সমান নহে, একজনের দুই চক্ষু সমান নহে; যাহা হউক উক্তরূপ পরিবর্ত্তনের বাস্তবত্ব পক্ষে সম্ভাবনা অধিক। পরন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি যে কিরূপ তাহা বলা ভবিষ্যতের কার্য্য। এ বিষয়ে এক্ষণে যাহা কিছু বলা যায় তাহা কেবল অসিদ্ধ অনুমান। পরিবর্ত্তন যদ্রূপ হউক, মঙ্গলমণ্ডলে জলস্থলের ভঙ্গির ও সাপেক্ষিক অবস্থানের স্থায়িত্বে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না।

মাঙ্গলিক গগণের আধিভৌতিক ব্যাপার। ভূতলে এবং মঙ্গলে উভয় লোকে তাপাদির কার্য্যের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়ত্র একা সাবিত্রী শক্তি সমস্ত গতির ও সমস্ত জীবিতের মূলকারণ। সাগর সলিল তাপ কর্ত্তৃক বাষ্পীভূত হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত জলীয়বাষ্প পর্থিব নভোমণ্ডলে মেঘে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়া (ঘণীকরণ ও সেক) সহকারে মঙ্গলের গগণে সেই বাষ্প দৃশ্যমান আকার প্রাপ্ত হয়; এবং সমীরণ কর্ত্তৃক উক্ত মেঘের জল-স্থল-উপরি সঞ্চলন প্রত্যক্ষীভূত হয়। যদিও মঙ্গল-ক্ষেত্রে অদ্যাপি বৃষ্টিপাত নয়নগোচর হয় নাই তথাপি জলদজালের লয় ও পুনরুদয় দেখিয়া আসারপাত অনুমিত হইতে পারে। আবার উত্তরায়ণান্তে মেদিনী-পৃষ্ঠে তুষারাবণ দর্শন করিয়া লোহিতাঙ্গে প্রালেয় পতন কল্পনাসিদ্ধ।

ভৌমের ভূগোল। এই গ্রহমণ্ডলে সাগর ও বর্ষসমূহ দর্শন করিয়া প্রতীতি হয় যে, ভূমণ্ডলের ন্যায় এখানেও ভূস্তরগত আভ্যন্তরিক উপপ্লব জন্য ভূমির উত্তুঙ্গতা এবং গভীরতা ঘটিয়াছে। তথা ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত প্রযুক্ত মণ্ডলের আদিপুট নানারূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃষ্ঠোপরি গিরি উপত্যকা, অধিত্যকা, দ্রোণী, কন্দর, ভৃগু,

নানারূপ পর্য্যবেক্ষণ কর। কোথাও নদী, প্রস্রবণ, প্রণালী যোগে বৃষ্টিবারি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও সুখভেদ্য কেদার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কোথাও ভূমির কাঠিন্যপ্রযুক্ত তদুপরি মন্দ মন্দ ভাবে চলিতেছে, কোথাও বা স্ফটিকাভ নির্ঝরমুখে সকৌতুকে আলোক পান পূর্ব্বক নানা ভঙ্গিভাবে ক্রীড়া করিতেছে, আবার কোথাও বা কল কলধ্বনি পূর্ব্বক সরোধরে পতিত হইতেছে বা স্রোতস্বিনী সহায়ে সাগরসঙ্গম লাভ করিতেছে।

মঙ্গলের উপগ্রহ। পৃথিবীর এক চন্দ্র, মঙ্গলের চারি চন্দ্র। মঙ্গল পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যস্থ আকাশে ভ্রমণ করেন। এ গ্রহ উক্ত গ্রহদ্বয়ের লক্ষণাক্রান্ত। তিনটিই সৌরজগতের অঙ্গীভূত, এবং তিনটিই একা সাবিত্রী-শক্তির আয়ত্তাধীন। যখন পৃথিবীর এক চন্দ্র বৃহস্পতির চারি, তখন মধ্যবর্ত্তী মঙ্গল কেন চন্দ্রবিহীন হইবেন? যদি বল যে মঙ্গল অল্পকায়, পৃথিবী অপেক্ষা অল্প, বৃহস্পতি অপেক্ষা স্বল্প। ভাল মঙ্গল ছোট, ইহার চাঁদ তবে তেমনই ছোট হউক। ছোট গ্রহের বড় চাঁদ সাজে না, আশাও করা যায় না, হইতেও পারে না; মঙ্গলের মূলে চাঁদ থাকিবে না এ বড় অসম্ভব। এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদেরা তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। দুইশতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত অনেকে মঙ্গলের উপগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে ভূয়োভূয়ঃ শ্রমবৈফল্য দেখিয়া স্থির করিলেন যে, মঙ্গলের চন্দ্র নাই; আর শুক্রের উর্দ্ধ আকাশস্থিত প্রত্যেক গ্রহের চন্দ্র আছে এ সিদ্ধান্ত মঙ্গলপক্ষে অপ্রযুজ্য।

কালসহকারে দৃষ্টি-বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হইল, দৃষ্টিযন্ত্র উৎকর্ষতা লাভ করিল, মঙ্গলমণ্ডল নরলোকের ব্যাকৃতির বিষয়ীভূত হইল, এবং পরিশেষে মঙ্গলের অধিকৃত নভোভাগের আলোচনার ফলরূপ দুই অনুপম উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। এখন জানা গেল প্রসূতি একচন্দ্রা, সুত দ্বিচন্দ্রক।

১৮৭৭ অব্দে ওয়াসিংটন বেধালয়ে অধ্যাপক হল্ তদানীন্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রসহায়ে এই চন্দ্রদ্বয় প্রকটিত করেন। এ আবিষ্কার যথাবিধি পর্য্যবেক্ষণের ফল; ইহা ধূমকেতু বা ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহের উপলব্ধির ন্যায় আকস্মিক নহে। ১৮৭৭ অব্দে অগষ্টের প্রারম্ভে যখন ভৌম ভূমির পরম সন্নিকর্ষে উপনীত ছিলেন, তখন এই লব্ধ প্রতিষ্ঠ আমেরিক জ্যোতির্ব্বিদ যৎপরোনাস্তি যত্নসহকারে গ্রহের সন্নিহিত প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় দীর্ঘযামিনী যাপনান্তর হতাশ হইয়া আফলোদয় পর্য্যবেক্ষণে নিরস্ত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময়ে পত্নীর সানুনয় অনুরোধে পুনরুৎসাহিত হইয়া অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১১ তারিখের সুপ্রসন্না রজনীযোগে এক উপগ্রহ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল এবং সপ্তমী নিশা যন্ত্রক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপগ্রহ উপনীত করিলেন।

বাহিরের চন্দ্র	মঙ্গলবিম্বের মধ্য হইতে	১৪৬৫০	মাইল অন্তরে
„ „	„ উপাণ্ড হইতে	১২৫০০	„ „

ভিতরের চন্দ্র মঙ্গল বিম্বের মধ্য হইতে ৫৮৩০ " "
" " " উপান্ত হইতে ৩৭০০ " "
বাহিরের চন্দ্রমণ্ডল পরিতঃ ৩০ ঘ ১৮ মিনিটে পরিভ্রমণ করেন।
ভিতরের চন্দ্র " ৭ ঘ ৩৯ মিনিটে "

উভয়ে পূর্ব্বমুখে এবং মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্তের ক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। উপগ্রহদ্বয়ের পরিমাণ স্থির করা অসাধ্য। আলোক দৃষ্টে অনুমিত হয় ভিতরের উপগ্রহের ৬ হইতে ১২ মাইল এবং বাহিরেরটির ব্যাস ১২ হইতে ২৫ মাইল।

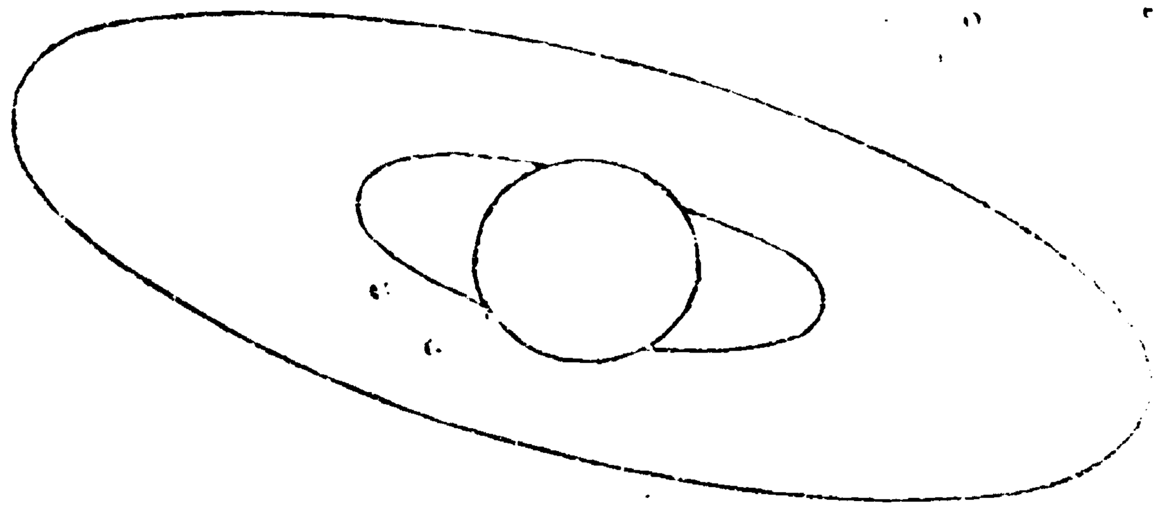

মঙ্গল এবং তদীয় উপগ্রহদ্বয়ের কক্ষা।

মঙ্গলের চন্দ্রদ্বয়ের অনন্য সাধারণ লক্ষণ এই যে অন্তরস্থ চন্দ্রগ্রহের অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট এবং উহার গতি অত্যন্ত দ্রুত। শনির অন্তরস্থ উপগ্রহের ভ্রমণকাল এত যে অল্প, তবু তাহা ২২ ঘ, ২৭ মি। এই দুইটির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আর আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গলের যতক্ষণে এক অক্ষাবর্ত্তন হয়, তদীয় অন্তরস্থ উপগ্রহ সেইকাল মধ্যে তাঁহাকে তিনবার পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতে, সৌরজগতে কেন নিখিল বিশ্বমধ্যে এ একটি অনুপম ব্যাপার। চন্দ্রের এক ভ্রমণকাল মধ্যে পৃথিবীর ২৭ বার আবর্ত্তন হয়। বৃহস্পতি এবং শনিপক্ষে প্রায় এই-রূপই ঘটে। গ্রহগণের কক্ষাবর্ত্তন কালমধ্যে স্বয়ং রবি কতবার আবর্ত্তিত হন।

এই স্থলে একটি কৌতুকের কথা বলা যাইতেছে। গলিবরস্ ট্রাবেল্স্ নামক পুস্তক যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে যে, ভীমমান লাপুটাদ্বীপস্থ জ্যোতিষীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং উত্তম দূরবীক্ষণ সহায়ে মঙ্গলের দুই উপগ্রহ দেখিয়াছিলেন এবং সেই উপগ্রহ ১০ ঘণ্টায় মঙ্গলকে পরিভ্রমণ করে। গ্রন্থকর্ত্তার এই উভয়বিধ সত্যাসন্ন অনুমান কেমন করিয়া হইল!

আর এক কথা। অনেক স্থলে মঙ্গলকে ভৌম বলিয়াছি। ভৌম অর্থাৎ ভূমির পুত্র। এ দেশের জ্যোতিষে মঙ্গলের ভূমিসুত কুজ ইত্যাদি পৃথ্বী ও মঙ্গলের সম্বন্ধসূচক অনেক নাম দেখা যায়। এ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পৃথ্বীকে মঙ্গল অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা বলিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে যে, মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়; তবেই বলিতে হইল যে, মঙ্গলে পৃথিবীতে সুত-প্রসূতী সম্বন্ধ নহে, এ কেবল পৌরাণিকী কথামাত্র।

সংক্ষেপতঃ অত্রত্য ভূপ্রদেশের সহিত মাঙ্গলিক ভূপ্রদেশের সাদৃশ্যের অভাব নাই। কত

সরিৎ সূর্য্যকিরণে সুবর্ণিত হইয়া শর্করিলবয়পথাবলম্বন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে; কত পয়স্বিনী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নির্ঝররূপে দ্রোণীতলে প্রপতিত হইতেছে, কত প্রণালী সাগরসঙ্গতা সরিদ্বরা সকলকে জলকর প্রদান করিতেছে। মহোদধি কখন অবাতবিক্ষুব্ধ হইয়া মুকরবৎ প্রতিভাত হইতেছে, কখন বা প্রভঞ্জন-বিলোড়িত হইয়া উত্তাল তরঙ্গ মালা বিস্তার করিতেছে; অধিকন্তু পৃথ্বীর ন্যায় মঙ্গল সূর্য্যের ও স্বীয় চন্দ্রদ্বয়ের আকর্ষণ জনিত অর্কেন্দ্র জলোচ্ছ্বাসের সমসাময়িকী গতি দ্বারা আন্দোলিত হয়। মঙ্গলের মহাদেশ সকল পৃথিবীর মহাদেশ সকল অপেক্ষা সপাট; সমস্ত ভূমিই যেন বিস্তৃত সমতল প্রান্তর। জলরাশি সমূহ ভূমির বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট! সকল স্থানই ৩, ৪ হাজার মাইল লম্বা ৫০, ৬০ মাইল চওড়া প্রণালীময়, যেন প্রণালীজালে আবরিত। প্রণালী সকলের তটরেখা সরল ও সমান্তর। অনুপম ভূগোল বৃত্তান্ত। ভবিষ্যতে আরও কত কি জানা যাবে।

মঙ্গলে জীবের বাস। এই খানেই ভূমি ভৌমের সাদৃশ্যের পর্য্যবসান হইল না। উভয়ত্র জীবরাজ্যের অপূর্ব্ব সমতা। মাঙ্গলিক ও ভৌমিকদিগের আকারগত সাম্যের আসন্নতা অনুমিত হয়। সেকালের কথা নহে, গত শতাব্দে বিজ্ঞানবিদ্ কাণ্ট অনুমান করিয়াছিলেন যে, মাঙ্গলিকেরা মানসিক শক্তি সম্বন্ধে মনুষ্যের সহিত সমশ্রেণী হইতে পারেন। অবর গ্রহদ্বয়ের অর্থাৎ বুধ শুক্রের অধিবাসীরা জড়ত্বাধিক্যবশতঃ বিবেকবিরহিত, সুতরাং স্বকর্ম্মের শুভাশুভ ফলানুভাবে অসমর্থ। আমাদের ন্যায় তাঁহারা আধিভৌতিক ও অধ্যাত্মিক অবস্থাদ্বয়ের মধ্যগত সুখকর সদ্ ভাবাপন্ন। ষষ্ঠ তারাগ্রহের (পৃথ্বী একটী তারা গ্রহ) মধ্যবর্ত্তী এই ভূমি ও ভৌম; অতএব অনুমিত হয় এতদ্বয়ের অধিবাসীদিগের দৈহিক ও মানসিক ভাব নাতি জড় নাতি সূক্ষ্ম, এবং বৃহস্পতি আদি উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগত লোকসকল যথাক্রমে আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করেন। এক এক তারা, এক এক পবিত্রধাম-পুন্যাত্মাদিগের আবাস। গ্রহবাসী মনুষ্যের জ্ঞান, ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ কোন কথারই মীমাংসা হইতে পারে না। এইমাত্র অনুমান হয় যে যখন আধ্যাত্মিক ভাব ভৌতিক ভাবের সম্বন্ধাধীন, তখন গ্রহের কঠোরতার অনুরূপ অধিবাসীর জড়তা সম্ভব। সুতরাং ভৌমিক অপেক্ষা বৌধিক ও শৌক্রিক অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট। পুনঃ দেখুন কালসহকারে মনুষ্যের উন্নতি লাভ হয়, মঙ্গল আমাদের পৃথ্বী অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ; ইনি পৃথিবীর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন এবং পৃথিবী শীতল হইবার পূর্ব্বে শীতল হইয়াছেন সুতরাং মঙ্গল পৃথ্বী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উন্নত, পৃথিবী হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা এখনও শিশু, রাজনীতি রাইফেল, কামান, টরপেড়ো আমাদের ক্রীড়নক।

অধুনাতন শরীর-তত্ত্ববিদ্ যথাশাস্ত্র উপপন্ন করিয়াছেন যে, এই গ্রহরূপা ভূতধাত্রীই নরদেহের প্রসবিনী। এ দেহের গুরুত্ব, পরিমাণ, স্নায়ুর সান্দ্রত্ব; কঙ্কালের মান, ভার; পরমায়ু; শ্রমের বিশ্রামের কাল; শ্বাসবায়ুর,—পাচ্যান্নের, পরিমাণ; এ দেহের ইন্দ্রিয় সাধ্য কার্য্য সমূহ; এ যন্ত্রের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই গ্রহকর্ত্তৃক সংবিহিত,—ব্যবস্থাপিত। ফুসফুসের

ধারণশক্তি, বক্ষের গঠন, পাকপ্রণালীর দৈর্ঘ্য, পদদ্বয়ের কার্য্য ও বল, দৃষ্টি, চক্ষের রচনা, সর্ব্বাবয়বের সর্ব্ব কাজের সহিত জীবধাণীর সম্পূর্ণ প্রগাঢ় চির-সম্বন্ধ,—সামঞ্জস্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূমণ্ডলের অপেক্ষা মঙ্গলমণ্ডলের উপকরণীভূত সমগ্রীসমূহের সান্দ্রত্ব কম—যেমন ১০০এ ৭১। আর তদুপরে দ্রব্যের ভার অত্যল্প। পৃথিবীর আকর্ষণ যদি ১০০ হয়, তবে মঙ্গলের আকর্ষণ ৩৭ মাত্র। সৌর-জগতের অন্তর্গত কোন গ্রহের আকর্ষণ শক্তি এত কম নহে। এখানকার ১ মোন সেখানে গেলে ১৫ সের হইবে। যিনি এখানে ওজনে ২ মোন তিনি সেখানে গেলে ৩০ সের হইবেন সুতরাং এখানে তাঁহার ২০ মাইল বেড়াইতে যে শ্রম হয়, সেখানে তাঁহার ৫০ মাইল বেড়াইতে সেই শ্রম হইবে।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, অত্রত্য এবং তত্রত্য মানুষে অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু এই পৃথ্বীতলেই কোন সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার জীব সর্ব্বতোভাবে স্বজাতীয় ভাবাপন্ন। কোন কোন দেশীয় তরু গুল্ম জীবজন্তু অস্মদ্দেশীয় জীবজন্তু হইতে পৃথকবিধ। একা অষ্ট্রেলিয়া কর্ত্তৃক আমাদিগের উদ্ভিদ বা জন্তু সম্বন্ধীয় প্রাক্সংস্কার রূপান্তরিত হইয়াছে।

মঙ্গল এবং মাঙ্গলিক ভূমি এবং ভৌমিক অপেক্ষা উন্নত সুতরাং পরিণত ভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। যদি স্বীকার কর যে, আদৌ ব্যোমকোষে বিকীর্ণ পরমাণু সমূহ উপর্য্যুপরি সংশ্লিষ্ট ও ঘনীভূত হইয়া দিব্য বিগ্রহরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তবে তাপবিষয়ক যন্ত্রবাদের মূলতত্ত্ব অনুসারে উপপন্ন করা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলের তাপমান ২ কোটি ৮০ লক্ষ, পৃথিবীর ৯ হাজার এবং মঙ্গলের ২ হাজার। আবার যদি নীহারিকাবাদ স্বীকার করা যায়, তবে সৌরনীহারিকা হইতে পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল বহুকাল পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। মঙ্গলের গর্ভ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ এতদিন শীতল হইয়াছে এবং পৃথিবীর মত ইহার পৃষ্ঠদেশ আভ্যন্তরিক উপদ্রব জন্য ভূমির উত্তুঙ্গতা এবং সাগরকূলের বিষমতা না ঘটিতে পারে। সেখানে যাইতে পারিলে কতই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অক্ষাবর্ত্তন,	Axial Rotution.	নীহারিকা,	Nabula.
অধঃসমাগম,	Inferior Conjunction.	পরিচ্ছিন্ন,	Well defined.
অনুলোম অনুযায়ী,	Direct Ratio.	পার্থিব,	Terrestrial.
অনুহৈলিক,	Perihelion.	প্রবর,	Superior.
অবর,	Inferior.	পুট,	Crust.
অবনতি,	Inclination.	প্রতিফলিত,	Reflected.
অযনান্তবৃত্ত,	Solistitial colure.	প্রত্যুৎপত্তি,	Reproduction.
আধিভৌতিক,	Physical.	প্রালেয়,	Ice.
উৎকেন্দ্রত্ব,	Eccentricity.	ভগন,	Time of revolution.
উপগ্রহ,	Satellite.	ভভ্রম,	Revolution.
ঊর্দ্ধসমাগম;	Superior Conjunction.	রোহিণী,	Aldeberan.
কক্ষা,	Orbit.	বটুজ্যা	Betelgeux.
কুটুম্ব,	Member (of family).	বর্ণপট্টিকা,	Spectrum.
কৌসুম্ভ বর্ণ,	Orange.Colour.	বিম্ব,	Disk.
ক্ষোদিষ্ট গ্রহ,	Minor planets.	বেধ,	Thickness.
চাপাত্মক,	Angular.	ব্যাকৃতি,	Analysis.
জ্যেষ্ঠা,	Antares.	ব্যাম,	Fathom.
টরপেডো,	Torpedo.	শীর্ষোচ্চ,	Snperior conjunction.
তীব্রতর,	More intensely.	সপাট,	Flat.
নিপীত,	Absorbed.	সান্দ্রত্ব,	Density

চকোর।

(১)

সুনীল আকাশ-তলে,
বেষ্টিত তারকাদলে,
সুধাংশুরতন,
রজত-চন্দ্রিকা রাশি
ছড়াইয়া হাসি হাসি
করেন গমন।

(২)

সুনীল আকাশ-কূলে,
বায়ুভরে হেলে দুলে,
একটি চকোর,
পিয়িছে চাঁদের সুধা
নিবারিছে চিরক্ষুধা
হরষে বিভোর !

(৩)

আধার বসন্তানিলে
হেলিয়া দুলিয়া,
উন্মুক্ত বাতায়নে,
পশি মম গৃহাঙ্গনে,
মুহূর্ত্তের তরে থাকি
চলিল ছুটিয়া।

(৪)

শূন্য হ'তে এসেছিল,
শূন্যে পুনঃ লুকাইল,
অনন্তে ডুবিল,
মহান্ অনন্ত-তলে,
(যথা রবিশশী জ্বলে)
ছুটিয়া চলিল।

(৫)

ঠিক ও বিহঙ্গ সম
মানব-আত্মন্,
সম্মুখে অনন্ত তার,
পশ্চাতে অনন্ত তার,
মুহূর্ত্তের তরে এই,
জাগ্রত স্বপন !

(৬)

এই ক্ষুদ্র দেহগৃহে,
মুহূর্ত্তের তরে থাকি,
যায় সে চলিয়া,
উধাও উধাও ধায়,
(রবিশশী লুটে পায়)
শূন্যে মিলাইয়া।

(৭)

হায় ও চকোর সম,
প্রিয় আত্মা ধন মম,
কবে বা ছুটিবে।
এ মোহ-শৃঙ্খল কাটি,
আমার সোণার পাখী
কবে বা উড়িবে !

(৮)

পিয়িবে তাঁহার সুধা,
শতকোটি চাঁদ যার
চরণে লুটায়,
গায়িবে তাঁহার নাম,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যাঁর
কটাক্ষে লুকায় !

ছেলে মানুষ করা।

বাঙ্গলা ভাষায় অনেক সদ্‌গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে বটে, কিন্তু কি প্রণালীতে সন্তানের নীতি-শিক্ষার সূত্রপাত করিতে হইবে সে সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচনায় এ পর্য্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ের আলোচনা একান্ত প্রার্থনীয়। "মান্দ্রাজ ক্রিশ্চান্ ভর্ণাক্যুলার এডুকেশন্ সোসাইটি" নানা ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়া এ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক* প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবটি তাহাই অবলম্বন করিয়া রচিত হইল। আশাকরি ইহা আমাদের জননী-পাঠিকাবর্গের কিছু উপকারে লাগিবে।

বাৎসল্য স্নেহের মত এমন প্রবল মনোবৃত্তি আর কিছুই নাই। সর্ব্বজয়ী দাম্পত্যপ্রণয় কেবল ইহারই নিকট পরাস্ত। অতি পুরাকাল হইতে জগতের সাহিত্যে এই বাৎসল্যরসের যেরূপ প্রচুরতা দৃষ্ট হয়, সেরূপ অন্য কিছুরই নহে। কেহ কেহ বলেন, সাহিত্যে প্রেমের অধিকার ইহার অপেক্ষা প্রবলতর। কিন্তু আমরা যে ভাবকে প্রেম বলি, তাহাত সম্পূর্ণ একালের জিনিষ! প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমচিত্র নির্দ্দেশ করিবার জন্য সচরাচর সকলে রামসীতা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা হইয়াছেন, তখন রামচন্দ্রের বিরহবর্ণনা আরম্ভ করিয়া বাল্মীকি তাঁহাকে "কামশোকাভিপীড়িতঃ" এই বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। কপোত কপোতীর, ময়ূর ময়ূরীর কামোল্লাসনৃত্য দেখিয়া রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শরৎকালে জ্যোৎস্নারজনীতে যখন সুগ্রীব তাঁহাকে "গুড্‌নাইট্" ইচ্ছা করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া পত্নীহারা রামচন্দ্র বিরহে আর বাঁচেন না। সেকালে মানুষের হৃদয়ে প্রেম যে ছিল না একথা বলি না; তবে বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন প্রেমের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু বাৎসল্যস্নেহের মাহাত্ম্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমানভাবে কীর্ত্তিত। কবি যে বলিয়াছেন ঃ—

আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল,
এমন সকল বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আর ?

একথা বাৎসল্যস্নেহের প্রতি যেমন প্রযুজ্য, তেমন আর অন্য কোনও মনোবৃত্তির প্রতি নহে। সন্তানকে যে স্নেহ করিতে হইবে বা কতখানি করিতে হইবে তাহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না ;—কিন্তু তাই বলিয়া এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, সন্তানের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক, পিতামাতা তাহার ঠিকই অনুষ্ঠান করিবেন। যত প্রকার শিল্পকর্ম্ম আছে, সকলের অপেক্ষা এই শিল্পটিই কঠিন—সন্তানের চরিত্রগঠন করিয়া দেওয়া।

প্রকৃতি মানুষে অনুকরণপ্রিয়তার চূড়ান্ত নমুনা দেখাইয়াছেন! শিশুর জ্ঞানচক্ষু একটু একটু করিয়া ফুটিতে থাকে, সে তাহার পিতামাতা প্রভৃতির কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন শিক্ষালাভ করে। সুতরাং জনকজননীর বলিলে চলিবে না

* 'The Training of Children for Indian Parents.

—"ও পথে যাও" ;—"এই পথে এস" বলিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। "এই পথে এস" এটা কবে হইতে বলিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া অনেকে পাঁচ ছয় বৎসর অলস ভাবে কাটাইয়া দেন ; ইতিমধ্যে শিশুর মনে কত প্রকার কুশিক্ষার বীজ পড়িয়া, সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। যখন হইতে শিশু মাতার আদর, স্নেহদৃষ্টি পাইলে হাস্য করিয়া থাকে, তখন হইতেই তাহার শিক্ষার আরম্ভ। এই সময়ে তাহাকে প্রফুল্লতা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে বাড়ীতে সর্ব্বদা হাসি খুসী, সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ, সে বাড়ীর শিশুরাও খুব হাসে। যে বাড়ীতে কলহ কচ্‌কচি, মনান্তর, ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা,—সে বাড়ীর শিশুরা ঠাকুরদাদার মত গম্ভীর হইয়া থাকে। গাছপালা বসন্তের বাতাসে বিকসিত হইয়া উঠে—সেইরূপ সকল পরিবারে আনন্দের বায়ুহিল্লোল সর্ব্বদা সঞ্চালিত রাখা উচিত। এইরূপ "জলহাওয়া"তে যে শিশু পরিবর্দ্ধিত হইবে, ভবিষ্যতে বিপদের সময়, দুঃখকষ্টের দিনে সংসারটাকে নিতান্ত মরুভূমি বলিয়া তাহার মনে হইবে না—ইহা অল্প সৌভাগ্য নহে। শিশু চলিতে শিখিলে, খেলিতে শিখিলে, একটি অতি সহজ উপায়ে তাহাকে নিষিদ্ধ স্থানে গমন, নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি হইতে বিরত করা হয়—সেটি কোন মিথ্যা ভয় দেখাইয়া। কিন্তু শিশুরা প্রায়ই সেটা জানে না কোন মতে ধরিয়া ফেলে। যে দিন প্রথম এইরূপ হয়, সেইদিন তাহার মনে মিথ্যার বিষবীজ রোপিত হইয়া যায়। অনেক পিতামাতা স্নেহের পুতলির হস্তে শৈশবে রাজক্ষমতা দিয়া রাখেন। ইহাতে তাহারা ক্রমে অত্যন্ত একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়ায়! ছেলে বলে—"দাও ওটা,"—"পাবিনে"—"না দিতেই হবে"—"না পাবিনে; তোর কথাতেই কথা না কি?"—"দি—তেই—হ—বে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ" করিয়া ছেলে যাই চীৎকার আরম্ভ করে তখন মাতা বলেন—"নে বাবু যা—আর পারিনে।" এইরূপ কয়েকবার হইলেই শিশু শিখিয়া লইল, যখন কোনও জিনিষ সহজে পাইব না তখন এমনি করিয়া গোঁ ধরিব। অভ্যাসক্রমে এত পাকা হইয়া যায় যে, তাহা সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। জিনিষটা না দিলেই তাহার এ শিক্ষাটা হইতে পাইত না, হয় ত, সে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে থাকিত ; তাহাতে পিতামাতার মনে ব্যথা লাগে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতামাতাকে এ সমস্তই সহিতে হইবে।

শিশুকে প্রথমেই কি শিক্ষা দিতে হয় ?—সুবাধ্যতা। যেমন মানব-শরীরে জ্বর হইতে উৎপন্ন না হইতে পারে এমন ব্যাধিই নাই, সেইরূপ শিশুদের অবাধ্যতা হইতে জন্মিতে পারে এমন দোষই নাই। বালকের যত কিছু ভাল গুণ থাকা সম্ভব, সকলের মূল সুবাধ্যতা। অনেক পিতামাতাকে এই নালিশ করিতে শুনিতে পাই—"ছেলেটা ভারি অবাধ্য, কিছুতেই বাগ মানাতে পারি নে।" কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে একমাত্র তাঁহারাই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দোষী। শিশুকে যাহা শিখান হইবে সে তাহাই শিখিবে—তাহার আর দোষ কি ? পিতামাতা কেমন করিয়া সন্তানকে অবাধ্য হইতে শিক্ষা দেন, তাহার উদাহরণ এই ঃ—"গোপাল চলে আয় বদ্‌মাইস্ ছেলে, নইলে মার খাবি।" গোপাল সে কথা গ্রাহ্যও করিল না। খেলা

শেষ হইলে যখন বাড়ী আসিল, তখন কিঞ্চিৎ বকুনি খাইল মাত্র ;—মার খাইল না। সে শিখিল মাতার কথা না শুনিলে কিছু ক্ষতি নাই এবং "মার খাবি" প্রভৃতি, ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। আর একটি উদাহরণ এই ঃ—দুইটি মহিলায় কথোপকথন হইতেছে—তিন বৎসরের শিশুটি কাছে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে।

"খোকা কেমন আছে গা ?"

"আছে ভাল ; কিন্তু এমন দুষ্টু, দিদি, দেখনি। ওকে নিয়ে আমি ত আর পারিনে।"

"কেন ভাই ছেলেকে দেখ্‌লে ত দুষ্ট বলে বোধ হয় না ?"

"না, স্বভাব নিতান্ত খারাপ নয় ;—কিন্তু (হাসিতে হাসিতে) যা বল্‌ব করিস্‌নে, তা করেছে বলে কথা ! আমি ওকে বলে দিয়েছি, খবরদার তুই কাঁচের ভাল গেলাস্‌টাতে হাত দিবিনে—পড়্‌লেই ঠুং করে ভেঙ্গে যাবে। এই তুমি আস্‌বার একটু আগে, গেলাসের ভিতর একটু আঙ্গুল দিয়ে, আমার পানে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইল। আমি বল্‌লাম—'তুলে নে হাত'—অমনি আরও একটা আঙ্গুল দিলে। আমি চোখ রাঙাবার চেষ্টা কর্‌লাম, আঙ্গুল তুলে নেওয়া চুলোয় যাক্‌, দুটো হাতই গেলাসের ভিতর দিয়ে তার পর হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে পালিয়ে গেল। আর কিছু নয়—কেবল আমাকে জ্বালাবার জন্য এইটে করলে গো—এমন পাজি দেখনি।" ছেলে সব শুনিল, এবং যাহা শিখিল তাহা শীঘ্র ভুলিবে না। একে ত ছেলেদের প্রকৃতি স্বভাবতঃই একটু অবাধ্য, তাহার উপর তাহাদের অবাধ্যতার দরুণ শাস্তি বিধান না করিয়া, সে বিষয়ে লোকের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে গল্প করিয়া তাহাদের অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই একটু কড়া শাসন করিলে আর এ ব্যাধি জন্মিবার অবসর পায় না। যাহা বালককে একবার করিতে বলিবে তাহা যেন তাহাকে কোন মতেই লঙ্ঘন করিতে না দেওয়া হয়। হইতে পারে তুমি মুখের কথায় তাহাকে একটা কিছু বলিয়াছ, সেটা সে না করিলে কোনই ক্ষতি নাই—কিন্তু "পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি" এই যে একটা ধারণা, ইহা বিলক্ষণ ক্ষতি করিবে। সুতরাং আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—এটা যদি সে করিতে না চায়, তবে তাহাকে করিতে বাধ্য করা উচিত কি না ; তাহার পক্ষে এটা সুসাধ্য কি না। যে কোন কারণেই হউক, বালককে যদি আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে দেওয়া হয়, তবে তাহাকে শিখান হয়—আজ্ঞার কোন একটা মূল্য মর্য্যাদা বা গুরুত্ব নাই। ওটা কিছুই নয়, মুখের কথা মাত্র, শুনিলেও চলে না শুনিলেও চলে। আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া করিয়া ক্রমে ছেলে এমন "ঢাট্" হইয়া পড়ে যে, শেষে আর কিছুতেই তাহাকে বাগাইতে পারা যায় না। এক একটা বিশেষ অবস্থায় ছেলের সহিত পিতামাতার যুদ্ধ চলিতে থাকে, কা'র জিদ বজায় থাকিবে। এই যুদ্ধে যে পক্ষের একবার জয়লাভ হয়, ভবিষ্যতে সব যুদ্ধে সেই পক্ষই জয়ী থাকে। একটা উদাহরণ দিতেছি ঃ—সন্ধ্যাবেলায় পিতা সুরেন্‌কে বলিলেন—"এস, পড়।" সুরেন বেশ অক্ষর চিনিত, কিন্তু এ সময়ে তাহার মেজাজটা ভাল ছিল না। পিতা বর্ণমালার প্রথম অক্ষরে অঙ্গুলি রাখিয়া

বলিলেন—"এটা কি ?" সুরেন কিছুই বলিল না, বিরক্তভাবে বহিপানে চাহিয়া রহিল। পিতা আদর করিয়া বলিলেন "কেন, তুমি ত'চেন ক !" "আমি ক বল্‌তে পারি নে।" পিতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"বল্‌তেই হবে তোকে।" সুরেন বলিল না। সে গোঁ ধরিল, বলিব না। অন্য পিতা হইলে এ অবস্থায় ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু ইনি বুঝিলেন, যদি ছেলের জিদ্‌ বজায় থাকিয়া যায় তবে ভবিষ্যতে তাহাকে বাধ্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া দণ্ডিত করিলেন। আবার তাহাকে পড়িবার ঘরে আনিয়া বলিলেন—"এটা কি বল।" সুরেন, বলিবে না। তখন পিতা তাহাকে দ্বিতীয়বার অধিক করিয়া দণ্ড দিলেন। তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি বল।" সুরেন তথাপি বলিল "আমি জানি না।" "জানিস্‌নে এটা কি ?" "আমি ক বল্‌তে জানিনে।" এবার, পিতা তাহাকে যতটা প্রহার করিতে সাহস করিলেন, ততটা করিলেন। কিন্তু তথাপি বালক জিদ ছাড়িল না। আপনার সন্তানকে স্বহস্তে এমন করিয়া আঘাত করিতে হইতেছে ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। জননী সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছেন, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলিলেন না। তিনি জানিতেন ইহা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্যই হইতেছে। পিতা, পুত্রকে অধিকতর দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার জন্য পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইলেন ; কিন্তু এবার আর তাঁহাকে যাইতে হইল না। সুরেন বলিল—"বাবা, আমি বল্‌ব।" পিতার তখন আর আনন্দের সীমা নাই। সুরেন ক বলিল। পিতা বলিলেন—"এবার যাও, তোমার মাকে বলগে' এটা কি !" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি বাবা ?" সুরেন বলিল—ক। কাছে যে সকল ছেলে পিলে বসিয়াছিল, তাহারা সসম্ভ্রমে দেখিল, কোন্‌ পক্ষের জয়। সুরেন বুঝিল,—কথা শুনাই মঙ্গল।—এক সময়ে একটি পীড়িত বালক ঔষধ পান করিতে আপত্তি করে। অনেক বাবা বাছা, অনেক বলা কহা—কিছুতেই সে শুনিল না। তখন তাহার পিতা পীড়িত অবস্থাতেই তাহাকে দণ্ডিত করিলেন। সে নিজে বুঝিল, পরিবারস্থ অন্যান্য বালকে দেখিল, পীড়িত থাকিলেও নিস্তার নাই, কথা শুনিতেই হইবে। নিতান্ত শিশু কিম্বা পীড়িত, এ সব ওজরে অবাধ্যতা কখনও ক্ষমা না করা হয়—খুব সাবধান। সুবাধ্যতার লক্ষণগুলি এই ঃ—১—একবারের বেশী বলিতে হইবে না। যাহা করিতে বলা হইবে, তাহা অবিলম্বে করা চাই। ২—কেন, কি বৃত্তান্ত, এ সব কৈফিয়তের আবশ্যক হইবে না। একটু বয়স্ক বালকদিগকে কিন্তু এ সব বলা প্রয়োজন ; আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে—পরে নহে। ৩—কিছু দিবার প্রলোভন বা ভয়প্রদর্শন প্রয়োজন হইবে না। নির্ব্বোধ পিতামাতা এটা দিব ওটা দিব বলিয়া ছেলেকে কথা শুনাইয়া থাকেন, কিন্তু এটা ভারি দোষের। ছেলে আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, পিতা বা মাতার আজ্ঞা বলিয়া ;—কিছু পাইবার প্রত্যাশায় নহে। ৪—কথা শুনাটা বেশ ভাল মনে চাই ;—মুখখানা হাঁড়ি করিয়া কথাশুনা সুবাধ্যতার লক্ষণ নহে। ৫—পিতামাতার আদেশ তাঁহাদের অসাক্ষাতেও সমানভাবে রক্ষিত হইবে। "বামুণ গেল ঘর ত লাঙল তুলে ধর" না হয়।

সন্তানের দোষগুণের জন্য যথাযথ দণ্ডপুরস্কারের বিধান অতি কঠিন কার্য্য। ইহাতে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। অমুক দোষ করিলে অমুক সেক্‌সনের মতে এই দণ্ড, এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকার দরুণ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কর্ত্তব্য তত কঠিন নহে; কিন্তু যেখানে কোন আইন বিধিবদ্ধ করা নাই, সেখানে যথার্থ শাসনকার্য্য অধিক দুরূহ, তাহার আর সন্দেহ কি? এস্রাজ বাজান অপেক্ষা বেহালা বাজান শক্ত, কারণ বেহালায় এস্রাজের মত পর্দ্দা বাঁধা থাকে না।

নিন্দা বা প্রশংসা অতি সহজ ও সাধারণ দণ্ড-পুরস্কার। কথায় কথায় নিন্দা বা প্রশংসার প্রয়োগ করিলে বড় হানি হয়। তাহাতে নিন্দার তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হইয়া যায়, প্রশংসার মূল্য কমিয়া যায়। যে প্রত্যহ লূচি কচুরি খাইতে পায়, তাহার পক্ষে এটা আর "লক্‌ড়ি" থাকে না। সেইরূপ প্রতি সামান্য কাযে যে বাহবা পাইয়া থাকে, সে বাহবামাত্র পাইবার জন্য একটা কিছু করিতে সহসা প্রস্তুত হইবে না। পক্ষান্তরে, যে প্রতি ক্ষুদ্র অন্যায় কাযে লাঞ্ছনা সহিয়াছে, লাঞ্ছনা আর তাহার গায়ে লাগে না। আনাড়ির হস্তে অল্পমূল্য-ঘড়ির মত যখন কিছুদিন পরে নিন্দাপ্রশংসার কল বিকল হইয়া যায়, অজ্ঞ পিতামাতা তখন লোভ বা ভয় প্রদর্শন আরম্ভ করেন "নাইবে এস লক্ষী ছেলে—একটা সন্দেশ দিব এখন" নয় ত "নাইবিনে, পাজি হতভাগা—মার খেলি—আয় বল্‌ছি।" মনে কর, একবার সন্দেশ পাইবার লোভে বালক স্নান করিল; আবার যে দিন তাহাকে স্নান করাইবার প্রয়োজন হইবে, সে দিন সে খুব সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসা করিবে—"কি দেবে বল?" অথবা যদি দেখে স্নান না করিয়াও মার খাইতে হইল না, তবে ভবিষ্যতে "মার খাবি" এই ভয়প্রদর্শন করায় আর কোন ফলই হইবে না।

প্রতি কথায় দোষ বাহির করা অতি মন্দ। দিবা রাত্রি "আঃ কি করিস্" "ওতে হাত কেন?" "চুপ্ কর্‌না, কি বালাই!" ইত্যাদি চীৎকার বড় অনিষ্ট করে। ছোট ছেলেদের এক আজ্ঞা দুই চারিবার ফিরিয়া বলিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা এমন ভাবে বলা চাই যে ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ না পায়, অথচ দৃঢ় ভাবে বলা হয়।

দণ্ড পুরস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য, ছেলেকে হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া, এটা ভাল, এটা মন্দ,—সুতরাং ইহার বিধান খুব নিরপেক্ষ ভাবে হওয়া চাই। একজন যে কাজ করিয়া তিরস্কৃত হইলমাত্র, অন্যে ঠিক সেই কাজ করিয়া প্রহার না খায়। অপিচ—কেহ আজ যে কাজ করিয়া শাস্তি পাইল, কাল সেই কাজ করিয়া পার পাইয়া না যায়। এটা অতি সচরাচর ঘটিয়া থাকে। যখন পিতামাতার মন বেশ প্রফুল্ল থাকে, তখন গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়, বা কোন দণ্ডই হয় না; কিন্তু মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া থাকিলেই সর্ব্বনাশ! তখন লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়া থাকে। ইহাতে ছেলেরা বড় মুস্কিলে পড়ে। কোন্ কাজটা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় স্থির করিতে পারে না। শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—আমরা যে দণ্ডিত হই তাহা দোষ করি বলিয়া নহে—মা বাপের মন ভাল থাকে না বলিয়া। ইহাতে [illegible] বলাই বাহুল্য।

বালক পুরস্কারের যথার্থ উপযুক্ত হইলে, টাকা পয়সা বা সন্দেশ মণ্ডা পুরস্কার দেওয়ার রীতি ভাল নহে। সন্দেশ পুরস্কারের লোভ দেখাইলে ছেলেরা ঔদরিক হইয়া পড়ে। আর সন্দেশ দিব সন্দেশ দিব বলিলে, ছেলেরা মনে করে সন্দেশই বুঝি পৃথিবীর সার পদার্থ। কোনরূপ খাবার জিনিষ পুরস্কার স্বরূপ না দিলেই ভাল হয়। সন্দেশ প্রভৃতিকে পুরস্কারের "লিষ্টে" রাখিলে তাহাদের মর্য্যাদা অযথা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ছোট বালকবালিকাদের জন্য খেলনা—যাহা শীঘ্র না ভাঙ্গে এবং ব্যবহার করিতে কিছু কারিগরির আবশ্যক, এক বাক্স কাঠের রঙ্গীন ইঁট; একটু বয়স হইলে আতসী কাচ, খেলার দূরবীণ, ষ্টিরিয়োস্কপিক্ ছবির বাক্স, লালনীল পেন্‌সিল, ভাল দোয়াত, নূতন রূল, রঙের বাক্স ইত্যাদি উপযুক্ত পুরস্কার। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখিবার স্থানে লইয়া যাওয়া, তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ করিতে ছুটি দেওয়া, অবস্থানুসারে রেলপথে কিছু দূর বেড়াইয়া আনা, উত্তম পুরস্কার। কিন্তু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কার্য্য করাইতে নাই; কার্য্য করিবার পরে মধ্যে মধ্যে পুরস্কৃত করা ভাল। বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক যাহাতে বালক দণ্ডপুরস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যায়।

দণ্ডবিধান সম্বন্ধে এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ১—দণ্ডভয়ের সুফল তাহার নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে। বালকের যেন ইহা স্থির জানা থাকে, যদি দণ্ড পাইবার মত কাজ করি, তবে আমাকে দণ্ড পাইতেই হইবে;—সুতরাং দণ্ডার্হ্য কার্য্য যেন কখনও কোনও অবস্থায় মার্জ্জনা না করা হয়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। দুইটি ভিন্ন সৈন্যদল একপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল। এক দলের নেতা একজন প্রিন্স্, অপর দলের নেতা এক ড্যুক্। প্রিন্সের কোনও সেনার চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ড্যুক্ আসিয়া প্রিন্স্‌কে অনুরোধ করিলেন, যাইতে দি'ন। প্রিন্স্ বলিলেন—"এরূপ অবস্থায় আমি কখনও কাহাকেও ক্ষমা করি নাই।" ড্যুক্ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ, এরূপ করিলে ত আমার অর্দ্ধেক লোকের এতদিন ফাঁসি হইয়া যাইত।" প্রিন্স্ বলিলেন—"এই জন্যই ত তোমার দলে এত বিভ্রাট। আমি কখনও কাহকেও ক্ষমা করি না সেই ভয়ে আমার দলে অতি অল্প লোকই অপরাধ করিয়া থাকে।" ২—দণ্ড যত অল্পে সারিলে চলে, তাহার অধিক ব্যবহার না করা হয়। চোখরাঙানি যদি যথেষ্ট হয়, তবে স্বরপ্রয়োগ করিবে না। সামান্য ধমক দিলে কাজ হাসিল হয় এমন বুঝিলে ঝাঁঝিয়া উঠিবে না। কথায় যদি না হয়, তবেই চাবুক ধরিতে হইবে। অনেকে এপর্য্যন্ত উঠিয়া চাবুক লইবার সময় রণে ভঙ্গ দিয়া থাকেন। কিন্তু সাবধান, তাহা করিলেই সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। পুরস্কার বন্ধ করা মন্দ দণ্ড নহে। ৩—দোষের পরিমাণ বুঝিয়া দণ্ডের মাত্রা স্থির করা উচিত। বালক যদি বল ছুড়িয়া ভাই কি বোন্‌কে মারিয়া থাকে, বল্‌টা কাড়িয়া লইলেই যথেষ্ট। অসাবধানতার [illegible] যদি নিজের কিছু ভাঙ্গিয়া বা হারাইয়া ফেলিয়া থাকে; নূতন একটা শীঘ্র আর না দিলেই [illegible] যদি কেহ অপরের একটি খেলানা লোকসান করিয়া দেয়, তবে তাহার নিজেরটি

দিয়া সে ক্ষতিপূরণ করিতে তাহাকে বাধ্য করিবে। ৪—যদি বালক ইচ্ছা করিয়া দোষ না করিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য কোন দণ্ড দিতে নাই। যাহা দৈবাৎ ঘটে, তাহার জন্য ছেলেকে দণ্ডিত করিলে শুধু যে তাহার প্রতি অবিচার করা হয় এমন নহে, সে যখন প্রকৃত দোষ করিয়া দণ্ডিত হয়, সে দণ্ডের তেমন গুরুত্ব থাকে না। সাধারণতঃ কুফলের পরিমাণে দোষের সুতরাং দণ্ডের মাত্রা স্থির করা হয়, কিন্তু এটা নিতান্ত অন্যায়। কয় বৎসর হইল এক ব্যক্তি রেলগাড়ীতে আসিতে আসিতে তামাক খাইবার জন্য টিকা ধরাইয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় দেশলাইটি গাড়ীর মেঝেতে ফেলিয়া দিয়াছিল। অন্য লোকের দুই তিন বস্তা বাজি বারুদ সেইখানে রাখা ছিল তাহা সে জানিত না। গাড়ী যখন মধ্যপথে মহাবেগে ছুটিতেছে, তখন সেই তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র কক্ষে ভয়ানক তুবড়ী, হাযুই, বমা ছুটতে লাগিল! অচিরে গাড়ীতে আগুন ধরিল, এবং গাড়ীশুদ্ধ লোকের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় সে গাড়ীতে অধিক লোক ছিল না; যাহারা ছিল, তাহারা দাঁড়াইয়া পুড়িতে লাগিল। জামালপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তাহাদের বাহির করা হইল;—সে কি ভয়ানক দৃশ্য! তাহাদের দেহের চর্ম্ম শাদাবর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ মরিয়াছে; যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের আর্ত্তনাদে ষ্টেশন্ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তাহারা রেলওয়ে-হাঁসপাতালে নীত হইল; যাহার জন্য এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছিল সে, এবং আর দুই তিন জন ভিন্ন কাহাকেও বাঁচান গেল না।—অপর পক্ষে এক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল; গুলিটা দৈবাৎ মানুষকে না লাগিয়া একটা গাভীকে ধরাঁশায়ী করিল! এখন, ফলের পরিমাণে অপরাধের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, প্রথম ব্যক্তিকে সবান্ধবে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইতে হয়; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, দশ বিশ টাকা গাভীর মূল্য স্বরূপ আদায় করিয়া অধিকারীকে দিলেই চলে। ৫—ছেলেকে সর্ব্বদা পাজি, হতভাগা, গাধা বলিয়া ভর্ৎসনা করা উচিত নহে। তাহার দোষগুলি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে নাই। এরূপ করিলে ক্রমে লজ্জার প্রাণবিয়োগ ঘটে, ছেলে "দুকাণকাটা" হইয়া দাঁড়ায়। কথিত আছে "এক কাণ কাটা" লজ্জায় গ্রামের বাহির দিয়া বাহির দিয়া পথ চলিত; কিন্তু "দুকাণকাটা" অসঙ্কোচে গ্রামের ভিতর দিয়াই যাইত। ৬—ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ছেলেকে শাস্তি দিবে না। ইহাতে মাত্রা ঠিক রাখিতে পারা যায় না, পরন্তু দেখায় যেন শাস্তিবিধানটা প্রতিশোধ লইবার জন্য—সংশোধনের জন্য নহে। শাস্তি দিবার সময় যদি তুমি অত্যন্ত দুঃখিত এরূপ ভাব দেখাও, তবে সেটা বালকের মনে বড় আঘাত করিবে। একবার এক পিতা তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন দেখিয়া মনোকষ্টে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ইহাতে ছেলেটির এতদূর মনে লাগিয়াছিল যে সে বলিল—"বাবা, আমাকে শাস্তি দাও, কাঁদিয়ো না।"

কেহ কেহ মনে করেন, বেত্রই অশিষ্ট বালকের একমাত্র ঔষধ। কিন্তু তাহা ঠিক নহে;—একমাত্র নহে—চরম বটে। বেত্র ব্যবহার যত কম করা হয় ততই ভাল। প্রথম

হইতে সাবধান হইলে ইহার প্রয়োজন আদৌ হইবে না। কিন্তু যদি বিগড়াইয়া থাকে, তবে লক্ষণ বুঝিয়া সময়মত এ মহৌষধ প্রয়োগ করিতে কোনমতেই কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। বালক একটু বয়স্ক হইলে, বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলা, মৃদু ভর্ৎসনা ইত্যাদিতে অধিক ফল হয়।

বালক যদি দোষস্বীকার করিয়া যথার্থই দুঃখিত হয়, তবে আর কোন শাস্তিবিধানেরই আবশ্যকতা থাকে না। বিশেষ চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বালকের মনে অন্যায় কর্ম্মের জন্য খাঁটি অনুতাপ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ ইহা না হইল, ততক্ষণ প্রায় কিছুই হইল না। ভবিষ্যতে সেই কর্ম্ম নিবারিত হওয়ার পক্ষে শতগুণ শাস্তিভয় অপেক্ষা ইহা সমধিক ফলপ্রদ। যখনি দেখিবে কুকর্ম্মের জন্য বালক আন্তরিক দুঃখিত ও অনুতপ্ত, তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সদয় সাদর ব্যবহার স্থাপন করিবে। ক্ষমা—ইহা সময়মত প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

বড় সহজে বালকেরা মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়া থাকে। আমাদের দেশে এখনও অনেকে মনে করেন, যে মিথ্যায় পরের কোনও অনিষ্ট না হয়, তাহা বলিতে কোনও দোষ নাই। যে লোক নিজের ক্ষতি করিয়াও সত্যকথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করে এমন লোক বিরল নহে! গ্রন্থকার বলিতেছেন—Lying is one of the crying sins of India.—বড় দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার বিষয়, একথাটা নিতান্তই সত্য। চিরদিন কিন্তু হিন্দুর এ দুর্নাম ছিল না। এক সময়ে হিন্দুজাতি সত্যবাদিতার জন্য জগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বহুবর্ষব্যাপী অধীনতা অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জ্জর হইয়া আমরা সে মহামূল্য রত্ন হারাইয়াছি। ইংরাজ রাজের কল্যাণে আমরা এখন বড় সুখে আছি। বহু কাল আমাদের অদৃষ্টে এমন ঘটে নাই। এখন আবার সেই মহামূল্য রত্নটি ফিরিয়া পাইতে আমাদের প্রাণপণ যত্ন হউক। আমরা বঙ্গের লক্ষ লক্ষ জননীকে গলবস্ত্রে, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিতেছি।

এ দেশের অধিকাংশ হতভাগ্য শিশু শৈশবে পিতামাতার কাছেই মিথ্যা কথা শিক্ষা করে। মা জল আনিতে যাইবেন, ছেলে শুনিলে সঙ্গে যাইতে চাহিবে; মা বলিয়া যান,—"এই অমুকের বাড়ী যাচ্চি, তুমি খেলা কর বসে।" ছেলে দণ্ড দুই পরে জানিতে পারে, মা মিথ্যা কহিয়াছেন। পিতা নিমন্ত্রণে যাইবেন, সঙ্গে ছেলে যাইতে চায়। ফিরিতে রাত্রি হইবে, হিম লাগিবে, ছেলেকে লইয়া যাওয়া কোন মতেই উচিত নহে। তাহাকে বলা হয়,—"তুমি ঘুমোও শুয়ে, আমি যাব না।" পরদিন প্রভাতে ছেলে জানিতে পারে বাবা মিথ্যা কহিয়াছেন। ছেলেকে ঔষধ পান করাইতে হইবে, সে খাইতে চাহে না। তাহাকে বলা হয়—"তেতো নয়, খাসা মিষ্টি, তুমি খেয়ে দেখ।" পরমুহূর্ত্তেই ছেলে জানিতে পারে, পিতা মিথ্যা কহিয়াছেন। যে হতভাগ্য শৈশব হইতে দেখিতেছে পিতা মিথ্যা কহেন, মাতা মিথ্যা কহেন, পরিজন, প্রতিবেশী, দাস দাসী সকলে অবাধে অসঙ্কোচে প্রতিদিন সহস্র সহস্র মিথ্যা

কথা কহে, সে পূর্ব্বজন্মে স্বয়ং ওয়াসিংটন বা বিদ্যাসাগর হইলেও মিথ্যা কথা শিখিবে। আমরা কোন কোনও গৃহিণীকে এই বিষয়ে সাবধান করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া এই প্রকার উত্তর পাইয়াছি ঃ—"অত করিতে গেলে কি ছেলে ভুলান যায় বাছা? সবাইকার মা বাপ ত এমনি করেই চিরকাল ছেলে মানুষ করে এসেছে, তারা কি সবাই বড় বড় মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে?"—এ কথা সত্য বটে, আমাদের মধ্যে অনেকে যাঁহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা বলেন না, তাঁহারা শৈশবে এইরূপ করিয়াই "মানুষ" হইয়াছিলেন। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে মিথ্যার প্রতি যতদূর ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকা প্রয়োজন, ততটা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে সত্যবাদী করিতে সুশিক্ষার যতটা প্রয়াস আবশ্যক হইয়াছে, অন্যথা ততটা হইত না। মিথ্যা বলা অন্যায়, এ জ্ঞান অতিবড় মিথ্যাবাদীরও আছে। কিন্তু শুধু জ্ঞান থাকিলেই হইবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা থাকা চাই। অনেক লোক বলেন, অমুক-মাংসটা খাইলে কোনই হানি নাই, তাহা এখন জ্ঞানে বুঝিতে পারি, কিন্তু খাইবার কথা মনে করিতেও বমনোদ্রেক হয়! ইহার কারণ কি? শৈশব হইতে পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধুর মুখে, প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে এত বক্তৃতা শুনিয়াছেন এবং পাঠ করিয়াছেন, যে সেই যে একটা সংস্কার, তাহা কিছুতেই উন্মূলিত হয় না। হিন্দু সন্তানের হাম্বারবকারী চতুষ্পদ বিশেষের মাংস খাইবার বিরুদ্ধে যে একটা অতি অতি প্রবল সংস্কার আছে, মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে সেইরূপ একটা প্রবল সংস্কার মনে জন্মিতে পার; তবেই আর কোন ভাবনা থাকে না। জগতে এমন পণ্ডিতের অভাব নাই যাঁহাদের মতে মিথ্যা বলা অন্যায় নহে যদি তদ্দারায় কাহারও অপকার না হইয়া নিজের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। যদি ঘটনাবশতঃ কেহ এইরূপ গুরুর শিষ্য হইয়া পড়েন, তথাপি তিনি শৈশবের সেই সংস্কার-দুর্গের মধ্যে থাকিয়া রক্ষা পাইয়া যাইবেন।

বালকবালিকারা সচরাচর কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পিতামাতাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকে। তাঁহারা অনেক সময়ে আলস্য বা অনবসরবশতঃ সুদীর্ঘ যথার্থ উত্তরের পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত মিথ্যা উত্তর দিয়া ছেলেকে থামাইয়া থাকেন। যাহা বলিলে সে বুঝিবে না, তাহার পরিবর্ত্তেও এইরূপ মিথ্যা উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে যথা—"বাবা, এঞ্জিন্ কি করে অত দৌড়ায়?" "ওর ভিতর একটা মোষ পোরা আছে।" তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণে ইহা বলা ভাল—"এখন না অন্য সময় বলিব" বা এখন বুঝিবে না; বড় হইলে, লেখাপড়া শিখিলে বুঝিতে পারিবে।"

সময়ে সময়ে দাস দাসীরা বালকবালিকাদিগকে মিথ্যা কথা শিখাইয়া দেয়। একটি বালক কাচের ফুলদানী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, চাকর শিখাইয়া দিল—"বলিয়ো বেরালে ফেলিয়া দিয়াছে।" দাসদাসীগণকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের বলিয়া রাখা ভাল, এরূপ ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

বালককে কখনও এরূপ অবস্থায় ফেলিয়ো না, যাহাতে তাহার মিথ্যা বলিবার প্রলোভন হইতে পারে। কোনও বহুমূল্য দ্রব্য ভাঙ্গিয়া বা পড়িয়া লোকসান হইলে ছেলেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়, "কে করেছেরে?" যদি সে করিয়া থাকে, তবে হয়ত ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিবে। এইরূপ বারকতক "কারে" পড়িয়া মিথ্যা বলিতে বলিতে, মিথ্যা বলিবার পূর্ব্বে যে একটা সঙ্কোচ হয় তাহা, ঘুচিয়া যাইবে। তাহার অপেক্ষা কে করিয়াছে গোপনে সংবাদ লওয়া ভাল। যদি কখনও ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করা ভিন্ন অন্য উপায় না থাকে, তবে তাহাকে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অভয়দান করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। সত্য বলিলে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ দোষ ক্ষমা করা অতি উত্তম। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, তবে ত ছেলের অসাবধানতার সংশোধন হয় না! আমরা বলি, মিথ্যা কথায় নিজের সন্তানের কোমল মুখ কলুষিত হওয়া অপেক্ষা ভঙ্গপ্রবণ দুই চারিটা জিনিষ প্রত্যহ নষ্ট হওয়া শতগুণে ভাল।

বালককে কখনও চট্ করিয়া মিথ্যাবাদী অপবাদ দিও না। কারণ, বালক যদি প্রকৃত সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে তাহার উৎসাহভঙ্গ হইবে। সে ভাবিবে, যদি সত্য বলিলেও সেই মিথ্যাবাদী বদ্‌নাম থাকিয়া যায়, তবে মিথ্যা বলার দরুণ সুবিধাটুকু হইতে বৃথা বঞ্চিত হই কেন? তাহা ছাড়া, বাল্যকালে, ছেলেদের যাহা সন্দেহ করা যায়, তাহাই হইবার দিকে তাহাদের কেমন একটা ঝোঁক হয়। সুতরাং বিশেষ অবগত না হইয়া ছেলেকে মিথ্যাবাদী বলিবে না।

মুখে মিথ্যা না বলিলেও কাজে মিথ্যা বলা যায়, সেটিও সমান দোষের। ছেলে একটু তেঁতুলের আচার খাইতে চায়। মা বলিলেন—"নাওগে হাঁড়ি থেকে, একটুখানি নিয়ো, বেশী খেলে অসুখ করবে।" ছেলে অনেকটা লইয়া, অধিকাংশ বামহস্তে লুকাইয়া রাখিল, সামান্য একটু খাইতে খাইতে মার সম্মুখ দিয়া বাহিরে গেল। ইহাও মিথ্যা কথা;—ইহা বলার সমান ঃ—"বেশী নিইনি গো, একটুখানি নিয়েছি।" আর এক প্রকার মিথ্যা আছে, কথাটা আসলে সত্য কিন্তু অন্যলোকে তাহা হইতেই ভিন্ন প্রকার বুঝিয়া লয়। ছেলে পড়া বলিতে না পারায় স্কুলে অতিরিক্ত একঘণ্টা কয়েদ ছিল। বাড়ী আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে এত দেরী?" ছেলে বলিল—"দেখ মা, আমরা যখন খেলি, তখন আর কিছু মনে থাকে না।" একথাটা খুব সত্য বটে, কিন্তু মা বুঝিলেন, ছেলেরও তাই বুঝাইবার উদ্দেশ্য,—খেলিবার জন্যই আজ বিলম্ব হইয়াছে। এ সমস্ত ধরা পড়িলে, মিথ্যা কথার মতই তাহার প্রতীকার আবশ্যক। মিথ্যা শুধু মুখের কতকগুলা কথা নহে; যাহা যথার্থ নহে অপরকে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা। চাটুবাদ একপ্রকার মিথ্যা—বাড়াইয়া বলাও তাহাই।

বালকবালিকার মনে খুব শৈশব হইতে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া উচিত যে মিথ্যা, চাতুরী, কপটতা—নীচতার একশেষ। তাহারা যেন জানিতে পায়, তাহাদের এরূপ আচরণে পিতামাতা একান্ত ব্যথিত হন। কখনও যেন ছেলেদের সম্মুখে কোনও মিথ্যাবাদীর বুদ্ধিকৌশল বা সাহসের প্রশংসা না করা হয়। এ প্রসঙ্গ যখনি উপস্থিত হইবে, তখনি যেন

এটা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয় যে ইহা নীচতার কাপুরুষতার চূড়ান্ত এবং যার পর নাই অভদ্রোচিত। কেহ কাহাকেও পরিহাস করিয়া মিথ্যাবাদী বলিলে সেটা বিশেষ অপমান স্বরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; কারণ শ্যালক-সম্বন্ধ স্থাপন করা অপেক্ষা, মিথ্যাবাদী বলা লক্ষগুণ বড় গালি।

(বারান্তরে সমাপ্য।)

কার্ত্তিকের লড়াই।

'কার্ত্তিকের লড়াই'—কথাটা শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, সুর-সেনাপতি ষড়াননের দিগ্বিজয়-কাহিনী নূতন করিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়ের মনে আতঙ্ক সঞ্চারের অবসর অন্বেষণ করিতেছি। সেই দেবসেনাপতির আখ্যায়িকা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় হইলেও উক্ত দেবশ্রেষ্ঠের বীরত্বকাহিনী কীর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার পূজা লইয়া ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রামে যে উৎসব কস্ত এ আমরা এখানে তাহারই অবতারণা করিব। কার্ত্তিক পূজার পরদিন গ্রামস্থ সমস্ত সর্ব্বদা ব্যব একত্র করিয়া তাহার যে আড়ম্বর হয়, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তাহাই 'কার্ত্তিকের লড়াই ব শিরোমণি ম। নিজ নিজ কার্ত্তিক লইয়া সাধারণের মধ্যে যে আন্দোলন, কোলাহল, নৃত্য, পর এই ব 'কার্ত্তিকের লড়াই' নামক উৎকট নামটিতে অভিহিত করা হইয়াছে কেন, এ পক্ষ তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম, কিন্তু উক্ত উৎসবের এই নামটাই পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে।

কার্ত্তিক পূজার পাঁচ সাত দিন আগে হইতে গোবিন্দপুরের মালীরা মাটীর কার্ত্তিক গড়াইতে আরম্ভ করে। গ্রামে সত্তর পঁচাত্তরখানি কার্ত্তিক পূজা হয়, ইহার অধিকাংশ ঠাকুরই মালীবাড়ীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক সময় মালীরা বায়না না পাইলেও কতকগুলি ঠাকুর গড়াইতে আরম্ভ করে, শেষে গৃহস্থদিগের নিকট হইতে বায়না পাইলে তাহাই তাহাদিগকে গড়াইয়া দেয় ; সকল ঠাকুরই এক সাধারণ ছাঁচে নির্ম্মিত ; কেবল পরাণ চৌধুরী এবং পীতাম্বর হালদারের বাড়ীতে কিছু ভিন্ন ধরণে ঠাকুর নির্ম্মিত হয়, ইহাদের কার্ত্তিক সাধারণ কার্ত্তিক হইতে স্বতন্ত্র—মালীরা তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া এই ঠাকুর গড়াইয়া যায়।

কার্ত্তিকমাস চিরকালই ত্রিশদিনে শেষ হয়। সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীবাড়ী পূজার ঢাক বাজিয়া উঠে। মালীবাড়ী হইতে সকলের চণ্ডীমণ্ডপেই ঠাকুর আসিয়া পৌছিয়াছে ; চণ্ডীমণ্ডপে বেদীর সম্মুখে ঘটস্থাপনা করিয়া, বেদীতে কতকগুলি ধান ছড়াইয়া তাহার উপর কার্ত্তিকের অধিষ্ঠানের স্থান হইয়াছে। কার্ত্তিক মহাশয় ময়ূরের উপর পরম গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল, কালি দিয়া পাট ছোপাইয়া এই চুল প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কার্ত্তিকের গোঁফ কালি দিয়া আঁকানো, আবার কোন কোন কার্ত্তিকের গোঁফের রেখামাত্র নাই, অত্যন্ত নব্য যুবক ; একহাতে ধনুক, অন্য হস্তে তীর, কাহারো বাড়ী সরের তীরে পাখীর পালক আঁটা এবং ইস্পাতের ফলা লাগান, কেহ বা কঞ্চী দিয়া তীর ধনুক গড়াইয়া কার্ত্তিকের হস্তে দিয়াছে। পায়ে মাটীর নাগরা জুতা, কালো রঙ্গের উপর ঘামতেল মাখানতে ঠিক বার্ণিশের মত চিক্‌চিক্ করিতেছে। কার্ত্তিকের

পরিধানে পট্টবস্ত্র, কেহ শান্তিপুরের লাল কল্কাপেড়ে ধুতি পরাইয়া দিয়াছে, কেহ বা নিতান্ত ছেলেমানুষটি মনে করিয়া ঢাকাই বা নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। করতল হিঙ্গুলে লাল, ঘন হরিতালে সর্ব্বশরীর পীত, শরীরের পীত আভা পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে, কাহারো কোঁচা সম্মুখভাগে গোঁজা, কোন কার্ত্তিকের কোঁচা ময়ুরের পিঠের উপর দিয়া পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোঁচান চাদর কাঁধের উপর ঝুলিতেছে। ময়ূর ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দীর্ঘ ঠোঁটে একটা সাপের গলদেশ এবং দক্ষিণ পদে তাহার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, সর্পের আহত মুখ হইতে ধারাল দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ময়ূরের লেজ প্রসারিত, বহুযত্নে মালীরা তাহার উপর নানারকম রঙ্গ ফলাইয়া রুচি আঁকাইয়া দিয়াছে, কেহ কেহ বা ময়ূরের পশ্চাভাগে গোটাকত সত্যকার ময়ূরপুচ্ছ। যেমন দেবতা, বাহনও তাঁহার উপযুক্ত বটে কিন্তু কলিকালে কার্ত্তিকের ... ব সংস্কারে তাহার হাতে তীরধনু না দিয়া দুই একটা গোলাপফুল দিলেই ভাল ... হত, কারণ রণদেবতার পূজা করা বাঙ্গালীর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, তবে একটা সান্ত্বনার কারণ আছে—কার্ত্তিক বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দেবসেনাপতিরূপে পূজিত হন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া পুত্রবর দান করেন এবং এই উদ্দেশ্যেই অনেকে তাঁহার পূজা করে। যে জাতি পৃথিবীতে বংশরক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাকুল—তাহাদের মধ্যে হইতে বীরত্বের সম্মান সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইলেও তাহারা কায়মনোবাক্যে কার্ত্তিকের পূজা করিবে।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটা ছোট সামিয়ানা টাঙ্গান, ভাল করিয়া টান না হওয়াতে মধ্যভাগটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং একটা বাঁশের ঠেকো দিয়া তাহাকে উচু করিয়া তোলা হইয়াছে। গোটাদুই তিন লণ্ঠন দড়ী দিয়া ঝুলান রহিয়াছে, ভিতরে এক পয়সা দামের ছোট ছোট কেরোসিনের টিমি, ধূমে লণ্ঠনের ভিতর কালো হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকের সম্মুখে লম্বা লম্বা দুটি কাঠের দীপগাছায় মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে পূজার উপকরণ সজ্জিত, পাশে গোটাকত হাঁড়ি, তাহার মধ্যে আতপচাউল, বারকসে ডাল, কাঁচকলা, আলু, লবণ ইত্যাদি সামগ্রীপূর্ণ সিধা। পল্লীরমণীগণ আজ কার্ত্তিকের ব্রত পালনের জন্য উপবাস করিয়া আছে, অপরাহ্নকালে পুরোহিত আসিয়া তাঁহার বহুপুরাতন, তালপত্র-নির্ম্মিত, লম্বা, পৈত্রিক পুঁথিখানি খুলিয়া প্রত্যেক যজমানবাড়ীতে উপবাসনিরতা, সংযতহৃদয়া রমণীগণকে কার্ত্তিকের জন্মকথা শুনাইয়া বেড়াইতেছেন; দক্ষিণা অতি সামান্য, একটি পয়সা, বা দুই একটি সুপারী, কিন্তু তাহাতেই নির্লোভী পল্লীপুরোহিত সন্তুষ্ট, কারণ এই ব্রতকথা শুনান তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে। এই সকল গ্রাম্যপুরোহিতের ইচ্ছা যজমানের খুব উন্নতি হউক—তাহাদের মধ্যে সমারোহপূর্ব্বক ক্রিয়াকর্ম্ম চলুক; যজমানের সুখ ও ঐশ্বর্য্যকালে ইহারা নিজের প্রাপ্য যজমানের কাছে হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লন, কিন্তু যজমানের দুর্দ্দিনে ইহারা পারিশ্রমিকের কোন আশা না রাখিয়া নিরাপত্তিতে এবং পরম সহিষ্ণুভাবে যজমানের ক্রিয়াকর্ম্ম

নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, বরং আবশ্যক হইলে পূজার দুই একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া সাহায্য করেন, এই জন্যই পল্লীঅঞ্চলে একটা কথা চলিত আছে যে ঃ—

"দেয় থোয় করে হিত
তারে বলি পুরোহিত।"

পরিবার বৃহৎ এবং সংসার অসচ্ছল বলিয়া দেওয়া থোয়ার ক্ষমতা না থাকিলেও পুরোহিত প্রমথ শিরোমণি যজমানমণ্ডলীর অত্যন্ত হিতৈষী। লোকটি অনতিদীর্ঘ, মাথায় থাট চুলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র টিকি, অধিকাংশ সময়ই সেখানে একটি ফুল গোঁজা দেখিতে পাওয়া যায়; দাড়ি গোঁফ কামান, ললাটে একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা, গ্রীষ্মকালে তিনি 'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত নামাবলী গায়ে দিয়াই সময় কাটান, কিন্তু একটু শীত পড়িবামাত্র তিনি তাঁহার পৈতৃক লাল বনাতখানি বাহির করেন, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহার করাতে পাছে তেল কি ময়লা লাগিয়া সেখানি বিবর্ণ হইয়া যায়, এই জন্য শিরোমণি মহাশয় তাঁহার মস্তক এবং সর্ব্বশরীর একখানি শাদা উড়ানিতে ঢাকিয়া তাহার উপর ঐই বনাত গায়ে দেন। তাঁহার বামহস্তে সর্ব্বদাই একটা সামুক দেখা যায়, সেই সামুকের মধ্যে তাঁহার স্বরচিত 'নস্য' বোঝাই করা থাকে। ছেলেরা 'হাডুডুড়' কি 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতে খেলিতে যেমন দেখিতে পায় পুরোহিত মহাশয় কোথাও যাইতেছেন, অমনি তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এবং সকলেই একবাক্যে বলে "দাদাঠাকুর আমাকে একটু নস্যি।"—দাদাঠাকুর সামুকটি বাহির করিয়া প্রশান্তহাস্যে সকলের হস্তে একটু একটু 'নস্য' ঢালিয়া দেন, তাহারা মহাকলরবে তাহা টানিতে থাকে—এবং হাঁচিয়া কাশিয়া চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তুলে।

আজ ব্রতকথা শুনাইতে হইবে বলিয়া পুরোহিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া যজমানবাড়ী চলিয়াছেন, পায়ে একজোড়া ঠনঠনের চটি, তাহার সর্ব্বত্র দুই তিন পুরু তালি দেওয়া; আজ তিন বৎসর হইল শিরোমণি ঠাকুরের এক যজমান কলিকাতা হইতে ঐই চটি আনাইয়া দিয়াছিলেন। পথের ধুলা সেই চটিজুতার আপাদ মস্তক এবং পুরোহিত ঠাকুরের জানু পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যজমান বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া একঘটি জলে পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক একখানি কুশাসনের উপর বসিয়া ঠাকুরমহাশয় তাঁহার পুঁথি খুলিয়া সুর করিয়া ব্রতকথা শুনাইতে লাগিলেন, রমণীগণ সর্ব্বশরীর গাত্রবস্ত্রে ঢাকিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছেন, সকলেই নিশ্চলভাবে বসিয়া কথা শুনিতেছেন, কেবল দুই এক জন বর্ষীয়সী রমণী হরিনামের ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া মোটা মালাগাছটি লইয়া ঘুরাইতেছেন, এবং একবার ঘুরান শেষ হইলে ঝোলাটি ধীরে ধীরে, ললাটস্পর্শ করিয়া আবার নূতন করিয়া জপ আরম্ভ করিতেছেন, পুরোহিত অনর্গল পুঁথি পড়িয়া যাইতেছেন।

যজমান বাড়ীতে ব্রতকথা শুনাইতে শুনাইতে রাত্রি হইয়া পড়িল। তখন তিনি পূজা করিবার জন্য ভিন্ন বাড়ীতে চলিলেন। পূজাবাড়ীর এবং প্রতিবাসী গৃহস্থদিগের অনেক বিধবা নূতন হাঁড়ি ও সিধা আনিয়া পূজার কাছে রাখিয়া দিয়াছে, ইহাই 'বরের হাঁড়ি'।

পূজার দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া পরদিন তাঁহাদিগের এই হাঁড়িতে পাক করিয়া খাওয়ার নিয়ম। কার্ত্তিক পূজা করিতে অধিক সময় লাগে না, পুরোহিত তাড়াতাড়ি পূজাশেষ করিয়া মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই সকল যজমানের মনরক্ষা করিলেন।

পরাণ চৌধুরীর বাড়ীতে আজ ধূমধাম কিছু অতিরিক্ত। পরাণ চৌধুরী নিজে জমীদার, বৃদ্ধ হইয়াছেন, গৃহে একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান। কন্যার পুত্রাদি না হওয়াতে কয়েকবৎসর হইতে তিনি বিশেষ সমারোহের সহিত কার্ত্তিকপূজা করিয়া আসিতেছেন। যদিও এ পর্য্যন্ত ইহাতে কোন ফললাভ হয় নাই কিন্তু সেজন্য উক্ত দেবতার উপাসনাকার্য্যে কোন বৎসরই কিছু ত্রুটি দেখা যায় না, কারণ চৌধুরী মহাশয়ের বিশ্বাস দেবতার অমোঘ বর কখন কিরূপে সংসারের মধ্যে সাফল্য এবং প্রসন্নতা বর্ষণ করিয়া যায়, তাহা নিরূপণ করা ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য নহে; সুতরাং নিরাপত্তিতে ষড়ানন পূজা পান, সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দপুরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোক, ইস্কুলের মাষ্টার, ডাকঘরের বৃদ্ধ ডাকমুন্সী এবং তাঁহার কেরাণী, মুন্সেফী ও ফৌজদারী আদালতের হেড্ ক্লার্ক সেরেস্তাদার হইতে মুহুরী, এমন কি পেয়াদাগুলা পর্য্যন্ত কার্ত্তিক পূজায় তাঁহার বাড়ীতে পরিপূর্ণ মাত্রায় লুচি চিনি এবং ক্ষীর সন্দেশের সদ্ব্যবহার করে, কেবল থানার দারোগা গমেজউদ্দীন মিঞা মুসলমান বলিয়া নিমন্ত্রিত হন না, কিন্তু তাঁহার বাসায় প্রতিবৎসর কার্ত্তিক পূজার পরদিন একটা খাসি, পাঁচসের ময়দা, তিন সের ঘৃত এবং আরো বহুতর জিনিষের প্রকাণ্ড সিধা যায়। কোম্পানী বাহাদুরের চাকর হইলেও গমেজউদ্দীন মিঞা 'নিমকহারাম' নহেন, অপরাহ্নে প্রতিমা বাহির হইলে তিনি সদলবলে সজ্জিত হইয়া চৌধুরীবাবুদের কার্ত্তিকের আগে আগে চলিয়া থাকেন, এবং কার্ত্তিকের আড়ং কোন সরু রাস্তায় আসিয়া বিভিন্ন পাড়ার কোন দলের সম্মুখে পড়িলে মহাগর্জ্জনপূর্ব্বক তিনি সেই দলকে তফাৎ করিয়া চৌধুরীদের কার্ত্তিকের জন্য পথ পরিস্কার করেন।

রাত্রি নয় দশটার সময় আমলা বাবুরা এবং গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা চৌধুরী মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইলেন; প্রায় সকলের মাথাতেই কম্ফর্টার জড়ান, গায়ে কালো সার্জ্জের চাদর, পায়ে ষ্টকিং, হাতে ছড়ি; কিন্তু এক টাকার নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া যে তিনটাকা সাড়েতিন টাকা দামের জুতাজোড়াটী খোয়াইয়া যাইবেন এমন ইচ্ছা কাহারো নহে, সুতরাং অনেকেই শত তালিবিশিষ্ট ছিন্ন পাদুকা বা চটি পরিয়া আসিয়াছেন, 'গোড়ালি' একেবারে ক্ষয় হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সম্মুখভাগটা বঙ্কিম আকার ধারণপূর্ব্বক মাথা উচু করিয়া রহিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটা সামিয়ানার নীচে গোটাকত ঝাড় ও লণ্ঠন ঝুলিতেছে, মাটিতে একটা বড় সতরঞ্চী পাতা, চারিপাশে আরো কয়েকখানা মাদুর বিছানো। আজ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে ঢপ হইবে; একটী বয়স্কা স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোরী বালিকা ঢপ গাহিবে; আহারাদি শেষ হইলে গান আরম্ভ হইবার কথা আছে।

কিন্তু আহারাদির কিছু বিলম্ব আছে, তাই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বাহিরের আটচালায় বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। দেওয়ালে কতকগুলি দেওয়ালগিরিতে বাতি জ্বলিতেছে, উপরে চাঁদোয়া ভেদ করিয়া তিনগাছি দড়িতে তিনটি বেল টাঙ্গান, দুইদিকের দুটি সবুজ, মধ্যেরটি লাল, নীচে সতরঞ্চীর উপর ফরাস করা, ফরাসের উপর বৈঠকে দুই তিনটি বাঁধা হুকা, চারিধারে অনেকগুলি তাকিয়া বালিশ। চৌধুরী মহাশয়, তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ফরসীর এক দীর্ঘ নল মুখে লাগাইয়া তামাক টানিতেছেন, কুণ্ডলীকৃত ধূম উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে। কাছে একটি রেকাবীতে এক রেকাবী পান, এক পাশে একটা পানের উপর খানিক চুণ; চৌধুরী মহাশয়কে ঘিরিয়া অনেকে বসিয়া আছে, কেহ পান চিবাইতেছে, কেহ বাঁধা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার চাটুয্যেদের একটা ফৌজদারী মকদ্দমায় জব্দ হইবার গল্প বলিতেছে এবং তাহা চৌধুরী মহাশয়ের কর্ণে সুধা সিঞ্চন করিতেছে। গল্প করিতে করিতে তাম্রকূটপরায়ণ ভদ্রলোকটি বলিল "কল্‌কেটাতে কিছু নেই বোধহচ্ছে"—অমনি চৌধুরীবাবু তাকিয়া হইতে মাথা তুলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন "নীলু, তামাক দিয়ে যা, পাজি বেটারা সব থাকিস কোথা?"

নীলু ওরফে নীলমণি খানসামা তখন প্রাঙ্গণের পাশে যে জায়গায় একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছিল, সেখানে চৌধুরীবাড়ীর এবং অন্যান্য বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে বসিয়া হাস্যামোদে সময় কাটাইতেছিল। আগামী কল্য কে কিরূপ বাহার করিয়া কার্ত্তিকের লড়াই দেখিতে যাইবে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সেই বিষয়েই প্রসঙ্গ চলিতেছিল, এমন সময় কর্ত্তা মহাশয়ের হুঙ্কার নীলুর কর্ণে প্রবেশ করিল, তাড়াতাড়ী উঠিয়া তামাক সাজিয়া কলিকা ভরিয়া আগুন লইয়া গেল, এবং থামের আড়াল হইতে কলিকাতে দুই একটা টান দিয়া হুকার উপর তাহা বসাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে চণ্ডীমণ্ডপে আহারের স্থান হইল, সারি সারি কুশাসন ও মাটির গেলাশ এবং কলাপাতা পড়িয়া গেল। আহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে সকলে একবার কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক দেখিয়া লইলেন। চৌধুরীবাবুদের বাড়ীতে কার্ত্তিক বরাবর রাজবেশে দেখা দেন, গোবিন্দপুরের আর কোন বাড়ীতে রাজ-কার্ত্তিকের পূজা হয় না। রাজ-কার্ত্তিকের মস্তকে সুবর্ণপ্রভ কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এক হস্তে শরাসন অন্য হস্তে তীর, পরিধানে সাটীনের ইজার চাপকান, তাহার উপর চুমকীবসান, পায়ে জরীর জুতা, একটি সুচিত্রিত সিংহাসনের উপর কার্ত্তিক উপবিষ্ট। ময়ূরযুগলের পৃষ্ঠদেশে এই সিংহাসন সংস্থাপিত, ময়ূরদুটি মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলেও তাহার সর্ব্বশরীর ময়ূর-পক্ষদ্বারা সুকৌশলে সমাচ্ছন্ন, গলদেশে জীবিত ময়ূরের ন্যায় ময়ূরকণ্ঠিপালক—পশ্চাতে দীর্ঘপুচ্ছ, কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ তার দিয়া একত্র করিয়া বাঁধা, ময়ূরযুগলের পশ্চাদ্ভাগে তাহা কৌশল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শতচন্দ্র সমন্বিত, পরম শোভাময়, সেই বিস্তারিত পুচ্ছ কার্ত্তিকের পৃষ্ঠদেশে সুন্দর চালির মত শোভা পাইতেছে, যেন ময়ূর দুটি আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পেখম ধরিয়াছে। কার্ত্তিকের ময়ূরা

সন হইতে চারিটি ধাপ নামিয়া গিয়াছে ; এই সোপানশ্রেণীর প্রথমটির উভয়প্রান্তে দুইজন মৃণ্ময়-বরকন্দাজ—স্কন্ধে সঙ্গীনশোভিত বন্দুক, বামকোষে তরবারী, মস্তকে পাখীর পালক-খচিত জরীরটুপী, গালপাট্টা, ললাটে লোহিত ত্রিবলী-রেখা, অধর দংশনপূর্ব্বক কোন অনির্দ্দিষ্ট অনধিকার-প্রবেশাকাঙ্ক্ষীর দিকে ভ্রূকুটিকুটিল তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার উপরের সোপানের দুইদিকে দুইটি অশ্বারোহী সৈনিক, নীল অশ্বে আরূঢ়, অশ্বদ্বয় ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখস্থ পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া বীরগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। সৈনিকদ্বয়ের পরিচ্ছদ ঘোর লোহিতবর্ণ, কটিতলে কোমরবন্ধ ; রেকাবদলে ভর দিয়া বীরদ্বয় জীনের উপর বসিয়া আছে, বামহস্তে ধনুক, তাহার আকর্ণ বিস্তৃত জ্যার মধ্যে তীর সংলগ্ন, যেন প্রভুর ইঙ্গিতমাত্র সেই তীক্ষ্ণশর শত্রুর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহার উপরের থাকে উভয় পার্শ্বে দুইটি রমণীমূর্ত্তি—পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে কালো চুড়ি, টানাটানা ভ্রূ—ভ্রূযুগলের মধ্যে ক্ষুদ্র কালো ফোঁটা, বর্ণ হরিতাভ, কেবল করতল ও ওষ্ঠ হিঙ্গুলের রঙ্গে ডগ্‌ডগ্ করিতেছে, উভয়ের হস্তে দুই গাছি ফুলের মালা, যেন তাহারা তাহাদের রমণীহৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ এবং যত্ন একত্র করিয়া এই মালা দুই গাছি নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং দেব-সেনাপতির দিব্য চরণমূলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্যই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত তাহারা দুই সখীতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছে, তাই তাহাদের লজ্জানম্র চক্ষুদুটি নাসাবিলম্বিত উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নলকের উপর বদ্ধদৃষ্টিতে অবনত হইয়া আছে। সর্ব্বোচ্চ সোপানে দুইটি ক্ষুদ্রকায়া অপ্সরী, দেবশিশুর মত সুন্দর দুইখানি প্রস্ফুটিত ওষ্ঠ, অতি মৃদুস্পর্শে যেমন বীণার তার কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তেমনি বোধহয় ভাবের সামান্য স্পর্শমাত্র এই দিব্যলোক-বাসিনী রমণীদ্বয়ের ওষ্ঠে কোমল হাস্য ফুটিয়া উঠিবে ; সুগোল এবং পরিপূর্ণ গোলাপী গণ্ডস্থল এমন সুন্দর যে, কৃষ্ণনগরের এই পুতুলনির্ম্মাতাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বেগুনী রঙ্গের বস্ত্রের ভিতর দিয়া অঙ্গের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মস্তকে কৃত্রিম পুষ্পলতা-নির্ম্মিত সুদৃশ্য মুকুট, দক্ষিণ হস্তে বেণু এবং বামহস্তে লোহিত পতাকা ; যেন এই বেণুরবে তাহারা দেব-সেনাপতির গুণগ্রাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রবণ-বিবর পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এবং জয়পতাকা উড়াইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এরূপভাবে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকলের আহার শেষ হইলে প্রাঙ্গণতলে ঢপ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধেরা মস্তকে চাদর জড়াইয়া আসরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, যুবকেরা একটু দূরে বসিয়া সেকাল ও একালের ঢপের সমালোচনা আরম্ভ করিল ; ঢপ, কবি, কীর্ত্তন এবং পাঁচালী এগুলির মধ্যে কোন্ রকমের গান শ্রেষ্ঠ তাহাই তাঁহাদের আলোচনার বিষয়। কণ্ঠস্বর ক্রমে পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল, সকলেই আপন আপন মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তর্ক কারতে লাগিল। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া কেহ ঢুলিতেছে, কেহ গান আরম্ভ হইতে বিলম্ব দেখিয়া ঢপওয়ালীর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা সতরঞ্চীর শেষপ্রান্তে

বসিয়া বিষম জটলা বাধাইয়া দিয়াছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, কেহ কাহাকেও কিল মারিতেছে এবং কিলপ্রাপ্ত বালক প্রতিশোধস্বরূপ চিম্‌টি কাটিয়া সরিয়া বসিতেছে।

এমন সময় গান আরম্ভসূচক খোলে দুই একটি মৃদু আঘাত পড়িল, অমনি চারিদিকের গণ্ডগোল একটু মন্দীভূত হইল। যাহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহারা হাঁই তুলিয়া আলস্য ছাড়িয়া নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ গৌর-চন্দ্রিকার পর বৃদ্ধা উঠিয়া গান আরম্ভ করিল, ফরমাইস হইল আজ কার্ত্তিকের জন্মকাহিনী গাহিতে হইবে।

বৃদ্ধেরা তামাক টানিতে টানিতে ভক্তিগদ্গদচিত্তে সেই গান শুনিতে লাগিল, যুবকগণের তর্কস্রোতে বাধা পড়িল, বালকগণের কিলোকিলি থামিয়া গেল। বৃদ্ধা কখন কথায়, কখন দ্রুত ছড়ায়, কখন তাললয়বদ্ধ অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত দীর্ঘ সুরে সেই দেবগাথা গাহিতে লাগিল ; বলদর্পিত, দুরন্ত অসুরগণের অত্যাচারে ত্রিদিব অন্ধকারময়, আনন্দোদ্ভাসিত নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, দেবগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ, অপমানে নতশির ; ইন্দ্রের শচী, কন্দর্পের রতি—সকলেই দানবহস্তে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। রোষে, ক্ষোভে দেবরাজের সহস্র নয়ন হইতে সহস্র ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে ; বৃদ্ধার করুণকণ্ঠ হইতে দেবগণের দুঃখদৈন্যপ্লাবিত কোমল সঙ্গীতধারা নির্গত হইয়া শ্রোতাদিগের কর্ণপথে হৃদয়ের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। সকলে স্থানকাল ভুলিয়া বহুপ্রাচীন যুগের একটি পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িল, শুধু সকলের নয়ন সমক্ষে উন্নত; শুভ্র তুষারমণ্ডিত কৈলাসের পাদপ্রবাহিতা সুরতরঙ্গিনী মন্দাকিনীর উন্মত্ত প্রবাহ, বিজন শরবন, বিশ্ব-বিমোহিনী পার্ব্বতীর মাতৃরূপ এবং তুষারশুভ্র দেবাদিদেব মহাদেবের সমুন্নত দেহ মায়াচিত্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে সকল চিত্র মিলিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দর, পঙ্কজলোচন, গৌর-কান্তি শিশু দেবতার মূর্ত্তি সৃজন করিয়া তুলিল। তখনো সেজের উজ্জ্বল আলো চণ্ডীমণ্ডপবর্ত্তী ময়ূরাসনস্থিত কার্ত্তিকের সুন্দর মুখের উপর পড়িতেছিল, সকলে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে একবার সেই দেবমূর্ত্তির দিকে ফিরিয়া চাহিল ; বৃদ্ধগণ গায়িকাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল, ভক্তগণের বিষাদাশ্রু আনন্দাশ্রুতে ধৌত হইয়া গেল।

ঢপ হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল যে হালদারবাড়ীতে ছায়াবাজী পুতুলনাচ হইতেছে। খবর শুনিয়াই ছেলেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে হালদারবাড়ীর দিকে ছুটিল, অনেক বুড়াও ছায়াবাজীর প্রলোভন ছাড়াইতে পারিল না।

বনের মধ্যে দিয়া হালদারবাড়ী যাইবার রাস্তা ; পথের দুই ধারে আস্তাওড়া এবং কালকাসিন্দের গাছ, লাল ভেরান্দার জঙ্গল, চিতে এবং জামাল কোটার বেড়া দেওয়া গৃহস্থদের বাগান। কোথাও একপাশে একটা বাঁশঝাড়—আর একদিকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল-গাছ। বাঁশ ও তেঁতুলের ঘনপাতার মধ্যে স্তূপীকৃত অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে ; লতায়, পাতায় জোনাকি পোকা মিটমিট করিতেছে, দূর মাঠে শিয়াল ডাকিতেছে, গৃহস্থদের গৃহপ্রান্ত হইতে গ্রাম্যকুকুরগুলা তাহাদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিতেছে। ছেলেরা ত্রস্তপদে গ্রাম্য-

পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল, বটতলা দিয়া যাইতে যাইতে বাতাসে একবার গাছের পাতাগুলি নড়িয়া উঠিল, একটি শুষ্ক বটপত্র শাখাচ্যুত হইয়া একজনের গায়ে উড়িয়া পড়িল—আর ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

হালদার বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল পূজার দালানের সম্মুখে একটা জায়গা চাটাই দিয়া ঘিরিয়া সেখানে পুতুলনাচ আরম্ভ হইয়াছে, অনেক লোক চারিদিকে কাতার দিয়া বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া আছে।

হালদারবাড়ীতে কার্ত্তিকপূজার প্রকরণ কিছু স্বতন্ত্র; এক কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষে এক চালিতে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমা গড়াইয়া তাঁহাদের সকলেরই পূজা হয়। পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে—আহারাদির বিশেষ কোন আয়োজন নাই; ঠাকুরঘরে আলোর কোন রকম আড়ম্বর নাই, একটা উচু দীপগাছার উপর একটা মাটির ডেল্‌কো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, কয়েকখান নৈবেদ্য রেকাব দিয়া ঢাকা রহিয়াছে, ঘরের মধ্যে একটিও লোক নাই, শুধু একটা ক্ষুধার্ত্ত কালো বিড়াল সেখানে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সমস্ত লোক ছায়াবাজীর পুতুলনাচ দেখিতেই ব্যস্ত।

বাজনা বাজিতেছে, ছায়াবাজীর পুতুলেরা অদৃশ্যহস্ত-চালিত হইয়া নাচিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছায়াবাজীর দলের লোক তালে তালে পা ফেলিয়া নূপুর বাজাইতেছে, লোকে ভাবিতেছে বুঝি পুতুলের পায়ের নূপুরের শব্দ! কিন্তু পুতুলের বক্তৃতা স্বরূপ পটান্তরালবর্ত্তী লোকগুলো চাপা গলায় অনুনাসিক স্বরে যে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছে, সেগুলি শুনিতে কিছুমাত্র মনোরম নহে, এবং সেগুলি পুতুলের কণ্ঠস্বর বলিয়া নিতান্ত শিশুরও ভ্রম জন্মে না।

নানারকম দৃশ্য। একটা জেলে সমুদ্রের ধারে বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছে, দৈবক্রমে একটা কুমীর আসিয়া বরসী গিলিল,—প্রকাণ্ড মাছ পড়িয়াছে আশা করিয়া জেলে ছিপ টানিতে টানিতে জলে গিয়া পড়িল, জলে পদস্পর্শ হইবামাত্র কুমীর আসিয়া জেলের পা চাপিয়া ধরিল, জেলের পো ছিপখানি ছাড়িয়া দিয়া হতভম্বভাবে দুই হাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, কুমীর তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া গেল। হঠাৎ সমুদ্রমধ্যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা আসিয়া লাগিল, গণেশকে কোলে লইয়া কমলেকামিনী কমলবনে বসিয়া গণেশের মুখচুম্বন করিতেছেন, রমণী হস্তী গিলিতেছে ভাবিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিতে দেখিতে পঞ্চবটী বনে জটাবাকলধারী রামলক্ষ্মণের আবির্ভাব হইল, সূর্পনখা আসিয়া লক্ষ্মণের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল, লক্ষ্মণ তাহায় নাসাকর্ণ কাটিয়া দিলেন। সূর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে দশমুণ্ড রাবণের কাছে উপস্থিত হইয়া নাকিস্থরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দাঁদাঁ গো দাঁদাঁ, নর্বা বেঁটা আমার নাক কাঁন কেঁটে নিয়েছেঁ"—দশানন দশটা মাথা নাড়িয়া রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। রামরাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল—ঘোরতর যুদ্ধ, হনুমান লাফাইয়া রাবণের মাথায়

উঠিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া পলাইতেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-শেষে ভীমের সহিত রাজগণের যুদ্ধ হইতেছে, ভীম এক এক জন রাজাকে জাপটাইয়া ধরিয়া অন্য একজনের গায়ে ছুড়িয়া মারিতেছে, আর তাহারা গড়াগড়ি যাইতেছে। অর্জ্জুন বাণে বাণে সম্মুখীন রাজাদের অস্থির করিয়া দিতেছেন, দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা ভীমার্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাত মুখ নাড়িয়া এবং প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিয়া নানারকম ইঙ্গিত করিতেছে, দেখিয়া দর্শকগণ হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

এইরূপে নানারকম দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় পুতুলনাচ বন্ধ হইয়া গেল, সকলে গোলমাল করিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল—উৎসবভবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল এবং দুই একবার ঢাক বাজাইয়া ঢাকিরা মাথার কাছে ঢাক রাখিয়া কাঁথায় সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া চাটাইয়ের উপর শুইয়া পড়িল। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, কেবল দূরবর্ত্তী পাড়ায় চৌকীদারেরা এক একবার "এ-এ, গেরস্ত, জাগ হো" বলিয়া চীৎকার করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ও পল্লীবাসীগণের নিদ্রিত চেতনাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রির উৎসবকাহিনী নূতন করিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিল। অপরাহ্নে তিনটার পূর্ব্বে বরণ হইয়া গেল। প্রত্যেক বাড়ীতেই ঠাকুর বাহির করিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল; বাগচীবাড়ীতে তক্তারামা সাজান হইল, কার্ত্তিক তক্তারামার ভিতর প্রবেশ করিলেন। লাল কাপড়ে মোড়া তক্তারামার প্রত্যেক কোকরে দড়ি দিয়া কাচের হাঁড়ি এবং বেল টাঙ্গান, হাঁড়িগুলির মধ্যে ছোট ছোট বাতি। কার্ত্তিকের সম্মুখে দুইদিকে দুই পরীর ছবি, হাতে বাতি ধরিবার এক একটা দণ্ড, তাহাতে বাতি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁশের আড় বাঁধিয়া তাহার উপর কার্ত্তিককে চড়াইয়া বাহির করা হইল; কেহ কেহ জোড়া কার্ত্তিক পূজা করিয়াছে, দুই কার্ত্তিককে বাঁশের মাচার উপর মুখোমুখী করিয়া বসাইয়া বাজারের দিকে লইয়া চলিল।

দুই প্রহরের পর হইতেই বাজার লোকে লোকারণ্য। আজ দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। পথের ধারে কেবল দুইখানা পানের দোকান বসিয়াছে, জলচৌকীর উপর ছোট ছোট বাটীতে নানারকম পানের মশলা, পাশে ছোট ঝোড়াতে পানের বিড়ে। মেছোবাজারে দুই এক ঝুড়ি মাছও বিক্রয় হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ক্রেতা অপেক্ষা আজ দর্শকের সংখ্যাই অধিক—তথাপি মেছোবাজারে লোকের ভিড় অসম্ভব বেশী। অনেক খদ্দের দেখিয়া মেছুনীরা অল্পসংখ্যক মাছ ডালার উপর তুলিয়া অনেক দাম হাঁকিতেছে, কিন্তু ক্রেতারাও অসম্ভব কম দাম বলিতেছে এবং সেটা পরিহাস মনে করিয়া মেছুনীরা যে দুই একটা নীচ রসিকতা করিতেছে তাহা তাহারা পরম স্মিতমুখে পরিপাক করিতেছে। আজ সকলের মুখেই কার্ত্তিকের লড়াইয়ের কথা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হইতে বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই ভাল

কাপড় পরিয়া রাস্তায়, বাজারের মধ্যে, ইঁদারার পাশে এবং বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিকের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেলা চারিটার পর ঢাক বাঁজাইতে বাজাইতে গ্রামবাসীগণ একে একে নিজ নিজ কার্ত্তিক লইয়া বাজারে প্রবেশ করিল। আট দশখানা বাঁশ আড়াআড়ি করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর কার্ত্তিকের পাট বসান হইয়াছে; পাট বাঁশের সঙ্গে এমন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে যে কার্ত্তিকের নড়িবার সামর্থ্য নাই, কার্ত্তিকের আড় ঘাড়ে লইয়া আট দশজন লোক চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নাচনের বাজনা বাজিতেছে আর লোকগুলি তালে তালে পা ফেলিয়া কার্ত্তিককে নাচাইতেছে। ক্রমে এক দুই করিয়া অনেকগুলি কার্ত্তিক বাহকস্কন্ধে নাচিতে নাচিতে বাজারে প্রবেশ করিল। তাহার পর দত্তপাড়ার কার্ত্তিক, বক্সিপাড়ার কার্ত্তিক, কাঁশারীপাড়া, তাঁতিপাড়া, আচার্য্যপাড়া—সমস্ত পাড়ার কার্ত্তিক ভিন্ন ভিন্ন দলে বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে লইয়া মহাধূমধামে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জোরে জোরে বাজনা বাজিতেছে আর বাহকেরা কার্ত্তিক ঘাড়ে করিয়া নাচিতে নাচিতে বাজারের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ধূলা উড়িতেছে, ঢাক বাজিতেছে, মধ্যে মধ্যে চারিদিক হইতে হরিধ্বনি উঠিতেছে, হর্ষ কলরবের অন্ত নাই।

বেলা শেষ হইয়া আসিলে চৌধুরীবাবুদের রাজকার্ত্তিক সদলবলে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন বাহকে বাঁশ বাঁধিয়া তাঁহার সিংহাসন ঘাড়ে করিয়া লইয়া চলিয়াছে—একজন লোক কার্ত্তিকের পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া দড়ী ধরিয়া ময়ূরপুচ্ছ টানিতেছে এবং ঢিল দিতেছে আর পুচ্ছগুলি একবার সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে আবার প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে; সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক থাস, নিশান, ছাতি, আড়ংনি লইয়া চলিয়াছে, অনেকের হাতে মশাল, রঙ্গমশাল এবং মহাতাপ। বড় লোকের চাকরেরা তাহাদের মনিবের ছোট ছোট ছেলেদের লাল সবুজ পোষাকে সাজাইয়া, টুপী এবং জুতা পরাইয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া ফিরিতেছে। চৌধুরীবাড়ীর কার্ত্তিকের পর বাগচীবাড়ীর তক্তারামা—বাগচীদের মেজ বাবু টেরি কাটিয়া, ফ্লানেলের সার্টের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া, একহাতে কোঁচার অগ্রভাগ এবং অন্যহস্তে একখান সরু ছড়ি লইয়া তাঁহাদের কার্ত্তিকের আগে আগে চলিয়াছেন। মুখে বড় ব্যস্ত ভাব; চলিতে চলিতে এক একবার হটিয়া আসিয়া ঢুলিদিগকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সমানতালে বাজাইবার হুকুম দিতেছেন, কাহারো বা পিঠে ছড়ির দুই একটা গুঁতা মারিয়া সোজা করিয়া দিতেছেন, যেন এরূপ না করিলে তাঁহাদের কার্ত্তিক লড়াইয়ে হটিয়া যাইবে। এক এক পাড়ার ঠাকুর তাহাদের সমবেত বাদ্যভাণ্ড অগ্রবর্ত্তী করিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া চলিতে লাগিল, সকলের পশ্চাতে দর্শকবৃন্দ—পথের ধূলায় সকলের হাঁটু পর্য্যন্ত শাদা হইয়া গিয়াছে, ধূলা উড়িয়া নাকে মুখে প্রবেশ করিতেছে তথাপি সকলে পরম পুলকিত চিত্তে ভিড় ঠেলিয়া কার্ত্তিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলেই তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইতেছে। কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর কাছে আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে বেহারা এবং বাজন্দারগণ একমিনিট কাল পথের উপর দাঁড়াইয়া বাতায়ন অন্তরালবর্ত্তিনী অন্তঃপুরিকাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কার্ত্তিকের মুখখানি সেইদিকে ঘুরাইয়া ধরিতেছে এবং আপনাদিগের বাদ্যকুশলতা দেখাইবার জন্য ঢাকিরা মাথা নাড়িয়া ঘাড় ঘুরাইয়া লম্ফ ঝম্ফ সহকারে বিকট ঢক্কাধ্বনিতে সন্ধ্যার আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।

সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কার্ত্তিকের আড়ং বিশ্বেশ্বরী মন্দিরদ্বারে সমাগত হইল। তখন ঢং ঢং করিয়া আরতির ঘণ্টা বাজিতেছিল এবং পুরোহিত ঠাকুর ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ নাড়িয়া দেবীর আরতি করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরী-মন্দিরের নিকটে রাস্তার দুইধারে সমস্ত কার্ত্তিককে সারি সারি নামাইয়া বাহকেরা কয়েক মিনিটের জন্য বিশ্রাম করিতে বসিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণ, মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী তমালতলা দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল; মশাল জ্বালান হইল, চারিদিকে বাতি, রঙ্গমশাল প্রভৃতি জলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একত্র তুমুলরবে সমস্ত ঢাক বাজিয়া উঠিল; বাহকেরা হরিধ্বনি করিয়া কার্ত্তিক ঘাড়ে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পুনর্ব্বার আলোকমালাবেষ্টিত, জনপূর্ণ বাজারের মধ্য দিয়া নদীর দিকে চলিল।

কিয়দ্দূর হইতে দর্শকগণ গৃহমুখে ফিরিয়া আসিল। নদীতীরে কার্ত্তিকের পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া লওয়া হইল। চৌধুরীদের রাজকার্ত্তিকের তাজ, ময়ূরপুচ্ছ, বস্ত্রাদি সমস্ত খুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্রকায়া নদীর আবদ্ধজলে তাহাকে বিসর্জ্জন দিল। ঢাকের আওয়াজ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ বাজনা বাজিতে লাগিল; বিসর্জ্জনের সেই বিদায়-করুণ, কাতরতা মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল 'কার্ত্তিকের লড়াই' শেষ হইয়াছে।

দেশবিদেশ।

"ভৃগুক্ষেত্র"

বহুদিনের ক্ষুধাতুর ব্যক্তি, সুপক্ক সুপরিস্কৃত অন্নরাশি ও নানাবিধ দুর্লভ রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যবস্তু সম্মুখে দেখিলে যেরূপ ব্যাকুল হইয়া কোনটী অগ্রে ভক্ষণ করিবে ইহা ভাবিয়া ব্যতিব্যস্ত হয়, চির-দরিদ্র আজন্ম-ভিখারীকে নানাবিধ দ্যুতিময় মণিমাণিক্যপূর্ণ রত্নভাণ্ডার দেখাইলে, কোন রত্নটী বাছিয়া লইয়া সে তাহার দারিদ্রতা দূর করিবে, এইরূপ ভাবিয়া যেমন আকুল হয়—চির-অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলে সে এই বিশালজগতের কোন অংশ অগ্রে দেখিয়া, দৃষ্টিশক্তির অতীত বিরহের ক্ষতিপূরণের অনন্ত সুখলাভ করিবে এই ভাবিয়া যেমন দিশাহারা হইয়া উঠে, আমরা পঞ্চবটী অতিক্রম করিয়া ভৃগুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তদ্রূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও

ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলাম। তুমি জান না—এ উদ্বেগ, এ আকাঙ্ক্ষা, এ আগ্রহের মূল্য কত? রুদ্ধ জগতের মধ্যে, চিরপরিচিত লীলাক্ষেত্রের মধ্যে, কোলাহল ও দুঃখকষ্টময় জীবন-পরিসরের মধ্যে, কখনও যাহা দেখি নাই ও দেখিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ভাবি নাই, আজ তাহা অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! এস্থলে প্রাণের ভিতর কি যে এক অব্যক্ত কাতরতা উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না।

এদিকে অনন্ত, অপরিবর্ত্তিত, ঘোর শব্দিত, মত্ত-জলোচ্ছ্বাসের দূর-প্রশমিত গম্ভীর আহ্বানে, মধুর সঙ্গীতে দিগন্ত ছাইয়া, সেই নির্জ্জন জনমানবশূন্য পঞ্চবটী পরিপূরিত করিয়া "নর্ম্মদা প্রপাত" আমাদের সাদর আহ্বান করিতেছে; ওদিকে আবার অনন্ত হইয়াও সান্ত, শ্যাম-কলেবর, সুদূর-প্রসারিত, উপলখণ্ডমণ্ডিত উপত্যকা ভূমি—দুইপার্শ্বে শ্যামল শাখাময় বৃক্ষরাজি লইয়া তাহার সুশীতল ছায়া ও মধুর মলয় সেবনের জন্য করসঞ্চালনে আমাদের যেন ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে— আবার অন্যতর দিকে—সুনীল, জ্যোতির্ম্ময়, আকাশের নীচে, স্বপ্নরাজ্যের উন্মুক্ত উপত্যকাপথে—বন্যপক্ষীর বিজন-সঙ্গীত, মেঘরাশির মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া, জলপ্রপাতের মধুর গম্ভীর সঙ্গীতে অঙ্গ মিশাইয়া আমাদের হৃদয়কে সেইদিকে টানিতেছে। আবার পরোক্ষ দিকে গগণস্পর্শী, তুষার-ধবল, চঞ্চলবালার্ক-কিরণদীপ্ত, সমুন্নত শৃঙ্গ আকাশের কোলে স্থাপন করিয়া, বিশালদর্শন মহোন্নতকায় মর্ম্মরপাহাড় আমাদের চিত্তকে তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও তাহার স্রষ্টার অসামান্য কৌশল দেখাইবার জন্য আকর্ষিত করিতেছে—আর সম্মুখে ভৃগুক্ষেত্রের এক সর্ব্বোচ্চ ভূধরশিখরে উন্নত ত্রিশূলচিহ্ন ও পার্ব্বত্য সমীরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত লোহিত পতাকা লইয়া—ভগবান গৌরীশঙ্করের নির্জ্জন মন্দির ও তাহার অবলম্বী সুদীর্ঘ পর্ব্বতগাত্রবাহী প্রস্তরবক্ষ সোপানরাজি আমাদের মনকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা কোথায় যে আগে যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিতেছি না। যাইহউক অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আমরা সম্মুখে পর্ব্বতগাত্রবাহী সোপানশ্রেণীতে উঠিয়া গৌরী-শঙ্করের মন্দিরোদ্দেশে চলিলাম।

গৌরীশঙ্কর।

সোপানের পর সোপান। নীচে হইতে দেখিলে বোধহয়—যেন ইহারা পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া কত ঊর্দ্ধে—কে জানে কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়া লীন হইয়াছে। অধঃস্থ উপত্যকায় দাঁড়াইলে ঊর্দ্ধদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না—সীমান্তভাগ চক্ষে পড়ে না। কত অতীতের স্মৃতিমধ্যে ডুবিয়া কত কালগর্ভগত—পোমার, গোভিল, চেদি ও চন্দেলা রাজবংশীয়দের প্রভাতকমল সদৃশা, অসূর্য্যম্পশ্যা, রাজলক্ষ্মীরূপিণী রাজকামিনীগণের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া—কত ঝঞ্ঝাবাত, কত শিলাবৃষ্টি, কত বজ্রপাত উপেক্ষা করিয়া এই কঠিনহৃদয় পাষাণ-সোপান আজও দুর্দ্ধর্ষভাবে দণ্ডায়মান!

মৎসঙ্গী ও আমি অদম্য উৎসাহে সোপানশ্রেণীতে উঠিতে লাগিলাম। মনে মনে একটী একটী করিয়া গুণিয়া লইতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের সমভিব্যাহারী চস্‌মধারী বন্ধুটী আরও অগ্রসর হইতে বড়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক প্রলোভন দেখাইলাম—কিন্তু তিনি ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলে, যদি স্বর্গের চির-উজ্জ্বল-স্বর্ণমণ্ডিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতেও তিনি সম্পূর্ণ নারাজ। কাজেই আমাদের সেখানে অর্দ্ধেক পথে বিশ্রামলাভ জন্য বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিতে হইল।

ঘনস্রাবী স্বেদজলে শরীর ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সন্তানের কষ্ট মা'র প্রাণে সহিবে কেন? প্রকৃতির আদেশে শাখাগুলি দুলাইয়া পার্শ্বস্থ সমুন্নত বিটপীরাজি পার্ব্বত্য সমীরকে ইতস্ততঃ প্রবাহিত করিতে লাগিল। তৃষ্ণাবোধ হইতেছে—কিন্তু জল কোথায়? প্রস্রবণ-বারি সেখান হইতে অনেক দূরে। প্রসন্নসলিলা নর্ম্মদাও অনেক নিম্নে। কিন্তু প্রকৃতি অঙ্গুলি হেলাইয়া আশে পাশে অগণ্য ফলপূরিত পক্ক আম্‌লকী বৃক্ষ দেখাইয়া দিলেন।

সেই পর্ব্বত-বিহারিণী, অদৃষ্টা বনদেবীর অযাচিত আতিথ্যসৎকারে, আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। আমাদের সঙ্গে যে পাহাড়ী পথ-প্রদর্শক ছিল—হুকুম প্রাপ্তিমাত্রেই সে গাছে উঠিয়া শত শত ফলপূর্ণ আম্‌লকীর ডাল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। আমরা বৃন্তচ্যুত নিম্নে নিক্ষিপ্ত, গুচ্ছভ্রষ্ট অযাচিত উপহারগুলি কুড়াইয়া লইয়া দুই চারিটীর আস্বাদ আরম্ভ করিলাম। তৃষ্ণায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছিল, কণ্ঠ রসহীন হইতেছিল—আম্‌লকীর অমৃত প্রবাহে সে তৃষ্ণা কোথায় গেল জানিতে পারিলাম না। সেই কষায়-মধুর রসাস্বাদে বন্ধুবর পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া, আরও ঊর্দ্ধে উঠিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাদের আপ্যায়িত করিলেন।

যখন দেশে ছিলাম, তখন একদিন আমার জনৈক আত্মীয় ঔষধ প্রস্তুতের জন্য আমায় কতকগুলি পার্ব্বতীয় আম্‌লকী আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আজ সেই কথা মনে উঠিল। ভগ্নবৃক্ষশাখা হইতে, ফলগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই নির্জ্জন সোপানের উপর স্তূপাকারে রাখিয়া আমরা আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে পাহাড়ীর ঘাড়ে চাপাইব, এই সংকল্পে সেইগুলি তখন সেই প্রস্তরসোপানে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

আমাদের পদযুগল ক্রমশঃ শক্তিহীন হইতেছিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শেষের কয়েকটী সোপান উত্তীর্ণ হইয়া আমরা প্রথম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে অগণ্য বিল্ব-বৃক্ষশ্রেণী, বাঁমে দক্ষিণে অগণ্য আতা বৃক্ষের বন, নিম্নে পদপ্রান্তে অগণ্য প্রস্তরসোপান, আর একটু ঊর্দ্ধে গৌরীশঙ্করের মন্দিরের গোলাকার প্রাচীর এবং পার্শ্বে প্রাচীন ঋষিদিগের পরিত্যক্ত কয়েকটী অন্ধকারময় নির্জ্জন গুহা। আর সম্মুখে, লোহিত পতাকামণ্ডিত, জনমানব-সমাগম-পরিশূন্য-পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর দেবের অতিনির্জ্জন মন্দির।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। সেই বৃত্তাকার দেয়ালের চারিদিক ব্যাপিয়া পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে ভগ্নপ্রস্তর প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কোনটীর হাত

নাই, কোনটীর বা পা নাই, কোনটী বা মুণ্ডহীন, কোনটীর বা নাসিকা নাই। সবই ভগ্ন ও অঙ্গহীন। মন্দিরটীর প্রধান দেবতা গৌরীশঙ্কর হইলেও ইহাকে "চৌষট্টি যোগিনীর" মন্দির বলে। আশে পাশে জনমানব নাই। দু দশ মাইলের মধ্যেও কেহ নাই। মূর্ত্তি-গুলির অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, এমন কেহও উপস্থিত নাই। পাহাড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে আধা-হিন্দী আধা-পাহাড়িতে কত কি বকিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে অন্য কোন বিশেষ তথ্য সংগ্রহ হইল না। বুঝিবার মধ্যে এইটুক বুঝিলাম, "পাৎসাসে এস্‌মাফিক্ হাল হুয়া।" যদি তাই ঠিক হয়, তবে বাদশাহকুলপ্রদীপ ঔরঙ্গজেব ভিন্ন এ সুকীর্ত্তির অধিকারী আর কেহই নহেন! সম্মুখেই উন্মুক্ত দ্বার—আমরা গৌরীশঙ্করের মন্দিরমধ্যে গেলাম। একটী ক্ষুদ্র নাটমন্দির পার হইয়া মন্দিরমধ্যে ঢুকিতে হয়। লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত—হরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে বিরাজিত। প্রভাতে কে আসিয়া চারিটী বন্যপুষ্প সংগ্রহ করিয়া পূজা করিয়া গিয়াছে। ফুলগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া মন্দিরতলে পড়িয়া রহিয়াছে। পাহাড়ী বলিল—নর্ম্মদার উপত্যকায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন, তাঁহারাই অন্য লোকের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন এইরূপে পূজা করিয়া যান। তৎপরে আমি চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটির তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক প্রতিমার নিম্নে দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃতে দেবতাদের নাম লেখা আছে। নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার সন তারিখ কিছু নাই। তাহা হইলে অনুসন্ধানের অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে কতকটা আলোক-জ্যোতি আসিয়া পড়িত।

আমি যখন মধ্যাহ্ন-ময়ূখমালা মস্তকের উপরে লইয়া কোন প্রকারে পাহাড়ীর ছিন্ন ছত্রের নিম্নে মস্তক রক্ষা করিয়া, গভীর গবেষণায় নিমগ্ন—তখন দেখি আর এক মহা বিভ্রাট উপস্থিত! আমাদের চস্‌মাধারী বন্ধু আমায় পেন্সিল ও কাগজ বাহির করিতে দেখিয়া, সেই ভীষণ রৌদ্রে রৌদ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন যে, দশমিনিটের বেশী দেরী হইলেই তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া যাইবেন। আমি তাঁহার প্রকৃতি বুঝিয়াছিলাম—তিনি একাকী কখনই সেই উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিতে পারিবেন না, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। যাহারা কার্য্যের আস্ফালন বেশী করে, তাহাদের কাছে প্রকৃত কাজ অতি অল্পই প্রত্যাশা করা যায়। রুদ্ধভুজঙ্গের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জন করিয়া শেষে নিরুপায় হইয়া বন্ধুবর অপ্রসন্ন মুখে মন্দিরচত্বরে এক ছায়াময় স্থান অন্বেষণ করতঃ দেহভার প্রসারিত করিলেন, আর বিশ্রাম করিতে করিতে আমাদের শত শত অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

আমি বাহাদুরির লোভে সেই প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের ভগ্ন প্রতিমাগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রলুব্ধ হই নাই। দেখ! কনিংহাম্, প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ আমাদের ভারতের বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া অতীত ও প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারকল্পে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিতেছেন ও করিয়াছেন। কিন্তু একেবারে চেষ্টাহীনতা

বিশেষতঃ এরূপ সুযোগের মুখে ও সুবিধাজনক স্থলে—আমার পক্ষে বড় লজ্জাকর বলিয়া বোধ হইল। কৌতূহল বশে সেই মধ্যাহ্ণ-রৌদ্রে সন্তাপিত হইয়া "চৌষট্টি" মন্দিরের যে ভগ্নমূর্ত্তির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম পাঠকের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"চৌষট্টি যোগিনী" মন্দিরের ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তির তালিকা ও বিবরণ।

	মূর্ত্তির নাম	বাহন-চিহ্ন	মূর্ত্তি-পরিচয়	মন্তব্য
১	শ্রীগণেশ	* *	...	...
২	,, ছত্রসম্বর	হরিণ	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩	,, অজিতা	সিংহ	ঐ	ঐ
৪	,, চণ্ডিকা	নরকঙ্কাল	দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি	শক্তি
৫	,, আনন্দা	পদ্ম	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৬	,, কামদি	(অবনত) পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি	ঐ	ঐ
৭	,, ব্রহ্মাণী	রাজহংস	ঐ	শক্তি
৮	,, মাহেশ্বরী	ষণ্ড	ঐ	ঐ
৯	,, টঙ্গারি	সিংহ	দশভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১০	,, জয়া	মার্জ্জার	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	ঐ
১১	,, পদ্মহংসা	পুষ্প	ঐ	ঐ
১২	,, রণজীরা	হস্তী	ঐ	ঐ
১৩	* নাম নাই	নাগিনী	ঐ	ঐ
১৪	,, হংসিনী	রাজহংস	ঐ	ঐ
১৫	* খোদা নাই	...	ষোড়শ হস্ত পুরুষ	ত্রিনেত্র শিবমূর্ত্তি
১৬	,, ঈশ্বরী	ষণ্ড	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১৭	,, স্থানী	পর্ব্বতচূড়া	ঐ	ঐ
১৮	,, ইন্দ্রজালী	হস্তী	ঐ	যোগিনী
১৯	,, ভগ্ন *	ষণ্ড	ঐ	...
২০	,, স্থানচ্যুত *	...	ঐ	...
২১	,, থাকিনী	উষ্ট্র	ঐ	...
২২	,, ধনেন্দ্রী	অবনত মনুষ্য	ঐ	...
২৩	,, শূন্য অংশ *	...	...	...
২৪	,, উত্তলা	কালসার	উপবিষ্টা স্ত্রী মূর্ত্তি	...

	মূর্ত্তির নাম	বাহনচিহ্ন	মূর্ত্তিপরিচয়	মন্তব্য
২৫	শ্রীলম্পটা,,	অবনত মনুষ্য	উপবিষ্টা স্ত্রী মূর্ত্তি	...
২৬	,, উহা	ময়ূর	ঐ	সরস্বতী
২৭	,, ...	বরাহ	...	...
২৮	,, গান্ধারি	অশ্ব	...	...
২৯	,, জাহ্নবী	মকর	দ্বিহস্তা দেবী	গঙ্গা
৩০	,, ডাকিনী	মনুষ্য-কঙ্কাল	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩১	,, বন্দিনী	স্ত্রীমূর্ত্তি	...	...
৩২	,, দর্পহারি	সিংহ	...	...
৩৩	,, বৈষ্ণবী	গরুড়	...	শক্তি
৩৪	,, অঙ্গিনী	ঐ	...	যোগিনী
৩৫	,, ঋক্ষাণী	মকর	...	...
৩৬	,, শাঁখিনী	গৃধ্র	...	...
৩৭	,, ঘণ্টালি	ঘণ্টা	...	...
৩৮	,, তত্বারি	হস্তী	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি (হস্তীমূর্দ্ধা)	যোগিনী
৩৯	খোদা নাই *	....	...	...
৪০	,, গঙ্গিণী	বৃষ	...	...
৪১	,, ভীষণী	অবনত মনুষ্য	...	...
৪২	,, সতনুসম্বর	হরিণ	...	...
৪৩	,, গহণী	মেষ	...	...
৪৪	খোদা নাই *	...	...	...
৪৫	,, উদরী	সজ্জিত ঘোটক	...	...
৪৬	,, বারাহি	বরাহ	বরাহ-মূর্দ্ধা	শক্তি
৪৭	,, নলিনী	বৃষ	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৪৮	দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রবেশদ্বার	...	...	...
৪৯	স্থানচ্যুত *	...	...	...
৫০	,, নন্দিনী	সিংহ	...	...
৫১	,, ইন্দ্রাণী	ঐরাবত	...	শক্তি
৫২	,, ইরারি	গাভী	...	যোগিনী
৫৩	,, স্তংন্দিনী	গর্দ্দভ	ভগ্ন হইয়াছে	...

	মূর্ত্তির নাম	বাহনচিহ্ন	মূর্ত্তি পরিচয়	মন্তব্য
৫৪	শ্রীঅঙ্গিনী	হস্তীমূর্দ্ধ মনুষ্য	...	...
৫৫	নাম নাই *	...	...	...
৫৬	,, তেরান্তা	মহেশ্বর	স্ত্রীমূর্ত্তি বিশভূজা	...
৫৭	,, পাবুণী	অবনত মনুষ্য	দশভূজা	...
৫৮	,, বায়ুবেগা	কালসার	ভগ্ন	...
৫৯	,, ভুভারবর্দ্ধিনী	পক্ষী	ঐ	...
৬০	খোদা নাই *	...	...	...
৬১	,, সর্ব্বতোমুখী	যন্ত্র ও পদ্ম	ত্রিমূর্দ্ধাদ্বাদশহস্তা	...
৬২	,, মন্দোদরী	কৃতাঞ্জলি পুরুষদ্বয়	স্ত্রীমূর্ত্তি—ভগ্না	যোগিনী
৬৩	,, ক্ষেমুখী	সারস	...	...
৬৪	,, জাম্বভী	ভল্লুক		...
৬৫	,, আরোগ	নগ্নপুরুষ	...	...
৬৬	স্থানশূন্য *	*		*
৬৭	,, স্থিরচিত্তা	কৃতাঞ্জলিপুরুষ	...	অজ্ঞাতব্য
৬৮	,, যমুনা	কূর্ম্ম	...	যমুনানদী
৬৯	,, নীলদাম্বরা	গরুড়	দ্বিহস্তা	যোগিনী
৭০	,, বিভাষ	মানুষ ও নরকঙ্কাল	...	* স্থির নাই
৭১	,, নারসিংহ	নৃসিংহমূর্ত্তি	...	শক্তি
৭২	,, অন্তকারি	মহিষ	উপবিষ্ট নরসিংহমূর্ত্তি	যোগিনী
৭৩	,, পিঙ্গলা	ময়ুর	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	শক্তি
৭৪	,, অক্ষলা	জোড়হস্ত পুরুষ	ঐ	...
৭৫	খোদা নাই *	*	ঐ	...
৭৬	,, ক্ষেত্রধর্ম্মিণী	শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃষ	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৭৭	,, বীরেন্দ্রী	অশ্বমূর্দ্ধা	ঐ	ঐ
৭৮	স্থানভ্রষ্ট *	*	*	*
৭৯	,, ঋধালি দেবী	কোন অজানিত জন্তুমূর্ত্তি	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৮০	* পশ্চিম প্রবেশপথ *	*	*	*
৮১	,, স্থানভ্রষ্ট *	*	*	*

এইমন্দিরে চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত—আটটী শক্তিমূর্ত্তি, তিনটী নদীমূর্ত্তি, শক্তির চারিমূর্ত্তি, শিব ও গণেশের দুইমূর্ত্তি,—মোট একাশি মূর্ত্তি আজও বর্ত্তমান।

ভৃগুক্ষেত্রকে চলিত কথায় লোকে "ভেড়াঘাট" বলিয়া থাকে। গৌরীশঙ্করের মন্দির হইতে নামিয়া পার্শ্বস্থ আর একটী অত্যুচ্চ প্রস্তরময়স্থানের নিকটবর্ত্তী দেশে 'ভৃগুমুনির' আশ্রম ছিল বলিয়া একটী জনপ্রবাদ আজও প্রচলিত। আশ্রম-অধিকৃত স্থানের স্মরণার্থে কতকটা অংশ ইন্দোররাজ্ঞী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

ভৃগু-আশ্রমের অনতিদূরে দত্তাত্রেয় ঋষির নির্জ্জন সমাধিক্ষেত্র। একটী প্রস্তরময় গুহা নিবিড় অন্ধকার হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত করিয়া আজও ঋষিপ্রবরের নাম, সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে ঘোষণা করিতেছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিল এই আশ্রম হইতে মন্দির পর্য্যন্ত একটী সুরঙ্গ বর্ত্তমান আছে। সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য সেই মহান্ধকার অজাগর-সঙ্কুল নিবিড় গুহায় নামিতে আমাদের সাহস হয় নাই। ভৃগু আশ্রমের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানটী অতি-মনোরম। নির্জ্জনে জগৎপাতার চিন্তার উপযুক্ত এরূপ মনোহর স্থান আর বুঝি দ্বিতীয় নাই! আশ্রম হইতে দু পাঁচ হাত দূরেই একটী মর্ম্মরপাহাড়ের বিস্তৃত শৃঙ্গ! সেখান হইতে নীচের দিকে চাহিলে গভীরতা দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—মাথা ঘুরিয়া যায়। সেই গভীরতার নিম্ন দিয়া পর্ব্বত সানুদেশ চুম্বিত করিয়া, নির্জ্জন সঙ্গীতে জীবন ভাসাইয়া নর্ম্মদা জলস্রোত প্রবল প্রবাহের ন্যায় চলিয়াছে। এত নির্জ্জন, এত শান্তরসাস্পদ, এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময়, এত চিরপ্রফুল্লতাপূর্ণ স্থান আমি জীবনে দেখি নাই। এইখানে শীতলতরুচ্ছায়ায় বসিয়া, পাহাড়ী শীতল বাতাসে, আকাশবিহারী কলকণ্ঠ পার্ব্বত্যপক্ষীর মধুর গাথা, আর নিম্ন প্রবাহিতা তরঙ্গভঙ্গমণ্ডিতা পর্ব্বত গাত্রপ্রহতা নর্ম্মদার বায়ুবেগ-বিতাড়িত প্রবল জলোচ্ছ্বাসশব্দ, শ্রবণ করার সুখ, একদিনও যদি তুমি ভোগ করিতে পাও তো তোমার জীবন সার্থক হইল। তোমার প্রাণের জ্বালা থাকে—তাহা হইলে তাহা তখনি শান্ত হইবে। তোমার প্রাণের কথা কিছু থাকে সেই নির্জ্জন তরঙ্গিণীকে বল—সেই আকাশ-বিহারী—সঙ্গীতস্রাবী কৃষ্ণবিন্দুবৎ-পক্ষীকে বল—তোমার মনের মধ্যে কিছু অভিমানের বা ক্ষোভের থাকে—নিকট প্রবাহিতা স্নিগ্ধ সলিলা নির্ঝরিণীকে বল—দুঃখময় জীবনের কাহিনী শুনিয়া কেহ তোমার উপেক্ষা করিবে না—কেহ বিদ্রূপ করিবে না—কেহ তীব্র কটাক্ষ করিবে না—কেহ মুখ ফিরাইবে না।

যাক্ ও সব কথা—ভৃগুক্ষেত্রের এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা কে এ সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা কৌতূহল হইতে পারে। আমি এ সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

এ সম্বন্ধে এ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে একটী চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী আছে। সেই কিম্বদন্তীমতে নাগবংশীয় রাজা শালিবাহন 'গৌরীশঙ্করের' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শালিবাহনকে শকাব্দাপ্রচারক শালিবাহন বলিয়া যেন ভ্রমে পড়িও না। উপকথার মধ্যে ইঁহার

জন্ম এবং উপকথাতেই শেষ। রাজা শালিবাহনের মাতা, কাশীর একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের কন্যা। তাঁহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য ছিল। একদিন বণিককন্যা—নদীতে স্নান করিতেছেন, সঙ্গে কেহই নাই—এমন সময়ে জল হইতে এক বৃহৎ সর্প উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সর্পমূর্ত্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। বণিককন্যা এই প্রকারে বিপদগ্রস্তা হইয়া মহাভয়ে চক্ষু মুদিলেন।

মনুষ্যমূর্ত্তিধারী সর্প অপসৃত হইলে বনিক্‌কন্যা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। বণিক জাতিপাত ভয়ে সেই অনূঢ়া কন্যাকে বাটি হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বনিককন্যা এক কুম্ভকারের আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন।

এই নাগপরিগৃহীতা বণিককন্যার সন্তানের নামই শালিবাহন। এক সময়ে দিল্লীশ্বর কাশী আক্রমণ করিলে কুম্ভকারপালিত এই শালিবাহনই স্বীয় বাহুবলে কাশীক্ষেত্র শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত করেন। শালিবাহন কি অদ্ভুত ক্ষমতায় এই প্রকার অসমসাহসিকরূপে যুদ্ধজয় করিয়াছিলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারে নাই। শালিবাহন বলিতেন "গৌরী ও শঙ্করের" কৃপায় বরলাভ করিয়া তিনি সেই মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন।' যেখানে তিনি গৌরী ও শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই স্থানেই এই ঘটনার স্মরণার্থে "গৌরীশঙ্কর" মন্দির নির্ম্মিত করান। এ গল্পটী পাছে কেহ আমার স্বরচিত বলিয়া ভাবেন তাই বলিয়া রাখি, আমি এটি মেজর জেনারল বিখ্যাত কনিংহাম সাহেবের কাছ হইতে পাইয়াছি। গল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইতিহাসের কথা বলি। এই ভেড়াঘাটে বা ভৃগুক্ষেত্রে একখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছিল—তাহার ২৭ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত ছিল—

"নরসিংহ দেবের জননী
অহ্লন দেবী এই অদ্ভুত
সুদৃঢ় ভিত্তি-সঙ্কুল শিব
মন্দির ও তৎসংলগ্ন এক
মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাউলী
পরগণার উদী নামক
সমগ্র গ্রাম দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট
রহিল।"

এই অহ্লন দেবী গয়াকর্ণ রাজার স্ত্রী! গয়াকর্ণ চেদীরাজ্যের "কুলসুরি" রাজবংশ-সম্ভূত। আগামীবারে এই গয়াকর্ণ ও অহ্লনদেবীর সম্বন্ধে বলিব। এইটুকু জানাইয়া রাখি, যখন ভারতে যবনাধিকার আদৌ বদ্ধমূল হয় নাই, গয়াকর্ণ সেই সময়ের একজন পরাক্রান্ত হিন্দুনরপতি।

কদম্ব সুন্দরী।

কবি বিদ্যাপতি-মুখে শুনি এ সঙ্গীত
উল্লাসিত পাণ্ডা, কতই কতই সুখী!
দর দর ধারে বহে নয়নযুগলে
আনন্দের ধারা! মরি, মকরন্দ-পানে
বিহ্বল ভ্রমর যথা, বার বার আসি
কুসুমে বসিতে চাহে, তেমতি সুমতি
পাণ্ডা, কহিল কবিরে "বল বল কবি
বস্ত্রহরণের এই সুন্দর কাহিনী।
আর সব সুন্দরী গোপিনী, ছিল জলে
যারা, আকণ্ঠমগনা, ব্রজবিলাসিনী
ধনী, তারা কি করিল? কেমনে উঠিল?
এমন মধুর গীতি কখন শুনিনি।
শ্রীমাধব গোপিনীবল্লভ, মুরলীর
রবে, হরিত গোপিনী-মন, হে সুকবি,
হরিয়াছ মম চিত তুমিও তেমতি,
অনুপম, অপরূপ ও গীতমাধুরি!"
কবি বিদ্যাপতি, মরি, শুনিয়া সুখ্যাতি,
ভাবে গদগদ কতই আহ্লাদে! বল
এ জগতে, কোন্ কবি, কবিত্বের খ্যাতি
আপন, শুনিলে (চির সাধনার ধন!)
নাহি ভাসে আনন্দসলিলে! ওই টুকু
লাগি, হায় ও যে সর্ব্বত্যাগী; ওই টুকু
পেলে, বিশ্বে, হায় ও যে সব অবহেলে!
হাসিয়া হাসিয়া কবি, মনের আনন্দে,
মধুর ব্রজ-ভাষায়, গাঁথিয়া গাঁথিয়া,
গাহিয়া কহিলা "অপরূপ গোবিন্দের
লীলা। গোপিনীবৃন্দের অবলজ্জা হেরি
শ্রীহরি, অদৃশ্য হইলা। ব্রজ-ভিতরে,
বণিক-চত্বরে, শ্রেষ্ঠীর দোকানে, মরি,
নারী-পরিধেয় বস্ত্র যত গো আছিল
মায়াবলে হরিয়া লইলা। নারীঘাটে
সারি সারি, স্তূপাকার করি, বসনের
রাশি, অদৃশ্য হইয়া, রাখিলা শ্রীহরি।
"কোথা গেল বস্ত্র? কে লইল? কোন চোর?"
এই রবে হাহাকার ধ্বনি, উঠিল গো
বণিক-চত্বরে!"

হেথা সেই নারী-ঘাটে,
সুনীল যমুনাজলে, আকণ্ঠমগনা,
ব্রজের অঙ্গনা সব, হর্ষ-কলরব
করিয়া উঠিল, হেরি সেই রাশি রাশি
(ব্রজবিলাসীর নয়নের ফাঁশি!) চারু
বসনের রাশি! হর্ষে, ছুটিয়া, ধাইয়া,
পুলিনে উঠিয়া, পরিতে লাগিল বস্ত্র
বিবস্ত্র গোপিনী!

রাধিকার কোনো আলি,
(পতির দুলালি) গুল-আনারের রঙে
রঞ্জিত, বাছিয়া নিল বাসন্তী চুনরি!
কোনো প্যারি "অচ্ছা" বলি "পিয়রি" পরিল
সচ্চা গোটাময়!—ব্রজবিলাসিনী ধনী
কোনো সুহাসিনী, মরি, গোলাপীবসনে
রঞ্জিল মোহন তনু! পুলিননিবাসী,
চপল সমীর, তার অঞ্চল হেরিয়া
চঞ্চল হইল; মরি, অনঙ্গ দেবের
বিজয়-পতাকা যেন সদর্পে উড়িল!
কোনো সুরঙ্গিণী রাঙা "লাহাঙ্গার" হেরি
বর্ণভাতি, রঙ্গে শ্রীঅঙ্গে বেড়িল; কেহ
হাসি হাসি পরিল গো বারাণসী শাড়ি!
কোনো কলাবতী, মতি-পান্না-বিজড়িত
ঝকমক্ কিংখাপে সাজিল! অতি স্বচ্ছ
যমুনা-জল-দর্পণে মুখ-প্রতিবিম্ব

হেরি, বুঝিল নাগরী, আজি রজনীতে,
বাসর-শয্যাতে, হবে বিজয়িনী! কেহ
লাল বুটি-ময়, সুন্দর "দরেশ" মরি
হরষে পরিল; জরির "তাঞ্জেব" কেহ;
কেহ রজতের ভাতি "ওড়নি" ধরিল;
কেহ কনকের ভাতি "ঘাঘরি" পরিল।
আহা, এইরূপে রাসরসময়ীসজ্জা
ভূষণে ভূষিতা, যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা,
শিরোপরি ধাতুর কলসী জলে ভরা,
বক্ষে ধরি কনক-কলসী রসে ভরা,
বিম্বাধরা, দু অধরে হাসি নাহি ধরে,
সুনয়না, দু নয়নে চাহনি না ধরে,
রাজহংসিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া,
গজেন্দ্রগমনে, গাহিয়া গাহিয়া গীতি,
কঙ্কণ বাজায়ে, শিঞ্জিনী নাচায়ে, বক্ষ
হার, দোলায়ে দোলায়ে, রাজপথ দিয়া,
চলিল সে নারী-সেনা ব্রজ-বিজয়িনী!
চরণচুম্বনে জাগি পথ-ধূলি-রাশি
আনন্দে শিহরি উঠে! কোনো ধূলিকণা,
কোনো-চন্দ্রাননা-চরণ-পরশে, হর্ষে
পাইয়া চেতনা, কহে "ওগো গোপাঙ্গনা,
সমাপ্ত হইল মম এ ধূলি-জীবন!
এবে আমি অশোক হইয়া, ফুটিব গো
ফুল বনে, নর-নারী-নয়ন রমিয়া।"
কোনো ধূলিকণা, উড়ি গিয়া, অধরেতে
বসে, কোনো রঙ্গিণীর; হাসি কহে ধূলি
(স্বর্গে উঠি!) "এবে আমি হইব বান্ধুলি!"
কোন ধূলিকণা, কোনো বরাঙ্গীর মরি
নখদর্পণেতে উঠি, হাসি কহে "আলি,
এবে আমি হইব শেফালি!" গোপী-বক্ষে
উঠি, হর্ষে লুটাপুটি, হাসি কহে কোনো
ধূলিকণা "একি সখি, সুখের যাতনা!
অঙ্গ মম উঠিছে শিহরি! হে সুন্দরি,
বুঝি আমি কদম্ব হইব, পোহাইলে
বিভাবরী!"

শ্রীরাধার সহচরী সব,
করি হর্ষ-কলরব, যাইতে যাইতে,
ব্রজের সে রাজপথে, আসি উপস্থিত
ক্রমে সেই নিরানন্দ বণিক-চত্বরে,
যথায় উঠিতেছিল হাহাকার-ধ্বনি,
বার বার বলি "কোথা বস্ত্র? কোথা চোর?
কোথা বস্ত্র? কোথা চোর? কে করিল চুরি?"

* * * *

বিচিত্রবসনময়ী, রাসলীলাময়ী,
রজতে কাঞ্চনে বিভূষিতা, অনিন্দিতা,
গোপ-দুহিতা-বনিতা!—তাহাদের পানে
একদৃষ্টে, মুগ্ধনেত্রে, শ্রেষ্ঠীচত্বরের যত
বণিকেরা, বাক্যহারা, চাহিয়া রহিল!
সুধাই, সুধাই করে "কোথা হ'তে পেলে
এই বস্ত্র?" আশঙ্কায় সুধাতে নারিল!
কতক্ষণে অগ্রসরি বস্ত্র-ব্যবসায়ী
ধনদাস (ধনদাস শ্রেষ্ঠীর অগ্রণী—
চক্ষুলজ্জা অল্প তার!) ভাল আকুঞ্চিয়া,
করিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গি, জিজ্ঞাসিল ক্রোধে,
"বল ওহে গোপবধূ, গোপের কুমারী,
কে দিল এ বস্ত্ররাশি? যাই বলিহারি
চৌরপণা!"

শুনি এই কঠোর আহ্বান
গোপীদের উড়িল পরাণ! বাক্যহারা,
কাঁপি থরথরি, ভূমি পানে নেত্র করি,
সারি সারি গোপ-নারী রহিল দাঁড়ায়ে!
ক্রোধান্ধ-নয়নে সেই বণিক-মণ্ডলি
চক্রাকার করি, ঘিরিল গোপিনী-ব্রজে!
গোপী-বৃন্দ করে হাহাকার!

বাতায়নে

বসি, গোবিন্দ চরণ প্রান্তে, শ্রীরাধিকা,
দেখিতেছিলা এই সব ; কহিলা রাধা
"একি লীলা তব লীলাময় ! সখীদের
এ লাঞ্ছনা, পরাণে সহেনা ! পায়ে পড়ি
হে শ্রীহরি, সম্বর সম্বর লীলা তব !
হের নাথ, উঠ, উঠ !—দুষ্ট ধনদাস,
বিশাখার অঞ্চল ধরিয়া—ওই দেখ—
টানিছে সরোষে !—কত কষ্টে সম্বরিছে
বস্ত্র, চন্দ্রাবলী! আহা সোহাগিনী আলি
কাঁদে উচ্চে ; রাখ মান, রাখ বনমালি !"
অবগাহি রাধিকারে সোহাগ-সায়রে,
ঈষৎ আঘাত করি কপোলে চিবুকে
প্রেমাদরে, সরাইয়া চূর্ণকুন্তলেরে,
চুম্বিয়া মুখারবিন্দ, কহিলা গোবিন্দ
"সোহাগিনি, মিছে তব ভয় ; আমি আছি
যবে, কি সংশয় ? চাহি দেখ ব্রজেশ্বরি !"

* * *

মরি কি হরির মায়া !—দুষ্ট বণিকেরা
যতই টানিল বস্ত্র, অসহায়া সেই
গোপিনীবৃন্দের, ততই সে বস্ত্ররাশি
হয়ে যায় দীর্ঘতম ! চম্পকের বর্ণ
শাড়িখানি শেষ হলে, অশোকের বর্ণ
কোথা হ'তে শাড়ি আসি জোটে ; তাহা শেষ
হলে, কোথা হ'তে জোটে আসি, কটিতটে
সুবিচিত্র শাটী মরি অতসী-বরণ !
তাহা শেষ হ'লে, কে গো অন্তরীক্ষ হ'তে
জোগায় গো চুপে ঝক্‌মক্ নীল-আভা,
অপরাজিতার বর্ণ নীলাম্বরী শাড়ি !
হরি যাহাদের লাজবস্ত্র, এই বিশ্বে
কে করে বিবস্ত্র তাহাদের ? আজি ব্রজে
একি লীলা ! চারিধারে শত শত মরি
দ্রৌপদী !—এ কৌতুকের নাহি গো অবধি !
বস্ত্র টানি পরিশ্রান্ত, ব্যথিত দু হস্ত
দুষ্ট বণিকেরা, ভয়ে লাজে অধোমুখে
ছাড়ি দিল বস্ত্র ; কহিল, "রাক্ষসী এরা
মায়াবিনী, শিখিয়াছে কামাখ্যার যাদু !"
হেনকালে পীতাম্বর হাসিতে হাসিতে
আসি উপস্থিত তথা ; কহিলা সুস্বরে
"যাও সবে গোপবধূ, গোপের কুমারী,
নিজ নিজ গৃহে ; তোমরা ত' চোর নহ ;
ইহারাই অন্ধ, দুষ্ট বণিকেরা ! এরা
রাখেনা সন্ধান ভাল, আপন গৃহের !
নির্লজ্জ পামর এরা, পথে ঘাটে ধরে
অবলা জনেরে !—বণিককুলের গ্লানি
ওহে ধনদাস, ওহে চন্দনবিলাস,
তোমাদের চক্ষু কোথা ? হের সারি সারি
তোমাদেরি দোকানেতে তোমাদেরি বস্ত্র !
ধিক্ ধিক্ ! "হা বস্ত্র" বলিয়া, ছুটিতেছ
যথাতথা, ধরিতেছ যারে তাঁরে পথে !
ভাঙ বুঝি ভখিয়াছ শ্রেষ্ঠীকুলগ্লানি ?"
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে, লাজে ম্রিয়মাণ,
হেঁট করি মাথা, বুঝিল সে বণিকেরা
সত্যই অলীক চুরি !—হেরিল দোকানে
বিদ্যমান যত বস্ত্র !—হাসিয়া গোবিন্দ
অদৃশ্য হইলা !
মুক্তি পেয়ে আহ্লাদিনী,
গোপ-আনন্দ-দায়িনী, রাধার সঙ্গিনী
সব, বারবার বলি "শ্রীরাধার জয়"
"জয় জয় নন্দদুলাল" "আজু কুঞ্জমে
ফাগু খেলব্ হম সব্, চলোরে সহেলি"
গাহিয়া গাহিয়া গোষ্ঠগীতি, চঞ্চল চরণে,
কঙ্কণবাজায়ে, শিঞ্জিনী নাচায়ে, বক্ষ
হার দোলায়ে দোলায়ে, রাজপথ দিয়া,

চলি গেল নারী-সেনা ব্রজ-বিজয়িনী !

* * *

কভু কবি বিদ্যাপতি গীত গাহি বলে
সেই গীতি, শুনি যাহা, বিপদভঞ্জন,
চিরলজ্জা নিবারণ, শ্রীমধুসূদন,
করিলা বারণ কলসীর শতছিদ্র
শত হস্ত দিয়া, মরি অদৃশ্য হইয়া !
অপূর্ব্ব সতীর হ'ল কলঙ্কভঞ্জন !
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ, *
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুলশীল জাতি মান !
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন,
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন ॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়,
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ,
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ !
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি,
রাধার ধেয়ানে, পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি !

* * *

এইরূপে সারাদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আনন্দকাননে, মুগ্ধ বিদ্যাপতি কবি,
আইলা পাণ্ডার সহ, মধুর বৈকালে,
কেলিকদম্বের কুঞ্জে যমুনার ধারে !
কেলিকদম্বের কুঞ্জে যত তরু আছে
প্রতি কদম্বের মরি বাকলে বাকলে
লেখা আছে শ্রুতিমধু প্রেমের কাহিনী !
কবিরে, চতুর পাণ্ডা বিনায়ে বিনায়ে,
নানা ছন্দে, শুনাইল সে সব কাহিনী !
সর্ব্বশেষে এই চারু কদম্বের তলে,
যে স্থান এখন আছে পাষাণ-প্রতিমা,
কথায় কৌতুকরঙ্গে উপস্থিত দোঁহে !

* * *

চুপ্ ! চুপ ! ওই শোন ! একি গো ক্রন্দন ?
মৃদু মৃদু একি গুঞ্জরণ ! ভ্রমর গুঞ্জন,
একি ? মধুর অস্ফুট বীণার তারেতে
একি গো প্রেমের আলাপন ? কুতূহলী
পাণ্ডা, বিস্ময়-বিস্ফারনেত্রে, চাহিতেছে
চারিধার !—একি, একি, অদ্ভুত ব্যাপার !
সহসা তরুর বক্ষ হইল বিদার,
বল্কলের যবনিকা কে যেন সহসা
করে দিল অপসার ! তরুবক্ষমাঝে
একি রাজে ? নারীমূর্ত্তি ! উদ্ভিদ-দেবতা !
অদ্ভুত, অতুল্য রূপ, লাবণ্য-প্রতিমা !

* * *

ভয়ত্রস্ত পাণ্ডা, হেরি সে মোহিনী মূর্ত্তি,
ফেলি তথা মাথার পাগ্‌ড়ি ; ফেলি তথা
চির যতনের ধন, ভাঙ ঘুঁটিবার
সোঁটা, ব্যস্তে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, গেল পলাইয়া !

* * *

কোথা বিদ্যাপতি কবি ? অবাক্, স্তম্ভিত,
চরণদুখানি কিলবিদ্ধ ! লৌহ যথা
চুম্বকের তেজে, শ্যাম হিরণ্ময়ী কান্তি
তেমতি সে পল্লবের দুকূল-বসনা,

* চণ্ডীদাস হইতে উদ্ধৃত।

উদ্ভিদ-মূরতি নিরখি, বিমুগ্ধ, লুব্ধ
কবির, চরণে নাহি গতি !
অকস্মাৎ
বাহিরিল কবির সুমুখ হ'তে "অয়ি
বনদেবি, কে তুমি, কি তুমি ?"
নারী-মূর্ত্তি
উত্তরিল বীণার ঝঙ্কারে, কবি-চিত্ত
রোমাঞ্চিয়া, বিমোহিয়া "বন-দেবী নয়
এ অধীনী, আখ্যা মম কদম্ব-মোহিনী"
"কদম্বমোহিনী ?—কোন্ অলকায় ওগো
থাক তুমি হে যক্ষমোহিনি !"
মুচকিয়া
উত্তরিলা মরি, তরুবক্ষ নিবাসিনী
সুহাসিনী "আমি নহি যক্ষবধূ, আমি
নহি গন্ধর্ব্বের প্রিয়া। আমি একাকিনী
আজন্মকুমারী, এই কদম্বের গর্ভে
থাকি আমি, এই ভাবে, কি দিবা যামিনী,
—কাছে এস ; স্পর্শ বাহু"—
বিদ্যাপতি কবি
আনমনে, যেন গো স্বপনে, পরশিলা
ফুলের কাঁকণপরা, সুকোমল বাহু
বরাঙ্গীর ! একি গো পরশ ! কি যেন কি
বিদ্যুতের মত, অকস্মাৎ প্রবেশিয়া
কবির সুতনু মাঝে, সর্ব্বাঙ্গ করিল
বিকল বিবশ ! কি যেন কি অমৃতের
মত, সর্ব্বাঙ্গে ঢালিল বিহ্বল হরষ !
যেন কোন দেব-কন্যা পুলক-অলসে
ভরি দিল কবি তনু, ললাট অর্চ্চিয়া
হরিচন্দনের রসে ! মন্দাকিনী-জলে
অবগাহিয়া, অবাক্ হইয়া, যেন গো,
তীরে দাঁড়াইয়া, ভোলা কবি নিরখিলা
সৌরভ সৌন্দর্য্যে ভরা ইন্দ্রের অমরা !
যেন কবি মিথিলায়, নব বসন্তের
নব সমাগমে, নব মলয়াহিল্লোলে,
(যবে নবীন প্রেমিক, বসন্তের পিক,
ঢালি দেয় গীতধারা বধূর অঞ্চলে)
নব পল্লব মর্ম্মরে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
নব প্রেমের উন্মেষে, হৃদয়-স্পন্দনে,
করিলা অবগাহন বাসন্ত-নির্ঝরে !

* * *

রোমাঞ্চিত কলেবরে কহিলা সুকবি
"অয়ি দেবি ! আজন্ম, আজন্ম কাল হ'তে,
তুমি কি গো আছ বন্দী এই তরুমাঝে ?
হায় রে এ দশা কে করিল ? দগ্ধবিধি,
নিষ্ঠুর পাষাণ, তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে,
কোমল শিরিষপুষ্পে কেমনে বিঁধিল ?"
"নহি আমি আজন্মবন্দিনী—এই ব্রজে
ছিনু আমি গোপের নন্দিনী !"
"তারপর ?"
"তার পর একদিন আমার দুষ্কৃতি
এ দুর্গতি করিল আমার !"
"এ ছলনা
গোপাঙ্গনা কেন ? কেন এ দাসের সাথে ?
তোমার দুষ্কৃতি ? অকলঙ্ক হাস্য-মুখ
তব, কুন্দশুভ্রবদনের কান্তি, জ্যোতিঃ
লাবণ্যেতে কি প্রশান্তি ! তোমার দুষ্কৃতি ?
দর্পণে মূরতি যথা, স্বচ্ছ সরসীতে
(মিথিলার রাজোদ্যানে) কুঞ্জ-প্রতিবিম্ব
কুঞ্জ ব'লে হয় ভ্রান্তি, তেমতি তোমার
সরল হৃদয়, স্বচ্ছ অনাবিল দেহে,
আহা ওই অকলঙ্ক নয়ন-মুকুরে,
প্রতিভাত হয় ! দেবি তোমার দুষ্কৃতি ?
ওগো মনে নাহি হয়, তুমি করেছিলে
পাপ, কোনো অসময় !"

"রাধিকার সখী,
ছিনু আমি। জানেন অন্তরযামী হরি,
জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন, বাসিতাম
ভাল, কত যে রাধারে ! রাধাও দাসীরে
বাসিত গো প্রাণপণে ! কোথা ব্রজলীলা ?
কোথা ব্রজবালা ? এবে নিশার স্বপন !
আমি শুধু একমাত্র লক্ষযুগব্যাপী
চির-ম্রিয়মাণা, চির-মৃত্যুঞ্জয় সাক্ষী !
আজি কিন্তু ওগো কবি, হেরি তব মুখ,
জাগিয়াছে এ পরাণে পুরাতন সুখ !"
"তুমিও কি নহ দেবি, নিশার স্বপন ?
শঙ্কা হয় মনে, পাছে যাও মিলাইয়া,
সুখ-মরীচিকা সম, জল-বুদ্বুদের
সম, স্বপনের সম ! দাও একবার,
ভাল করি পরখিতে, দাও একবার,
ভাল করি পরশিতে, লাবণ্য-সম্ভার,
সুন্দর, অতনু-তনু, গোপিনি, তোমার !"
"হে কবি, কি স্পর্দ্ধা তব ! প্রথম আলাপে
প্রগল্ভ বাসনা তব একি এ তোমার !
বড়ই হাসির কথা !"
"কবির এ স্পর্দ্ধা
জগতে বিদিত। বুঝি দেবতার শাপে,
হয় সে সর্ব্বস্বহারা প্রথম আলাপে !
হে গোপি, তোমার ওই আলাপী বয়ান
করেছে আলাপী মোরে। সাজে না তোমারে
ছলনার ভাণ ; সখি, সাজে না আমারে !
আমি বুঝিয়াছি তব চিত ; মম চিত
বুঝিয়াছ তুমি ! অভিনব শ্যামকান্তি
হরিয়াছে মম ভ্রান্তি ; বুঝিতে কি বাকি
আছে আর ? আপনি দিয়াছ ধরা—
কেন আর তবে, আপনারে দাও ফাঁকি ?"
"আজি নহে, কালি !"
"গোপবালা, আজি নহে ?
কালি কেন ? শাস্তি দাও কোন অপরাধে ?"
"হে কবি, ক্ষম গো মোরে। কালি সন্ধ্যাকালে
শুনিবে কাহিনী যবে, বুঝিতে পারিবে
আমার এ আকিঞ্চন নহে বঞ্চনার !"
"কদম্ব-কাহিনী তব কদম্ব-মোহিনি !
শুনাবে না আজি তবে ?"
"আজি নহে—কালি"
"আজির কি পক্ষ আছে ? বিহঙ্গের মত
সে কি উড়ি যাবে ? যুগযুগান্তের মত
সে যে গুরুভার হয়ে, চাপিয়া বসিবে
বক্ষের উপরি !"
"ওই শোন শঙ্খধ্বনি
আরতির ; ওই শোন যমুনার ঘাটে
দেবের মন্দিরে স্তুতিপাঠ ; আজি মম
সমাপ্ত হইবে উদ্ভিদ-জীবন ; কালি
শাপ-অবসানে, হইবে তোমার সহ
দেখা, যমুনা-পুলিনে ; নিভৃতে নিকুঞ্জে
তথা, হে কবি, পূরাব তব মনোবাঞ্ছা !
নিবেদিব সর্ব্ব কথা তোমার চরণে,
অপরূপ অদভুত কদম্ব-কাহিনী !
এই দেখ ধীরে ধীরে কদম্ব-বাকল
ঘিরিছে আমারে ; হের, ভগ্ন এ ফাটল
হয়ে গেল লগ্ন !—কালি পুনঃ হবে দেখা ;
আজি যাও প্রিয় সখা, বিদায়, বিদায় !"
এত বলি সবিষাদে উদ্ভিদ-দেবতা,
তরুবক্ষনিবাসিনী কদম্বমোহিনী
অদৃশ্য হইলা। ক্ষিপ্ত বিদ্যাপতি কবি
দুই বাহু পশারিলা, আলিঙ্গিয়া আহা
ধরিয়া রাখিতে ! আঘাত পাইল বাহু
তরুত্বক-স্পর্শে ! হর্ষ-হারা সন্ধ্যা-বায়ু
চঞ্চল হইল ; সন্ধ্যা করুণে কাঁদিল

ঝিল্লি-ছলে.; নিশীথিনী, সতত কাতরা
পরদুঃখে, আঁখি-প্রান্তে অঞ্চল টানিল;
কাতরে শিশির-অশ্রু নীরবে মুছিল!

*   *   *

হে কবি, বিষণ্ণ কেন? তুমি কি জাননা
এ জগতে এমনিই মিলনের রীতি?
অনুরাগ-প্রীতি পুড়ে হ'ত খাক্, যদি
পলে পলে জাগাইতে মিলন-অনলে
না থাকিত বিশ্বে বিরহ-ইন্ধন! বল,
কে গাইত মিলন-সঙ্গীত? ম্লান ওষ্ঠ
কাঁপিয়া উঠিত থর থর করি, কণ্ঠ
পরিশুষ্ক হ'ত, যদি বিরহের ছন্দে
না হ'ত গ্রথিত সে সঙ্গীত! গাও
তবে, গাও কবি, কণ্ঠ ছাড়ি (সারানিশি
যমুনাপুলিনে বসি, মোহিনী রূপসী
গাঁথিছে তোমার লাগি বনমালা!) গাও
বিশ্ববিমোহিনী গীতি, সারা বঙ্গ যাহে
আনন্দ তরঙ্গে ভাসে হয়ে মাতোয়ারা!

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল। *
মেঘমালা সঞে   তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচরে খসি   আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি   আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা   কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন   জনু বুঝি ঐছন
পাশ পসারল কাম॥
দশনমুকুতাপাঁতি   অধর মিলায়তি
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা

(ক্রমশঃ)

অথর্ব্ব বেদের সময়।

হিন্দুদের চারি বেদ আছে ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইহার মধ্যে অথর্ব্ব বেদ সকল বেদের পরবর্ত্তী। ইহা ত্রয়ীর মধ্যে গণ্য হয় নাই। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল ৯০ সূক্ত ৯ম ঋকে অন্য বেদের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু অথর্ব্বের কোন উল্লেখ নাই—

তস্মাদ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচাঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বভক্ষী যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম ছন্দ ও যজু ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইল। বেদত্রয়ের পাদচারী মনুসংহিতার সঙ্কলিতাও সেইমত প্রকাশ করিয়াছেন—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ংব্রহ্ম সনাতনং
দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং॥ ১ অধ্যায় ২৩

স্বয়ম্ভু যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অগ্নি বায়ু রবি হইতে ক্রমান্বয়ে ঋক্ যজুঃ ও সামরূপ বেদত্রয় দোহন করিলেন। অর্থাৎ "ভূ"র সার পদার্থ অগ্নি হইতে ঋক্, "ভুব"র সারাংশ বায়ু বা

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

অন্তরীক্ষ হইতে যজুঃ, এবং "স্ব" অর্থাৎ আকাশের সার সূর্য্য হইতে সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্‌সাম ও বাজসনেয়ীসংহিতায় অথর্ব্ব ঋষির উল্লেখ ও প্রশংসা আছে—

যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ প্রথস্ততে।
ইমংতুত্যমথর্ব্ববদগ্নিং মথন্তি বেধসঃ।

অথর্ব্ব ঋষি সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অথর্ব্ব ঋষি সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহারই বংশধরগণ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন এবং ঔদ্ধত্যও অবিনয়তা প্রযুক্ত স্বীয় বেদের গুণগান ও শ্রেষ্ঠতা এবং অন্য বেদত্রয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন—

ঋচঃসামানিছন্দাংসি পুরাণং যজুসাসহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবিদেবাদিবিশ্রিতঃ॥
যস্মাদ্‌ঋচো অপাতক্ষণ্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্যলোমানি অথর্ব্বাঙ্গিরসোমুখং।
স্কম্ভংতংব্রূহিকতম স্বিদেব সঃ। ১০ কাণ্ড ৭ ক্ত ২০

বহ্বৃচোহন্তি বৈরাষ্ট্রং অধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছান্দোগো নাশয়েদ্ধনং তস্মাদথর্ব্বনো গুরুঃ॥
অথর্ব্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরা॥
ব্রহ্মা শময়েন্ নাধ্বর্য্যু ন ছন্দোগো ন বহ্বৃচঃ।
রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাতস্মাদথর্ব্ববিৎ॥ ইত্যাদি অথর্ব্বপরিশিষ্ট।

ভাবার্থ—ঋক্, সাম, ছন্দ, পুরাণ, যজুঃ এবং দেবগণ সকলেই উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। যাঁহা হইতে ঋগ্ যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সাম যাঁহার লোমমাত্র ও অথর্ব্বাঙ্গিরস মুখ- সেই জগদাধার স্কম্ভ কে? তাহা বল। ঋগ্বেদীয় গুরু রাজ্যনাশ যজুর্ব্বেদীয় গুরু পুত্রনাশ এবং সামবেদীয় গুরু ধননাশ করেন অতএব অথর্ব্ববেদীয় গুরুকেই বরণ করা উচিত। অথর্ব্বা যজ্ঞরক্ষা করেন সুতরাং তিনি যজ্ঞকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা অর্থাৎ অথর্ব্ববেদীয় পুরোহিত বিঘ্নের শান্তি করেন, রাক্ষস হইতে যজ্ঞরক্ষা করেন কিন্তু অন্য বেদীয় পুরোহিতগণ তাহা পারেন না। শান্তিপুষ্টি ও অভিচারাদি কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মা পুরোহিতের সাহায্য লওয়া হইত কিন্তু যজ্ঞের অন্য কার্য্যে তাঁহার আবশ্যক হইত না ইহাতেই ঈর্ষান্বিত পরবর্ত্তী বংশধরগণ অন্য বেদের নিন্দা করিয়া স্বীয় বেদের প্রশংসা করিয়াছেন, তত্রাপি হিন্দুগণ চিরাগত যজ্ঞপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন না, প্রত্যুত পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ীর অখ্যাতিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—

ঋচঃপঠন্ মধুপয়ঃ কুল্যাভিস্তর্পয়েৎ সুরান।
ঘৃতামৃতৌঘকুল্যাভি র্যজুংষ্যপি পঠন্‌সদা॥

সামান্যপি পঠন্ সোমঘৃতকুল্যাভিরন্বহং।
মেদঃ কুল্যাভিরপিচ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন॥ কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য।

অথাৎ অথর্ব্ববেদ পাঠ করাওয়া আর দেবতার বসা (চর্ব্বী) দ্বারা তর্পণ করাও তাই। যাহা হউক এই সময়েই অথর্ব্ববেদ পর্য্যায়ে আরোহণ করিয়া বেদের ত্রয়ীত্বকে চতুষ্কে পরিণত করিয়াছে।

অধ্যাপক Max Muller বলিয়াছেন * বেদাধ্যায়নে দুইটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। ইহাদ্বারা এককালেই জগৎ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। জগতের ইতিহাসে ভাষা সম্বন্ধে যে অভাবটী রহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাধ বেদদ্বারাই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মানরজাতির যে সময়ের ইতিহাস আমরা কোথাও পাই না, সে সময়ের ইতিহাসের জন্য আমরা ঋগ্বেদের নিকট ঋণী। এই ঋগ্বেদই রূপকচ্ছলে নক্ষত্রাবস্থানগুলিও প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন না করিলে তাহা হইতে সময় নিরূপণে কোন সাহায্যই পাওয়া যাইবে না। অতএব তাহা হইতে এখন নিরস্ত হওয়া উচিত—শেষে তাহার বিচার করিব।

অথর্ব্ববেদ নক্ষত্রাবস্থানগুলি স্পষ্টভাবে লিখিয়া গিয়াছে সুতরাং তাহার সময় নিরূপণে তাদৃশ কষ্ট ও মস্তক চালনা করিতে হইবে না। ইহারই রচনা মনুসংহিতা ও রামায়ণ মহাভারতাদির রচনা হইতে বিভিন্ন—ঋগ্বেদের রচনার সহিত তুলনার ত কথাই নাই। বহুকালাগত প্রযুক্ত আমরা বলি বেদ অপৌরুষেয় বা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—বেদ, ধ্যাননিরত ঈশ্বরে বা তাঁহার প্রাকৃতিক জ্যোতিতে তন্ময়চিত্ত ঋষিগণের ভক্তি প্রার্থনা ও আনন্দাদি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা অভিব্যক্তিমাত্র কিন্তু তাহা হইলেও বিসদৃশ বা প্রলাপোক্তি নহে এই কারণেই বেদের এত সম্মাননা ও সমাদর। অপিচ বেদ এক সময়ে রচিতও হয় নাই ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঋষিগণের রচনায় পূর্ণ কিন্তু তাঁহারা এত পুরাকালের যে পরবর্ত্তী কালের রচনা আরণ্যক ব্রাহ্মণ ও সংহিতাগুলি যাহা কালে বেদের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেগুলির নিকটও বেদের কোন কোন স্থানের অর্থ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অতএব বেদের সময় নিরূপণে মনের স্থিরতাই প্রধান সহায়;—

অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডে ৭ম সূক্তে নক্ষত্রাবস্থান নিম্নপ্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে।

চিত্রাণিসাকং দিবি রোচনানি।
সরীসৃপানি ভুবনে জবানি। †

* History of Ancient Sanskrit Literature P. 63.

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা বলিয়া থাকি যে মিসর ও কাল্‌ডীয় দেশেই চিত্রাক্ষর (hieroglyphics)গুলি প্রচলিত থাকায় রাশিচক্রের কল্পনাও তদ্দেশপ্রসূত। ভারতবর্ষরাশিচক্রের আবিষ্কারক কি না সে সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে বেদের কোন স্থানেই উহার উল্লেখ নাই অতএব তাহা এখানে উদ্ভূত হয় কি না তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১৪০০ বৎসরের পরে কোন সময়ে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে রাশি শব্দের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যাহা হউক আর্য্যগণও আকাশে জীবজন্তু ও প্রাকৃত বস্তুর চিত্র দেখিতে পাইতেন—

অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো।
অহানিগীভিঃ সপর্য্যামি নাকং॥ ১
সুহবং মে কৃত্তিকা রোহিণীচ
অস্তুভদ্রং মৃগশিরঃ শমাদ্রা।
পুনর্বসূঃ সুনৃতা চারুপুষ্যো।
ভানুরশ্লেষা অয়নং মঘামে॥ ২
পুণ্যং পূর্ব্বফল্গুন্যৌ চাত্রহস্তঃ।
চিত্রাশিবা স্বাতিঃ সুখোমেঅস্তু।
রাধো বিশাখে সুহবানুরাধা।
জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলং॥ ৩
অন্নং পূর্ব্বারাসন্তাংমে অষাঢ়া।
উর্জং যে হ্যুত্তর আবহন্তু।
অভিজিন্মে বাসন্তাং পুণ্যমেব
শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠা কুর্ব্বতাং সুপুষ্টিং॥ ৪

শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সম্বৎসর।
ইদমদ্যা ব্যখ্যত ॥ ঋ ১।১৬১।১৩
যৌ তৌ শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথীরক্ষী ঋ ১০।১৪।১১
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিবঃ ইন্দ্রোদবর্ত্তয়ঃ। ঋ ৮।১৪।১৩

এগুলি দ্বারা কুকুর বা মৃগব্যাধ (Canis Major or Serms and Minor or Procyon) ও মৃগ or Orion বুঝাইতেছে। অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাদি নক্ষত্রেও একটী না একটী আকার কল্পনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য Orionকে কিরাৎরূপী রুদ্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার মস্তক আদ্রানক্ষত্রে; তিনটী মধ্যস্থিত নক্ষত্রে তাঁহার কটিবন্ধ, মৃগশিরা তাঁহার গদার শীর্ষদেশ কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের একপাঠমতে আদ্রা রুদ্রের শিরোদেশ; তিনি মৃগ বা মৃগশিরাকে হস্তে ধারণ করিয়া আছেন—এই কারণেই শিবের ধ্যানে—"পরশু মৃগবরাভীতিহস্তংপ্রসন্নং" ইত্যাদি বচন দেখিতে পাই এবং পাঠান্তর মতে মৃগব্যাধই রুদ্র বলিয়া বোধ হয়েন, আর রুদ্রের একাদশ নামের অন্যতমটী মৃগব্যাধও বটে (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই কারণেই মহিম্নস্তোত্রে মৃগরূপী প্রজাপতির পশ্চাৎ রুদ্ররূপী মৃগব্যাধের ধাবনব্যাপার বর্ণিত দৃষ্ট হয়।

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং।
গতং রোহিদ্ভূতাং বিরময়িষুমৃষ্যস্তবপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রা কৃতমমুং।
ত্রসন্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধ রভসঃ॥
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগোভূত্বাসপাবকঃ॥ ১৩
সতু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্যব্যরাজত।
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠিরনমস্তলে॥ ১৪ মহাভারত সৌপ্ত ১৮ অধ্যায়
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনং॥ শকুন্তলা

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে ভারতীয়গণও চিত্রদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Cunningham সাহেব সংস্কৃত বর্ণমালায় সে ভাবের পরিস্ফুটন প্রদর্শন করিয়াছেন—যেমন থ অর্থে সূর্য্য; ইহার আকার পালিভাষায় (যাহা পুরাতন দেবনাগর বা সংস্কৃত অক্ষর) বৃত্তমধ্যে বিন্দুরূপে কল্পিত হইয়াছে। অর্দ্ধবৃত্তে বা 'গ'য়ে গগণ বোঝায় ইত্যাদি। তাঁহার Inscription of India vol. I. দেখিলে পাঠকবর্গ পালি অক্ষরের অর্থ জানিতে পারিবেন।

আমে মহচ্ছতভিষ গ্বরীয়।
আমে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম্ম।
আরেবতীচাশ্চযুজৌ ভ্যাংমে।
আমে রয়িংভরণ্যঃ আবহন্তু ॥ ৫

ভাবার্থ—আকাশে নানাপ্রকার মনোহর গতিশীল সরীসৃপ দৃষ্ট হয়; তাহারাই অষ্টবিংশরূপে আকাশে অহোরাত্রমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে সম্বৎসরের মধ্যে তাহারা উদিত হইয়া আমাদের ঐশ্বর্য্য মঙ্গল ধন ধান্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। উপরিলিখিত অংশে আমাদের সময় নির্দ্ধারণ পক্ষে চারিটী নক্ষত্রাবস্থানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতেছি।

১ম—"সুহবং মে কৃত্তিকারোহিণীচ" অর্থাৎ যজ্ঞের পক্ষে কৃত্তিকা ও রোহিণী প্রশস্ত।

২য়—"অয়নং মঘামে" অর্থাৎ মঘায় অয়ন পরিবর্ত্তন ঘটিত।

৩য়—"সুহবানুরাধা" অর্থাৎ অনুরাধাও যজ্ঞের পক্ষে প্রশস্ত।

৪র্থ—"আমে মহচ্ছতভিষ গ্বরীয়" অর্থাৎ শতভিষার সীমাই শ্রেষ্ঠ অথবা সেই সময়েই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

বসন্ত ঋতুর ক্রান্তিপাত যজ্ঞের আরম্ভ সময়; সুতরাং সত্র বা যজ্ঞ বিষুবান্ দ্বারা শরদৃতুতে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ এস্থানে অনুরাধায় শরদৃতুর ক্রান্তিপাত সংঘটিত হইতেছে। যখন বসন্তের যজ্ঞারম্ভ সম্বন্ধে দুই নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতেছি তখন ইহা ত নিশ্চয় যে দুই নক্ষত্রে এক সময়ে ক্রান্তিপাত অবস্থান করিতে পারে না, তবে এ প্রকার হইবার অর্থ আছে—ক্রান্তিপাত রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কৃত্তিকাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল—অর্থাৎ রাশিচক্র সম্বন্ধে কৃত্তিকার ভোগাংশ ৪০ অংশে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। এই কয়টী নক্ষত্রাবস্থানের মধ্যম অংশ ধরিলে জানা যায় ক্রান্তিপাত মেষের আরম্ভ বা নিরংশ স্থান হইতে ৪৬ অংশ ৪০ কলা পশ্চিমে ছিল। ইহা দ্বারা যদিও অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলন কাল (৭২ × ৬২/৩) ৪৮০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে তত্রাপি আমরা কৃত্তিকার ভোগাংশ ৪০ ধরিয়াই গণনা করিব, যে হেতু নক্ষত্রের আদিতে কৃত্তিকারই নাম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব নিরংশ স্থান হইতে অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলন কাল (৪০ × ৭২) ২৮০০ বৎসর হইতেছে। আমাদের মতে নিরংশকাল ২৮৪ খৃষ্টাব্দ (হিন্দুজ্যোতিষীগণের বিবরণ, ভারতী ভাদ্র ১৩০০ দ্রষ্টব্য) নিরূপিত হইয়াছে সুতরাং অথর্ব্ব বেদ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ২৫১৬ বৎসরে অথবা ৩০০০ ও ২৫১৬ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়। Weber, Bentley আদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৪০০০ বৎসররূপ আসন প্রদান করিতে বড় নারাজ। তাঁহাদের ত্রিকোণমিতি সাধিত গণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বেদরচনা খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১৪২৬ বৎসরের পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না। পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন যে আমরা অথর্ব্ব বেদের যে অংশের প্রমাণবলে তাহার সঙ্কলনকাল নিরূপিত করিয়াছি, তাহাই অবলম্বন করিয়া Bentely উপরিউক্ত কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কে যথার্থ সময় নিরূপণ করিয়াছে তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। যাঁহাদের

মূলেই কুসংস্কার রহিয়াছে, তাঁহারা প্রমাণসত্বেও বেদের প্রাপ্য প্রাচীনতা স্বীকার করিতে বড় কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে এক বাইবেলই জগতের প্রাচীন গ্রন্থ। রচনার অর্ব্বাচীনতা যেমন প্রাচীনতার, প্রবীণতা তেমনি আধুনিকতার নির্ণায়ক নহে; ইহা স্মরণ রাখিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বাইবেল ও বেদ তুলনা সময়ে কখন প্রমাদের বশীভূত হইবেন না কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সে বিষয়ে বড় মনোযোগী নহেন। হিন্দুগণের চিন্তা ক্রমিক উদার হইতে উদারতর ভাব ধারণ করিয়াছে—প্রকৃতির অনুশীলন হইতে ক্রমে পরম ব্রহ্মের উপাসনায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, ঋগ্বেদ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের সৃষ্টিবর্ণন পাঠ করিলে তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। আর বাইবেলের সৃষ্টিবর্ণন পাঠ করুন। অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। ইহাতে ইহুদিগণ স্বীয় অনুদারতা ও ঈর্ষা ঈশ্বরেও আরোপিত করিয়াছে কিন্তু মুখে বলিতেছে পুত্তল পূজা করিও না।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ।

তৈত্তীরীয় সংহিতা ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে দীক্ষেচ্ছুক সম্বৎসরান্তে "একাষ্টকায়" দীক্ষিত হইবেন। ইহা সম্বৎসরের পত্নী ও তাহার প্রথম রাত্রি কিন্তু এসময় দীক্ষিত হইলে একটী অসুবিধা আছে অর্থাৎ তখন "আর্ত্ত" কাল "অনাবৃতু" হইয়া থাকে এবং জল বড় অপ্রিয় বোধ হয়। অতএব সম্বৎসরের আদি ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে দীক্ষিত হও; কিন্তু ইহার একটী অসুবিধা এই যে "বিষুবান্" বর্ষাকালে গিয়া পড়ে। অতএব সম্বৎসরের আদি চিত্রাপূর্ণমাসীতে দীক্ষিত হও; ইহাতে কোন অসুবিধা নাই।

"সম্বৎসরায় দীক্ষিষ্যমানা একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্নেষাবৈ সম্বৎসরস্য পত্নী যদ্দেকাষ্ট
"কৈতস্যাং বা এষ এতাং রাত্রিং বসতি সাক্ষাদেব তং সম্বৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে। আর্ত্তং বা
"এতে সম্বৎসরাভি দীক্ষন্তে যেন্তে নামানাবৃতু অভিদীক্ষন্তে। ব্যস্তং (বিচ্ছিন্নং) বা এতে
সম্বৎসরস্যাভিদীক্ষন্তে য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তেহন্তনামানাবৃতু ভবতঃ। তস্য সা নির্য্যা
যদপোহ
"নভিনন্দতোহভ্যবয়ন্তি। তস্মাদে কাষ্টকয়াং ন দীক্ষ্যম্
"ফাল্গুণী পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্; মুখঃ বা এতৎসম্বৎসরস্য যৎফাল্গুণী ... ...।
"তস্য সা (একৈব) নির্য্যা যৎসম্মেঘে বিষুবান্ সম্পদ্যতে।
"চিত্রা পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখং (চক্ষুঃ) বা এতৎসম্বৎসরস্য যচ্চিত্রাপূর্ণমাসো ...।
"তস্যন নির্য্যাস্তি ... ...।

উপরিলিখিত অংশ দ্বারা আমরা অবগত হইতেছি যে উত্তরায়ণে দীক্ষিত হইতে হইত তখন শীতকাল ঋতু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যথা "আর্ত্তা যস্মিন্‌কালে ভবন্তিস আর্ত্তঃকালঃ শীতেনচ আর্ত্তা ভবন্তি।" অয়ন পরিবৃত্তি ব্যস্তশব্দেনোচ্যতে" ইতি শবরঃ

ইহা এবং পরবর্ত্তী প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে উত্তরায়ণ 'মাঘী পৌর্ণমাসী'তে আরম্ভ হইত যে হেতু—১মতঃ দীক্ষার অনুপযুক্ততা নির্দ্দেশ করিবার পরেই ফাল্গুনীর উল্লেখ আছে।

২য়তঃ ফাল্গুনীতে দীক্ষার আরম্ভ করিলে বিষুবান্ ভরপুর বর্ষায় গিয়া পড়ে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষে বিষুবান্ সংঘটিত হয়। ইহা ছাড়া লৌগাক্ষী একস্থানে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে "মাঘীপূর্ণমাসীর চারি দিবস পূর্ব্বে দীক্ষিত হইবে"—"মাঘ্যাঃ পৌর্ণমাস্যাশ্চতুরহঃ পুরস্তাৎ সম্বৎসরায় দীক্ষন্তে।"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—"কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীত—মুখং বা এতন্নক্ষত্রানাং যৎকৃত্তিকাঃ" "মুখং বা এতদৃতূনাং যদ্বসন্তঃ। দেবগৃহাবৈনক্ষত্রাণি। কৃত্তিকাঃ প্রথমং বিশাখে উত্তমং "তানি দেবনক্ষত্রাণি। অনুরাধা প্রথমং। অপভরণীরুত্তমং। তানি যমনক্ষত্রাণি। যানিদেব "নক্ষত্রাণি তানি দক্ষিণে পরিচন্তি। যানি যমনক্ষত্রানি তান্যুত্তরেণ।"

নক্ষত্রের আদি কৃত্তিকায় অগ্নি স্থাপন করিবে এবং তাহা ঋতুর আদি বসন্তেই করা উচিত। নক্ষত্রগুলি দেবতার গৃহ, ইহাতে কৃত্তিকা হইতে বিশাখাবধি দেবনক্ষত্র, তাহার সীমা দক্ষিণে। অনুরাধা হইতে অপভরিণী পর্য্যন্ত যমনক্ষত্র; তাহার সীমা উত্তরে। এই উত্তর দক্ষিণ সীমা দ্বারা উত্তরায়ণও দক্ষিনায়ণ বুঝায় না। কিন্তু ইহা দ্বারা দেবযান বা দেবলোক এবং পিতৃযান বা পিতৃলোক বুঝায়। ক্রান্তিপাতের উত্তরাংশে দেবযান এবং দক্ষিণাংশে পিতৃযান। "বসন্ত গ্রীষ্মোবর্ষা তে দেবাঋতবঃ শরদ্ধেমন্ত শিশিরস্তে পিতরঃ........। সযত্র উদগাবর্ত্ততে দেবেষু তর্হিভবতি দেবাংস্তর্হ্যভি গোপায়তি অথ যত্র দক্ষিণাবর্ত্ততে পিতৃযুতর্হিভবতিপিতৃন্ তর্হ্যভি-গোপায়তি।......ষণ্মাসানুদঙ্গাদিত্য এতি মাসেভ্যোদেবলোকং......।......ষণ্মাসান্ দক্ষিণা-দিত্য এতিমাসেভ্যঃ পিতৃলোকং।"

অতএব দেখিতেছি যখন সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমনাগমন করেন, তখন দেবযান বা দেবলোক হয় এবং যখন দক্ষিণদিকে গমনাগমন করেন, তখন পিতৃযান হয়।

উপরিলিখিত অংশগুলি বিচার করিয়া দেখিলে আমরা নিম্নরূপ নক্ষত্রাবস্থানগুলি প্রাপ্ত হইতেছি

১ম কৃত্তিকাতে বসন্তের ক্রান্তিপাত হইত।

২য় মঘাপূর্ণমাসীতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইত।

সুতরাং দেখিতেছি যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সঙ্কলনকাল অথর্ব্ব বেদের সমসাময়িক হইতেছে; তবে এইমাত্র প্রভেদ যে অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলনকালে ক্রান্তিপাত রোহিণী হইতে কৃত্তিকায় অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু সংহিতাদির সময়ে তাহা কৃত্তিকায় ছিল, অপিচ অনুরাধায় ক্রান্তিপাত না হইয়া বিশাখার শেষে হইত (অন্ততঃ ঋষিগণের সহজ দৃষ্টিতে তাহাই বোধ হইত) সুতরাং যদি আমরা ক্রান্তিপাতের অবস্থান ৪০ অংশে না রাখিয়া কৃত্তিকার যোগ তারা ৩৭ অংশে রাখি, তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকে; অতএব সংহিতা ব্রাহ্মণাদির রচনা সময়ে ক্রান্তিপাত ৩৭ অংশ পশ্চিমে ছিল অর্থাৎ সেগুলি খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ২৩৮০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

একাদশ অধ্যায়।

সন্ধির পরিণাম!

সন্ধি সংস্থাপিত হইল;—কিন্তু ইংরাজের মনের গোল মিটিল না। সিরাজদ্দৌলা মিত্রতাবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য ক্লাইব, ওয়াট্‌সন্ এবং ড্রেক সাহেবকে যথাযোগ্য "সিরোপা" পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই শিরোপা গ্রহণ করিলেন, ওয়াট্‌সন্ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে,—তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা; সিরাজদ্দৌলার নিকট শিরোপা লইয়া অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না!*

আলিনগরের সন্ধি-সূত্রে ইংরাজের অপমান হইল বলিয়া ইংরাজমাত্রেই ক্লাইবের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; যাঁহারা প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সময় পাইয়া তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চকণ্ঠে ক্লাইবকে ভীরু কাপুরুষ ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্বোধনে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন! ইহা হইতেই হয়ত ওয়াট্‌সন্ বুঝিয়াছিলেন যে আলিনগরের সন্ধিপত্র বড় অধিকদিন সমাদরলাভ করিবে না; সুতরাং তিনি বোধ হয় "নিমক্‌-হারামী" করিবেন না বলিয়াই শিরোপা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন;—"এইসময়ে তাঁহার সেনাবল কেবল দুই সহস্রমাত্র; ফরাসিরা নবাবের পক্ষভুক্ত হইলে সহজেই ইংরাজের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইত। কেবল বীরহৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইলে, তিনিও সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেন না;—কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া বাণিজ্যরক্ষার জন্যই তাঁহাকে এরূপ (অপমানসূচক) সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইতে হইয়াছিল।" †

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে;—এখন কোনরূপে ফরাসিদিগকে চিরনির্ব্বাসিত করাই ইংরাজদিগের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সিরাজদ্দৌলা এই প্রস্তাবে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন! ইহাই কি শান্তিপিপাসার পরিচয়? এখনও এক সপ্তাহ অতীত হয় নাই,—ইহার মধ্যেই আবার যুদ্ধ? তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজের ন্যায়

* পলাসির যুদ্ধাবসানে মীরজাফর যখন 'শিরোপা' পাঠাইয়া দেন, তখন কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ওয়াট্‌সন্ সাহেবের কোনরূপ ইতস্ততের পরিচয় পাওয়া যায় নাই; বরং তিনি সহস্তে মীরজাফরকে লিখিয়া গিয়াছেন যে;—Mirza Jaffier Beg, whom you have done me the honor to depute to me, has delivered me your letter, and *other marks of friendship*, with which you have been pleased to favor me.—Ive's Journal.

† Clive's Evidence.

ফরাসিরাও নবাবের পদাশ্রিত ফিরিঙ্গি বণিক্,—তিনি কিছুতেই আশ্রিতের সর্ব্বনাশসাধনের সহায়তা করিবেন না। ইংরাজেরা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করায়, সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্তহৃদয়ে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অগ্রদ্বীপে আসিয়া সিরাজদ্দৌলা সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির অবসর পাইয়া ইংরাজেরা আবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং সঙ্গীণস্কন্ধে চন্দননগর লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করিতেছেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব তাঁহার সঙ্গেই মুরশিদাবাদে যাইতেছিলেন;—তিনি এ সকল কথা একেবারে অস্বীকার করিবার জন্য বিবিধ বিধানে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধে বণিকরাজ উমাচরণ আসিয়া সিরাজদ্দৌলার সমক্ষে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে,—"ইংরাজেরা কখনও সন্ধিভঙ্গ করিবে না, তাহাদের মত সত্যপ্রিয় জাতি ভূভারতে আর নাই, তাহাদের যে কথা সেই কাজ।"* ঈশ্বরের নামে ধর্ম্মশপথের বলে সিরাজদ্দৌলাও বশীভূত হইলেন। তথাপি তিনি ইংরাজদিগকে সাবধান করিবার জন্য ওয়াট্‌স্‌ন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—

"সমুদায় কলহ বিবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্যই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিলাম। আপনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এ দেশে আর যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিবেন না। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, আপনারা বুঝি হুগলীর নিকটস্থ ফরাসিকুঠি আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন। আমার রাজ্যে আবার কলহ সৃষ্টির আয়োজন করিতেছেন কেন? ইহা ত সকল দেশেরই সুনীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার! তৈমূরলঙ্গের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গিরা ত এদেশে পরস্পরের মধ্যে কোন দিনই যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিতে পারেন নাই? আপনারা রণোন্মুখ হইয়া থাকিলে, আমি আর কি করিব? বাদশাহের কর্ত্তব্যপালন ও সম্মানরক্ষার জন্য আমাকে অগত্যা সসৈন্যে ফরাসিপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এই ত সেদিন সন্ধি করিয়াছেন,—ইহারই মধ্যে আবার যুদ্ধ? মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুকাল শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল; কিন্তু যেদিন সন্ধি করিল, সে দিন হইতে আর কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে নাই; ভবিষ্যতেও করিবে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মশপথ পূর্ব্বক সন্ধিসংস্থাপন করতঃ জানিয়া শুনিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করা বড়ই গুরুতর অপরাধ। আপনারা সন্ধি করিরাছেন, সন্ধিপালন করিতেই বাধ্য। সাবধান! যেন আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ উপস্থিত না হয়;—আমি যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে।"†

পত্র লিখিয়াই সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না,—তিনি প্রজারক্ষার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের অধীনে হুগলীতে, অগ্রদ্বীপে এবং পলাসীতে সেনাসমাবেশ করিয়া রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন।

রাজধানীতে আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজেরা সসৈন্যে চন্দননগর আক্রমণ করাই স্থির করিয়াছেন! তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সিরাজদ্দৌলা পুনরায় ওয়াট্‌স্‌ন্‌কে লিখিলেন ঃ—

* Orme, vol. II.

† মূলপত্র কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না;—ইংরাজেরা এই সকল পত্রের যে ইংরাজি অনুবাদ করাইয়াছিলেন, তাহা Ive's Journal নামক পুরাতন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। সিরাজচরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পত্রগুলি আদ্যন্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

"গত কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনার হস্তগত হইয়াছে। সেই পত্র লিখিবার পরেই ফরাসিদিগের উকীলের নিকট অবগত হইলাম যে,—আপনারা নাকি চারি পাঁচ খানি অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ আনাইয়াছেন, এবং আরও আনাইবার চেষ্টায় আছেন। ইহাও শুনিলাম যে আপনারা চন্দননগর ধ্বংস করিয়াই নিরস্ত হইবেন না, বর্ষাশেষে সসৈন্যে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্তও শুভাগমন করিবেন। ইহা কি বীরোচিত অথবা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার? সন্ধিপালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাহাজগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। এই ত সেদিন সন্ধি করিলেন! এত অল্পদিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি? মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাইবেল নাই,—কিন্তু তাহারা ত সন্ধিলঙ্ঘন করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—সহসা বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ হয়,—বাইবেলের ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া, পরমেশ্বর এবং যীশুখৃষ্টের দোয়াই দিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছেন, অথচ কার্য্যকালে তাহা পালন করিতে পারিতেছেন না!"*

এই পত্রখানি যেরূপ শ্লেষাত্মক, সেইরূপ সুতীব্র ভাষায় লিখিত। বোধ হয় পত্র পড়িয়া ইংরাজদিগেরও চক্ষুলজ্জা হইয়াছিল। তাঁহারা নবাবের অনুমতি না লইয়া বাহুবলে চন্দননগর আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ওয়াট্‌স্‌ন্ অনন্যোপায় হইয়া নূতন এক ধূয়া ধরিয়া প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলেন ঃ—

"আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্র অদ্য ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হস্তগত হইল। পত্রপাঠে জানিতে পারিলাম যে, ফরাসিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা আপনার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে আপনি যে এতদূর অসন্তুষ্ট হইবেন, এ কথা জানিতে পারিলে আমরা আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিবার আয়োজন করিতাম না। ফরাসিরা সন্ধি-সংস্থাপন করিলে আমরা আর যুদ্ধ করিতে চাহি না; কিন্তু তাহারা সন্ধি করিলেই ছাড়িব না, সুবাদারস্বরূপ আপনাকে তাহার জামিন থাকিতে হইবে। পৃথিবীতে আমাদের মত সত্যপরায়ণ লোক যে আর কোন দেশে নাই, তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নাই। আমি আপনাকে সত্যশপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা কিছুতেই সত্যলঙ্ঘন করিব না। প্রভু যীশু খৃষ্ট এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আবার বলিতেছি যে, আপনি যদি ফরাসিদের সঙ্গে সন্ধি করাইয়া দেন, তবে আর কিছুতেই আমরা সত্যভঙ্গ করিব না।"†

ওয়াট্‌স্‌নের প্রত্যুত্তর পাইয়া সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—তথাস্তু। তিনি কলহপ্রিয় চঞ্চল যুবক হইলে, এই উপলক্ষে ইংরাজকে বিলক্ষণ দশকথা শুনাইয়া দিতে পারিতেন; বলিতে পারিতেন, ফরাসির সঙ্গে তোমাদিগের সন্ধি হয় হউক, না হয় না হউক, তাহার সঙ্গে আমার সংস্রব কি? আমার অধিকারে আর কলহ বিবাদ করিবে না বলিয়া সেদিন যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছ, তাহার সহিত ফরাসিদিগের সম্বন্ধ কি? কিন্তু সিরাজদ্দৌলা এ সকল কূটতর্ক উপস্থিত না করিয়া অম্লান-বদনে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—

"ফরাসিযুদ্ধ সংক্রান্ত পত্র পাইয়া তন্মর্ম্ম জ্ঞাত হইলাম। আমি ফরাসিদিগকে কলহবৃদ্ধির সহায়তা করিব না, সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবেন। এবং তাহারাই যদি গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করে, তবে সসৈন্যে বাধাপ্রদান করিব। আপনারা চন্দননগর আক্রমণ করিবেন শুনিয়া যাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আমি ফরাসিদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সেনাবল পাঠাই নাই; আপনারা কলহবিবাদ উপস্থিত করিলে আমারই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে, সুতরাং প্রজারক্ষার জন্যই (স্থানে স্থানে) সেনা-

* Ive's Journal. † Ive's Journal.

সমাবেশ করিয়াছিলাম। আমার পত্র পাইয়া আপনারা যে চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদে আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। ফরাসিদিগকে সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। সন্ধি হইলে, আমি একজন রাজকর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিব, এবং আপনাদের সন্ধিপত্র আমার দপ্তরে জারি করাইয়া রাখিব। মিত্রভাবে থাকিবার জন্যই সন্ধি করিয়াছি,—সে কথার কখনও অন্যথা হইবে না।

"আর এক কথা। শুনিতেছি যে দিল্লীর ফৌজ আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তজ্জন্য বোধ হয় শীঘ্রই পাটনা অঞ্চলে গমন করিব। এ সময়ে আপনারা সেনাসাহায্য করিলে আমি লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।"*

যখন নবাবের নিকট হইতে এই পত্রখানি কলিকাতায় উপনীত হইল, তখন ইংরাজমণ্ডলীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ফরাসিরা সন্ধির জন্য কলিকাতায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন, সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গিয়াছে, কেবল গৃহকলহে ইংরাজবণিক তাহা স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিয়া কালক্ষয় করিতেছেন। ওয়াট্‌স্‌ন্ সাহেবই সকল গোলযোগের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সকলেই সম্মত, কেবল একাকী ওয়াট্‌স্‌ন্ অসম্মত হইয়া সকলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার প্রধান তর্ক এই যে, "পঁদিচেরীর ফরাসিদরবার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করিলে কদাচ সন্ধি করা কর্ত্তব্য নহে।" ক্লাইব দরবার বসাইয়া প্রাণপণে সন্ধির জন্য অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাহাতে সম্মতিদান করায় ওয়াট্‌স্‌নের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াট্‌স্‌ন্ তাহা দুইবার ফিরাইয়া দিবার পর, ক্লাইব স্বহস্তে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া বার বার তিনবার ওয়াট্‌স্‌নের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াট্‌স্‌ন্ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না;—সন্ধি হইল না। কাহার দোষে সন্ধি হইল না, সে বিষয়ে ক্লাইব নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যেঃ—

"Do but reflect, gentlemen, what will be the opinion of the world of these our late proceedings. Did we not, in consequence of a letter received from the Governor and Council of Chandernagore making offers of a neutrality within the Ganges, in a manner accede to it by desiring they would send deputies, and that we would gladly come into such a neutrality with them; and have we not since their arrival drawn out Articles that were satisfactory to both parties, and agreed that each Article should be reciprocally signed, sealed and sworn to? What will the Nabab think? After the promises made him on our side and after his consenting to

* Ive's Journal.—অনেকে এই পত্রখানির অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরাজেরা বলেন যে সিরাজদ্দৌলা পাঠানসেনার আক্রমণ ভয়ে জীবন্মৃত হইয়াই ইংরাজের নিকট সেনাবল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজচরিত্র বিচার করিয়া আমাদিগের এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, ইংরাজদিগকে সেনাহীন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পাটনায় প্রস্থান করিলে ইংরাজ হয় ত সসৈন্যে চন্দননগর আক্রমণ করিবেন, বোধ হয় সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

guarrantee this neutrality, he and all the world will certainly think that we are men of a trifling, insignificant disposition, or that we are men without principles. It is therefore incumbent on us to exculpate ourselves by declaring the real truth, that we were entirely ignorant of Mr. Watson's intentions to refuse the neutrality in the manner proposed and settled by us, and that we always thought him of a contrary opinion to what his letter declares. I am persuaded these must be the sentiments of the gentlemen of the Committee, or they never would have gone such lengths as, must expose them to the censure of all reasonable men."*

ওয়াট্‌স্‌ন্ ইহাতেও বিচলিত হইলেন না! তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর আক্রমণভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া ইংরাজের নিকট সাহায্যভিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এ সময়ে দায়ে পড়িয়াই—চন্দননগর লুণ্ঠনের অনুমতি দিতে হইবে। ওয়াট্‌স্‌ন্ হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে হইবে। তিনি সেই জন্য নানারূপ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপঃ—"চন্দননগরের ফরাসিদুর্গে অনেক সেনা রহিয়াছে, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারি না। আপনি অনুমতি করিলেই আমরা ফরাসিদিগকে নির্ম্মূল করিয়া সসৈন্যে আপনার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলে গমন করিতে পারি।" †

সিরাজদ্দৌলা বিষম বিপদে পতিত হইলেন। এদিকে বাদশাহী সিপাহী সদর্পে অগ্রসর হইতেছে, ওদিকে ইংরাজসিংহ সগর্ব্বে ফরাসিদলনের আয়োজন করিতেছেন;—সিরাজদ্দৌলা কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন? তিনি যদি পদাশ্রিত ফরাসিবণিকের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজের সাহায্য ক্রয় করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত উভয়কূলই রক্ষা হইতে পারিত, এবং ইতিহাসলেখকেরাও বোধ হয় দুই হাত তুলিয়া সিরাজদ্দৌলার জয়ধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন! কিন্তু সিরাজদ্দৌলা তাহা পারিলেন না; পদাশ্রিত ফরাসিবণিকের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজের নিকট সেনাভিক্ষা করা সিরাজদ্দৌলার মনঃপূত হইল না। তিনি ওয়াট্‌স্‌নের ঘৃণিত প্রস্তাবের কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর না দিয়া বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন! ইহাতেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

* Select Committee proceedings, 4 March 1757.

† Ive's Journal.

দ্বাদশ অধ্যায়।

চন্দননগর-ধ্বংস।

নবাবের প্রত্যুত্তর না পাইয়া ইংরাজেরা সহসা কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্লাইব বলিতে লাগিলেন যে, হয় সন্ধি কর, না হয় এখনই যুদ্ধঘোষণা কর। ওয়াট্‌স্‌ন্ সন্ধিতেও অসম্মত, নবাবের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধঘোষণা করিতেও অসম্মত। অগত্যা সন্ধির লেখাপড়া যেমন চলিতেছিল, সেইরূপই চলিতে লাগিল; অথচ কোন কথারই মীমাংসা হইল না!

সিরাজদ্দৌলা যে ফরাসিদিগের সর্ব্বনাশসাধনে সহায়তা করিবেন না, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, ফরাসির সঙ্গে কলহ বিবাদ উপস্থিত করিলে প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গেই কলহ করার ফল হইবে। সেই জন্য সকলেই বলিয়াছিলেন যে,—"সন্ধিভঙ্গ মহাপাপ; নবাবের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ করা হইবে না।" কিন্তু এই সময়ে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই হইতে কয়েক পল্টন ফৌজ আসিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের সকল ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল; তাঁহারা দরবার বসাইয়া কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন!

এই মন্ত্রণাসভায় ক্লাইব প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন;—গবর্ণর ড্রেক, মেজর কিলপ্যাট্রিক, এবং বীচার সাহেব সদস্য হইলেন। ক্লাইবের বক্তৃতা শেষ হইলে সকলেই বুঝিলেন যে, আর নবাবের অনুমতিলাভের আশা নাই, বরং তিনি সসৈন্যে ফরাসিপক্ষ অবলম্বন করাই সম্ভব। সুতরাং সহসা চন্দননগর আক্রমণ করিলে আলিনগরের সন্ধিভঙ্গ হইয়া নবাবের সঙ্গে পুনরায় শত্রুতার সূত্রপাত হইবে। মেজর কিলপ্যাট্রিক এবং বীচার বলিলেন যে, "এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অনুচিত।" ক্লাইব তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিসের সন্ধি? এই ত চন্দননগর আক্রমণের উপযুক্ত অবসর।" তখন সকলেই ড্রেক সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন; তিনি অনেক হত ইতি গজ করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সমস্যার কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার "মত" কেহ গণনার মধ্যে আনিলেন না। দুই জন সন্ধির পক্ষে, একজন যুদ্ধের পক্ষে;—এরূপ অবস্থায় সন্ধি করাই স্থিরীকৃত বটে। কিন্তু মেজর সাহেব সহসা ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আচ্ছা, এখন আমাদের যত সেনাবল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা লইয়া নবাব এবং ফরাসি দুইদলকেই পরাস্ত করা কি সম্ভব নহে?" ক্লাইব বলিলেন,—"নিশ্চয়ই সম্ভব।" তখন কিলপ্যাট্রিক মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমিও আর সন্ধি চাহি না।"* দরবার ভঙ্গ হইল;

* এই মন্ত্রণাব্যাপারের সমালোচনা করিতে গিয়া ইংরাজ ইতিহাসলেখক জেমস্ মিল সদস্যদিগকে পরিহাস করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ক্লাইব বাহিরে আসিয়া ফরাসি-দূতকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আর সন্ধি হইবে না; অতঃপর কেবল যুদ্ধ।"

সহসা ইংরাজের মতিপরিবর্ত্তন হইল কেন, ফরাসিরা আর তাহা লইয়া কোনরূপ আন্দোলন করিলেন না। ইংরাজ তাঁহাদের পুরাতন বন্ধু, (!)। সুতরাং নূতন পল্টন আসিয়াছে বলিয়াই যে তাঁহাদের মতিপরিবর্ত্তন হইল, ফরাসিরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা চন্দননগরে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আর সন্ধির আশা বৃথা;—অতঃপর কেবল যুদ্ধ!

ইংরাজ-দরবার স্থির করিলেন যে, অতঃপর কেবল যুদ্ধ! কিন্তু ওয়াট্‌স্‌ন্ তাহাতে সম্মত হইলেন না। নবাবের অনুমতি না পাইলে তিনি কিছুতেই যুদ্ধঘোষণা করিবেন না,—এ সংবাদে ক্লাইব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। জাহাজগুলি ওয়াট্‌স্‌নের আজ্ঞাবহ, জাহাজ না লইয়া চন্দননগর আক্রমণ করা বিড়ম্বনা মাত্র;—সুতরাং ওয়াট্‌স্‌ন্‌কে বুঝাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ওয়াট্‌স্‌নের সংকল্প অচল অটল! সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলার অনুমতি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব; তথাপি ওয়াট্‌স্‌নের অনুরোধে নবাবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

ওয়াট্‌স্‌ন্ ভাবিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর ভয়ে জড়সড় হইয়াছেন, এ সময়ে একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলে অবশ্যই অনুমতি পাওয়া যাইবে। তিনি সেই উদ্দেশ্যে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"স্পষ্ট কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষা করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা করা যদি আপনার রাজধর্ম্ম হয়, তবে অদ্য হইতে দশ দিবসের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। অন্যথাচরণ করিলে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে। আমরা কেবল সরল ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখনও সরল ব্যবহার করিবার জন্যই বলিতেছি যে আমাদের অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই কলিকাতায় উপনীত হইবে, এবং আবশ্যক বুঝি ত আরও জাহাজ জাহাজ ফৌজ লইয়া আসিব। ইহাদের সহায়তায় এ দেশে এমন ভয়ানক সমরানল জ্বালিয়া দিব যে, সমস্ত জাহ্নবীজল শুষ্ক করিয়াও আপনি তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না। আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু যিনি জীবনে কাহারও সঙ্গে কথার অন্যথা করেন নাই, তিনিই যে স্বহস্তে এই পত্র লিখিতেছেন, এ কথা যেন আপনি কদাচ বিস্মৃত হইবেন না!" *

সিরাজদ্দৌলা এই পত্রের গূঢ়মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াই লিখিয়া পাঠাইলেন যে:—

"আপনাদের নিকট যে সেনাসাহায্য চাহিয়াছিলাম তাহার কি হইল? সন্ধিপত্রের অঙ্গীকৃত অর্থ শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতেছি, কেবল দোলযাত্রা উপলক্ষে রাজকর্ম্মচারিগণ উৎসব-মগ্ন ছিলেন বলিয়াই বিলম্ব হইয়াছে। সন্ধিভঙ্গ করা আমার অভ্যাস নাই, যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা প্রদান করিবার সময়ে বাক্‌চাতুরী করিয়া কাল হরণ করিব না। কেহ যদি আপনাদিগকে আক্রমণ করে, তখন আমিও আপনাদের সাহায্য করিব। আমি এ পর্য্যন্ত ফরাসিদিগকে কপর্দ্দক সাহায্য করি নাই; কেবল প্রজারক্ষার জন্যই হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের

* Ive's Journal.

নিকট কতকগুলি ফৌজ পাঠাইয়াছি মাত্র। এদেশের চিরন্তন প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনারা আমার অধিকারে কোনরূপ যুদ্ধকলহ উপস্থিত না করেন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।” *

এই পত্র পাইয়া সকলেই বুঝিলেন যে সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধের অনুমতি দিবেন না। যাহা সহজে হইবে না, তাহা কৌশলক্রমে সাধন করাই ওয়াট্‌সনের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। কি জন্য, কাহার দোষে সন্ধি হইল না, সে সকল কথার আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ না করিয়া ওয়াট্‌সন্ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফরাসিদিগের দোষেই সন্ধি হইল না; এবং যাহারা এরূপ চরিত্রের লোক, তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সিরাজদ্দৌলার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইহাকে সাধারণ ভাবের পত্র মনে করিয়াই সাধারণ ভাবেই প্রত্যুত্তর লিখিলেন ঃ—

১০ মার্চ্চ ১৭৬৬।

“আমার পত্র পাইয়া আপনি যে প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিয়াছেন, তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন যে “আপনার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমার পত্র পাইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, এবং ফরাসীদিগের সঙ্গে লেখা পড়াও শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসিরা নাকি স্বাক্ষর করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের সেনাপতিগণ এই সন্ধি পালন করিবেন কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই।” একজন ফরাসি যাহা স্বাক্ষর করিল, আর একজন আসিয়া তাহার অন্যথা করিলে তাহাদিগকে আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? সে যাহা হউক, আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ করিতে আমি নিতান্ত অসম্মত; তাহার কারণ এই যে, ফরাসিরাও আমার প্রজা এবং আপনাদের ভয়ে শরণাগত। সেই জন্যই আমি সন্ধি করিতে বলিয়াছিলাম। তাহাদিগকে যে অনুগ্রহ দেখাইব বা সাহায্য করিব এমন অভিসন্ধি ছিল না। আপনি ত একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ সদাশয় মহাত্মা; আপনিই বিচার করিয়া দেখুন যে পরম শত্রুও যদি শরণাগত হয় তবে আপনিও তাহাকে প্রাণভিক্ষা প্রদান করেন কি না? তাহার সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে আপনিও তাহাকে দয়া করিয়া থাকেন; সরলতায় সন্দেহ হইলে পৃথক কথা,—তখন যেমন বুঝিতে পারেন সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।”†

এই পত্রের শেষোক্ত কথাগুলি সিরাজদ্দৌলার লিখিত কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, পত্রখানি যাহাতে এইরূপ ভাবে লিখিত হয় তজ্জন্য মুন্সিখানায় সময়োচিত অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি হইয়াছিল না।‡

মূলপত্রখানি পারশ্যভাষায় লিখিত। তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। ওয়াট্‌স্ সাহেব মুন্সীখানায় “তদ্বির” করিয়া যেরূপ অনুবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই এখন ইতিহাসের একমাত্র সম্বল। আমরা তাহারই অনুবাদ প্রদান করিলাম। এই পত্রের কোন স্থলেই অনুমতির নামগন্ধ নাই; অথচ ওয়াট্‌সন্ ইহাকেই নবাবের অনুমতি পত্র বলিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। ওয়াট্‌সনও সমরোন্মুখ, কিন্তু পাছে উত্তরকালে ইহার জন্য গঞ্জনাভোগ করিতে হয়, বোধ হয় সেই জন্যই তিনি কৈফিয়ত সংগ্রহের আয়োজন করিতেছিলেন। সেই

* Ive's Journal. † Ive's Journal. ‡ Scrafton's Reflection, 70

কৈফিয়ত হস্তগত হইবামাত্র ওয়াট্‌সনের সকল ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল। তখন ইংরাজের রণবাদ্য ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল;—জলপথে ওয়াট্‌সন্, আর স্থলপথে ক্লাইব, উভয়েই সসৈন্যে চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী আলিনগরের সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল; আর ৭ই মার্চ্চ ইংরাজসেনা চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া শিবির-সংস্থাপন করিল। সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে বাইবেল চুম্বন করিয়া ঈশ্বর ও যীশু খৃষ্টের পবিত্রনামে ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইব যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষীণ পরমায়ু এইরূপে প্রভাতশিশিরের ন্যায় এত অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

মন্ত্রণাগৃহের উত্তেজনায় পড়িয়া ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে, “ফরাসির সহিত নবাবের সেনাদল মিলিত হইলেই বা ভীত হইব কেন? একাকী উভয়সেনাদল বাহুবলে পরাজয় করিব।” কিন্তু চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া সে বাহুবল সহসা যেন শিথিল হইয়া পড়িল! ফরাসিরা বীরবিক্রমে দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প, নিকটেই নন্দকুমারের সেনাদল সতর্কভাবে দণ্ডায়মান! সুতরাং ক্লাইব শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্লাইব বড়ই সিদ্ধ হস্ত। তিনি শাম দান ভেদ দণ্ডাত্মক সামরিক নীতির সমাদর রক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। নন্দকুমারকে পরাজয় করিতে কতক্ষণ? কিন্তু পরাজয় করা অপেক্ষাও কি সহজ পথ নাই? ক্লাইব সেই সহজ পথের সন্ধান লইবার জন্য উমাচরণকে নন্দকুমারের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন।* উমাচরণ সহজেই কৃতকার্য্য হইলেন;—নন্দকুমার সসৈন্যে ডঙ্কা বাজাইয়া দূরস্থানে সরিয়া পড়িলেন। ক্লাইবের কলঙ্কমোচন করিবার জন্য অনেক প্রতিভাশালী ইতিহাসলেখক অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু একজন আর কোন উপায় না পাইয়া স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, এ যাত্রা কেবল উৎকোচ-মহিমাতেই নন্দকুমার পরাজিত হইয়াছিলেন। †

ফরাসিরা প্রাণপনে দুর্গরক্ষা করিতে গিয়া দলে দলে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু ইংরাজের প্রচণ্ড বিক্রমের সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। যখন তাঁহাদের বাহুবল টুটিয়া আসিল, তখন তাঁহারা ধীরে ধীরে দুর্গত্যাগ করিলেন;—ইংরাজসেনা ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্নে মহোল্লাসে “হুরে ধ্বনিতে” জলস্থল প্রতিশব্দিত করিয়া ফরাসিদুর্গে ইংরাজের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিল!

* Another well-applied bribe to NunComar.—Scrafton.

† A body of the Subahdar's troops was stationed within the bounds of Chandernagore, previously to the attack. They belonged to the garrison of Hoogly, and were under the command of Nuncomar, governor of that place. Nuncomar had been bought by Omichand for the English, and on their approach, the troops of Shirajodwola were withdrawn from Chandernagore.—Thornton's History of the Britlsh Empire, vol. I. p. 221.

সংবাদ পাইয়াও সিরাজদ্দৌলা ফরাসিদিগকে রক্ষা ক রতে পারিলেন না; ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। ইংরাজেরা বলেন যে, তিনি আহ্‌মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই, এবং ইংরাজবন্ধু মীরজাফর জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ প্রভৃতি পাত্রমিত্রও নানাকৌশলে সিরাজদ্দৌলার হৃদয়ে আব্‌দালীর আক্রমণভীতি জাগরিত রাখিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে ত্রুটি করেন নাই। সিরাজদ্দৌলাকে যে দশজনে মিলিয়া নানা বিভীষিকায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহা সত্য কথা; কিন্তু তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াও ফরাসিদিগের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য হুগলীতে সৈন্যসমাবেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ফরাসিদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করাই যে তাঁহার মঙ্গলসূচক তাহা সিরাজদ্দৌলা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ইংরাজদিগকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! কে জানিত যে মহারাজ নন্দকুমার সিরাজদ্দৌলার লবণ খাইয়া সিরাজদ্দৌলার আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেন?

স্বরলিপি।

মিশ্র সাহানা—একতালা।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর—শ্রীমতী সরলা দেবী।

এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা,
সে শুধু যদি ভাল বাসিত।
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি।
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য্য, নাহি যদি দৃষ্টি।
যদি হলাহলে ভরা প্রেম সুধা বৃষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত।

।।৩।। রম১ র১ ম১। প১ র্স১ ন১। র্র্স৩। র্সনো১ নোপ১ পম১।
এ ম ন যা — মি নী ম ধু র

মগো১ মপ১ পম১। মগো১ র১ সন্১। স৩। রগো১ মগো১ রস১।
চাঁ — দি নী — — — হা — য়

ম১ র১ ম১। প১ র্স১ ন১। র্র্স৩। —৩। ম২ প১। নো২ র্স১।
এ ম ন যা — মি নী — সে শু ধু গো

শেষ।

র্গো১ র্র্ম১ র্গোর্র১। র্স৩। র্সনো১ ধনো১ প১। প১ র্স২। —২ পমগ১।
— — দি আ — সি ত — — —

পমগ১। মগর১। গ১ গর১ স১। ম১ প১ পন১। ন২ ন১। ন৩।
— — য় প রা ণে এ ম ন

(আ—প্র)

ন১। র্স১ র্সন১ নর্সর্র১। র্স১ ন১ ন১। র্স৩। —৩। র্র২ র্র১।
আ কু ল পি — য়া সা — সে শু

র্রর্গো১ র্র্ম১ র্গোর্র১। র্স৩। র্সনো১ ধনো১ প১। প১ র্স২।
দি — ভা ল বা — সি ত —

পমগ১। গম১ পধপ১ মগর১। গ১ গর১ স১ ॥ [ম২ ম১। মপম১।
স — হা — — — — য় [এ ম ধু

(আ—প্র)

ম১। প৩। প৩। পধপ১ মগ১ ম১। প১ ন১ র্স১। র্সর্রর্স১ নো১ ধ১।
ব স ন্ত এ — ত শো — ভা হা — —

ম১ গ১। গ২ গ১। গ২ গ১। গম১ গমপ১ ম১। গ১ র১ সন্১। স৩।
— — এ ন ব যৌ ব — ন এ — ত রূ

পধ১ নোর্স১ নোধ১। প৩।]ম১ প১ পন১। ন২ ন১। ন৩।
শি — — —]স ক লি উ ঠি ত

ন১। র্স১ র্সন১ নর্সর্র১। র্স১ ন১ ন১। র্স৩। —৩। র্র২ র্র১। র্র২
পু ল কে বি — কা শি — সে শু ধু

র্রর্গো১ র্র্ম১ র্গোর্র১। র্স৩। র্সনো১ ধনো১ প১। প১ র্স২। —২ পমগ১।
দি — — গো চা — হি ত — — —

পধপ১ মগর১। গ১ গর১ স১। [ধ৩। ধ২ ম১। প২ প১। প৩। ধ
— — য় [মি থ্যা বি ধি তু মি মি

(আ—প্র)

নো১। ধ১ প১ প১। মপ১ মপ১ ধপ১। ম১ গো২। গো২ গো১। রগো
থ্যা ত — ব স্ — — ষ্টি, — বৃ থা

মপ১ র১। স২। স৩। র১ ম১ ম১। ম১ পধ১ ম১। প৩। প২ স১
— সৌ ন্দ র্য্য ত র না — হি য — দি দৃ ষ্টি —

প১ প১। ন২ ন১। ন২ ন১। ন১ প — ন১। র্স১ ন১ নর্সর্র১। র্স১ ন১ ন১
দি হ লা হ লে ভ রা — — দিপে — ম স্থ —

র্স৩। ম১ ম১ প১। পনো২ র্স১। রর্গো১ র্রর্ম১ র্গোর১ । র্স৩। র্সনো
ষ্টি কে ন ত বে প্রা ণ — — তৃ

প১। প১ র্স২। —২ পমগ১। গম১ পধপ১ মগর১। গ১ গর১ স১
ষি ত — — — হৃ — — — — — য়
দি আ — সি ত — — — হা য়

রামমোহন রায়।

সরলা দেবী।

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্ত্তী আ[সনে] বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না; তাঁহার মুখচ্ছবি[তে] এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্ব্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট এই বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব্ব মানসীমূর্ত্তি আম[ার] মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদ মহিমা, সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্য্যন্ত,—স্নেহ-চিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মি বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্ব[ন্দ্ব] এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছি—আমি [দেখিতে] পাইতেছি, এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূ[রপ্রসা]রিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত [কর্ম্ম] অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব—যখন নবতর বঙ্গবাসী নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি মধ্যে অবতীর্ণ হইবে তখনও রামমোহন রা[য়ের] সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্ব্বাদ বি[কীর্ণ] করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যা[লয়ে] যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন; —

[যে] পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে;—তখন [বঙ্গ]সমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল—তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র, এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরিপরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গসমাজের [অভ্যু]দয় হয় নাই, তখন ছোট ছোট গ্রামসমাজ পল্লিসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া-[ছি]ল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য্য অকার্য্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যমণ্ড-[লী]র সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ [হৃদয়ে]র তাঁহার বৃহৎ সঙ্কল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার [প্রতি]ষ্ঠিত নব-বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

[অ]দ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাঙ্গলা দেশের প্রভাত[পাখী]রা ইংরাজি অনুবাদমিশ্রিত সঙ্গীতে দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষা-[কাল]ে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাঙ্গলাভাষায় মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দো-[লিত] হইতেছে; তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কি করিয়া বুঝিতে হয়, রামমোহন রায় তাহা প্রথমে [নির্দে]শ করিয়া তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা [গদ্যে] পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও বা কণ্টকিত কোথাও বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে,— [আজ] সভাসমিতি, আবেদন নিবেদন, আলোচনা আন্দোলন, বাদপ্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুক-[শারী]কুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে;—ফলতঃ বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের [অ]নেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর [ঘটিয়াছে]—কিন্তু তথাপি, আমি কল্পনা করিতেছি, যে শকটে রামমোহন রায় আমার [পিতাকে] [বিদ্যা]লয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আসনে [বসিয়া আ]ছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, [তাঁহার] সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত [হয় নাই]; এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি [প্রসা]রিয়া রাখিয়াছেন।

[হিমা]লয়ের দুর্গম নির্জ্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্ম্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ [বিষাদ] সত্ত্বেও বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ—তাহা অবসাদ নহে, [তাহা] অভা,—তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যান-[নিমগ্ন] নিকশীলতা;—অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা, অতলস্পর্শ নির্ম্মল সরোবরের শ্যাম-[লিমা]র ন্যায় উজ্জ্বল—তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময়, সেইরূপ বহুদূর-[ব্যা]পী। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল, সে বঙ্গভূমি তখন [কোথায় ছি]ল—এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার [সমস্]ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিম দিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভা-

মণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মত বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ
মূঢ়ের মত তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সঙ্গীত-
ধ্বনির প্রতি কাণ পাতিয়াছিলেন ;—সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন
ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল, তখন তিনি প্রসারিতবাহু রিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস-
বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ম্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ
করিয়াছিলেন। সে সঙ্গীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে
বর্ত্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সতত সঞ্চরমান ছায়ালোকের
কোন অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না,
জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত ; বি
তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার, ধর্ম্ম তাহাদের
চারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগতপ্রতিপালন, এবং পৌরুষ রাজদ্বা
ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদেরই মধ্যে আ
দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানকালের মধ্যেই আপনার সমস্ত আশ
প্রতিহত হইতে দিতেন তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না—তাহা হইলে তাঁ
মাতৃভূমিকে আপন আদর্শ লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অ
বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী একই মৃত্তিকা তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূ আমাদের হ
অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের
তলে বহু উর্দ্ধে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সম
করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্ব্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন ; সেইজন্য তাঁহার
থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্ত্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগ
করিতে থাকে ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষ গোচ
ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম
বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকে
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়,—আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে
অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে
যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃ শব্দে
ন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে ;—আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রা
হীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত না
হইতে ইহলোক পরলোকের জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তরি
দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্যই আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা, সেইজন্যই আমাদের
সংকল্প এমন দুর্ব্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ ;—সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্ম-

সমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে
উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্র আর
আমরা দেখিতেই পাই না, মর্ত্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মত আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া
ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়।
আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, বর্ত্তমানের উপস্থিত বাধাবিপত্তি, মর্ত্ত্যসুখের
বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য,—আর সমস্ত শুন্য কথা, শিক্ষালব্ধ মুখস্থ বিদ্যা এবং ছায়া-
ময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য—
বস্তুতঃ সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন—আমাদের সংসার, আমাদের সুখ দুঃখ, আমা-
ধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণামস্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

মমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য-
লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—সেইজন্য হার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার
সিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্য-
ত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দ্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজনবেশে সঞ্চরণ করি-
তেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য
শের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতে-
ল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে
মি প্রবাসে দেশ-দেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্য্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক,
নে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে
ইয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব্বজীর্ণ জড়বৎ
রাখে তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না,—রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হই-
সেই সকল জড়সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না—নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল্ পক্ষী যেমন
পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি
কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ
রিয়া অভ্রভেদী অচলশিখরপ্রতিষ্ঠিত সত্যকুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকা-
সামাজিক সংস্কার, বহু পুরাতন হইতে পারে কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন—সেই চির-
তন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙ্গালী বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই
র অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি এই গৃহপালিত তরুণ বাঙ্গা-
নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে
লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া
পনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে
লাগিল; বালক কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ইহা নহে ইহা নহে—আমি ধর্ম্ম চাহি ধর্ম্মের
পুত্তলি চাহি না, আমি সত্য চাহি সত্যের প্রতিমা চাহি না। বঙ্গমাতা কিছুতেই এই

বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্ এক সময় কেমন করিয়া বাঙ্গলা দেশের সমস্ত দেশাচার লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার অনুষ্ঠানই চরম নহে—ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্য ভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্ব্বর্ত্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তথন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বাহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্ম্মেরই বাহিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত ... রসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্ল্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত্ত রামমোহন রায় সেই কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্ম্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগি... তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদপুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লই... হিব্রু ও গ্রীকভাষা শিখিয়া খৃষ্টধর্ম্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আর... শিখিয়া কোরাণের মূলমন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন—ইহাই সত্যের জন্য তঁ... সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই, সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দে... পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে—কর্ত্তব্যবিমুখ অলসধাত্রী... ন্যায় মোহ-অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নির... করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্ব সাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পু... পুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতীকূলে কোন এক নিস্তব্ধ তপোবনে কো... বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্তস্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা যা যে দিব্যধামানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং পরমং পরস্তাৎ।

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর—আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন ঊষাকালে নির্ব্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসী-গণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি—তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্কপর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্ত্তিকায় অগ্নি যথন ধরিয়া

উঠে তথন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে—আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই সে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না—সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্য্যাতন করুক্ তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তথন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গ-...জের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে ... বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জ্জনের ঊর্দ্ধে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে—মিথ্যা, ... হে পৌরগণ! ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই—ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা আত্মার ...বিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য ..., তাহা মহৎ হয় না;—সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে ...কে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা কর,—যে ভক্তি যেথানেসেথানে অর্ঘ্য-...ব স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তিলাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যা-...রবশ ...বলাসিতা,—তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, ...য়াছে ... লাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে ...গুমগ্ন হইতে থাকে।

...রা এবং বর্জ্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে ... বর্জ্জন ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে—যথন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তথন স্বাস্থ্য ...ং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

...আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণ বর্জ্জন ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া ...ংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ুগ্রহণ করি অঙ্গারক ...ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীরকোষ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং মৃত কো... পরিত্যাগ করিতেছে, কি করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তর প্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে —কিন্তু সেথানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ। ভাল মন্দ পাপ পুণ্য শ্রেয় প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্য—এ কার্য্যের যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না—তবে ধর্ম্ম ও নীতিশব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ বর্জ্জন কার্য্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্ত্তব্যকার্য্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃতকোষকে যেমন নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করে আমরা আমাদের মৃতবস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না। এই জন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্ম্মেরই চতুর্দ্দিকে বহুযুগসঞ্চিত

DAMAGE PAGES,

পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়,—অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিতভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে তাহারা কি আলোক কি স্বাস্থ্য কি মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশতঃ ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্ব্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে, যাহা মুখ্যবস্তু, যাহা সার পদার্থ তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া ক্র... ভ্রান্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর ... আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না। যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য তাহাই পদে পদে আ... চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা ... আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা ... না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয় ... বলে, সত্যকে মিথ্যাস্তূপের মধ্যে হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আ... করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত ... ইচ্ছা করি। অর্থাৎ যাহা বর্জ্জনীয় তাহা বর্জ্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহা ... করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই ... বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জ্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটী ... মৃত সতীদেহ কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফলমোহে তাহাকে স্কন্ধে ... করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র দ্বারা সেই মৃতদেহ ছি... করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানবসমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র লইয়া আবির্ভূত হন,—সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে; কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য্য করে, সানন্দমনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে; যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি;—বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি;

সমাজের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে একমুহূর্ত্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি, আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনও মহৎ সঙ্কল্প সাধন কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই,—সেইজন্য আমাদের অন্তর-প্রকৃতি ক্রমশঃ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল, আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল, এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম্ম যে আপন আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে: যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত,—তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না,—তবে আমরা লোকসমাজে সর্ব্বদা নির্ভীকভাবে অসঙ্কোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই, বারুদ এবং সীসকের গোলকদ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা, সকল দুর্ব্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্ম্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্ম্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তিদ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়—রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদপুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন—যে সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন। সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে আর এই সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে আমাদের চিন্তায় কার্য্যে আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে—চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই শাস্ত্র উদ্ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত, আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

DAMAGE PAGES,

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশঃ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা একমুহূর্ত্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি,—সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু-বর্ষন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে, সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্ম্মল উজ্জ্বল সুন্দররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব—না, না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও, তাহার পর একদিন বলিব, এস এস হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এস হে হৃদয়ের মহারাজ, এস হে আত্মার জাগরণ! তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়াছিলাম!

এসগো নূতন জীবন!
এস গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এস গো ভীষণ শোভন!
এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এস গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন!
থাক্ বীণাবেণু মালতী মালিকা,
পূর্ণিমানিশি মায়া-কুহেলিকা,
এস গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয় শোণিত-প্রাশন!
এস গো পরম-দুঃখ-নিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ-সাধন!

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই যখন আবাহন করিব, তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব,—প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পন করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব; তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্য মিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্য মিথ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। এমন কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোন গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারম্বার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্ম্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিলেন নাই, এমন কি, এক এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত-মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্ম্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন;—আমরাও অগ্রে সে ধর্ম্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে,—অনেকে যাঁহারা মনে করেন জানিয়াছি তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্ম্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই, এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই; সত্যধর্ম্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম্মস্বীকার করি সে ধর্ম্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করি সে ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতি বোধ হয় না;—আমাদের ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয় এমন চাপল্য এমন মুখরতা, কোন সন্ধান কোন সাধনা না করিয়া অন্তরের মধ্যে কোন অভাব অনুভব বা কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এমন অনায়াসে কোন এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক উকীলের মত নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্ব্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছু-

দিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে—তখনই সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্ক বিতর্ক, এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব, ধর্ম্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব, অবশেষে সূর্য্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বই পরিতৃপ্তি নাই—তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্যপানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙ্গালীকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি ঃ—

"হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ।"

প্রতিশোধ।

নরেন্দ্রনাথ যখন ক্রোধভরে তারাপ্রসন্ন বাবুর আফিষের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন, তখন সকলে একবাক্যে নরেন্দ্রনাথের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন কি যাঁহারা পূর্ব্ব দিবসেও নরেন্দ্রনাথের সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তায় বলিয়াছিলেন "আপনার আর এ আফিষে থাকা ভাল নহে; আমরা হইলে বহুকাল পূর্ব্বেই কর্ম্মত্যাগ করিতাম" তাঁহারাও এখন অপরের নিকট বলিতে লাগিলেন "আরে ছিছি! নরেন্দ্রনাথ যে লেখাপড়া শিখিয়া এত ছেলেমানুষি করিবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তারাপ্রসন্ন বাবু একজন মহাশয় লোক, দেশের মাথা, তাঁহার সহিত ওরূপ ব্যবহার করা কি ভাল?—না কাজটা ভাল হয় নাই। কাল আমরা উহাকে কত বুঝাইয়াছি যে মনিব যদি এক কথা বলেই থাকেন, তাহা হলে চেপে যাওয়া উচিত। আজ কাল এই চাকরির বাজার, কপালে ওর নিতান্ত কষ্ট আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলতঃ নরেন্দ্রনাথ যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন "বিশেষতঃ আজ কালিকার এই চাকরীরবাজারে" তাহা বুঝিতে আর কাহারও তিলমাত্র বাকি রহিল না। কেবল বুঝিলেন না নরেন্দ্রনাথের পিতামাতা, দুই একজন নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু ও নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁহারা মনে করিলেন যে ভদ্রলোকের মান সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হওয়া উচিত, আত্মসম্মান নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর এত দুর্গতি। নরেন্দ্রনাথ আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তারপর চাকরীর কথা? সেজন্য তখন কেহ বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিলেন না। নরেন্দ্রনাথ দার্শনিকের ন্যায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তারাপ্রসন্ন বাবু আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন স্বীকার করি এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন সে কথা স্বীকার করিব কিন্তু আহারদাতা কি তিনি? তাঁহার আহারদাতা কে? যে দেশে তারাপ্রসন্ন বাবু নাই, সে দেশের সকলে কি উপবাস করিয়া থাকে? যিনি তাঁহাকে আহার দিতেছেন, তিনি আমাকেও আহার দিবেন। চাকরি কোথাও না হয়, ব্রাহ্মণের ছেলে—ভিক্ষা করিয়া খাইব, তাহাতে আমাদের অপমান নাই।"

তারাপ্রসন্ন বাবুর নিবাস ২৪পরগণার কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। তিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান ও দাতা। কলিকাতায় তাঁহার খুব ফলাও কারবার, প্রায় বিশলক্ষ টাকা ও দুই তিন শত লোক তাঁহার কারবারে ঘুরিতেছে। আর এত যে বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। বাল্যকালে সরস্বতীর প্রতি যথার্থ বিমাতৃভাব থাকাতেই যেন কমলা তাঁহাকে নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সামান্য টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অবশেষে কলিকাতার মধ্যে একজন বিশেষ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত হয়েন। তাঁহার অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল, বিশেষতঃ ধনবানের মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর প্রায় দেখা যাইত না। নিজে বাল্যকালে অশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা বশতঃই হউক পরের কষ্ট শুনিলেই তাঁহার অশ্রুপাত হইত এবং সাধ্যমত কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। স্বয়ংসিদ্ধ ধনবানদিগের ন্যায় তিনি বিলাসের উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, বড় বড় জুড়ি, নানাবিধ গাড়ি ও মেকেবের ঘড়ি সত্বেও তিনি বড় সাদা চালচলন ভাল বাসিতেন। কিন্তু দেশের নিন্দুকেরা এত গুণ সত্বেও তাঁহার শ্রবণের সূক্ষ্মত্ব লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন করিত। তারাপ্রসন্ন বাবুর বিচারশক্তি বড় তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া নিন্দুকেরা স্বীকার করিত না। এমন কি বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিনি একজন অনাহারী মাজিষ্ট্রেট বলিয়া কোম্পানি বাহাদুরের নিকট পরিচিত ছিলেন তখন অনেকে বলিত যে তাঁহার নিকট যে আগে নালিশ করিবে, তাহারই জিত হইবে।

নরেন্দ্রনাথ তারাপ্রসন্ন বাবুর প্রতিবাসী এবং বয়সে প্রায় তাঁহার পুত্রের সমান। বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনেরা মনে করিতেন যে নরেন্দ্রনাথ বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী। নরেন্দ্রনাথও সর্ব্বসাধারণ যুবকের ন্যায় আপনাকে একজন

অসাধারণ মনে করিতেন। যে সকল সাধারণ ঘটনা সকলের জীবনে প্রায় ঘটিয়া থাকে, নরেন্দ্রনাথও সেই সকল ঘটনাকেই আপনার অসাধারণত্বের অনুকূলে সাক্ষ্যস্বরূপে গণ্য করিতেন। বাল্যকালে একটু আধটু কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়াই এফ, এ, পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অঙ্কশাস্ত্রের সহিত যে কবিদের চিরবিবাদ এবং আমাদের নরেন্দ্রনাথ যে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ অনুরক্ত নহেন, এই সামান্য ব্যাপারেই তিনি আপনাকে ভবিষ্যৎ হেম বাবু, নবীন সেন, অথবা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে করিতেন।

পিতার তাড়নায় দুই তিনবার পরীক্ষায় চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন বিশ্ববিদ্যালয়-দ্রাক্ষা ফলে অম্লরসের সঞ্চার স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। এবং অবশেষে কলেজ ত্যাগ করিয়াই "বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির দোষ," "ইংরাজী শিক্ষায় দেশের ক্ষতি" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ-কষ্ট-পীড়িত সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের সম্পাদককে চিরবাধিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আপাততঃ আধিভৌতিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া "মহাজন অবলম্বিত পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ" বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার একজন পিতৃবন্ধু তারাপ্রসন্ন বাবুর অধীনে তাঁহার জন্য ৩০ টাকা বেতনে একটি কর্ম্মের যোগাড় করিলেন, বলা ভাল এই কর্ম্মের জন্য নরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার পিতা কাহাকেও কিছু অনুরোধ করেন নাই। নরেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু উপযাচক হইয়া নরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম করিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথও লক্ষ্মী ছেলেটি হইয়া প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত "চাকরি কলম পেশা" শেষ করিয়া শূন্য জঠরে, বিষন্ন মনে, মৃদুমন্দ গমনে বাসায় ফিরিতে লাগিলেন।

এ ত গেল সাদা কথা। ইহার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের কর্ম্মপরিত্যাগ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামরাবণের যুদ্ধের বহুকাল পূর্ব্বে যেমন স্বর্গের নিঃস্বার্থ দেবগণ কৈকেয়ীর কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতীর অবস্থান, দশরথের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কার্য্য-কারণ পরম্পরার জাল বুনিয়া রাখিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথের চাকরী স্বীকার করিবার বহু পূর্ব্বে কোন অজ্ঞাতনামা দেবতা, সেই প্রকার তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে এক অন্ধকারময় বিষম কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে নিজ নিজ গন্তব্য ও কর্ত্তব্য-পথে যাইব মনে করিলেও এই কুহেলিকার প্রভাবে পরস্পরের সংঘর্ষণ হইয়া থাকে।

তারাপ্রসন্ন বাবুর একটি পুত্র ও একটি ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল। চিররুগ্ন ও অক্ষম ভ্রাতা তাঁহার সংসারেই বাস করিতেন এবং তাঁহার কন্যা বিমলা তারাপ্রসন্ন বাবুর কন্যা-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের কন্যাসন্তান না থাকাতে তিনি বিমলাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জ্ঞান করিতেন। ভবিষ্যতে বিবাহ দিয়া বিমলাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া তিনি কখন কখন সঙ্কল্প করিতেন যে, কোন দীনহীন গৃহস্থের পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া তাহার সহিত বিমলার বিবাহ দিবেন। আবার কখন মনে করিতেন তাহা হইলে আমার অভিমানিনী বিমলার মনে ঘরজামায়ের স্ত্রী বলিয়া বড়ই কষ্ট হইবে। এই

প্রকার নানাবিধ চিন্তার পর নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী অমরনাথের সহিত বিমলার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। অমরনাথ বনিয়াদি ঘরের ছেলে, দেখিতে অতি সুশ্রী এবং পিতাও বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বিমলা গৃহের নিকটে থাকিবে, মনে করিলেই দেখিতে পাইব অথচ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে পড়িবে—ইহা অপেক্ষা আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? এই প্রকার সকল দিক বিবেচনার পর অমরনাথের পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। অমরনাথের পিতা সুশিক্ষিত, উন্নতমনা ও মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন "অমরনাথের মতামত জানিয়া আপনাকে কথা দিব; এ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই।" তারাপ্রসন্ন বাবু দেনা-পাওনার কথা উত্থাপন করিলে অমরনাথের পিতা সহাস্যে বলিলেন "আমাদের বংশে পুত্রবিক্রয়ের প্রথা নাই। আপনার কন্যাকে আপনি দিবেন তাহাতে আমার কথা কওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।" উপস্থিত সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের অসাক্ষাতে "লোকটা কি বোকা! চাহিলে অনায়াসে ১০ হাজার টাকা পাইতে পারিত, বিষয়-বুদ্ধি কিছু নাই" ইত্যাদি বাক্যে নিজের বিষয়-বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে লাগিলেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথের উপর অমরনাথের মন জানিবার ভার পড়িল। এত মন জানাজানির বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না, তবে মেয়েটি নাকি একটু শ্যামবর্ণা, তাই একবার তবু জিজ্ঞাসা করা ভাল, এইজন্যই নরেন্দ্রনাথ মন জানিবার ভার পাইলেন এবং বিবাহের অনুকূলে মনও পাইলেন। বর, কন্যা, নরেন্দ্রনাথ সকলেরই এক পাড়ায় বাস সুতরাং কন্যা সকলেরই নয়নপথে পড়িয়াছিল। অমরনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই বিমলাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন; এমন কি বিবাহের পূর্ব্বে বিমলা দুই এক বার অমরনাথের বাটিতে নিমন্ত্রণেও আসিয়াছিল।

কৌতুকপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ বিবাহের সময় একটু নূতন ধরণের আমোদ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন নরেন্দ্রনাথ, অমরনাথকে আয়ুর্বৃদ্ধান্ন উপলক্ষে নিজের বাটিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। অমরনাথ ভোজন করিবার জন্য ভোজন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গৃহের মধ্যে দুইখানি আসন পাতা আছে ও দুইজন লোকের আহার্য্য রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে বোধহয় নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত আহার করিবেন। নরেন্দ্রনাথকে বসিতে বলিলে, তিনি বলিলেন "তুমি ব'স আমার কিছু বিলম্ব হইবে।" অগত্যা অমরনাথ আহারে প্রবৃত্ত হইলেন; নরেন্দ্রনাথ "আসিতেছি" বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণকাল পরে গৃহের বাহিরে বসন্তকালের ভ্রমরগুঞ্জনবৎ বালিকার চরণকমল-নিঃসৃত নূপুরধ্বনি হইতে লাগিল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতামহী, প্রস্ফুটনোন্মুখ অপরাজিতা কুসুমবৎ, সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষণা নয়নাভিরাম-স্নিগ্ধ-শ্যামবর্ণা একটি বালিকার হস্ত ধরিয়া ভোজন-গৃহের অপর আসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। অমরনাথ বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন "বিমলা!" নরেন্দ্রনাথের পিতামহী বিমলাকে বলিলেন "বোস ভাই, এই আসনে ব'সে বর কনে দুজনে একসঙ্গে খাও, আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি। এখন ত বিয়ে

হয়নি, এর মধ্যে এত লজ্জা কেন? এখন লজ্জা করিতে নাই।" বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল; প্রাচীনা দেখিলেন যে, অমরনাথও খুব মনোযোগী ছেলে হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি অমরনাথকে দুই একটি মিষ্ট অনুশাসন করিয়া এবং বিমলাকে জোর করিয়া আসনে বসাইয়া "খাওনা ভাই, কতক্ষণ বসে থাকবে? ও শালা থাক্‌লেই বা ওকে লজ্জা কি? খাও ভাই আমি দুধ আনি।" এই বলিয়াই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। বোধহয় অন্যমনস্কবশঃতই হইবে, যাইবার সময় গৃহের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মা, বিমলাকে বসাইয়া দুগ্ধ আনিবার জন্য বোধহয় "মাহিন্দির" গয়লার বাড়ি লোক পাঠাইয়া দিলেন অথবা গোয়াল বাড়িতে গিয়া দুগ্ধদোহনে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ যে সময় তিনি দুগ্ধ আনিতে গিয়া অতিবাহিত করিলেন, সে সময়ের মধ্যে স্বয়ং ঠাকুরমা তিনবার আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। দুধের বাটী হাতে লইয়া ও যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া ঠাকুরমা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে বিমলাকে যে অবস্থায় বসাইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায়, বরং মাথাটী আরও একটু নামাইয়া, বসিয়া আছে। অমরনাথেরও প্রায় সেই অবস্থা—তবে সুখের মধ্যে আহার বন্ধ নাই, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিবাহের পর বিমলা একদিন নরেন্দ্রের পত্নীর নিকট বলিয়াছিল যে ঠাকুরমার অনুপস্থিতিকালে সে একবারও অমরনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, তাহার বুকের ভিতর কেমন গুরুগুরু করিয়া কাঁপিয়াছিল এবং নিশ্বাস ফেলিতেও সাহস হয় নাই। নরেন্দ্রের স্ত্রী কিন্তু বলে যে সে সেই সময় আড়ি পাতিয়াছিল। সে অমরনাথের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল কিন্তু কিছু অর্থ বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

"আমার জামাই আর কাহার নিকট চাকরির জন্য যাইবে? আমার নিকট কাজকর্ম্ম শিক্ষা করুক" তারাপ্রসন্ন বাবুর এই যুক্তিসঙ্গত কথায় অমরনাথের পিতা, অমরনাথকে বৈবাহিকের অধীনে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যবন্ধুকে একই স্থলে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং দুই বন্ধুতে পরম উৎসাহে তারাপ্রসন্ন বাবুর ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারাপ্রসন্ন বাবুও জামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এমন কি কখন কোন কারণে যদি জামাতার কোন বিরক্তির সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথের উপর জামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার ভার দিতেন।

সম্প্রদায় বিশেষের মতে, সয়তান সর্পরূপ ধারণ করিয়া মানবকে সুখময়-উপবন-বাস হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সেই সয়তানের বংশাবলী আজিও নানাবিধ আকার ধারণ পূর্ব্বক সকলকেই প্রতিপদে কষ্ট দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। হয়ত একজন পল্লীগ্রামবাসী কোন বিশেষ সমারোহ উপলক্ষে কলিকাতা দেখিতে আসিল। কলিকাতার গগণস্পর্শী বিচিত্র অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া ইংরাজ জাতিকে স্বর্ণলঙ্কাবাসী রাবণের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব বলিয়া

মনে করিতেছে, এমন সময় সয়তানের বংশধর কি না ফুটপাথের পাথর হইয়া তাহার পদনখে এমন আঘাত করিল যে বেচারার কলিকাতা দেখা সাধ পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে স্নায়ুযোগে তড়িত-বেগে মস্তকে উঠিয়া গেল। শনিবারে ৫টার সময় আফিষের বাবু বাড়ি যাইবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিলেন, সয়তানবংশধর অমনি সেই ট্রামের অশ্বরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং নানাবিধ উপায়ে যেমন করিয়াই হউক বাবুর বৃথা ২০ মিনিট সময় নষ্ট করিল; বাবু যেমন ষ্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত হইলেন, আর সয়তান অমনি এঞ্জিনের বংশীধ্বনিরূপে উচ্চহাস্য করিয়া বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া গেল, বাবু রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে বসিয়া রহিলেন। নববিবাহিত যুবক উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন প্রিয়তমার পত্র না পাইয়া, অভিমান ভরে পত্নীকে নরম গরম ভাষার সোহাগে ভিজাইয়া, বিরহের ভয় দেখাইয়া "এই পত্রের অবশ্য অবশ্য জবাব দিও" অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া যেই পত্রখানি ডাকবাক্স মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন আর অমনি পোষ্টপিয়ন, সর্ব্বাঙ্গে গোলাকার ষটকোণ চৌকোণ কাল ও লালরঙ্গের ছাপলাগান একখানি পত্র দিয়া বলিল "বাবু ঠিকানার গোলমাল হওয়াতে ৪।৫ দিন পত্রখানি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আপনার পত্রখানা লউন।" সয়তান পোষ্টমাষ্টার বাবুর স্কন্ধে চাপিয়া "নইহাটির" পরিবর্ত্তে "নলহাটী" পড়াইয়া এই গোলযোগ করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের সহিত অমরনাথের সদ্ভাব দেখিয়া দুই একজন "বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী" তারাপ্রসন্ন বাবুর নিকট কথায় কথায় "এখন নরেন্দ্রনাথের একটু বিবেচনা করিয়া চলা ভাল, অমরনাথ হাজার হ'ক এখন মনিবের জামাতা, সেই রকম দেখলে ভাল হয় না" বলিয়া বাবুর মাথায় চিন্তা করিবার একটা নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া দিলেন। "বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী" মহাশয়েরা যে নিজে মন্দ লোক—একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। তবে হয় ত সয়তান কখন্ কোন্ দুর্লক্ষ্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের রসনায় আবির্ভূত হইয়াছিল। তাঁহারা যে নিজে তারাপ্রসন্ন বাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। একবার বাবুর বাটিতে পূজা উপলক্ষে, একজন "শুভাকাঙ্ক্ষী" ময়রার হিসাব নিকাসের সময় ময়রা যে বাবুকে ছানা অপেক্ষা চিনি অধিক পরিমাণে দিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহার নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক ময়রার ১৫৲ টাকা জরিমানা করাইয়া বাবুকে চিরবাধিত করেন। অপর একজন "শুভাকাঙ্ক্ষী" ১০।১২ খানা গরম গরম লুচি চাকিয়া তাহাতে যে ময়ান কম এবং লুচিভাজা ব্রাহ্মণেরা যে ইচ্ছা করিয়া কম ময়ানের লুচিতে বাবুকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছে ইহা প্রমাণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সদলবলে বরতরফ করেন।

এই হিতৈষীদের প্ররোচনায় অমরনাথের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের কিছুদিন পরে, নরেন্দ্রনাথের প্রভুজামাতা অমরনাথের প্রতি প্রভুপ্রাপ্য সম্মান না দিয়া বন্ধুপ্রাপ্য প্রণয় দেওয়াটা, তারাপ্রসন্ন বাবুর চক্ষে যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেলাগিল। অমরনাথও আবার এমন অবাধ্য যে শ্বশুরের নানাবিধ যানবাহনাদি সত্ত্বেও পদব্রজেই নরেন্দ্রনাথের সহিত যাতায়াত করেন। অবোধ অমরনাথ নরেনের নিকট কিছুতেই আপনার প্রভুত্ব রাখিতে পারেন

না এবং রাখিতে চেষ্টাও করেন না। অবশেষে শ্বশুর মহাশয় একদিন স্বয়ং দুই এক কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কিছু অনুযোগ করিতে উপক্রম করিলে অমরনাথ বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্বশুরের অভিপ্রায় কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কথা কহিতে এ পর্য্যন্ত কোন সুযোগ পান নাই। অদ্য শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ের উল্লেখ করাতে অমরনাথ সবিনয়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে নরেন্দ্রনাথ দরিদ্র হইলেও যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশকে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজারাও সম্মান করিতেন এবং নরেন্দ্রনাথের পিতাকে সকলেই স্বাধীনচেতা উন্নতমনা, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন ও নরেন্দ্রনাথের স্বভাব চরিত্র সকলে আদর্শ বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং অমরনাথ শূদ্র। এমন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বলাভ অমরনাথের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মানিতে হইবে।

তারাপ্রসন্ন বাবুর কথার উপর কথা কহিতে এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি নিজে একজন ধনবান ব্যবসাদার ছিলেন। অধিকাংশ দালাল ও ব্যবসাদারদিগের সংস্রবে তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইত, বিদ্বান স্পষ্টবক্তা ও উন্নতমনা লোক তাঁহার সংস্রবে বড় আসিতেন না ও আসিবার আবশ্যক হইত না। সুতরাং "কর্ত্তা যা বল্লেন" "যে আজ্ঞা হুজুর" প্রভৃতি পদ তাঁহার কর্ণকুহরে এত কলরব করিত যে তিনি যথার্থ উচিত কথা বড় শুনিতে পাইতেন না। সুতরাং এমন স্থলে যে অমরনাথের যুক্তিসঙ্গত কথা তাঁহার প্রিয় হইবে না তাহা বলা বাহুল্য। জামাতার কথায় তিনি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু কিছু না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। জামাতা প্রস্থান করিলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দুর্গে! আমায় আবার উপদেশ দেয়! এসব ইংরাজী লেখাপড়ার ফল! মেয়েটাকে একটা মূর্খের সঙ্গে বিয়ে দিলে ভাল হ'ত; এ ত হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলে দিয়াছি!!" হায় রে ইংরাজী শিক্ষা! অজ্ঞানান্ধকারপ্রসূত কত অভিশাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস যে তোমার শিরে বর্ষণ হইতেছে তাহা কে বলিবে?

এই হইল প্রথম সূত্রপাত। তারপর সকলেই প্রতি ঝোপে বাঘ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। অমরনাথ, শ্বশুরের কোন যুক্তিহীন অসঙ্গত আদেশ পালন না করিলে সেটা বেচারা ইংরাজী শিক্ষা ও গোবেচারা নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পড়ে! নরেন্দ্রনাথের অপরাধ তিনি অমরনাথকে আপনার সমকক্ষ ভাবেন কোন্ হিসাবে? শ্বশুরের কোন ত্রুটি দেখিলে অমরনাথ মনে করেন যে আমি উঁহার অপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে। আমি উঁহার ন্যায় ধনবান হইলে হয়ত আমাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। এ দিকে তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্রও কতকটা কুশিক্ষাবশতঃ কতকটা ঈর্ষাবশতঃ ও কতকটা বাল্যসুলভ চপলতাবশতঃ অমরনাথের প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। পাছে পিতার অধিক স্নেহ আকর্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে পিতৃসম্পত্তির অংশ আকর্ষণ করেন, বোধ হয় এই ভাবিয়াই, তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্র সারদাপ্রসন্ন সুবিধা পাইলেই অমরনাথের অতি সামান্য ত্রুটী অতিরঞ্জিত করিয়া

পিতার নিকট চিত্রিত করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তারাপ্রসন্ন বাবুর নিকট যে অগ্রে নালিশ করিত তাহারই জিত হইত। সুতরাং তারাপ্রসন্ন বাবুও জামাতার আচরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতে লাগিলেন। এ স্থলে যাহা সচরাচর হইয়া থাকে তাহাই হইল। তারাপ্রসন্ন বাবুর, তাঁহার পুত্রের এবং তাঁহার মতস্থ সকলের বিরক্তি একত্রীভূত হইয়া নির্দ্দোষী নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পড়িল। নরেন্দ্রনাথও যে নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে তারাপ্রসন্ন বাবুর স্নেহলাভ করিয়া পরে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া বড়ই কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। যদি প্রথম হইতে প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ চলিয়া আসিত, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হইত না। প্রথম প্রথম প্রভুর নিকট হইতে স্নেহমাখা ব্যবহার পাইতেন এবং আপনাকে সেই স্নেহের যথার্থ অধিকারীও মনে করিতেন; কেননা তিনি অমরনাথের বন্ধু। অবশেষে বিনা কারণে সেই স্নেহচ্যুত হইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি দেখিতেন তারাপ্রসন্ন বাবু বরং অপরের সহিত হাসিয়া কথা কহিতেন কিন্তু তাঁহার প্রতি গম্ভীর কর্ত্তব্যমিশ্রিত আদেশবাণী ভিন্ন অন্য কোন কথা কহিতেন না। নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইত অথচ নিরুপায়ে প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইতেন। তারাপ্রসন্ন বাবু নরেন্দ্রের কার্য্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পান না অথচ ত্রুটি দেখিবার জন্য নূতন নূতন কার্য্য করিতে আদেশ করেন। প্রথম প্রথম নরেন্দ্র যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে তারাপ্রসন্ন বাবু সস্নেহে বলিতেন "থাক, ও কাজ তুমি কেন করছ? ওকাজ ওরা করবে এখন" এখন তদপেক্ষা হীনতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন ও স্নেহের পরিবর্ত্তে নিতান্ত কঠোরকণ্ঠে আদেশ করিতেন। তারাপ্রসন্ন বাবু যদি অমরনাথের পূজনীয় আত্মীয় না হইতেন তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বে স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন। যে আত্মীয় তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন, পাছে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এই ভয়েও কর্ম্ম সহসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অমরনাথ সকলই বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু নিরুপায় হইয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল। তারাপ্রসন্ন বাবু, অমরনাথ ও নরেন্দ্রনাথ তিনজনের হৃদয়েই কেমন অন্ধকার করিয়া একটা মেঘ উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বুঝিলেন যে, বিলম্বে অথবা অবিলম্বে এই মেঘ হইতে অশনিপাত হইবেই হইবে, প্রত্যেকেই যেন এই দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অথচ প্রত্যেকে অতি সাবধানে আপনাকে এই অশনিপাতের লক্ষ্য হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন ভবিষ্যতে এই কলহবিবাদের উল্লেখ করিয়া কেহ যেন আমার নামে দোষ না দিতে পারে। অবশেষে তারাপ্রসন্ন বাবুর কোন আত্মীয়ের বিবাহে এই বর্ষণোন্মুখ মেঘ হইতে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হইল। হরকুমার বাবু তারাপ্রসন্ন বাবুর আত্মীয়। তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি তারাপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন যে "আপনার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীকে আমি নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহা-

দের নামের ও বাসস্থানের তালিকা দিয়া বাধিত করিবেন।” তারাপ্রসন্ন বাবু আপনার অধীনস্থ কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও উন্নত কর্ম্মচারীর নাম দিয়া বলিলেন অপর সকলকে আমার এই খানে বলিলেই হইবে। ভ্রমবশতঃই হউক অথবা ইচ্ছাবশতঃই হউক, তালিকার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের নাম ছিল না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে আমার বাসায় গিয়া আমাকে স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করা উচিৎ বলিয়া ইহাঁরা বিবেচনা করেন না। ভাল আমিও এ অপমানের প্রতিশোধ লইব! যাঁহাদের স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তারাপ্রসন্ন বাবু স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নরেন্দ্রকে কিছু বলিলেন না; নরেন্দ্রনাথ ইহাও লক্ষ্য করিলেন। পূর্ব্বে হয়ত নরেন্দ্র এ সকল তুচ্ছ বিষয় লক্ষ্য করিতেন না কিন্তু এখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যবহারে ছল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকলে নিমন্ত্রণে গেলেন, নরেন্দ্র যাইলেন না। তারাপ্রসন্ন বাবু নরেন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া অমরনাথকে বলিলেন “দেখ দেখি নরেন্দ্রের, ব্যবহার! সকলে আসিল আর বাবুর বুঝি আসা হ’ল না?” অমরনাথ ক্ষুণ্ণচিত্তে নীরব হইয়া রহিলেন।

পরদিন তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্র সারদাপ্রসন্ন নরেনকে বলিলেন “নরেন কাল নিমন্ত্রণে যাও নাই কেন?” নরেন্দ্রনাথ বলিলেন “আমার অসুখ করিয়াছিল।” “বাবা কাল তোমার অনুপস্থিতির জন্য তোমার উপর বড় রাগ করেছেন।” অন্য সময় তাঁহারা আগে সংবাদ লইতেন ‘কি অসুখ’ “কেন হল” “কেমন আছ” এখন কি না বলিলেন “বাবা বড় রাগ করেছেন!” নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন “তোমার পিতা রাগ করিলে আমার বড় ক্ষতি নাই; তিনি আমার চাকরীর কর্ত্তা, আমার জাতের আমার সমাজের কর্ত্তা নন। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তাই বলিলাম অসুখ করিয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম ইচ্ছা হয় নাই তাই যাই নাই, নিমন্ত্রণ হয় নাই তাই যাই নাই। অথবা তাঁহার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। তিনি শূদ্র—শূদ্রের ন্যায় থাকুন, তাঁহার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? তিনি যদি আমাকে পূর্ব্বের চক্ষে দেখিতেন তাহা হইলে আমি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতাম কিন্তু এখন তাঁহারও সেভাব আমারও সেভাব নাই।” নরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে এত কথা না বলিতেও পারিতেন, আর সারদাপ্রসন্ন কিছু এত রূঢ় কথা বলেন নাই যে; যাহাতে নরেন্দ্র এত আত্মহারা হইলেন কিন্তু কেমন যে বিধাতার খেলা, সময় সময় আমাদের বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা আত্মসংযম করিতে পারি না। বলা বাহুল্য সেইদিনই তারাপ্রসন্ন বাবু পুত্রের নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা অতিরঞ্জিত ভাবে জ্ঞাত হইলেন ও ক্রোধে অপমানে অধীর হইয়া স্থির করিলেন পরদিন প্রাতে আফিসে গিয়া প্রথমেই নরেন্দ্রনাথের এই রূঢ় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া বেতন কমাইয়া দিবেন অথবা তেমন তেমন দেখেন ত কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিবেন।

পরদিন প্রাতে কর্ম্মস্থলে গিয়া দেখিলেন নরেন্দ্র তখনও আসেন নাই। (আজকাল

নরেন্দ্র সকলের অপেক্ষা অগ্রে আসিতেন) নরেন্দ্র আসিলেই নিকটে পাঠাইয়া দিবার জন্য দ্বারবানকে অনুমতি করিয়া স্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র, তারের সংবাদ ও পত্রাদি দেখিতে দেখিতে একখানা বাঙ্গালা পত্র পাইলেন। পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন:—

“আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সসম্মানে নিবেদন—

মহাশয় আমাকে স্বয়ং অনুরোধ করিয়া যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সাধ্যমত পালন করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কোন অজ্ঞাত কারণে আপনি আমার উপর বিরক্ত হওয়াতে আমি নিজের ইচ্ছায় আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম। যদি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোন ত্রুটি দেখিয়া থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। এক সময়ে মহাশয় আমাকে নিজের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এ উপকার জন্মে বিস্মৃত হইব না। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।”

* * * * *

প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। তারাপ্রসন্ন বাবুর বড় কঠিন পীড়া, জীবনের আশা নাই, বাটীর সকলেই শোকে মগ্ন। দেশ মধ্যে কেমন একটা ভয়মিশ্র আবেগ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কলিকাতা হইতে ৩।৪ জন ডাক্তার আসিয়াছেন। আজ তারাপ্রসন্ন বাবুর জীবনের বড় কঠিন সন্ধিস্থল। তারাপ্রসন্ন বাবু আজ অনন্তের সীমায় উপস্থিত, আজ যদি রক্ষা পান তাহা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন, তাঁহার এমন যে কঠিন রোগ, নরেন্দ্রনাথ একদিনের জন্যও উঁকি মারেন নাই! কি অকৃতজ্ঞ! এখন অপর এক আফিসে উচ্চ বেতনে কর্ম্ম হইয়াছে কি না? হউক একবার আসিতে হয়।

রোগীর গৃহে প্রায় ৪।৫ জন চিকিৎসক ও পুত্র, জামাতা, পত্নী প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। সকলে একদৃষ্টে রোগীরদিকে চাহিয়া আছেন। মৌনভঙ্গ করিয়া প্রধান ডাক্তার (সাহেব) বলিলেন “এখন একমাত্র এবং শেষ উপায় এই যে—অপর কোন সবল লোকের শরীর হইতে শোণিত লইয়া ইহার শরীরে প্রবিষ্ট করান। রোগীর দেহে নূতন শোণিত সঞ্চারিত করিয়া দিলে রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। কিন্তু কে শোণিত দিবেন? যিনি দিবেন তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে।” তারাপ্রসন্ন বাবুর পত্নী বলিলেন “আমি দিব, আমার প্রাণ যায় যাক!” বাঙ্গালী স্ত্রীর পতিভক্তি দেখিয়া সাহেব মুগ্ধ হইলেন! স্বামীর জন্য অকাতরে মরিতে চায়! প্রকাশ্যে বলিলেন “আপনি স্ত্রীলোক তাহাতে প্রাচীনা, আপনার শোণিত লইলে কোন ফল হইবে না। আমি কোন সবল যুবকের শোণিত লইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কে শোণিত দিয়া এই মহাত্মার প্রাণরক্ষা করিবেন?”

অন্ধকার কোণ হইতে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত একব্যক্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সতেজ কণ্ঠে স্পষ্টস্বরে কহিল "আমি দিব।" আগন্তুকের বদনমণ্ডলের প্রায় সমস্ত ভাগই আবৃত, শীতকাল বলিয়া কেহ অকস্মাৎ এরূপ আবরণে সন্দিহান হয় নাই। ডাক্তার আগন্তুকের উলঙ্গ বাহু দেখিয়া বুঝিলেন লোকটা সবল বটে। গৃহস্থিত সকলে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক ডাক্তারের নিকট হইতে একখানা অস্ত্র লইয়া স্বীয় বাহুমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল "আবশ্যক মত শোণিত লউন।" ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে একবার আগন্তুকের একবার রোগীর দিকে চাহিতে লাগিলেন, ক্ষণকালপরে ডাক্তার গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "আপনারা এই অজ্ঞাত মহানুভবের সেবা করুন, রোগীর আর ভয় নাই কিন্তু ইঁহাকে আগে দেখুন।"

"আজ আমার প্রতিশোধ লইলাম" এই বলিয়া আগন্তুক সেবার অপেক্ষা না করিয়াই মুখের বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক দুর্ব্বলদেহে স্খলিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সকলে তাহার মুখ দেখিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল "নরেন্দ্রনাথ!"

বৃহস্পতি।

দূরত্ব, ভগণ ইত্যাদি। ক্ষুদ্রগ্রহগণ-অধ্যাসিত নভোমেখলা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে সৌরজগতের এবম্ভূত প্রদেশে প্রবেশ করা যাইতেছে যে, তাহার সহিত অভিপার্থিব গ্রহ-রাজ্যের অথবা ক্ষুদ্র গ্রহবলয়াবলি উপসেবিত অন্তরীক্ষের সাদৃশ্য নাই। সৌরজগতের এই উর্দ্ধাম্বর গ্রহগণের ব্যবধানের আধিক্য এবং আকারের বৈপুল্য উভয়ই বিস্ময়কর।

মহামায়া প্রকৃতি যেন এই সুবিশাল রঙ্গশালার পরিষদ্বর্গের মনোমধ্যে বিস্ময়রসের আবির্ভাব করাইবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্রগ্রহকুলের উর্দ্ধতমা ক্রেইরার অভিনয়ান্তে এই মহামহিম সুশোভন গ্রহবরের প্রবেশ আদেশ করিলেন। বৃহস্পতি কেবল সুরগুরু নহেন, ইনি আকারে মহিমায় ভারে, বিভবে, সর্ব্বতোভাবে গুরু।

এই সুদূর অন্তরীক্ষে প্রথমতঃ গ্রহরাজ (রবি ভিন্ন) বৃহস্পতিকে পর্য্যবেক্ষণ করুন। ইনি রবিপরিত ১১ বৎসর ৩১৪.৯ দিনে পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্য হইতে ইহার মধ্যম অন্তর ৪৮,২৭,১৬,০০০ মাইল কিন্তু কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব .০৪৮ প্রযুক্ত যখন অপহেলিকে থাকেন, তখন দূরত্ব ৫০,৫৮,৮৬,০০০ মাইল, আর যখন অনুহেলিকে থাকেন, তখন দূরত্ব ৪৫,৯৫,৪৫,০০০ মাইল হয়।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোম্বর মাসে পৃথিবী যখন বৃহস্পতি ও সূর্য্যের মধ্যে আসেন, তখন সুরাচার্য্য আমাদিগের খুব নিকটবর্ত্তী হন। এবং সূর্য্যকে যখন পৃথিবী ও গুরুর মধ্যগত দেখায় তখন তিনি পৃথিবী হইতে অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট হন; সুতরাং পৃথিবী হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব কখন কখন ৩৬,৬৪,৮১,০০০ এবং কখন বা ৪১,২৮,৭১,০০০ মাইল হয়। পৃথিবী যে দিবস রবির একদিকে এবং বৃহস্পতির বিপরীত দিকে থাকেন এবং তিন জ্যোতিষ্ক এক রেখাস্থ হন, সেই দিবস হইতে ৩৯৯ দিন পরে জ্যোতিষ্কত্রয়ের পুনঃ সদৃশভাবে সমাগম হয়। এই ৩৯৯ দিনের মধ্যে স্থূলতঃ বৃহস্পতি ২৭৯ দিন মার্গী এবং ১২১ দিন বক্রী থাকেন। এই শোভনতম গ্রহবর বর্ষে বর্ষে একমাস ছয়দিন বিলম্বে সূর্য্য হইতে ষড্ভান্তরিত হন। এই সময় তিনি কান্তিমতী তারার ন্যায় অর্দ্ধ রাত্রে ধীরে ধীরে যাম্যোত্তর রেখা অতিক্রমণ করেন, সুতরাং তখন তাঁহাকে অনায়াসে চিনা যায়। ইনি রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন এবং প্রতি দ্বাদশবর্ষে সেই নক্ষত্রে উপনীত হন। প্রতি বর্ষে তিন মাস পর্য্যন্ত ইহাকে সুখে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় অর্থাৎ যে মাসে উর্দ্ধসমাগম হয় এবং পরবর্ত্তী দুই মাসে।

বৃহস্পতি মণ্ডলের ব্যাস। এই মণ্ডলের নিরক্ষবৃত্তীয় ব্যাস অপেক্ষা আক্ষ্যব্যাস [illegible] পরিমাণে ছোট। দীর্ঘব্যাস ৮৬,৫২০ মাইল, হ্রস্বব্যাস ৮১১৪৩০ মাইল। সুতরাং উক্তমণ্ডলের ব্যাস ভূব্যাস অপেক্ষা ১১ গুণে অধিক; এবং ইহার ঘনফল পৃথিবীর ঘনফল অপেক্ষা ১,২৪৮ গুণ অধিক। অপর গ্রহ সকলের ঘনফলের সমষ্টি অপেক্ষা গুরুর ঘনমান অধিক।

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে।	বৃহস্পতির ভগণকাল	৪৩৩২ দি-১৯দ·১৪প-২০·৯ বি,
	মন্দপরিধির ব্যাস যুগ্মপাদে … …	৩১৫·১৫ কলা,
	„ অযুগ্মপাদে … …	৩০৫·৬০ কলা,
	ভূসাপেক্ষিক দূরত্ব যুগ্মপাদে … …	৫·১৪২৯ ,,
	„ অযুগ্মপাদে … …	৫·২০২৮ ,,
	মন্দফল বা কেন্দ্র সংস্কারের পরমপরিমাণ	৫°৫′৫৮″ ,,
	উপর্য্যুপরি দুই সমাগমের ব্যবধান কাল	৩৯৮দি ২১ঘ ২০ মি
	চাপাত্মক ব্যাস … … …	… ৩′ ৩০″
	কক্ষা পরিমাণ … … …	৫,১০,৭৫,৭৬৪ যোজন
	কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব … … …	… ০·০৪৫
	বিক্ষেপ … … …	১°

বৃহস্পতি ও পৃথিবী।

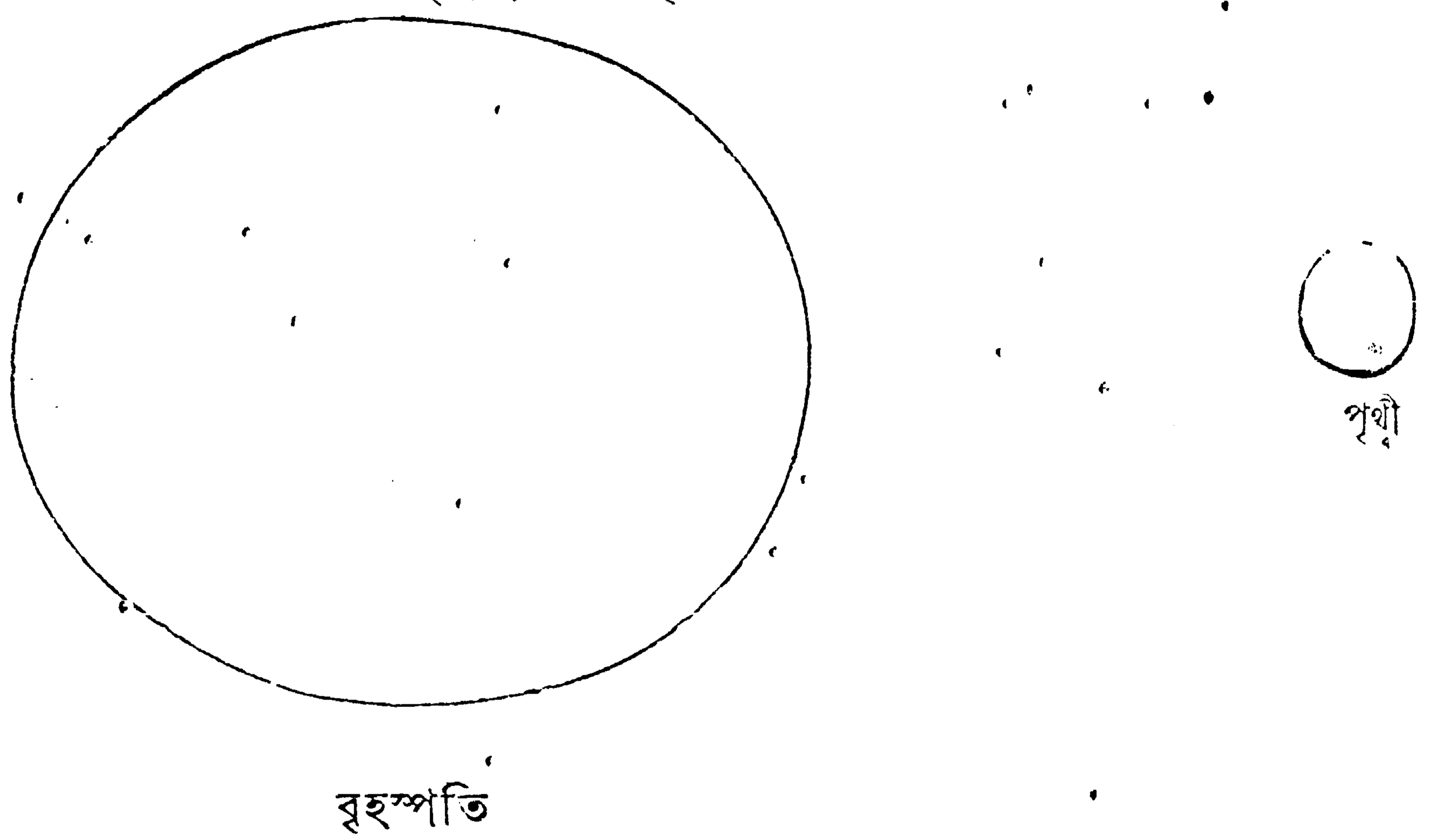

পৃথিবীর সহিত বৃহস্পতির তুলনা।

চন্দ্রকলার ন্যায় বার্হস্পত্য মণ্ডলের শুক্লাংশের হ্রাসবৃদ্ধি। বুঝা যায় না বিম্বের কিঞ্চিৎ ক্ষয় হয় বটে কিন্তু তাহা ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষয় যে হয় তাহার সন্দেহ নাই, কারণ বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণকালে যখন মণ্ডলের ক্ষয়িত অংশে স্পর্শ হয় তখন বৃহস্পতির উজ্জলাঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তদীয় চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া পড়ে! তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, মণ্ডলের কিঞ্চিৎ অপচিতি ঘটে। পৃথিবী যখন বৃহস্পতি ও সূর্য্যের মধ্যে আসেন তখন শুক্র ভিন্ন নভশ্চরদিগের মধ্যে এমন সুন্দর ও উজ্জল কোন গ্রহই দেখায় না।

বৃহস্পতির মধ্যাকর্ষণ। জ্যোতির্ব্বিদেরা বার্হস্পত্য মণ্ডলের সামগ্রীর যে পরিমাণ

অবধারিত করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যে কোন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক গণিত কর, সামগ্রীর সেই এক পরিমাণ অর্থাৎ সৌর-সামগ্রীর ১০ষ্টব উপলব্ধি হয়। বৃহস্পতির উপগ্রহের গতিদ্বারা হউক বা ক্ষুদ্র গ্রহগণের প্রতি তদীয় আকর্ষণের দ্বারা হউক পরিমাণ এতই ঠিক হয় যেন বৃহস্পতিকে তুলাযন্ত্রে ওজন করা হইয়াছে। পৃথ্বী অপেক্ষা বৃহস্পতি ৩০৯ গুণ ভারি। পৃথিবীর সান্দ্রত্ব যদি এক মনে কর, এবং বার্হস্পত্য মণ্ডলের কেন্দ্রপ্রদেশের সপাটত্ব যদি হিসাবের ভিতরে ধর তবে তন্মণ্ডলের সান্দ্রত্ব ·২৪২ হইবে। সাবিত্র মণ্ডলের সান্দ্রত্ব ·২৪২ ; এই একতার কি কোন ভৌতিক কারণ আছে? না ইহা আকস্মিক? বৃহস্পতি মণ্ডল যদি জলময় হইত, তবে উহার ওজন এখন যত আছে, তাহা অপেক্ষা আর ১ এর ৩ অধিক হইত। বৃহস্পতি যদি পৃথিবী অপেক্ষা বড় না হইতেন অথচ ওজনে ৩০৯ গুণ অধিক হইতেন, তবে তদীয় পৃষ্ঠে মধ্যাকর্ষণের বল পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা ৩০৯ গুণ অধিক হইত। কিন্তু বার্হস্পত্য বিম্বের ব্যাস ভূব্যাস অপেক্ষা ১১ গুণ বেশী, সুতরাং তদীয় পৃষ্ঠে আকর্ষণ অবশ্য উক্ত সংখ্যার বর্গের বিলোম অনুপাতে অল্পীভূত হইবে অর্থাৎ ১২১ঃ১ হইবে ; অথবা সূক্ষ্ম গণিত অনুসারে ১১·০৬ × ১১·০৬ = ১২২ ভাগের একভাগ হইবে। এখন ৩০৯কে ১২২ দিয়া ভাগ দিলে ২½ হয় ; তবেই বুঝা গেল যে, বৃহস্পতির মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা আড়াই গুণ অধিক। যে মানুষের ওজন এখানে ২ মোণ, তিনি সেখানে গেলে ৫ মোণ ভারি হইবেন। উত্তুঙ্গ স্তম্ভের চূড়া হইতে লোষ্ট্র পতিত হইলে পতনকালের প্রথম সেকণ্ডে উহা ৩৯·৩৬ ফুট পড়িবে। অতএব ভূমণ্ডলের উপকরণীভূত পদার্থ, এবং অত্রত্য জীবদেহ, বৃহস্পতির অঙ্গীভূত পদার্থ এবং তত্রত্য জীবদেহ অপেক্ষা লঘুতর ও অসংহত ; কিন্তু গ্রহের আকর্ষণের আধিক্য প্রযুক্ত সে সমস্ত বস্তুতঃ গুরুতর, শীঘ্রতর নিপতিত হয় এবং ওজনেও বেশী হয়। পরন্তু বিশ্ব-সংসারে পরমার্থতঃ কিছুই লঘু কিছুই গুরু নহে ; সমস্ত ভূতধর্ম্ম সাপেক্ষিক। এই গোলা এখানে রহিয়াছে বলিয়া এত ভারি—কোন ক্ষুদ্রগ্রহে লইয়া যাও, পালকের মত হাল্কা হইবে ; আবার সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া গেলে এত ভারি হইবে যে, উহা আর নাড়াচাড়া ভার হইয়া পড়িবে।

বৃহস্পতিলোকে ঋতু। যে ক্ষেত্রে পৃথিবী রবিপরিতঃ ভ্রমণ করেন, প্রায় সেই ক্ষেত্রেই অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ক্ষেত্রে বৃহস্পতির পর্য্যটন হয় ; কারণ তাঁহার কক্ষাক্ষেত্র ভূকক্ষা ক্ষেত্রে ১°১৮′৪১″ পরিমাণ মাত্রে অবনত। এই কক্ষার অনুহৈলিক বিন্দু এক্ষণে ক্রান্তিপাত হইতে ১৩° অন্তরে অর্থাৎ মীনান্তে রেবতীর অনতি দূরে। ১৮৮০, ২৫ সেপ্টেম্বরে এবং ১৮৯২, ৫ অগষ্টে বৃহস্পতি ঐস্থানে ছিলেন। তদীয় অপহৈলিকে আগমন অবশ্য আকাশের প্রতীপ ভাগে ১৮৮৬, ২২ এপ্রেলে এবং ১৮৯৮, ৩ মার্চ্চ তারিখে ঘটিয়াছিল এবং ঘটিবে। বৃহস্পতির মন্দোচ্চের বর্ষে বর্ষে ৫৭″ পরিমাণে পূর্ব্বাগতি হয়। সিদ্ধান্ত মতে মন্দোচ্চের বার্ষিকী গতি ·২৭″, গতি নাই বলিলেই হয়।

সূর্য্য হইতে বার্হস্পত্য মণ্ডলের দূরত্ব প্রযুক্ত এখান অপেক্ষা সেখানে আলোক ও তাপের

পরিমাণ ২৭ অংশে কম, সুতরাং ভূমণ্ডল রচনার প্রণালী হইতে ভিন্ন প্রণালী অনুসারে এই প্রকাণ্ড মণ্ডল বিনির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। বৃহস্পতি রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় অক্ষে প্রায় খাড়া হইয়া আবর্ত্তিত হন, কারণ আবর্ত্তন—অক্ষের অবনতি ৩° মাত্র, অতি অল্প। অতএব এলোকে ঋতুভেদ অসম্ভব। সেখানে যাবৎ বৎসর দিনমান সমান থাকে; রবি প্রায় নিরক্ষবৃত্তীয় ক্ষেত্রে গমন করেন। তথা শীত, উষ্ণ, বা সম-কোটিবন্ধ নাই; সর্ব্বত্র চিরবসন্ত। নিরক্ষ প্রদেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ তাপের পরিমাণ কম।

অস্মৎ সম্বন্ধে এই বিশাল গ্রহমণ্ডলে নানারূপ বিষমতা দৃষ্ট হয়। ইহার বার্ষিক গতি অতি মন্দ কিন্তু আহ্নিক গতি এত দ্রুত যে, এক 'এক আবর্ত্তন দশ ঘণ্টার কমে হয় সুতরাং রাত ও দিন দুইই ৫ ঘণ্টার কম।

বৃহস্পতির উপগ্রহ। ইটালির অন্তর্গত পাডুয়া নগরে সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ গালিলিও কর্ত্তৃক ১৮১০, ৮ জানুয়ারি তারিখে বৃহস্পতির তিন উপগ্রহ এবং ১৩ তারিখে চতুর্থ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক বারনার্ড পঞ্চম উপগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন; ইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহস্পতির নিকটস্থ এবং তন্মণ্ডলের মধ্য হইতে ১,১২,৫০০ মাইল অন্তরে থাকিয়া ১১ ঘ ৫৭ মি ২২½ সেকণ্ডে পরিভ্রমণ করে। প্রথমোক্ত চন্দ্র চতুষ্টয় বৃত্তাকার কক্ষে ভ্রমণ করে। বার্হস্পত্য জগৎ অতিপার্থিব জগতের যদ্রূপ হস্তমিত অনুরূপ, তদ্রূপ বিশাল গ্রহ চতুষ্টয় বিনির্ম্মিত অতিপার্থিব জগতের অক্লিষ্টা অনুকৃতি। এই উপগ্রহ চারিটি—চারিটি কেন, এখন পাঁচটি কেপ্‌লারীয় নিয়মের বশবর্ত্তী।

গালিলিওর আবিষ্কার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের ব্যবহার। গালিলিওর আবিষ্কারে বিজ্ঞান অনুরাগী ও অনুশীলকদিগের মধ্যে মহা কুতূহল উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতীব অভ্যসূয়াপরতন্ত্র হইয়া যাহাতে বিজ্ঞান পরিচিত-সীমা অতিক্রম না করে, সেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্রচেতাদিগের বিরক্তির অন্যতর কারণও ছিল। তাঁহাদিগের সংকীর্ণ মনোমধ্যে এই অসীম বিশ্বের যে সীমাবিশিষ্ট ভাব অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত গালিলিও দ্বারা আবিষ্কৃত সৌরজগতের সামঞ্জস্য হয় না। প্রাচীন গণিতজ্ঞ ক্লাবিয়স ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন 'এই উপগ্রহ চতুষ্টয় গালিলিওর দূরবীক্ষণের সুত চতুষ্টয়।' কিন্তু এই সাধু যখন স্বচক্ষে চারি চন্দ্র দেখিলেন তখন তিনি নিজের ভ্রমস্বীকার পূর্ব্বক জাত-প্রত্যয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপ কুৎসাবাদ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থে ক্ষীণশ্রদ্ধ কতিপয় লোকে দর্শন করা দূরে থাকুক দূরবীক্ষণে হাতে করিতে আশঙ্কা করিলেন, পাছে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কলুষীকৃত হইয়া যান। ইহাঁদিগের মধ্যে জনৈকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নর্ম্মচ্ছলে গালিলিও বলিয়াছিলেন 'ভরসা করি এই সন্দিগ্ধচেতা যেন স্বর্গারোহণ করিতে করিতে পথিমধ্যে বার্হস্পত্য চন্দ্র চতুষ্টয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।' ১৮২৩ অব্দে মুদ্রিত নিউটনের সুপ্রসিদ্ধ প্রিণসিপিয়া গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, 'মহাকর্ষণ ব্যাখ্যাস্থলে পৃথিবীর গতি স্বীকার করি, কিন্তু

আমরা পোপের আজ্ঞাধীন, পৃথিবীর গতিবাদের বিরুদ্ধে পোপ যে সকল হুকুম জারি করিয়াছেন তাহার বিপরীতাচরণ আমাদের মতবিরুদ্ধ। বোধহয় বার্হস্পত্য চন্দ্রের অস্তিত্ব প্রচারের বিপক্ষে বাবাজী কোন আজ্ঞা ঘোষণা করিয়া থাকিবেন!

ভারতবর্ষে অদ্যাপি কোন নবাবিষ্কৃত বিষয় দেখিলে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। প্রাচীন সিদ্ধান্তমতে গণিতগ্রহ দৃক্‌সিদ্ধ হয় না তাহা আমাদের মধ্যে অনেকে জানেন, কিন্তু পাছে ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস জন্মে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না!

১৮৫২ অব্দে ধর্ম্মপ্রচারক ষ্টডার্ড পারস্য দেশের অন্তর্গত ওরুমিয়া নগরে প্রত্যূষে যাবৎ না বৃহস্পতি অরুণাভিভূত হইয়াছিলেন, তাবৎ তদীয় দুইটি উপগ্রহ পুনঃ পুনঃ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রুস-পর্য্যাটক বেঞ্জেল লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি সাইবিরিয়া দেশে ছিলেন তখন একজন ব্যাধের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, 'আমি এখনই দেখিলাম ঐ বড় তারাটী একটী ছোট তারা গিলিল এবং অচিরে সেটিকে বমন করিল; অর্থাৎ সে বৃহস্পতির তৃতীয় চন্দ্রের নিমীলন ও উন্মীলন দেখিয়াছিল। বস্তুতঃ তাতারদিগের দৃক্‌শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

চন্দ্র চতুষ্টয়ের সবিশেষ বিবরণ। এ চারিটি নামবিশেষ দ্বারা আহূত হয় না। ইহারা মূলগ্রহ হইতে ইহাদের অন্তর অনুসারে ক্রমসংখ্যা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ) দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি মণ্ডলের মধ্য হইতে উপগ্রহগণের অন্তর যথাক্রমে ২,৬১,৫৫০; ৪,১৬,৪৬০; ৬,৬৪৯৪০; এবং ১২,৩১২০০ মাইল। ইহাদের ব্যাসের পরিমাণ অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই; স্থূলতঃ ১মের ব্যাস ২,৫০০, ২য়ের ২,২০০, ৩য়ের ৩,৭০০, ৪এর ৩,১০০ ধরিলে ২০০, ৩০০ মাইলের অধিক ভুল হইবে না।

চন্দ্র চতুষ্টয়ের পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে নিম্নরূপ দেখাইবে।

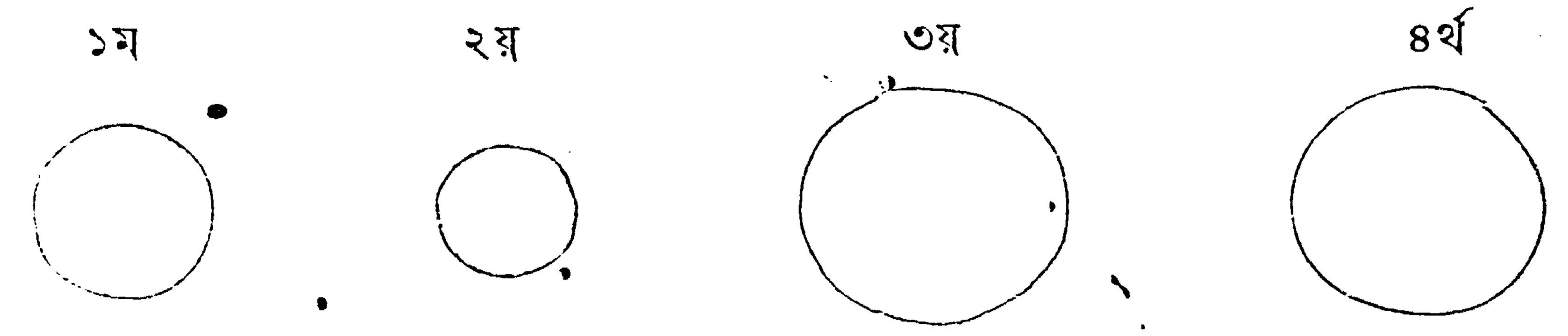

ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি আমাদের চাঁদের মত বড়। সুতরাং এতদ্বারা আমাদের চাঁদের সহিত বৃহস্পতির চারিই চাঁদের তুলনা হইল। বৃহস্পতির নিরক্ষবৃত্তের ক্ষেত্রে ১ম উপগ্রহের কক্ষাক্ষেত্র ৬" পরিমাণে অবনত, ২য়ের ১'৫," ৩য়ের ৫'২" এবং ৪র্থের ২৪'৪" অতএব বৃহস্পতির কক্ষাক্ষেত্রে উহাদের কক্ষার অবনতি যথাক্রমে ৩°৫', ৩°৪', ৩° এবং ২° ৪১'।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, পার্থিব চন্দ্রের ন্যায় বার্হস্পত্য চন্দ্র চতুষ্টয়ের অক্ষাবর্ত্তন কাল উহাদের ভগণ কালের সমান, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

বৃহস্পতির অক্ষাবর্ত্তন। পৃথিবী যেমন স্বীয় অক্ষপরিতঃ ২৪ ঘ, ৫৬ মি, ৪.০৯ সে,

সময়ে একবার আবর্ত্তিত হন তেমনই বৃহস্পতি ৯ ঘ, ৫৫ মি, ২০ সে, একবার স্বীয় অক্ষে ঘুরেন; অর্থাৎ বৃহস্পতি-লোকে এই ৯ ঘ, ৫৫ মি, ২০ সে, নাক্ষত্র দিনের পরিমাণ। বৃহস্পতিমণ্ডলের চিরস্থায়ী চিহ্নের আবর্ত্তনকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বার্হস্পত্য দিনমান নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মণ্ডলের পদার্থকণা প্রতি মিনিটে ৪৬৬ মাইলের অধিক বেগে ঘুরিতে থাকে; তবেই উহা পৃথিবীর নিরক্ষদেশীয় কণা অপেক্ষা সাতাইস গুণ বেগে ধাবিত হয়। এই বেগই বার্হস্পত্য মণ্ডলের অসাধারণ গোলাভাসত্বের কারণ। এই দ্রুত-বেগবশতঃ কেন্দ্রবিমুখ বলের আধিক্য জন্মে সুতরাং নিরক্ষপ্রদেশ উদারাকারে প্রলম্বিত হয় কারণ মণ্ডল অদ্যাপি স্থথনম্য অবস্থায় আছে বলিয়া বোধ হয়।

বার্হস্পত্য দিনমান পার্থিব দিনমানের অর্দ্ধেরও ন্যূন। বৃহস্পতির ভগণকাল ৪৩৩২ পার্থিব দিন সুতরাং তদীয় বর্ষ বার্হস্পত্য মানে ১০৪৮৫ দিন হয়।

বৃহস্পতি-মণ্ডলে মেখলা। দূরবীক্ষণ সহকারে মঙ্গল-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে তথা মহাদ্বীপ ও সাগর সদৃশ বৃহদাকায় জলের ও স্থলের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। তথা মেঘ কুহেলিকা ও তুষারের উপচিতি ও অপচিতি নিবন্ধন মণ্ডল কখন একপ্রকার কখন অন্য প্রকার দেখায়। কিন্তু বার্হস্পত্য মণ্ডলের লক্ষণ সকল অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রধান লক্ষণ নিরক্ষবৃত্তের সমান্তর কতিপয় মেখলা; এগুলি বিস্তৃত নানা আভাবিশিষ্ট শ্যামল বা শ্বেতশ্যামল ডোরা। বৃহস্পতিমণ্ডলের গোলাভাসত্ব উহার আক্ষ্য আবর্ত্তনের একটি প্রমাণ; উক্ত মেখলাবলির পরিবর্ত্তন আক্ষ্যাবর্ত্তনের স্বতন্ত্র প্রমাণ। নিরক্ষদেশস্থ বিস্তীর্ণ মেখলাটী কুটিলাকার, ঈষৎ পীতাভ কখন কখন কৌসুম্ভ বা স্বুবর্ণগৌরিক দেখায়; মণ্ডলের অন্যান্য মেখলা অপেক্ষা এই মেখলার বর্ণ গাঢ়তর। এই মেখলা এবং কখন কখন অপর মেখলাও অণ্ডমালাবৎ দেখায়। এক একটি অণ্ডাকারের ব্যাস পাঁচ হইতে দশ হাজার মাইল, এবং দেখিতে সচ্ছায় মেঘবৎ।

আবার কতকগুলি ডোরা হেঁকাতেও আছে। হেঁকাতে ডোরাগুলি বোধ হয় বৃহস্পতি-মণ্ডলে মেঘাবরণে রন্ধ্র। এইগুলির আকার বোধ হয় যেন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবী হইতে গুরুর দূরত্বের হিসাব ধরিলে প্রতীতি হইবে যে, তত্রত্য বায়ুমণ্ডলে প্রবল বাত্যাবেগে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল করিয়া মেঘ চলিতেছে।

কখন বা মণ্ডলের দক্ষিণে অনেক সমান্তর মেখলা দৃষ্ট হয়। মেখলা সকলের বিন্যাসে বিবিধ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। ছোট ছোট সমভাবাপন্ন মেখলার মধ্যে একটি বড় মেখলা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার অংশবিশেষ সঙ্কীর্ণ এবং ইহার মধ্যে মধ্যে মেঘরাশি অবলোকিত হয়। কখন কখন অনেক শ্যাম চিহ্নও লক্ষিত হয়। বোধ হয় এগুলিও মেঘ-মেখলার রন্ধ্র।

বার্হস্পত্যমণ্ডলে যে চিহ্নটি বৃহল্লোহিত লাঞ্ছন নামে অভিহিত, সেটি অতীব অপূর্ব্ব। এই চিহ্নটি প্রথমতঃ বাদামে বালার মত দেখায়; পরে ক্রমে ক্রমে অণ্ডাকার চিহ্নে পরিণত হয়,

এবং অন্তর্ভূত শুক্লাংশ সমভাবাপন্ন অনুজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। বলয়াকার হইতে অণ্ডাকারে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। এই কাল মধ্যে উক্তচিহ্ন নানারূপ ধারণ করে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাষ্পের লক্ষণ এবং মধ্যে মধ্যে নৈসর্গিক আলোকের লক্ষণ (বিশেষতঃ মধ্যমেখলায়) দৃষ্ট হয়। এই আলোক বোধ হয় মণ্ডলের ভিতর হইতে আইসে। বৃহস্পতির বায়ুকোষের বহির্ভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল এবং তত্রত্য মেঘরাশি পার্থিব মেঘরাশির সদৃশ আলোক প্রতিভাত করে।

মেখলার উৎপত্তি। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভ প্রযুক্ত তদীয় মণ্ডলে উক্ত-রূপ মেখলা ও চিহ্ন সকলের উৎপত্তি হয়। বৃহস্পতির অক্ষাবর্ত্তনকাল ৯ঘ, ৫৫½ মিনিট; তাহা হইলেই আবর্ত্তনের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৭·৭ মাইল। সৌরজগতে এরূপ দ্রুতগতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

বৃহস্পতিলোকে আমাদের মত জীবের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায় এবং তত্রত্য বায়ু-মণ্ডলের তাপাতিশব্য যদি মান, তবে বায়ুকোষের বিক্ষোভ সম্বন্ধে কোন বাধা দেখা যায় না। বৃহস্পতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলেও সূর্য্যের সমান তপ্ত নহে। সূর্য্যের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সমস্ত মণ্ডল সূষ্ণ। সূর্য্যাতপ আমাদের উপলব্ধি হয় এবং তদীয় দীপ্তিকোষ-বিনির্গত অতীব প্রখর আলোক আমাদের প্রত্যক্ষ; কিন্তু বৃহস্পতি হইতে তাপ বিনির্গত হয় না এবং তদীয় আলোক উগ্র নহে। অতএব এ মণ্ডল অত্যন্ত উষ্ণ হইলেও সূর্য্যের ন্যায় চণ্ড-রশ্মি নহে অথচ তাঁহার উষ্ণতা এত অধিক যে, তদীয় স্বাভাবিক আলোকের কিয়দংশ নিষ্প্রভ মেঘাক্রান্ত বায়ুমণ্ডল দিয়া বহির্গত হয়।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে যে সকল উপপ্লব ঘটে, তাহাতে সূর্য্যের কর্তৃত্ব যদি থাকে তবে তাহা অত্যল্প, কিম্বা তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য নহে। এক পক্ষে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বার্হস্পত্যমণ্ডলে ঋতু-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে রবির প্রভাব মন্দ ও অতি অল্প; পক্ষান্তরে লক্ষিত হইতেছে যে বৃহস্পতির বায়ুকোষে রবির এরূপ আধিপত্য নাই যে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা অপরিবর্ত্তিতভাবে রাখিতে পারেন। যদি বৃহস্পতির অখিল মণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় এবং সেই উত্তাপ তদীয় মধ্যাকর্ষণের ভয়ানক ফলের বিপরীত আচরণে সমর্থ হয় তবে মণ্ডলমধ্যে যে কোনরূপ বিস্ময়জনক উপদ্রব ঘটুক না কেন, তাহা দুরবগাহ্য নহে। এরূপ অবস্থায় নিম্নস্তরে বিশাল বাষ্পরাশি উৎপাদিত হইয়া ঊর্দ্ধপ্রদেশে ঘনীভূত হইতে থাকিবে। কোন কোন সময়ে বৃহস্পতি-মণ্ডলের মধ্য মেখলা কখন বা অপর মেখলা মেঘের অস্তিত্বব্যঞ্জক শুক্লবর্ণ ধারণ করে। কখন বা মেখলায় বর্ণ বিশেষ দেখিয়া বুঝা যায় যে, অধঃস্থিত দেদীপ্যমান পদার্থরাশির কিয়দংশ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে,—কখন বা মেখলাবলি সরল ও সমভাবাপন্ন,—কখন বা তদ্দ্বারা বিক্ষোভ-বিমর্দ্দিত লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল ব্যাপারের তথ্য নির্দ্দেশ করা সুসাধ্য নহে। যেমন সৌরলাঞ্ছনের কালভেদে

অবস্থান্তরের বিশিষ্ট কারণ পাওয়া কঠিন, তেমনই বার্হস্পত্য মেখলার পরিবর্ত্তনের প্রকৃত হেতু সুলভ নহে। কিন্তু তা বলিয়া সৌরলাঞ্ছন দর্শন করিয়া তদীয় প্রজ্জ্বলিত দীপ্তিকোষের অবস্থা সম্বন্ধে মত-প্রকাশের বাধা দেখা যায় না।

বার্হস্পত্যমণ্ডলের মধ্য মেখলায় যে আলোহিত প্রভা দৃষ্ট হয়, তাহা সুগভীর অভ্রাক্রান্ত বায়ুমণ্ডলের অধঃস্থিত প্রদীপ্ত পদার্থনিচয়ের স্বাভাবিক আলোকসম্ভূত, অথবা সে আলোক স্বভাবতঃ শুক্ল আলোহিত বাষ্পরাশি মধ্যে পতিত হইয়া রক্তাভ ধারণ করে। যে পক্ষ গ্রহণ কর ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বার্হস্পত্য আলোকের অধিকাংশ প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ। বৃহস্পতিমণ্ডল দেখিতে যেন প্রকাণ্ড সান্দ্রীভূত সমুজ্জ্বল মেঘপিণ্ড; সুতরাং তদীয় আলোক তুষার-সন্নিভ। আমাদের চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ পদার্থনিচয়ে বিনির্ম্মিত, বৃহস্পতিমণ্ডল যদি সেইরূপ পদার্থসমূহে বিরচিত হইত তবে তাহার তিনগুণ আলোক পৃথিবীর দিকে প্রতিভাত হইত; কিন্তু মণ্ডলটি কেবল নির্ম্মল তুষারনির্ম্মিত হইলেও যত আলোক পাইবার সম্ভাবনা, তত আলোকও পাওয়া যায় না। বৃহস্পতিমণ্ডলের অধিকাংশ শুভ্র নহে। বার্হস্পত্য আলোকের কিয়দংশ তাহার স্বকীয় আলোক।

বৃহস্পতিমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত, তজ্জন্য তথা হইতে প্রভূত আলোক আসিবে এমত কোন কারণ নাই। বৃহস্পতিমণ্ডল প্রদীপ্ত শুক্লাগ্নিবৎ হইলেও সম্পূর্ণ মেঘাবৃত থাকিতে পারে এবং আমরা একটু আলোক না পাইতেও পারি অথবা তদীয় মণ্ডলের উপরিভাগ উত্তপ্ত লৌহ-লোহিত হইলে প্রচুরতাপ প্রদান করিতে পারে কিন্তু আলোকের ভাগ যৎসামান্য হইতে পারে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল যে অত্যন্ত উত্তপ্ত তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ দেখান যাইতেছে। বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয়কে সাধারণ দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে সে চারিটি আলোক বিন্দুবৎ দেখায়, কিন্তু সে বিন্দুগুলির ব্যাস ২০০০ মাইলেরও অধিক তদীয় মেঘমেখলার লক্ষণ দেখিয়া প্রতীতি হয় যে তাহার গভীরতা ২০০০ মাইলের কম হইবে না; না হয় ধর যে উক্ত ব্যাসের বিংশতি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১৬০ মাইলের কম হইবে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্ববর্ণিত মেঘরাশি সকল সুগভীর বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হইতে থাকে।

বৃহস্পতি বিম্বের দৃশ্য, দৃশ্যের পরিবর্ত্তন, উহার পিণ্ড ও সামগ্রী সূচিত ভৌতিক অবস্থা, ইহার উপগ্রহের গতির গণিতাগত ফল, উপগ্রহগণের সমাগম ও ভেদযোগের পূর্ব্বে বৃহস্পতি মণ্ডলে প্রবেশ করিবার সময় অনন্যসদৃশ চেষ্টিত, তাহাদিগের ছায়ার ভঙ্গি, এবং ছায়ার প্রবেশের পর মধ্যে মধ্যে দর্শন, এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে সূর্য্য মণ্ডলের মত বাস্তব বৃহস্পতিমণ্ডল পরিদৃশ্যমান ও পরিমিয়মান বৃহস্পতিমণ্ডলের বহুদূর অভ্যন্তরে আছে। ভূলোক অপেক্ষা জীবলোকের গ্রহজীবনের তরুণাবস্থা; এবং ইহাকে অত্যন্ত তাপ বিশিষ্ট দেখিয়া সূর্য্যসদৃশ জ্ঞান হয়।

বার্হস্পত্য উপগ্রহ চতুষ্টয়ের গ্রহণ।

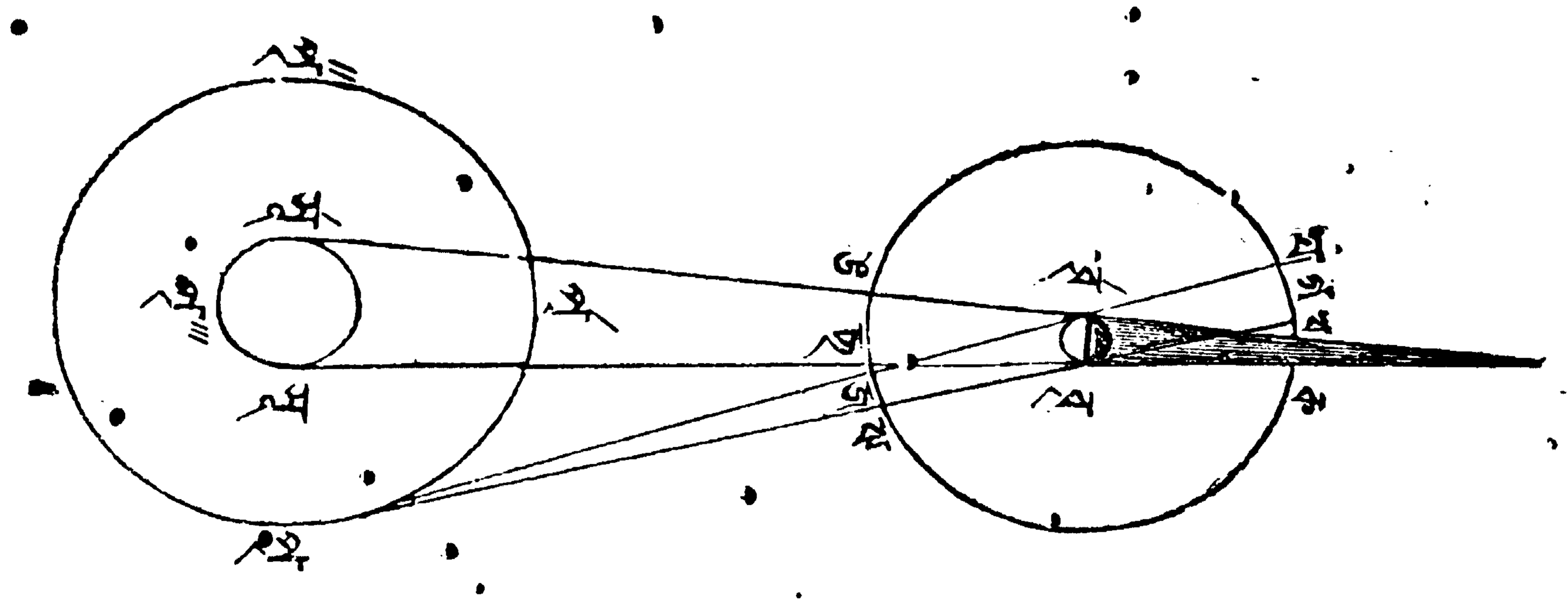

বার্হস্পত্য উপগ্রহগণ তদীয় ছায়ায় পতিত হইয়া অদৃষ্ট হয়। পরিলেখে বৃবৃ´ বৃহস্পতি; কখ বৃ´বৃ বৃহস্পতির ছায়া; সূসূ´ সূর্য্য; পৃপৃ´ পৃথিবী, বৃহস্পতি হইতে পাদান্তরে অর্থাৎ ৯০° অন্তরে স্থিত। মনে কর ক খ ঙ ঝ অন্যতম উপগ্রহের কক্ষা এবং ধর, এই কক্ষার ক্ষেত্র ক্রান্তিবৃত্তের ক্ষেত্রের সহিত একীভূত। পৃবৃ ও পৃবৃ´ রেখা দুইটী উপগ্রহের কক্ষাকে জ ঝ গ ঘ বিন্দুতে কাটুক; ক, খ ছায়ার প্রান্তদ্বয়। ভূচ্ছায়ার দৈর্ঘ্য নিরূপনের বিধি অনুসারে গণিত করিলে বৃহস্পতির ছায়া ৫ কোটি ২০ লক্ষ মাইলের অধিক লম্বা হইবে। উপগ্রহের মধ্যে অত্যন্ত দূরবর্ত্তিটিরও অন্তর যখন ১০ লক্ষ মাইলের কিঞ্চিদধিক তখন প্রতি ভ্রমেই তাহাদের সকলকেই ছায়ায় পতিত হইতে হয়, কেবল ৪র্থ উপগ্রহের কক্ষার অবনতিপ্রযুক্ত কখন কখন ছায়া এড়াইয়া যায়।

গ্রহণ, ভেদযোগ সমাগম ইত্যাদি। বৃহস্পতি পরিতঃ উপগ্রহের ভ্রমণকালে চতুর্বিধ ব্যাপার লক্ষিত হয়।

১মতঃ উপগ্রহ মূলগ্রহের ছায়ায় পতিত হইলে উপগ্রহের গ্রহণ হইল বলা যায়। কএতে ছায়ায় উপগ্রহের প্রবেশকে তাহার নিমীলন বলে। আর খএতে ছায়া হইতে বহির্গত হওয়াকে উন্মীলন কহে।

২য়তঃ উপগ্রহগণ যখন সূবৃ সূ´বৃ´ রেখার মধ্যগত চ ছ স্থানে থাকে তখন তাহাদের ছায়া কাল তিলকের ন্যায় গ্রহবিম্বে পতিত হয়, যেমন সূর্য্য গ্রহণকালে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পতিত হয়; এই ব্যাপারকে ছায়া সংক্রম বলে।

৩য়তঃ উপগ্রহ যখন গ্রহের পশ্চাৎভাগে পৃবৃ গ ও পৃ´বৃ´ ঘ এর মধ্যে থাকে তখন গ্রহদ্বারা উপগ্রহ আচ্ছাদিত হয়। উপগ্রহ গ্রহের এক দিকে অস্তমিত এবং অপরদিকে উদিত হয়, এরূপ ঘটনাকে আচ্ছাদন বলে।

৪র্থতঃ উপগ্রহ যখন বৃহস্পতি ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পৃবৃ রেখা হইতে পৃবৃ´ রেখায় যায় তখন উহার বিম্ব গুরুবিম্ব দিয়া যায় অর্থাৎ বোধ হয় যেন উপগ্রহটি বার্হস্পত্য মণ্ডল দিয়া চলিতেছে। গ্রহবিম্ব যদি শুক্ল মেখলা দিয়া চলে তবে উহাকে শুক্লতর দেখায় আর

শ্যাম মেখলা দিয়া চলিলে শ্যামতর দেখায়। গ্রহবিম্বে উপগ্রহের প্রবেশকে সংক্রম এবং বহির্গমনকে নিষ্ক্রম বলে। এই ব্যাপারের নাম ভেদযোগ।

বৃহস্পতি যখন পাদান্তরে থাকেন তখন উপগ্রহগণের পরিভ্রমণে উক্তরূপ ব্যাপার সকল অবলোকিত হয়। বৃহস্পতি পাদান্তরের সন্নিহিত হইলে ৩য় ও ৪র্থ উপগ্রহের কএ ও খএ নিমীলন ও উন্মীলন উভয়বিধ ব্যাপার বৃহস্পতির এক দিকেই দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু ১মএর ও ২য়এর কেবল নিমীলন দেখা যায়। উন্মীলন কালে গ্রহবিম্ব দ্বারা উপগ্রহ আচ্ছাদিত হয় এবং গ্রহের পশ্চাৎভাগ অতিক্রম না করিলে পুনরুদিত হয় না।

উপগ্রহগণের গ্রহণ দেখিয়া দেশান্তর নিরূপণ। বার্হস্পত্য উপগ্রহের আবিষ্কারের অবিলম্বে প্রতিভাসম্পন্ন গালিলিও বুঝিয়াছিলেন যে এই উপগ্রহগণের গ্রহণ দেশান্তর নিরূপণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাঁহার আশা ছিল যে এই উপায় অবলম্বন করিলে নাবিকদিগের পক্ষে দেশান্তর নিরূপণ অতি সহজ হইবে। কিন্তু জাহাজের উপর থাকিয়া গ্রহণে স্পর্শাদি কাল অবধারিত করার পক্ষে যে অনেক ব্যাঘাত তিনি তাহা ভাবেন নাই। সত্য বটে যে, যে সকল দেশের ক্ষিতিজের ঊর্দ্ধে গ্রহণ হয় তত্তৎ দেশের লোকেরা তাৎকালিক ব্যাপাররূপ সেই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ঘড়ীর কালান্তর প্রাপ্তি সুতরাং দেশান্তর লাভ হয়। যেমন উজ্জয়িনীর গণিত গ্রহণ কলিকাতায় দেখিলে, উজ্জয়িনীর গণিতকাল ও কলিকাতার বেধলব্ধকাল উভয়ের অন্তর পাওয়া যায় সুতরাং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতা কত মাইল পূর্ব্বে তাহা জানা যায়। কিন্তু গ্রহণ কাল নিরূপণ জন্য পর্য্যবেক্ষণে যতদূর সূক্ষ্মতা প্রয়োজন তাহা ভূমিতেই যখন দুর্লভ তখন সে সূক্ষ্মতা সাগরের উপর কিরূপে সুলভ হইবে? ছায়াতে প্রবেশকালে উপগ্রহের আলোক ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং ছায়া হইতে বিনির্গমনকালে বাড়িতে থাকে সুতরাং উপগ্রহের স্পর্শের ও মোক্ষের বেধলব্ধকাল দূরবীক্ষণের তেজস্বিতার উপর নির্ভর করে। অতএব এ উপায় দ্বারা আশার অনুরূপ ফল লাভ হইতে পারে না স্থূল পরিমাণ পাওয়া যায়।

উপগ্রহগণের বিন্যাস। বৃহস্পতির উপগ্রহ চারিটির অবস্থান অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হয়ত চারিটি উপগ্রহই বৃহস্পতির এক দিকে দেখা যায়; প্রায়ই দুই বা তিনটির অধিক দেখা যায় না; কখন বা কেবল একটিমাত্র নয়ন গোচর হয়; লেখা আছে যে এক এক সময়ে ক্ষণকালের জন্য চারিটিই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ১৮৬৭ অব্দে ২১ অগষ্ট তারিখে প্রায় পৌণে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃহস্পতিকে অনুচর বিরহিত দেখা গিয়াছিল।

প্রথম তিনটি উপগ্রহের মধ্যম গতির অপূর্ব্ব সম্বন্ধ।

১মএর গতি + দ্বিগুণিত ৩য়এর গতি = ত্রিগুণিত ২য়এর গতি; অর্থাৎ ১মএর ভোগ × ২ (৩য় এর ভোগ) — ৩ (২য় এর ভোগ) = ধ্রুবাঙ্ক। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে এই ধ্রুবাঙ্ক ১৮০°।

এই সম্বন্ধ নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

	নক্ষত্র মানে ভগণ কাল					প্রতি সেকণ্ডে গতি
উপগ্রহ	দি	ঘ	মি	সে	সেকণ্ড	,,
১ম	১	১৮	২৭·	৩৩·৫০৫	১,৫২,৮৫৩·৫০৫	৮·৪৭৮৭০৬
২য়	৩	১৩	১৩	৪২·০৪০	৩,০৬,৮২২.০৪০	৪·২২৩৯৪৭
৩য়	৭	৩	৪২	৩৩·৩৬০	৬,১৮,১৫৩·৩৬০	২·০৯৬৫৬৭
৪র্থ	১৬	১৬	৩২	১১·২৭১	১৪,৩১,৯৩১.২৭১	০·০৯৮৭৯০

সুতরাং ১ম এর ৮·৪৭৮৭০৬ × ১ = ৮·৪৭৮৭০৬,

২য় এর ৪·২২৩৯৪৭ × ৩ = ১২·৬৭১৮৪১,

৩য় এর ২·০৯৬৫৬৭ × ২ = ৪·১৯৩১৩৪,

প্রথম ও তৃতীয় রাশির যোগে ১২·৬৭১৮৪০ প্রায় ঠিক দ্বিতীয় রাশির সমান।

এতদ্দারা সিদ্ধ হইতেছে যে প্রথম তিন উপগ্রহের যুগপৎ গ্রহণ হইতে পারে না; আর যখন দুইটির গ্রহণ একেবারে হয় তখন তৃতীয়টি পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যে আসে; এ অবস্থায় উপগ্রহ সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ট হয়, তবে অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণে দেখা যায়।

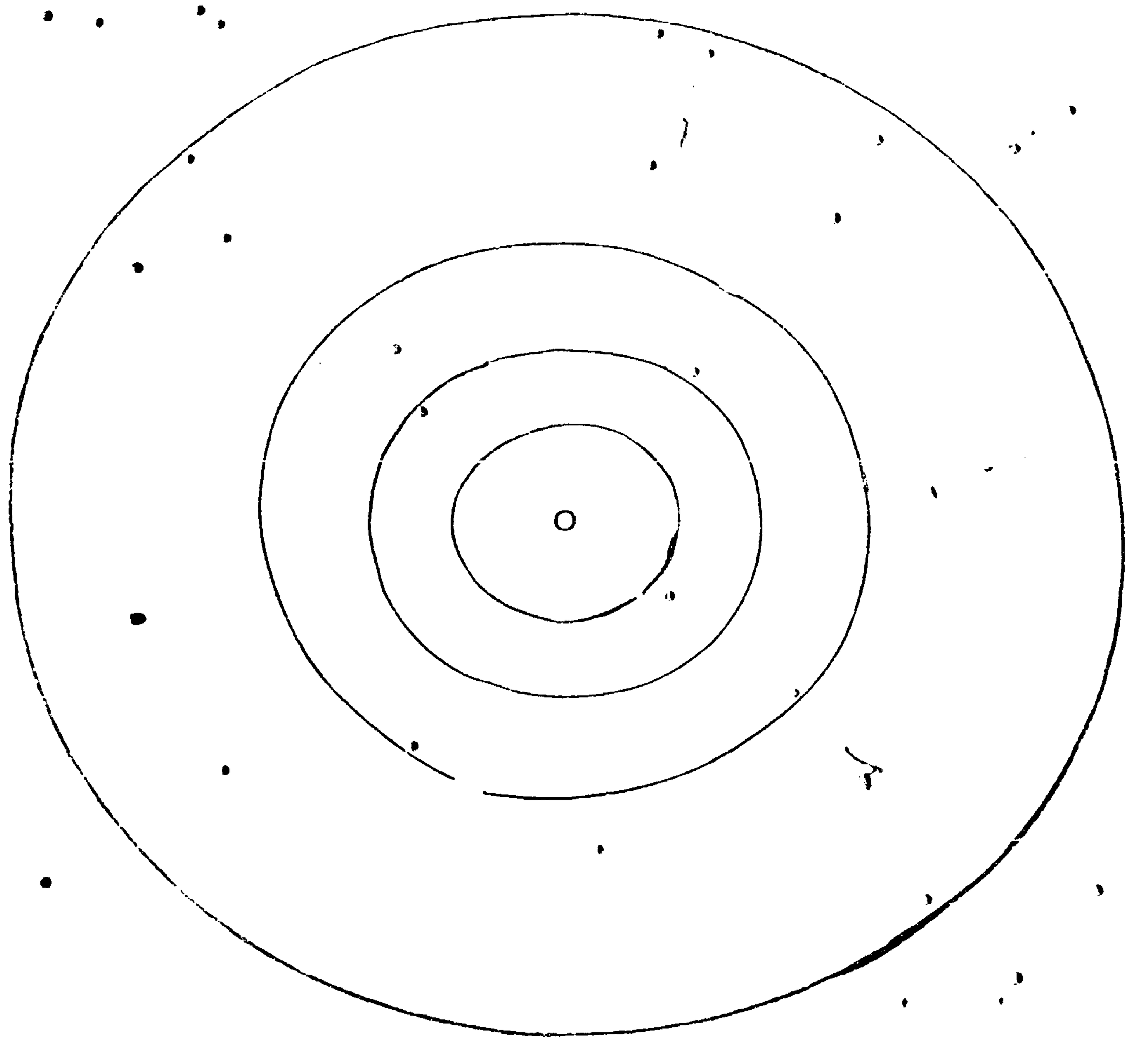

বার্হস্পত্য জগতের পরিলেখ।
কক্ষা চতুষ্টয় যথা পরিমাণ অঙ্কিত হইয়াছে।

বারজেনটিনের সিদ্ধান্ত। ইনি বার্হস্পত্য চন্দ্রের গতি পরীক্ষায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বকৃত সারণী অনুসারে হিসাব করিয়াছেন যে, তিন চাঁদের গ্রহণ যদি এককালে হয় তবে তাহা ১৩,১৭,৯০০ বৎসরের পূর্ব্বে নহে। আর ২য় এর বার্ষিক গতি যদি কোনরূপে ০·৩৩" পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় তবে তিন চাঁদের যুগপৎ গ্রহণ কোনকালে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু চন্দ্র চতুষ্টয়ের গতির পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ ১৭৬৭ অব্দের ধূমকেতু বার্হস্পত্য জগতের মধ্যদিয়া গিয়াছিল তাহাতেও উক্ত উপগ্রহগণের মধ্যম গতির কিছুমাত্র ন্যূনাধিক্য ঘটে নাই।

৬ আরবেষ্টের সিদ্ধান্ত। কতিপয় ঘণ্টার তফাৎ যদি না ধরা যায় তবে উপগ্রহ চতুষ্টয়ের ভগণে সাপবর্ত্ততা প্রাপ্তি হয়।

উপগ্রহ	দিন।	দিন।
১ম	১·৭৭ × ৫১৮৭ =	৯১৮০·২৭
২য়	৩·৫৫ × ২৫৮৩ =	৯১৮০·২৩
৩য়	৭·১৫ × ১২৮১ =	৯১৮০.১৪
৪র্থ	১৬·৬৯ × ৫৪৮ =	৯১৮০·৯৫

অর্থাৎ ৯১৮০ দিনে বা ২৫ বৎসর ৪৯ দিনের পর ১ম এর ৫১৮৭ পরিভ্রমণ হয়। ২য় এর ২৫৮৩ পরিভ্রমণ, ৩য় এর ১২৮১ এবং ৪র্থ এর ৫৪৮ ভভ্রম হয়।

৩য় ও ৪র্থ উপগ্রহের ভভ্রমে অপেক্ষাকৃত স্থূল সাপবর্ত্ততা দেখা যায়।

৩য় এর ৭ পরিভ্রমণ = ৫০ দি. ১ ঘ. ৫৭ মি· ৫৩৫২০ সে,

৪র্থ এর ৩ পরিভ্রমণ = ৫০ দি ১ ঘ. ৩৬ মি. ৩৩·৮১৩ সে,

অন্তর ২১ মি. ১৯·৭ সে মাত্র।

আলোকের গতি। দূরবীক্ষণের সৃষ্টির কিছুদিন পরেই দেনমার্ক দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ রোমর বার্হস্পত্য চন্দ্রগ্রহণের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ঐ তালিকায় এক বৎসরে যত গ্রহণ হয় তাহা গণিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে গণিতের সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করিবার জন্য পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের প্রারম্ভে পৃথিবী পৃ'তে বৃহস্পতির সন্নিকৃষ্ট ছিলেন। পৃথিবী যত পৃ'' দিকে যাইতে লাগিলেন গ্রহণের গণিত কাল বেধলব্ধ কালাপেক্ষা তত একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। এবং পৃথিবী যত প''' দিকে চলিলেন বেধলব্ধ কাল গণিত কালাপেক্ষা ততই অধিক হইতে লাগিল; পরিণামে প''' তে ১৬ মিনিট বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে আবার যখন প'এর দিকে আসিতে লাগিলেন তখন গণিত কালাপেক্ষা দৃষ্টকাল অল্প হইতে লাগিল এবং অবশেষে প' আসায় দৃক্ ও গণিত একতা প্রাপ্ত হইল।

এই দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল যে, গণিত কালাপেক্ষা গ্রহণ বিলম্বে ঘটিবার কারণ কেবল বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীর দূরত্বের আধিক্য। পৃথিবী যখন পৃ''' এ তখন প' এ গ্রহণের গণিত

কালাপেক্ষা ১৬ মিনিট অধিক হইল। ভূব্যাস সাড়ে উনিশ কোটি মাইল অতএব প্রতি ২ লক্ষ মাইল অন্তরে গণিতকাল এক সেকণ্ড করিয়া বাড়ে। এখন দেখা যাইতেছে যে, উপগ্রহ যেমন বৃহস্পতির ছায়া স্পর্শ করিল অমনই গ্রহণ লাগিল তবে দৃষ্টকাল গণিত কালাপেক্ষা অধিক হয় কেন? ইহার কারণ এই যে উপগ্রহের নিমীলনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে আলোক পৃথিবীতে আসিতে আরম্ভ করিল সে আলোক তৎক্ষণাৎ আসিতে পারিল না, উহা দর্শকের চক্ষে পড়িতে ১৬ মিনিট বিলম্ব হইল।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপে গণিত করিয়া অবধারিত হইয়াছে যে ভূব্যাস অতিক্রম করিতে আলোকের ১৭ মি ২৭ সে ·৯২১ লাগে অর্থাৎ প্রতি সেকণ্ডে আলোক ১,৮৬,৬১৬ মাইল গমন করে।

বার্হস্পত্য লোকে জীবের বাস। বোধ হয় বার্হস্পত্য জগতের নির্ম্মাণ কার্য্য অদ্যাপি সমাহিত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে (সহস্র সহস্র শতাব্দ পূর্ব্বে) বৃহস্পতি এই চারি, পাঁচ বা ততধিক চন্দ্রাত্মক জগতের সবিতার স্বরূপ ছিলেন বহুবিধ উপগ্রহে অলঙ্কৃত এই জীবমণ্ডল যদিও অদ্যাপি জীবের বাসোপযোগী না হইয়া থাকে তথাপি তদীয় উপগ্রহগণে প্রাণীপুঞ্জের আবির্ভাব হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। উপগ্রহবাসীদিগের নয়নে গ্রহবর কি মহান্ কি চমৎকার কি বিচিত্র দেখান। প্রথম উপগ্রহ ''তে দেখিলে বৃহস্পতির চাপাত্মক ২০° পরিমিত বিশাল বিম্ব চৌদ্দশত পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও বৃহত্তর দেখায়। কি অপূর্ব্ব কলেবর! কি সুন্দর ছবি! কত আয়ত রঞ্জিত মেখলাবলী! নানাবর্ণময় উজ্জ্বল কামরূপ মেঘমালার অনুপম সঞ্চার! নিশীথিনীর দিনমণি! মণ্ডল বোধ হয় এখনও উষ্ণ। অপিচ উপগ্রহ পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া কি অপূর্ব্ব নেত্রানন্দ উপভোগ করে। এরূপ দৃশ্য ভৌমী রজনীর কল্পনাতীত।

বার্হস্পত্য লোকের বর্ত্তমান বা ভাবী জীবগণ সম্বন্ধে আমাদের এখনও কোন কথা বলিবার অধিকার জন্মে নাই। পার্থিব জীবনের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে তৎসহকারে ভিন্নলোকের জীবগণের বাহ্য বা অন্তঃ প্রকৃতির কল্পনা করা অবিধেয়। কেবল ভগবতী প্রকৃতিই জানেন যে দেশ, কাল বিচার পূর্ব্বক কিরূপে জীব সৃষ্টি করিতে হয়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

অতিক্রমণ, Pass.
অতিপার্থিব, Beyond orbit of Earth.
অনুহৈলিক, Perihelion.
অপহৈলিক, Aphelion.
অভিপার্থিব, Within Earth's orbit.
অযুগ্মপাদ, Odd Quadrant.
অবনতি, Inclination.
আক্ষব্যাস, Polar diameter.
আচ্ছাদন, Occultation.
পরিলেখ, Projection, Illustration.
পৃষ্ঠ, Surface.
ফ্রেইরা, Freia.
বাবাজী, Pope.
ভগণকাল, Time of revolution.
ভেদযোগ, Transit.
মন্দপরিধি, Epicycle.
মন্দফল, Equation of Centre.
মন্দোচ্চ, Aphelion.

আবর্ত্তন অক্ষ, Axis of Rotation.
উৎকেন্দ্রত্ব, Eccentricity.
উন্মীলন, Emersion.
কক্ষা, Orbit.
কণা, Particle,
কেন্দ্রসংস্কার, Equation of Centre.
কেপ্‌লরীয়, Of Kepler.
ক্লাবিঅস্‌, Clavius.
ক্ষুদ্রগ্রহ, Asteroid, Minor Planet.
ক্ষেত্র, Plain.
খাড়া, Perpendicular.
গালিলেও, Galileo.
গোলাভাসত্ব, Elleplicity.
গ্রহবলয়, Belt of asteroids.
চাপাত্মক, Angular.
জীবলোক, Iovian system.
ড' আরেষ্ট, D' Arrest.
নিমীলন, Immersion.
নিরক্ষবৃত্তীয়, Equattorial.
পরমার্থতঃ, Really.
মার্গী, Direct.
মীন, Pices.
মেখলা, Belt.
যুগ্মপাদ, Even quadrant.
রেঞ্জেল, Wrangel.
রেবতী, Zeta Picium.
রোমর, Romer.
বক্রী, Retrograde.
বিক্ষেপ, Latitude.
বিক্ষোভ, Disturbance.
বিলোমানুপাত, Indirect ratio.
ষড়ভান্তর, Six sines distant.
সপাটত্ব, Flatness.
সমাগম, Conjuction.
সাইবিরিয়া, Siberia.
সান্দ্রত্ব, Density.
সামগ্রী, Mass.
হেঁকাতে, Slant.
হস্তমিত অনুরূপ, Mimature.

সর

অলঙ্কারের দোকান।

আমি কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। যখন মাইকেল, হেমবাবু প্রভৃতি দিগ্‌গজ কবির কাব্যগুলির ভাল কাট্‌তি নাই তখন আমার কবি হওয়া ধৃষ্টতামাত্র। এখন আমি অলঙ্কারের দোকান খুলিয়াছি। মহাজনো গতঃ স পন্থাঃ। এ পথে আমি প্রথম পথিক নহি। সাহিত্য ছাড়িয়া অলঙ্কারের দোকান আরও তুই এক জন মহাত্মা খুলিয়াছেন। যথা ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ বাবু। মহাকবি Shelly যথার্থই বলিয়াছেন :—

"Most men are cradled into the—the—the goldsmith's craft by wrong."

আমার স্মরণশক্তিটা স্বভাবতঃ কিছু দুর্ব্বল। Quotationটা ঠিক হইল কি না বলিতে পারি না। একদিন আমি এই স্মরণশক্তির দোষে মহাবিপদেই পড়িয়াছিলাম। সে বহুদিনের কথা; আমি তখন প্রেসিডেন্সি কালেজে 4th Yearএ পাঠ করি। Professor Tawney সমবেত ছাত্রগুলিকে বলিলেন "Wordsworthএর Rainbow শীর্ষক কবিতাটির যিটি oft-quoted line তাহার উপর তোমরা একটা essay লেখ।" আমি The man is the father of the child এই heading দিয়া একটা লম্বা চৌড়া প্রবন্ধ লিখিলাম। টনি সাহেব স্বভাবতঃ কিছু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি পর্য্যন্ত সে দিন হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

পরন্তু মহাশয়রা আমাকে এ কাজে নেহাৎ amateur ঠাওরাইবেন না। আমি আমার এই দোকান খুলিবার আগে ভাল ভাল কারিগরের নিকটে কাজ রীতিমত শিখিয়া লইয়াছি। অলঙ্কারের নামগুলিও তাহাদিগের দেওয়া। এমন সুন্দর, হৃদয়-গ্রাহী, নারীকর্ণরঞ্জন নাম এ জগতে নাই। যথা সরমা-সিঁতি, প্রমীলা-চিক। এই তুটি ফ্যাশেনের অলঙ্কারের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুনিতে পাই—এই সরমা-সিঁতি অশোকবনে জনক দুহিতা দশরথ-পুত্রবধূ সীতাদেবী মাথায় পরিতেন। ললাটে অশোক-সিন্দুর ও এই অনুপম সরমা-সিঁতি! মরি! মরি! বনলক্ষ্মীর কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত। আর প্রমীলা-চিক্ লঙ্কার Prince of Wales মেঘনাদ কণ্ঠে ধারণ করিতেন। সেকালে পুরুষদিগেরও অলঙ্কার পরার রীতি ছিল। হনূমান, অঙ্গদ, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি এই প্রমীলা-চিক্ গলায় দিতে গিয়াছিল। বানরের জাত্ কত আর ভাল হইবে। এই ঘটনা হইতেই "বানরের গলায় মুক্তার মালা" প্রবাদের সৃষ্টি। গলায় দিয়া বানরগুলা যায় আর কি! শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু উল্টাইয়া গেল। তখন স্বয়ং ভক্তবৎসল রামচন্দ্র আসিয়া গলার ফাঁশ ছাড়াইয়া দিলেন। এ কাহিনাটি আমার স্বকপোল-কল্পিত নহে। মেঘনাদবধ নামক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

কপাল-কুণ্ডলা-শাঁখা আর সূর্য্যমুখী চূড় এ তুটি অপূর্ব্ব fashionএর গহনা। ইহার আবিষ্কর্ত্তা বঙ্কিমচন্দ্র।

কপাল-কুণ্ডলা-শাঁখা! আমার রাঙাদিদি ত' হাসিয়াই খুন্! রাঙাদিদি সুবাদে আমার ঠাকুরুণদিদি হন্। তিনি নাকে একটি নাতিবৃহৎ নথ পরেন। আমার রাঙাদিদি Junction Station স্বরূপ। তিনি Loop line রূপিণী প্রাচীনাদিগের ও Chord line রূপিণী নবীনাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী Kanoo-Junction অথবা লক্ষ্মীসরাই। তাঁহার ক্ষুদ্র নথটি ও একটি copula বিশেষ—প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ! তিনি নাকের নথটি নাড়িয়া বলিলেন :—

"অবাক আর কি! সোণার শাঁখা, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, সোণার পাথর-বাটী!"

আমি বলিলাম :—

"নাম মাত্র শাঁখা কিন্তু জিনিসটা খাঁটি সোণা। তোমার নাকের নতের চেয়ে ভাল। কারিগরটা কে তা জান?" নাম শুনিয়া রাঙাদিদি একবার হাতে পরিলেন ও বলিলেন "বাহ! বেশ তো, সাঁকার মত গড়নটা কিন্তু কেমন ঝক্‌মক্ করছে। শহুরে মেয়েদের ঠাকার দেখে বাঁচিনে। এমন গহনাকেও হতশ্রদ্ধা করে গা!"

আমি বলিলাম "হাঁ দিদি, তোমাদের দৌরাত্ম্যেই তো পাড়াগাঁয়ে, জঙ্গলে, পালিয়ে গিয়ে, শেষটা গঙ্গাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে out of fashion হয়ে পড়েছিল। Bankim Babu revive—পুনরায় জারি করেছেন।

সূর্য্য-মুখী-চূড় একেবারে নূতন ফ্যাশনের। মূল্য কিছু বেশি। বড়মানুষের ঘরের গৃহিণীর উপযুক্ত। দেখাদেখি দুই একজন পেঁচি সোণার বেণে নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে কদর্য্যগড়ন, ফঙ্গবেনে গহনা; কেবল কন্যাভারগ্রস্ত পিতার ক্রয় করিবার যোগ্য।

ইন্দুবালা-প্রজাপতি ও ঐন্দ্রিলা-পইরি এই দুই গহনার ওরিজিনাল মেকার হেমবাবু।

ইন্দুবালা-প্রজাপতি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, দেখিলে আসল প্রজাপতি বলিয়া ভ্রম হয়। ঝক্ মক্, ঝল্ মল্! পক্ষ নক্ষত্র-খচিত। যখন সুন্দরীর খোঁপায় উঠে তখন বোধ হয় যেন মাতৃ-স্তন্যপায়ী-অতিক্ষুদ্র-মনুষ্য-শিশুবৎ একটা জীবন্ত প্রজাপতি নির্ব্বাক 'নিঃশব্দে করবির ঝাড়ে বসিয়া আছে। এমনি শীরিষ-পুষ্প-সুকুমার অঙ্গ যে ছুঁইতে ভয় হয়। সুন্দরীরা সাবধান; তাহাদের ক্রোড়স্থ শিশু দুষ্ট ভোলা না ঘাঁটে! সে যে রগ্‌ড়ায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

"পেলে হেন প্রজাপতি, কে চায় রে ভ্রমরী?"

ঐন্দ্রিলা পইরি! ওমা পইরি আবার কি! আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ আপনারা এ নামশুনেন নাই। পইরি এক প্রকার পায়ের বেড়ি স্বরূপ গহনা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গোয়ালিনীরা পায়ে দেয়। যে দিন পায়ে দেয় সে দিন গোপবধূর চীৎকার-শব্দে বধিরের বধিরতা সারিয়া যায় এবং যস্য শ্রবণ-মাত্রেন বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ। আর ত্যাগ করে সেই মহাপ্রস্থানের দিন। অথবা সে নিজে ছাড়ে না; পইরি তাহাকে ছাড়ে। শুনিতে পাই এ গহনা বৃত্রাসুর নামক জনৈক দৈত্য পায়ে দিয়াছিল; গহনা দৈত্যরাজকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই। অবশ্য এ গহনা বঙ্গ-সীমন্তিনীদিগের জন্য নহে। কিন্তু যে দেশে উল্কির আধিপত্য ছিল, যে দেশে চন্দ্রহার, বাঁকমল অদ্যাপি দৃষ্টি-গোচর হয়, নথধারিণী রাঙাদিদির প্রভাব অদ্যাপি যেখানে অপ্রতিহত, সেখানে আমারও আশা ফলবতী হইতে পারে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ভারতী পত্রিকায় ইহারও বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল। ভরসা করি সুন্দরী পাঠিকারা (আর সুন্দর পাঠকরাও বটে) অপরাধ মাফ্ করিবেন। —ণিক ;

সুভদ্রা-কণ্ঠমালা ও সত্যভামা-নথ—এ দুটির ওরিজিনাল মেকার নবীন্ বাবু। লোকটার এ ধরণের গহনা গড়ায় সিদ্ধহাত।

সত্যভামা-নথ এখনও obsolete হয় নাই। রৈবতক নামক Webster's Dictionary তে পাওয়া যায়। খদ্দের যথেষ্ট। সে দিন রাঙাদিদি মুচকে হাসিয়া, ঠুংরি তালে গ্রথিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন "আমার সত্যভামা নথ চাই। অগ্রিম বাণী দেড় টাকা নাও।" আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "নথ! নথ! সেকি গো, সে গহনা যে বেফ্যাশান।" অমনি আমার পীঠে গুম্ করিয়া একটা কিল্ পড়িল। আমি আহত পৃষ্ঠ আমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলাম "হে বিপত্তৌ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! সত্যভামা-নথের মাহাত্ম্য তুমি বুঝিয়াছিলে, বুঝিয়াছেন আমার রাঙাদিদি, আর হাতে কলমে বুঝিয়াছি আমি।"

সুভদ্রা-কণ্ঠমালা সে কালে রৈবতক-পর্ব্বতে যাদবীরা কণ্ঠে ধারণ করিত। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—এমন অপূর্ব্ব-শোভাময় অলঙ্কার আপনারা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। আমি যে দোকানি—আমারও (তা, আপনারা গ্রাহক; আপনাদিগের কাছে বলিতে লজ্জা কি?)—আমারও কণ্ঠে ধারণ করিতে ইচ্ছা যায়।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনদেব লাবণ্যময় গহনার মূর্ত্তি দেখিয়া লোভসম্বরণ করিতে পারেন নাই। লোকটা বিলক্ষণ ফুলবাবু। Gay Lothario গোচের প্রকৃতি, কিন্তু দেখান "আমি ভারি স দাসিদে।" দ্রুপদ রাজা বিবাহের সময়ে ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ দিয়াছিলেন। তা পরিলেন না। বলিলেন আমার ভ্রাতারা পরিবে।" অহো! কি ভ্রাতৃ-প্রেম! শেষটা এই কীর্ত্তি; গহনা চুরি! বলভদ্রদাদা নেশায় চূর্. ছিলেন; এই চুরির সংবাদ শুনিয়া, ক্রোধান্ধ হইয়া, বলিলেন "শ্বশুর কা শির লও।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "করেন কি দাদা? ওযে ভগ্নীপতি হয়।" মহাবীর অর্জ্জুন কণ্ঠমালা কণ্ঠে দিয়া Young Lochinvarএর মত চম্পট দিলেন। হতাশ্বাস হইয়া বলাই দাদা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন আর ভৃত্যদিগকে হুকুম দিলেন "Never mind. Punch তৈয়ার কর।"

সুমিত্রা-বীরবৌলি ও নলিনী-সূর্য্যহার—এই দুইটি গহনার ওরিজিনাল মেকার রবীন্দ্র বাবু। বীরবৌলি বীরপুরুষের কর্ণ-ভূষণ। বাঙালির ঘরে এ কেন? পুরুষরা চেন আর আংটি নিয়াই ব্যস্ত। এ কেন? কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস—ইহাও fashionable হইয়া পড়িবে। যেমন Tagore's cap fashionable হইয়া পড়িয়াছে, যেমন রবীন্দ্রবাবুর "শিশির" দেখিয়া, তেমনি নূতনে ছন্দে হারু মতি সকলেই "রুধির" "আবির" "পনির"এর উপর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে—তেমনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস সুমিত্রা-বীরবৌলীও fashionable হইয়া পড়িবে।

নলিনী-সূর্য্যহার; নলিনী-সূর্য্যহার। অনেক সুন্দরীরা হয় 'ত "চন্দ্রহার, গোট্, রেট্" বলিয়া নাক সিট্‌কাইয়া উঠিবেন! কিন্তু নমুনাটা দেখুন্, তারপর নামঞ্জুর করিবেন। এক ছড়া সূর্য্যহার ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, Essex, Raleigh প্রভৃতির সখী, শ্রীমতী এলিজেবেথ্ সুন্দরীর সমীপে পাঠাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তার পর (শ্রীবিষ্ণু) স্মরণ হইল Queen Elizabeth এ পৃথিবীতে নাই। একছড়া সূর্য্যহার রাঙাদিদির কাছে পাঠাইলে হয় না? (অবশ্য নমুনা-স্বরূপ)—আপনারা কি বলেন?

নবান্ন।

বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে নবান্ন অগ্রহায়ণের একটি আনন্দকর আবশ্যকীয় পার্ব্বণ। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুমাত্রেই পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদিগকে নূতন চাউল উৎসর্গ না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করে না, বরং সেরূপ করিলে তাহাতে প্রত্যবায় আছে বলিয়া মনে করে; এমন কি অনেক প্রবাসী এই সময় স্বগৃহে সমাগত হইয়া আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত সমারোহ পূর্ব্বক নবান্ন করিয়া কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমন করে। পূর্ব্বে পল্লী অঞ্চলে এই দৃশ্য তেমন বিরল ছিল না, কিন্তু আজকাল রেল ও ষ্টীমারের অত্যন্ত প্রচলনে এক দেশের লোক বহুদূরবর্ত্তী প্রবাসে গমন করায় এবং অনেক অতিরিক্ত খরচ পড়িয়া যায় এই কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মধুর স্মৃতিমণ্ডিত পল্লীগ্রামের উৎসবভবনে উপস্থিত হইয়া নবান্নে যোগ দিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন ইংরাজী শিক্ষাও আমাদের এই ভাবটিকে অনেক পরিমাণে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। নবান্ন না করিলে কোন প্রত্যবায় আছে কি না জানি না, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে হর্ষ-কোলাহলমুখর, বালকবালিকার সুকোমল পদধ্বনিতে সদাচঞ্চল স্নেহপূর্ণ গৃহে পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী এবং পুত্র কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া অচিরোৎপন্ন নূতন চাউলের অন্নগ্রহণের মধ্যে একটা মাধুর্য্য, একটি প্রীতিকর ভাব আছে যাহা বিরহ-বিষাদ-প্লাবিত নিত্য প্রবাসীর একক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর, এবং এই পুণ্যস্মৃতিটুকুকে পথের সম্বল করিয়া বিরহী পথিক তাহার সম্বৎসরের দীর্ঘ বিরহযাত্রাকে মধুময় করিতে পারে।

আমাদের ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রামে যে সকল গৃহস্থের বাস, তাহাদিগের অধিকাংশেরই উপজীবিকা চাষ; যাহারা জমীদারের বাড়ীতে কি নীলকুঠীতে চাকরী করে, তাহাদিগেরও দুই দশ বিঘা জমী কি একখান লাঙ্গল আছে, তাহা হইতে তাহাদের সম্বৎসরের চিড়ামুড়ীর এবং ডাল ও তৈলের সংস্থান হয়, পাঁচজন লোকও হাতে থাকে। এদিকে কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়াতে চাষে প্রায় প্রতি বৎসরই লোকশান হইতেছে কিন্তু তথাপি কেহ চাষ ছাড়িতে চাহে না, ইহাকে তাহারা দিনপাতের একটা উপলক্ষ্য বলিয়া মনে করে; চাষবাস একেবারে উঠিয়া গেলে পল্লী অঞ্চলে মারামারি, নিন্দা কুৎসা দলাদলীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া উঠিত; জমীদারের বাড়াতে বা নীলকুঠীতে কাজ শেষ করিয়া যে দুইদণ্ড সময় পাওয়া যায়, লোকে তাহা রাখাল কৃষাণ লইয়া জমীর কথা, গরু ও লাঙ্গলের কথা, ফসলের কথা লইয়াই কাটাইয়া দেয়। চাষ উঠিয়া গেলে আর এ সকল উৎপাত থাকিত না, সুতরাং কোন নিরীহ ভদ্রলোকের জাতি মারিবার জন্য কিম্বা কোন নিরাশ্রয়া বিধবার অরক্ষিতা কন্যার বিবাহে বাধা জন্মাইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যাকালে নিমাই হালদারের দোকানে, না হয় বিশ্বনাথ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপে ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইয়া শুধু তামাকের শ্রাদ্ধ করিত। অতএব চাষে যতই লোকশান হউক, ইহা যেন পল্লী অঞ্চল হইতে উঠিয়া না যায়, পল্লীবাসীর কার্য্যহীন চিত্তকে সংযত রাখিবার ইহা একটি মহৌষধ।

মজুমদারেরা গোবিন্দপুরের একঘর প্রধান গৃহস্থ; শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বকালে তাঁহাদের জমীদারীও ছিল; ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর কি তাহারও পূর্ব্বে তাঁহাদের জমীদারী বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, পদ্মাপারে ইহাদিগের জমীদারী ছিল, মজুমদারদের পূর্ব্বপুরুষ গুরুগোবিন্দ মজুমদারের মোক্তার জয়রাম গাঙ্গুলী তাঁহার নিকট হইতে কালেক্টরীর খাজনার টাকা লইয়া জেলায় যাইতেছিল, হঠাৎ একদিন সকালবেলা মোক্তার একখান ভিজে গামছা পরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মজুমদার বৃদ্ধের পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল, কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরুগোবিন্দ জানিতে পারিলেন তাঁহারই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, গঙ্গাগর্ভে খাজনার টাকা শুদ্ধ মোক্তারের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, এক কপর্দ্দকও উদ্ধার হয় নাই, মা গঙ্গা সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুগোবিন্দ নিজের অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিলেন কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই তাঁহার বৃহৎ জমীদারী লাটে উঠিবে, শত শত ব্যক্তিকে যিনি নিত্য অন্নদানে প্রতিপালন করিতেছেন তাঁহাকেই সপরিবারে অন্নকষ্টে মারা পড়িতে হইবে, কিন্তু নিরুপায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সুদূর সদরে পাঠান সেকালের রেলওয়ে টেলিগ্রাফহীন সময়ে অসম্ভব ছিল। মোক্তার ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহাকে অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু টাকা ডুবির কথাটাও তিনি তেমন বিশ্বাস করিলেন না, শুধু ঘৃণাভরে উত্তর করিলেন "মা গঙ্গা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন কিন্তু তোমার লজ্জাটুকু নিবারিত হইয়াছে ত? সকলই গিয়াছে, তোমার গামছাখানি যায় নাই দেখিতেছি, আচ্ছা যাও, তোমার দায়িত্ব হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।"

মজুমদারদের টাকাতেই তাঁহাদের সম্পত্তি খরিদ হইয়া গেল, মোক্তার জমীদার হইল, কিন্তু সেই হইতেই মজুমদারেরা চাষী গৃহস্থ:—

"বাণিজ্যেবসতে লক্ষ্মী,
তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।"

এ প্রবাদটা মজুমদার-পরিবারে বেশ ফলিয়া গিয়াছিল; দৈব বিড়ম্বনায় তাঁহারা লক্ষ্মীকে বিদায় দিলেন বটে কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী সেই সরলহৃদয় উদার বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। সমস্ত বিষয় নষ্ট হইলেও এই চাষ হইতেই গুরুগোবিন্দ মজুমদারের সোনার টাট বজায় ছিল; তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এই চাষের টাকা হইতেই সাতগেছের চৌধুরী জমীদারদের কাছে চক শ্যামনগর মহালখানি কিনিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন গ্রামের বাহিরে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটো প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের দক্ষিণদিকে যে পুকুরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম গোপালদিঘী। পাশে গ্রাম্যদেবতা গোপালদেবের উচ্চ সুন্দর মন্দির, বিগ্রহের নাম অনুসারে এই পুষ্করিণীর নাম গোপালদিঘী হইয়াছে; গোপালদিঘীর পূর্ব্ব পশ্চিম দুইদিকে দুইটি স্নানবাঁধান প্রকাণ্ড

ঘাট, উপরে সুন্দর চাঁদনী। পূর্ব্ব ঘাটটিতে স্ত্রীলোকেরা এবং পশ্চিমটিতে পুরুষেরা স্নান করেন। মন্দিরের অনতিদূরে মজুমদারদের প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী—ধান, গোধূম, অরহর, মশিনা, বুট প্রভৃতি শস্যে বার চোদ্দটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলা বোঝাই হইয়া থাকিত। মছিরদ্দীন বিশ্বাস এই গোলাবাড়ীর গোমস্তা; মছিরদ্দীন অনেক দিনের পুরাতন চাকর, প্রভুর অত্যন্ত বিশ্বাসী; ধান বাড়ী দেওয়া, আসামীদিগের কাছে ধান ও অন্যান্য শস্য আদায় করা, গোলাবাড়ীর জিনিষপত্র খরিদ বিক্রয় করা, সমস্ত তাহারই কাজ।

এখান হইতে মজুমদারবাড়ী বেশী দূরে নহে; মজুমদারদের পূজার চণ্ডীমণ্ডপখানি অত্যন্ত বৃহৎ, বাহির বাড়ীতে শুধু সেই ঘরখানিই কাঁচা, আর সমস্ত পাকা ইমারত। বাড়ীর পাশেই গোয়ালবাড়ী, গোয়ালবাড়ীতে খুব বড় বড় দুখানা গোয়াল ঘর, চাষী গৃহস্থ বলিয়া ইঁহাদের বিশ বাইশটে বলদ আছে, গাই গরুর সংখ্যাও দশ বারোটা। গোয়ালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে সারি সারি 'নাদা' পাতা, সেগুলি মাটি দিয়া উঁচু করিয়া বাঁধান. একপাশে ঘরের মত উঁচু বিচালির গাদা এবং একটি অনতিদীর্ঘ ভুষির ঘরে বাঁশের মাচার উপর ঘরের চাল সমান ভুষি। মধ্যাহ্ন কালে যখন গোরুগুলি গোয়াল ছাড়িয়া মাঠে চরিতে বা ভুঁই চষিতে যায়, তখন গোয়াল বাড়ীটা শূন্য 'হা হা' করে, কিন্তু অপরাহ্ণ কালে গোয়ালের আর এক শ্রী বাহির হয়। কৃষাণেরা ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাঙ্গলগুলি ঘরের ভিতে কাৎ করিয়া রাখে, দুই জন চাকর বাঁকের দুই দিকে টিনের ক্যানেস্তারা ঝুলাইয়া পুকুর হইতে জল আনিয়া জাবনার জন্য নাদাগুলি পরিপূর্ণ করিতে থাকে, একজন রাখাল বড় বিচালী-কাটা বঁটিতে বিচালী চুরাইতে থাকে; শেষে বিচালী চুরান হইলে জাবনা মাখিয়া বলদ-গুলাকে নাদার কাছে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহারা নাক চুবড়াইয়া 'সানি' খাইতে আরম্ভ করে, এক একবার মুখ তুলিয়া ব্যস্তভাবে চর্ব্বন করিতে থাকে অথবা পরস্পরের শিঙ্গে শিঙ্গ বাধাইয়া নারানারি করে; কৃষকেরা গোয়ালের চালে পানাইগুলি গুঁজিয়া রাখিয়া বাঁশের চোঙ্গাতে করিয়া গৃহকর্ত্রীর কাছে তেল লইয়া সর্ব্ব শরীর তৈলে উত্তমরূপে অভিষিক্ত করে—তাহার পর পুকুরে স্নান করিতে যায়। রাখালেরা সন্ধ্যার সময় গরু চরাইয়া আসিয়া গোরুগুলিকে গোয়ালঘরে তুলিয়া রাখে, তাহার পর দুই একটি দুগ্ধবতী গাভীকে রান্নাবাড়ী লইয়া গিয়া সঞ্চিত ফেনজল খাওয়াইয়া আনে এবং বাছুরগুলিকে একটা ছোট কুঠুরীর মধ্যে আটকাইয়া রাখে। ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া আসে, গোয়ালঘরে সাঁজাল জ্বালান হয়, প্রচুর ধূম উঠিতে থাকে, রাখালেরা সাঁজালের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া অগ্নিতে হাত পা সেকিতে সেকিতে আপনাদিগের সুখদুঃখের গল্প বলিতে থাকে। কৃষাণেরা চণ্ডীমণ্ডপে একটা কম্বলের উপর বসিয়া মজুমদারদের ছোটকর্ত্তার অপেক্ষা করে; অবশেষে ছোট কর্ত্তা রামধন বাবু যখন আফিস হইতে ফিরিয়া তাঁহার চিরসঙ্গী সাদা ইজের, কালো চাপকান এবং একখান ধোপদস্ত ভাঁজ করা সাদা সরু চাদরের সহিত ধীরে ধীরে বহির্বাটীতে পদক্ষেপ করেন, তখন সকলে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করে, তিনিও তাহাদিগকে

প্রত্যভিবাদন জানাইয়া এবং সহাস্যে তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

ক্রমে বহির্বাটীতে একটি অনুচ্চ তৈলানুলিপ্ত কাঠের দীপগাছার উপর একটা ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। রামধন বাবু কোঁচার টেরে শরীরটি আবৃত করিয়া একটি হুকা টানিতে টানিতে খড়ম পায়ে দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দর্শন দেন। তখন প্রভু ও ভৃত্যবর্গের মধ্যে নানাকথা চলিতে থাকে—কোন্ জমীতে কেমন চাষ হইতেছে, লালের জমীর অবস্থা কেমন, এবারকার চাষে লোকশান হইবে কি খরচটা পুষাইয়া যাইতে পারে, মরিচের আবাদে কিরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা এবং এ বৎসর তিল ভাল হইবে না, প্রায় সকলের ক্ষেতেই আচা লাগিয়াছে ইত্যাদি অসংখ্য রকমের কথার আলোচনা চলিতে থাকে; সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি এবং হিসাব মত অসঙ্কুচিতভাবে স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যায়, এবং প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে কিছু রূঢ়তা, পদগত পার্থক্য কিম্বা ভেদাভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে পরস্পরের নিতান্ত আত্মীয়, প্রিয়তম, সুহৃদ বলিয়া মনে করে। কোন কোন কৃষাণ অন্যান্য লোকের ফসল অপেক্ষা তাহার প্রভুর ফসলের অবস্থা যে উৎকৃষ্ট তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানা প্রকার নজীর প্রয়োগ করে এবং প্রভুর মন কিছু প্রফুল্ল আছে বুঝিলেই তাহারা শীতবস্ত্র, নূতন পানাই কিম্বা কন্যার আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে কিছু 'আগাম মাহিনা' পাইবার আরজ করে। ছোটকর্ত্তা সকলকেই অল্প বিস্তর সন্তুষ্ট করিয়া রাত্রি গভীর হইলে বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

ধরিতে গেলে রামধন মজুমদারই এখন বাড়ীরকর্ত্তা। গ্রামে এক মুনসেফী চৌকী আছে, তিনি সেখানে মুহুরীগিরি করেন, বাড়ীর চাষবাসের তত্ত্বাবধান করাও চলে। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণধন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর হাট লক্ষীপুরের নীলকুঠীর দেওয়ান এবং মধ্যম হারাধন স্বরূপপুরের জমীদার নীলকমল বাবুর সদর আমিন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ বাড়ীতেই থাকেন, পূজার সময় কিম্বা বৎসরের অন্ত কোন উৎসব উপলক্ষে বড় কর্ত্তা ও মেজ কর্ত্তা বাড়ী আসিবার সময় নৌকা বোঝাই করিয়া কত রকম দ্রব্য সামগ্রী বাড়ী লইয়া আসেন। নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র চারিদিকে ঢিঢি পড়িয়া যায়, গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই জিনিষ দেখিতে নদীতীরে ছুটিয়া যায়। ইঁহাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে বেশ সম্প্রীতি আছে; কিন্তু বধূদিগের মধ্যে সেই স্নেহবন্ধনের সম্যক অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বিশে-ষতঃ কৃষ্ণধনের পত্নী দামিনী ঠাকুরাণী কিছু পরুষভাষিণী, তাঁহার স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া যখন তখনই তাঁহার মুখে উচ্চ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে নানাপ্রকার কাল্পনিক ত্রুটির ছলনা করিয়া কনিষ্ঠ দেবর রামধনের প্রতি সময়ে সময়ে তিনি নানাপ্রকার কটুকাটব্যও বর্ষণ করিয়া থাকেন; রামধন মনে মনে অত্যন্ত অসুস্থতা অনুভব করেন এবং তিনি সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন বলিয়াই মুখরা বড় বধূ যে তাঁহাকে অপরাধী মনে করিতেছেন ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ

করেন, কিন্তু পাছে কোন কথা প্রকাশ করিলে বড় দাদা মনে বেদনা পান এই ভয়ে নিজের মনোকষ্ট আত্মহৃদয়েই সংগুপ্ত রাখেন ; অবশেষে একবার পূজার সময় তিন ভাই একত্র হইলে রামধন কৃষ্ণধনকে বলিলেন "দাদা, আমি আর এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি না, বড়ই দুরূহ ভার, আপনি এ ভার বড় বৌ কি অন্য কাহারো হাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে ছুটি দেন।"—বুদ্ধিমান কৃষ্ণধন ভ্রাতার মনোকষ্টের কারণ অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণপূর্ব্বক স্নেহমধুরস্বরে বলিলেন 'ভাই, নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকে না বুঝিয়া কত সময় কত অন্যায় কথা বলে, আমরা যদি তাহা সহ্য না করিব, আমরা যদি তাহাতে বিচলিত হইব তাহা হইলে সংসার টিকিবে কি করিয়া ?' আমাদের সেই ছেলেবেলার কথা মনে করিয়া দেখ দেখি আমরা তিন ভাই মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছি, বাবার হৃদয়-বৃন্তে আমরা তিনটি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম, মা বাবা আজ দুজনেই স্বর্গে গিয়াছেন, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি এস কাছাকাছি থাকি, পিতামাতার সেই স্বর্গীয় স্নেহের মধ্যে আর অভিশাপ আনিব না, ইহাতে শুধু আমাদের ক্ষতি নাই, বাড়ীর ছোট ছেলেগুলির মন হইতেও প্রীতির মূল শিথিল হইয়া পড়িবে। বৌরা ত পরস্পর বিবাদ করিবেই, তারা ত আর আমাদের মত আজন্মের স্নেহবন্ধনের মধ্যে বাড়িয়া উঠে নাই; আমাদের পরস্পরের ব্যথা তাহারা কিরূপে বুঝিবে ?"—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথায় কনিষ্ঠের সমস্ত মনোবেদনা দূর হইয়া গেল। ইহাদের বিধবা ভগিনী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী ; শ্বশুরকুলে কেহ নাই, সেই সংযতহৃদয়া পবিত্রচরিত্রা বিধবা ভ্রাতৃগণের সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দতা বিতরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন ; সাংসারিক কর্ত্তব্য বড় গুরুতর তাই তাহা পালন করিতে তাঁহাকেও ভ্রাতৃজায়াগণের নিকট অনেক সময় রুক্ষবচন শুনিতে হয়, কিন্তু ভাইদের মুখ চাহিয়া পাছে তিনি অশ্রু মুছিলে তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে সকল সহ্য করেন, মনে অত্যন্ত কষ্ট হইলে মনে মনে বলেন "হে হরি, হে জগন্নাথ, ইহাদের সকলকে সুখী কর, আর আমাকে তোমার শ্রীচরণে টানিয়া লও।" কাত্যায়নী তাঁহার সমস্ত হৃদয় দিয়া অমঙ্গল ও অশান্তি হইতে সংসারটি ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন। বাড়ীর দাস দাসীরা তাঁহাকে যেমন ভয় করে তেমনি ভালবাসে; পাছে তিনি মুখ ভার করেন এই ভয়ে গোয়ালকাড়ুনী সকালে সকালে আসিয়া গোয়ালঘর পরিষ্কার করিয়া যায়, ঝিরা অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ছড়া ঝাঁট দিয়া আঙ্গিনাখানি আয়নার মত তকতকে করিয়া রাখে। তাহার পর বাড়ীতে যে কয়টা ধানের গোলা আছে তাহাদের ও তুলসীমন্দিরের সম্মুখভাগ গোল করিয়া নিকাইয়া দেয়। রৌদ্র উঠিলে কেহ আস্তাকুড়ে বসিয়া বাসন মাজিতে আরম্ভ করে, কেহ রান্নাঘর নিকাইতে বসে। কাত্যায়নী দেবী রাত্রি প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া বস্ত্রাদি ছাড়িয়া একখান কুশাসনে বসিয়া মালা জপিতে আরম্ভ করেন, শেষে প্রভাত হইবামাত্র ফুলবাগান হইতে কতকগুলি পুষ্পচয়ন করিয়া কলাপাতে মুড়িয়া তাহার কতকগুলি গ্রাম্যবিগ্রহকে উপহার পাঠাইয়া

দেন, এবং নিজে পূজা করিবেন বলিয়া কতকগুলি একখানি পরিষ্কার পিতলের রেকাবীতে করিয়া একটি ভাল জায়গায় রাখিয়া দেন।

আজ অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচই তারিখ, গ্রামের প্রধান পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় পাঁজি দেখিয়া বলিয়াছেন আজ নবান্নের অতি প্রশস্ত দিন ; তাই গোবিন্দপুরের ঘরে ঘরে আজ নবান্ন হইতেছে, সেই জন্য গ্রামের মধ্যে ভারি একটা আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে। আজ পাঠশালা বন্ধ, গুরুমহাশয় আজ ভিন্নগ্রামে যজমানবাড়ীতে নবান্ন করাইতে যাইবেন, তাই পাঠশালের পোড়োরা আজ মনের আনন্দ চাপা দিতে না পারিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে চঞ্চলভাবে বন্ধুবান্ধবদিগের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল বাড়ীতেই নবান্নের উদ্যোগ চলিতেছে কিন্তু মজুমদারবাড়ীর আয়োজনই কিছু অতিরিক্ত, নবান্ন করিবার জন্য বড় কর্ত্তা ও মেজ কর্ত্তা চাকরী স্থান হইতে বাড়ী আসিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তাঁহারা তিন ভায়ে বালাপোষ গায়ে দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন ; রাখাল কৃষাণরা আসিয়া প্রাঙ্গনস্থিত কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া রোদ পোহাইতে লাগিল, পাড়ার দুই পাঁচজন আত্মীয় প্রতিবেশী আসিয়া কর্ত্তাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিতে লাগিল। প্রভাতের রৌদ্র বকুলগাছের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় আসিয়া পড়িয়াছে, নবমুকুলিত শজিনাগাছের একটা উচু ডালে বসিয়া একটা চিল রৌদ্র পোহাইতেছে, কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোক মোটা চাদর গায়ে দিয়া সতরঞ্চির উপর বসিয়া সশব্দে তামাক টানিতেছে, সেকালের নবান্নের গল্প চলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতি উথলিয়া উঠিতেছে। এ প্রভাতে যেন কাহারো কোনকর্ম্ম নাই, শুধু কয়েকখানি খালি গরুরগাড়ী হট্‌হট্‌ শব্দ করিতে করিতে সম্মুখের পাকা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, আর পাঁচ সাতজন মেঠে মজুর কোদাল লইয়া ঝুড়ি ঘাড়ে করিয়া গল্প করিতে করিতে কাহার বাড়ীতে মাটীর প্রাচীর গাঁথিতে যাইতেছে!

আজ আর রাখাল কৃষাণদের মাঠে যাইতে হইল না, তাহারা মনিব বাড়ীতে নবান্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইল। বাড়ীর বাগানটা বড় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে, পূজার পর আর সে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া তিন ভায়ে কয়েকজন কৃষাণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাগানে প্রবেশ করিলেন। শাণিত দাউলীর আঘাতে বহুসংখ্যক আগাছার ধ্বংস হইল। গোবিন্দপুরে মজুমদারদের কলাবাগান বিশেষ প্রসিদ্ধ ; প্রকাণ্ড দুই কাঁদি মর্ত্তমান কলা [illegible] হইয়া পাকিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কলার ভারে গাছ দুটি হেলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগের গায়ে বাঁশের ঠেকো লাগাইয়া তাহাদিগকে সোজা করিয়া রাখা হইয়াছে। [illegible] কাঁদির উপর রাত্রে বাদুড় পড়িয়া সর্ব্বোচ্চ ছড়ার পাঁচ সাতটা কলা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় [illegible] গিয়াছে, অতএব তাহা আর গাছে রাখা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া কলা দুই কাঁদি কাটিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। কাঁদিদ্বয় অঙ্গন মধ্যে নীত হইলে তাহারা অবিলম্বে [illegible] হইয়া বৈঠকখানার কড়িকাঠের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, পাকিলে তাহা নামাইয়া পরিবার

বর্গের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কলাগাছ দুটির মধ্যে একটিকে কাটিয়া তাহার বাসনা ও পেটকো ছাড়াইয়া একজন কৃষাণ থোড়গুলি রান্নাঘরে দিয়া আসিল, একটি গাছ আস্ত রাখা হইল, এই থোড় নিঃশেষিত হইলে সে গাছটি কাটা হইবে।

আজ নবান্নের দিনে পাথরী গাইয়ের নূতন দোহাপাতা আরম্ভ হইবে। পাথরী বড় দুষ্ট গাই, তাহার মা ভাঁড়ভাঙ্গী দুই বেলা ছয় সের দুধ দিত, পাথরী সবে একুশ দিন মাত্র বিয়াইয়াছে, সে কেমন দুধ দেয় তাহা দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে। দোহাল হরি ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে গোয়ালবাড়ীতে আসিলেন। হরি ঘোষ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া শুনিল গরু দুহিবার ভাঁড়টা কালরাত্রে উনানের মুখে তাতাইতে দেওয়া হয় নাই, সে ভাঁড়ে করিয়া গরু দুহিলে পাছে দুধ নঠাইয়া যায় এই আশঙ্কায় পিসিমার পরামর্শে সে একটা পরিষ্কার পিতলের ঘটি লইয়া গরু দুহিতে গেল। বাছুর বাঁধিয়া সে দুইতে প্রবৃত্ত হইবে কিন্তু পাথরী কিছুতে তাহাকে কাছে ভিড়িতে দিল না, বাঁটে হাত দিতে না দিতে কখন সে লম্ফ ঝম্ফ করে, কখন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে ছাঁদন দিয়া তাহার পা বাঁধিয়া দেওয়া হইল, এই ছাঁদন দড়ীর তৈয়েরী নহে, গোরুর গোফালি (লেজের চুল) কাটিয়া কাটিয়া রাখাল কৃষাণেরা তাহা পাকাইয়া এই ছাঁদন দড়া প্রস্তুত করে। পা ছাঁদা হইলে পাথরী আর অস্থিরতা প্রকাশ করিতে পারিল না, নতমুখে বাছুরের গা চাটিতে লাগিল। পাথরীকে দুহিতেছে শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা অনেকে কৌতুকভরে দরজার ফাঁক দিয়া গোয়ালবাড়ীর দিকে উঁকি মারিতে লাগিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া গোয়ালের অনতিদূরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রামধন বাবুর ছোট ছেলে অজয়কুমার তাহার জেঠা মহাশয়দের কাছে ভদ্রভাবে উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে নালাম্বরী কাপড়খানি পরিয়া লইবার উমেদারীতে তাহার দিদির কাছে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কৃতকার্য্য না হইয়া কাপড়খানি কক্ষে লইয়া সেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। নবজাত শুভ্র বাছুরটিকে গরুর সম্মুখের পায়ের সঙ্গে বাঁধা [illegible] সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, তাহার শিশুনেত্রের চঞ্চল দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া দুই শূন্য হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, কাপড়খানি মাটিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া আধ আধ স্বরে বলিল "বাবা হরে পাকলিকে দুচ্ছে, চ্যাঁ চূ গবল গুঁ, আমি বাচুল নোব।" বাবা বলিলেন "এখন বাছুর নেয়না, এখন নিলে পাথরী মারবে।" বালক কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, দুই ক্ষুদ্র হস্তে বাপকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "গয়ু মালবে. কোয়ে কল," বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিতা তাহাকে কোলে লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন "না মারবে না, দুধ দেবে, দুধ খাবে না?" দুধ খাওয়ার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না "দুদ কুকা খাবে" বলিয়া সে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত নির্ভয়ে গোদোহন দেখিতে লাগিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার কাপড়ের কথা মনে পড়িল, দেখিল তাহা দিদি শুভা কাপড়খানি কুড়াইয়া

লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—অমনি সুর ধরিল "আমি কাপল পলবো।" পিতা তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া কাপড় পরাইতে লাগিলেন।

এমন সময় তাহার জ্যেঠতুতো বোন লীলা আসিয়া ডাকিল "অজা ভাই, ক্ষেতা নারকোল পাড়চে, শিগ্‌গির আয়।" আর কোঁচা গুঁজিবার অবসর হইল না, সকলে মহাকলরব করিতে করিতে বাড়ীর প্রান্তবর্ত্তী নারিকেলবাগানের দিকে ছুটিয়া চলিল। ক্ষেতা ডাব গাছে উঠিতে ভারি ওস্তাদ, দশ মিনিটের মধ্যে একরাশি নারিকেল পাড়িয়া ফেলিল, ছেলে মেয়েরা সকলেই এক একটা হাতে লইয়া মায়ের কাছে চলিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরে ভাঙ্গা ছাতি মাথায় দিয়া একজোড়া শততালিবিশিষ্ট ছেঁড়া চটিতে ধূলিধূসরিত ফাটা বিশ্রী চরণযুগলের সম্মান কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া পেয়ারী আচার্য্য মজুমদারবাড়ীতে প্রবেশ করিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ পুরুষ, মাথার সম্মুখভাগটা যত্নপূর্ব্বক কামানো, হস্তস্থিত ছাতার দামাটে একখানি গামছা বাঁধা, স্নানের সময় সেখানি গামছা, বাজার করিবার সময় সেখানি মাছ তরকারী বাঁধিবার নেকড়া। পেয়ারী আচার্য্যকে গোবিন্দপুরে কে না জানে?—হরিনাম কীর্ত্তন না করিলেও পেয়ারী সর্ব্বদাই "তৃণাদপিসুনীচ" এবং "তরোরিব সহিষ্ণু"; কপালে দীর্ঘ তিলক কাটা, গলায় কাঠের মোটা তিনকণ্ঠি মালা, দাড়ী গোঁপ কামান; সর্ব্বদা হাস্য-চ্ছটা-লাঞ্ছিত উদ্ঘাটিত দন্ত-শ্রেণী-শোভিত মুখখানিতে কোন প্রকার রাগ এবং অভিমানের ভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত। গোবিন্দপুরের সমস্ত লোকের ঠিকুজি কুষ্ঠি পেয়ারি স্বহস্তে প্রস্তুত করে; ঠিকুজি কুষ্ঠিতে ছবি কাটিতে, তুলটের কাগজের রংটি ঘোরাল করিতে, মোটা মোটা করিয়া মুক্তার মত লিখিতে পেয়ারীর ন্যায় কাহারো অভিজ্ঞতা নাই। পেয়ারী যাহারই ঠিকুজি কিম্বা কুষ্ঠি প্রস্তুত করুক না কেন, ছেলে মেয়ে যে লগ্নেই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার গণনার কৌশল এমনই আশ্চর্য্য যে সকল বালক বালিকার ভবিষ্যৎই সে অসম্ভব উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করে। তাহার দৈববাণীতে কাহাকেও মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয় না। নূতন ঠিকুজি কুষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল শুনাইবার সময় তাহার স্বরচিত সংস্কৃতে সুর করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়া যায় "এই শিশু মহা ধার্ম্মিক পরম বিষ্ণুপরায়ণ, অত্যন্ত দাতা হইবে, এবং শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিবে; এই সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হইতে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল এবং বংশ ধন্য হইবে, ইত্যাদি।" তাহার পর ধান দূর্ব্বা সহযোগে কুষ্ঠিখানি বন্ধ করিয়া রাখে; ঠিকুজি কুষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া পেয়ারীর প্রাপ্তি নিতান্ত মন্দ হয় না; তদ্ভিন্ন কোন বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, অথবা শ্রাদ্ধ যাহাই উপস্থিত হউক, পেয়ারী সকলের আগে সেখানে হাজির হয় এবং কলার পেটকো কাটিয়া ষোড়শ মাতৃকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বসে। আজ নবান্ন উপলক্ষে এক আধটা ভালরকম সিধে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ মজুমদারবাড়ীর বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তা নবান্ন উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছেন, টাকাটা শিকেটা কিছু প্রাপ্তি হওয়াও অসম্ভব নহে ভাবিয়া পেয়ারী যথাসময়ে মজুমদার বাড়ীতে আসিয়া দর্শন দিল, এবং বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তাকে দেখিয়া সস্মিত মুখে

বলিল "প্রণাম হই দাদা, কবে বাড়ী আসা হ'লো, প্রাণগতিক সব মঙ্গলতো, বৈষয়িক সংবাদও অবশ্য ভাল। আর দাদা, আপনারাই এ প্রদেশের প্রধান বেক্তি, আপনারা যদি মধ্যে মধ্যে বাড়ী না আস্‌বেন ত দেশের গুমোর থাকে কিসে?" এইরূপ আলাপ আপ্যায়িত শেষ হইলে আচার্য্য ঠাকুর একখান ছুরী ও একটা কলাগাছ লইয়া বসিল। তাহার পর কাজ শেষ হইলে বলিল 'দাদা, আজ নবান্ন আছে একবার বাজারটা ঘুরে আসি, আর সিধেটা যেন যাবার সময় পাই, আপনাদের আশ্রয়েই বাস কচ্ছি, ইত্যাদি।"

আজ কিছু সকালেই বাজার বসিয়াছে; নবান্ন উপলক্ষে আজ বাজারে আখ, সাঁক-আলু, লাল সাঁকারকুণ্ড আলু প্রভৃতি নানারকম ফলফুলারি আমদানী হইয়াছে। ক্ষেন্তা চাকর বাজার হইতে ধামা বোঝাই করিয়া ফলফুলারি ও তরকারী লইয়া আসিল। কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সকালে সকালে স্নান করিয়া আসিয়া প্রথমে নূতন গরুর দুধ প্রায় একপোয়া গঙ্গাকে দিবার জন্য ঘটিতে করিয়া নদীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর আর আধসের দুধ, কতকগুলি ফুল, ফল, নূতন আতপ চাউল, চিনি, কাঁচাগোল্লা প্রভৃতি জিনিষ গ্রাম্যবিগ্রহ গোপালজীর মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে নিজের বাড়ীর নবান্নের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। আচার্য্যকর্ত্তিত কলার পেটকোতে তিনি নবান্নের জন্য নূতন প্রস্তুত আতপ চাউল মুষ্টি পরিমাণে স্থাপন করিয়া একটা বড় পাত্রে কতকগুলি ফলমূল, আখ, আলু, কলা, মূলো, নারিকেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখিলেন, এবং একটা বড় পাথরের খোরায় একখোরা কাঁচা দুধ, একটা ক্ষেত্তুরে বাটীতে একবাটী নূতন খেজুরে গুড়, ও বড় পিতলের রেকাবে বাতাশা, কাঁচাগোল্লা, গুড়ে মণ্ডা প্রভৃতি মিষ্টান্ন রাখিয়া দিলেন; ছেলে মেয়েরা অদূরে বসিয়া সদ্যস্নাতা, সিক্তকেশা, শুভ্রবেশিনী পিসিমার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

নবান্নের যোগাড় করিয়া কাত্যায়নী কৃষ্ণধনকে বলিলেন 'দাদা সকালে স্নান করে এস, উদ্যোগত সকলই হয়েছে এখন পুরুত খুড়ো এলেই হয়, এত খানি বেলা হয়েছে ছেলে মেয়েরা মুখে জলটুকু দিতে পায় নি, বাছাদের নাড়ী পিতিয়ে গেল।" কৃষ্ণধন ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তৈলসিক্ত বালকবালিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নদীতে চলিলেন, কতকগুলি শুকনো কাপড় লইয়া ক্ষেন্তা খানসামা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন পুরোহিত চূড়ামণি ঠাকুর হাত পা ধুইয়া ভিজে গামছা কাঁধে কুশাসনের উপর বসিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি একখানি পট্টবস্ত্র পড়িয়া দোকজাতে সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া কৃষ্ণধন নবান্ন করিতে বসিলেন। প্রথমে দেবগণ ও স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণকে সেই নূতন আতপান্ন ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়া অবশেষে তিনি চাউল, দুধ, গুড়, ফলমূল সমস্ত সেই প্রকাণ্ড পাথরের খোরাটাতে ঢালিয়া মাখিয়া লইলেন।

তখন ছেলেরা কলাপাতে একটু একটু নবান্ন লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিল, কেহ ছাদের উপর কাক শালিখ প্রভৃতি পাখীর জন্য তাহা রাখিয়া আসিল, কেহ ঢেঁকির ঘরে ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে দিতে গেল, মাছেদের নবান্ন খাওয়াইতে একটি ছেলে নদীতে চলিল,

একজন গোরু বাছুরের জন্য খানিকটে গোয়ালঘরে লইয়া গেল, কেহ শৃগালের জন্য চাট্টি চাউল ও খান দুই আখ এবং আলু লইয়া বাঁশঝাড়ে আশ্‌শ্যাওড়া জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া আসিল। সকল জন্তুকে দেওয়া হইলে পর সকলে মহাসমারোহে দুগ্ধ গুড় মিশ্রিত চাউল খাইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর বৌ ঝিরা এক এক বাটী চাউল লইয়া রান্না ঘরের বারান্দায় উননের ধোঁয়ার মধ্যে, ভিজে চুলে, পা মেলিয়া বসিয়া সিক্ত নবতণ্ডুলরাশি নত মুখে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। রাখাল কৃষাণ সকলেরই নবান্ন হইয়া গেল, এমন কি দুই চারিজন ভিখারীও আঁজ্‌কার এই উৎসবান্নের অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। যে সকল ছেলেপিলে জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছে, এবং দুধ ও বার্লি ভিন্ন ডাক্তার যাহাদের অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করে নাই তাহারা পর্য্যন্ত দুটি চাউল মুখে দিয়া নিয়ম রক্ষা করিল।

গ্রাম্যদেবতা গোপালের বাড়ীতে আজ নবান্নের ভারি আয়োজন। যে সকল গরীব দুঃখী লোক ঘরে নবান্নের যোগাড় করিতে পারে নাই কিম্বা যাহাদের পরিবারে অশৌচ হওয়াতে নবান্ন হইল না, তাহারা ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদ আনাইয়া সপরিবারে তাহাই মুখে দিল।

আজ সকল বাড়ীতেই ধূমধামের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হইয়াছে, পাঁচ তরকারী ভাত, ভাজা, বড়া, গুড়অম্বল পায়েশ, আজ কিছুই বাদ যাইবার যো নাই। গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা আহারাদির পর হুকা টানিতে টানিতে দারা ও পাশা খেলিতে বসিয়া গিয়াছেন, গড় গড় করিয়া হুকা ডাকিতেছে, কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে, 'কিস্তী,' 'কচে বার' প্রভৃতি শব্দের বিরাম নাই, যুবকেরা সশব্দে তাস পিটিতেছে। ছেলেরা সমস্ত দুপুরটা বাড়ীতে বাড়ীতে, চিলে কোটার ছাদে, অন্দরের বাগানে, গোয়ালঘরের অন্তরালে লুকোচুরী খেলা শেষ করিয়া বৈকালে দত্তবাগানে দলে দলে আসিয়া জুটিল। একদল 'চানচু' খেলিতে লাগিল, একজন বুড়ী হইয়া বসিল, আর একজন তাহার মাথা ধরিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল, বিপক্ষ দলের একটি ছেলে একদমে 'চু' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সকলকে তাড়া করিয়া ঘুরিতে লাগিল, যে ছেলেটি মাথা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মরিবার ভয়ে সেও একদিকে পালাইয়া গেল, বুড়ী ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল নিকটে তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই, উঠিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে নিজের 'কোটে' পলাইয়া গেল, আর তাহার দলস্থ সকলে বিজয়োল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল।

একদল দাণ্ডাগুলি লইয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছে, 'গুবা'র গুলিতে দাণ্ডার আঘাত পড়িতেছে, আহতগুলি বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া চলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠিতেছে "নেই আনকাট্টা নেই ন্যাং"। দৈবাৎ গুলি গিয়া আমগাছের পাতার মধ্যে বাধিতেছে আর দাণ্ডা-হস্ত ক্রীড়ামগ্ন বালক হাঁকিতেছে "নেই ঝোড়োল," অর্থাৎ ঝোড়ে বাধিয়াছে, সেগুলি ধরিলে কোন ফল নাই।

অপেক্ষাকৃত বড় বড় একদল ছেলে "হাডুডুডু" খেলার আয়োজন করিতে লাগিল,

একটু তফাতে ঘাসের উপর দুই 'মূল গেঁড়ু' বসিয়া গিয়াছে, দুইজন করিয়া ছেলে একটু দূরে যাইয়া কল্পিত নাম পাতাইয়া আসিতেছে এবং সহাস্যে মূল গেঁড়ুদের জিজ্ঞাসা করিতেছে "কে নেবেরে হীরেমন কে নেবেরে ময়না।" অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া এবং উভয়ের কৌতুকোদীপ্ত চক্ষু ও হাস্য-তরঙ্গায়িত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া 'মূলগেঁড়ু' ডাকিতেছে "আয়রে আমার হীরেমন।" যাহাকে সে চায়, দৈবক্রমে সে "হীরেমন" হইলে খেলোয়াড়দের মধ্যে তুমুল হাস্যধ্বনি উছলিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে হর্ষ-কলরব এবং উৎসাহের সীমা নাই। নদীতীরবর্ত্তী ষষ্ঠীতলায় খোলামাঠে রাখাল কৃষাণ ও মজুরেরা সমবেত হইয়াছে, আজ তাহাদের বিশ্রামবার, বৎসরকার দিন বলিয়া কেহ কাজে যায় নাই; তাহাদের মধ্যে কোন দুইজন মালামো করিতেছে, কেহ কেহ লাঠি খেলিতেছে, তিন চারিজনে বাজি রাখিয়া একটা লক্ষ্য স্থানে আগে পৌঁছিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছে; আজ ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রাম আনন্দে পরিপূর্ণ।

ক্রমে যখন সায়ংসূর্য্য নদীর পশ্চিমে বহুদূরবর্ত্তী আম কাঁঠালের বাগানের অন্তরালে অস্ত গেল, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ এবং বনে বনে খদ্যোতের ক্ষীণ আলো জ্বলিয়া উঠিল, এবং পল্লীরমণীগণ নদীতে গা ধুইয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া হেলিয়া দুলিয়া গল্প করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কৌতুক হাস্যে সন্ধ্যান্ধকার-বেষ্টিত ঝিল্লিধ্বনিমুখর বনপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গৃহে ফিরিল, বায়সের দল তীব্রস্বরে 'কা' 'কা' করিয়া ডাকিয়া দ্রুতপক্ষে নীড়লক্ষ্যে ফিরিতে লাগিল, বাদুড়েরা দিবসের আশ্রয় নিবিড়পত্র তেঁতুলশাখা কিম্বা বাঁশঝাড় ছাড়িয়া আহার অন্বেষণে নিঃশব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিল ও নেশাখোর বাউলের দল বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরের পাশে একটা গাঁজার আড্ডায় বসিয়া ডুগী বাজাইয়া "বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে" অন্তিম কালের এই গান জুড়িয়া ঐহিক জীবনের নশ্বরতার কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল তখন সকলে ক্ষীণদেহে ধীরে ধীরে স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আক্ষেপ।

কেন তুমি হয়েছিলে, প্রিয়া,
অতুলনা সুন্দরী এমন?
কেন তুমি পরিয়া এসেছ
স্বভাবের শত আভরণ?
আমি যে তোমারে ভালবাসি,
তাহা, তুমি সুন্দরী বলিয়া—
অবিচারে এ কথা কেহ ত
নাহি বলে অপবাদ দিয়া?
আহা, তুমি হইতে গো যদি
রূপহীন, ব্যাধিত, বিকল,—
আর, আমি বাদশাহ-বলে
শাসিতাম সর্ব্ব ধরাতল,
তবুও তোমারে সখি আমি
একমাত্র করিতাম সার;
রাখিতাম হৃদয়ে করিয়া
ফেলে দিয়ে কোহিনূর ছার!
আমার কবিতা-মন্দাকিনী
শত লক্ষ অযুত ধারায়
রাত্রিদিন বহিয়া বহিয়া
তব নামে প্লাবিত ধরায়।
প্রহেলিকা ভাবিত মানুষে
দেখিয়া আমার আচরণ;
জগতের রূপসীগণের
মুখচন্দ্রে লাগিত গ্রহণ।

পুর্শী জাতি।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পুর্শী নামে এক প্রাচীন অসভ্য জাতি আছে। ইহাদের ইতিবৃত্ত অতীব কৌতুককর। ইহারা যে ভারতের আদিম অনার্য্য জাতিদিগের অন্যতম শাখা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের ধর্ম্মটা কি তাহা সহজে বুঝা যায় না কিন্তু ইহারা এক্ষণে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। গোমাংস ভিন্ন ইহারা সকল প্রকার মাংসই ভক্ষণ করে; সর্প, শূকর, বৃশ্চিক, ভেক, মূষিক, মুর্গী ইত্যাদি অম্লানবদনে ইহারা আহার করিয়া থাকে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত, এখন মাংস পাক করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা বনে ও পাহাড়ে লুকাইয়া থাকিত, এখন গ্রামে ও নগরে আসিয়া বাস করিতেছে। পুর্শীরা দেখিতে পুষ্ট, সবল, দীর্ঘাকার, উন্নতললাট এবং সুশ্রী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী; এক একটা যুবতী স্ত্রীলোকের এমন রূপ যে, অনেক ইংরাজ এবং য়িহুদী রমণী লজ্জায় অবনতবদনা হইয়া যায়। পুর্শীরা সাঁওতালদিগের ন্যায় সত্যবাদী, তীর ধনু ব্যবহার করিতে খুব পটু, শিকারে ক্ষিপ্রহস্ত, ঘোড়ায় চড়িতে বা দৌড়িতে বিশেষ দক্ষ এবং প্রতিহিংসা লইতে বোধ হয় পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রগণ্য। পঞ্চবিংশ বৎসরের পুরাতন ক্রোধটিও তাহারা সহজে ভুলিতে পারে না; শত্রুকে যখনই যে অবস্থায় প্রাপ্ত হয়, তদ্দণ্ডেই বিনাশ করে। গোধূম অপেক্ষা চাউলে ইহারা বড় সন্তুষ্ট থাকে এবং নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ ভক্ষণে বড়ই প্রিয়। সহজে ইহারা কাহারও সহিত কলহ করে না, সহজে ক্রোধান্ধ হয় না কিন্তু রাগিলে আর রক্ষা নাই, ক্রোধসম্বরণ করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে, এই জন্য সাবধানে ইহাদের সহিত মিলিতে হয়! ইহারা কৃষিকার্য্য করে না, কৃষিকার্য্য করা ইহাদের সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ। মৎস্য ধরিয়া তাহা বিক্রয় করে অথবা বনের কাষ্ঠ বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুর্শীরা বনের নানাপ্রকার তরুলতার গুণ জানে, অনেক দুঃসাধ্য রোগের ঔষধ তাহারা বন হইতে আনিয়া দেয়। কোনও কোনও সময়ে অরণ্য হইতে নানাপ্রকারের ফুল আনিয়া তাহা হইতে সুরা প্রস্তুত করিয়া লয়, কখনও বা গহন কানন হইতে সুস্বাদু মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, ইহাদের স্ত্রীসমাজে ব্যভিচার বা ব্যভিচারিণী নাই। কোনও পুর্শী স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে শুনিলে ইহারা তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে অথবা তরবারী আঘাতে মারিয়া ফেলে কিম্বা প্রাণহত্যার সুবিধা না পাইলে চাঁদা তুলিয়া তাহার সাহায্য করে কিন্তু বেশ্যা হইতে দেয় না। আমাদের দেশের অনেক সমাজসংস্কারক ও সুনীতিপ্রচারক মহাশয়দিগের পক্ষে পুর্শী স্ত্রীচরিত্র একটা সুদৃষ্টান্ত বলিয়া পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমি একবার একটা পুর্শীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমাদের মধ্যে বেশ্যা আছে কি?" লোকটা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল "আমরা কি লেখাপড়া জানি যে, আমাদের স্ত্রীসমাজে বেশ্যা পাওয়া যাইবে?" কথাটা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলাম। বাস্তবিকই পুর্শীরা লেখা পড়া জানে না, শিক্ষার বিস্তার এখনও ইহাদের মধ্যে হয় নাই। খৃষ্টীয় পাদ্রীরা কতকগুলি পুর্শী স্ত্রী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দী লেখা পড়া শিখাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের সমাজে লেখা পড়ার চর্চ্চা বিন্দুবিসর্গও নাই। পুর্শীদিগের স্মরণশক্তি অতি প্রখর এবং বংশী বাজাইতে ইহারা বিশেষ পটু।

এইবারে ইহাদের অত্যদ্ভুত বিবাহের কথা বলা যাইতেছে। বলা বাহুল্য পুর্শীদিগের সংখ্যা এখন খুব কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অপরাপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যার তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়, কিন্তু অতি পুরাতন জাতি বলিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকটে অতীব প্রয়োজনীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রকার মহর্ষি মনু, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, ব্রাহ্ম, আর্য, প্রভৃতি অষ্টপ্রকারের বিবাহবিধি লিখিয়াছেন। পুর্শীদিগের বিবাহ এই আটপ্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাদের কন্যার অভিভাবক এবং পুত্রের অভিভাবকের মধ্যে বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেলে, একমাস পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে পশু যৌতুক অথবা পক্ষী যৌতুক প্রেরিত হয়, অর্থাৎ ছাগ, মেষ, মহিষ, মুর্গী প্রভৃতি উপহার দেওয়া হইয়া থাকে। বিবাহের এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে মদিরা সংগৃহীত হয় এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা মাংস সহকারে মদিরা পান করিয়া নৃত্য করে। বিবাহের দুই দিন অগ্রে পুত্র পক্ষের লোকেরা কন্যা পক্ষের লোকের সহিত যোগ দেয় এবং তাহাদের বাটীতে আসিয়া অবস্থান করে। একদিন পূর্ব্বে কন্যাটি একটি সুরঙ্গ (মৃত্তিকার নীচে গুহা) মধ্যে বাস করে, গুহার মুখটি কদলী পত্র ও নানাপ্রকার পুষ্পমালা দ্বারা আবৃত হয়। সমস্ত দিন ও রাত্রি কন্যাকে কেহ দেখিতে পায় না। ঐ দিবস পুত্রটি (বর) কোনও উচ্চস্থানে বা গৃহের ছাদে একাকী অবস্থান করে। বিবাহ রাত্রে হয় না, মধ্যাহ্নে হইয়া থাকে। বিবাহের দিনে কন্যাকে গুহা হইতে এবং পাত্রকে ছাদ হইতে নামাইয়া আনা হয় এবং বরকে স্ত্রীলোকের বেশে ও কন্যাকে পুরুষের বেশে সজ্জিত করান হইয়া থাকে। পরিচ্ছদের কার্য্য শেষ হইলে, অগ্নি জ্বালান হয়, ঐ অগ্নির দক্ষিণ দিকে পাত্র এবং বামদিকে পাত্রী বসে। তদনন্তর সূর্য্য পূজা হয়, উহার মন্ত্র এইরূপ—"হো দোবা লাকোড়্ কৌছি ইঁদোলা খৌড়ী মগারে সূয়া।" ইত্যাদি। সূর্য্যপূজার পরে, পুর্শী ভিন্ন কেহ সে স্থানে আসিতে বা থাকিতে পারে না। গোপনে কি তাহারা করে তাহা জানা যায় না। সন্ধ্যার সময়ে বলিয়া বেড়ায়, বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। রাত্রে নৃত্য গীত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ে হাত ধরিয়া নাচে। তদনন্তর কন্যাটিকে লইয়া তাহার পিতা চলিয়া যায়, কন্যা এক বৎসর পর্য্যন্ত শ্বশুরালয় যাইতে পারে না। এই এক বৎসরের খরচা কন্যার শ্বশুর কন্যাকে অথবা তাহার পিতা বা অভিভাবককে পাঠাইয়া দেয়। যদি কোনও মাসে খরচার টাকা না আইসে তাহা হইলে কন্যা ভিক্ষা করিয়া খাইবে কিন্তু পিতার অন্ন খাইবে না। পুর্শীদের কন্যাদের গড় ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, পুত্রদের গড়ে ১৯ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে। তাহারা বিবাহকে 'পুনী' বলে। যে কোনও মাসে বা যে কোনও তারিখে বিবাহ হউক না,

শুক্রবারে বিবাহ হওয়া চাই। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা দলের প্রধান কর্ত্তা পুরোহিতের কার্য্য করে। পুর্শীরা হিন্দুমন্দিরে যাইয়া দেবতাদিও দর্শন করিয়া থাকে এবং কালী দুর্গা প্রভৃতিকে দেখিলে মস্তক অবনত করে। পুর্শী স্ত্রীলোক মরিলে তাহার মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়, বালক মরিলে তাহাকে জলে ফেলিয়া দেয়, বয়স্ক পুরুষ মরিলে মৃতদেহ দাহ করে। পুর্শী পুরুষদিগের নাম, সাধারণতঃ এইরূপ হয়ঃ—নারানা, কিপ্পা, হদ্দু, গোজুলা, বুটিয়া, সরিকা, ভট্টু, মোহোলু, পোৎরী, পর্ম্মা, বগ্গা, টীয়াবু, ইত্যাদি।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিলে পুর্শীরা উত্তম সিপাহী হইতে পারে এবং যুদ্ধ সময়ে রাজ্যের অনেক হিতকর কর্ম্ম করিতে পারে। পুর্শীরা খুব পরিশ্রমীও বটে, সাহস কম নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও বেশ আছে। দোষের মধ্যে ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসভ্য প্রথাগুলি সহজে ছাড়িতে চায় না। পুর্শীর সঙ্গে মিত্রতা করিতে হইলে খুব সাবধানী হইতে হয়, ইহাদের প্রকৃতি খুব চঞ্চল। ইহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে পরম মিত্র হয় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধুর গলদেশে তরবারী লাগাইয়া দেয়। কবিবর বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"কানুর পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ॥"

পুর্শীর স্বভাব এবং পুর্শীর মিত্রতা ঠিক তাহাই। আমার পুর্শী ভৃত্য বলিত "সাপকে বিশ্বাস হয়, পুর্শীকে বিশ্বাস হয় না।"

A NARROW ESCAPE.

অথবা

দগ্ধ কচু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন রাঙ্গাদিদির ও শালিগণের ও শালাজগণের সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আমি তিন ঘণ্টার জন্য অব্যাহতি পাইলাম, তখন আমি সটান্ অন্দরমহল ত্যাগ করিয়া, একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও আমার শ্যালকগণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বালিয়া, চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া, আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শালিপতি ভাই শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু নিবিষ্টচিত্তে আইনের পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিয়া shake hand করিলেন ও সাগ্রহে বলিলেন "Hallo, Meghnad Babu যে! কেমন আছ? কখন এলে? Well met।"

আমি যথোচিত অভিবাদন করিয়া বলিলাম "Thank you, ভাল আছি। এসেছি অনেকক্ষণ হ'ল। বৈঠকে কেউ ছিল না ব'লে আমি ভেতরে রাঙ্গাদিদির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম।"

হরনাথ বাবু সহাস্যে বলিলেন "ওঃ বোঝা গেছে! Labyrinth of Beauties এ সেঁদিয়ে বাইরে আস্‌বার পথ খুঁজে পাচ্ছিলে না! কোথায় লাগে এর কাছে লক্ষ্ণৌর নচ্ছিভবনের গোলকধাঁধা!"

আমি বলিলাম "ঠিক্ বলেছেন দাদা; আপনার উপমাটি খুব্ মানান্‌সই হয়েছে। কিন্তু এই গোলোকধাঁধার মধ্যে স্থানে স্থানে মৌমাছির চাক্ আছে। শুধু মধু ও গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ শব্দ থাক্‌লে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এরা যে কখন কখন দংশন ও করে থাকে।"

হরনাথ বাবু সরোষে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "বল কি হে মেঘনাদ? মধু? ভ্রমর? গুণ্ গুণ্? Nonsense! No such thing! These girls have built a veritable nest of hornets! বোল্‌তার চাক্!—বোল্‌তার চাক!"

আমি হরনাথ বাবুর সক্রোধ মুখভঙ্গি দেখিয়া ও রোষব্যঞ্জক বাক্যগুলি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার দশমহাবিদ্যারা ইঁহাকে যার পর নাই উৎপীড়িত করিয়াছে। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে দাদা? কি হয়েছে? কাণ্ডকারখানাটা কি? এত রাগ কেন?"

হরনাথ দাদা বলিলেন "অনেকে সেক্সপীয়রের নিন্দা করে থাকে যে তাঁর পক্ষে Taming of the Shrew লেখা অন্যায় হয়েছে—এ নাটকটি কবির সহৃদয়তার অনুপযুক্ত। আমিও পূর্ব্বে এই মনে করতাম! কিন্তু সংসারে ঠেকে শিখে আমি মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কি বল্‌ব মেঘনাদ বাবু? আমরা এ বাড়ির জামাই। যদি এ বাড়ির কোনো বাবু হ'তাম তা হ'লে স্বহস্তে Taming of the Shrew করতাম!"

আমি বলিলাম "দাদা, দশমহাবিদ্যার মধ্যে কেউই ত' shrew নয়। সকলেই সুশীল ও নম্রপ্রকৃতি। আমার ছোটশালিটিও আপনার খুব্ বাধ্য। আর রাঙ্গাদিদি ত' Pink of perfection বল্‌লেই হয়। এরা সকলেই রূপে গুণে আলো করা। আমাদের শ্বশুর শাশুড়ি চমৎকার অমায়িক প্রকৃতির লোক—দেবতা বল্‌লেই হয়। আর আমাদের শালা বাবুরা perfect types of gentlemanliness। সত্য কথা বল্‌তে কি, হরনাথ দাদা, আমাদের পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় যে এমন সৎ বংশে বিবাহ হয়েছে।"

হরনাথ দাদা একটু নরম হইয়া বলিলেন "ভায়া মেঘনাদ, শালিশালাজেরা দেখ্‌ছি তোমাকে একেবারে mesmerise করে ফেলেছে। হিন্দু ভূগোলবেত্তারা যে বলেন—কামাখ্যা প্রদেশটা বঙ্গভূমির উত্তরপূর্ব্বে সে কথাটা তাহা ভুল—কামাখ্যা-প্রদেশ বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত এই ব—গ্রামে। বলি, ভায়া,—Shelly

ও Byron ও কালিদাস এখনও কি তোমার favourite authors? Keatsএর সেই line গুলি কি হে?

> "A thing of beauty is a joy for ever.
> "Whence that completed form of all completeness?
> Whence come that high perfection of all sweetness?"

আর Byronএর সেই অদ্ভুত কবিতা—

> "The smile which answers to mine
> I do not believe it beguiling"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি সহাস্যে বলিলাম "দাদা আজকাল 'আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, ভগবদ্গীতা, Denssen ও Schopenhaur পাঠ করি। বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, এ সংসারে সকলি ভোজবাজি ও মায়ার খেলা। ক্রমাগত philosophy পড়ে পড়ে মাথাটা গরম হয়ে উঠল; মনে করলাম একবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শরীর ও মনটা তাজা ক'রে আসি। অনেক দিনের পরে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, বিশ্রামটাও হবে। ফিকিরটা কি মন্দ হয়েছে?"

হরনাথ বাবু বলিলেন "See-saw! see-saw! The world moves in a cycle! তুমি পাঠ ত্যাগ করবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে এসেছ আর আমি পাঠ করবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। মনে করলাম B. L, পরীক্ষার আর বেশি বিলম্ব নেই—দুই মাস মাত্র বাকি আছে। চুঁচ্‌ড়োর বাড়িতে সেই হট্টগোলের মধ্যিখানে তো পাঠ করবার জো নেই। বিবেচনা করলাম শ্বশুরালয়ে গিয়ে একান্তে নিরিবিলিতে study করব। ও মা! এখানে এসে একি! From the frying pan into the fire, এ যে, regular confusion of Babel"

হরনাথ দাদার কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভারি amused হইলাম। আমি মনে করিলাম "শ্বশুরবাড়িতে অধ্যয়নের জন্য আসা ideaটা নূতন ও মৌলিক বটে।" কিন্তু আমি জানিতাম হরনাথ দাদা কিছু eccentric প্রকৃতির লোক; এই জন্য আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। প্রকাশ্যে বলিলাম "দাদা, এরা দেখ্‌চি আপনাকে যার পর নাই জ্বালাতন করেছে। কি হয়েছে দাদা, সব কথা খুলে বলুন্। দুই জনে মিলে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।"

হরনাথ দাদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "জ্বালাতন? শুধু জ্বালাতন? উস্তোম ফুস্তোম্; ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত! এমনও গোলযোগে মানুষে পড়ে হে? দুই দিন

না যেতে যেতে রাঙ্গাদিদি ও তাঁর দশ শিষ্যেরা আমাকে "গান গাও—গল্প কর" বলে গ্রেফ্‌তার কর্‌লে। আমি তাঁদের খ্যাতিরে একদিন অনেকগুলি বাঙ্গলা গান গাইলাম। তার পর দিন আবার পাক্‌ড়াও! আমি সাফ্ জবাব দিলাম "দুই মাস পরে আবার গাইব।" রাঙ্গাদিদি সানুনয়ে বল্‌লেন, "লক্ষ্মী নাতজামাইটি। কথায় বলে, অনুরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে; আমরা এত সাধ্যসাধনা কর্‌চি—রোজ এক আধটা গান গাইলে আর ভারত অশুদ্ধ হবে না। আর শ্বশুরবাড়িতে এসে রোজ এক আধ্‌টা গান না গাইলে লোকেই বা কি বল্‌বে?"

আমি বল্‌লাম "আমি শ্বশুরবাড়িতে গান গাইতে আসিনি; বই পড়্‌তে এসেছি" বড় শালিটি বল্‌লেন "কথা শোন! শ্বশুরবাড়িতে বই পড়্‌তে কে কবে গিয়ে থাকে গা! অনেক দিন বাদে এসেছ; দুটো রসের কথা কও; দুটো আমোদের কথা পাড়; না কেবল চক্ষে ঠুলি দিয়ে আইন্ আর কানুন্, কানুন্ আর আইন্। শ্বশুরবাড়িতে এসে এমন বেয়াইনি কাণ্ড কে কবে করে থাকে গা?"

বড় শালাজ বড় বড় চক্ষু ঘুরিয়ে বল্‌লেন "তা ভাই, পড়্‌তে এসেছ বেশ্ করেচ। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় পোড়ো—প্রভা ঠাকুরঝি গুরুমশায়গিরি ভাল করে কর্‌বে। সে কাণ্ মল্‌তে বেশ্ শিখেচে।"

দ্বিতীয় শালিটি বল্‌লেন "রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! এতক্ষণ ধ'রে আমাদের সঙ্গে ঝুটোপুটি কোঁদল করচো, তাতে সময় নষ্ট হ'ল না, তাতে পড়ার ক্ষতি হ'ল না—আর একটা গান গাইলেই যত পড়ার ক্ষতি! এত ন্যাকামিও জান গা!"

দ্বিতীয় শালাজ্‌টি (যাকে তুমি "পণ্ডিত মশায়" ব'লে ডাক—In order of meritএ এঁর উল্লেখ প্রথম হওয়া উচিত ছিল—কেমন মেঘনাদ বাবু ঠিক্ নয়?) বল্‌লেন "ঠাকুর জামাই—তুমি অসঙ্কোচে পাঠ হ'তে বিরত হ'তে পারো—পরীক্ষার দিন, পরীক্ষার স্থলে, প্রভা ঠাকুরঝি তোমার প্রতিভূ হয়ে যাবে।"

আমি কৃত্রিম মূর্খতা প্রকাশ ক'রে বল্‌লাম "সে আবার কি!—হা হতোহস্মি!" পণ্ডিত মহাশয় রেগে বল্‌লেন "ঠাট্টা না কি!—প্রতিভূ—প্রতিভূ শব্দ বুঝি বাঙ্গলা ভাষায় নেই—অনঙ্গ, অনঙ্গ—কর্ত্তার মহল থেকে শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে আয় তো"—

তখন অনঙ্গ ছুঁড়িটে (I beg your pardon, Meghnad Babu) যথা নির্দ্দিষ্ট, ছুটে শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করলে! পণ্ডিত মহাশয় ক্ষিপ্রহস্তে "প"য়ের কোটায় হাত দিয়ে প্রতিভূ শব্দ বার করলেন ও বিজয়-প্রদীপ্ত-নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—

"ঠাকুরজামাই, আমার সঙ্গে ঠাট্টা—এই দেখ "প্রতিভূ"!—প্রতিভূ অর্থে "লগ্নক, জামিন্‌দার, ঋণশোধে স্বীকারক।" চাণক্যশ্লোকের সেই শ্লোকটা (মাগি কি pedant!) ঠাকুর-জামাই, সেই শ্লোকটা মনে আছে তো? "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে!"

আমি হেসে বল্‌লাম "বউঠাকরুণ, বেয়াদবি মাফ করতে আজ্ঞা হোক—ব্যাকরণ অশুদ্ধ হোলো—বিদুষী সর্ব্বত্র পূজাতে হওয়া উচিত ছিল।"

আমাদের কবিতাপ্রিয় তৃতীয় শালিটি অর্দ্ধ ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠল—

"পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পূরিয়া—
মূর্খে কি বুঝিবে—থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া।"

পণ্ডিত মহাশয় সুপ্রসন্ন হয়ে বল্‌লেন "মন্দ বলনি ঠাকুরজামাই—এবারে চাণক্য শ্লোকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এ ভ্রম সংশোধন করে দিও।"

আমি বল্‌লাম "যে আজ্ঞা—তাই হবে এখন আমি বাইরে চল্‌লাম—আপনি আমার প্রতিভূ হয়ে এই সভামণ্ডপের সমক্ষে দুই একটি গান গাইবেন।" এই বলেই আমি উত্তরের প্রতীক্ষা না করে তাড়াতাড়ি জুতা পায়ে দিয়ে সে স্থান হতে প্রস্থান করলাম। কেমন মেঘনাদ বাবু, ভাল করিনি? সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌চি এমন সময়ে রাঙ্গাদিদি উপর হতে খানিকটে Lavender water আমার মাথায় ঢেলে দিলেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদার নাকালের ইতিহাসটা শুনিয়া আমি সহাস্যে বলিলাম "দাদা, এতেই এত রাগ? আপনার কাজটা ভারি engallantlike হয়েচে দেখ্‌চি। Xantippeর প্রতি Socrates এর সম্বোধনের মত আপনারও বলা উচিত ছিল—After such thunders, there must needs be a shower of rain"

হরনাথ দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন (শরৎ কালের মেঘ ও রৌদ্রের মত হরনাথ দাদার বিরক্তি ও সন্তোষ আমাদের কাছে এক প্রকার প্রহেলিকা ছিল) "ওহে মেঘনাদ—আমি এত thinskinned নই যে এই গোলাপি সম্ভাষণে এত চটে যাই। এটাতো কেবল কথা কাটাকাটি, theoretical অংশ গেল—এখনও হাতাহাতি, practical অংশটা বাকি আছে। শুন্‌লে তোমারও ক্রোধ হবে। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে যাচ্চে। সাধুচরণ—সাধুচরণ—তামাক দিয়ে যাওতো—হা দেখ, এদ্দের আক্কেলটা! শালা বাবুরা এখনো ফিরলেন না—By the way; মেঘনাদ তামাক ধর। Try this cigar. Eh? No? This is prudery indeed! I am afraid মেঘনাদ, তুমি এই নির্দ্দোষ ব্যোমযান, বেলুন যন্ত্রকে অবহেলা ক'রে, কোন্‌দিন জলপথে ষ্টীমারে আরোহণ না কর। আমাদ্দের ব্লু ষ্টকিংস্ শালাজটিকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি বল্‌বেন "সে যাত্রা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল। সে প্রদেশে ভীম নক্র বাস করে।"

ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিল। হরনাথ দাদা তামাক টানিতে টানিতে বলিতে

লাগিলেন "আমার নাকালের practical অংশটা বল্‌চি শোন। শ্রোতার পক্ষে edifying, বক্তার পক্ষে mortifying,

সেই দিন রাত্রিকালে আহারান্তে শয়ন-কক্ষে দিব্য আরামে পালঙ্কে শুয়ে Penal Code এর definition গুলি revise করচি—পালঙ্কের এক পার্শ্বে শশীকলার মত প্রভা সুন্দরী শোভা পাচ্চেন, এমন সময়ে Brigadier-General রাঙ্গাদিদি সদলবলে আমার সমীপে হাজির"—

আমার ত' দেখেই চক্ষুস্থির! জান ত' মেঘনাদ, ছেলে বেলা হ'তে কশরৎ ও জিম্‌ন্যাস্‌টিক্ ক'রে আমার দেহে অসাধারণ শক্তি হয়েচে—মাংসপেশীগুলি দেখেচো!—কেমন developed! Worthy of a gladiator! সুরেন্ বাঁড়ুয্যের ভাই জিতেন বাঁড়ুয্যের অপেক্ষা বাহুবলে আমি কোন মতেই হীন নহি। আর আমার height জান! 6 feet 6 inches। সে দিন সেই গোঁয়ার গোরাটাকে ঠেঙ্গিয়ে চুঁচুড়ায় আমার নাম জাহির হয়ে গিয়েচে। কিন্তু এ হেন বঙ্গবীর আমি শ্রীমান্ হরনাথ বসু, সেই মধ্যাহ্ন রজনীতে শ্রীমতী রাঙ্গাদিদির রণচণ্ডী-মূর্ত্তি দেখে ঈষৎ কম্পান্বিত-কলেবর হলাম! আমি মানস চক্ষে মাইকেল মধুসূদন-বর্ণিত প্রমীলার লঙ্কাপুরী-প্রবেশ দেখ্‌তে লাগলাম।

অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণপ্রভা সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশুরাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!

*　　*　　*

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে
অগ্নিময় দশদিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়দড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্গুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদা আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন "আমি সহাস্তে বল্‌লাম—এত রাত্রে, এ আবার কি রঙ্গ, রাঙ্গাদিদি?"

রাঙ্গাদিদি ও তাঁর সহচরীরা বিনা বাক্যব্যয়ে dumb pantomime showএর মত আমার সুপ্রশস্ত double পালঙ্গের চারি পার্শ্বে—যে, যে স্থানে ইচ্ছা করলে—বসে পড়ল। বেগতিক দেখে আমার আকুল অর্দ্ধাঙ্গীটি কক্ষ হতে শশব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত হল। আমি সসম্ভ্রমে Penal Code খানি বন্ধ করে উঠে বস্‌লাম। তখন রাঙ্গাদিদি ও তাঁর ministerial officersরা ঐকতানিক স্বরে বলে উঠল "গান গাও, গান গাও, গান গাও—গান না গাইলে নিস্তার নেই—গান না গাইলে তোমাকে ঘুমোতে দেব না। আর তোমার আইনের বই দাও"—এই বলে একটি সুন্দরী harpy (অনঙ্গ ছুঁড়িটা কি কম দুষ্ট!—I again beg your pardon, Brother Meghnad) আমার হতভাগ্য Penal Code খানিকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিবেচনা করলাম "এখন্ সন্ধিস্থাপন করাই যুক্তিসিদ্ধ।" প্রকাশ্যে বল্‌লাম "Treaty of Utrechtএর মশওদা প্রস্তুত হয়েচে কি?"

আমার চতুর্থী শালিটি বল্‌লে "ও সব আইন্ কানুন্ রেখে দাও। এখন্ একটা ভাল দেখে গান গাও। গাও

"যুবক যুবতী জাগ যামিনী যে যায় রে
মদন শাসনে কেবা নিশীথে ঘুমায় রে
আজি যে প্রভাত-ফুল"—

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম "আপনারা'ত আমার বাঙ্গলা গান অনেক শুনেচেন; যদি অনুমতি করেন তা হ'লে আজ গোটা কতক ইংরিজি গান গাই।"

পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন "না, না,—তা হবে না—সংস্কৃত গান হোক্; গাও

যাহি মাধব, যাহি কেশব, মা বদ কৈতববাদম্,
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্।

গাও

স্মরগরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্"—

আমার বড় শালি বল্‌লেন "না বউ—ও বড় কটমটে—আজ ইংরিজি গানই হোক্—সংস্কৃত গান আর এক দিন হবে"

পণ্ডিত মহাশয় ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বল্‌লেন "বল কি ঠাকুর ঝি? ও বুঝি তোমার কটমটে গান হোলো? জয়দেব গোস্বামীর সুললিত পদ ভুবনে বিখ্যাত। কথায় বলে—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্"—

তখন সকলের vote নেওয়া হল। পণ্ডিত মহাশয় outvoted হয়ে গেলেন। সকলেরি মত হল "আজ ইংরাজি গানই হউক্।" আমি সেই নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করে উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ তাল মান লয়ে গাইতে লাগলাম। আমিও কতকটা আমোদ অনুভব করতে লাগলাম। আমি গাইলাম—

I.

Love not, love not, ye hapless sons of clay,
Hope's gayest reeds are made of earthly flowers,
Things that are made to fade and fall away,
Ere they have blosommed for a few short hours!
Love not, love not.

II.

Love not, love not, the thing you love may die,
May perish from the gay or gladsome earth,
The silent stars, the blue and smiling sky,
Beam on its grave as once upon its birth!
Love not, love not.

III.

Love not, love not, the thing you love may change,
The rosy lips may cease to smile on you,
The kindly beaming eye grow cold and strange,
The heart still warmly beat, yet not be true.
Love not, love not.

IV.

Love not, love not, O warning vainly said!
In present hours as in years gone by,

Love flings a halo round the dear one's head,
Faultless, immortal, till they change or die !
Love not, love not.

মেঘনাদ ভায়া, আমার অতি বড় শত্রুও স্বীকার করবে যে আমার গলাটা নেহাৎ মন্দ নয়। আমি নিজের গানে নিজেই মোহিত হলাম।

রাঙ্গাদিদি বল্লেন "বলিহারি তোমার গলা, নাৎজামাই। বিধাতা তোমাকে নারী না করে্য পুরুষ করলেন কেন ?"

পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"

আমার প্রথম শালি বল্লেন "লভ্ নট্—লভ্ নট্, এর অর্থ কি হরনাথ বাবু ?"

আমার প্রথম শালাজ সহাস্যে বল্লেন "তা বুঝি জানিস্ নে ঠাকুরঝি। লভ্ মানে ভালবাসার সামিগ্রি। আমার ইনি আমাকে যখন তখন আদর করে্য বলেন—মাই ডিয়ার লভ্।"

রাঙ্গাদিদি প্রাগুক্ত সুন্দরীর পৃষ্ঠে সস্নেহে মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে বল্লেন—"মাই ডিয়ার তোমার মাথা মুণ্ডু। একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েচিস্। নাৎজামাই, নাৎজামাই, তুমি কিছু মনে কোরো না—এরা নেহাৎ বিলিতি গোরা।" আমি সবিনয়ে বল্লাম "না ঠান্দিদি, মনে আবার কোরবো কি ? তোমাদের সাত খুন্ মাফ্—তোমরা যে Non regulation Provincesএর অধিবাসী !"

দশম পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন "ঠাকুরজামাই। এই ম্লেচ্ছ শ্লোকগুলিকে আর্য্যভাষায় অনুবাদ করে্য আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর।"

আমাদের কবিতাপ্রিয় তৃতীয় শালিটি বল্লেন "গদ্যে বল্লে হবে না, পদ্যে বল।"

আমি সহাস্যে বল্লাম "সে কি বল বোন্ ? আমি কি কল্পতরু ?"

রাঙ্গাদিদি হেসে বল্লেন "না নাৎজামাই—তুমি কামধেনু !"

যা হোক, মনে কিছুক্ষণ ভেবে একটা চলন-সই বাঙ্গলা কবিতা তৈয়ার করে বল্লাম "ইংরাজি গানটার ভাবার্থ এই—

১

বাস করে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বুদ্বুদ-প্রায়
চকিতে মিলায়ে যায় ; ভুল না রে ভুল না !
কারে ভাল বেস না রে বেস না !

২

জতুর কুসুমে গাঁথা আশার মালিকা রে
দপ্ করি জ্বলি উঠে অনলের শিখা রে
মালা সহ শরীরেতে নর-বক্ষ-উপরেতে
দগ্ধচিহ্ন থেকে যায় ; ভুল না রে ভুল না !
কারে ভাল বেস না রে বেস না !

৩

ওই বিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় রে
পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে
ওই পুনঃ আঁখি ঠেরে নিরখিয়ে বিজয়েরে
প্রণয় বিষম খেলা ; ভুল না রে ভুল না !
কারে ভাল বেস না রে বেস না !

মেঘে আবরিত হয় সুধাংশু-আনন রে
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে !
কাচ হেরি হীরা ভ্রমে ভুল না রে ভুল না !
কারে ভাল বেস না রে বেস না।

৫

না ছুঁইতে ঝরে যায় প্রজাপতি-পাখা রে
আগমনী না ফুরাতে বিজয়ার দেখা রে
অভিনয় না ফুরাতে রঙ্গভূমি-প্রাঙ্গণেতে
সূর্য্যরশ্মি দেখা যায় ; ভুল না রে ভুল না—
কারে ভাল বেস না রে বেস না !

আমার কবিতাটি সমাপ্ত হলে আমার প্রথম শালাজ বল্লেন "ঠাকুর জামাই, এ কোন্ বদ রসিকের গান ? এ গান আমাদের নামঞ্জুর। যদি জগতে ভালই না বাস্লাম তা হ'লে আমাদের বেঁচে সুখ কি ?"

আমাদের কবিতাপ্রিয় শালিটি বল্লেন—

যে যাহারে ভাল বাসে
সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে ?"

প্রথম শালি বল্লেন "হরনাথ বাবু, একটা ভাল রং তামাসার গান গাও—আমরা প্রাণ ভরে বুকপুরে হেসে নি।"

৬

আমি বল্লাম "দিদি, আমার বড় ঘুম পাচ্চে। রং তামাসার মধ্যে চক্ষে কেবল চিড়িতন্ ইস্কাপন্ দেখ্‌চি—হরথন রুইথন আদপে দেখ্‌তে পাচ্চি না।"

রাঙাদিদি বল্‌লেন "ছি, নাত্‌জামাই,—আমরা বুঝি চিড়িতন্ ইস্কাপন্?—প্রভাকে ডাক্‌ব?"

চতুর্থী শালি বল্‌লেন "মরে যাই আর কি! কি রং তা জানেন না!—আমরা উঠে যাই আর উনি প্রভাকে নিয়ে বিন্‌তি খেল্‌তে বসুন! সিটি হচ্চে না—একটা ভাল দেখে মজার গান গাও—আমরা হাস্‌তে চাই।"

আমি দেখ্‌লাম "বড়ই বেগতিক। এই সিংহবাহিনীদের পাল্লায় পড়ে আমার রাত্রিটাই মাটি।" আমি কাজেই শঠে শাঠ্যম্ আরম্ভ করা শ্রেয়ঃ মনে কর্‌লাম। মনে কর্‌লাম Law books এর definition গুলি যেগুলি এত করে কণ্ঠস্থ করেছি—সুর করে আওড়ে যাই, তবু অনেকটা revision এর কাজ হবে। এই মনে করে বললাম "তবে একটা ইংরিজিতে মজার গান গাই শোন।" তার পর, রাগরাগিণীর স্বরে Evidence Act খানা যা আগাগোড়া মুখস্থ করেছিলাম—বিকট মুখভঙ্গিতে আওড়াতে লাগলাম। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি "কেমন? কেমন লাগচে?" কোন সুন্দরী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন "বেশ খাসা" কোন সুন্দরী সহাস্যে বল্‌লেন "কি মধুর! কি মজা।" পণ্ডিত মহাশয় অনুনাসিক স্বরে বল্‌লেন "রাগ কোরো না ঠাঁকুরজামাই—গানটা বড়ই দীর্ঘ ও কিছু শ্রুতিকঠোর।" রাঙ্গাদিদি রাগ করে বল্‌লেন "কঠোর! যা ছুঁড়ি যা—তোর ভাল না লাগে তুই উঠে যা। এমন মিষ্টি গান—ওঁর লাগে কি না কঠোর—নাত্‌জামাই, তুমি কিছু মনে কোরো না—খাসা।"

এইরূপে নানা সুরে Preamble হতে শেষ পর্য্যন্ত সুকবি Stphen গ্রথিত Evidence Act নামক গীতি কাব্যখানি আবৃত্তি কর্‌লাম।

যখন আবৃত্তি শেষ হল, তখন সুন্দরীরা বল্‌লেন "অতি সংক্ষেপে এর অর্থ বল।"

আমি বল্‌লাম "অবশ্য অবশ্য—অতি সংক্ষেপেই বল্‌ব—ওই শোন, ঘড়িতে টং টং টং করে তিনটে বাজলো। রাত্রিও সংক্ষেপ হয়ে পোড়্‌ল।" এই গানটি অতি মজার, অতি কৌতুকের—এর নাম "আইবুড়ার খেদ।" আপনারা মন দিয়ে শুনুন; এর ভাবার্থ এইরূপ—

আইবুড়ার খেদ।

(১)

একটি নক্ষত্র আঁধার আকাশে,
একটি পাদপ বিস্তৃত প্রান্তরে,
একমাত্র পোত সাগর উরসে,
আমি আইবুড়া জগত ভিতরে!

কত শঙ্খচিলে করিনু প্রণাম,
ঘুচিল না তবু আইবুড়া নাম।

(২)

সে দিনের কথা—হরি খুড়া মোর
রাঢ় দেশে এক জুটালে সম্বন্ধ—
কি করিবে ওঝা? কি করিবে রোজা?
দেবের গঠিত ভাগ্য যার মন্দ।
রূপে গুণে ধন্যা ছিল সে কদম,
মাকে কথা কয় এই সে বিষম!

(৩)

ছিল নৃত্যকালি, মিষ্ট যেন নিচু!
দুই বর্ষ নাহি যাইতে যাইতে
হোলো তাল গাছ, দাঁত হোলো উঁচু,
হোলো কদাকার আমার ভাগ্যেতে।
কাজেই ভাঙ্গিয়া গেল সে সম্বন্ধ;—
অদৃষ্টের ফের হইল না বন্ধ।

(৪)

ময়রাণী দিদি মোর হিতৈষিণী
জুটালে সম্বন্ধ বড়শে বেয়ালায়,
ঠান্ দিদি কিন্তু হইয়ে বাঘিনী,
দেখালে ধবল কন্যার মাথায়
বিদ্যুৎ বরণী চারু সরোজিনী
অভাগা অদৃষ্টে ধবল-রূপিণী!

(৫)

এইবার বুঝি বিধাতা সদয়,
পাতা চাপা বুঝি আমারো কপাল—
বিধুর বাটীতে নিত্য তত্ত্ব যায়,
শুনি নিতি নিতি, শ্রবণ-রসাল,
"জামাই বাবু গো, চাঁপার সন্তোষ!
"কি ঝি, বলি আমি, মুখে মৃদুহাস!

(৬)

সেই কথা গিয়া পশিল কি হায়
উদ্বাহের দেব পদ্মযোনি কাণে ?
একটি সপ্তাহ যায় কি না যায়,
বিধুর শরীর শীতলার বাণে
হৈল ক্ষত ক্ষত ! চারিদিকে দাগ !
ঘুচিল আমার উদ্বাহের রাগ !

(৭)

জোড় ভাঙ্গা এক বিনামার মত,
বোস্জার হারা পাদুকার প্রায়,
সতত চঞ্চল সংসারের স্রোত
ইতস্ততঃ মোরে লইয়া বেড়ায় !
কত প্রজাপতি বধেছি শৈশবে,
সেই পাপে মোর এই দশা এবে !

(৮)

ভয়ে ভয়ে থাকি, নিরাশে, বিষাদে,
গণি কড়িকাট, গণিয়া নক্ষত্র,
সকালে বিকালে উঠি না'ক ছাদে,
প্রমাদ ঘটায় পাছে মোর নেত্র !
তবু আইবুড়া গুণের দাপটে
অভাগার নামে কত কথা রটে !

(৯)

এক হাত ভাঙ্গা চেয়ারের মত,
দুই পদ-হারা খট্টাঙ্গের প্রায়,
আমি আইবুড়া, ঘুরি ইতস্ততঃ,
মাথা নাই, মরি মাথার ব্যথায় !
কত শঙ্খচীলে করিনু প্রণাম,
ঘুচিবে না বুঝি আইবুড়া নাম !

আমার মুখভঙ্গি ও কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া সুন্দরীরা খুব উচ্চৈঃস্বরে হাস্তে লাগ্ল। আমিও খুব হাস্লাম। Well, Mr. Meghnad don't you think I deserve three cheers for that night's performance ?

(ক্রমশঃ)

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ফরাসির সর্ব্বনাশ !

ফরাসিদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইল ! তাঁহারা ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পথের ফকিরের মত নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিতে পারিলেন না ! ইংরাজেরা দুর্গাধিকার করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন না ;—ফরাসিদিগকে ধনেবংশে বিনাশ করিবার জন্য পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তীরবেগে ইংরাজতরণী ছুটিয়া চলিল ; ফরাসিরা অনন্যোপায় হইয়া, বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া, প্রাণ লইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন ! ইংরাজেরা শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া নিরীহ প্রজাপুঞ্জের শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিতে করিতে, গ্রাম নগর উৎসন্ন করিতে করিতে, হুগলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার বিস্তীর্ণ জনপদ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন !

মুর্শিদাবাদের লোকে ফরাসিদিগের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিল না ! সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা ; সুতরাং ফরাসিরা তাঁহারই শরণাগত হইল। তিনি ফরাসিদিগের কাতর-ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করিতে বাধ্য হইলেন !

বৃটিশবণিক বিজয়োন্মত্ত হৃদয়ে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। এত স্পর্দ্ধা ! এত সাহস ! তাঁহারা যাহাদিগকে ধনেবংশে বিনাশ করিবার জন্যই চন্দননগর কাড়িয়া লইলেন, সিরাজদ্দৌলা তাহাদিগকেই স্নেহক্রোড়ে আশ্রয়দান করিলেন ? সিরাজদ্দৌলা এ দেশের রাজা, আর্ত্তত্রাণ তাঁহার পরম পবিত্র রাজধর্ম্ম,—সে কথা কেহ বিচার করিয়া দেখিলেন না। ইংরাজ মাত্রেই সিরাজদ্দৌলার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা জানিতেন যে, চন্দননগরের অল্পসংখ্যক ফরাসি-সেনা সমূলে বিনষ্ট করা খুব সহজ কথা ; কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ফরাসিজাতি যখন প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইবে, তাহার গতিরোধ করা সেরূপ সহজ হইবে না ! ইংরাজেরা সেই জন্যই সিরাজদ্দৌলার সহায়তায় ফরাসিদিগকে নির্ম্মূল করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন ! যদি সিরাজদ্দৌলা সহায়তা করেন, তবে ইংরাজ বাঙ্গালীর সমবেত শক্তির নিকট ফরাসিকে অবশ্যই নতশির হইতে হইবে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ফরাসিদিগকে আশ্রয়দান করায় ইংরাজের সে আশা নির্ম্মূল হইল। তখন তাঁহারা নানা উপায়ে সিরাজদ্দৌলার মতিপরিবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ এবং ফরাসি উভয়েই উভয়ের চিরশত্রু। তাঁহারা দুই জনেই ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য লালায়িত। সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে ফরাসিদিগকে নির্ম্মূল করিবার অবসর দান করা আর ইংরাজের নিকট আত্ম-বিক্রয় করা এক কথা। তিনি সেই জন্যই ফরাসিদিগকে রক্ষা করিতে সমুৎসুক। ইংরাজেরাও ইহা জানিতেন ;—সুতরাং তাঁহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সিরাজদ্দৌলাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য চন্দননগর ধ্বংস করিবামাত্র সেনাপতি ওয়াট্‌স্‌ন্ লিখিয়া পাঠাইলেন যে:—

"আমি যে গুরুতর কার্য্যের জন্য এখানে (চন্দননগরে) আসিয়াছি, তাহাতেই ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনার কয়েকখানি পত্র পাইয়াও যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই ;—তজ্জন্য ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আমাদের সৌভাগ্যবলে, আপনার সৌহার্দ্দ্য-সহায়তায় এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায়, দুইঘণ্টামাত্র যুদ্ধ করিয়াই ২৩শে মার্চ্চ তারিখে চন্দননগর অধিকার করিয়া লইয়াছি। ফরাসিরা অনেকেই বন্দী হইয়াছে, যে কয়েকজন পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধরিয়া আনিবার জন্য অস্ত্রধারী নিযুক্ত করিয়াছি ;—তাহারা আর কাহারও উপর কোনরূপ উপদ্রব করিবে না, সুতরাং আপনি তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না! আমরা যে সন্ধিপালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না, সে কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছি। আপনার শত্রু যখন আমাদিগেরও শত্রু, তখন আমাদিগের শত্রুও অবশ্যই আপনার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং ফরাসিরা যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আপনি অবশ্যই তাহাদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। আপনি লিখিয়াছেন যে ড্রেক সাহেব মহারাজ মাণিকচাঁদকে অসম্মানসূচক কথা বলিয়াছিলেন ; আমি সে কথা শুনিবামাত্র ড্রেক সাহেবকে যথোচিত লিখিয়াছি, এবং তিনিও মাণিকচাঁদের নিকট যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ভরসা করি আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা কি আপনাকে অসন্তুষ্ট করিতে পারি? আমাদের নিকট সেরূপ ব্যবহার পাইবেন না!*

ওয়াটস্‌ন্ যে উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল না ;—সিরাজদ্দৌলা শরণাগত ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইতে সম্মত হইলেন না! ওয়াটস্‌ন্ নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া ভয় প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইবার জন্য পুনরায় পত্র লিখিলেন :—

"আমরা যে চন্দননগর অধিকার করিয়া অধিকাংশ ফরাসিদিগকে বন্দী করিয়াছি এবং পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ফৌজ পাঠাইয়াছি, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি ; আবার যে সে বিষয়ে লিখিতে হইতেছে ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা! পরমেশ্বর এবং মহম্মদের পবিত্র নামে আপনি যে ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করিতেছেন না বলিয়াই আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হইতেছে! কোম্পানীর যে সকল কামান আপনার অধিকারে রহিয়াছে, তাহা ওয়াটস্ সাহেবকে প্রত্যর্পণ করিবেন, বন্ধুভাবে থাকিবার জন্যই যে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছেন সে কথা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না, এবং পলায়িত ফরাসিদিগকে অবিলম্বে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইহার বিপরীতাচরণ করিবার জন্য পরামর্শ দেয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন যে সে কদাচ আপনার বন্ধু নহে। সে উপদেশে দেশের মধ্যে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিবে ;—কিন্তু আপনি সত্যভঙ্গ না করিলে আমরা কিছুতেই যুদ্ধঘোষণা করিবনা! এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে ফরাসিরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট উপনীত হইয়াছে এবং আপনার সেনাদলে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন

* Ive's Journal.

করিয়াছে। আপনি তাহাতে সম্মত হইলে আমাদের সঙ্গে আর বন্ধুভাব থাকিবে না। আপনি সেদিনও আমাদের নিকট সেনা-সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহার পরেই লিখিয়াছেন যে আর চাহেন না ; ইহাতেই বুঝিতেছি যে ফরাসির সঙ্গে মিত্রতা সংস্থাপন করাই বোধ হয় আপনার অভিমত!"*

আলিনগরের সন্ধির পরিণাম যে এরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা সিরাজদ্দৌলা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। ক্রমে ইংরাজের গূঢ়নীতির মর্ম্মালোচনা করিয়া সিরাজদ্দৌলা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি আর ওয়াটসনের পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না ; কেবল নীরবে সতর্ক দৃষ্টিতে ইংরাজের সংকল্পানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

মহানগরীর রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময়ে সুচতুর দস্যুতস্কর হাতের উপর হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিলে পথিক যেমন চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তস্করও তদ্রূপ চোর চোর করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। সেই জন্য কে সাধু কে চোর তাহার মীমাংসা করা সহজ হয় না। সিরাজদ্দৌলার অবস্থাও সেইরূপ হইল ;—আলিনগরের সন্ধিভঙ্গ হইল, কিন্তু কাহার দোষে সন্ধিভঙ্গ হইল, সে কথার মীমাংসা হইতে পারিল না!

এদিকে ইংরাজদরবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল! ওয়াটস্‌ন্ সাদর-সম্ভাষণে পত্র লিখিলেন, তাহার উত্তর আসিল না ; স্বর চড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর আসিল না! তখন ইংরাজেরা বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসিদিগকে আশ্রয়দান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে ইংরাজেরা শিহরিয়া উঠিলেন ; ওয়াটস্‌ন্ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসিদিগকে গৃহতাড়িত না করিলে ইংরাজের কল্যাণ হইবে না। তখন নানা উপায়ে নবাব এবং ফরাসিদিগের অভিনব সৌহার্দ্দ্য ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ওয়াটস্‌ন্ স্তুতি মিনতি করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"চন্দননগরের নিকটে আমাদের কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ বাঁধা রহিয়াছে, এবং হুগলীর নিকটে কয়েক পল্টন গোরা ছাউনী ফেলিয়াছে, এই জন্য আপনি নাকি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সুযোগে আমাদের শত্রুদল নাকি আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে আমরা সসৈন্যে মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিবার জন্যই এই সকল আয়োজন করিতেছি! কেহ যে এমন ভয়ানক মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে প্রতারিত করিতে সাহস পাইয়াছে, ইহাই সমধিক বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনি যে এমন অলীক সংবাদও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা আরও বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনিও ত একজন বীরপুরুষ ;—আপনি কি বুঝেন না যে আপনার রাজ্য মধ্যে একজন শত্রুসেনা লুকাইয়া থাকা পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন না করা আমার পক্ষে কতদূর মতিভ্রমের কথা? সে যাহা হউক, আপনি যদি ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দেন তাহা হইলেই ত সকল বিতর্কের অবসান হইতে পারে, এবং আমরাও সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে পারি। যতক্ষণ ইহা না করিতেছেন ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব যে আপনি ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন?"†

ওয়াট্‌স্‌ন্ যে কেবল রণপণ্ডিত তাহাই নহে,—সেকালের ইংরাজদিগের মধ্যে তাঁহার মত সুচতুর রাজনীতিবিশারদ সুলেখকও অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়! তিনি যখন অবলীলাক্রমে সিরাজদ্দৌলাকে লিখিতেছিলেন যে মুরশিদাবাদ আক্রমণের প্রস্তাব সর্ব্বৈব মিথ্যা,

* Ive's Journal.
† Ive's Journal.

ঠিক সেই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লর্ড ক্লাইব মহাসভার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে "চন্দননগর হস্তগত করিবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সেই পর্য্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না; যখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দননগর অধিকার করা হইল, তখন আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হউক।"* ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার এই সাধুসংকল্পে সকলেই সম্মতিদান করিয়াছিলেন! সুতরাং সিরাজদ্দৌলা যে অঙ্কুরেই ইংরাজের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দশজনে মিলিয়া তাঁহার মতিভ্রম জন্মাইবার জন্য নানারূপ আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে ফরাসিরাই যত অনিষ্টের মূল—তাহাদিগকে রাজধানীতে আশ্রয়দান করিয়াছেন বলিয়াই ইংরাজের সঙ্গে সন্ধিভঙ্গের উপক্রম হইয়াছে!

সিরাজদ্দৌলা কি জন্য সন্ধি করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহার কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন, এবং ফরাসিদিগকেও সিরাজদ্দৌলা কতদূর অবিশ্বাস করিতেন, তাহা তাঁহার লিখিত ২২শে মার্চ্চ দিবসীয় সামরিক লিপিতে প্রকাশিত রহিয়াছে;—সে পত্রখানি এইরূপ:—

"আমি ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়া যে সকল কথা স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি পাইবেন না। ওয়াটস্ সাহেব যাহা যাহা দাবি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি; যৎকিঞ্চিৎ অপরিশোধিত আছে,—তাহাও বর্ত্তমান চান্দ্রমাসের প্রথম পক্ষান্তেই পরিশোধিত হইবে। বোধ হয় ওয়াটস্ সাহেব এ সকল কথা আপনাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত পালন করিতেছি; কিন্তু আপনাদের মতিগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে, প্রতিজ্ঞাপালন করা দূরে থাকুক, তাহা বিলীন করাই আপনাদের অভিপ্রেত। আপনাদের ফৌজের উৎপাতে হুগলী, হিজলী বর্দ্ধমান, এবং নদীয়া প্রদেশ উৎসন্ন হইতেছে;—এ উপদ্রব কেন? বামদেবের পুত্রের দ্বারায় গোবিন্দরাম মিত্র নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কালীঘাট কলিকাতার জমিদারীভুক্ত বলিয়া দখল পাইবার দাবি করেন। এ কথার অর্থ কি? এ সকল যে আপনার জ্ঞাতসারে ঘটিতেছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। আপনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন;—আপনার বিশ্বাসেই আমিও সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। সন্ধি না হইলে, উভয় সেনার তুমূল সংঘর্ষে দেশের সর্ব্বনাশ হইত, প্রকৃতিপুঞ্জ পদদলিত হইত, রাজকর ধ্বংস হইত, রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল হইত; তাহা নিবারণ করিবার জন্যই ত সন্ধি করিয়াছিলাম! আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের অঙ্কুরোদ্ভব হইয়াছে তাহাকে সুদৃঢ় করাই আপনার কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আপনার দ্বিধা না থাকিলে এই সকল উৎপাত নিবারণ করিয়া মিত্রজকে বলিবেন সে যেন ভবিষ্যতে এমন মিথ্যা প্রবঞ্চনাময় অলীক প্রস্তাব উপস্থিত না করে।

"পুনশ্চ। এইমাত্র শুনিলাম যে, ফরাসিরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। তাহারা যদি আমার অধিকারে যুদ্ধ বিবাদ উপস্থিত করিতে চাহে, আমাকে লিখিবামাত্র আমি সিপাহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে ত্রুটি করিব না;—আপনি লিখিবামাত্র আবার সিপাহী-সেনা অগ্রসর হইবে।"†

* Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, 1772.

† Ive's Journal.

ওয়াট্‌সনের পত্রের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার পত্রগুলির তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। একজন সুশিক্ষিত পরিণামদর্শী সুচতুর বৃটীশ সেনাপতি, আর একজন অপরিণতবয়স্ক ভারতবর্ষীয় স্বাধীন নরপতি,—একজন ইতিহাসে চিরগৌরবান্বিত, আর একজন স্বদেশে বিদেশে সকলের নিকটেই চিরধিক্কৃত! কিন্তু দুইজনের কথা এবং কার্য্যের বিচার করিয়া দেখ,—কে কিরূপ সমাদর লাভ করিবার যোগ্যপাত্র! সিরাজদ্দৌলা কলঙ্কগ্রস্ত,—কিন্তু কেবল রাজধর্ম্ম পালন করিতে গিয়াই কি তিনি ইংরাজদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন না? ওয়াট্‌সন্ তাঁহাকে যে সকল পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত হইলেই কি সিরাজচরিত্র কলঙ্কমুক্ত হইত?

সিরাজদ্দৌলা শান্তিসংস্থাপনের জন্যই ইংরাজদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াও আলিনগরের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার পাত্রমিত্রগণ ছিদ্রান্বেষী গৃহশত্রু;—সুতরাং পুনরায় ইংরাজদিগের সঙ্গে শান্তিভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। তিনি শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নবাব দরবারের সুচতুর পাত্রমিত্রগণ বুঝিলেন যে ইহাই উপযুক্ত অবসর। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে ফরাসিদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করার জন্যই পুনরায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে পাটনা প্রদেশে প্রেরণ করা হউক। সিরাজদ্দৌলা এই নিঃস্বার্থ হিতবাক্যের মধ্যে কোনরূপ দুষ্টাভিসন্ধির সন্ধান পাইলেন না; তিনি ফরাসি-সেনানায়ক ল সাহেবকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। ল রাজধানীতে থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজদ্দৌলাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "তাঁহার মন্ত্রীদল ও অধিকাংশ সেনানায়কগণ ইংরাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে, কেবল, ফরাসির ভয়ে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হইতে সাহস পাইতেছে না। এমন সময়ে ফরাসিদিগকে রাজধানী হইতে বিদায় দিলেই সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে!" সিরাজদ্দৌলা এ কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি আশু শান্তিসংস্থাপনের জন্যই ব্যাকুল; সুতরাং বলিলেন যে, "আপনারা ভাগলপুর অঞ্চলেই থাকিবেন, বিদ্রোহের সূচনা বুঝিলেই সংবাদ পাঠাইব।" সেনাপতি ল আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; কেবল বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে সাশ্রুনয়নে এই মাত্র বলিলেন যে;—"এই শেষ সাক্ষাৎ,—আমাদের মধ্যে আর শুভসম্মিলন হইবে না।"*

* Serajaud Dowla felt the truth of his observation but had not the resolution to detain him; he however promised to send for him, should anything occur, but Mr. Law prophetically said, "I know we shall never meet again."—Stewart's History of Bengal.

খুকী।

(১)

"ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা, একটি রূপকথা বল" বলিতে বলিতে বাম কক্ষে একখানি কাপড় লইয়া একটি বালিকা আসিয়া এক বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিল ও অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কোপরি আপন কোমল সুঠাম শরীরখানি ঢালিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তের কোমল চম্পককলি তুল্য অঙ্গুলিগুলি দ্বারা "সজোরে তাঁহার গোঁফ টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ টানের জ্বালায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, ছাড়্ ছাড়্, আমার গোঁফ ছাড়্ নইলে গল্প বল্‌বো না।"

বালিকা তবুও ছাড়ে না—সে আরও জোরে টানিতে লাগিল দেখিয়া বৃদ্ধ অগত্যা বলিতে লাগিলেন "এক যে ছিল খুকী তার ছিল এক কাল—"

তখন বালিকা গোঁফ ছাড়িয়া "না না, তার ছিল এক লাল টুক জামাই" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও ক্ষিপ্রহস্তে কাপড়খানি পরিয়া আবার তাঁহার অঙ্কোপরি হেলিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন "তার ছিল এক কাল জামাই।" বালিকা তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার মাথার কাঁচায় পাকায় সকল চুল ছিঁড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ এবারও বড় অস্থির হইয়া বালিকাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালিকা "নাছোড়বন্দা"—সে তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না; কেবল প্রাণপণে টানিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধ বলিলেন, শীঘ্র ছাড়্—আমি বলি। এই বলিয়া, বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "তার ছিল এক লাল টুক জামাই।"

এবার বালিকা চুল ছাড়িয়া গম্ভীরভাবে উৎফুল্লচিত্তে শুনিতে লাগিল—"তার ছিল এক লাল টুক জামাই, তার নাকটি ছিল কুন্দে কাটা, দাঁতগুলি ছিল দুধের মত ধলা, শরীর ছিল নাহস্ নুহস্ দেখ্‌তে যেন ঠিক জামাইটী, কোকিলের স্বরে কথা কইত, সকলই তার ভাল ছিল কিন্তু তার পায়ে ছিল—"

ঠাকুরদাদার গল্প বালিকার অবিদিত ছিল না, সে পুনরায় বলিল "না না, তার পায়ে কিছু ছিল না।" ঠাকুরদাদা আবার বলিলেন "তার পায়ে ছিল গোদ।" বালিকার মুখ বিবর্ণ হইল। সে আবার বলিল, "না, তার পায়ে কিছু ছিল না।" বৃদ্ধ আবারও বলিলেন "তার পায়ে ছিল গোদ।" এবার বালিকা ভারি রাগিয়া উঠিল ও বৃদ্ধের চুল ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল, মাথা ঝাঁকিতে লাগিল, শেষে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ পরাজিত হইয়া তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন "তার পায়ে ছিল আল্‌তা।" কিন্তু বালিকা সে কথায় কর্ণপাতও করিল না—সে কাঁদিয়াই আকুল। বৃদ্ধ কোন মতেই তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক কাঁদাকাটির পর বালিকা একটি লাল টুক জামাই, আর দশখানা অলঙ্কার চাহিয়া বসিল।

বৃদ্ধের ধনের অভাব ছিল না। অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও আজ তিনি কুটীরবাসী ভিক্ষুক অপেক্ষাও কাঙ্গাল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৫ম বর্ষীয়া এক কন্যা রাখিয়া ও বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী ভার্য্যাকে চিরবৈধব্যসাগরে ভাসাইয়া দিয়া ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই পিতৃ-পরিজনদিগকে কাঁদাইয়া পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তাহার একমাত্র চিহ্ন এই ক্ষুদ্র বালিকা বৃদ্ধের অবলম্বন ও সান্ত্বনার স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। বালিকা অধিক আদর পাইয়া অভিমান করিতে শিখিল। বৃদ্ধেরও তাহাই ভাল লাগিত। সুতরাং যখনই বৃদ্ধ বালিকার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেন তখনই সে অভিমানে কাঁদিয়া ভাসাইত। শৈশব কাল হইতেই বালিকার "বাবা" বলিয়া কাঁদিবার অভ্যাস হইয়াছিল। বৃদ্ধ বালিকার সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেই পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িতেন। এই জন্য বালিকার যে কোন আবদার তিনি রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এবারও বৃদ্ধ তাহার আবদার রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাহার জন্য প্রস্তুত করা কতকগুলি অলঙ্কার আনিয়া আপন হাতে তাহাকে সাজাইয়া দিলেন। বালিকা অলঙ্কার পরিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল 'জামাই'? বৃদ্ধ বলিলেন "কাল দিব।" তখন বালিকা আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মা, মা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

(২)

সেই দিন বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলেন একটী সর্ব্বগুণান্বিত সুরূপ জামাতা আনিতেই হইবে। অনুষ্ঠানও তদনুরূপ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার পসন্দসই "লালটুক্ জামাই" মিলিল না।

ক্রমে খুকীর বয়ঃক্রম ১২।১৩ বৎসর হইল দেখিয়া বৃদ্ধ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যে লালটুক জামাইয়ের জন্য একদিন তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল, এখন সেই লালটুক্ জামাইয়ের কথা বলিলে বালিকা লজ্জায় জড়সড় হইয়া, অবনত মস্তকে অন্যত্র চলিয়া যায়। ঠাকুরদাদা ভাবিতেন হায়! আবার কেন পোড়ামুখী খুকী "লালটুক জামাই" চাহিয়া আমার চুল গোঁপ ধরিয়া টানে না? আবার কেন সে তেমন করিয়া কাঁদিয়া ভাসায় না? হরি! হরি! হরি! আর কি তেমন দিন হইবে? এ সংসারে যেমন দিন যায় তেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না কেন? সে দিনও নাই সে খুকীও নাই।

খুকী ত এখন আর সে খুকী নাই কিন্তু তাহার সেই আবদার কি রক্ষা হইবে না? বৃদ্ধ একদিন মনে মনে এই কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাহার এক পিসেমশায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ এবার তাঁহাকে সেই লালটুক জামাইয়ের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন।

১০।১২ দিন চলিয়া গেলে একদিন পিসেমশায় হাসিতে হাসিতে আসিয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে,

এবং তজ্জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইলেন। পিসে-মহাশয় মৃদু মধুর হাসিয়া লম্বা চৌড়া এক ভুমিকা করতঃ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ধীরে ধীরে একখানী ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া বলিলেন "এই নাও তোমার জামাই।" কিন্তু দরটি বড় কড়া। তিনটা (অর্থাৎ এণ্ট্রেন্স, এলে, বি এ এই তিন পরীক্ষা) পাশ করা ছেলে; আর কি চাও? বয়স চেহারায় দেখ—২০।২২ বৎসরের বেশী নয়। বৃদ্ধ ছবিখানি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তখনই উঠিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রথম নম্বরেই "খুকীর তলপ। খুকীও অবিলম্বে হাজির হইয়া দণ্ডবৎ করিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন খুকী ছবি নিবি? এই ধর" বলিতে বলিতে খুকী হাত বাড়াইয়া ছবি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কার ছবি ঠাকুরদাদা?" বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কিছু কহিলেন না। বালিকা ইতিমধ্যে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। পরে বৃদ্ধ বলিলেন "কেমন খুকী, দেখতে কেমন? লালটুক জামাইয়ের মতন দেখায় কি?" তখন বালিকা আর একবার ছবিখানির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধের গায়ে ছুড়িয়া মারিল ও কোন কথা না কহিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ঠাকুরদাদার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। তিনি অপর সকলকে ডাকিয়া ছবিখানি দেখাইলেন। সকলেরই মনোমত হইল। এমন সময় পিসেমশায়ও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে হুকুম দিলেন "দিন ঠিক কর, যাহা চাহিয়াছে তাহাই দিব, তোমারও কিছু বকশিস্ মিলিবে।" এই বলিয়া তখনই তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন। ছবিখানি প্রকারান্তরে খুকীরই সম্পত্তি হইল। বালিকা অবসর সময় চোরের মত তাহা এক একবার দেখিয়া লয় ও মনে মনে ঠাকুরদাদাকে কতই আশীর্ব্বাদ করে!

(৩)

আজ খুকীর বিবাহ। ভোর না হইতেই গুরুগম্ভীর স্বরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। শানাইয়ের ভোঁ ভোঁ, কাশীর টুং টাং বাজনার সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রুতিবিনোদন শব্দ গগনময় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। চারিদিকেই লোকজনের কোলাহল। কোন স্থান বা বালকের ক্রন্দনধ্বনিতে, কোনস্থান বা তাহাদিগের হাস্যধ্বনিতে পরিপূরিত। কোথাও বা ২।৪ জনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছে, কোথাও বা ৪।৫ জনে মিলিয়া একটা খেলার আয়োজন করিতেছে। সর্ব্বত্রই এক আনন্দের স্রোত প্রবহমান! চারিদিকে মিঠাইওয়ালারা অবিশ্রান্ত লুচি মণ্ডা প্রস্তুত করিতেছে. আর শত শত লোক তাহা মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে। কাহারও খাইতে নিষেধ নাই। গরীব দুঃখী সকলেই আজ তথায় নিমন্ত্রিত। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আজ ঠাকুরদাদার বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে বালিকার মাতা সকলকে ভাবী জামাতার ছবিখানি দেখাইয়া চিত্তবিনোদন করিতেছেন। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সকলেই সেই লালটুক জামাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল, মেয়েদের মধ্যে বড়ই একটা আমোদের রোল পড়িয়াছে। যাহারা ছবিখানি দেখিয়াছে, তাহারা একবাক্যে বলিতেছে 'দেখিলেই চিনিব'। কেহ বা বলিতেছে "তোদের

ত বড়ই ক্ষমতা, জামাই দেখিলেই চিনিতে পারিবি!" যাহারা ছবি দেখে নাই তাহারাও একবার চাহিয়া দেখিতেছে। সমবয়স্কা বিবাহিতা মেয়েরা খুকীকে দেখিলেই একটু মৃদুমন্দ হাসিতেছে—খুকীও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। আলোকমালায় বাড়ী সুসজ্জিত হইল। এমন আলো হইয়াছে যে, সরিষাটী পর্য্যন্ত মাটিতে পড়িলে তাহা পরিষ্কার দেখা যায়। এমন সময় পিসেমশায় আসিয়া খবর দিলেন জামাই আসিয়াছে, এখন আনিতে হয়। অমনি জামাই আনার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। দলে দলে বাদ্যকর সাজিল, দলে দলে লোক মশাল ও আলোকমালা লইয়া ধাবমান হইল, দলে দলে বালকবৃন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল। চারি-দিক হইতেই লোক ছুটিয়া জামাই আনিতে চলিল। যাহারা বাড়ীতে রহিল তাহারা উন্মুখ হইয়া জামাইয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৪)

বিবাহের সময় উপস্থিত। এ দিকে জামাতা লইয়া পাল্কী আসিয়া পৌছিল। শত শত বাদ্যকর যুগপৎ বাদ্যোদ্যম করিয়া উঠিল। শত শত রমণীকণ্ঠে হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। কানে আর কিছুই শুনা যায় না—কেবলই বাদ্যধ্বনি, কেবলই হুলুধ্বনি! কথা ছিল পিসেমশায় সেই পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন কিন্তু তাঁহাকে সেখানে দেখা গেল না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন অনুমান করিয়া, তাঁহার জন্য আর অপেক্ষা করা হইল না। পাল্কীর কবাট খুলিয়া জামাই নিয়া একেবারে বিবাহের স্থানে দাঁড় করান হইল। জামাই দেখিয়া বৃদ্ধের মুখ শুকাইল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। একবার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, আবার দেখিলেন আবার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, আবার দেখিলেন কিন্তু হায়! একি হইল! এই কি সেই "লালটুক জামাই?" বৃদ্ধ বিকৃতস্বরে ডাকিলেন "পিসেমশায়" কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। অগণিত লোকসংখ্যা জামাই দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বাদ্য থামিয়া গিয়াছে, হুলুধ্বনি অর্দ্ধোচ্চারিত হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া হাঁ করিয়া দণ্ডায়মান। অপর সকলেই নীরব নিস্পন্দ, নিশ্বাসের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না। বৃদ্ধের বিকৃতস্বর আরও বিকৃত হইল। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "হতভাগা! কি করিলি, এর চেয়ে আমার খুকী বিধবা হওয়াও ভাল ছিল।" এই অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বৃদ্ধ যাইয়া বিছানা লইলেন। স্ত্রীমহলে একটা বিষম বিষাদের ভাব দেখা দিল। খুকীর মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বালিকাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

(৫)

বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। খুকীর বিবাহ হইয়া গেল। সেই ঠাকুরদাদার গল্পের সেই জামাই। সেই "এক যে ছিল খুকী, তার ছিল এক কাল জামাই, তার পায়ে ছিল গোদ," দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত। বুঝি পৃথিবীর সমস্ত কুৎসিত জীবজন্তুর কুৎসিত উপাদান দিয়া বিধাতা খুকীর জন্য এই জামাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের সেই রাত্রেই জ্বর হইয়া চেতনা লুপ্ত হইল, কিন্তু কেহই সে রাত্রে তাঁহার খবর লইল না, কিম্বা তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না। প্রাতঃকালে সেই অচেতন অবস্থায় বৃদ্ধ একবার খুকীকে ডাকিলেন কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কিছুকাল পরে খুকী তাঁহার নিকট গিয়া দেখে যে তাঁহার চেতনা নাই, কেবল প্রলাপ বকিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে খুকী যাইয়া সকলকে সংবাদ দিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলেই আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। বৃদ্ধ সেই "এক যে ছিল খুকী তার ছিল এক কাল জামাই, তার পায়ে ছিল গোদ" এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। খুকী তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইল। শেষে মা ও মেয়ে ও অন্যান্য সকলে একত্র হইয়া কাঁদিতে লাগিল। 'বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ' হইতে লাগিল। "তার ছিল এক লাল টুক্ জামাই। না না সব ফাঁকি! হতভাগা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল। অবস্থা আরও খারাপ হইল;—কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে বাহিরে নিল।

এদিকে সেই বিবাহ রাত্রেই জামাতা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু কেহই তাহা জানিল না। নব-বিবাহিতা বালিকাও তাহা জানিল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। জামাতার অবস্থাও শোচনীয় হইতে লাগিল। বিবাহ-রাত্রে সকলেই মনোকষ্টে যে যেখানে পারিল সেই খানেই পড়িয়া ছিল। বেলা হইল তবুও কেহ নড়িল না। যখন সকলে জাগিল তখন বৃদ্ধের অবস্থা মন্দ। বাড়ীর সকলেই সেইদিকে দৌড়িল। জামাতার অবস্থা কেহ বুঝিল না; লক্ষ্যও করিল না। যখন বৃদ্ধকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাহির করিল, তখন জামাতারও শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছিল। জামাতার ভৃত্য তাহার নিকট যাইয়া তাহার অবস্থা সকলকে জানাইল। সকলে মিলিয়া তাহাকেও বাহির করিল। এক সঙ্গে উভয়েরই প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

খুকীর কপাল ভাঙ্গিল। সেই রক্তাম্বরপরিধানা সেই নববিবাহিতা বালিকা, সেই বৃদ্ধের এক মাত্র সুখশান্তি, সেই আঁধার ঘরের উজ্জ্বল মাণিক, সেই কত যতনের ধন খুকীর অদৃষ্টে চির-অন্ধকার পুরীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। হতভাগিনী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাহার মাতার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে ঘরে লইয়া গেল। সব ফুরাইল!

এটোয়া নগরী।

বসন্তের প্রারম্ভে, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, যমুনাতটে দাঁড়াইয়া, সায়াহ্ন-সমীরণ সেবন করিতে করিতে যিনি এটোয়া নগরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, মানব জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং সংসারের নিত্য নশ্বরতা, তাঁহার সহজেই উপলব্ধি হয়। এই প্রাচীনা, প্রসিদ্ধা, মনোমোহিনী নগরীর যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই বৈরাগ্যের তীব্রভাবের গভীর উচ্ছ্বাস

দেখিতে পাইবে। একবার এই অসংখ্যাসংখ্য ভগ্ন স্তূপরাশির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অন্তরকে ভাবিয়া দেখ, বহির্জগৎ ভুলিয়া তুমি অন্তর্জগতে মিশিয়া যাইবে। ভগ্ন রাজপ্রাসাদের শিখর দেশে দাঁড়াইয়া একবার চন্দ্রালোকে এই প্রাচীনা নগরীর ভগ্নস্তূপের দিকে তাকাইয়া দেখ, তাকাইতে তাকাইতে এতদূর আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলাম, বুঝিলাম না, আমি জীবন্ত সংসারে কি মৃতের শান্তিময় শ্মশানে!!

মহানগরী এটোয়ার এক দিকে শ্যামসলিলা যমুনা, এক দিকে বিস্তৃত নিবিড় অরণ্য, এক দিকে সুবিশাল ময়দান এবং আর এক দিকে অতি প্রাচীন ও প্রশস্ত মহা শ্মশান। এই মহা শ্মশানভূমি প্রায় তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন। এই সুবিশাল ভূমি, হিন্দু-রাজত্বের অধঃপতন এবং মুসলমান শাসনের পরিণাম দেখিয়াছে। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গালী পর্য্যন্ত, কত অনন্ত লক্ষ মানবদেহ এখানে ভস্মীভূত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? এ মহা ভয়ানক ভূমিতে দিবালোকেও যাইতে লোকে ভয় করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহা প্রেতযোনির লীলাক্ষেত্র। এই শ্মশান সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহা শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! এই মহাক্ষেত্রে, যে দিকেই দেখ, সেই দিকেই মহাবীভৎস রসের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইবে। শিবার চীৎকার, সারমেয় শাবকের দন্ত কর্ষণ, বৃদ্ধা মার্জ্জারীর ভয়োৎপাদনকারী মুখব্যাদান, শকুনির শন্ শন্ শব্দ—প্রভৃতিতে স্থানটি যেন আতঙ্কের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও অভস্মীভূত মৃতদেহের মস্তক লইয়া শিবাকুল মহাহবে উন্মত্ত, কোথাও শোণিত কর্ত্তৃক মৃত্তিকা লোহিত বর্ণে রঞ্জিত, কোথাও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডে স্থলবিশেষ শুভ্রতায় পরিপূর্ণ, কোথাও বা নরমাংসলোলুপ পশুপক্ষিগণের মৃতদেহের দুর্গন্ধে এমন এক প্রাণহারী বাষ্পের উৎপাদন হইয়াছে যে, কাহার সাধ্য তথায় ক্ষণেকের জন্যও দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রাচীন, প্রশান্ত ও প্রসিদ্ধ মহাশ্মশান ক্ষেত্রকে দেখিয়া লয়। ইহার যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, রাক্ষসী ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। মাংসের পূতিগন্ধ, শোণিতে দুর্গন্ধময় বাষ্প, অস্থিরাশির বিকটভাব, মৃতদেহপুঞ্জের দুর্গন্ধ এবং ভস্ম, জলকলস, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, পুরাতন, প্রচ্ছিন্ন, মলিন শয্যাদি প্রভৃতিতে স্থানটী যেন এক ক্ষুদ্র নূতন সংসার সৃজন করিয়া রাখিয়াছে। এই নব সংসারে তুমি আমি এক দিনের পথিক; এই নূতন সংসার-ক্ষেত্রে একদিন তোমার ও আমার বিপুলবপু ভস্মীভূত হইয়া অপরের পদতলে দলিত হইবে। এই মহা বীভৎস রসের মধ্যেও যে সভার উপদেশ পাওয়া যায়, এই ভয়াবহ দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ অপবিত্র স্থানেও যে মহা জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা পাওয়া যায়, এ শিক্ষা বোধ করি বহু শাস্ত্রে হয় না। অনেকের গুরুমন্ত্রেও বোধ করি এ শিক্ষালাভ হওয়া ভার।

এটোয়ার প্রাচীন ভগ্ন স্তূপরাশির মধ্যে, "অটবী"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, বিপুল এবং দর্শনযোগ্য। এই অটবীভূমিতে আসিলে, অহঙ্কারীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যৌবনমদে মত্ত যুবার যৌবনে ঘৃণা হয়, মহাজ্ঞানীর জ্ঞানরাশিকে তৃণের ন্যায় সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং

সংসারাসক্ত মহাভোগী মানব, "যোগী" জীবনকেই সুখময় জীবন বলিয়া বিবেচনা করে। এই অটবী ভূমিতে প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের "দরবার" হইত; পশ্চিমোত্তর প্রদেশের— কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, ভরতপুর, আগ্রা, দিল্লী, কণোজ, অযোধ্যা—প্রভৃতি স্থানের মহা মহা পণ্ডিতেরা এই স্থলে সমবেত হইতেন এবং মহা যোগীন্দ্রপুরুষগণ একত্রিত হইয়া শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞানের বিচার করিতেন। সাধুদিগের ইহা আশ্রয়ভূমি ছিল। এই অটবীতে আজি পর্য্যন্ত বৃহদাকার গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল গুহায় অবস্থান করিয়া তৎকালের তপঃপ্রভাবশালী হিন্দু মনস্বীগণ যোগক্রিয়া করিতেন এবং ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেন। রাজা ইহাঁদের রক্ষক ও পোষক ছিলেন। এখন এই গুহাবলীতে বিপুলবপু আরণ্য সর্প, শিবা, এবং সময়ে সময়ে ভল্লুক পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে।

এটোয়া অতি প্রাচীনা, প্রসিদ্ধা এবং মনোমোহিনী নগরী। উৎকৃষ্ট জলবায়ুর জন্য ইহা ভারতে বিখ্যাত। নানা দেশ দেশান্তর হইতে, বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য, এখানে লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন নীলের জন্যও ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কয়েক জাতীয় মনোহর বিহঙ্গের জন্য, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইহার বড়ই সম্মান; এই সকল বিহঙ্গ ধৃত হইয়া বিলাতে ও মার্কিণে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় ইহাদের পুচ্ছ, চর্ম্ম এবং মাথার ফুল বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। এটোয়ায় অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র সহরটি ময়ূরে পরিপূর্ণ, এমন বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ময়ূর অন্যত্র দুর্লভ। এটোয়ার জল অতিশয় নির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। ৭০ হইতে ১২৫ ফিট পর্য্যন্ত গভীর কূপ হইতে জল উঠাইয়া লইতে হয়, এই জল পান করিলে "পাথর হজম করাইয়া দেয়।" এখানকার যমুনার জল বিশেষ প্রশংসার যোগ্য নহে। লোকে কূপের জলই ব্যবহার করে, যমুনার জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয় না। এটোয়ার প্রাচীন বিভব কিছুই নাই। সহরটি স্তূপরাশিতে পরিপূর্ণ। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেওয়া যাইতেছে। এটোয়ার প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুষ্কর, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। যাঁহারা কেবল চারিসহস্র বৎসর, সংসারের উৎপত্তি বা সৃজনকাল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্নতত্ত্বানুসারে এটোয়ার ইতিবৃত্তের একটা কাল নির্ণয় হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা সে মতের পক্ষপাতী বা পোষক নহি। তবে একথা সহজে বলা যায়; ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবের পূর্ব্বেও ইটোয়া ধন ধান্যে পূর্ণা ছিল; সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেও এই মহানগরী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির দিকে অগ্রসরা হইতেছিল। দ্বাপর যুগেও এটোয়ার প্রতাপের সমাচার, ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল। যাঁহারা খৃষ্টের জন্মের ৫০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে দ্বাপর যুগের কাল নির্ণয় করেন, তাঁহাদের দ্বাপরযুগের কথা আমরা বলিতেছি না; এই দ্বাপরযুগ হিন্দুশাস্ত্রকার নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানসিদ্ধ তৃতীয় যুগ।

এটোয়া হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক হারিস্ সাহেব এটোয়ার একসংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা তাহা দেখি নাই; বোধ করি তাহা প্রকাশিতও হয়

নাই। কন্‌গ্রেশ-নেতা মান্যবর এ, ও, হিউম সাহেব, প্রায় ৩৬ বৎসর কাল এটোয়ার মাজিষ্ট্রেটি ও কালেক্‌টরী করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তিনিও এই নগরীর একখানি ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এটোয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত লালা শিবনারায়ণের মন্ত্রগুরু, পারস্যভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি জীবনের শেষ ভাগে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, যমুনাতটে, এটোয়ায় অতিবাহিত করেন। তাঁহারই অতি কষ্টে ও অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে সংগৃহীত একখানি পুরাতন পারস্য কাগজ হইতে এটোয়ার অতি প্রাচীন কয়েকজন হিন্দুরাজার নাম দিতেছি।

রাজার নাম।	রাজত্বকাল।	রাজার নাম।	রাজত্বকাল।
মহাধর্ম্ম।	১৫ বৎসর	বিভব।	৯ মাস
রঙ্গরাজ।	২১ ঐ	ভলো। (অক্ষর উত্তমরূপে পড়া যায় নাই)	৭ বৎসর
শ্রীমন।	১৭ ঐ	ত্রিদিব।	৪০ ঐ
মহাদ্যুতি।	২৯ ঐ	বিভাবসু।	৬৫ ঐ
গতি শ্রী।	৩৫ ঐ	চর্ম্মণ্য।	২৪ ঐ
শ্রীপতি।	৩৮ ঐ		

সন্ন্যাসীর মতে, দ্বাপর যুগের প্রথমে "অথবা" নামক রাজা ইটোয়া স্থাপন করেন। এবং তাঁহারই নামানুসারে এটোয়া নাম হইয়াছে।

এটোয়া সহর দুই অংশে বিভক্ত, একের নাম "নওয়া সহর" অপরের নাম "পুরাণা সহর"। নওয়া সহর ইংরাজেরা বসাইয়াছেন। পুরাণা সহর প্রকৃত এটোয়া, ইহা যমুনাতটে। উভয় সহরই সংযুক্ত; রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর জিলা; কমিশনর আগ্রায় থাকেন।

অযোধ্যা হইতে ব্রজধাম পর্য্যন্ত একটি ভৌগলিক রেখা টানিলে ইটোয়াকে কেন্দ্রস্থলে দেখা যায়। হিন্দুরাজারা এই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ শাসন করিতেন। এক দিকে বিশাল অযোধ্যা; রঘুবংশের বংশধরগণ হীনপ্রভঃ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন, দ্বাপরে তাঁহাদের কয়েকজন ইটোয়ায় আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। অন্য দিকে ব্রজধাম; শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত প্রভুত্ব ও ধর্ম্ম হীনপ্রভঃ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এটোয়ার রাজারা তাঁহার পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করেন।

পুরাণা সহরে অতি প্রাচীন, সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় এক মৃণ্ময় দুর্গ আছে; ইহা পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ। ইহার উপরেই প্রাচীন এটোয়া স্থাপিত ছিল এবং ইহার উপরেই রাজধানী ছিল। কত সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই দুর্গের স্থানে স্থানে গাঁথুনি এখনও সুন্দররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক দিনে সমগ্র দুর্গটি পরিদর্শন করিয়া উঠা দুষ্কর। দুর্গের কোনও স্থানে সুড়ঙ্গ, কোথাও ভগ্ন প্রাচীর, কোথাও গভীর গুহা, কোথাও জঙ্গল, কোথাও ভগ্ন প্রাসাদ, কোথাও ইষ্টকের স্তূপরাশি, কোথাও বা বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।

দুর্গের দুই অংশ কাটিয়া দিয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দূর হইতে এই রাজবর্ত্মকে হলদীঘাটের ন্যায় বোধ হয়। দুর্গের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তথায় রাজসভার গৃহ এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান, ইহার পার্শ্বে মানমন্দির এখনও দেখা যায়। এই মানমন্দির বারাণসীর মানমন্দিরের ন্যায়, জ্যোতিষ বিদ্যা সম্বন্ধীয় যন্ত্রে পরিপূর্ণ। দুই একটি প্রস্তরময় যন্ত্র এখনও বর্ত্তমান। দুই এক স্থান খনন করিতে করিতে প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে। লোকের বিশ্বাস দুর্গের নানা স্থানে প্রোথিত অর্থ আছে। কেল্লার অনেক স্থানে নানা প্রকার লতা, মূল এবং ফলফুলের গাছ দেখা যায়, যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। চিকিৎসকেরা বলেন এই সকল লতা ও মূল, মহৌষধির উপকরণ।

একটি প্রাচীন গৃহে প্রায় তিনশত প্রকারের চিত্র ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। আর একটি গৃহ, ইষ্টক, প্রস্তর, কাষ্ঠ এবং লৌহ এই চারি প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত। ইহাও এক্ষণে জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান। দুইটি গৃহ সম্পূর্ণাকারে এখনও দেখা যায়। একটি উপাসনালয়, অপরটি ক্রীড়াগৃহ। দ্বিতীয় গৃহে রাজা ও রাণীগণ বসিয়া ক্রীড়া করিতেন। সমগ্র দুর্গের দৈর্ঘ্য বা বিস্তার ঠিক বুঝা যায় না; পরিধি দুই ক্রোশের কম হইবে না। এই দুর্গ দেখিলে বোধ হয়, সংসারে সকলই চঞ্চল। এমন বিভবশালী রাজবংশের এখন নাম নিশান পর্য্যন্ত নাই। যে দিকে চাও, সেই দিকেই ভগ্নস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। এখন কোথায় সে বিভব, কোথায় সে বিক্রম? সংসারে সকলই চঞ্চল, সকলই নশ্বর।

ইটোয়ার ভগ্নরাশি মহাজ্ঞানের আকর, মহাবৈরাগ্যের প্রসূতি। এখানে আসিলে হৃদয়ে শান্তি হয়, সংসারের চঞ্চলতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই মহাস্তূপের উপরে দাঁড়াইলে বুদ্ধিমান সহজেই বুঝিতে পারেন।

"নলিনী দলগত জলবৎতরলং
তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং।"

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীর কোন লেখক বঙ্গীয় প্রবাদসমূহের মূল নিষ্কাসনে বদ্ধপরিকর হইয়া ভারতীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কয়েকটি প্রবাদের উৎপত্তির কারণ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়টি এমন গুরুতর যে একজনের চেষ্টায় ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজীতে প্রবাদের উৎপত্তি বিষয়ক Dictionary of phrases and fables প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক আছে, বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব; আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি সংস্কৃত প্রবাদের উৎপত্তি বিষয়ক গল্প পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

দশচক্রে ভগবান ভূত। এক রাজার ভগবান নামে এক উৎকট প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন, তিনি চাণক্যের দ্বিতায় অবতার বিশেষ, রাজাকে মুঠার মধ্যে রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এবং রাজাও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। এদিকে তাঁহার মন্ত্রীত্বে রাজবাড়ীতে কাহারো অভীষ্ট পূর্ণ হইবার আশা ছিল না, কিন্তু রাজার কাছে মন্ত্রীর নামে অভিযোগ করিতে কাহারো সাহসে কুলাইত না। অবশেষে মন্ত্রীর একাধিপত্যে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করিল। একদিন সকালে মন্ত্রী রাজসভায় যাইবেন, দ্বারবান দুই হস্তে দ্বার রোধ করিয়া বলিল "হুকুম নাহি"। মন্ত্রী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে রাজা মন্ত্রীর অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন ভগবানের মৃত্যু হইয়াছে, সে ভূত হইয়া পাড়ায় বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; সকল লোকের মুখেই এই এক কথা, রাজা এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিলেন না।

একদিন সকালে রাজা গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন, ভগবান তাহা জানিতে পারিলেন, কিন্তু রুষ্ট নাগরিকবর্গ কর্ত্তৃক অপদস্থ হইবার ভয়ে পথে রাজার সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, চুপে চুপে একটা গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকিলেন, রাজাকে সেই গাছতলা দিয়া যাইতে দেখিয়া ভগবান গাছের উপর হইতে ডাকিলেন "মহারাজ!"—রাজা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন 'কে, মন্ত্রী? যতদিন বাঁচিয়া ছিলে, আমাকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছ, ভূত হইয়াও কি এখন আমার স্কন্ধে ভর করিতে চাও?"—মন্ত্রী গাছের উপর হইতে উত্তর করিলেনঃ—

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ
ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ
অতো চক্রস্য মহত্বাৎ
ভগবান ভূততাং গতঃ।"

গৌরাঙ্গ কাঠ। একজন ভদ্রলোক জনৈক রসিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, গৌরাঙ্গ (বিষ্ণু) কাঠে পরিণত হইলেন কেন?"—বোধ করি পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের কথা ভাবিয়াই তিনি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া নাসারন্ধ্রে খানিকটে নস্য প্রবেশ করাইয়া বলিলেনঃ—

"একাভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা—
চঞ্চলাচ দ্বিতীয়া,
পুত্রোপ্যেক ত্রিভুবনজয়ী-
র্মন্মথো দুর্নিবারঃ
শেষং শয্যা শয়নমুদধিঃ
বাহনং পন্ন গারি
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং
দারু ভূতো মুরারি

"—এক স্ত্রী (সরস্বতী) দারুণ মুখরা, বাক্যস্রোত এক দণ্ড বন্ধ থাকে না, দ্বিতীয়া (লক্ষ্মী) চিরচঞ্চলা—এক স্থানে স্থির থাকা তাঁহার অভ্যাস নাই, মন্মথ নামক ত্রিভুবনজয়ী পুত্রটি অতি দুরন্ত, তাহাকে শাসন করা কঠিন, বিছানাটি অপূর্ব্ব, শেষ সর্পের দেহ, তা শয়ন আবার সমুদ্রের উপর, বাহনটি সর্প ভক্ষণ করেন, গৃহস্থালীর এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে গৌরাঙ্গ কাঠ হইয়া গিয়াছেন।" কোন বিপদে পড়িয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে আমরা বলি "গৌরাঙ্গ কাঠ হয়েছে।"

অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি। এক ব্রাহ্মণ কাকচরিত্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যাহারা কাকচরিত্র জানে, ললাটের হাড়ের উপর যে লেখা থাকে তাহারা তাহা পড়িতে পারে; সেই কাকচরিত্রবিৎ ব্রাহ্মণ একদিন সকাল বেলা এক শ্মশানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একটা মড়ার মাথা পথের ধারে পড়িয়া আছে। কাকচরিত্র ভাষায় জ্ঞান থাকাতে তিনি পড়িলেন, সেই মড়ার মাথার উপর হিজিবিজি অক্ষরে লিখিত আছে:—

"ভোজনং যত্র তত্রৈব
শয়নং হট্ট মন্দিরে;
মরণং গোমতী তীরে
অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি।"

ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন "এ লোকটার অদৃষ্ট বড় জোরের বটে, বিধাতা ইহার কপালে কম সুখ লেখেন নাই। আহারটি যেখানে সেখানে হইত, হাটের মধ্যে একটা কুঁড়েতে শয়ন, তাহার পর গোমতী তীরে মৃত্যু—তাহাও ত হইয়াছে দেখিতেছি, এখন 'অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি, ইহার পর কি হইবে, ইহাই সমস্যা। মৃত্যুর পর আবার কি হইবে তাহাতো ভাবিয়া পাই না, যাহা হউক মুণ্ডুটা তুলিয়া লওয়া যাক, পরে কি হয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।"

এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ মুণ্ডুটা তুলিয়া গামছায় বাঁধিলেন এবং একটা নূতন হাঁড়ির মধ্যে তাহা পুরিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন, অনন্তর গৃহপ্রান্তে তাহা একটা দড়ি দিয়া টাঙ্গাইয়া ভবিষ্যৎ ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একবার করিয়া হাঁড়ীটা খুলিয়া দেখেন, কিন্তু সে মরার মাথার আর কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, যেমন মাথা তেমনি রহিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণের শিষ্যবাড়ী যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন "ঐ যে একটা হাঁড়ী টাঙ্গান আছে, খবরদার ওটি ছুঁয়ো না, আমি ওর মধ্যে একটা ভয়ানক অজগর সাপ পুরে রেখেছি, বিশেষ কাজ আছে।"—ব্রাহ্মণী শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

এই ভাবে কয়েকদিন যায়, একদিন সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীর সঙ্গে তাহার শাশুড়ীর তুমুল কলহ বাধিয়া গেল, ব্রাহ্মণী রাগে অভিমানে স্থির করিল আজ আত্মহত্যা করিয়া সে ভবযন্ত্রণা এড়াইবে; কিন্তু এখনকার মত সেকালে আফিং খাইয়া প্রাণবিসর্জ্জনের ততটা 'রেওয়াজ'

ছিল না, ব্রাহ্মণী মনে করিল ঐ হাঁড়ীর মধ্যে যে সাপ আছে তাহারই মুখে হাত দিয়া জীবনান্ত করিবে। ব্রাহ্মণী সন্ধ্যাকালে চুপে চুপে গৃহপ্রান্তে গিয়া ধীরে ধীরে হাঁড়ীটা নামাইল, সাবধানে হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া দেখে, ও হরি, তাহার মধ্যে সাদা একটা মড়ার খুলি! দেখিয়া ব্রাহ্মণী প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহার সেই বিস্ময়ের 'চোটে' রাগ এবং অভিমান দুই দূর হইয়া গেল, এত রাজ্যের জিনিষ থাকিতে একটা পুরাণো মড়ার মাথা হাঁড়ীর মধ্যে অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখিবার কি আবশ্যক; ব্রাহ্মণী বহু গবেষণাতেও তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না, কিন্তু রমণীর ন্যায় এমন সরল সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সন্দিগ্ধমনা জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই; চট্ করিয়া তাহার মাথায় একটা গুরুতর তত্ত্বকথার উদয় হইল। সে ভাবিল হয়তঃ তাহার স্বামী গোপনে কোন রমণীর প্রণয়ভাজন ছিল, স্ত্রীলোকটি মরিয়া গিয়াছে, 'অলপ্পেয়ে মিন্‌সে' এখনও তাহার মায়া কাটাইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণী ত চটিয়া লাল, স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া প্রথমে সে খানিকটে অশ্রু বর্ষণ করিল, অবশেষে সংকল্প করিল, তাহার স্বামীরত্ন বাড়ীতে ফিরিলে সম্মার্জ্জনীর আঘাতে তাহার এই ব্যাধি ঝাড়িয়া দিবে, কিন্তু মড়ার মাথাটার ত প্রতিহিংসা লওয়া চাই, তাই সে পরম আগ্রহে ঢেঁকিতে সেটা চূর্ণ করিয়া একটা দুর্গন্ধময় পচা নর্দ্দামার ভিতর ফেলিয়া দিয়া আসিল, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির। ব্রাহ্মণের দুরদৃষ্ট! বাড়ী আসিয়া হাত মুখ না ধুইয়াই মুণ্ডুটার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণ ঘরের কানাচের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিল "সে গুড়ে বালি, বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরেছে, মাগি মরেছে তবু তার মাথা ছাড়তে পার নি, বলি আমি কি ধান খাই, কিছু বুঝিনে, কি ঘেন্না গো কি ঘেন্না, আমার ইচ্ছে কচ্চে এখনি গালে মুখে চড়িয়ে মরি। তোমার সাধের পিরীতের আমি কি দুর্দ্দশা করেছি একবার দেখে যাও।" বলিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া সেই নর্দ্দামার কাছে টানিয়া আনিয়া নরকপালের দুর্দ্দশা দেখাইল। ব্রাহ্মণের চক্ষু স্থির! "অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি" যে কিরূপে সার্থক হইল তাহা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু অনেক দাম দিয়া তাঁহাকে এই অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হইয়াছিল, কারণ প্রায় একমাস কাল অভিমানিনী কুপিতা ব্রাহ্মণী তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখিয়াছিল।

কথং ধূমায়তে চিতা। এক গ্রামে একজন কবিরাজ ও এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করিতেন। গ্রামের মধ্যে ইঁহারা দুজনেই খুব মাতব্বর লোক, কোন বাড়ীতে কাহারো পীড়া হইলে এই কবিরাজ মহাশয়ই সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা করিতেন, আর উক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতটি শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা রোগশান্তির চেষ্টা দেখিতেন। এদিকে কিন্তু কবিরাজ মহাশয় "শতংমারী ভবেৎ বৈদ্য" এই প্রবাদটি সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞানও তথৈবচ।

একদা কবিরাজ মহাশয় ভিন্ন গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইলেন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশান হইতে চিতাধূম উঠিতেছে। গ্রামে কে মরিল তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, ইতিমধ্যে দেখেন তাঁহার বন্ধু ব্রাহ্মণপণ্ডিতটিও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে ভায়া, ইতিমধ্যে তুমি কি কোন বাড়ীতে শান্তি স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত ছিলে ?" ব্রাহ্মণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না, আজকাল শান্তি স্বস্ত্যয়ন একেবারে বন্ধ।" শুনিয়া কবিরাজ সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন :—

বটে ! "ত্বয়া ন পঠিতা চণ্ডী ময়ানাপি চিকিৎসিতঃ
অকস্মাৎ নগরপ্রান্তে কথং ধূমায়তে চিতা।"

বিষস্য বিষমৌধম্। মহাকবি কালিদাসের চরিত্র-দোষের কথা যত্র তত্র শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কত খানি সত্য, এই অপবাদের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; তথাপি কবিবরের সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত এবং অন্যের বিরচিত এত অধিক সংখ্যক উদ্ভট শ্লোকের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা সাধারণের মতকে তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে উন্মুখ করিয়া তোলে।

কথিত আছে কালিদাস একদিন উজ্জয়িনীর রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে পথ-প্রান্তবর্ত্তী একটি দ্বিতল প্রাসাদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, প্রাসাদশিখরে একটি অনবগুণ্ঠিতা ষোড়শী সুন্দরী দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছেন। মুগ্ধনেত্রে কালিদাস পুনঃ পুনঃ সেই দিকে চাহিতে লাগিলেন, যুবতী তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া আত্মগোপন করিলেন, বুঝি অন্যের অলক্ষ্যে যুবতীর উজ্জল আয়ত চক্ষুর বিদ্যুৎ কটাক্ষ কালিদাসের মর্ম্মস্তল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সেখানে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই রমণীর অদর্শনে উদ্ভ্রান্তচিত্ত অস্থির কবি আবেগের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন :—

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে কমলায়ত লোচনে,
শ্রূয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ। যখন আমরা দেখি একজন লোক মুখে অনেক ভাল ভাল কথা বলিতেছে কিন্তু তাহার হৃদয় কলুষিতভাবে পরিপূর্ণ ; বাহিরে দিব্য পরম বৈষ্ণব, মুখে অষ্ট প্রহর হরিনাম, গায়ে নামাবলী, সর্ব্বাঙ্গে ছাপা তিলক, মায় টিকিটি পর্য্যন্ত নিখুঁত, কিন্তু সর্ব্বদাই চিন্তা কিরূপে কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন—এরূপ লোকই সাধারণতঃ "বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ" নামে অভিহিত হয়, ইহার একটা গল্প আছে।

একদা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পম্পা সরোবরতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, দেখিলেন

হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীতে ও মৃণালদলে সরোবর সুশোভিত, তীরে কতকগুলি বক অতি লঘুপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাছে কোন কীট পতঙ্গের অঙ্গে পা পড়িয়া তাহারা মারা যায়, তাই বক মহাশয়েরা যেন কতই সশঙ্ক ! যোল আনা অভিপ্রায় কিন্তু পোকাটা মাকড়টা তুলিয়া উদরপূর্ণ করা !—রাম অনেকক্ষণ ধরিয়া বকের গতিবিধি দেখিয়া হাসিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন :—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণীনাম্বধশঙ্কয়া
পশ্য লক্ষ্মণ ! পম্পায়াং "বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ।"

পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে। অতসী ফুলের গাছ বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। ফুলগুলি সুবর্ণকান্তি, দেখিতেও মন্দ নহে। এক ব্রাহ্মণের গোয়ালঘরের পাশে একটি অতসী ফুলের চারা জন্মিয়াছিল। চারাটি সুন্দর দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতি যত্নে জলসেক পূর্ব্বক তাহাকে বাড়াইয়া তুলিল, ক্রমে তাহাতে সোনার মত রঙ্গের ফুল ফুটিল, দেখিয়া ব্রাহ্মণের বড় ভরসা হইল যে, যে গাছে এমন সুন্দর ফুল ধরে—সে গাছের ফল নিশ্চয় রত্নময় হইবে, তাহা হইলে আর তাহার দারিদ্র্য দুঃখ থাকিবে না। যখন গাছে ফল ধরিল তখন ব্রাহ্মণের কত আশা ! ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করিয়া থাকিল, কবে ফল পাকিবে, কবে তাহা হইতে রত্নলাভ হইবে, কিন্তু হায় ! ব্রাহ্মণের বড় আশায় ছাই পড়িল !—ফলগুলি পাকিলে বৈশাখের বাতাসে সুঁটীর মধ্যে যখন ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ উৎপন্ন হইল তখন ব্রাহ্মণের মোহ ছুটিয়া গেল, ব্রাহ্মণ সনিশ্বাসে বলিল :—

"সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ 'পশ্চাৎ ঝন্ ঝনায়তে'।"

কাঠ পাথরে বিশেষ কি ? সমান মূল্যবাচক অথচ বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট দুইটি জিনিষের তুলনা করিতে হইলে সাধারণ কথায় বলে "কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?" কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রহস্যনিপুণ রসসাগর বা কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী এই প্রবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত আছে ; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন "কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?" রসসাগর তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে উত্তর দিলেন "শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হন, সেই সময়ে তিনি পদরজ দ্বারা শাপগ্রস্তা পাষাণে পরিণতা অহল্যার উদ্ধার করেন। রাম চন্দ্রের পদরেণুস্পর্শে পাষাণ মানব হইয়াছে শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইল। দণ্ডকারণ্যের নদীতীরে এক নৌকার মাঝিও এ কথা শুনিয়াছিল,

তাই রামচন্দ্র যথন তাহার নৌকায় নদী পার হইবার ইচ্ছা করিলেন, তথন বিস্ময়বিহ্বল মূঢ় নৌকার মাঝি কাতরভাবে তাঁহাকে বলিল ঃ—

"আমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি
আমার নাই লক্ষ্মী দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি
তোমার ঠেকলে পা, ঘুচবে'লা
লা (নৌকা) হ'য়ে যাবে মনিষ্যি,
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
"কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?"

কিন্তু ইহা একটি সংস্কৃত শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহা এই ঃ—
"মানুষী করণ রেণু রস্তিতে পাদয়ো রিতি কথা প্রথীয়সী,
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজং, নাথ দারুদৃষ দস্তকাভিদা।"

ত্রেতাযুগের সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ নাবিক এই কথা বলিয়াই তাঁহার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল, কলিযুগের বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালা দেশের মাঝির ভাষাতেই তাহা রূপান্তরিত করিয়াছেন।

কাহাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিদি বলিয়াছিলেন, তাঁহার সাপক্ষের বক্তব্য শুনিলে আমার আর রাগ থাকিবে না ; ফলে বিপরীত ঘটিল। নিজের দোষক্ষালন অভিপ্রায়ে তিনি যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন তাহাতেই উত্তরোত্তর ধাপে ধাপে আমার রাগটা ক্রমিকই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমেই রাগ ধরিল, বিলাতের ঘটনাকে নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে সামান্য flirtation মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করায় ; রাগটা আরো জ্বলিল ডাক্তারকে গালি দিতে শুনিয়া ; অবশেষে ক্রোধের যেখানে যতটুকু বাকি ছিল সর্ব্বাংশে বেশ হুহু করিয়া ধরিয়া উঠিল, যথন বলিলেন তিনি আমাকে ছলনা করেন নাই, আমিই তাঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভাল বাসিয়াও ভালবাসা জানাইয়াছি, নহিলে এত সামান্য কথায় তাঁহাকে এতদূর অপরাধী করিতাম না। যেন ভাল বাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা, আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম—তিনি যে তাহা নহেন সে যেন আমারি দোষ! তিনি যে আপনাকে আমার আদর্শরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন সে আমারি ছলনা বটে! কি চমৎকার যুক্তিচাতুরী! আমার এতদূর ক্রোধ হইল যে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকণাও বাহিরে আসিয়া পড়িলে যেন সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। অথচ এই প্রজ্বলন্ত মহাক্রোধও তাঁহার বিদায় কালের সেই কাতর করুণ উক্তিতে মুহূর্ত্তে অতি সহজে ভস্মাকারে নির্ব্বাপিত নিস্ফল হইয়া পড়িল! রমণী সব পারে—যথার্থ প্রেম উপেক্ষা করিতে পারে না, বিধাতা বুঝি এইখানেই স্ত্রীপুরুষের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যথিত স্বরে, তাঁহার মর্ম্মোত্থিত বাক্যে তাঁহার গভীর প্রেম অন্তরে উপলব্ধি করিলাম, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহাতে করুণা তান বিকম্পিত হইয়া উঠিল ; তিনি চলিয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহার নৈরাশ্য-ব্যথা আমি নিজের অন্তরে নিজের মত করিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার যে কথায় পূর্ব্বে ক্রোধাভিভূত হইয়াছিলাম, সেই কথা মনে উদয় হইয়া নিজের প্রতি সন্দেহ আনয়ন করিল,—সত্যই কি তবে আমিই ইহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভালবাসিয়াও ভালবাসা জানাইয়া ইহার চিরজীবনের সুখদুঃখ আপনাতে ন্যস্ত করিয়াছি ?

প্রাণভরা করুণাপূর্ণ অনুতাপ বেদনা লইয়া আমি নীরবে বসিয়া, দিদি আমার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিবেন করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল "ডাক্তার আসিয়াছেন।" এই সংবাদে সহজেই ভিন্নমনা হইয়া পড়িলাম—চিন্তাবেগ শমিত হইল, ডাক্তার যথন গৃহ প্রবেশ করিলেন স্পষ্ট আনন্দ অনুভব করিলাম।

ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া, পরে সকালে আসিতে না

পারার কারণ জানাইয়া তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি বলিলেন "ভালই আছে, রাতে ঘুমও বেশ হয়েছে—আর বোধহয় ওষুধের আবশ্যক নেই ?" পশ্চিমের জানালা দিয়া আমার কৌচের উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল ; ইতিমধ্যে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার নিকটে একখানি চৌকিতে আসিয়া বসিলেন, বসিয়া আমার হাত দেখিয়া বলিলেন "এখনো বেশ সবল বোধ হচ্ছে না—টনিকটা বন্ধ করবেন না।"

আমি বলিলাম "না অমন বিশ্রী ওযুধ আমি আর খাব না।"

ভগ্নিনীপতি কোথা হইতে আসিয়া বলিলেন—"কার সঙ্গে অভিমান আবদার হচ্ছে ? ডাক্তারের সঙ্গে না ওষুধের সঙ্গে ?"

আমি লজ্জিত হইলাম, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"এ বুঝি আবদার হোল ? একবার ওযুধটা খাও দেখি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন "তাতে যদি তোমাদের আবদার কিছু কমে তাহলে একশিশি কেন, যত শিশি বল খাচ্ছি। I say B এমন পজিটিভ প্রমাণ থাকতে মেয়ে পুরুষের intellectual superiority সম্বন্ধে এখনো এত বাকবিতণ্ডা চলে কেন তাত বুঝতে পারিনে।"

দিদি বলিলেন—"পজিটিভ প্রমাণটা কি, আর কোন্ পক্ষে শুনি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন—"মেয়েরা যদি আর কারো সঙ্গে অভিমান করতে না পায় তখন fate এর সঙ্গেই অভিমান করতে বসে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অটল অচল অদৃষ্টকেও তারা চোখের জলে গলিয়ে একেবারে জল করে ফেলবে।"

দিদি বলিলেন "অদৃষ্ট যদি এমনই অটল অচল হয় তাহলে তার সঙ্গে যারা লড়াই করতে যায় তারাই বা কি মহাবুদ্ধিমান ?"

ডাক্তার বলিলেন—"বেশ বলেছেন, আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার সঙ্গে একমত !"

ভগিনীপতি বলিলেন—"তুমি শুদ্ধ দলে মিশলে—তবে দেখছি আর এখানে পোষাল না আমার, আমি চল্লুম—নীচে মক্কেল এসে বসে আছে, যাবার সময় দেখা করে যেও হে।" ভগিনীপতি চলিয়া গেলেন, ডাক্তার বলিলেন—"আচ্ছা ও ওষুধটা যদি আপনি খেতে না পারেন একটা সুস্বাদু টনিক লিখে দিচ্ছি।"

এই সরল সহানুভূতি আমার বড় ভাল লাগিল, আমি আনন্দ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—যাঁহারা স্ত্রীলোকের আব্দার সহ্য করিতে না পারিয়া খড়্গহস্তে তাহার দমন করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেবল তাঁহারা দিব্যহৃদয় লাভ করিয়া অনুভব করিতে পারেন সামান্য নির্দ্দোষ ছোটখাট অভিমানগুলির সম্মান রক্ষায় তাঁহারা অতি সহজে নিজের এবং পরের কিরূপ অপরিমিত গভীর সুখের কারণ হইতে পারিতেন, কেবল একটুখানি সহানুভূতির অভাবে এই সুখের স্থলে কত অসুখ বৃদ্ধি করিতেছেন ; কত কোমল হৃদয় নিষ্পেষিত কঠোর করিয়া

তুলিতেছেন—তাহা হইলে জানিনা তাঁহাদের সুখ বাড়িত কিম্বা দুঃখ বাড়িত, তবে সংসারের রূপ এবং স্ত্রীলোকের ভাগ্য যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৃহেই এককোণে টেবিলে লিখিবার সরঞ্জাম ছিল—ডাক্তার নূতন একটি প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিদির হাতে দিয়া বলিলেন, "আর বোধহয় আমার আসার আবশ্যক নেই" বলিয়া দিদির সহিত বিদায় লইলেন। দিদি বলিলেন—"এখন ত ভালই আছে আর অসুখ না করলেই বাঁচা যায়।" ডাক্তারের আসিবার কথার উত্তরে আর কোন কথাই বলিলেন না, আমার সেটা নিতান্ত অভদ্রতা বলিয়া মনে হইল ; দিদির উপর মনে মনে একটু রাগ হইল, কেন তিনি কি বলিতে পারিতেন না মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইয়া যাইবেন, অথবা কখনো কোন দিন সুবিধা মত দেখা করিতে আসিলে সুখী হইব—এমনিতর কোন একটা ভদ্রতার কথা ? কিন্তু রাগটা মনেই চাপিয়া লইলাম। দিদির কথার উত্তরে ডাক্তার বলিলেন "আশা করি এখন ভালই থাকিবেন"—বলিয়া আমার সহিত বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমার নিকট হইতে কিছুদূরে ছোট টিপাইয়ের উপর একটি ফুলদানিতে কতকগুলি সুগন্ধী ফুল সাজান ছিল, যাইবার সময় সেই টিপাইটি আমার কাছে আনিয়া রাখিয়া বলিলেন—"ফুলের গন্ধ Nervous system এর পক্ষে খুব উপকারী"—বলিয়া আর একবার good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার সহসা বাল্যকালের সেই আটচালা ঘর মনে পড়িল—ছোটুকে আমি যে ফুলগুলি দিতাম সে সযত্নে একটি ভাঙ্গা গ্লাসে পড়ার টেবিলের উপর কেমন সাজাইয়া রাখিত, আমি মাঝে মাঝে তাহার উপর ঝুঁকিয়া ফুলগুলির গন্ধ লইতাম ; শুঁকিয়া বলিতাম "বাঃ কেমন গন্ধ, আমি বাড়ীতে যে ফুল সাজাই তার ত কই এমন গন্ধ হয় না" ; ছোটু হাসিয়া সগর্ব্বে মাথা নাড়িত। সে ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ ঘটনার বিশেষ যে কিছু সাদৃশ্য ছিল এমন নহে ; তথাপি আমার মনে হইল—এ যেন ছোটু আমাকে তাহার সেই ফুলদানী আনিয়া দিল। আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম—"আপনি কি ছোটু ?" সহসা আত্মস্থ সচেতন হইলাম, যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম, ততক্ষণ তিনি দ্বার পার হইয়া চলিয়া গেলেন। আমার সহসা মনে হইল আমি কি ইঁহাকে ভালবাসিতেছি, মিষ্টার জির গান শুনিয়া যে মোহ জন্মিত ইঁহাকে দেখিয়াও কি সেইরূপ মোহের উদয় হইতেছে না ? এ কিরূপ চাপল্য কিরূপ হীনতা ? এই, দুদিন আগে যাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি তাঁহাকে ভুলিলাম ? আমার প্রতি যাঁহার ভালবাসা অটল অচল তাঁহাকে ভুলিলাম ? আর কিজন্য ? কাহার জন্য ? যাহাকে জীবনে পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই, একদিনের মাত্র যাহার সহিত সাক্ষাৎ তাহার জন্য ? এই জন্যই কি তাঁহাকে দোষী করিয়াছিলাম ? নিজের ভালবাসা গিয়াছে বলিয়াই কি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা গিয়াছে ? তাঁহার কথাই তবে সত্য ? আমি তাঁহাকে ছলনা করিতেছি তিনি নহেন ; নহিলে যথার্থ ভালবাসিলে এ ঘটনায় আমার দুঃখ হইত, অভিমান হইত, কিন্তু এরূপ ক্রোধ হইত না ; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার ভাব আসিত না।

আমায় অন্ধ নয়ন যেন খুলিয়া গেল, আমি সত্যালোক দেখিতে পাইলাম, নিজের দোষ অতি তীব্রভাবে অনুভাব করিলাম; অনুতাপে হৃদয় দাহ হইতে লাগিল। দিদি ডাক্তারকে আসিতে না বলায় তখন রাগ হইয়াছিল এখন তাহাতে খুসী হইলাম; ভাবিলাম তাঁহার সহিত আর কখনো দেখা করিব না; যাঁহাকে একবার স্বামী মনে করিয়াছি—তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিব—কিন্তু প্রতারণা করিব না; আমার মনের ভাব খুলিয়া বলিব, যদি ইহাতেও তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন আমি তাঁহারি। সমস্ত শুনিয়াও অবশ্যই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন; তাঁহার প্রেম অটল অচল, আমি যাহাই হই তিনি দেবতা, তাঁহার প্রেমে তিনি পতিত আমাকে উদ্ধার করিবেন।

দিদি যখন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—তার সঙ্গে কি কথা হোল? তখন বিবাহ করিতে আমি দৃঢ় সঙ্কল্প। আমি বলিলাম "বুঝেছি, তাকে বিয়ে না করে কোন দোষ করেন নি।"

"তোকে যে খুব ভাল বাসে তাও বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।"

"এখন বিয়েতে আপত্তি আছে কি?"

বলিলাম "না"।

দিদি ভারী খুসী হইয়া বলিলেন, "একহপ্তা পরে সে আসবে—না"?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ময়মনসিং হইতে তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম। চিঠিখানি একান্তই প্রীতি মিনতিপূর্ণ; পড়িয়া যেমন আর্দ্র হইলাম তেমনি আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য এখানি ইংরাজি পত্র; নব্য ইঙ্গ বঙ্গ যুবা—যাঁহার জীবনই ইংরাজি অনুকরণ, তাঁহার প্রণয়-পত্র যে মাতৃভাষায় লিখিত হইবে—বোধ করি আমি খুলিয়া না বলিলেও, এমন আজগুবি ভুল কেহ করিতেন না।

আমিও অবশ্য ইংরাজিতেই উত্তর লিখিতে বসিলাম।—ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিতনামা কোন বঙ্গবালা হইতে যে আমার ইংরাজি বুৎপত্তি প্রতিপত্তি কিছু কম—তাহা নহে, আমিও লোরেটো কন্‌ভেণ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বাবাকে জ্যাঠাইমাকে ও পিসিমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে হইলে ইংরাজিতেই লিখিয়া থাকি; সখীদিগের সহিত কথা বার্ত্তাও অনেক সময়ে ইংরাজিতেই চলে; আর এ পর্য্যন্ত যে কত শত ইংরাজি কবিতা উপন্যাস মস্তিষ্কজাত করিয়াছি তাহার ত ঠিক ঠিকানাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি, দেশের ভাষা হইতে এই পরদেশী ভাষাটাকে অধিকতর আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি বলিয়াই বরঞ্চ এতদিন মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম, কিন্তু এ চিঠি লিখিতে বসিয়া সে ভুল আমার ভাঙ্গিল! এ ধরণের পত্র লিখিবার প্রয়াস আমার এই প্রথম। এক একটি মনোমত শব্দের চিন্তায়, ভাব ও ভাষার সুন্দর সঙ্গতিতে এক একটি সুললিত পদবিন্যাসের প্রয়াসে উৎকণ্ঠিত গলদ্‌ঘর্ম্ম

হইয়া উঠিলাম। চিঠি কতবার লিখিলাম, কতবার ছিঁড়িলাম তাহার ঠিক নাই। যেখানির বা ভাব ঠিক হয়—তাহার ভাষা ঠিক হয় না, যাহার বা ভাষা পসন্দ হয়—তাহাতে আমার মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দৈবক্রমে কোনখানিতে ভাব ও ভাষার একরূপ নির্দ্দোষ সমন্বয় হইলেও তখন ভাবনা জন্মে—ইহা ঔপন্যাসিক রসযুক্ত সুরচনা হইয়াছে কি না? এমন কি একটা in এবং to শব্দের স্থানান্তর সংঘটন সন্দেহে বহুযত্নে বহু সময় ধরিয়া লিখিত প্রায় সমাপ্ত পত্রখানিও মুহূর্ত্তে শতছিন্ন হইয়া পড়ে,—এ অবস্থায় কি চিঠি শেষ হয়? এই চিঠি লিখিতে বসিয়া প্রথম আমি মাতৃভাষার সহজ গৌরব উপলব্ধি করিলাম। দশ এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রীতিমত যা বাঙ্গলা শিখিয়াছিলাম; তাহার পর কলিকাতা আসিয়া লোরেটোতে ভর্ত্তি হইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা চর্চ্চার মধ্যে প্রধানতঃ কথা কহা; দ্বিতীয়তঃ মাঝে মাঝে ভাল উপন্যাস কবিতা পাইলে যা পড়িয়া থাকি; তাহার সংখ্যাও ত নখাগ্রে গণনা করা যায়। কিন্তু তথাপি আমি যদি এ চিঠি বাঙ্গলাতে লিখিতাম তাহা হইলে কি কর্তৃ কর্ম্ম ভাববাচ্যের সুপ্রয়োগ নিরূপণে, বিশেষণ প্রতিশব্দ নিচয়ের সূক্ষ্ম ভাবার্থভেদ বিচারে,—সমাপক অসমাপক ক্রিয়ার স্থিতি গতির বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণে অথবা সামান্য একটা অব্যয় শব্দের যথা সন্নিবেশ চিন্তায় মস্তিষ্ক এতদূর আলোড়িত বিলোড়িত করিতাম! এক কথায় চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ভুলিয়া সুরচনার উদ্দেশ্যে এতটা বিব্রত হইয়া পড়িতাম—অথবা শব্দ, পদ, ভাষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহা বলিবার আছে বিনাড়ম্বরে সহজভাবে তাহাই বলিয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়াই যথেষ্ট সন্তোষলাভ করিতাম? বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গলা ভুল করিলে তাহাতে আমাদের লজ্জা করে না—কিন্তু ইংরাজির একটা সামান্য ভুলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই! বিপদে পড়িলেই মধুসূদনকে মনে পড়ে; সেই দিন আমার জ্ঞান জন্মিল, এই ইংরাজি পত্রখানির জন্য যতটা পরিশ্রম করিলাম, তাহা নিতান্তই বৃথা হইল; কিন্তু বাঙ্গলা লিখিবার জন্য এতটা পরিশ্রম করিলে আমি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুলেখক হইতে পারিতাম নাকি? সেই জ্ঞানের ফল আজ পাঠককে উপহার দিতেছি, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন।

কিন্তু তাহাও বলি—নিতান্তই কি ভাষারি দোষ! মনের দোষ কি ইহাতে কিছুই ছিল না? লোকের যখন বিশেষ কোন হৃদয়ের কথা বলার না থাকে; সে তখন বেশ অসঙ্কোচে অনর্গল বলিয়া বা লিখিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য বলিবার কথা কিছু বিশেষ থাকিলেই তাহা তখন বলা দায় হইয়া উঠে, তখনই, সে কথা কি ভাবে প্রকাশ করিব, কিরূপ আকৃতিতে তাহা সুস্পষ্ট অথচ নিখুঁৎ হইবে—এই চিন্তায় এই সঙ্কোচে, প্রকাশে শত সহস্র বাধা আসিয়া পড়ে। তাই এক একবার মনে হয়—ইংরাজিতে না লিখিয়া বাঙ্গলাতে লিখিলেই কি তাঁহার হাতে পত্রখানি পৌঁছিত? কে জানে!

সপ্তাহ কাটিতে চলিল; তাঁহার আসিবার সময় হইয়া আসিল দিস্তা দিস্তা কাগজ নষ্ট করিলাম তবু আমার চিঠি শেষ হইল না; বিরক্ত হইয়া লেখা বন্ধ করিলাম—মনকে বুঝাই-

লাম—তিনি ত শীঘ্রই আসিবেন, আর লেখার সময়ই বা কই, আবশ্যকই বা কি ? দেখা হইলে মুখেই সব বলিব, চিঠিতে কি অত কথা বলা যায় ? কেন লিখি নাই কারণ শুনিলে তিনিও ইহাতে কিছু মনে করিবেন না।

এক সপ্তাহ মাত্র তাঁহার মফঃস্বলে থাকিবার কথা—দশ বার দিন হইল তবু তিনি ফিরিলেন না। দিদি একদিন রাত্রে ডিনার পার্টি হইতে ফিরিয়া পরদিন সকালে আমার সহিত প্রথম দেখা হইবামাত্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার চিঠিপত্র পেয়েছিস ?"

কি জানি প্রসঙ্গ ক্রমে যদি দিদি জানিতে পারেন যে সে চিঠির এখনো উত্তর দেওয়া হয় নাই ; তাহা হইলে, একে নিজের মনের জ্বালাতেই জ্বলিতেছি তাহার উপর কর্ত্তব্য ত্রুটির উপদেশে ক্ষত স্থান লবণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, এই ভয়ে আমি কথাটা কোন রকমে এড়াইয়া অন্য কথা পাড়িবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—"গান টান কাল কেমন হোল ?"

দিদি বলিলেন—"গাইয়ে লোক কাল তেমন কেউ ছিল না। মিশেষ ক—মিশ ক—তাঁরা সব এখনো ময়মনসিংয়ে—কেউ কলকাতায় ফেরেন নি ; মিশ ক না থাকলে কি গান জমে ? চঞ্চল একবার টিম টিম করে গাইলে ; আমিও গেয়েছিলুম ; কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—মোটেই ভাল করে গাইতে পারলুম না"—

"মন আবার খারাপ হোল কেন ডিনার পার্টিতে গিয়ে ?"

"কি গুজব উঠেছে জানিস,—তোর সঙ্গে জির বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, মিশ কর সঙ্গে তার বিয়ে। ময়মনসিংয়ে নাকি তাদের বাড়ীতেই জি ছিল।"

"সেই জন্যেই আর কি গুজবটা উঠেছে। লোকদের ত খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, পরচর্চ্চার একটা সুযোগ পেলে হয়। ত্রেতা যুগে বাল্মীকি রাম না হতে রামায়ণ সৃষ্টি করেছিলেন—এ যুগে সে ক্ষমতাটুকু ত কারো নেই,—তাই অহর্নিশি তার চেষ্টাটাই চলেছে। একটা গুজব শুনে তুমি অত মুষড়ে গেলে কেন ?"

"কথাটা নিতান্ত গুজব বলে মনে হচ্ছে না,—চঞ্চলের মার কাছে সব শুনলুম। তারা নাকি মেয়েকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দেবে।"

চঞ্চলের মা মিশেস কয়ের যা, উভয়ের মধ্যে প্রীতি সদ্ভাব কিছুমাত্র নাই,—আত্মীয়তা স্থলে কলহ বিবাদ হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে, কাহারো গুণ কেহ দেখিতে পান না, তিল দোষ পাইলে তাহাকে তাল করিয়া তুলিয়া তাহার সমালোচনায় উভয়েই পরমানন্দ লাভ করেন। আমি বলিলাম—"তিনি যখন বলেছেন তখন ত কথাটার মধ্যে কোন সত্য না থাকারই বেশী সম্ভাবনা।"

"কিন্তু শুনছি জি পরশু রাতে এসেছে—তাহলে সে কাল এখানে এলনা কেন ? আগে হোলে কি তা করত ?"

আমার মনে তখনো তাঁহার ভালবাসার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার বিদায় কালের কাতরোক্তি তখনো মনে সুস্পষ্ট বাজিতেছে, তাঁহার পত্রের প্রীতিময় বাক্য তখনো হৃদয়

অনুকম্পিত ব্যথিত করিতেছে, আমি কি বাহিরের সামান্য একটা গুজবে বা একদিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে মহা বিশ্বাস হারাই ? আমি বলিলাম—"দিদি তুমি যেন কি ? কাল আসতে পারেন নি আজ আসবেন এখন, তাতে আর এতই হয়েছে কি ? কিছুদিন আগে তাঁর সৌজন্যের প্রতি তোমার এতটা গভীর বিশ্বাস ছিল—আর সামান্য একটা গুজবে সমস্ত হারিয়ে ফেল্লে। যদি তাঁর ভালবাসা মিথ্যা না হয় তাহলে এ গুজব সত্য হতে পারে না—আর গুজবটা যদি সত্যি হয় তাহলে ত তাঁর ছলনা হতে অব্যাহতি পাওয়া গেল তাতে দুঃখ করার কি আছে বল ?"

দিদি চুপ করিয়া গেলেন। ভক্ত ঐশ্বরিক প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, আমি তাঁহার প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যেন সেইরূপ আনন্দ পূর্ণ হইলাম। আত্মপ্রেমানুভূতিতে যে আনন্দ, নিজে ভাল বাসিয়া যে সুখ—এ সুখ এ আনন্দ একমাত্র তাহারই সহিত তুলনীয়, অন্য কোন আনন্দের সহিত ইহার তুলনা নাই, যিনি, ইহা ভোগ করিয়াছেন তিনিই মাত্র জানেন—এ ভক্তি বিশ্বাস কিরূপ পরমানন্দ ! এই বিশ্বাস সংসারে অমূল্যধন! অপ্রেম হৃদয়ে ইহাতে প্রেম ফুটায় ; সপ্রেম হৃদয় ইহাতে চির-প্রেমময় করিয়া তোলে, আর এই বিশ্বাসের অভাবে প্রজ্জ্বলন্ত প্রেমও ক্রমে নিস্তেজ নির্ব্বাপিত শীতল হইয়া পড়ে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ডিনারে রাত জাগিয়া দিদি তাঁহার ঘরে দিবা নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, আমি ড্রয়িংরুমে জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানি নভেল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলাম ;—কিন্তু কিছুতেই তাহাতে মন বসিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষার রাশি রাশি পাঠের মধ্যেও ফাঁকি দিয়া যখন নভেল শেষ করিতাম—তখন মনে হইত সারা জীবন যদি উপন্যাসের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনের পরম ও চরম সুখ লাভ হয়—আমি আর সংসারে অন্য কিছু চাহি না। কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের সুখের কল্পনা পরিবর্ত্তিত হয়, একবৎসরও তাহার পর অতীত হয় নাই !

চোখের উপর খোলা কেতাব, যন্ত্রের মত হরফগুলি নিঃশব্দে আওড়াইয়া যাইতেছি—অথচ খানিক পরে আত্মস্থ হইয়া দেখিতেছি এক অক্ষরও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই—আসলে পড়িতেছি না ভাবিতেছি, কিন্তু কি ভাবিতেছি তাহারও একটা ঠিক ঠিকানা নাই, অস্পষ্ট অসংযত বিশৃঙ্খল ভাবনা,—মনের মধ্যে একটা কেমন অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতের জন্য আগ্রহ,—কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কি, তাহার আকৃতি কিরূপ—স্থিতিই বা কোথায়, তাহা সে ভাবনার মধ্যে নাই। মাঝে মাঝে এক একবার পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টি পড়িতেছিল—উদার স্তব্ধ সৌন্দর্য্য দৃশ্যের মধ্যে আমার উদাসচিত্ত স্বপ্নের মত যেন মিলাইয়া পড়িতেছিল, সহসা আবার তাহা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়া পুস্তকে চক্ষু ফিরাইতেছিলাম। ঠুং ঠুং করিয়া চারিটা বাজিল, আকাশে চাহিয়া দেখিলাম সুন্দর লাল

মেঘের শোভা, সমুদ্র মনে পড়িল, এই প্রশান্ত সুরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া কটকে যাইবার পথে ঝটিকা তরঙ্গিত যে ভীম সমুদ্র দেখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়িল, কে জানে এ দৃশ্যের সহিত তাহার কি যোগ? অমনি বহু পূর্ব্বে পঠিত একখানি উপন্যাসের কয়েকটি লাইন মনে পড়িল—"In certain places and certain periods the aspect of the sea is dangerous—fatal; as at times is the glance of a woman." যখন পড়িয়াছিলাম তুলনাটা বেশ ভাল লাগিয়াছিল তাই বোধ হয় স্মৃতির কোণে ইহা সুপ্ত ছিল—আজ সহসা জাগিয়া উঠিল। যদিও বইখানিরও নাম মনে করিতে পারিলাম না, তখন যে ইহার অর্থ কিরূপ বুঝিয়াছিলাম তাহাও মনে পড়িল না। এখন সমালোচনার ভাবে ভাবিলাম, সমুদ্রের সহিত যে দৃষ্টির তুলনা হয় তাহা অবশ্য ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হইবে, স্ত্রীলোকের সক্রোধ দৃষ্টি কি পুরুষের নিকট এতই ভয়জনক। আমি ত পুরুষ নই, সে ভাবটা ঠিক আত্মস্থ করিতে পারিলাম না, কেবল পুরুষের কাপুরুষতা ভাবিয়া মনে মনে একটু হাসির উদ্রেক হইল। কই আমি ত পুরুষের এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ক্রুদ্ধ ভাব কল্পনা করিতে পারি না যাহাতে আমাকে ভয়কম্পিত অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তোলে। আমাকে ত লোকে এত কোমল স্বভাব বলিয়া জানে, বাস্তবিকই আমি অল্পেতেই আর্দ্র হই, পরদুঃখ দেখিতে পারি না, বিশেষতঃ ভালবাসা স্থলে সহজেই নিজের প্রবল ইচ্ছাও বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু ক্রোধে কি আমাকে বশ করিতে পারে? সেদিন যদি তিনি আমার কথায় রাগ করিয়া রূঢ়বাক্যে আমাকে অভিসম্পাৎ দিতেন, প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া শাসাইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার বেদনা আমি অনুভব করিতাম—না তাহা নিবারণের জন্যই এত ব্যাকুল হইতাম? সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা অভক্তিরই উদ্রেক হইত। প্রেমের আশঙ্কাই প্রবল আশঙ্কা। যে ভাল বাসে, যাহাকে ভালবাসি—তাহাকে ব্যথা দিতে প্রাণে যেমন বাজে এমন আর কিসে? ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নহে; প্রেমময় করুণ দৃষ্টিই প্রকৃত পক্ষে fatal—dangerous; তাঁহার বিদায় কালের সেই সকরুণ দৃষ্টি মনে জাগিল, লেখকও যে শেষ অর্থে এ তুলনা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আমার আর তখন সন্দেহ রহিল না। সময়ে সময়ে জোয়ার আসিয়া শুষ্ক তীরস্থিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেমন সহসা ভাসাইয়া লইয়া যায়—এই সকরুণ দৃষ্টিও সেইরূপ নিঃশব্দে হৃদয় অধিকার করে—তখন লোকে বিপদ জানিয়া শুনিয়াও আর ফিরিতে পারে না, অধিকাংশ সময় ফিরিতে চাহেও না, ইচ্ছা করিয়া তাহাতে আত্মা ভাসাইয়া দেয় সেই জন্যই ইহা অধিক ভয়জনক।

জুতার শব্দে চিন্তাভঙ্গ হইল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তিনি। তাঁহার ভাব তেমন সহাস্য নহে, গম্ভীর বিষণ্ণ ভাবে গৃহ প্রবেশ করিয়া নীরবে হাত বাড়াইয়া দিলেন, নীরবে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া নিকটের একখানি চৌকিতে বসিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমিও দমিয়া গেলাম, বুঝিলাম চিঠি না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, অথচ তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিলে আমি যেরূপ সহজভাবে সব খুলিয়া বলিতে পারিতাম এখন তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় কি শত ইচ্ছাতেও কথা ফোটে!

কিছু পরে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার চিঠি পাইয়াছিলেন আশা করি?" সম্বোধনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার এই অনাত্মীয় ভাব, অনুত্তপ্ত শীতল কঠিন ভাষা আমার হৃদয়কে কেমন তুষার জমাট করিয়া আনিতে লাগিল; আমিও অস্বাভাবিক রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"পাইয়াছি, শীঘ্র আসিবেন বলিয়া উত্তর দিই নাই।"

"উত্তর কি এখন প্রত্যাশা করিতে পারি?"

অবশ্যই পারেন, আমিও ত বলিবার জন্য প্রস্তুত! কি করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিব এতদিন ধরিয়া অনবরত মনে মনে তাহার রিহার্সেল দিয়া আসিতেছি অথচ এখন বলিতে গিয়া দেখিলাম বলা কত কঠিন! কি যে বলিব—কি কথা হইতে আরম্ভ করিব, কিছুই মনে করিতে পারিলাম না, মাথার মধ্যে কথার রাশি এলোমেলো ভাবে সবেগে ঘুরপাক খাইতে লাগিল—ঘূর্ণ মস্তিষ্ক, রুদ্ধাবেগ লইয়া আমি বলিলাম—"আমি—আমি কি বলিব—আপনার দোষ—

তিনি বলিলেন "এখনো সেইভাব—সেই উত্তর—আমার দোষ।—

আমি যদিও তাহা বলিতে যাই নাই—বলিতে গিয়াছিলাম, আপনার দোষ নাই—আমারি দোষ—ইত্যাদি; কিন্তু কথাটা এইখানেই তিনি ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন। উল্লিখিত কথার পর বলিলেন "দোষ আমারি তবে হউক, কিন্তু এ দোষ জানিয়াও কি আমাকে বিবাহ করিতে পারিবেন? আমি নিতান্তই স্বার্থপর হইয়া একথা বলিতেছি মনে করিবেন না। এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে আপনার পক্ষেও কিরূপ ক্ষতি তাহা বিবেচনা করিবেন। আমি ভালবাসি, না বিবাহ হইলে আমার কষ্ট হইবে, এরূপ ভাবিয়া মতামত স্থির করিবেন না; নিজের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়া যাহা হয় স্থির করুন।"

কথাটা খুবই নিঃস্বার্থ ভাবের কথা; কিন্তু আমার সমস্ত প্রকৃতি ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে কারণে আমি তাঁহার সমস্ত দোষ ভুলিয়াছিলাম—সে কারণ ইহার মধ্যে কোথা? এই আশ পাশআঁটা, বুদ্ধি বিবেচনাযুক্ত কথার মধ্যে প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যাকুলতা কই? তবে যে গুজব শুনা গিয়াছে তাহা কি সত্য? কয়েক হাজার সামান্য রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার প্রেম জয় করিয়াছে? আমার নিদ্রিত গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল; আমি অসঙ্কোচে সুস্পষ্টস্বরে বলিলাম "আমার ক্ষতির জন্য আমি ভাবি না—আপনারো ভাবিবার আবশ্যক নাই,—সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করিতে চাহি না—আপনার সুখ যখন ইহার উপর নির্ভর করিতেছে না—তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি—"

তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তবে তাহাই হোক্—"

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুপ্ত-মন্ত্রণা।

আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপনের সময়ে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে "যুদ্ধ কলহের মধ্যে সিপাহীদিগের লুট তরাজের গতিরোধ করা কত কঠিন, তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই। তথাপি তোমরা যদি কিছু কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার কর, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য আমিও কিছু কিঞ্চিৎ ত্যাগ-স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব।"* এই প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। যথন সকল গোলযোগ শেষ হইয়া গেল, তখন সিরাজদ্দৌলা সেনাপতিদিগের কৃতকার্য্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বিচারে মহারাজ মাণিকচাঁদের কীর্ত্তিকলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িল,—তিনিই যে কলিকাতার রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইয়াছিলেন, সে কথা বুঝিতে আর ইতস্ততঃ রহিল না! সিরাজদ্দৌলা অপরাধীর সমুচিত দণ্ডদান করিলেন,—মাণিকচাঁদ কারারুদ্ধ হইলেন! সেকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া পদগৌরবে পরিত্রাণ লাভ করিতেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যের কোনরূপ বিচার হইত না। সুতরাং মাণিকচাঁদের কারাদণ্ডে অনেকেই শিহরিয়া উঠিলেন।

অনেক কাকুতি মিনতির পর দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া মাণিকচাঁদ মুক্তিলাভ করিলেন;† কিন্তু ইহাতেই প্রধূমিত বিদ্রোহবহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। রায় দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর,—সকলেই ভাবিলেন যে, মাণিকচাঁদ উপলক্ষ মাত্র, অতঃপর সকলকেই একে একে উৎপীড়ন করিয়া সিরাজদ্দৌলা ইচ্ছানুরূপ অর্থমোষণ করিবেন। সুতরাং স্বার্থরক্ষার জন্য জগৎশেঠের মন্ত্রভবন পুনরায় নৈশসম্মিলনের সঙ্কেতস্থান হইয়া উঠিল।

যাঁহারা গুপ্তমন্ত্রণায় মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের জন্য বা দশের

* You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore if you will, on your part, relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, to gain your friendship and preserve a good understanding with your nation.—Nabob's letter to Admiral Watson.

† He had imprisoned Monikchand, and upon releasing, had obliged him to pay a million of Rupees as a fine for the effects he had plundered in Calcutta.—Orme, vol. ii. 147.

জন্য চিন্তা করিতেন না;—জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্ল্লভরাম, সুদখোর উমাচরণ, প্রতিহিংসাতাড়িত মাণিকচাঁদ,—ইঁহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোণিতসংস্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না; কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সহিত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ দুঃখের চির-সংস্রব, তাঁহাদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুর এই গুপ্ত-মন্ত্রণায় যোগদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী কৃষ্ণনগরাধিপতির কাপুরুষত্বের পরিচয় পাইয়া সঙ্কেতে সদুপদেশ দিবার জন্য "শাঁখা সিন্দুর" উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা স্বার্থের চরণতলে দয়া, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, রাজভক্তি বলিদান দিয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন,—যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল আত্মকল্যাণের জন্যই শওকতজঙ্গের ন্যায় পরম সুপাত্রকেও সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন,—তাঁহারা বীররমণীর ভর্ৎসনাবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, ইংরাজ-সাহায্যে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন!

আত্মশক্তির উপর স্বাভাবিক বিশ্বাস বড়ই প্রবল;—রাজসিংহাসন যে এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইতে পারে, স্বাধীন নরপতিগণ তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। সিপাহী-যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে বিদ্রোহের আভাস পাইয়াও কোম্পানী বাহাদুরের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল; সিরাজদ্দৌলারও মতিভ্রম ঘটিল। তিনি ভাবিলেন, ফরাসিরাই বুঝি সকল গোলযোগের মূল, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেই ইংরাজ শান্ত হইবে, এবং ইংরাজ শান্ত হইলেই পাত্র-মিত্রগণ গুপ্তমন্ত্রণা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এই সময়ে ওয়াট্‌সন্‌ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"চিরস্থায়ী শান্তিসংস্থাপনের ইহাই সুসময়, এ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না।"* সুতরাং স্বদেশের কল্যাণকামনায় সিরাজদ্দৌলা শান্তিসংস্থাপনের জন্যই ব্যাকুল হইলেন; তিনি ফরাসিদিগকে বিদায় দান করিয়া, ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—"স্বার্থান্ধ লোকের উত্তেজনায় ভুলিও না; সন্ধিভঙ্গ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য! যদি কলহ বিবাদ বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, তবে আর আমাকে সন্ধির বিরোধী প্রস্তাব লিখিও না। বরং লিখিবার পূর্ব্বে সন্ধিপত্রখানি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিও।"†

* It is now in your power to settle ever-lasting peace in your country; and if you suffer the opportunity to slip, it may never offer again.—Watson's letter to the Nabob.

† I have written before and now repeat that if the English Company want to establish their trade, do not write me what is not conformable to our agreement, by the instigation of self-interested and designing men, who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me, you have my agreement under my hand and seal, when you write, look upon that, and write accordingly. Nabob's letter to Admiral Watson, 14 April, 1757.

ফরাসিদিগকে পথিমধ্যে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজেরা পল্টন পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না! তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজের উকীলকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিয়া, ওয়াট্‌স্ সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন:—"হয় এখনই মুচলিকা লিখিয়া দিয়া ফরাসির পশ্চাদ্ধাবনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর,—না হয়, এই মুহূর্ত্তেই রাজধানী হইতে দূর হইয়া যাও!"* এ সংবাদে ক্লাইব ক্ষিপ্রহস্তে বাণিজ্যের তরণী সাজাইতে আরম্ভ করিলেন;—ভিতরে গোলা বারুদ, উপরে ধানের বস্তা, তাহার উপর 'চড়ন্দার' চল্লিশ জন সুশিক্ষিত সৈনিকপুরুষ,—এইরূপ সুকৌশলপূর্ণ 'সপ্তডিঙ্গা মধুকোষ' ইংরাজ সওদাগরের বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কাশিমবাজারে যাহা কিছু ধনরত্ন সঞ্চিত থাকে, তাহা অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য ওয়াট্‌স্‌কে গোপনে পত্র লিখিতেও ত্রুটি হইল না!†

অতঃপর সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ যে পত্র লিখিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ পত্র; তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইল:—"একজনমাত্র ফরাসী জীবিত থাকিতেও ইংরাজ নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা শীঘ্রই কাশিমবাজারে সেনা পাঠাইতেছেন, কাশিমবাজার সুরক্ষিত হইলেই, ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য পাটনা অঞ্চলে আরও দুই সহস্র ফৌজ প্রেরিত হইবে;—এ সকল কার্য্যে নবাবকে ইংরাজের সহায়তা করিতে হইবে।" এই পত্রে আত্মচরিত্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ওয়াট্‌সন্ ইহাও লিখিলেন যে,—"কেবল শান্তির জন্যই তাঁহার যাহা কিছু ব্যাকুলতা, ধনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে না,—তিনি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন!!"‡ সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, আবার যুদ্ধ বাধিল; তিনিও সাধ্যমত আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফরাসি-নিপাতে সহায়তা করিলে সিরাজদ্দৌলাকে এ সকল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু পদাশ্রিত শরণাগত দুর্ব্বল ফরাসিদলের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সিরাজদ্দৌলার প্রবৃত্তি হইল না। একশত ফরাসিসেনার প্রাণরক্ষার জন্য শত সহস্র লোকের সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজসিংহাসন এবং আত্মজীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি কুক্ষণে ইংরাজ-সেনাপতিকে উপেক্ষা করিলেন। ইহার জন্য স্বাধীনতা গেল, সিংহাসন গেল, জীবন গেল,—অবশেষে তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্তও কলঙ্কিত হইয়া রহিল!!

পলাসির যুদ্ধাবসানে কর্ণেল ক্লাইব বিলাতের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে:—"Some of Suraja Dowla's letters to the French having fallen into my hands, I enclose a translate of them

* Orme. vol. ii. 147.

† Colonel Clive detatched 40 Europeans to protect the factory, and sent in several boats a supply of ammunition concealed under rice.—Ibid.

‡ Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together of riches is what I despise.—Watson's letter.

just to show you the necessity we were reduced to of attempting his overthrow."* এই পত্রগুলি আলিনগরের সন্ধির অব্যবহিত পরের তারিখের, এবং ইহা হইতে মনে হয় যে সিরাজদ্দৌলা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিয়া গোপনে ফরাসিদিগের সহায়তা করিতেছিলেন। †

এই পত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া অনেকেই সিরাজদ্দৌলাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া গিয়াছেন, এবং কেহ কেহ ইহাও রটনা করিয়া গিয়াছেন যে গুপ্তচর সাহায্যে মূল পত্রগুলিই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ওয়াট্‌স্ সাহেবের যোগে এই পত্রগুলির নকলমাত্র প্রাপ্ত হন। স্ক্রাফ্‌টন বলেন যে; যখন সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সেই সময়ে তিনি এই পত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন।‡ এই পত্রগুলি যে চক্রান্তকারিদিগের স্বকপোলকল্পিত নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। ইংরাজদিগকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্যই যে এ গুলি রচিত হয় নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিরাজদ্দৌলার মীরমুন্সী এই সকল পত্রের নকল বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই মীরমুন্সীই যে তৎকালে উৎকোচলোভে ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে ওয়াট্‌স্ সাহেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।§ সিরাজদ্দৌলা ফরাসি-নিপাতে সহায়তা করিলে এ সকল অযথা কলঙ্কের সৃষ্টি হইত কি না, কে বলিতে পারে?

ইয়ার লতিফ খাঁ দুই সহস্র অশ্বসেনার অধিনায়ক। তিনি সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি কিন্তু জগৎশেঠের অন্নদাস!¶ এই মুসলমান সেনাপতি ২৩শে এপ্রিল তারিখে ওয়াট্‌স্ সাহেবের সহিত গুপ্ত-সন্দর্শন প্রার্থনা করিলেন। সাহেবের সাহসে কুলাইল না, তিনি সুচতুর উমাচরণকে পাঠাইয়া দিলেন।|| তদনুসারে, ইয়ার লতিফ এবং উমাচরণের যোগে ইংরাজের নিকট বাঙ্গালীর রাজবিদ্রোহের প্রথম প্রস্তাব উপনীত হইল। স্বার্থ-সাধনের প্রলোভনে, হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ান, জাতি ধর্ম্মের চিরবিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া একাত্মা হইয়া উঠিলেন।

* Clive's letter to Court, 6 August, 1757.

† These disturbers of my country, Admiral and Colonel Clive, Sabut Jung, whom bad fortune attends, without any reason whatever, are warring against Zubdalook Toojah, Monsr. Rennault, the Governor of Chandernagore.—Suraja Dowla's letter to Monsr. Busie, Bahadre, supposed to be written in the latter end of February, 1757.

‡ Scrafton's Reflections.

§ Partly by such arguments, and, taught by the French the power of money at the Subah's Court, partly by a handsome present of money to his first Secretary, he (Mr. Watts) produced the following letter from him to Mr. Watson.—Scrafton.

¶ He was at the same time in the pay of the Seits.—Thornton, vol. i. 226.

|| Mr. Watts was too closely watched by the Subah's spies to venture himself, but sent one Omichund to him, who was an agent under him.—Scrafton.

ফরাসিদিগকে পথিমধ্যে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজেরা পল্টন পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না! তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজের উকীলকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিয়া, ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন ঃ—"হয় এখনই মুচলিকা লিখিয়া দিয়া ফরাসির পশ্চাদ্ধাবনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর,—না হয়, এই মুহূর্ত্তেই রাজধানী হইতে দূর হইয়া যাও!"* এ সংবাদে ক্লাইব ক্ষিপ্রহস্তে বাণিজ্যের তরণী সাজাইতে আরম্ভ করিলেন;—ভিতরে গোলা বারুদ, উপরে ধানের বস্তা, তাহার উপর 'চড়ন্দার' চল্লিশ জন সুশিক্ষিত সৈনিকপুরুষ,—এইরূপ সুকৌশলপূর্ণ 'সপ্তডিঙ্গা মধুকোষ' ইংরাজ সওদাগরের বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কাশিমবাজারে যাহা কিছু ধনরত্ন সঞ্চিত থাকে, তাহা অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য ওয়াট্‌স্‌কে গোপনে পত্র লিখিতেও ত্রুটি হইল না!†

অতঃপর সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ যে পত্র লিখিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ পত্র; তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইল ঃ—"একজনমাত্র ফরাসী জীবিত থাকিতেও ইংরাজ নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা শীঘ্রই কাশিমবাজারে সেনা পাঠাইতেছেন, কাশিমবাজার সুরক্ষিত হইলেই, ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য পাটনা অঞ্চলে আরও দুই সহস্র ফৌজ প্রেরিত হইবে;—এ সকল কার্য্যে নবাবকে ইংরাজের সহায়তা করিতে হইবে।" এই পত্রে আত্মচরিত্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ওয়াট্‌সন্‌ ইহাও লিখিলেন যে,—"কেবল শান্তির জন্যই তাঁহার যাহা কিছু ব্যাকুলতা, ধনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে না,—তিনি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন!!"‡ সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, আবার যুদ্ধ বাধিল; তিনিও সাধ্যমত আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফরাসি-নিপাতে সহায়তা করিলে সিরাজদ্দৌলাকে এ সকল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু পদাশ্রিত শরণাগত দুর্ব্বল ফরাসিদলের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সিরাজদ্দৌলার প্রবৃত্তি হইল না। একশত ফরাসিসেনার প্রাণরক্ষার জন্য শত সহস্র লোকের সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজসিংহাসন এবং আত্মজীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি কুক্ষণে ইংরাজ-সেনাপতিকে উপেক্ষা করিলেন। ইহার জন্য স্বাধীনতা গেল, সিংহাসন গেল, জীবন গেল,—অবশেষে তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্তও কলঙ্কিত হইয়া রহিল!!

পলাসির যুদ্ধাবসানে কর্ণেল ক্লাইব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে ঃ—"Some of Suraja Dowla's letters to the French having fallen into my hands, I enclose a translate of them

* Orme. vol. ii. 147.

† Colonel Clive detatched 40 Europeans to protect the factory, and sent in several boats a supply of ammunition concealed under rice.—Ibid.

‡ Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together of riches is what I despise.—Watson's letter.

just to show you the necessity we were reduced to of attempting his overthrow."* এই পত্রগুলি আলিনগরের সন্ধির অব্যবহিত পরের তারিখের, এবং ইহা হইতে মনে হয় যে সিরাজদ্দৌলা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিয়া গোপনে ফরাসিদিগের সহায়তা করিতেছিলেন।†

এই পত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া অনেকেই সিরাজদ্দৌলাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া গিয়াছেন, এবং কেহ কেহ ইহাও রটনা করিয়া গিয়াছেন যে গুপ্তচর সাহায্যে মূল পত্রগুলিই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের যোগে এই পত্রগুলির নকলমাত্র প্রাপ্ত হন। স্ক্রাফ্‌টন বলেন যে; যখন সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সেই সময়ে তিনি এই পত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন।‡ এই পত্রগুলি যে চক্রান্তকারিদিগের স্বকপোলকল্পিত নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। ইংরাজদিগকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্যই যে এ গুলি রচিত হয় নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিরাজদ্দৌলার মীরমুন্সী এই সকল পত্রের নকল বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই মীরমুন্সীই যে তৎকালে উৎকোচলোভে ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।§ সিরাজদ্দৌলা ফরাসি-নিপাতে সহায়তা করিলে এ সকল অযথা কলঙ্কের সৃষ্টি হইত কি না, কে বলিতে পারে?

ইয়ার লতিফ খাঁ দুই সহস্র অশ্বসেনার অধিনায়ক। তিনি সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি কিন্তু জগৎশেঠের অন্নদাস!¶ এই মুসলমান সেনাপতি ২৩শে এপ্রিল তারিখে ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের সহিত গুপ্ত-সন্দর্শন প্রার্থনা করিলেন। সাহেবের সাহসে কুলাইল না, তিনি সুচতুর উমাচরণকে পাঠাইয়া দিলেন।‖ তদনুসারে, ইয়ার লতিফ এবং উমাচরণের যোগে ইংরাজের নিকট বাঙ্গালীর রাজবিদ্রোহের প্রথম প্রস্তাব উপনীত হইল। স্বার্থ-সাধনের প্রলোভনে, হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ান, জাতি ধর্ম্মের চিরবিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া একাত্মা হইয়া উঠিলেন!

* Clive's letter to Court, 6 August, 1757.

† These disturbers of my country, Admiral and Colonel Clive, Sabut Jung, whom bad fortune attends, without any reason whatever, are warring against Zubdalook Toojah, Monsr. Rennault, the Governor of Chandernagore.—Suraja Dowla's letter to Monsr. Busie, Bahadre, supposed to be written in the latter end of February, 1757.

‡ Scrafton's Reflections.

§ Partly by such arguments, and, taught by the French the power of money at the Subah's Court, partly by a handsome present of money to his first Secretary, he (Mr. Watts) produced the following letter from him to Mr. Watson.—Scrafton.

¶ He was at the same time in the pay of the Seits.—Thornton, vol. i. 226.

‖ Mr. Watts was too closely watched by the Subah's spies to venture himself, but sent one Omichund to him, who was an agent under him.—Scrafton.

লতিফ বলিলেন, "সিরাজদ্দৌলা শীঘ্রই পাটনা প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, কেবল সেই জন্যই আপাততঃ ইংরাজদিগকে কিছু বলিতেছেন না ;—কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে আর ইংরাজের রক্ষা থাকিবে না ! দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই সিরাজদ্দৌলাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। তিনি পাটনা যাত্রা করিলে, সেই অবসরে ইংরাজেরা যদি মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমাকে সিংহাসন দান করিলে, ইংরাজেরা যাহা চাহেন আমি তাহাই অম্লানবদনে প্রদান করিতে সম্মত রহিলাম।"* লতিফ মীরজাফরের নাম গোপন করিয়া রাখিলেন !

পরদিবস খোজা পিক্র নামক আরমাণী বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবেই ওয়াট্‌স্ সাহেবের কথোপকথন হইল। তিনি বলিলেন যে,—"মীরজাফরকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা অবসর অনুসন্ধান করিতেছেন ; অগত্যা আত্মরক্ষার জন্যই মীরজাফর বিদ্রোহীদলে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রায় দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ এবং আর আর সকলেই মন্ত্রণার মধ্যে আছেন ; আপনারা সহায়তা করিলে তাঁহারাও সহায়তা করিবেন। এ কার্য্য আপনাদের কর্ত্তব্য হয় ত এখনই অগ্রসর হউন। সিরাজদ্দৌলাকে আপাততঃ নিশ্চিন্ত রাখা আবশ্যক ; তজ্জন্য কর্ণেল ক্লাইবকে সসৈন্যে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।"†

ক্লাইব অবিলম্বে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়া ১লা মে তারিখে ইংরাজদরবারে উপনীত হইলেন। তাঁহার এবং ওয়াট্‌সের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইল।‡ তিনি শীঘ্রই ছাউনী উঠাইয়া অর্দ্ধেক সেনাদল কলিকাতায় এবং অর্দ্ধেক সেনাদল চন্দননগরে লুকাইয়া রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে শান্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমরা ত সেনাদল উঠাইয়া আনিলাম ; আপনি আর পলাসিতে ছাউনী রাখিতেছেন কেন ?" যে পত্রবাহক এই বিষকুম্ভপয়োমুখ পত্র লইয়া মুরশিদাবাদ যাত্রা করিল, ক্লাইব তাহার যোগেই ওয়াট্‌স্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মীরজাফরকে বলিও কিছুতেই যেন তিনি ভীত না হন, আমি পাঁচ হাজার ফৌজ লইয়া সাহায্য করিব, একজন মাত্র জীবিত থাকিতেও পলায়ন করিব না ; দিবারাত্রি অক্লান্তচরণে অগ্রসর হইব।"§

* বোধ হয় বিদ্রোহীদলের এই সকল উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়াই ইংরাজেরা লিখিয়া রাখিয়াছেনঃ— "Suraja Dowlah was such a monster that no security could be 'enjoyed either by the 'English or by the natives in Calcutta, so long as he sat upon the musnud at Moorshedabad, and ruled over Bengal, Bahar and Orissa."—The Great battles of the British Army, p. 162.

† Orme, vol. ii. 149.

‡ Great dexterity as well as secrecy being necessary in executing the plan of a revolution, the whole management thereof was left to Colonel Clive and to Mr. Watts. —Ive's Journal.

§ He wrote to Surajah Dowlah in terms so affectionate that they for a time lulled that weak prince into perfect security. The same courier who carried this "Soothing

যাঁহার মনে যত পাপ, তিনি প্রকাশ্যে তত সরলতা দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহ্‌মদ শাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করায়, সিরাজকে আর পাটনা যাত্রা করিতে হইল না ; তিনি ইংরাজের সুকৌশলপূর্ণ বাণিজ্যতরণী আটক করিয়া, পলাশির ছাউনী যেমন ছিল সেইরূপ রাখিয়া, গুপ্তচরসহায়ে ইংরাজের সংকল্পানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

মতিরাম একজন বিখ্যাত গুপ্তচর। তিনি কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় থাকিয়া গোপনে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন যে,—"কেবল অর্দ্ধেক ফৌজ কলিকাতায় আছে, অপরার্দ্ধ বোধ হয় কোন গোপনপথে কাশিমবাজার যাত্রা করিয়াছে !" সিরাজদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন ; ফৌজের সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। তিনি ফরাসিদিগকে ভাগলপুরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভাগীরথীমুখে শালতরু প্রোথিত করিয়া, পঞ্চদশ সহস্র সেনাসমভিব্যাহারে মীরজাফরকে পলাশিযাত্রার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে পলাশিতে অবস্থান করিতে হইলে গুপ্তমন্ত্রণার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সন্দেহ দূর করিবার জন্য মীরজাফরকে সহাস্যমুখেই পলাশিযাত্রা করিতে হইল !

মহারাষ্ট্র-সেনাপতি, বহুদিন চৌথ না পাইয়া লুণ্ঠন-লোলুপ সতৃষ্ণনয়নে ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়া গোবিন্দরাম নামক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।* সেই মহারাষ্ট্রদূত কলিকাতায় উপনীত হইলে কর্ণেল ক্লাইব বিষম বিপদে পতিত হইলেন। গোবিন্দরাম কাহার চর ? তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্রখানি সিরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। ইহাতে ইংরাজের সরলতার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন, এই ভরসায় স্ক্রাফ্‌টন্ সাহেব মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন ;—পথিমধ্যে পলাশিতে মীরজাফরের সঙ্গে পরামর্শ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।† নবাবের

letter," as Clive calls it, carried to Mr. Watts a letter in the following terms : "Tell Meer Jaffier to fear nothing. I will join him with *five thousand* men who never turned their backs. Assure him, I will march night and day to his assistance, and stand by him as long as I have a man left.—Macaulay's Lord Clive. বলাবাহুল্য যে এ সময়ে ক্লাইবের আদৌ ৫০০০ ফৌজ ছিল না ; এবং কার্য্যকালেও তিনি তিন হাজারের অধিক ফৌজ লইয়া যাইতে পারেন নাই। আশ্বাস দিবার সময়ে ক্লাইবের মুখে এইরূপ করিয়াই খৈ ফুটিত।"

* "Your misfortunes have been related to me by Ragooje, son to Janooge. Make yourself easy, and be my friend ; send me your proposals such as you imagine may be for the best ; and with the divine assistance, Sumseer Caun Bhadre and Roghu Babu, son to Baje Row, shall enter Bengal with a hundred and twenty thousand horse."—Letter from Ballaje Row Seehoo Baje Row, Vizir to Ram Rajah, brother to Raja Seehoo, from Hydrabad, to Roger Drake, Governor of Calcutta.

† Another, and the principal object of Mr. Scrafton's mission, was to obtain an opportunity of consulting confidentially with Meer Jaffier ; but this was prevented by the watchfulness of the Subahdar's emissaries.—Thornton's History of the British Empire, vol. i. 229. note.

গুপ্তচরগণ সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে দিল না; তাহারা স্ক্রাফ্‌টন্‌কে বরাবর মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিল। ক্লাইবের কৌশল জয়যুক্ত হইল; নবাব ইংরাজদিগের উপর এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার যাহা কিছু এখনও সন্দেহ ছিল, স্ক্রাফ্‌টন্‌ তাহা সহজেই দূর করিতে সক্ষম হইলেন; মীরজাফর সসৈন্যে পলাশি হইতে উঠিয়া আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মুরশিদাবাদে আসিবামাত্র গুপ্তসন্ধিপত্র লিখিত হইল।

১৭ই মে কলিকাতার ইংরাজদরবারে এই গুপ্ত সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপির আলোচনা হইল। এই পাণ্ডুলিপিতে কোম্পানী বাহাদুর এক কোটী টাকা, কলিকাতাবাসী ইংরাজ বঙ্গালী ও আরমানীগণ ৭০ লক্ষ টাকা এবং উমাচরণ ৩০ লক্ষ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া যাঁহারা বিদ্রোহের প্রধান প্রধান পাণ্ডা, তাঁহাদের পুরস্কারের অঙ্ক এক পৃথক ফর্দ্দে লিখিত হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার রাজভাণ্ডারে অবশ্যই এত টাকা থাকিবার কথা নহে;—কিন্তু সে কথার কেহ বিচার করিলেন না। চারিদিকে রাজবিপ্লব,—ইংরাজেরা কাণ্ডারী সাজিয়া মীরজাফরের আশার তরণী-তীর-সংলগ্ন করিতে প্রতিশ্রুত,—সুতরাং তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, মীরজাফরকে তাহাতেই 'তথাস্তু' বলিতে হইয়াছিল!*

পাণ্ডুলিপি পাঠাইবার সময়ে ওয়াট্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে,—"উমিচাঁদ যাহা চাহিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে! সে সহজ পাত্র নহে;—নবাবের নিকট এখনই সকল চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া দিবে!" এই সংবাদে ইংরাজেরা উমাচরণের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। যাহারা মীরজাফরকে কামধেনুর ন্যায় যথেচ্ছ দোহন করিতে লালায়িত, তাঁহারাই উমাচরণকে অর্থগৃধ্নু স্বার্থপিশাচ বলিয়া ফাঁকি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু উমাচরণকে কেমন করিয়া ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে, সে কথার কেহ মীমাংসা করিতে পারিলেন না!

অবশেষে একদিন এক রাত্রির গভীর গবেষণার পর, ক্লাইবের "প্রত্যুৎপন্নমতি" সমস্যাপূরণে কৃতকার্য্য হইল। তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র লিখাইলেন; একখানি সাদা কাগজে,—সে খানি আসল; আর একখানি লাল কাগজে,—সে খানি জাল!† এই জাল সন্ধিপত্রে উমাচরণের ত্রিশ লক্ষের উল্লেখ রহিল। ওয়াট্‌সন্‌ ইহাতে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিয়া ক্লাইবকে একটু বিপদে ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইবের আদেশে লসিংটন সাহেব ওয়াট্‌সনের নাম জাল করায় সকল বিপদ কাটিয়া গেল।‡ দুইখানি সন্ধিপত্রই মীরজাফরের নিকট প্রেরিত হইল।

* The plain truth was that the so-called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything; the Nawab-expectant could refuse nothing. There was not even a shadow of deliberation, for there was no time to haggle over terms.—Early Records of British India, p. 316.

† His Lordship himself formed the plan of the fictitious treaty.—First Report.

‡ Mr. Lushington was the person who signed Admiral Watson's name, by his Lordship's order.—Ibid,

এই জাল সন্ধিপত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ইতিহাসলেখকেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন। ক্লাইব কিন্তু মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে অম্লানচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে,—"তিনি কখনও এ কথা লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এবম্প্রকার জাল জুয়াচুরি যে অনায়াসেই করা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহার মত। একবার কেন,—আবশ্যক হইলে, এরূপ অবস্থায় আরও একশ বার তিনি এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত।"*

যিনি ভারতবর্ষে বৃটীশ শাসনের ভিত্তিমূল সংস্থাপনের আদি পুরুষ, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি যে এতদূর নীচগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন;—একমাত্র স্যর জন ম্যাল্‌কম্‌ ভিন্ন আর কেহই ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইহার জন্য লোকে অনর্থক তিলে তাল করিয়া তুলিয়াছে।† ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া এদেশের দশজন গণ্যমান্য লোকের সহায়তায় কর্ণেল ক্লাইব যে মোগল রাজসিংহাসন উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জাল জুয়াচুরি ভিন্ন কেবল বাহুবলে তাহা মুসলমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার সম্ভাবনা ছিল না।

রাজবিদ্রোহ মহাপাপ;—ইংরাজেরা জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই ত যথেষ্ট; তাহার তুলনায় আর জাল জুয়াচুরি এমন গুরুতর অপরাধ কি? আর ক্লাইবের ন্যায় লোকের পক্ষে তাহা এমন দুরপনেয় কলঙ্কই বা কি?‡, তিনি যে শ্রেণীর ইংরাজ, যে সহবাসে শিক্ষিত, যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সমাগত,—তাহাতে তাঁহার নিকট সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত আদর্শ ইংরাজের চরিত্রবলের প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা! যখন

* His Lordship never made any secret of it; he thinks it warrantable in such a case, and *would do it again a hundred times*.—Ibid.

† "বিষস্য বিষমৌষধং" মোগলগৌরবের অধঃপতন সময়ে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান,—বাঙ্গালী মরহাট্টা এবং ফিরিঙ্গি বণিক অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভারত-ভাগ্য-সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যে অরাজকতার কালান্তক হলাহল উত্তোলন করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবাসীর সুখ-সৌভাগ্য জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লাইব সেই বিকারে বিষপ্রয়োগ না করিলে আজ দিগন্ত-বিস্তৃত বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতেশ্বরীর শাসন-কৌশলে এদেশের লোক পূর্ব্ব কাহিনী বিস্মৃত হইবার অবসর লাভ করিত না; পাঠানের শাণিত খরসান, মরহাট্টার অশ্বপদতাড়না, ইউরোপীয় বণিকের সর্ব্বসংহারিণী ক্ষুধা এতদিনে এ দেশের অস্থিচর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিত;—যে রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্নিশিখা ভারতবর্ষে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আজিও দেশে দেশে উন্মত্ত পিশাচের মত নৃত্য করিয়া বেড়াইত! পাশ্চাত্য শিক্ষার সহস্র দৃষ্টান্তে আজিও যাহাদের গৃহকলহ শান্তিলাভ করে নাই, তাহারা যে আত্মবলে বলীয়ান্‌ হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত, সে আশা নিতান্তই আকাশকুসুম!

‡ His family expected nothing good from such slender parts and such a headstrong temper. It is not strange, therefore, that they gladly accepted for him, when he was in his eighteenth year, a writership in the service of the East India Company, and shipped him off to make a fortune or to die of a fever at Madras.—Macaulay's Lord Clive.

যাহা আবশ্যক, তিনি তখনই তাহা অম্লানচিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন; তাহাতে কখন তাঁহার "কেশাগ্রও" কম্পিত হয় নাই! * যে দুর্দ্দান্ত ইংরাজ-যুবক আবাল্য শত সহস্র উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যে জীবনযাপন করিয়া, নিরন্তর স্বজনবান্ধবগণকে সশঙ্কিত রাখিয়া, অবশেষে অন্তিমে অশান্তহৃদয়ে আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার হতভাগ্য স্মৃতি নীরবে শান্তিলাভ করুক্। যাঁহারা তাঁহাকে মহাবীর পলাশি-বিজেতা "ব্যারণ" বলিয়া ভক্তিপুষ্পে চরণ বন্দনা করিবার জন্য সাগ্রহে প্রস্তরমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই অবসাদের অন্ত নাই। কিন্তু যে মহাজাতি আত্মগৌরবকাহিনীতে সভ্য-জগৎ প্রতিশব্দিত করিয়া স্বদেশের রাজপথপার্শ্বে বৃটীশ বীরকেশরী নেল্‌সন্ ওয়েলিংটনের জয়স্তম্ভ গঠন করিয়াছে, তাহারা ক্লাইবের জন্য এখনও জাতীয় কীর্ত্তিমন্দিরে পাদপীঠ রচনা করে নাই!†

যাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঙ্গালীর গুপ্ত-মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, রাজবিপ্লবের কল্যাণে এ দেশের রাজ-সিংহাসন বিনাপণে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, অর্থই তাঁহাদের নিকট একমাত্র "বাইবেল" বলিয়া পরিচিত ছিল।‡ তাঁহারা যে শাস্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাহারই মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যে তাঁহাদিগকেই আদর্শ ইংরাজ বলিয়া, তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের লেখায়, তাঁহাদের প্ররোচনায়, সিরাজদ্দৌলাকে নরপিশাচ বলিয়া ইতিহাসের অবমাননা করিতেছি, তজ্জন্য আমরাই বরং সমধিক তিরস্কারের পাত্র।

উমাচরণকে প্রতারিত করিয়াই ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আনিয়া মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কি সুকৌশলে "ধূর্ত্ত উমিচাঁদকে" অধিকতর ধূর্ত্ততায় পরাস্ত করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করা সম্ভব, স্ক্রাফ্‌টনের উপর সেই ভার নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি উমাচরণকে নির্জ্জনে বুঝাইতে বসিলেন; "কথাবার্ত্তা ত একরূপ শেষ হইয়া গেল। এখন দুই চারিদিনের মধ্যেই লড়াই বাধিবে। তখন সকলকেই তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে হইবে। আমরা না হয় একরূপ করিব; কিন্তু তুমি,—একে স্থূলদেহ, তাহাতে স্থবির,—তুমি কি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে পারিবে?" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল;—উমাচরণ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পলায়নের কথা একবারও

* Clive was a man, "to whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang."—Mill's History of British India, vol. iii.

† The anniversary of Lord Clive's birth, though seldom observed or honored among us as continental people honor the heroes of their national Pantheon, must still fill every reflecting mind with crowding thoughts upon the strange and romantic rise of the British Power in the East.—The Indian Statesman, 30th September, 1896.

‡ In manufacturing the terms of the confederacy the grand concern of the English appeared to be money.—Mill's History of British India, vol. iii. 185.

তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে নাই! তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্ক্রাফ্‌টনের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেন; তখন সুকৌশলে সিরাজদ্দৌলার অনুমতি লইয়া দুইজনেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যাহারা পাপসংকল্পে লিপ্ত হয়, তাহারা কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না। ইংরাজেরা স্থির করিলেন যে, মীরজাফর যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, সে সময়ে ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়াট্‌স্ সাহেব উপস্থিত থাকা চাই। কিন্তু সিরাজের সন্দেহে পড়িয়া মীরজাফর পদচ্যুত হইয়াছিলেন; গুপ্তচরগণ সতর্কদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল;—এরূপ অবস্থায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল!

অবশেষে ওয়াট্‌স্ সাহেব একদিন অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া আস্তরণাবৃত শিবিকা-রোহণে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় সভয়ে সসঙ্কোচে মীরজাফরের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগৃহের রীত্যনুসারে শিবিকা একেবারে অন্তঃপুরে নীত হইল। ওয়াট্‌স্ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া বেগম-মহলে আসনগ্রহণ করিলেন।* তাঁহার সম্মুখে মীরজাফর মুসলমানের পরমপবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মাথায় লইয়া, একহাত প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মাথায় রাখিয়া, আর একহাতে কলম ধরিয়া স্বাক্ষর করিলেনঃ—"ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এই সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার পালন করিতে বাধ্য থাকিলাম।"†

এই গুপ্ত সন্ধিপত্র লইয়া মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার ১০ই জুন কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তখন একরূপ ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিয়াছে! আর কালবিলম্ব করিবার অবসর রহিল না;—ক্লাইব যুদ্ধযাত্রার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সগর্ব্বে সিরাজদ্দৌলাকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

মীরজাফর কোরাণস্পর্শ করিয়াও ইংরাজদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই। তিনি যে সত্য সত্যই সন্ধিপত্রের লিখিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি যথাধর্ম্ম পালন করিবেন, তজ্জন্য উমা-চরণ ও জগৎশেঠকে জামিন থাকিতে হইয়াছিল। ‡

এ দেশের লোক বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন;—তাহারা এখনও বিশ্বাস করে যে, মীরজাফর পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া কৃতঘ্নের ন্যায় ফিরিঙ্গীর সঙ্গে গোপনে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিধাতার অভিসম্পাতে তাঁহার পাপহস্ত কুষ্ঠরোগে খসিয়া পড়িয়াছিল, § এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র মীরণের মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছিল।

* Orme, ii.

† "I swear by God and the Prophet of God to abide by the terms of this treaty while I have life."

‡ "জামিন্ উস্‌কে ওহি দোনো মহাজনান্ মজ্‌কুরা হুয়ে।"—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

§ মীরজাফরের মৃত্যুসময়ে তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য মহারাজ নন্দকুমার শ্রীশ্রীশ্বরী কিরীটশ্বরী দেবীর চরণামৃত তাঁহার ওষ্ঠে সেচন করিয়া এই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। "Gholam Hossein has a

এরূপ কুসংস্কার কেবল আমাদিগেরই পৈতৃক সম্পত্তি নহে ;—ক্লাইব যখন আত্মহত্যা করেন, তখন বিলাতের কত ভাল ভাল লোকেও বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, এত দিনে বিধাতার বিচারে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ! *

এ দিকে সিরাজদ্দৌলা গুপ্ত সন্ধিপত্রের সন্ধান পাইয়া মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের বাটীতে গোলাবারুদের অভাব ছিল না,—সুতরাং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা সহজ হইল না ! ওয়াট্‌স্‌ ইহার আভাস বুঝিয়াই বায়ুসেবনের উপলক্ষ করিয়া সহযোগী সহযোগে রজনীমুখে অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন ! তখন আর সিরাজদ্দৌলার ইতস্ততঃ রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ওয়াট্‌স্‌নকে পত্র লিখিতে বসিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। তিনি লিখিলেন ঃ—

২৫ রমজান (১৩ই জুন ১৭৫৭)।

"আমরা যে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার অঙ্গীকার পালনের জন্য ওয়াট্‌স সাহেবকে প্রায় সকল বস্তুই বুঝিয়া দিয়াছি। যৎসামান্য কিছু কিঞ্চিৎ বাকী থাকিতে পারে। মাণিকচাঁদের ব্যাপারও একরূপ শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও ফল হইল না ! ওয়াট্‌স্‌ এবং কাশিমবাজারের কুঠিয়ালেরা বায়ুসেবনের ভাণ করিয়া রজনীযোগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহা প্রতারণার স্পষ্ট লক্ষণ,—সন্ধিভঙ্গের পূর্ব্বসূচনা। তোমার অজ্ঞাতসারে বা উপদেশ ব্যতীত যে এরূপ কার্য্য সংঘটিত হয় নাই তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইয়াছে। এরূপ ঘটিবে বলিয়া চিরদিনই আশঙ্কা করিতাম, এবং তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বলিয়াই আমি পলাশি হইতে ছাউনী উঠাইয়া আনিতে সম্মত হইতাম না !

"যাহা হউক, আমার দ্বারা যে সন্ধিভঙ্গ হইল না এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! আমরা যে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঈশ্বর এবং পয়গম্বর তাহার সাক্ষী। যিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন, তিনিই সেই মহাপাপের শাস্তিভোগ করিবেন !" †

---

story that, when Mir Jaffar was dying, Nanda Kumar gave him water that had bathed the image of Kiriteshwari."—H. Beveridge, C. S.

* In the awful close of so much prosperity and glory, the vulgar saw only a confirmation of all their prejudices ; and some men of real piety and genius so far forgot the maxims both of religion and of philosophy as confidently to ascribe the mournful event to the just vengeance of God, and to the horrors of an evil conscience.—Macaulay's Lord Clive.

"25th Ramzan (13th of June 1757).

† According to my promises, and the agreement made between us, I have duly rendered everything to Mr. Watts, except a very small remainder, and had almost settled Monickchand's affair : Notwithstanding all this, Mr. Watts and the rest of the Council of the factory at Cossimbazar, under pretence of going to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty. I am convinced it could not have happened without your knowledge or without your advice. I all along expected something of this kind and for that reason I would not recall my forces from Plassey, expecting some treachery.

I praise God, *that the breach of the treaty has not been on my part :* God and His Prophet have been witnesses to the contract made between us, and whoever first

চারিদিকে রাজবিপ্লব ; তাহার মধ্যে সিরাজের রত্নসিংহাসন বটপত্রের মত ভাসমান হইল ! তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে সিংহাসন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে পাত্রমিত্রগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযোগ্য সমালোচনা না করিয়া, লর্ড মেকলে সিরাজদ্দৌলাকেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক সাজাইবার জন্য অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—"The Nabob behaved with all the faithlessness of an Indian statesman, and with all the levity of a boy whose mind had been enfeebled by power and self-indulgence. He promised, retracted, hesitated, evaded."* এই গ্রন্থ আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী যুবকবৃন্দের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে !

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুদ্ধযাত্রা।

যুদ্ধযাত্রার আবশ্যকীয় আয়োজন শেষ হইলে, ১২ই জুন কলিকাতার ফৌজ চন্দননগরের ফৌজের সহিত মিলিত হইল, এবং চন্দননগরের দুর্গরক্ষার জন্য কেবলমাত্র দেড়শত জাহাজী-গোরা পশ্চাতে রাখিয়া, ১৩ই জুন সমগ্র বৃটিশবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করিল। † গুলি গোলা বারুদ লইয়া "গোরা লোগ" দুইশত নৌকায় আরোহণ করিল, "কালা আদ্‌মীরা" গঙ্গাতীরের বাদশাহী রাস্তার উপর দিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ অনেক দূরের পথ ! পথপার্শ্বে হুগলী এবং কাটোয়ার দুর্গে, অগ্রদ্বীপ এবং পলাশির ছাউনীতে, নবাবের সিপাহীসেনা বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা বীরোচিত আত্মকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, হয়ত হুগলীর নিকটেই ইংরাজেরা সসৈন্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কেহ ইংরাজের গতিরোধ করা দূরে থাকুক, একবার বীরের ন্যায় সম্মুখসমরে দাঁড়াইতেও সাহস করিল না। ইতিহাসে কেবল এই পর্য্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হুগলীর ফৌজদার ইংরাজের যুদ্ধজাহাজ দেখিয়া এবং ক্লাইবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াই পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন !

ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে যখন চন্দননগর আক্রমণ করেন, মহারাজ নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার ! তিনি সে যাত্রা কি জন্য ইংরাজের পথ ছাড়িয়া দেন, সে কথা নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এবার সেইজন্য তিনি হুগলীতে আর একজন নূতন ফৌজদার পাঠাইয়া-

---

deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.—Ive's Journal.

* Macaulay's Lord Clive.

† It consisted of 650 European infantry, 150 artillary men, including 50 Seamen, 2100 Seapoys, and a small number of Portuguese, making a total of something more than 3000 men.—Thornton's History of the British Empire, vol. i. 233.

ছিলেন।* এই সকল বাঙ্গালী ফৌজদার বা তাহাদের কালা সিপাহীরা যে কিরূপ বীর-বিক্রমে অস্ত্রচালনা করিত, তাহা ইংরাজের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তাঁহারা কোন্ সাহসে দেড়শতমাত্র জাহাজী-গোরা পশ্চাতে রাখিয়া সসৈন্যে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তাঁহারা কি জানিতেন না যে হুগলীর ফৌজদার পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিলে ইংরাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত? ইংরাজদিগের নিশ্চিন্ত রণযাত্রা, ফৌজদারের সযত্ন-পালিত তুষ্ণীম্ভাব, চন্দননগরে কেবলমাত্র দেড়শত গোরার অবস্থান,—এই সকল বিষয় একত্র বিচার করিলে মনে হয় যে, মুর্শিদাবাদের গুপ্তমন্ত্রণা হুগলীর ফৌজদারকেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছিল!

এদিকে বিদ্রোহের সন্ধান পাইয়া, মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কাপুরুষত্বের ইহাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।† কিন্তু সে সময়ে মীরজাফরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে বসিলে, মুর্শিদাবাদেই পলাশির যুদ্ধাভিনয় সুসম্পন্ন হইত! সিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যাকুল; সুতরাং মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা করিলেও সিরাজদ্দৌলা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি মীরজাফরের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাজসদনে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা ভাবিয়াছিলেন যে, ইস্‌লামের নামে, আলিবর্দ্দির নামে, স্বাধীনতা রক্ষার্থ সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে, হয়ত এখনও মীরজাফরের মতিভ্রম দূর হইতে পারে! বিদ্রোহীদল সিরাজদ্দৌলাকে বিলক্ষণ ভয় করিতেন; তাঁহারা দেখিলেন যে সকল কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নবাবের সঙ্গে পুনরায় সখ্যসংস্থাপন করাই সুপরামর্শ। তাঁহারা সেইরূপ উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু মীরজাফরের সাহসে কুলাইল না;—তিনি আর রাজসদনে শুভাগমন করিলেন না!‡

অবশেষে আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা ১৫ জুন শিবিকারোহণে মীরজাফরের বাটীতে উপনীত হইলেন!§ এবার মীরজাফরকে বাহির হইতে হইল, এবার তাঁহাকে অধোমুখে সলজ্জনয়নে স্নেহভাজন কুটুম্বের মুখের সকরুণ ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিতে হইল; এবং সিরাজদ্দৌলা যখন ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরের নামে, মহম্মদের নামে, মুসলমান-

* The Nawab entertaining suspicions of NunComar, had lately sent a new Governor to Hoogly, who threatened to oppose the passage of the boats; but the twenty-gunship coming up and anchoring before his fort, and a *menacing* letter from Colonel Clive, deterred him from that resolution.—Orme, vol, ii. 164. এই ভয়প্রদর্শনপূর্ণ পত্রখানি বর্ত্তমান নাই। সেই ক্লাইব, সেই উমাচরণ এবং সেই পত্র;—পূর্ব্বের ন্যায় এবারও যে সহজে কার্য্যোদ্ধার হয় নাই, তাহা কে বলিবে?

† Thornton's History of the British Empire vol. i. 232.

‡ At the same time several of the Nabob's Officers, on whose friendship Juffier relied, were exhorting him to a reconciliation; to which he seemingly agreed, but, either through suspicion or scorn, refused to visit the Nabab.—Orme, vol. ii. 167.

§ This interview was on the 15th June.—Ibid.

গৌরবের নামে, আলিবর্দ্দির বংশমর্য্যাদার দোহাই দিয়া মীরজাফরকে ফিরিঙ্গীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন,—তখন সকল কথাই স্বীকার করিতে হইল! তখন আবার 'কোরাণ' আসিল।* আবার মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ মাথায় লইয়া, অন্নদাতা মুসলমান নরপতির নিকট মুসলমান সেনাপতি জানু পাতিয়া শপথ করিলেন:—"ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে ধর্ম্মশপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন মুসলমান সিংহাসন রক্ষা করিব, প্রাণ থাকিতে বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিব না!"

পরমেশ্বরের পবিত্র নামে সিরাজদ্দৌলার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল! হিন্দু যে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে পারে, সে কথা সিরাজদ্দৌলা বিশ্বাস করিতেন না;—সেই জন্য একবার উমাচরণের শপথে প্রতারিত হইয়াছিলেন! মুসলমান যে কোরাণ মাথায় লইয়াও মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে, তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, সিরাজদ্দৌলা আবার প্রতারিত হইলেন! কেহ কেহ বলে সিরাজ পরমপাষণ্ড ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারবিহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক;—তাহা হইলে হয়ত তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাহা হইলে হয়ত হিন্দু ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া, ফিরিঙ্গী বাইবেল চুম্বন করিয়া, এবং মুসলমান কোরাণ মাথায় লইয়া, তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বিশ্বাস করাইতে পারিতেন না। যাঁহারা স্বস্ব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জানিয়া শুনিয়া প্রতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে;—আর তাঁহাদের শপথে সিরাজদ্দৌলা প্রতারিত হইলেন কেন, সেই অপরাধে তাঁহাকে ইতিহাসের তীব্র গঞ্জনা সহ্য করিতে হইতেছে!†

এইরূপে গৃহবিবাদের মীমাংসা করিয়া সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে পলাশিক্ষেত্রে সমবেত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আশা হইল যে, মীরজাফর যখন ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিতে অস্বীকার,—তখন এবার আর ইংরাজের নিস্তার নাই। সেই সাহসে সেনাদল আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদলের প্ররোচনায় বেতন না পাইলে যুদ্ধযাত্রা করিতে অসম্মত হইল। সুতরাং তাহাদিগের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিয়া সিরাজদ্দৌলা নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইলেন।‡ রায় দুর্ল্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর, মীরমদন,

* "The Koran was introduced, the accustomed pledge of their falsehood."—Scrafton's Reflections, p. 85.

† If the Subah erred before in abandoning the French, he doubly erred now, in admitting a suspicious friend.—Ive's Journal.

‡ The Nawab's troops seeing in the impending warfare no prospect of plunder, as in the sacking of Calcutta, and much more danger, clamorously refused to quit the city until the arrears of their pay were discharged; this tumult lasted three days; nor was it appeased until they had obtained a large distribution of money.—Orme, vol. ii. 169.

মোহনলাল, এবং ফরাসী সেনানায়ক সিনফ্রেঁ এক এক বিভাগের সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সহগামী হইলেন।

গুপ্তচরের গোপনানুসন্ধানভয়ে মীরজাফরের পক্ষে সর্ব্বদা ইংরাজশিবিরে সংবাদ প্রেরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনিই সকল চক্রান্তের চক্রধর,—সুতরাং তাঁহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় ক্লাইব প্রতিদিনই তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু ১৩ই জুন সোমবার হইতে ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চারি দিনের মধ্যে একখানিও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। ওয়াট্‌স্ সাহেব ১৪ জুন ইংরাজশিবিরে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মীরজাফরের নিকট একজন বিশ্বাসী হরকরা পাঠাইয়া দেন; দুর্ভাগ্যক্রমে সে হরকরাও ফিরিয়া আসিল না। ক্লাইব অগত্যা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সসৈন্যে পাটুলিতে ছাউনী ফেলিলেন।

মীরজাফর ১৬ই জুন বৃহস্পতিবারে ক্লাইবকে প্রথম পত্র লিখিলেন; সে পত্র শুক্রবারে পাটুলীর ছাউনীতে ক্লাইবের হস্তগত হইল। মীরজাফর যে সিরাজের সঙ্গে মৌখিক সখ্য-সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি যে তজ্জন্য ইংরাজের সহায়তা করিয়া আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, সে কথাও লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র পাইয়াও ক্লাইব সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। সম্মুখে কাটোয়া-দুর্গ; সে দুর্গের সেনানায়ক কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া ইংরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন, এইরূপ কথা ছিল।* সে কথা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, শনিবার প্রাতঃকালে ২০০ গোরা এবং ৩০০ সিপাহী লইয়া মেজর কূট কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ক্লাইব সসৈন্যে পাটুলিতেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। অজয় এবং ভাগীরথীর সম্মিলনস্থানে কাটোয়া-দুর্গ সুসংস্থাপিত, বর্গীর হাঙ্গামায় কাটোয়া-দুর্গ বীরবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া চিরবিখ্যাত। এবার কিন্তু দুর্গদ্বারে যুদ্ধ হইল না; কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধাভিনয়ের পর নবাবসেনা স্বহস্তে চালে চালে আগুণ ধরাইয়া দিয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিল! এই যুদ্ধাভিনয়ে নবাব-সেনা যতটুকু বীরবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই মেজর কূট ভাবিয়াছিলেন যে, সেনাপতি হয়ত পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা হউক কাটোয়া নির্ম্মক্ষিক হইলে, ক্লাইব ধীরে ধীরে সসৈন্যে কাটোয়া অধিকার করিয়া লইলেন, নাগরিকগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করায় এত ধান চাউল ইংরাজের হস্তগত হইল যে, তাহাতে দশসহস্র সিপাহী বৎসর ভরিয়া উদর-পূরণ করিতে পারিত। সুতরাং ক্লাইব সসৈন্যে কাটোয়ায় শিবির-সন্নিবেশ করিলেন।

মীরজাফরের প্রথম পত্রেই ক্লাইবের মন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল; ওয়াট্‌স্ সাহেবের পূর্ব্বপ্রেরিত গুপ্তচর ফিরিয়া আসিয়া সন্দেহ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিল। আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য ক্লাইব দুই দিন পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে পথ চাহিয়া রহিলেন।† কখন

* The Governor of this fort had promissed to surrender after a little pretended resistance.—Orme, vol. ii. 168.

† Orme vol. ii. 169.

বিশ্বাস কখন অবিশ্বাসে আন্দোলিত হইয়া স্বভাবতই মনে হইতে লাগিল যে গুপ্তসন্ধিপত্র হয়ত সিরাজদ্দৌলারই কৌশলমাত্র; হয়ত সখ্যসংস্থাপন করিয়া মীরজাফর পূর্ব্বকথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। সম্মুখে ভাগীরথী তরল তরঙ্গভঙ্গে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত; এখনও বর্ষাসমাগম হয় নাই, সুতরাং এখনও নদীস্রোত উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু হায়! পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যত সহজ, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা কি তত সহজ কথা? ক্লাইব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইতিহাসবিখ্যাত বিপুল বাহুবল এবং অলৌকিক রণকৌশল সহসা যেন শিথিল হইয়া পড়িল!* কেবল মনে হইতে লাগিল,—কি কুক্ষণেই সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, কি কুলগ্নেই বিদ্রোহীদলের মুখের দিকে চাহিয়া গায়ে পড়িয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে খড়্গাধারণ করিয়াছেন! উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়েও এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া ক্লাইব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার কেবলই ভয় হইতে লাগিল,—"যদি পরাজিত হই, তবে আর একজনও সে পরাজয়-কাহিনী বহন করিবার জন্য প্রত্যাগমন করিবার অবসর পাইবে না।"†

সোমবার অপরাহ্নে মীরজাফরের নিকট হইতে এক সঙ্গে দুইখানি পত্র আসিয়া উপনীত হইল;—একখানি ক্লাইবের নামে, অপরখানি উমরবেগের নামে।‡ এই উভয় পত্রে সন্দেহ অপসারিত হইল; কিন্তু বৃটীশ-শিবিরে অশ্বসেনা না থাকায় ক্লাইবের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল।$ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানের মহারাজের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার সদ্ভাব নাই; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনার অশ্বসেনা যদি এক সহস্রেরও অধিক না থাকে, তথাপি তাহা লইয়াই আমাদিগের সহিত মিলিত হউন।"

এই পত্র লিখিয়াও ক্লাইবের দুশ্চিন্তা দূর হইল না। তাঁহার আদেশে ২১ জুন মঙ্গলবার সামরিক সভার অধিবেশন হইল। ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "ইহাই তাঁহার জীবনের

* Before him lay a river over which it was easy to advance, but over which, if things went ill, not one of his little band would ever return. On this occasion, for the first and for the last time, his dauntless spirit, during a few hours, shrank from the fearful responsibility of making a decision.—Macaulay's Lord Clive.

† Had a defeat ensued, "not one man would have returned to tell it."—First Report of the Select Committee of House of Commons, 1772, p. 149.

‡ মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার প্রতিভূ-স্বরূপ ক্লাইবের শিবিরেই অবস্থান করিতেছিলেন!

$ Much confounded by this perflexity, as well as by the danger of coming to action without horse, of which the English had none, he wrote the same day to the Raja of Burdwan, who was discontented with the Nabob, inviting him to join them with his cavalry, even were they only a thousand.—Orme, vol. ii. 170. বাস্তবিক অশ্বসেনার অভাবে এরূপ চিন্তাকুল হওয়াই স্বাভাবিক। কেবল 'পলাশির যুদ্ধকাব্যে' কবিকল্পনা এই চিন্তা দূর করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে যে,—"যদি ডুবি একা নাহি ডুবিবে সকল,

কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত।

প্রথম এবং শেষ সামরিক সভা।"* বিংশতি বৃটীশ-বীরকেশরী চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণবদনে কাটোয়ার শিবিরে সামরিক সভায় উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের নিকট ক্লাইব কি মর্ম্মে প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "এখনই নদীপার হইয়া বাহুবলে সিরাজদ্দৌলাকে আক্রমণ করাই সঙ্গত, কি আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করাই সঙ্গত।" †

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, ক্লাইবের যে সকল কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সামরিক সভার কার্য্যবিবরণী ছিল। তাহাতে প্রশ্নটি এইরূপ লিখিত আছে ঃ—"বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যের সাহায্য না লইয়া আত্মবলেই নবাবশিবির আক্রমণ করিব, কি দেশীয়শক্তির সহায়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব ?" ‡

এই বিষয়ে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে সামরিক সভার অন্যতম সভ্য মেজর কূট (ইনি পরবর্ত্তী ইতিহাসে স্যর আয়ার কূট নামে প্রসিদ্ধ) বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রশ্নটি এইরূপ ঃ—"এরূপ ক্ষেত্রে এখনই নবাবের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করাই কর্ত্তব্য, কি বর্ষা-শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাটোয়ায় আত্মরক্ষা করিয়া আমাদের সাহায্যার্থ মহারাষ্ট্রসেনাদলকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য ; § সমসাময়িক ইতিহাসলেখক অর্ম্মিও এই মর্ম্মেই লিখিয়া গিয়াছেন ¶

ক্লাইবের কাগজপত্রে 'দেশীয় শক্তির' সাহায্য লওয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়, অর্ম্মির ইতিহাসে এবং মেজর কূটের জবানবন্দীতে স্পষ্ট করিয়া "মহারাষ্ট্রশক্তির" নামোল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ক্লাইবের জবানবন্দীতে ইহার নাম গন্ধও নাই,—কেবল সংবাদ সংগ্রহের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না, তাহাই রহিয়াছে কেন ? ক্লাইবের জবানবন্দীতে এরূপ স্থলে ভুল হইল কেন ? ||

* একথা কি সত্য ? চন্দননগর আক্রমণের সময়ে এবং পলাশির আম্রবনে আরও দুইবার সমরসভার অধিবেশনের কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

† Whether they should cross the river and attack Soorajoo Dowla with their own force alone, or wait for *further intelligence ?*—Clive's Evidence, First Report p. 149.

‡ Whether in our present situation, without assistance, and on our own bottom, it would be prudent to attack the Nabob, or whether we should wait till joined by some *country power ?*—Sir John Malcolm.

§ Whether in those circumstances it would be prudent to come to an immediate action with the Nabob, or fortify themselves (English) where they were, and remain till the monsoon was over, and *the Marhattas* could be braught into the country to join us.—Coote's Evidence, First Report, p. 153.

¶ Whether the army shoud immediately cross into the island of Cossimbazar, and at all risk, attack the Nabob ; or whether, availing themselves of the great quantity of rice, which they had taken at Kutwa, they should maintain themselves there during the rainy season, and in the meantime invite the *Marhattas* to enter the Province to join them ?—Orme, vol. ii. 170.

|| This differs from the accounts given by Coote and Orme, principally in the substitution of a general reference to the aid of some native power in place of the particular reference to the Marhattas ; but it differs *materially* from Clive's own statement to the Select Committee of the House of Commons.—Thornton's History of the British Empire, vol. i. 236.

ক্লাইব যে সময়ে মহাসভায় সাক্ষ্যদান করেন, তখন আর তিনি লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল ক্লাইব নহেন ; তখন তিনি পলাশিবীর (ব্যারণ) লর্ড ক্লাইব, ইংলণ্ডের নরনারীর নিকট "নবাব" ক্লাইব নামে পরিচিত। তখন কি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন ? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক দিনের পর এত কথা স্মরণ রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেখানেই আত্মগৌরব বৃদ্ধি করা বা আত্মাপরাধ ক্ষালন করা প্রয়োজন, ঠিক সেখানে আসিয়াই যে ক্লাইবের স্মৃতিশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইহাই তাঁহার জবানবন্দীর প্রধান দোষ !

যিনি একবার স্বার্থসাধনের জন্য জানিয়া শুনিয়া জাল জুয়াচুরি করিয়াছিলেন, এবং আরও শতবার সেরূপ ক্ষেত্রে সেরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি যে আত্মগৌরব বর্দ্ধন বা আত্মাপরাধ ক্ষালনের জন্য সময়ান্তরে মহাসভার ন্যায় মহাধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে জানিয়া শুনিয়া এক আধটা নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা এদিক ওদিক করিয়া বলেন নাই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই !

আলিনগরের সন্ধির পূর্ব্বে ক্লাইব যখন সংবাদ পাইলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কামানগুলি এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, তখন তিনি নিশারণে শত্রুসংহারের জন্য সর্ব্বাগ্রে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। চন্দননগর আক্রমণের পূর্ব্বে যখন সংবাদ পাইলেন যে, মান্দ্রাজ হইতে সেনাবল আসিতেছে এবং সিরাজদ্দৌলা পাঠানভয়ে জড়সড় হইয়াছেন, তখন সদস্যদিগের ইতস্ততঃ থাকিলেও ক্লাইব সগর্ব্বে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, "এখনই চন্দননগর ধ্বংস করিব।" উমরবেগ যখন সন্ধিপত্র আনিয়া দিল তখনও তিনি প্রবল প্রতাপে সেনাদল লইয়া পলাশির দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু কাটোয়ায় পদার্পণ করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা আর সেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিল না। পাছে কনিষ্ঠ বীরপুরুষগণ একবাক্যে যুদ্ধযাত্রার অভিমত প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করেন, সেই আশঙ্কায় ক্লাইব সমর-নীতি সংযম করতঃ প্রথমেই আপন মত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "যেখানে রহিয়াছি, সেখানেই থাকি, ইহাই আমার মত ;—আপনাদের মতামত কি ?" * এই কথায় দ্বাদশজন সেনানায়ক "তথাস্তু" বলিলেন। কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ মেজর কূট প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ—"আপনারা বড়ই ভুল বুঝিতেছেন। সেনাদলের এখনও বিশ্বাস আছে যে তাহারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। শত্রুর সম্মুখে আসিয়া থতমত খাইয়া বসিয়া পড়িলে, তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িবে ; কিছুতেই আর উত্তেজিত করা যাইবে না। আর ল সাহেব অবসর পাইলেই নবাবশিবিরে মিলিত হইবেন ;—তখন নবাবের বাহুবলও বাড়িবে, মন্ত্রণাও উৎসাহলাভ করিবে। তাহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া কলিকাতায় পলায়নের পথ অবরোধ

* Contrary to the forms usually practised in councils of war, of taking the voice of the youngest offlcer first and ascending from this to the opinion of the president, Colonel Clive gave his own opinion first.—Orme, ii. 170.

করিবে। আপনারা এখন যাহা দেখিতে পাইতেছেন না এমন কত নূতন বিপদে পড়িয়া বিনাযুদ্ধেই হয়ত পরাজিত হইবেন। আসুন এখনই অগ্রসর হই, নচেৎ এখনই পলায়ন করি,—যেখানে আছি, এখানে বসিয়া থাকা অসম্ভব।" ছয়জন সেনানায়ক এই মত পোষণ করিলেন। তাঁহাদের কথা কাজে লাগিল না; ক্লাইবের মতই প্রবল হইল; যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রহিল! *

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "কেবল মেজর কূট এবং কাপ্তান গ্রাণ্ট ভিন্ন আর আর সকলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কথা শুনিতে হইলে কোম্পানী বাহাদুরের সর্ব্বনাশ হইত;—আমি সেই জন্যই তাহা অবহেলা করিয়াছিলাম।" †

ক্লাইব যে নিজেই সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া অন্যান্য সেনানায়কদিগের মত প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার জবানবন্দীতে কিন্তু সে কথার উল্লেখ নাই। জবানবন্দী পড়িয়া বরং ইহাই মনে হয় যে, অধিকাংশ লোকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কেবল তিনিই কোম্পানীর কল্যাণের জন্য যুদ্ধের সপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন! এখানেও কি তাঁহার স্মৃতিশক্তি সহসা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল? মেকলে বলেন যে, "অহিফেণ-প্রসাদে তন্দ্রামগ্ন থাকিয়া ক্লাইব মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন! ‡ তাঁহার এই সকল স্থলে ভুলগুলি কি অহিফেণ প্রসাদাৎ,—না স্মৃতিভ্রংশবশাৎ,—না আত্মগৌরবলোভাৎ;—সে কথার আর এখন মীমাংসা করিবার উপায় নাই!

কিজন্য সমগ্র সমর-সভার মন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সহসা ক্লাইবের শৌর্য্যবীর্য্য পুনরাগত হইয়াছিল, সে বিষয়েও নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়! অর্ম্মি বলেন যে, "সভাভঙ্গ হইবামাত্র নিকটস্থ বনান্তরালে প্রবেশ করিয়া একঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ক্লাইব নিজেই বুঝিয়াছিলেন যে অগ্রসর না হওয়াই মূর্খতা! তিনি সেইজন্য শিবিরে আসিয়াই আদেশ দিলেন যে, প্রত্যূষেই গঙ্গাপার হইতে হইবে।" §

ষ্টুয়ার্ট এবং মেকলে অর্ম্মির পদানুসরণ করিয়া এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনায় যাহা কিছু অসঙ্গতি ছিল তাহার পাদপূরণ করিয়া বাঙ্গালী কবি ধ্যানস্তিমিতলোচন ইংরাজ সেনাপতির সম্মুখে ইংলণ্ডের সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে সশরীরে হাজির করিয়া দিয়াছেন! ¶

---

* Ibid.

† His Lordship observed, this was the only Council of war that he ever held and if he had abided by that Council, it would have been the ruin of the East India Company.—Clive's Evidence.

‡ Macaulay's Lord Clive.

§ He retired alone into the adjoining grove, where he remained near an hour in deep meditation, which convinced him of the absurdity of stopping where he was.—Orme, ii. 171.

¶ চিন্তা অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে;
* * *

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক স্যর জন ম্যাল্‌কম ধ্যানের অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়া, অবশিষ্ট কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইবের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর স্ক্রাফ্‌টন্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "২২শে জুন মীরজাফরের পত্র পাইয়াই ক্লাইব ঘুরিয়া বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আদেশে ২২শে জুন সায়ংকাল ৫ ঘটিকার সময়ে বৃটিশ-বাহিনী গঙ্গাপার হইয়াছিল'!", *

কাহার কথা সত্য? কোন্ তারিখে কোন্ সময়ে, কি জন্য ক্লাইবের মতপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল? তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, "কাহারও উপদেশে মত পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজে নিজেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" তাঁহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর একথা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কাহার কথা বিশ্বাস করিব?

ষ্টুয়ার্ট, ম্যাল্‌কম এবং মেকলে সকলেই অর্ম্মিলিখিত আদিম ইতিহাস হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্ম্মির ইতিহাসে প্রকাশ যে ২২শে জুন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে সত্যসত্যই নিম্নলিখিতরূপ পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করেন।

মীরজাফরের পত্র।

That the Nabob had halted at Muncara, a village six miles to the south of Cossimbazar, and intended to entrench and wait the event at that place, where Jaffier proposed that the English should attack him by surprise, marching round by the inland part of the island.

ক্লাইবের উত্তর।

That he should march to Plassey without delay, and would the next morning advance six miles farther to the village of Daudpoor; but if Meer Jaffier did not join him there, he would make peace with the Nabob.

ক্লাইবের প্রত্যুত্তরে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ২১শে জুন অপরাহ্ণ পর্য্যন্তও যুদ্ধযাত্রা করেন নাই; তখনই পত্র পাইবার পর যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মীরজাফরকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। মীরজাফর কিরূপভাবে ক্লাইবের সহায়তা করিবেন, কোন্ পথে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে মীরজাফরের উপদেশ না পাইয়া ইংরাজেরা সসৈন্যে কাটোয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন; এবং তজ্জন্যই সমরসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মীরজাফরের উপদেশ পাইবামাত্রই যে আবার ইংরাজ সেনাপতির শৌর্য্যবীর্য্য জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে! ক্লাইব নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, "সমর সভার অধিবেশন শেষ হইলে, ২৪ ঘণ্টার বিশেষ গবেষণার পরে তাঁহার মতপরিবর্ত্তন সংঘ-

---

সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

* In this doubtful interval the majority of our officers were against crossing the river and everything bore the face of disappointment; but on the 22nd. of June, the Colonel received a letter from Meer Jaffier, which determined him to hazard a battle; and he passed the river at five in the evening.—Scrafton.

টিত হয় ; এবং ২২শে জুন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে সেনাদল গঙ্গাপার হয়।" * সুতরাং স্ক্রাফ্‌টন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়ায় ; অথচ ক্লাইব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, "কাহারও কথায় কি উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই !"

এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে অর্ম্মি ২২শে জুন প্রত্যূষে গঙ্গাপার হইবার কথা লিখিয়া স্ক্রাফ্‌টনের উক্তি খণ্ডন ও ধ্যানযোগে ক্লাইবের মত পরিবর্ত্তন হইবার কথা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কেবল সেই জন্যই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "২১শে জুন এক ঘণ্টার ধ্যানযোগেই" ক্লাইবের দিব্যনেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল ! মেকলে ইহারই পদানুসরণ করিয়া বাঙ্গালীর সত্যনিষ্ঠার কলঙ্করটনা করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই!

অর্ম্মির ন্যায় আরও একজন সমসাময়িক লেখক ২১শে তারিখেই ক্লাইবের মতপরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তিনিও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "এই দিবসেই সন্ধ্যাকালে মীরজাফরের পত্র আসিয়াছিল, এবং তাহাতেই ক্লাইব পরদিবস প্রত্যূষে গঙ্গাপার হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।" †

আমরাই রাজবিপ্লব সংঘটনের মূল কারণ। আমাদিগের মীরজাফর, আমাদিগের রায়দুর্ল্লভ, আমাদিগের জগৎশেঠ,—আমাদিগের স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতাই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের মূল, তজ্জন্য চিরদিন আমাদিগকে ইতিহাসের নিকট শতগঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় লোকের দলে উমাচরণ ছিল, বিদেশীয় বণিকের দলেও ক্লাইব ছিল,—এই ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করিলেই ন্যায়ের মর্য্যাদা অধিকতর সুরক্ষিত হয় ! আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপিত হইলে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টির জন্য কর্ণেল ক্লাইব এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যথা :—

I, Colonel Clive, Sabut Jung Behauder, Commander of the English Land-Forces in Bengal, do solemnly declare, in the presence of God and our Saviour, that there is peace between the Nabob, Serajah Dowla, and the English. They, the English will inviolably adhere to the Articles of the Treaty made with the Nabob : That as long as he shall observe his Agreement, the English will always look upon his enemies as their

* After about twenty-four hours mature consideration, his Lordship said, he took upon himself to break through the opinion of the Council, and ordered the army to cross the river ; and what he did upon that occasion, he did without receiving any advice from any one.—First Report.

† However, the same evening Colonel Clive received a second message from Meer Jaffier, assuring him of his due performance of the articles mentioned in the treaty, but informing him that he was so surrounded with spies, as to be obliged to act with greatest caution. This intelligence soon determined the Colonel to push on. —Ive's Journal.

enemies, and whenever called upon will grant him all the assistance in their power.—12 February, 1757.*

ক্লাইব কিরূপে এই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি মহাসভায় সাক্ষ্যদিবার সময়ে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে :—

That after Chandernagore was resolved to be attacked, he repeatedly said to the Committee, as well as to others, that they could not stop there, but must go further : that having established themselves by force, and not by the consent of the Nabob, he would endeavour by force to drive them out again. That they had numberless proofs of his intention ; and his Lordship said, he did suggest to Admiral Watson and Sir George Pocock, as well as to the Committee, the necessity of a revolution. †

পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।
(২৩শে জুন, ১৭৫৭)

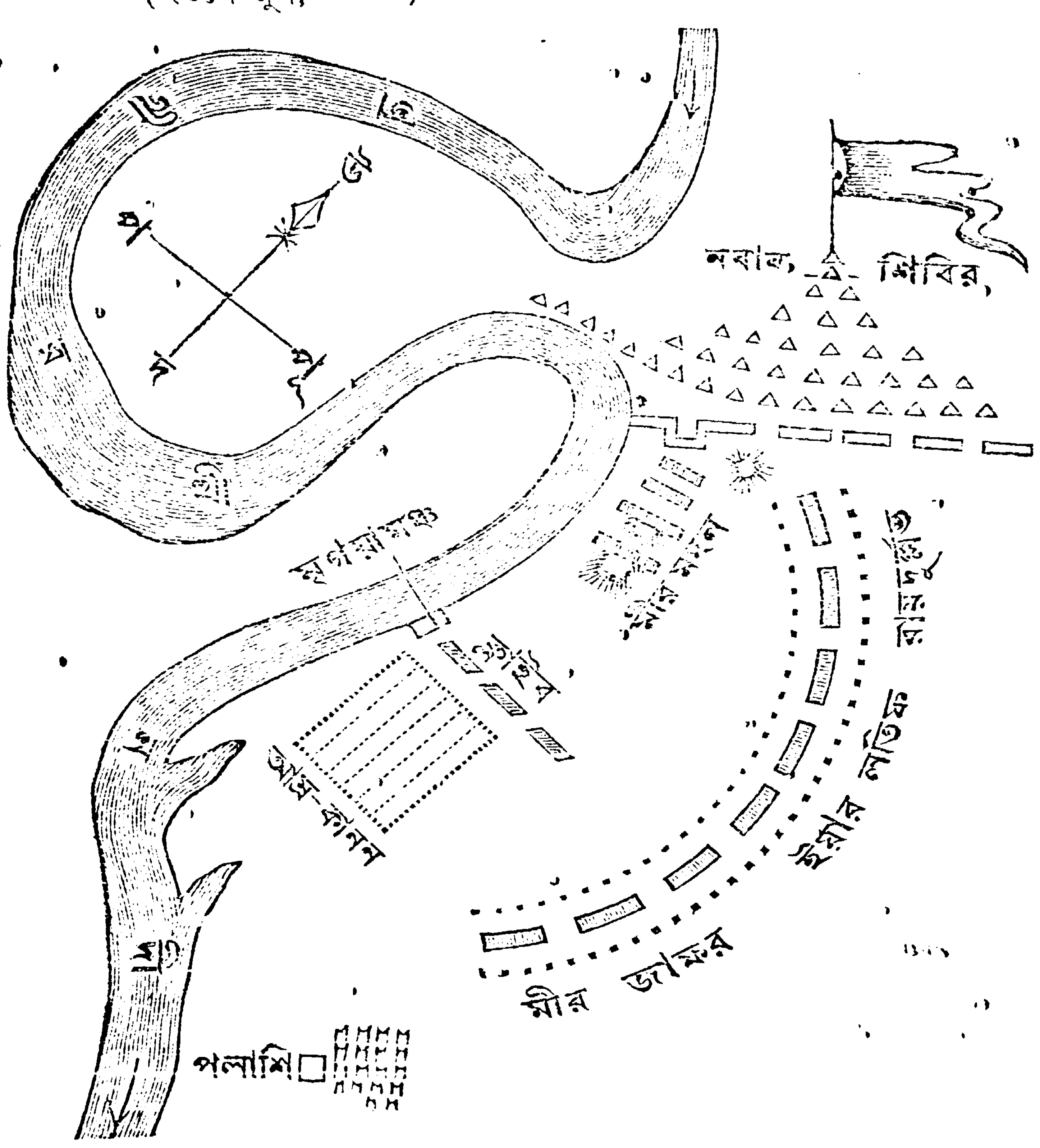

* Treaties, Engagements and Sununds, vol. i. 10.

† Clive's Evidence,—First Report, 1772.

গন্ধরাজ।

(স্থান, বিডন্ গার্ডেন্—সময়, মধ্যাহ্ন—
টগর ও গন্ধরাজ বার্ত্তালাপে মগ্ন। গাছের আড়ালে কবি গুপ্তভাবে দণ্ডায়।

টগর। (ঈষৎ হাসিয়া)

সুধাই সুধাই করি, সুধাইতে নারি।
সারানিশি সহবাস পতঙ্গের সাথে,
দিবসেতে আনাগোনা নর-নারীদের,
নাহি অবসর সখি কহিবারে কথা।
আজি যেন ভাগ্যদেব, কি কুহকে ভুলি,
(হয়ে যেন অ্যান্‌মনা) আমাদেরি দিকে !
তাই সখি পেয়ে সাড়া চল সমীরের,
দিয়ে ভর লঘু লঘু পক্ষোপরি তার,
শাখা সহ ছুলিতেছি তোমারি দুয়ারে।
বড় সাধ পূরাই এ চিত্তের বাসনা ;
কথা কও, চেয়ে দেখ—

গন্ধরাজ।

আয়, আয় সখি ;—
একি দেখি ? এখানেও সেই ভাব তোর ?
ত্রিদিবেতে আপ্ত-হারা ব'লে তোর খ্যাতি—
কচি কচি দেববালা যায় রে যেমতি
তোর পাশে, নিরখিতে ও চারু মূরতি,
তুষিতে তাদের মন ঢালিস্ অমনি
প্রাণের ভাণ্ডার তোর, সৌরভের ডালা ;
পলকে ফকির তুই আপনা পাশরি !
সে লাগি বাসন্তী দেবী, আমাদের রাণী,
কত শাসাতেন তোরে—সুন্দর ভ্রূকুটি
যেত মিলাইয়া, তোর হাসি নিরখিয়া।
এখানেও সেই ভাব কেন প্রিয় সখি ?
ও সুগন্ধ-দেহবাস কে লইল হরি ?

টগর।

জান'ত জান'ত সখি কত প্রণপাশে
বদ্ধ মোরা শ্যামাঙ্গিনী যামিনীর কাছে ;
ফুলকুল-ধাত্রী সখি যামিনী সুন্দরা !
সাঁজের শৈশবে মোরা ছিনু ক্ষুদ্র কলি,
মুখ টিপে টিপে হাসি প্রহরেক যেতে,
বাড়ি মোরা তিল তিল যামিনী-সোহাগে !
না হাসিলে—দূত তার নৈশ সমীরণ
দেয় কত কাতু কুতু !—সে রসে ঢলিয়া
ফুল্ল দেহ হয় আরো লাবণ্য লভিয়া !
যামিনীর শীলতায় লাজেতে কুণ্ঠিত
হয় যদি দলদাম—যামিনী-প্রেরিত
রসিক পতঙ্গ কত, দলে দলে আসি,
মুখ চুমি, হাসায় লো নায়িকার হাসি !
এইরূপে নিশি-শেষ হ'তে না হইতে,
সুখের যৌবন-বাসে হইয়ে ভূষিতা,
মৃদু মৃদু দুলি মোরা প্রভাত-সমীরে !
সকলি'ত যামিনীর প্রসাদের গুণে—
তাই সখি বুক পুরি, বুক খালি করি,
অরপি সৌরভ-ডালা যামিনী-চরণে !

গন্ধরাজ।

অন্ধ-মানবের কিন্তু এমনি বিশ্বাস,
ভাবে তোরে গন্ধহারা!—জানে না তাহারা
রবহীন গর্ব্বহীন ফকিরের ধারা !

টগর।

ভাল কথা এল মনে, সুধাইতে যাহা
বায়ু-পিঠে আরোহিয়া এসেছি এখানে।
"গন্ধময়ী" নাম তোর স্বরগে প্রথিত ;—
কোন্ অপরাধে সখি ফুলকুলরাণী
দিলা শাপ, যাহে তুই কুনাম লভিলি
কঠোর পুরুষ-নাম ? দেবতার মন
মরতে পাঠায়ে দিয়ে, স্বর্গচ্যুত করি,
নহে কিরে পরিতুষ্ট ?

গন্ধরাজ।

তুষার-ধবল
আমার এ দেহ—তবু ভাবিলে ও কথা
(মধ্যাহ্নেতে নিরিবিলি লোকের নিভৃতি,
যখনি একেলা হই তখনি'ত ভাবি)
সর্ব্বাঙ্গে অনল জ্বলে ভাবিলে ও কথা !

টগর।

বিধির বিধানে সখি, দেবী বসুধার
হইল করিতে হায় ষড়ঋতু সেবা।
কাঁদিয়া পড়িলা দেবী বিধাতা-চরণে।
কহিলা "কি দিয়া দাসী তুষিবে মানস
বসন্তের ? ফুলধনু, ফুল-সখা তিনি !
ফুলরত্ন অধীনীর নাহি গো ভাণ্ডারে ;
নারীর ধরম দেব পতি-মন-রাখা ;
কি দিয়ে তুষিব মন ? ফুল-প্রিয় তিনি"।
ধরার সুখের তরে, বিধির শাসনে,
আইনু হেথায় সবে ফুলবালা মোরা।
অশোক বকুল আদি কত ফুলবালা
আসিতে গো চাহিল না ; হইল তাদের
তোরি মত স্বজনি লো কতই লাঞ্ছনা !
বহাস্ নে, প্রিয়সখি শোক-অশ্রু-লোর,
সহানুভূতির লোক আছে কত তোর !

গন্ধরাজ।

শুনিবারে সাধ যদি এতই স্বজনি,
শোন্ তবে কহি তোরে সে দুঃখ-কাহিনী।
আমাদের ফুলরাণী বাসন্তী সুন্দরী
গিয়াছিলা একদিন বৈজয়ন্ত-ধামে।
দৈব যোগে সেই দিন বসন্ত-উৎসব
গোলকেতে ; বাসন্তীর পেয়ে দরশন,
আবেগ-উচ্ছ্বাসে রমা বক্ষমাঝে ধরি,
তুষি অতিথির মন স্বাগত-সম্ভাষে
কহিলেন কতই কি মধুময় কথা !
বসন্তে লতিকা যেন কুসুম-উদ্গমে
কতই কতই সুখী ; বাসন্ত কোকিল,
কষায়িত কলকণ্ঠে, বিহ্বল পুলকে,
পঞ্চমে ঝঙ্কারে যেন অমৃত লভিয়া !
শরৎ ঋতুর যেন পূরণিমা রাতে,
সোণার সলিলে স্নাত তরঙ্গিণী হিয়া,
কুলুস্বরে গাহি উঠে নাচিয়া নাচিয়া !
ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়া পড়িল গোলকে।
হাসিয়া কহিলা লক্ষ্মী "বড় পুণ্য-ফলে
আমার, পাইনু দেখা তোর লো স্বজনি ;
সাজা লো রঙ্গিণী আজি এ বরাঙ্গ মোর,
কুসুম-ভাণ্ডারে তোর আছে যে রতন,
সাজালো বাসন্তি আজি সে সব রতনে।
ভুবনমোহিনী সাজি, নব-রঙ্গে মাতি,
ভেটিব নিশীথে আজি মদনমোহনে !
কুসুম-পরাগরেণু অধরেতে মাখা,
সুরভি নিশ্বাসে মরি আকুলি সে পুরি,
কহিলা বসন্ত-রাণী, ঈষৎ হাসিয়া—
"সে কি কথা ইন্দিরা গো? তোমার সেবিকা
এ কিঙ্করী—সাজাইব, সেবা কোন্ কথা ?
আপনি মদন হেথা ঋতুপতি সাথে
ভ্রমেন হরষে নিত্য ; বিভব-ঈশ্বরি,
কিসের অভাব তব, কিসের বাসনা ?
তবে যে আমারে দেবি কর অনুমতি,
অমিয়া-প্রসাদ তাহা সেবিকার তরে।
এত বলি পুষ্পরাণী, লোহিত-অধরে
আধো বিস্ফুরিত করি ভাবনা-আবেশে,
স্মরিলেন ত্রিলোকের ফুলবালা দলে !

টগর।

তখন লুলিত ছিল অলির আঘাতে
এ তনু, তাই গো দেবি করুণা করিয়া
নাহি স্মরিলেন মোরে।

গন্ধরাজ।

যত ফুলবালা
আসি উপনীত হ'ল, আকুল-কুন্তলা।
রোষে কষায়িত-আঁখি, লোহিত কপোলে,
সুধাইলা ফুলরাণী "গন্ধময়ী কোথা" ?
কর্ণলোল ছিল তথা পাগল ভ্রমরা ;
বিশ্বাস-ঘাতক সব কহে দিল তাঁরে।
অমনি বাসন্তী দেবী শাপ দিলা মোরে—
"এত পুরুষের বশ ! লাজহীন ফুল,
আজি হ'তে হলি তুই দেব-আঁখি-শূল।
কঠোর পুরুষ প্রিয় গন্ধরাজ নামে,
থাক্ গিয়া স্বৈরিণি লো নীচ ধরাধামে"।

টগর।

ভাল লো বুকের পাটা তোর গন্ধময়ি !
কোন্ রঙ্গরসে তুই আছিলি লো ভোর ?
সুখের স্বপনে কোন্ ?

গন্ধরাজ।

সোণার স্বপন !
খেদমাত্র কেন সখি হ'ল জাগরণ !
মূর্ত্তিমতী ফুলবালা-মূরতি ধরিয়ে,

হাসিতেছিলাম আহা আধো মুচকিয়ে !
বাতাসে দোদুল্ দোলে অলকের হার,
অলসে বুকের বাস হয় অপসার।
লাজ হয় কহিবারে, দেব একজন
সাদরে এ মুখ মম করিলা চুম্বন !
শিহরি উঠিল দেহ, গায়ে দিল কাঁটা,
অধীর বাসনা সখি হইল প্রবল,
ভাসিল শিশির-স্বেদে কপোল যুগল,
খুলিল লাজের দ্বার, মুখের ঘোমটা !

টগর।
কে আসিছে ? চুপ্ চুপ্ !
গন্ধরাজ।
বঙ্গ কবি বুঝি !—
অদ্ভুত ভাবের ঘোরে আঁখি জড়াইয়ে,
ভ্রমিতেছে ইতি উতি আলাভোলা হয়ে,
জলদে রৌদ্রের বিভা, কি মধুর রূপ !
টগর।
আবার হইবে দেখা; ওই এল — চুপ !

পৌষ বাঁউড়ী।

(পল্লীচিত্র।)

পৌষ মাসকে পল্লীরমণীগণ 'লক্ষ্মী মাস' বলিয়া মনে করেন। কোন রমণীই পৌষ মাসে স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে কিম্বা পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে গমন করেন না। এমন কি কোন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া গৃহে আসিলেও তাহাকে পৌষ মাসে বিদায় দেওয়া দোষের কথা। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলে পৌষ মাসের প্রতি এই অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের একটি ন্যায্য কারণ এই দেখা যায় যে, এই সময়ে ধান কাটামাড়া আরম্ভ হয় ; প্রত্যেক গৃহস্থের খামারে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে সুপক্ক ধান্য-শীর্ষ স্তূপাকারে পালা দেওয়া রহিয়াছে ; কৃষাণগণ দশ বারোটা বলদ লইয়া হুকা টানিতে টানিতে সেই রজ্জুবদ্ধ বলদশ্রেণীর লেজ মলিতে মলিতে তাহাদিগকে ধানের পালার উপর ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, পিঠে পাচনের বাড়ি মারিতেছে, কেহ 'কাঁদাল' দিয়া ধানের আটি উল্‌টাইয়া দিতেছে, কেহ কুলায় করিয়া ধান ছড়াইয়া তাহার চিটা ও ধূলামাটি উড়াইয়া দিতেছে ; ফকির বৈষ্ণবেরা গোপীযন্ত্র ও মন্দিরা বাজাইয়া কৃষাণদের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক দুই এক পাথি ধান ভিক্ষা লইয়া যাইতেছে, মাথা তামাক বিক্রেতাগণ খোলায় খোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ছুছিলিম তামাক দিয়া আধসের ধান উপার্জ্জন করিতেছে। চারিদিকেই একটি সজীবতার হিল্লোল সুপ্রকাশিত, যেন দেবী কমলা তাঁহার কমলাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধান্যের আড়ি কক্ষে লইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। পৌষ মাসের শেষ দিন এই কঠোর পরিশ্রমের দৃশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেদিন সাধারণ শ্রমজীবীগণ আমোদ আহ্লাদেই সময় অতিবাহিত করে।

৩০ এ পৌষ রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, জেলে, বাগ্‌দি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীগণের ছেলেরা তাহাদের আনকোরা ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হয়। এ তাহাদের সখের ভিক্ষা; প্রত্যেক দলে একজন এক একটা করিয়া ধামা লইয়া চলিয়াছে, আর দলস্থ অবশিষ্ট সকলের হাতে এক একগাছি কোঞ্চি, এই কোঞ্চি বহুসংখ্যক সুপক্ক লাল লঙ্কামরিচে পরিপূর্ণ, সূতা দিয়া সেগুলি কোঞ্চির সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক দল এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিতেছে ঃ—

"হরিবোল হরিবোল,
সোনারায়ের ভার এল বাড়ীর ভিতর,
বল ভাই শিশে,
এক কাঠা চাল নটাবড়ি নিসে।"

সুর করিয়া এই ছড়া বলিয়া তাহারা ভিক্ষা আদায় করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, ছড়ার ভাষায় তাহারা সরলা গৃহস্থ মহিলাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেও বিরত হইতেছে না। তাহারা কোমল শিশু-স্বরে অসঙ্কোচে দৈববাণী করিয়া যাইতেছে যে, যাহারা তাহাদিগকে ছালা বোঝাই করিয়া চাউল দিবে তাহাদিগের ভাগ্যে সাত গোলা ধান ফলিবে, যাহারা বাটা বাটা দিবে তাহাদিগের 'সাত বেটা' হইবে, যাহারা বাটি বাটি দিবে তাহাদের 'সাত বেটি' জন্মিবে, কিন্তু যাহারা মুঠো মুঠো দিবে তাহাদিগের হাত 'ঠুঁঠো' হইয়া যাইবে। শুনিয়া রমণীগণ হাসিয়া তাহাদিগকে মুঠো মুঠো চাউল দিয়াই বিদায় করেন। কেহ বলেন "সাত বেটি হওয়ার চেয়ে হাত ঠুঁঠো হওয়া ঢের ভাল, বেয়ান মাগির মন ত কিছুতে পাওয়া যায়ই না, তা ছাড়া জামাইগুলির কেহ মদ, কেহ গাঁজা কেহবা গুলিতে ভোর হইয়া সমস্ত জীবনটা ভাজা ভাজা করিয়া মারে, হাত ঠুঁঠো হইলে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"—ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে যখন এই ছড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালীর ঘরে ছেলে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হয় নাই এবং সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মেয়ে পার করিতে হইত না—তাই এই দিন সেকালের কথা মনে করিয়া অনেক কন্যাগ্রস্তা রমণীকে সেই "সোণার সেকালের" জন্য আক্ষেপ করিতে শুনা যায়।

সকালে এইরূপ ছেলেরা এক পত্তন ভিক্ষা লইয়া চলিয়া যায়। বেলা বেশী হইলে আবার মুসলমানশ্রমজীবীগণ টুপি মাথায় দিয়া, গলায় রুমাল বাঁধিয়া জারী ও মাণিকপীরের গান গাহিতে গাহিতে কাঠাহস্তে দলেদলে গৃহস্থবাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং প্রতি বাড়ীতেই পূর্ব্বোক্ত মত ভিক্ষা পাইয়া কাঠাপূর্ণ করিয়া ফেলে। ইহারা শুধু চাউল লইয়াই ক্ষান্ত হয় না; চাউল, ডাল, বড়ি, বেগুণ প্রভৃতি তরকারীর জন্যও আবদার করিয়া থাকে ; কোন কোন গৃহস্থ দয়াপরবশ হইয়া দুই একটি আধলা বা পয়সাও ভিক্ষা দেয়। পৌষ মাসের শেষদিন সর্ব্বসাধারণের 'তিলুয়া' খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ; যে কিছু পয়সা সংগ্রহ হয় তাহা দিয়া ইহারা ময়রা দোকান হইতে 'তিলুয়া' কিনিয়া লইয়া যায়। সমস্ত দিন ভিক্ষার পর অপরাহ্নে স্নান করিয়া ইহাদের বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন মাঠে পোষলা করিতে যায়, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহানন্দে বনভোজন সমাপ্ত করে।

আজ সকালে অনেকেই গুড়ের 'বাইনে' আসিয়া ধন্না দিয়াছে। পৌষ বাঁউড়ী উপলক্ষে

সকল বাড়ীতেই পিঠে পুলি আঁদাসার আয়োজন হয়—গুড়ই ইহার প্রধান উপকরণ, সুতরাং আজ সকলেরই চেষ্টা খানিকটে টাটকা খেজুরে গুড় সংগ্রহ করিতে পারে। পল্লী অঞ্চলে খেজুর গাছের অভাব নাই, এ সময় গোয়ালা বাগ্দি কিম্বা কৈবর্ত্তেরা চারি পাঁচজনে একত্র হইয়া, কখন কখন ছু তিন ভাই একত্রে শীতকালের কয়েকমাস শুধু খেজুরে গুড়েরই কারবার করে। খেজুর গাছ বাঁধা হইতে রস জ্বাল দিয়া গুড় করা পর্য্যন্ত সকল কাজই নিজে করিয়া থাকে, সুতরাং এই ব্যবসায়ে তাহাদের বেশ লাভ হয়। যেখানে রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা হয়, সে জায়গাটাকে 'বাইন' বলে। একটা বড় তেঁতুলগাছ তলায়, কিম্বা বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে বড় বড় উনান কাটিয়া প্রকাণ্ড এক একটা মাটির পোড়ান 'খোলা'তে রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে, 'বাইনের' চারিদিকে শুষ্ক খর্জ্জুর পত্রের টাটি, আঙ্গিনাখানি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, তাহার একপাশে কতকগুলা ভাঁট, আশ্শেওড়া কালকাসিন্দার শুষ্ক বন পালা দেওয়া রহিয়াছে। গুড়জ্বাল দিবার জন্য গাছিরা জঙ্গল হইতে সেগুলি কাটিয়া আনিয়া রাখিয়াছে। গাছ বাঁধা ঠিলিগুলি চারিদিকে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, মলিন মোটা মার্কিনের অপ্রশস্ত 'চাদর গায়ে জড়াইয়া গাছিরা একহাতে উননে জঙ্গল ঠেলিয়া দিতেছে, আর একহাতে ডাবা হুকা ধরিয়া গাঁজার কিঞ্চিৎ মোলায়েম সংস্করণ দাক্মটা ঘরেমাখা তামাকে টান দিতেছে, চট্ পট্ করিয়া উননে আগুনের শব্দ হইতেছে, কলকল করিয়া রস ফুটিয়া উঠিতেছে, আর এক একবার তাহারা 'ওড়ং' দিয়া রসের গাদ কাটিয়া নিকটবর্ত্তী একটা ঠিলির মধ্যে ফেলিতেছে এবং নানারকম গল্প করিতেছে। গল্পের অধিকাংশই গুড় সম্বন্ধীয়, কাহার পিতা ও পিতামহ গুড়ের কারবার করিয়া হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিল, কে কবে খেজুর গাছে উঠিতে গিয়া পা ফসকাইয়া পড়িয়া 'জন্মের ভাত' খাইয়াছিল, শেষরাত্রে ঠিলি খুলিতে গিয়া কে কতবার বাঘের হাতে পড়িয়াছে, এবং বাঁকের বাড়ি মারিয়া কে কতদিন সন্ধ্যেবেলা রসলিপ্সু ঠিলিচোরের রসপিপাসা আরাম করিয়া দিয়াছে, ওজস্বিনী ভাষায় সেই সকল গল্প চলিতেছে, আর পাড়াপ্রতিবেশী গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, মালো, চাঁড়াল, বাইতিদের ছেলেরা চারিদিকে বসিয়া অত্যন্ত তৃপ্তমনে সেই সকল গল্প শুনিয়া যাইতেছে, এক একবার তাহারা হাসিয়া অস্থির হইতেছে, এক একবার ভয়ে তাহাদের বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

বেলা প্রায় দশটার সময় গুড়জ্বাল দেওয়া শেষ হইয়া গেল। একটা খোলার গুড় 'সরাগুড়' বা 'গুড়মুচি' করিবার জন্য তাহাতে বীজ মিশাইয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত সাদা ও ঘন করিয়া তোলা হইল। তাহার পর বিশ পঁচিশটা ঠিলি দুই সারি করিয়া সাজাইয়া লম্বা দুখানা কাপড় দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিয়া সেই কাপড়ের উপর ঠিলির মুখে অল্প পরিমাণে গুড় ঢালিয়া 'সরাগুড়' প্রস্তুত করিল। পল্লীরমণীগণ ঘাটে যাইতে যাইতে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া 'বাইনে' উপস্থিত হয় এবং কুটুম্ববাড়ী পাঠাইবার জন্য পুরু দেখিয়া 'সরাগুড়' পছন্দ করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

'সরাগুড়' প্রস্তুত হইয়া ডালায় উঠিলে সমবেত চাষার ছেলেরা কেহ কচুর, কেহ কলার, কেহবা কাঁঠালের পাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া খোলার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তখন গাছিরা তাহাদের পাতায় একটু একটু গুড় উপহার দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল—তাহারা সেই সদ্যোজাত গুড়টুকু আস্বাদন করিতে করিতে বাইন ত্যাগ করিল। পল্লীবাসীগণ যাহার যতটুকু গুড়ের দরকার তাহা লইয়া চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে 'বাইন' জনশূন্য হইয়া পড়িল, শুধু ঠিলিগুলো প্রকাণ্ড উননের উপর স্তূপাকারে অধোমুখে পড়িয়া উত্তাপ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন কাল হইতেই রমণীগণের মধ্যে পৌষবাঁউড়ীর আয়োজন পড়িয়া যায়; বিধবাগণ স্নান করিয়া আসিয়া কেহ গ্রাম্যবিগ্রহের মন্দিরে, কেহ কালীবাড়িতে এক আধ পোয়া যাহার যাহা সাধ্য তিলুয়া পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর সকলে গামলাতে আতব চাউল ভিজাইয়া 'আতাল' পাতে। চাউল অল্প ভিজিলে তাহা ছাঁকিয়া কুটিবার জন্য ঢেঁকিঘরে লইয়া যাওয়া হয়। প্রথমে ঢেঁকির 'নোটের' কাছে সেই চাউল সাতবার ছড়াইয়া দিয়া তবে ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করে, ইহাকেই 'আতাল' পাতা বলে। ত্রিশে পৌষ মধ্যাহ্ন কালে সকল বাড়ী হইতেই ঢেঁকির শব্দ উঠিয়া গ্রামখানিকে অত্যন্ত মুখর করিয়া তোলে; এই দিন গ্রাম্য বাজারে অসংখ্য মাটির সরা ও মুচি বিক্রয় হইতে আসে, পিঠে ভাজিবার জন্য সকলেই আগ্রহ সহকারে এক এক জোড় 'সরামুচি' কিনিয়া লইয়া যায়।

দুপুরের সময় কোন বাড়ীতেই প্রায় ভাতের আয়োজন নাই, যাহাদের বাড়ীতে দুবেলা গরম ভাত নহিলে চলে না, ছেলেপিলে রোগা এবং কর্ত্তাটি গরম গরম ভাত ও খয়রা মাছের ঝোল ভিন্ন আর কিছুই পরিপাক করিতে পারেন না, তাহাদের বাড়ীতেই শুধু এবেলা ভাত রান্না হয়। অনেক বাড়ীতেই আজ ছেলেমেয়েদের জন্য 'তিলজাউ' হইতেছে; তিলজাউ জিনিষটির সহিত সহরাঞ্চলে, লোকের পরিচয় নাই বলিয়াই অনুমান হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে "পরমান্ন" বা পায়সের নীচেই তিলজাউর আসন। তিলজাউ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পল্লীঅঞ্চলে গৃহস্থরমণীগণের মধ্যে তাহার একটা গল্প আছে, গল্পটাতে কিছু নৈপুণ্য কিম্বা পারিপাট্য না থাকিলেও পল্লী অঞ্চলের সাধারণ গল্প হিসাবে ইহার যে মূল্য আছে, তাহারই অনুরোধে আমরা ইহার এখানে উল্লেখ করিতেছি; ভরসা করি সহৃদয় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

একবার এক জামাই অনেক দিন পরে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রী আনিতে গিয়াছিল। স্ত্রীটি কিছু সম্পন্ন লোকের কন্যা; শাশুড়ী বহুদিন পরে জামাতাকে পাইয়া তাহাকে 'আদরে গোবরে' খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি দিন পরে একদিন অতি যত্নে 'তিলজাউ' রাঁধা হইল, জামাইটির এক 'শালাজ' পরিবেশন করিতে আসিলেন, অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত যথারীতি দেওয়ার পর শালাজ হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আজ তোমার জন্যে 'তিলজাউ' রাঁধা হয়েছে, কি রকম হয়েছে দেখ দেখি।"—ঠাকুরজামাইয়ের উদর তখন ঘৃতপক্ক বহুবিধ

সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মৎস্যাদিতে পূর্ণপ্রায়, অতএব জামাতৃসুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী না হইলেও সে উত্তর করিল "না পেট ভরিয়া গিয়াছে, আর 'তিলজাউ'র আবশ্যক নাই, ও ত রোজই বাড়ীতে খাওয়া যায়।"—জামাই বাবাজীর বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না, সে প্রত্যহ বাড়ীতে 'তিলজাউ' খায় শুনিয়া—সে যে কেমন 'তিলজাউ'তে অভ্যস্ত তাহা বুদ্ধিমতী শালাজ ঠাকুরাণী অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তিনি বলিলেন 'তা হোক না, বাড়ীতে রোজ খাও ব'লে কি আর এখানে খেতে নাই, একটু দিই।"—এই বলিয়া তিনি তাহার পাতে দিতে গেলেন, কিন্তু জামাই কিছুতেই লইবে না, এক টোপ পাতে পড়িবামাত্র তাঁহাকে হাতাসমেত ফেরত লইতে হইল। জামাই দৈবাৎ সেইটুকু মুখে দিয়াই বুঝিতে পারিল বাড়ীর তিলজাউ ও শ্বশুরবাড়ীর এই তিলজাউর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ, সে ইচ্ছা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে আর চাহিয়া লইতে পারে না, অথচ তাহার মধুর আস্বাদনও অপরিহার্য্য। একালের জামাই হইলে না হয় বলিত "তুমি কষ্ট করিয়া তিলজাউ রাঁধিয়াছ আমার না লওয়াটা বড়ই অন্যায় হইতেছে, আচ্ছা, খানিকটে দিয়া যাও"—কিন্তু সেকেলে বোকা পাড়াগেঁয়ে জামাই, বুদ্ধি তত প্রখর নহে, শুধু গুরুমহাশয়ের তামাক সাজিয়া ও তাঁহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া যা' কিছু বিদ্যা হইয়াছে, কাজেই কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে এতই লোভ সঞ্চার হইল যে সে ঠিক করিল রাত্রে রান্নাঘরের হাঁড়ি হইতে খানিক তিলজাউ চুরী করিয়া খাইবে। তিলজাউ জিনিষটি এক রকম গ্রাম্য পোলাও, শীতকালেরই একান্ত উপযোগী, কিন্তু অন্যান্য প্রভেদ ভিন্ন পোলাওয়ের সঙ্গে ইহার একটা প্রধান পার্থক্য এই যে পোলাও গরম গরম ভাল, আর তিলজাউ একদিন হাঁড়িতে বাসি করিয়া রাখিয়া পরদিন স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া খাইলে তবে ইহার রস সম্যক অনুভব করিতে পারা যায়। তাই রাত্রে রান্নাঘরে হাঁড়ি বোঝাই তিলজাউ পরের দিনের জন্য সঞ্চিত থাকিল। জামাই বাবাজী অনেক রাত্রে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষের বাহিরে আসিল, এবং রান্নাঘরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্ধকারের মধ্যেই 'হাতড়াইয়া' তিল জাউর হাঁড়ি আবিষ্কার করিয়া সড়াসড় খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার একটি সম্বন্ধী সেই সময় হঠাৎ বাহিরে আসিয়াছিল; এত রাত্রে দ্বার খুলিয়া কে চুপি চুপি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল!—এ নিশ্চয়ই চোর। সম্বন্ধী মহা সোর গোল আরম্ভ করিয়া দিল, বিপদ বুঝিয়া জামাইবাবাজী দু থাবা তিলজাউ হাতে লইয়াই রান্নাঘরের খিড়কী দ্বার খুলিয়া চম্পট দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, সম্বন্ধীদের হাতে দুই চারি ঘা' উত্তম মধ্যম খাইয়া তিলজাউ এবং তদপেক্ষা সুমিষ্ট বাঁশের লাঠি হজম করিতে করিতে রাতারাতি শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

স্থূলবুদ্ধি গ্রাম্যজামাই-বাবাজীর পরিণাম দেখিয়া বোধ হয় আমাদের কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি নাগরিক বন্ধুই এরূপ বিপদসঙ্কুল তিলজাউর প্রতি লোভ প্রকাশ করিবেন না, কিন্তু এখানে একথাও বলা অসঙ্গত নহে যে খাদ্যহিসাবে তিলজাউর কোনই শ্রেষ্ঠতা নাই, বিশেষতঃ

অল্পাহারী, ভোজনবিলাসী নাগরিক ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা একান্ত গুরুপাক, এবং ইহা অসঙ্কোচেও তাঁহাদের পাতে দেওয়া যায় না; কারণ চাউল, দুগ্ধ, ভাজা তিলের গুঁড়া ও খেজুরে গুড়ের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু শিল্প এবং আস্বাদন হিসাবে ইহার প্রাধান্য না থাকিলেও ইহার সহিত মাতৃহৃদয়ের যে অকৃত্রিম স্নেহরস, যত্ন ও আগ্রহ মিশ্রিত থাকে তাহা এবং ইহার স্বাদগ্রহণের জন্য পল্লীবালকবালিকাগণের দীর্ঘকালের উমেদারী ও আশাপূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় শিশুহৃদয়ের সরল আনন্দোচ্ছ্বাস, সর্ব্বোপরি মধুর পৌষপার্ব্বণের একটি সুখকর স্নিগ্ধস্মৃতি এই খাদ্যটিকে অত্যন্ত মুখরোচক এবং সুখকর করিয়া তোলে।

কিন্তু সকল বাড়ীতেই তিলজাউ না হইলেও সকল গৃহস্থবধূই, আজ মধ্যাহ্নে মুঠে ও সিদ্ধপুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; ভিজে চাউলের গুঁড়াগুলি গরমজলে ভিজাইয়া তাহা গোল করিয়া দলা বাঁধিয়া জলে সিদ্ধ করিলেই মুঠে প্রস্তুত হয়; অনেকে চাউল গুঁড়ার পুলি তৈয়েরী করিয়া তাহার মধ্যে নারিকেল ছাঁই বা ক্ষীর পুরিয়া মুঠের সঙ্গে সিদ্ধ করিতেছে। ইহাতে বেশী খরচ নাই; অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মুঠে ও সিদ্ধ পুলি জলে সিদ্ধ না করিয়া দুধে সিদ্ধ করিয়া রসে ডুবাইয়া রাখে, যাহারা রসের যোগাড় করিতে না পারে, তাহারা গুড় দিয়াই রসের অভাব পূর্ণ করে।

অপরাহ্নকালে প্রত্যেক বাড়ীতেই হুলাহুলি পড়িয়া যায়, চারিদিকেই আনন্দ, উৎসাহ, কলরব, সমস্ত পল্লী সজীব হইয়া উঠে। বালিকা ও যুবতাগণ ঝিকি মিকি বেলা থাকিতে নদীতে গা ধুইয়া কলসীকাঁকে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রাম্যপথ দিয়া বাড়ী আসিতেছে, তাহার পর বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ঘরে দ্বারে আলিপনা দিতে বসিয়া গিয়াছে। আজ তুলসীতলা আলিপনা দিবার প্রধান স্থান। সকালে তুলসীতলাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিকনো হইয়াছিল, এখন সেখানে আলিপনার কতরকম চিত্র বিচিত্র ছবি অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঘর, বাড়ী, গোয়াল, গোলাবাড়ী, ঢেঁকিঘর, পুকুর, হাঁস, পদ্মফুল, মাছ, বুড়োবুড়ি; গোলাবাড়ীতে সারি সারি গোলা, গোয়ালে সারি সারি গরু; এই সকল আঁকাইয়া কল্পিত গোলাগুলিতে ছোলা, মটর, ধান, গম প্রভৃতি নানারকম শস্য অল্প অল্প রাখিয়া পোয়াল দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসে। ছোট ছোট মেয়েরা গোবরের নুড়ি তৈয়েরী করিয়া তাহাদের মাথায় সিন্দূর লাগাইয়া তাহাতে দুই তিন গাছা করিয়া দুর্ব্বাঘাস বসাইয়া বারকস সাজাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেয়। তাহার পর রান্নাঘরে পিঠে পুলি প্রস্তুত দেখিবার জন্য মা, দিদিমা, কাকিমাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হয়।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থগণের বাড়ীতে আজ মুগের ডালের পুলি, চিঁড়ার পুলি, আলুর পুলি প্রভৃতি নানারকমের পুলি, আঁদোশা, গকুল পিঠে, সরুচুকোলি প্রভৃতি পৌষপার্ব্বণের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু দিনের বেলা যেমন মুঠে ও সিদ্ধ পুলি সর্ব্বসাধারণ গৃহস্থের অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পিঠে প্রত্যেক গৃহস্থের সেইরূপ রাত্রের আয়োজন।

রমণীগণ উননের সম্মুখে মৃৎপ্রদীপের নিকটে বসিয়া পিঠে ভাজিতেছেন, দিনের বেলা বাজার হইতে যে 'সরামুচি' আনান হইয়াছে, তাহারই সরাখানি উননের উপর রাখিয়া বোঁটাসমেত একটা বেগুনের পশ্চাতের অংশ তৈলপাত্রে ডুবাইয়া তাহা দিয়া মধ্যে মধ্যে সরায় তেলের 'পোঁচড়া' দেওয়া হইতেছে, আর একটা বাটিতে করিয়া ঘন চাউলের গোলা তুলিয়া সরায় ঢালিয়া খুরি দিয়া ঢাকিয়া দিতেছে, 'ছ্যাঁকছুঁক' করিয়া শব্দ হইতেছে, আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দে মাথা নাড়িয়া দুই হাতে তালি দিয়া বলিতেছে "উননে পিঠে দোলে, কাণ্টায় শিয়াল ফোলে।"

পিঠে গড়ান শেষ হইলে একখানি পিঠে আস্তাকুড়ে শৃগালের জন্য ফেলিয়া রাখা হইল, আর একখানি উননের পাড়ে অগ্নিদেবের জন্য সরা সমেত রক্ষিত হইল। ছেলে মেয়েরা সানন্দ মনে দুধগুড় দিয়া পিঠে খাইতে লাগিল। রমণীগণ ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যপূর্ণ হাঁড়ি, কলসী, খোলা, হুঁড়ি, ঝাঁঝুরি প্রভৃতিতে 'বাঁউড়ি' বাঁধিতে লাগিল। অল্প পরিমাণে পোয়াল লইয়া হাঁড়ি কলসীগুলিকে বেষ্টন করিয়া রাখাকে 'বাঁউড়ি' বাঁধা বলে, গৃহস্থ রমণীদের পক্ষে ইহা একটা ভারি লক্ষণের কাজ। 'বাঁউড়ি' বাঁধিবার উদ্দেশ্য কি ঠিক বলা যায় না, তবে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের মতে পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস, আজ পৌষমাসের শেষ দিন, এইরূপে পোয়াল বাঁধিয়া লক্ষ্মীকে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে যে সিন্দুর চর্চ্চিত দুর্ব্বাদলমুকুটিত গোবরের নুড়ির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি ও কতকগুলি চাউলের গুঁড়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া আহারাদির পর সকলে শয়ন করিতে যায়।

কিন্তু রাত্রি তিনটার পূর্ব্বেই আবার পল্লীরমণীগণ জাগিয়া উঠেন। পৌষের অবসান দিনে এই দুরন্ত শীতে রমণীগণ, এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত গায়ে কাপড় জড়াইয়া পৌষ আগলাইতে আরম্ভ করে। প্রথমে একজন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকছটা ফুটিয়া উঠে, দুই একটি কোমল কণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত পল্লীতে একটি পরিবারও সুপ্ত থাকে না। একজন প্রদীপ লইয়া আগে আগে চলিয়াছে, তাহার পশ্চাতে একজন বাড়ীর ভিতরে উঠানে, বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে অল্প অল্প চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছে। অন্য একজন পূর্ব্বোক্ত গোবরের নুড়ি চাউল গুঁড়ার উপর বসাইয়া দিতেছে, আর সকলে সমস্বরে বলিতেছে :—

"এস পৌষ যেয়োনা,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেয়োনা।"

অল্পক্ষণ পরেই পাশের বাড়ী হইতে শব্দ উঠিল,

"লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেয়োনা,
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেয়োনা।"

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্রকুটীর পূর্ণ, আম্রকানন ও বাঁশবন পরিবেষ্টিত

নৈশ অন্ধকারমগ্ন পল্লীখানি বামাকণ্ঠের মধুর গুঞ্জনে সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গ-নীড়ের ন্যায় শব্দ-সমাকুল হইয়া উঠিল। পৌষমাস তাহার সমস্ত আনন্দ, সুখ এবং উপভোগের মধুর স্মৃতি লইয়া তাহার অবসানের এই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রমণীগণের কৃতজ্ঞহৃদয়ে নিজের যে সজীব দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে, ধনধান্যদাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিনী সেই দেবীর উদ্বোধন করিয়া পল্লীরমণীগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে যুগপৎ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,

"এসো পৌষ যেয়োনা,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেয়োনা,
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেয়োনা,
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেয়োনা
পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস যেয়োনা।"

কিন্তু তাহাদের মধুর কণ্ঠের সেই সাগ্রহ আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও পৌষ মাস এক দণ্ড অপেক্ষা করিতে পারে না, নৈশবায়ুর অতি শীতল নিশ্বাস ফেলিয়া বর্ত্তমানের আনন্দউচ্ছ্বাস টুকু পাথেয়স্বরূপে লইয়া অতীতের অনন্ত রহস্যান্ধকারে মিশিবার জন্য সে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া চলে। আকাশে নক্ষত্রের দল ক্রমে বিরল ও জ্যোতিহীন হইয়া আসে; পূর্ব্বগগণ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে, এবং আলো অন্ধকারের মধুর মিলন দেখিবার জন্য একটি অতি উজ্জ্বল তারকা পূর্ব্বাকাশের অতি ঊর্দ্ধ হইতে স্থির দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া থাকে। তখন উৎসবের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া রমণীগণ আবার ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করেন, যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডস্পর্শে মর্ম্মরধ্বনিমুখরিত উৎসবাকুল সুপ্তিহীন চঞ্চলজগৎ মুহূর্ত্তমধ্যে নিস্তব্ধ ও সুসুপ্ত হইয়া পড়ে।

দগ্ধকচু।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ বাবুর মজার ইতিহাস শুনিয়া আমিও খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম। এমন সময়ে কমল দাসী হাসিতে হাসিতে দুই থালায় জলখাবার তাম্বুল ও জল আনিয়া উপস্থিত করিল।

কমল সহাস্যে বলিল "কচু ও কেসুরের বুঝি গল্প হচ্ছে? তাই এত হাসি!"

হরনাথ বাবু আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "অনধিকার-চর্চ্চাটা দেখেচো? Like master like servant।" তৎপরে দাসীকে বলিলেন "হাঁ তোমাদেরি বৌ ঝির যশঃকীর্ত্তি বর্ণন হচ্চে। যা মাগি—তোর সে কথায় প্রয়োজন?"

তাড়া খাইয়া কমল সভয়ে এক নিশ্বাসে পলাইয়া গেল।

আমি বলিলাম "হরনাথ দাদা, এ ঝি মাগি বলে কি ? কচু ও কেস্থরের গল্পটা কি ?"

হরনাথ বাবু সখেদে বলিলেন "আরে দাদা, সে নাকালের কথা কও কেন ? আসল গল্পটাই বলা এখনো বাকি ! এখনো যে উদ্যোগপর্ব্বই শেষ হয় নি। এ যে মহাভারতের কেস্‌সা। শালিরা আমাকে ভারি জ্বালাতন করেছিল। এস হে, জলখাবারটা আগে শেষ করা যাক্। বুঝ্‌তে পেরেচ ?—আমি ব'লে পাঠিয়েছিলাম আমি জলখাবারটা এঁকা বাহিরেই খাব। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে ব'লে তোমারও ভিতরে ডাক্ পোড়্‌লো না * * * সব পানগুলো শেষ করা যাক্। সাধুচরণ, সাধুচরণ, আর এক চিলেম্ তামাক্ দিয়ে যাও * * * কি refreshing ! (চক্ষু বুজিয়া) অহো তামাক সামগ্রীটা কি উপাদেয় !—

লো হুঁকে, নিদ্রার সখি, শান্তি-সহচরি,
তোর ঐ চক্রাকার ধোঁয়ার পরিধি,
চক্রে চক্রে আনে সুখ-শান্তি, ক্লান্তি করি
দূর, শূর তুল্য করি, চির দুঃখীজনে
বঙ্গের—

এ আবার কি ? চৌবে দারোয়ানটি লগুড় হস্তে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া এ বৈঠকের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন ! দেখ, দেখ—মেঘনাদ বাবু, কেমন শরীরখানা !—physique হবে তো এমনি হবে !—yes, quite a treat ! Really enviable, ক্যা চৌবেজি, ক্যা খবর ?"—

চৌবেজি আসিয়া আমাদিগকে অবনত স্কন্ধে সেলাম করিল ও হরনাথ বাবুর হস্তে এক খানি পত্র দিয়া, বলিল—

"পাঁচো বাবু, উপেন্দ্রনাথ বাবুকে বাগ্‌সে অভি গাড়ি করকে কল্‌কত্তা চলা গয়া—মালুম হোতা হয় থিয়েটর দেখ্‌নে গয়া—রমেশ বাবু নে আপ্‌সে মাফি মাগা হয় ও আপকো কহা হয় কি ঠাকরোণদিদিকো আপ সম্‌ঝা কর্ কহিয়ে গা নাখুস্ না হোঁয়। চিঠ্‌ঠিমে সব বাৎ লিখ্‌খা হয়"—

রমেশ বাবু আমাদের বড় শ্যালক। তাঁহার প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া হরনাথ দাদা অতি অসন্তোষের সহিত আমার দিকে ফেলিয়া দিলেন আর বলিলেন চিঠি লেখবার রকম দেখ। শালাদের কিছু যদি আক্কেল—কিছু যদি sense of proportion থাকে। এই বুড়ো পিতা—যার জমিদারি ও যার পেন্সনের বলে তোরা চাকুরি না করে বড়মানুষি করো বেড়াচ্চিস্—বাতের ব্যারামে পঙ্গু প্রায়—মা বৃদ্ধা—এক রাশ যুবতী ভগ্নী ও যুবতী ভার্য্যা বাড়িতে বিদ্যমান—আমরা বাড়ির জামাই—কুটুম্বের মুকুট—দুই দিনের অতিথি—আমাদের সববাইকে বিড়ম্বিত, অপমানিত করো, কল্‌কাতায় theatre দেখ্‌তে চলে গেলি। গেলি, গেলি, কোন্ একবার পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়ি এসে শিষ্টাচার করো কেতা দস্তর মাফিক্ গেলি। এই গাঁয়েই অন্য পাড়ায় Theatre Rehearsal কর্‌ছিলি—নেপথ্যে চলে যাবার

প্রয়োজন ? —বাবুরা গ্রামে Amateur theatre খুলেচেন কি না, এখন্ সব কাজই নেপথ্যে হবে। And these gentiemen pose themselyes as leaders of society ! O Tempora ! O Mores !"

* * * * *

আমি রমেশবাবুর পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—

7 P. M. Saturday
উপেন্দ্রনাথের বাগান বাটি।
ব—গ্রাম।

প্রিয় হরিনাথ,

"সধবার একাদশী"র আমরা এমন সুন্দর rehearsal আরম্ভ করেচি যে তুমি যদি স্বচক্ষে একবার এসে দেখে যেতে তা হলে গ্রাম্য থিয়েটর ব'লে অত ভ্রূকুঞ্চিত করিতে না। দেখ, আমি determined. I will make my theatre a success। এত বল্‌লাম—"তুমি এক্‌বার এসে দেখে যাও"—তুমি কিছুতেই এলে না। যা হোক্ যে দিন act হবে সে দিন তোমাকে ধরো আন্‌বই আন্‌ব। তোমার বি এল্ পড়ার ক্ষতি, রাত্রি জেগে অসুখ—এ সব shabby excuses কিছুতেই শুন্‌বো না। ভায়া, আমরাও 'ত পাঁচ ভাই এতগুলা ইউনিভর্‌সিটি পরীক্ষা দিলাম, তোমার মত Hermit's cell এ ব'সে অন্তঃপুর গুল্‌জার তো করি নি। তুমি সকল বিষয়েই সৃষ্টিছাড়া।

Query : তোমার আকৃতিটা এমন MANly, তোমার প্রকৃতিটা এমন DOGged কেন ?

ভেবে দেখ, তুমি আমাদের theatre এ যোগ, দিলে সোণায় কেমন সোহাগা হ'ত ! আর তুমি যদি নিমে দত্ত সাজ্‌তে তা হ'লে splendid—capital হ'ত ! তা হ'লে তো আমার সাধের থিয়েটরের success perfectly guaranteed ছিল। আর আমাকে এত মাথা ঘামাতে হোত না। ভেবে দেখ, তুমি নিমচাঁদ দত্ত না হয়ে আমাদের কতটা ক্ষতি কর্‌লে ! Boy, thou wert the very man for it। অথবা তোমারই বা কি দোষ ? তুমি যে জেদের অবতার—incorrigibly DOGged !—O diamond, diamond, thou little knowest of the mischief thou hast done !

মঙ্গলভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ। আমিই এখন্ নিমচাঁদ দত্ত সাজ্‌ছি। আমার এই Anglo-vernacular পত্রখানা পাঠ করো তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে আমি নেহাৎ মন্দ নিমচাঁদ হব না। আর আমার প্রিয়বন্ধু উপেন্দ্রনাথ বসু মাতাল ভোলানাথ সেজেছে। হাল্‌দারেদের টুক্‌টুকে ছেলে দুটি (যাদের তুমি Beatrice আর Rosalind ব'লে সম্ভাষণ কর) স্ত্রী-character সেজেছে। কেমন ? মন্দ হয়েছে কি ?

কিন্তু আমরা সকলেই Rehearsal discontinue ক'রে কল্‌কাতার এই দণ্ডেই চল্‌লাম

সম্মুখেই চারখানা ভাড়াটে গাড়ি তৈয়েরি। এই মাত্র শুন্‌লাম আজ Emerald Theatreএ "সধবার একাদশী"র অভিনয় হবে। আর বঙ্গের Garrick স্বয়ং গিরিশ ঘোষ নিমে দত্ত সাজবেন। Notes compare কর্‌তে পার্‌বো। আর আমাদের সবল ও দুর্ব্বল points গুলি বুঝ্‌তে পার্‌বো! একেই বলে "সুবর্ণসুযোগ।" ইহা নিশ্চয়ই Godsend।

French leaveএ চল্‌লাম; কিছু মনে কোরো না। A thousand apologies to you।

রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার সেনাবৃন্দ রাঁধা ভাত নষ্ট হোলো ব'লে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি হবেন, সন্দেহ নাই। তাঁদের থাওা কোরো। কি করি—necessity has no law। গাড়ি তৈয়েরি—there is no time to lose।

অবশ্য চৌবে দারোয়ান দেউড়িতে থেকে বাড়ি আগ্‌লাবে। সাধুচরণও বৈঠকে থাক্‌বে। কমল ও বুড়োঝি তো থাক্‌বেই—নতুন ঝিকে বোলো সে যেন আজ রাত্রিটা আমাদের বাড়িতেই থাকে। আর তুমি তো একা একশো—কাশীর কালভৈরব—ধর্ম্মরাজের Cerberus। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারি। আর বাবার বাতের ব্যারামটাও আজ কাল নেই বল্‌লেই হয়। Good bye। প্রভাতে দেখা হবে। Again I beg a thousand pardons।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

P. S. তোমার গলার বেদনাটা কেমন আছে? হা! হা! হা! আবার Assistant Surgeonকে তো ডাকৃতে হবে না?

* * * * *

আমি শ্যালক বাবুর পত্রখানি শেষ করিয়া, মুখ তুলিয়া, দেখি—হরনাথ দাদা বৈঠকখানায় ক্রমাগত পা-চালি করিতেছেন ও আপনার মনে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার-শব্দে বলিতেছেন "Excellent! Excellent! Capitally happy! What an idea!" আমি বলিলাম "দাদা, ক্রমাগত hard study কোরে আপনার—"

হরনাথ দাদা বাধা দিয়া বলিলেন "You mean আমার মাথা থারাপ হয়ে গিয়েছে। You are mistaken. Oh no!—I was never more coolheaded than now—দেখ তোমার honourএ—আগমনের honourএ—আমি আজ লেখা পড়া বন্ধ করেচি, আর মনে করেছি তোমার health drink কোর্‌বো"—

আমি সশঙ্কিত হইয়া বলিলাম "সে কি দাদা? বলেন কি? মদ থাবেন না কি?" হরনাথ দাদা সহাস্তে বলিলেন "না হে না—বেদবিহিত মতে—oriental styleএ" আমি বলিলাম "তা ধূমপান তো কর্‌চেন্‌ই—আবার কি চাই!"

হরনাথ দাদা বলিলেন "ভায়া, তোমার পক্ষে এটা puzzle। বুঝ্‌তে পারলে না?—চৌবেজি, উস্ মর্‌তবে যয়সা বুটি ছানে থেও আজ্‌ভি বনাও। ভাঙপিনে কা বহুতহি জিউ

চাহতা হয়। ইয়হ লেও চার আনে (দারোয়ানের হস্তে একটি সিকি প্রদান)—খুব্ উমদা বনানা—মেঘনাদ, তুমি তো এ রসে বঞ্চিত, তোমাকে আহ্বান করা বৃথা। দেখি—আমি ও চৌবেজি—আর কে আমার সরিক হ'তে পারে?—রাঙ্গাদিদি—শালিরা—শালাজেরা—প্রভাসুন্দরী—they are out of the question—কেমন, সাধুচরণ, তোমার সিদ্ধি খেতে কোনো আপত্তি নেই?—অবশ্য নয়!—that's like a good servant—অতএব আমি ও চৌবেজি ও সাধুচরণ সিদ্ধি খাব—that is a glorious triumvirate—ওহে মেঘনাদ, তুমি বাক্‌শূন্য হয়ে, অমন করো, like one possessed, তাকাচ্চ যে। তুমি অবশ্য ভাব্‌চ "What next, and what next?"—ওহে মেঘনাদ ভায়া, আমি দিন দিন superstitious হয়ে পড়্‌চি—শাস্ত্রে বলে সিদ্ধি খাওয়াটা মঙ্গলাচরণ বিশেষ—চৌবেজি! ভাঙ পিনে সে হম্ বি এল্ পাশ্ হোগা ইয়া নহি?"

চৌবেজি হরনাথদাদার গোলাপি-সম্ভাষণে ও সাধের নেশার অবশ্যম্ভাবী সুখ-চিন্তায় গদ্‌গদ হইয়াছিল। সে সহাস্তে বলিল "হাঁ জামাইবাবু—সিদ্ধিসে সব্ কাম্ সিদ্ধ হোতা হয়—আপ্ জরুর্ পাশ্ হোইয়ে গা"—

সাধুচরণও আহ্লাদে গদ্‌গদ ছিল; সে বিনা আজ্ঞায় ছুটিয়া আর এক চিলেম্ তামাক্ সাজিয়া আনিল। হরনাথ দাদা সহাস্তে বলিলেন "দেখিও সাধুচরণ, বেশী নেশা করিও না—আর সকলের আহারান্তে খাইও।"

সাধুচরণ যোড়-হস্তে হর্ষবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল "আজ্ঞে জামাই বাবু, তা আর বল্‌তে?"

তখন হরনাথ দাদা অন্তঃপুর হইতে "নতুন ঝিকে" ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন "দেখ ঝি—রাঙ্গাদিদিকে আর আমার শাশুড়ি ঠাক্‌রোণকে খবর দাও—দাদা বাবুরা চিঠি লিখে পাঠিয়েচেন্, তাঁরা রাত্রে বাড়িতে আস্‌বেন না—কল্‌কাতায় থিয়েটর দেখ্‌বেন—আর রাঙ্গা দিদি যেন এদ্দের বেয়াক্কিলি কাণ্ডকারখানা দেখে রাগ না করেন। বাড়া ভাত নষ্ট হবে না। দাদাবাবুদের হুকুম, তুমি আজ এখানেই থাকিবে। তুমি এইখানেই আহার কোরো—সাধুচরণও এখানে থাক্‌বে, সেও এখানে আহার কোরবে। আর রাঙ্গাদিদিকে বোলো, আমি আজ সিদ্ধি খেয়েচি—বোধকরি দুই তিনজনের ভাত আমিই একা খেয়ে উঠতে পারব। তবে এটা যেন রাঙ্গাদিদির মনে থাকে যে আমার গলার ঘা এখনও ভাল করে্য সারে নি—আর তোমার দিদিদের বোলো আজ আমি ভেতরে শোব না—কেন ঝি? অত হাস্‌চ কেন?—এতে আর হাসির কথা কি?—দাঁড়াও, দাঁড়াও!—এই কেরোসিন তেলের আলোয় প'ড়ে প'ড়ে আমার মাথা থারাপ হয়ে উঠেচে—এই দণ্ডে এই বড় বোতলটায় শোর্‌যের তেল ভ'রে এনে এই টেবিলের নিচে রেখে যাও। এখ্‌খুনি নিয়ে এস—বোতল পূরে এন—ভুল না"।

আমি'ত হরনাথদাদার কাণ্ডকার্‌খানা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। "এতক্ষণ এসেছি, শ্বশুরমহাশয়কে ও শাশুড়িঠাক্‌রোণকে প্রণাম করা হয় নাই। আর থাবার প্রস্তত হইবারও

বিলম্ব আছে। এই অবসরে একবার কর্ত্তার মহলে যাই”—এই বলিয়া, হরনাথদাদার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমি নূতন ঝির সহিত অন্তঃপুর দিয়া কর্ত্তার মহলে গেলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই বৃহৎ বাড়িটি দ্বিখণ্ডে বিভক্ত ছিল। কর্ত্তা পেন্‌সন্ নেবার পরে বাতরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য একান্তে নির্জ্জনে এক খণ্ডে থাকিতেন। বধূরা ও কন্যারা তাঁহার “খাবার” সেই স্থানেই উপর তলায় বহিয়া লইয়া যাইত। আমার শাশুড়িঠাকুরাণীও অধিকাংশ সময়ে পতিসেবায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই জন্য সেই খণ্ডটিকে সকলেই কর্ত্তা গিন্নির মহল বলিত। অপর খণ্ড রাঙ্গাদিদির মহল বলিয়া বিখ্যাত। সে মহলে নিত্য আমোদ, নিত্য উৎসব। যেন একটি নব-বৃন্দাবন in miniature।

হিন্দুগৃহে জামাতা বড়ই আদরের সামগ্রী। আমাকে দেখিয়া কর্ত্তা ও কর্ত্রী যারপর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

নানা কথাবার্ত্তায়, প্রায় একঘণ্টার পর, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, আমি, আবার বৈঠকে আসিয়া হাজির হইলাম।

আসিয়া দেখি, আমার হরনাথদাদা পুরাতন ইংরাজি ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র একত্র করিয়া স্তূপাকারে টেবিলের উপর রাখিয়া কাগজের বাক্স তৈয়ারি করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া দাদা সহাস্যে বলিলেন “দেখ, মেঘনাদ,—কেমন আমার set hand! এই দুটি বাক্স দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। কেমন? very neat, খুব সুন্দর নয়? তা হবে না কেন? আমার গুরু কে, তা জান? স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে নিজহস্তে শিখাইয়াছেন।”

আমি বলিলাম “দাদা, এ বাই আবার কেন?”

দাদা বলিলেন “দুটি তোয়ের হয়েচে—এম্‌নি আরো দশটি তোয়ের কর্‌বো। রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার volunteer corpsকে present কোর্‌বো।”

আমি বলিলাম “দাদা—এইমাত্র আপনার এত রাগ ছিল তাহাদের উপর! এরি মধ্যে হঠাৎ তাহাদের উপর এত প্রসন্ন হলেন কিসে?”

হরনাথ দাদা বলিলেন “এইমাত্র এক গ্লাস্ সিদ্ধি খেয়েচি। বোধ করি চৌবেজি বেশী মাত্রায় মিষ্টি দিয়েচে। একটু গোলাপি গোচের নেশা বোধ হচ্চে। আমি বোধ করি এই জন্যেই আমার রোষ ক্ষোভ হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েচে। পণ্ডিতমশায় থাক্‌লে বল্‌তেন “উদার চরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্।”

আমি বলিলাম “কি দাদা, ঢলাঢলি কর্‌বে না তো?”

দাদা বলিলেন “আমি যদি এম্‌নি superficial হতাম, তা হ’লে বড় শালাবাবু কি আমাকে নিমচাঁদ দত্ত সাজ্‌তে প্রস্তাব কোর্‌তেন?—জান ত, মেঘনাদ ভায়া—Coleridge এর Ancient Mariner যতক্ষণ সমস্ত কাহিনীটা না বোল্‌তো ততক্ষণ সে ছট্‌ফট্ কোর্‌তো আমারও কতকটা সেই দশা হয়েচে। তোমাকে আমার নাকালের সমস্ত ইতিহাসটা যদি না বলি তা হ’লে আমার আহার হজম হবে না।”

আমি বলিলাম “দাদা, আমিও শুন্‌তে সবিশেষ উৎসুক আছি। অমৃতে কাহার অরুচি হয়?”

হরনাথ দাদা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন “It may be nectar and ambrosia to you, Meghnad. To me it is gall and wormwood”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“আইবুড়ার খেদ শুনিয়া হাস্যময়ী ক্রীড়াময়ী লীলাময়ী সুন্দরীরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন বটে—কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বেই বলিলেন “গানটি বেশ বটে কিন্তু বিবাহিত বিবাহিতার সভার মধ্যে আইবুড়ার গান কেমন কেমন ঠেকে। অতএব আপনি একটা প্রেমিক বিবাহিতের গান ধরুন” পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন “মধুরেণ সমাপয়েৎ—ঠাকুরজামাই, আপনি একটা মধুর সরস পদাবলী গাইয়া আমাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন।”

রাঙ্গাদিদি দুই তিনটি নাতিনী নাতবধূর নিটোল কপোলে আদরের ঠোন্‌কা মারিয়া বলিলেন “তোদ্দেরি যেন আনন্দ—নাত্‌জামাইর কি? তোরা হুড়মুড়িয়ে এসে প্রভাকে তাড়িয়ে দিলি—উনি সমস্ত রাত্রির প্রভাকে না পেয়ে, সত্যি সত্যি ঘরটি অন্ধকার দেখ্‌চেন।”

পণ্ডিতমহাশয় সকৌতুকে বলিলেন “কি ঠাকুরজামাই? আপনার কি প্রভার আবশ্যক হয়েছে? প্রদীপে আরও দুই তিনটি বর্ত্তিকা প্রয়োগ করিব না কি?”

আমাদের প্রথমা শালাজটি সহাস্যে বলিলেন “আ মর ছুঁড়ি—পিদ্দিপই যদি উস্‌কবি, তবে আমরা এতগুলি ভুবনমোহিনী সুন্দরী কি কর্‌তে এসেছি? আমাদের রূপে যে ঠাকুরজামাইর ঘর আলো।”

আমাদের কবিতাপ্রিয় শালিটি বলিলেন

“মন্দ বলিস্ নি বৌ,—

মোরা যত পরী
রূপসাগরের তরী।”

রাঙ্গাদিদি বলিলেন “ছুঁড়িরা কি বেহায়া গা! কেবল রূপের গর্ব্ব, কেবল রূপের গর্ব্ব! তা তোদ্দের রূপ তোদ্দের কাছে থাকুক—নাত্‌জামাই কি, তা নিয়ে ধুয়ে খাবেন?” আমি সহাস্যে বলিলাম “রাঙ্গাদিদি, আমি আপনাদের পা ধোয়া জল খেতে রাজি আছি। [Bro-

ther Meghnad, was it not bravely said ? was it not worthy of a calidore] ?

অনঙ্গ ছুঁড়িটা—ছুঁড়িটাও কপ্‌চাতে শিখেচে গো ! (I beg your pardon for these slips of my tongue) বল্‌লে "ছুধের তেষ্ণা কি মেটে ঘোলে ?"

পণ্ডিতমহাশয় বল্‌লেন (O the monstrous taste of this young lady) ! "ঠিক্ বলেচিস্ ঠাকুরঝি, সকল কার্য্যেই প্রতিভূ হ'তে পারে কিন্তু প্রেমে প্রতিভূ হ'তে পারে না—একেবারেই না—বিধাতার নির্ব্বন্ধ।" আমি বল্‌লাম "ঐ দেখ, ঘড়িতে চারটে বাজে বোলে। প্রভা সুন্দরী না আসুন, প্রভাত সুন্দরী এলেন বোলে। অতএব এই বেলা একটা ললিত কিম্বা বিভাস কিম্বা ভৈঁরো গেয়ে আজকের সভাভঙ্গ করা যাক। ইংরিজিতে খুব ভাল ভাল matin songs—প্রভাতী গান আছে। বলুন'ত একটা গাই।"

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্তে বলিলেন "অথ কিম্—আপনি অসঙ্কোচে গাইতে পারেন।"

সভার সুন্দরী সভ্যদিগের সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে আমি প্রভাতী রাগিণী ধরিলাম। আমি এবারে সুকবি Macaulay গ্রথিত সুন্দর ললিত Indian Penal code নামক গীতি কাব্যের definition গুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের পণ্ডিত মহাশয় সহাস্তে বলিলেন "এই দেখ ঠাকুরজামাই, তোমার গানের কিয়দংশ আমি পেন্সিল দিয়া কাগজে লিপিবদ্ধ করো্য নিচ্চি"—

আমি মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি "কেমন লাগ্‌চে" ? এবারে কোনো সুন্দরী বল্‌লেন মন্দ নয় কোন সুন্দরী বল্‌লেন "অমনি একরকম"। ছুই এক সুন্দরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "বড় কটর্মট বাপু"। আর রাঙ্গাদিদির সহিত জনান্তিকে গুণ্ গুণ্ স্বরে সকলে কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

তখন আমার বুক ছুড়্ ছুড়্ করিতে লাগিল। আশঙ্কা হইল "বুঝি বা এতক্ষণ বাদে ধরা পড়িলাম।"

আমি যখন Defamation এর definition শেষ করিয়া, সুর করিয়া, Criminal Intimidation গাইতে আরম্ভ করিয়াছি তখন ছুইজন সুন্দরী আমার মুখ চাপিয়া ধরিল আর বলিল "আর নয়—ইহার অর্থ বল।"

তখন আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলাম কিন্তু তবু অবিলম্বে সাম্‌লাইয়া desperately বলিলাম—ইহার অর্থ কতকটা সেই বাঙ্গলা গানটার মত—

"শ্যাম না এল,

অলস অঙ্গ, শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী ঐ পোহাল"—

তখন সকল সুন্দরীরা ঘোর গণ্ডগোল করিয়া বলিয়া উঠিল "আর বল্‌তে হবে না,—বোঝা গেছে, বোঝা গেছে !"

এক কুপিতা নাগিনী বলিল "এ ইংরেজি গানটার অর্থ—হরনাথ বাবু ভণ্ড—ঘোর ভণ্ড ভণ্ড তপস্বী।"

এক ফণিনী বলিল "ইহার অর্থ—তুমি বিশ্বাসঘাতক ?" (কি ক্রোধ ! কি ক্রোধ ! আমি আমি মনে মনে ভাবিলাম "এই বাঘিনীগুলাকে ঘাঁটাইয়া ভাল কাজ করি নাই")

রাঙ্গাদিদিও ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন "ওমা, ওমা ! কোথায় যাব গো !—নাত্‌জামাই তোমাকে সরল ব'লে জান্‌তাম—তোমার পেটে পেটে এত !"

প্রথম শালাজ ঠাকুরাণীটি বলিলেন "আমাদ্দের সরল অবলা পেয়ে আমাদ্দের এত লাঞ্ছনা !"

পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "ঠাকুরজামাই, গানটার প্রকৃত অর্থ আমি বল্‌বো ? গানটার প্রকৃত অর্থ

ত্বমসি শঠধিকটঃ

ত্বমসি অতি কপটঃ

ত্বমসি মম ভবজলধিনক্রঃ"

আমি জলে মজ্জমান লোকের তৃণধারণবৎ চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলাম "আমার অপরাধ ?"

তখন প্রথমা শালিঠাকুরাণী বলিলেন "অপরাধ ?—তোমার বল্‌তে লজ্জা করে না ?

তোমার মত তঞ্চক বঞ্চক লোক ভূভারতে নেই ! আমরা ইংরিজি জানিনে—আমাদ্দের মুখ্‌খু মেয়েমানুষ পেয়ে আমাদ্দের এত নাকাল, এত লাঞ্ছনা ! তুমি সমস্ত রাত্তির আইন আওড়ালে, আর সমস্ত রাত্তির মিথ্যে কথা কইলে ! আমাদ্দের কি বুঝ্‌তে বাকি আছে ? বলে, ধম্মের ঢল বাতাসে নড়ে। মেজ বউ কাগজ পেন্সিল নিয়ে যতদূর পেরেছিল, তোমার কথা গুলো লিখ্‌ছিল। বলিহারি চাতুরি ! আবার সুর করো্য বলা হচ্ছিল, ডেকয়িটি—ডেকয়িটি। কেন ডাকাতি কথা কি মুখ দিয়ে বেরোয় না ?" (আমি অপরিণামদর্শী মেকলে সাহেবকে মনে মনে শত ধিক্কার দিলাম। "Dacoity" ছাড়া কি "ডাকাতি" শব্দের অন্য কোন সুশোভন প্রতিশব্দ পেলেন না !)

প্রথম শালাজ ঠাকরোণ বল্লেন "এমন চাতুরী—এমন চালাকি ! তুমি মনে কর তোমার মত চালাক দাস ভূভারতে নেই ! নয় ? ডিফ্যামেশন্—ডিফ্যামেশন্। আমরা বুঝি জানিনে, ডিফ্যামেশন্ অর্থে "মানহানি"। সেদিন হিতবাদী আর সঞ্জীবনী পত্রিকায় এই ডিফ্যামেশন্ কথাটার কত নাড়াচাড়া দেখ্‌লাম। ওমা—আবার সুর করো্য প্রভাতী গাওয়া হচ্ছিল, ছিঃ ছিঃ ঠাকুরজামাই, তুমি এমন ধূর্ত্ত, এমন শঠ, এমন জালিয়াৎ"—

আমি পরাজিত—পরাভূত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বিনাবাক্যব্যয়ে, চটিজুতা পায়ে দিয়া, একেবারে দ্রুতপাদবিক্ষেপে, বৈঠকের দিকে ধাবিত হইলাম। "ধর্—ধর্—চোর পালায়" বলিয়া অনঙ্গ ছুঁড়িটে আমার পশ্চাতে ছুটিল। সিঁড়িতে নামিবার সময় আমার পা হইতে চটি জোড়াটি খসিয়া গেল। সেই চটি জোড়াটি trophy স্বরূপ হাতে করিয়া, অনঙ্গ রাক্ষসী, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পলাইয়া গেল ! Tam o' shanter এ সেই বড়বার ছুর্দ্দশা !—মনে আছে ?

For Nannie, far before the rest,
Hard upon noble Maggie prest,
And flew at Tam wi' furious ettle;
But little wist she Maggie's mettle—
Ae spring brought off her master hale,
But left behind her ain grey tail:
The carlin claught her by the rump,
And left poor Maggie scarce a stump!

আমারও সেই দশা হইল। কিন্তু আমি আর জুতার অপেক্ষায় ফিরিয়া তাকাইলাম না। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—আমি খালি পায়ে বৈঠকে আসিয়া এই খট্টাঙ্গে শুইয়া পড়িলাম"—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদার বাক্যাবসানে আমি বলিলাম—"আপনার এত সহজে দোষ স্বীকার করাটা ঠিক হয় নি। আপনি একটু হঠধর্ম্মিতা দেখালে অবশেষে বিজয়পতাকা উড্ডীন ক'রে ফির্‌তে পারতেন। আপনার মুখ চুণ দেখে ওরা সহজেই বুঝতে পার্‌লে ওদ্দের থিওরিটা অকাট্য"।

হরনাথ দাদা বলিলেন "ঠিক বলেছ মেঘনাদ, অত শীগ্‌গির কুসুর কবুল অন্যায় হয়েচে। তবে কি জান? অত পাকড়াপাকড়িতে বোকা বনে যেতে হ'ল। Thus, conscience makes a coward of us all"

আমি বলিলাম "হরনাথ দাদা, এখন কচু ও কেসুরের কেস্‌টা বলুন। শোন্‌বার জন্যে মনটা ভারি উৎসুক হয়েছে"।

হরনাথ দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন "দুই তিনদিন উহারা কিছুই বাড়াবাড়ি কর্‌লে না। যেন কত ভালমানুষ—নিরীহ নির্ব্বিরোধী অবলা। এত ঝড় বহে গেছে চিহ্ন নাই তার। একদিন মধ্যাহ্নে, আহার কর্‌তে বসেছি—রাঙ্গাদিদি ও কোম্পানি আমার সম্মুখে ব'সে "এটা খাও—ওটা খাও" ব'লে কত আদর, কত যত্ন, কত আপ্যায়িত কর্‌তে লাগ্‌ল। ভায়া মেঘনাদ,—ইহারা কুসুমের স্তূপের ভেতরে বিষধরী। এরা বিষকুম্ভ পয়োমুখম্।

বড় শালাজ বলিলেন "ঠাকুরজামাই, এ মাংসের বড়াগুলো কেমন হয়েছে"? আমি অম্লানবদনে সব বড়াগুলি উদরসাৎ ক'রে বল্লুম "খুব ভাল হয়েছে; আরো আছে? নিয়ে এস"। তৎক্ষণাৎ আবার এল। আমি সেগুলিও পার করিয়া সপরিতোষে বলিলাম "এমন চমৎকার মাংসের বড়া কস্মিন্ কালে খাই নাই"। সব সুন্দরীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম "আমি রাক্ষসের মত খাই বলে বুঝি আপনারা এত হাস্‌চেন?

তা, আপনারা হাসুন। ভোজনে আমার লজ্জা নেই আর আপনাদের হাসিতেও আমার আপত্তি নেই"।

আর এক সুন্দরী এক রাশ বড়া থালে আনিয়া বলিলেন" বলুন্ তো হরনাথ বাবু — এগুলি কিসের বড়া আর কেমন"? আমি সবগুলি খাইয়া বলিলাম "খুব্ চমৎকার। এগুলি বোধ করি চিংড়ি মাছের বড়া"।

এবার সুন্দরীরা উচ্চরোলে মহাগণ্ডগোল করিয়া যে যার গায়ে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। আমি ঝোল, সুক্ত, ঘণ্ট, মাংসের বড়া, চিংড়ি মাছের বড়া প্রভৃতি খাইয়া ভাল করিয়া ঠাওরাইয়া দেখিলাম, পাতে মাংসের ঝোলও নাই, মৎস্যও নাই। তখন আমার হুঁশ হইল—ভাবিলাম সুন্দরীরা আহারে কোনো practical joke করিয়াছে। তখন অনঙ্গ সুন্দরী সহাস্যে হাততালি দিয়া বলিল "কেমন ঠগান্‌টাই ঠগিয়েছি—কচু, কচু, কচু—হরনাথ বাবু, আজ কেবল কচু খেয়েচ"—

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন "নাৎজামাই, ওকি মাংসের বড়া খেলে—ওযে কচুর বড়া"!

প্রথম শালি বলিলেন "উকিল বাবু, ওকি চিংড়ি মাছের বড়া খেলেন? ওটাও যে কচুর বড়া"।

আমি'ত অবাক! হতবুদ্ধি! আমি আহার শেষ করিয়া যখন আচমনার্থে উঠিলাম তখন কবিতাপ্রিয় শালিটি বলিয়া উঠিল—

"ঝোলে কচু, টকে কচু, কচু মূলোর সুক্ত,
কচুর ঘণ্ট, বিউলির ডাল, তাও কচুযুক্ত"।

সকলে কোলাহল করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি একেবারে মৃত্তিকা!

অনঙ্গ ছুঁড়িটে হাসিতে হাসিতে বলিল—

"রাত্রিকালে গানের সময় দিলে কেন ফাঁকি?
সব রকম কচু; কেবল কচুপোড়া বাকি!"

কি করি? আমিও হাসিতে লাগিলাম! ভাবিলাম "যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল"!

যাহা হউক আঁচাইয়া, গামছায় মুখ মুছিয়া, শ্রীমতী পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদত্ত পানগুলির মধ্যে দুইটি মুখে পূরিয়া আর দুটি হস্তে লইয়া বাহিরে যাচ্চি, এমন সময়ে সুন্দরীরা আবার খুব হাসিয়া উঠিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় হাস্য-বিকশিত আয়ত-নেত্রে বলিলেন "হে চতুর! হে বিদ্বান্! তুমি যাহা এইমাত্র খাইলে উহা পান নহে, উহা দগ্ধ কচু—আমাদের সুনিপুণ হস্তকৌশলে দগ্ধকচু হরিত-পীত-লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সুন্দর তাম্বুলের আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার হস্তে আরও দুটি দগ্ধকচু বিদ্যমান আছে, না বিশ্বাস হয় বাহিরে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও"! আমি শুনিয়া থুঃ, থুঃ, করিয়া মুখের দগ্ধকচু ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। সেই হাসি বিদ্রূপের রাজ্য হইতে দ্রুত পলাইয়া, বাহিরে আসিয়া দেখি—সত্য সত্যই—সেগুলি কৃত্রিম পান—অকৃত্রিম দগ্ধকচু!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদা বলিলেন "ভায়া মেঘনাদ, এতো গেল innocent practical joke। ইহাতে বেশি রাগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু এইবার আমার নাকালের শেষ পালা বর্ণন কোর্‌চি শোন।

আবার দুই দিন কেটে গেল, আমিও অন্যমনস্ক হলাম। একদিন বৈকালে, অন্তঃপুরে শালি শালাজের সম্মুখে ব'সে জলখাবার খাচ্চি—রাঙ্গাদিদি এর মধ্যে ছিলেন না। দুইটি রেকাবিতে আহারীয় প্রস্তুত—একটিতে পেঁপে, নেবু, শশা প্রভৃতি ফল সাজান, অন্যটিতে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন! আমি প্রথমেই কেশুর খেতে আরম্ভ কর্‌লাম। আমার যেমন অভ্যাস, একেবারে গোটাকতক মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ কর্‌লাম।

তখন প্রথম শালি সহাস্যে বলিলেন "ফেল, হরনাথ বাবু, ফেল মুখ থেকে—অতগুলো খেলে মারা পড়্‌বে, ও কেশুর নয়, ও ওল্‌।"

কিন্তু তখন আমি অর্দ্ধেক গলাধঃকরণ করেছি। কণ্ঠে এমন কুট্‌কুটানি ধর্‌লো যে চক্ষু স্থির!

প্রথম শালাজ সহাস্যে বলিলেন "ও কটমটে আইন নয়—ও রসের গান—এখুনি রস গড়াবে"—

কিন্তু তখন মুখের গ্রাস ভূতলে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও আমার সত্যসত্যই রস গড়াইতে আরম্ভ হইয়াছে! গো-নালি ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে!

এমন সময়ে রাঙ্গাদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাস্তবিক ইহার মধ্যে ছিলেন না। সবিশেষ শুনিয়া, যাহার পর নাই, দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে "রাক্ষসী—ডাইনি শাকচুন্নি—আহা বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেচে—বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন ও সস্নেহে নিজের হস্তে আমার মুখে কমলানেবু, শশা প্রভৃতি গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন।

অনঙ্গ বলিল "দুটো রসগোল্লা খাও—সব জ্বালা সেরে যাবে।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "না কাজ নেই, নাৎজামাই—রাক্ষসীরা বোধ করি উহার মধ্যেও কোনো কারসাজি করেচে"।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা ?
বিহসতি যুবতি সভা তব সকলা"।

আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আসিয়া শালাবাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাহারা যাহার পর নাই শুশ্রূষা করিল কিন্তু সে নিদারুণ যন্ত্রণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। সমস্ত রাত্রি, কাৎরাণি, সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফটানি! শেষে ভোর রাত্রে Assistant surgeonকে ডাক্‌তে হোলো। তিনি একটা Exterior lotion দিলেন

ও কি একটা decoction খাইতে দিলেন। দুইদিনের পরে বেদনা শান্ত হোলো। এই দেখ গলার শিরটা এখনো ফুলে রয়েছে। মেঘনাদ ভায়া, তুমি এদের মৌমাছি বল। এরা বল্‌তা, ভিমরুল, বৃশ্চিক! এরা রাক্ষসী, দানবী, harpy!—এদের শরীরে দয়ামায়া আদবে নাই"।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদার বিড়ম্বনার ইতিহাস শুনিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইল। আমি বলিলাম "হাঁ দাদা, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল হয় নাই। তবে দাদা ওদের পক্ষ হ'তে আমি বল্‌তে বাধ্য যে ওরা মনে করেছিল তুমি এক অধটা কেশুর খাবে। তুমি একেবারে অতগুলো মুখে পুরে দেবে এটা ওদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এটা কেবল pure mischance। ওদের কেবল নির্দ্দোষ আমোদ করা অভিপ্রায় ছিল"।

আমার কথা শুনিয়া হরনাথ দাদা সজোরে উচ্চহাস্য হাসিয়া "একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেচে। 'mesmerised, mesmerised'' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আর মুখে দুই হাত দিয়া বৈঠকের সেই খট্টাঙ্গে পড়িয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি কিছুতেই থামে না।

আমি বলিলাম "দাদা, সিদ্ধির নেশা দেখ্‌চি তোমার মাথায় উঠেছে! কয় গ্লাস খেয়েছ?

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরনাথ দাদা ক্রমাগত হাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কমল ঝি সহাস্যে আসিয়া "জামাই বাবুরা, ভেতরে এস, খাবার তৈয়ারি" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল। আমার আশঙ্কা হইল যে সিদ্ধির ঝোঁকে হরনাথ দাদা ভিতরে গিয়া ঢলাঢলি না করেন।

আমরা ভিতরে গিয়া রাঙ্গাদিদি ও শালি শালাজগণের আদর-আহ্বান-সম্ভাষণে গদ্‌গদ ও "টইটম্বুর" হইয়া "চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়" সপরিতোষে আহার করিলাম। হরনাথ দাদা বরাবর সুসম্বৃত ও সংযত ছিলেন। আহারের সময়ে অতিরিক্ত হাসি কিম্বা অন্য কোনো গোলযোগ করিলেন না। দেখিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল।

বাহিরে আসিয়া দেখি সাধুচরণ নেশার ঝোঁকে ভোঁ হইয়া রোয়াকে পড়িয়া আছে। "রঙে মত্ত" হইয়া, দেউড়িতে বসিয়া চৌবে দারোয়ান গান ধরিয়াছে—"পূরবী লড়ইয়া হো রামা পূরবী লড়ইয়া!"

যখন কমল ঝি আসিয়া সহাস্যে বলিল "ছোট জামাইবাবু, ভেতরে চলুন—দিদি ঠাকরোণরা ওপোর কোটায় আপনার জন্যে অপিক্ষে কোর্‌চেন্" তখনও হরনাথদাদা কাগজের বাক্স তৈয়ারিতে ব্যস্ত ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে বলিতেছিলেন "মেঘনাদ ভায়া—একবার কারিগরিখানা দেখ। কে বল্‌বে কাগজের বাক্স? দেখ, এই কয় রকমের কালি দিয়ে রংটা কেমন ফলিয়েছি! কেমন? perfect varnish নয়?"

গ্রামের চতুর্দ্দিকে নিশুতি। তখন জ্যোৎস্না অস্তমিত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শৃগালগুলা ঐকতানিক-স্বরে "হুক্কা হুয়া" করিয়া উঠিতেছিল, দুই একটা গ্রাম্য কুকুর "ভেউ ভেউ" করিয়া প্রতিবাদ করিতেছিল। বৈঠকের সম্মুখে, বারাণ্ডায়, রেলিংএ ও টবে সযত্ন-পালিত ক্রিপর, ক্রোটন্, কন্‌ভল্‌ভিউলস্ প্রভৃতি বিলাতি উদ্ভিদ্‌গুলি অন্ধকারেও অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছিল। হস্তে প্রদীপ লইয়া, কমল ঝি আমাকে পথ দেখাইয়া, রাঙ্গাদিদির মহলে অগ্রসর হইল। অন্তঃপুর-বাসী গৃহপালিত একটা কাকাতুয়া কমল ঝিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল "মর্ মাগি!—চুরি করতে চল্‌লি!"—কমল ঝি বিরক্ত হইয়া বলিল "মরণ আর কি!—পাখীটে যেন যমের অরুচি!" অন্তঃপুরের সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে সিঁড়িতে উঠিবার নিকটে এক রাশি বিচালি স্তূপীকৃত ছিল। কমল ঝি সক্রোধে বলিতে লাগিল—"নতুন ঝি মাগির আক্কেল দেখ। দিদি ঠাকরোণ এত করে্য বল্লেন্ যে কত্তার মহল থেকে বিচুলি গুলো এনে গোয়ালঘরে রেখে আয়—তা মাগি এখানে এনে ফেলে রেখেচে!—তুলে রেখে আস্‌বার সময় হোলো না! রোস্ মাগি—কাল্‌কের্ চাকর—এতটা আস্পাদ্দা! সকাল্ হোক্ মাগিকে খ্যাংরাপিটে কোরবো!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, উপরে উঠিয়া, যখন সুন্দরীদিগের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তখন দেখি চারিদিকে ঝাড়, লাণ্টেন্, শ্যান্‌ডিলিয়রে গৃহখানি সুসজ্জিত। রাঙ্গাদিদি সাদরে বলিলেন "নাৎজামাই, এই ঘরখানিতেই বাসর হয়েছিল, মনে পড়ে?" আমি সহাস্যে উচ্চগদিতে তাকিয়া ঠ্যাসান্ দিয়া বসিলাম। রাঙ্গাদিদির ও তাঁহার দশমহাবিদ্যার অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে, তাহাদের উচ্চ কলহাস্যে, মালার সৌরভে, কেশসুবাসী গন্ধদ্রব্যে, লাল নীল সবুজ কারুকার্য্য-খচিত সুবিচিত্র বস্ত্রের গৌরবে, ঘরখানি গম্ গম্ করিতে লাগিল। আমি সত্য সত্যই অতুল-সুখানন্দে mesmerised হইয়া পড়িলাম।

প্রথম শালাজ ঠাকুরাণী বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আর নয়, গান হোক্।"

প্রভা ঠাকুরঝি বলিলেন "সেই গানটা গাও—

ওরে ওই ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী,
ঘুঘু ফিঙে ছাতারে আর নোড়ে বুকবুকি।
লাগাইয়ে তুল, ডাকিছে বুল্‌বুল্
ডাকে হরিয়াল হাড়ি চাঁচা, কাট্‌ঠোক্‌রা কাদাখোঁচা,
দোয়েল কোকিল কাজ্‌লা কালপেঁচা!
ফইরিদি মদ্‌না, টিয়ে চন্দনা,
ডাকে মন্‌য়া খঞ্জন চাতক চাতকী,
মন বাজবউরি মাছ্‌রাঙা পাপিয়া ময়না!

ডাকে কাক চীল টুনটুনি শালিকি!
ওরে ওই ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী!"

আমার কবিতাপ্রিয় শালিটি বলিল—"মেঘনাদ বাবু, লক্ষ্মীটি—রবি বাবুর তয়েরি একটা মজার গান গাও—যেটা শুন্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ যায়।—সেই যে—

দামু বোসে, চামু বোসে,
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যাখানা বড্ড ফেনিয়েছে।
আমার দামু, আমার চামু!
দামু ডাকেন "দাদা আমার"
চামু বলেন "ভাই,
সারা দুনিয়া খুঁজে এলাম,
মোদের যুড়ি নাই"
আমার দামু, আমার চামু!

কেমন? খুব মজার নয়?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "না ভাই, আজ আমার পালা। সে দিন তোরা আমার কথা শুন্‌লি নে। ইংরিজি গানের ফরমাশ্ কোরে ঐ গোঁয়ার ঠাকুরজামাইর (দেখ্, বোন্ প্রভা তুই রাগ করিস্ নে) হস্তে কেমন লাঞ্ছিত হলি!—আজ আমার কথা বাহাল্ থাক্‌বে, আজ সংস্কৃত গান হবে। গাও তো লক্ষ্মী ছোট ঠাকুরজামাইটি, গাও—

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে।

গাও—

চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী"

আমার প্রথমা শালীঠাকুরাণী বলিলেন "যা বল বউ—ও ভারি কট্‌মটে—ওর্ যদি কিছু মাথামুণ্ডু বুঝ্‌তে পারি!"

পণ্ডিত মহাশয় সরোষে বলিলেন "বড় ঠাকুরঝি, তুমি সকল সময়ে আমার কথার প্রতিবাদ কর। এতটা ঠিক নয়!—এই সুন্দর ললিত জয়দেব-রচিত সঙ্গীত তোমার কাণে কঠোর হোলো, আর সেই শঠশিরোমণি ঠাকুরজামাইর বিজাতীয় ম্লেচ্ছগানগুলি তোমার কাণে শ্রুতিমধুর ঠেকেছিল! সেই ইংরাজি গানগুলির কটা শব্দ তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলে? বলিহারি দিদি, তোমার রুচি!"

বড় শালি ঠাকুরাণী সহাস্যে বলিলেন—"কেন বউমহাশয়, রাগ কর কেন? দুইটা শব্দ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। মনে নেই? ডি—ফ্যা—মে—শন্ আর ডে—ক—য়ি—টি"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। আমার প্রথম শালাজ বলিলেন "এমন ঠগ্ দেখেছ? আমাদের নাকাল করে ছেড়েছিল!"

প্রভা ঠাকুরঝি জনান্তিকে বলিল (কিন্তু আমি বেশ্ শুন্তে পাইলাম) "তা বেশ হয়েছিল—ঘাঁটাতে গিয়েছিলে কেন?"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "আর তোরা ছুঁড়িরা বুঝি কম! তোদের লজ্জা করে না বল্তে? তোরা বুঝি তাকে কম নাকাল করেছিলি? আহা বাছা আমার গোনালি ভেঙে সারা হয়েছিল!"

পণ্ডিত মহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া সহাস্যে বলিলেন "দেখিও ছোট ঠাকুরজামাই, সাবধান! দেখিও তোমার অদৃষ্টে কৃত্রিম—অন্ততঃ দগ্ধকচু না থাকে!"

আমি 'ত গান গাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া—মরিয়া হইয়া আসিয়াছিলাম। "যা থাকে কপালে—হাসে হাস্‌বে, বিদ্রূপ করে কোর্‌বে—লজ্জার মাথা খাইয়া, চোক্ কাণ্ বুজিয়া, তাল রাগ রাগিণীর মাথা খাইয়া, রাসভকণ্ঠে দুইটা গান গাইবই গাইব—অতএব অশুভস্য শীঘ্রম্—শীতের ভয়ে, আদুল গায়ে, তীরে দাঁড়াইয়া, কাঁপিয়া কি হইবে? একেবারে জলে ঝাঁপ দেওয়া ভাল" এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া আমি পণ্ডিত মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "মেজ বৌ ঠাকুরোণ্—আজ্ঞে করুন্ কোন্ ভাষায় গাইতে হবে"

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে বলিলেন "গাও, ঠাকুরজামাই, গাও—

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মনসিজ ধ্বজ চামরে
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ড ডামরে"

আমার প্রথমা শালি বলিলেন বৌ ঠাকরোণ্, তোমার ঐ শিখণ্ডিশিখণ্ড লণ্ডভণ্ড গবা-গণ্ড গান তোমার কাছেই থাক্—। আজ্ সংস্কৃত গান হবে না, হবে না। আজ কেবল খাঁটি বাঙ্গলা গান হবে। ভাই মেঘনাদ, এচ্চে বরং গাইতে পার—

বৃন্দাবনে ব'লে গেছে বাম্নি বৈষ্ণবী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম ষষ্ঠমী!
আর কামরূপেতে কাগ্ মরেচে কাশীধামে হাহাকার!
ওলো সজনি আমার—
নাপ্তে বামা, ধোবা শ্যামা, নাচিছে কেমন!
এক বাপের পেটেতে ওরা জন্মেছে দুজন!
বাবুদ্দের টাট্টু ঘোড়া, সিং উঠেচে দুটো তার!
কার্ত্তিক মাসে চড়ক পূজা হবে এবার,
ওলো স্বজনি আমার!"

পণ্ডিত মহাশয় ছাড়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল! তখন দর্পিতা দলিত-ফণিতুল্য-কুপিতা পণ্ডিত মহাশয় "রোজ রোজ আমার অপমান? তোমরা রাত্রি জেগে আমোদ কর—আমি এখান্ থেকে চল্‌লাম! আমি কর্ত্তার মহলে গিয়ে অনঙ্গ ঠাকুরঝির পাশে গিয়ে শুয়ে

থাক্‌চি। ওমা, এখানে থাকতে আছে? এত অপমান?" এই বলিয়া ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে পণ্ডিত মহাশয় কঙ্কণকিঙ্কিণীশিঞ্জিনীর কোলাহলে গৃহখানিকে কাঁপাইয়া দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে নিষ্ক্রান্তা হইলেন! "ও নাত্ বৌ যাস্‌নে"—"ছি বৌ, রাগ্ কর্‌লি"—"ও দিদি, ফিরে এস, ফিরে এস" বলিয়া রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার জয়াবিজয়াগণ পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে ছুটিল। গৃহখানি শূন্য হইল। আমি এত সহজে "NARROW escape" হইল ভাবিয়া সহাস্যে তাকিয়ায় মাথা দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়, Narrow escape কোথায়? মেয়েলি কথায় বলে "তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে!" অদৃষ্টদেবী আমাকে লইয়া "ওঠ বোস্" করিতেছিল। পাঁচ মিনিট না যাইতে যাইতে দেখি ক্যাপ্‌টেন ও তাহার নাবিকেরা পুনরায় বন্দরে আসিয়া জাহাজ ভিড়াইল। আমি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলাম।

প্রভা ঠাকুরঝি সহাস্যে বলিলেন "ভারি সুখ! না? নিদ্রা যাওয়া হচ্ছিল! রাঙ্গাদিদি, রাঙ্গাদিদি, মেঘনাদ বাবুর ঘাড়ে খানিকটে ল্যাভেণ্ডার্ ওয়াটর্ ঢেলে দাও তো!"

প্রথমা শালাজ বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আমাদ্দের আপোসের ঝগ্‌ড়া দেখে বুঝি "নারদ—নারদ" কর্‌ছিলে? বড়ই আমোদ হয়েছিল, না? কিন্তু দাদা, স্বয়ং বিধাতা এলেও আজ নিস্তার নাই। গলাটা শানিয়ে নাও।"

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন "নাত্‌জামাই,—ভয় নেই। আমরা এখানে ঘণ্টা খানিকের অতিথি। গোটাকতক গান শুনেই আমরা স্বস্থানে প্রস্থান কোর্‌বো। এ ঘরের আসল রাণী শ্রীমতী বিদ্যাদেবী সেজে গুজে তোমার জন্যে ব'সে আছেন—গিয়ে, পাঠিয়ে দিচ্চি—"

আমার কবিতাপ্রিয় শালিটি সহাস্যে বলিল—

"ভেব না ভেব না, বেনোয়ারি,
আসিবে সে, আসিবে সে, অভিসারিকার বেশে,
নব বধূ, তব বর নারী!"

প্রথমা শালি বলিলেন "রেখে দাও তোমাদ্দের কবিতা আর বাজে কথা। সাজ্‌তে গুজ্‌তে দোল ফুরোয়। মেঘনাদ বাবু, তুমি গান ধর"—

আমি বলিলাম "দিদি, গোলাম তো গাইতে প্রস্তুত আছে। কোন্ ভাষায় গাইব—আজ্ঞা করুন্—"

তখন পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে বলিলেন "আমাদের মধ্যে দ্বন্দযুদ্ধে সন্ধিস্থাপিত হয়ে গেছে। এই স্থিরীকৃত হয়েছে যে ইংরিজি, হিন্দি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত সব গানই তোমাকে গাইতে হইবে কিন্তু ইংরিজি গান একটা বই গাইতে পাবে না, তাও পাঁচ ছয় ছত্রের অধিক না হয়। দুটি সংস্কৃত, দুটি হিন্দি গান, আর দুইটি বাঙ্গলা গান—"

প্রভাদেবী সহাস্যে বলিলেন "আর একটি উড়ে গান। আমি সে ইকৃড়ি মিকৃড়ি শুন্‌বোই শুন্‌বো—কিছুতেই ছাড়্‌ব না"—

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন "নাত্‌জামাই—একঘণ্টার ভেতরে সব সারো—তোমার ভালর জন্যেই বল্‌চি—এখন তোমার ইচ্ছে—যে ভাষায় ইচ্ছে প্রথমে গাও"।

আমি মনে করিলাম "ইহাতে কতকটা সুবিধা বটে। তবু কতকটা গোলে হরিবোলে লজ্জা নিবারণ কর্‌তে পার্‌বো। আর সকলের শেষে বাঙ্গলা গান দুইটা ভগ্নগলার দোহাই দিয়া গাব"। এই মনে করিয়া আমি প্রথমে হিন্দি গান ধরিলাম। আমি গাইলাম—

মেহ বর্‌ষে রে চমকে বাদরিয়া!
অওর্ শাস্ চম্‌কে রে, ননদী চম্‌কে রে
চমকি খুল্ গয়ি দূয়রিয়া!
ঝরোখাসে ঝাঁকি মারি, দেখা মৈ ঝরৎ বারি,
সঘন ঘোর গগন সেতর্ দর্ দরিয়া!
বর্‌খামে আগ্ দগি, মেকো চক্‌চোঁধি লগি,—
অটার্ কে নিচে ঠার্ কুঁয়র কন্হৈয়া!
হসি হসি নটবর, দেখল্ উপর,
ধসি গয়ি ছতিয়া মে রিজুরিয়া!
মেঘ বর্‌ষে রে চম্‌কেঁ বাদরিয়া!"—

সে স্থলে যদি কোনো হিন্দিজ্ঞ পুরুষ শ্রোতা থাকিত তাহা হইলে আমার সেই কেকা-দর্পহারী গগনবিদারী সঙ্গীত শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু সুন্দরীরা চৌবে দারোয়ানের "আজু ব্রজমে হোরি মচায়া" ছাড়া আর কোন গান শোনেন নাই, সুতরাং সুন্দরীরা মহাখুসি! আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

আমি বলিলাম "প্রভা ঠাকুরঝি—মনে করেছিলাম তোমার ফর্‌মাশের গান গেয়ে তার পরে আবার হিন্দি গান ধর্‌বো—কিন্তু কোনো ভাল উড়ে গান মনে পড়্‌চে না"।

প্রভা ঠাকুরঝি সহাস্যে বলিলেন "উড়ে গান না হোক—একটা ইকৃড়ি মিকৃড়ি হলেই হোল—গাও, মেঘনাদ বাবু।"

"পাল্‌কি তত্তড় বাহিছি, ভোঁদ্‌ড়ে ও"। (কলহাস্য) পণ্ডিত মহাশয় সখেদে বলিলেন "সন্ধির সময়ে উড়ে গানের উল্লেখ হয় নাই—প্রভা ঠাকুরঝির সবই অদ্ভুত অপরূপ আব্‌দার, ঠাকুরজামাই, তুমি আমার মাথা খাও, আগে গাও এই দুটো—

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি বিরহি জনস্য দুরন্তে
* * *
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—
পততিপতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিসু লোলং
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং

সুন্দরীর শ্লোক আবৃত্তি শেষ না হইতে হইতে বাড়ির বৃদ্ধা ঝি চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল "আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে, তোমরা ওঠ গো, ওঠো গো—এই দেখ, আমার চুল পুড়ে গিয়েছে!"

রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার সহচরীরা সহাস্যে বলিল "যা বুড়ি—যা—শুগে যা। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠে আমাদ্দের দুপুর রাত্রে জ্বালাতন কর্‌তে এসেচে। বুড়ো বয়েসে রঙ্গ দেখে বাঁচি নে। আমরা নীচের সব আকার আগুন নিবিয়ে ওপোরে এসেচি, আগুন কোত্থেকে এল রে আবাগি মাগি"—

পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "এ তোর রত্নাবলী নাটকের ভোজবাজির আগুন। এ সাগরিকার আগুন"!

তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নূতন ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইল। কেশ এলান,—মাথায় কাপড় নাই! ভয়বিকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল "পালাও গো পালাও—এই ঘরের পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে—যদি বাঁচতে চাও তো পালাও। ডাকাত পড়েছে, ডাকাত পড়েছে—বাগানের দিকে পালাও—ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌বার যো নেই। নীচে আগুন, ওপরে আগুন, চারিদিকে আগুন! সিন্দুক, প্যাট্‌রা, বাক্স সব লুটপাট কর্‌চে। পালাও, পালাও। সময় নেই, পালাও।"

আমার তখন ভয় হইল—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। জানেলা দিয়া দেখি, ছাদের ওপাশের ঘরে, মশাল জ্বালিয়া বিকটাকারে মূর্ত্তি সকল বাক্স দ্রব্যাদি সরাইতেছে! ঐ দিকের ছাদে, ঘরে, কানাচে, চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিতেছে! ডাকাতেরা সত্যসত্যই বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে! সুন্দরীরা "কি হবে নাত্‌জামাই, কি হবে ভাই" বলিয়া ভয়-রুদ্ধকণ্ঠে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া "চৌবে" "চৌবে" "দারোয়ান" "দারোয়ান" করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলাম। কে উত্তর দিবে। কেবল চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ! ডাকাতেরা "বম্ ভোলানাথ—জয় মা কালি—হর হর হর" করিয়া বিকট চীৎকার করিতেছে।

কমল ঝি অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল "জামাই বাবু, জামাই বাবু, পালাও পালাও—আমার হাতের বালা কেড়ে নিয়েচে মশাল দিয়ে আমার মুখ পুড়াতে এসেছিল—ও জামাই বাবুর সঙ্গে যুদ্ধু বেধে গিয়েচে—পালাও পালাও"—

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। চীৎকার—হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। এমন সময়ে রক্তাক্ত কলেবরে, হস্তে বন্দুক লইয়া, হরনাথ দাদা উপস্থিত হইলেন!

"খুব বেঁচে গিয়েচি! For God's sake এদ্দের নিয়ে, মেঘনাদ পালাও!—এই কপাট বন্ধ কর্‌লাম্—Damn it—শালারা ইদিকে এসেচে কি গুলি করেচি—দুটো শালাকে বধ করেচি—সব গুলোকে খুন কর্‌বো—Goodness gracious—these are desperate

characters—পদাঘাত—পদাঘাত—পদাঘাতে দোর ভেঙ্গে ফেল্‌বে দেখ্‌চি—বাগানের দিকে পলাও—I will shoot them all ! Take care of these girls—I will follow you within half an hour—Bolt, bolt !—Hasten away !—Pray don't be anxious for me !—I know how to take care of myself"—

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কি করি ? কোথায় যাই ? এই মহাবিপদে পড়িয়া, অন্য কোন কর্ত্তব্য ঠাওরাইতে না পারিয়া, হরনাথ দাদার সঙ্কেত ও আদেশ অনুযায়ী, সভয়ে, সশঙ্কিতচিত্তে, অন্ধকারে পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে, ভয়বিহ্বলা, রুদ্ধকণ্ঠা, বেপথুকলেবরা রাঙ্গাদিদি, শালিগণ, শালাজ-গণ ও তিন দাসীকে লইয়া, সেই সুবৃহৎ বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত অন্তঃপুর-উদ্যানে অবতীর্ণ হইবার জন্য নির্ম্মিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নিম্নে নামিতে লাগিলাম।

কাহারও মুখে কথা নাই, রা নাই ; পাছে ডাকাতেরা আসিয়া আক্রমণ করে !

একবার প্রভা ঠাকুরঝি মৃদু মৃদু সক্রন্দনস্বরে বলিল "ওমা কি হবে গো ?—মাকে আর বাবাকে মেরে ফেলেনি তো" ? অমনি সকলে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল "চুপ্ চুপ" !

আবার গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমরা সকলেই ভয়ে ভটস্থ!

আমি মনে মনে "ত্রাহি মধুসূদন" করিতে করিতে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, উদ্যানে নামিয়া, সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া, বাগানের দূরকোণেস্থিত মাধবীলতার ঘনমণ্ডপে গিয়া এই বিপন্না স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিঃশব্দে বসিলাম।

মাতুলমহ মহাশয়ের সেই "young Hercules" বলিয়া সাদর সম্ভাষণই বা কোথায় ? আর বাল্যসহচরদিগের "বীর মেঘনাদ" বলিয়া সেই প্রীতিপূর্ণ আহ্বানই বা কোথায় ? আমি এই নারীদিগের মধ্যে পড়িয়া, হরনাথ দাদাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিলাম না—এই ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আর যদি ডাকাতেরা কর্ত্তার মহলে গিয়া কর্ত্তা কর্ত্রীকে আর অনঙ্গকে খুন করিয়া থাকে ! আর যদি হরনাথ দাদাকেই সাংঘাতিক আঘাত করিয়া থাকে ! এই সব কথা, আমি কপালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম ! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল—চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

হায় ভগবান !—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, আমারও কি সেই দশা হইল ?

প্রায় আধ ঘণ্টার উপর, সেই মাধবীমণ্ডপের নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে, সেই ত্রাসরুদ্ধ-কণ্ঠা, কম্পান্বিতকলেবরা স্ত্রীলোকগুলিকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া রহিলাম। সেই আধ ঘণ্টা যেন ব্রহ্মার ঘণ্টা !—কিছুতেই শেষ হয় না।

আমার মধ্যে মধ্যে আশঙ্কা হইতে লাগিল "এই মহাবিপদের সময়ে ইহাদের মধ্যে কাহারও Hysteria না হয়। তা হইলেইত' মহাবিভ্রাট" !

এমন সময়ে দুপ্ দুপ্ জুতার শব্দ ! সকলেরই প্রাণ উড়িয়া গেল !—

হরনাথ দাদা সেইরূপে রক্তাক্ত কলেবরে double barelled Henri martini ঘাড়ে করিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কোথা হে মেঘনাদ ভায়া—চল, চল, পালাই—তিনখানা গাড়ি বাহিরে প্রস্তুত—একেই বলে Narrow Escape—Povidential, providential—কর্ত্তা কর্ত্রী আর অনঙ্গকে একখানা গাড়িতে আগেই কল্‌কাতায় রওয়ানা করেছি—আহা কর্ত্তা বাতে পঙ্গু, তাঁকে linger করান ঠিক নয় ভেবে at once পাঠিয়ে দিলাম—পাঁচটা ডাকাতকে kill করেচি—the other rascals have decamped—bolted—ইদিক দিয়ে—ইদিক দিয়ে—এই খিড়কির দোর দিয়ে চল—ওপরে উঠে সদর ফটক দিয়ে যাবার এ সময় নয়—আস্তে, আস্তে—দেখ পোড়ে যেও না—রাঙ্গাদিদি, আপনি আমার হাত ধরুন, শালা ডাকাতেদের বিশ্বাস নেই—আবার ফিরে আস্‌তে পারে—সেই সেবার হাল্‌দারেদের বাড়িতে ডাকাতেরা কি কর্‌লে জান ত ?—বাপ্‌রে, এ বাড়িতে এখন থাকা যায়, না এ গ্রামে এখন থাকা যায় !—গ্রামের police ! তাদের বিশ্বাস কি ? তাদের সঙ্গে যোট না থাক্‌লে কি এ ডাকাতি হয় ?—সাধুচরণটা পালিয়ে গেচে ! ইনি আবার পুরাতন ভৃত্য ! the ungrateful rogue !—চৌবেকে মেরে ফেলেচে ! চুপ্ ! চুপ্ !—এ গোল কর্‌বার সময় নয়—মেঘনাদ ভায়া, এই তিনখানি গাড়ি তোয়ের—আমি সম্মুখের গাড়ির coachboxএ বোস্‌বো—তুমি শেষের গাড়িতে তিন চারজনকে নিয়ে ভেতরে বোসো—রাঙ্গাদিদি, তিন চারজনকে নিয়ে মধ্যিখানের গাড়িতে বসুন—আর বাকি আমার গাড়িতে !—দেখ সাবধান কেউ কপাট খুলে উঁকি মেরো না !—খবরদার !—এ ডাকাতদের বিশ্বাস নেই !—দাদাবাবুরা তো বিডন্ ষ্ট্রীটে থিয়েটর দেখ্‌চেন—সেখানে এদের নিয়ে কোথায় যাব ?—তাই কর্ত্তার ও কর্ত্রীর আমার মতেই মত হ'ল, যে এ বিপদের সময়ে হোগলকুঁড়ে সুরেশ সমাজপতিদের বাড়িতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ—কর্ত্তাগিন্নির গাড়ি এতক্ষণ অনেক দূরে বেরিয়ে গিয়েচে—গাড়িওয়ান ! গাড়িওয়ান !—জোর্‌সে চলাও—যে আস্‌বে বাবা তারই দফা এই Henri martiniর দ্বারায় রফা কোরবো !—সব বসেছ ?—খবরদার, গাড়ির কপাট খুলে উঁকি মেরো না—চল বাবা পক্ষীরাজ—মারো চাবুক্—বক্‌সিস মিলেগা—পহিলা গাড়িওয়ান যিস্ তরফ গয়া হয় উসি তরফ্ চলো—কলকত্তা চলো—কলকত্তা চলো—হোগলকুঁড়িয়া—তেরহ সাং বৃন্দাবন বোস্ লেন—সমঝা" ?

* * * * *

আমাদের তিনখানি গাড়ি গড়্ গড়্ করিয়া কলিকাতার অভিমুখে চলিল !

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   সুর—ঐ

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনি
তুমি থাক সিন্ধু পারে
ওগো বিদেশিনি
তোমায় দেখেছি শরদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে
ওগো বিদেশিনি।
আমি আকাশে পাতিয়া কাণ, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ
ওগো বিদেশিনি।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে
ওগো বিদেশিনি।

।।৩।।[স১ র১ । গ১ গ১ গ১ । সগ১ গ১ গ১ । ম২ মগ১ । র২ রগ১ । র১
[আ মি চি নি গো চি নি তো মা — রে ও গো

গ১ র১ । র১ প১ মী১ । ধপমী১ প২ । —১] গ১ ম১ । প২ র্স১ । নর্স১ নর্সর্র১
— বি দে — শি নি — —] তু মি থা ক সি —

র্সনো১ । ধ১ নো১ নোধ১ । প২ স১ । র১ গ১ র১ । র১ গ১ ম১ । রগ৩ ।
ন্ধু গা — — রে ও গো — বি দে — শি নি

—১ গ১ গ১ । গ১ গ১ গ১ । গ১ গ১ ম১ । ম২ প১ । প১ প২ । ম১ প১
— তো মায় দে খে ছি শা র দ প্রা তে তো মায় দে খে

প১ । পম১ মধ১ পধ১ । পম১ প১ ম১ ।[গ১ গ১ মগ১ । র১ গ২ । ম১ প২ । —৩ ।
ছি মা ধ বী রা — তে [তো মা য় দে খে ছি — —

—১ স১ স১ । র২ রগ১ । রগ১ রগ১ ম১ । গ৩ ।]—১ রসন্১ স১ । রগ১ ম১
— হৃ দি মা — ঝা — — রে]— — ও গো —

গ১ । রগর১ স১ ন্১ । স৩ । —১ স১ স১ । ন্১ র১ স১ । স১ ন্১ ধ্১ । প্৩ ।
বি দে — শি নি — আ মি আ কা শে পা তি য়া কাণ

স১ স১ স১ । স১ র১ র১ । র১ গ১ ম১ । গ৩ । —১ গ১ গ১ । ম১ ম১ ম১ । ম১
শু নে ছি শু নে ছি তো মা রি গা ন আ মি তো মা রে সঁ

ম১ ম১ । মম১ প১ ধপ১ । ম১ প১ ম১ । গ২ মগ১ । রগ১ রপ১ ম১ । গ৩ । গ১
পে ছি প্রা — — — ণ ও গো বি দে — শি নি ভু

গ১ গ১ । গ১ গ১ ম১ । ম১ প২ । —১ প১ প১ । ম১ প১ প১ । মপ১ মধ১
ব ন ভ্র মি য়া শে ষে — আ মি এ সে ছি নূ ত

পধপ১ । ম৩ । —২ গমপ১ । গ১ গ১ ম১ । প১ প১ র্স১ । র্ন১ র্সর্র১
ন দে — — শে আ মি অ তি থি তো মা

র্সনো১ । ধ২ নোধ । প২ ধপ১ । ম১ নোধ১ প১ । ম১ পধপ১ ম১ । গ৩ । —১
রি দ্বা — রে ও গো — বি দে — শি নি —

(আ—প্র)

রাম রাজার মুলুক ।

(প্রথম প্রস্তাব ।)

পুরাণে, জনপ্রবাদে, তিন রামের কথা শুনিয়াছি। ভৃগুরাম, পরশুরাম, এবং রঘুবংশাবতংস,
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম, অযোধ্যাধিপতি রাম। কাল প্রভাবে এই তিনেরই রাজত্ব ও ভূম্যাধিকার
গিয়াছে ; এই তিনের মধ্যে কাহারও "মুলুক" নাই। তবে এই প্রস্তাবশীর্ষোক্ত রাম
রাজার মুলুক যাঁহার, তিনি কোন্ রাম ? এ রামের রাজ্যের বিবরণী বড়ই কৌতুকময়ী, বড়ই
হাস্যর[illegible]সাৎপাদিকা। এ রাজ্য যিনি দেখেন নাই মানব চরিত্রের অনেক অংশ তাঁহার
জানি[illegible]ত এখনও বাকি আছে। দুঃখের বিষয় এই অদ্ভুত মুলুকের লোকেরা রাজ্যের বাহিরে
প্রায়ই আইসে না এবং বাহিরের লোকেরা এ রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে সম্মত হয় না।
ইং ১৮৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত এ মুলুকে বাঙ্গালী প্রবেশ করেন নাই ; ১৮৮৯-৯০ বর্ষে দুইটি মাত্র
বঙ্গীয় [illegible]বা এই রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সুদূর রাজ্যে যাইতে হইলে রেল নাই, উষ্ট্র
নাই, হস্তী নাই, অশ্বযান সতত পাওয়া যায় না, (পাওয়া গেলেও অনেকে ব্যয় ভার বহন
[illegible]ত সক্ষম হয় না), কেবল গরুর গাড়ী চলে। নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন প্রায় একশত
[illegible] দূরে স্থিত। এই এক শত ক্রোশ বা ইংরাজী দুই শত মাইল পথ, অতি কষ্টে, হাতে
[illegible]রাখিয়া, বলদশকটে যাইতে হয়। ভাষা তুমি আদৌ, বুঝিবেনা, আচার বিচারের
[illegible]কের পরমাণু পর্য্যন্ত তোমার সহিত মিলিবে না। তুমি বাঙ্গালী হিন্দু, পথে এ দেশের এ[illegible]
[illegible]রী [illegible] সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উভয়েই দিশাহারা হইয়া পরস্পর ভাবিবে, আমি হিন্দু কি
[illegible]ক্তর [illegible] সে তোমাতে হিন্দুত্বের অণুও দেখিতে পায় না, তুমিও তাহাতে হিন্দুর 'হ' পর্য
[illegible]রের কত পাও না। অথচ তোমরা উভয়েই হিন্দু। তাহাতেই বলিতেছি, এ অদ্ভুত মু[illegible]
[illegible]ণ্ডিত [illegible]য় ?

[illegible]বাঙ্গালাই সুবিস্তৃত মহারাজ্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে সুদূর দক্ষিণে যাইতে হইবে। সতী
[illegible]অত্যাচা জানকীর উদ্ধারব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপ্রধান অঙ্গদের ন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া
যাও, উলিশ-হৃদয়ে মহাসাগর তটে যাইতে হইবে। এই রাজ্য হইতে রাবণের লঙ্কা (সিংহল
) বাষ্পীয় পোতে দেড় দিনের পথ মাত্র। এই রাজ্যেই সুপ্রসিদ্ধ গন্ধমাদন শৈল বর্ত্তমান
ভা[illegible] এই দেশেই কন্যাকুমারীর মন্দির। এই মহারাজ্যে পিতার বিষয় পুত্রে পায় না,
[illegible]নেয় পাইয়া থাকে ; এখানে ব্রাহ্মণে ইচ্ছা করিলে শূদ্রানীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে
[illegible]তাহার অপত্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হয়। এই অদ্ভুত রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা শির হইতে
[illegible]দেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখে ; এখানে ব্যভিচার সমাজ মতে বা আইন মতে অদণ্ডনীয় ;
[illegible] অবধ্য এবং অর্দ্ধ-ঈশ্বর ; রাজা ব্রাহ্মণের দাসানুদাস এবং স্ত্রী যথেচ্ছাচারিণী।
এখানে বার মাসই বসন্ত ঋতু। এই মজার মুলুকের ইংরাজী নাম ত্রিবাঙ্কোর, স্থানীয়

১

DAMAGE PAGES,

RECORD NO. 78

VOLUME CONTINUED

IN

NEXT ROLL NO. B.S.P. - 146 B

END

ROLL NO.

B.S.P. - 146A

রাম রাজার মুলুক।

(প্রথম প্রস্তাব।)

পুরাণে[illegible], জনপ্রবাদে, তিন রামের কথা শুনিয়াছি। ভৃগুরাম, পরশুরাম, এবং রঘুবংশাবতংস, নবদুর্ব[illegible]াদল শ্যাম, অযোধ্যাধিপতি রাম। কাল প্রভাবে এই তিনেরই রাজত্ব ও ভূম্যাধিকার গিয়াছে[illegible]ছ; এই তিনের মধ্যে কাহারও "মুলুক" নাই। তবে এই প্রস্তাবশীর্ষোক্ত রাম রাজার[illegible] মুলুক যাঁহার, তিনি কোন্ রাম? এ রামের রাজ্যের বিবরণী বড়ই কৌতুকময়ী, বড়ই হাস্যরসে[illegible]সাৎপাদিকা। এ রাজ্য যিনি দেখেন নাই মানব চরিত্রের অনেক অংশ তাঁহার জানি[illegible]ত এখনও বাকি আছে। দুঃখের বিষয় এই অদ্ভুত মুলুকের লোকেরা রাজ্যের বাহিরে প্রায়ই[illegible] আইসে না এবং বাহিরের লোকেরা এ রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে সম্মত হয় না। ইং ১৮[illegible]৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত এ মুলুকে বাঙ্গালী প্রবেশ করেন নাই; ১৮৮৯-৯০ বর্ষে দুইটি মাত্র বঙ্গীয়[illegible] যুবা এই রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সুদূর রাজ্যে যাইতে হইলে রেল নাই, উষ্ট্র নাই, [illegible]হস্তী নাই, অশ্বযান সতত পাওয়া যায় না, (পাওয়া গেলেও অনেকে ব্যয় ভার বহন করিতে[illegible]ত সক্ষম হয় না), কেবল গরুর গাড়ী চলে। নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন প্রায় একশত [illegible] দূরে স্থিত। এই এক শত ক্রোশ বা ইংরাজী দুই শত মাইল পথ, অতি কষ্টে, [illegible]াথিয়া, বলদশকটে যাইতে হয়। ভাষা তুমি আদৌ বুঝিবেনা, আচার [illegible] [illegible]মাণু পর্য্যন্ত তোমার সহিত মিলিবে না। তুমি বাঙ্গালী হিন্দু, পথে এ দেশে[illegible] [illegible]সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উভয়েই দিশাহারা হইয়া পরস্পর ভাবিবে, আমি হিন্দু[illegible] [illegible] সে তোমাতে হিন্দুত্বের অণুও দেখিতে পায় না, তুমিও তাহাতে হিন্দুর [illegible] [illegible]ত পাও না। অথচ তোমরা উভয়েই হিন্দু। তাহাতেই বলিতেছি, এ অদ্ভু[illegible] [illegible]ায়?

[illegible]াই সুবিস্তৃত মহারাজ্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে সুদূর দক্ষিণে যাইতে হইবে। সতী [illegible]ায়া জানকীর উদ্ধারব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপ্রধান অঙ্গদের ন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া [illegible]উলিশ-হৃদয়ে মহাসাগর তটে যাইতে হইবে। এই রাজ্য হইতে রাবণের লঙ্কা (সিংহল [illegible]ম্পীয় পোতে দেড় দিনের পথ মাত্র। এই রাজ্যেই সুপ্রসিদ্ধ গন্ধমাদন শৈল বর্ত্তমান [illegible] দেশেই কন্যাকুমারীর মন্দির। এই মহারাজ্যে পিতার বিষয় পুত্রে পায় না, [illegible]ানেয় পাইয়া থাকে; এখানে ব্রাহ্মণে ইচ্ছা করিলে শূদ্রানীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে [illegible] তাহার অপত্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হয়। এই অদ্ভুত রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা শির হইতে [illegible]দশ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখে; এখানে ব্যভিচার সমাজ মতে বা আইন মতে অদণ্ডনীয়; [illegible]ণ অবধ্য এবং অর্দ্ধ-ঈশ্বর; রাজা ব্রাহ্মণের দাসানুদাস এবং স্ত্রী যথেচ্ছাচারিণী। এখানে বার মাসই বসন্ত ঋতু। এই মজার মুলুকের ইংরাজী নাম ত্রিবাঙ্কোর, স্থানীয়

নাম মলয়খণ্ডম্, হিন্দুস্থানী নাম রাম রাজার মুলুক এবং মুসলমান জাতি ইহাকে "
স্থান" (উলঙ্গ দেশ,) বলিয়া অভিহিত করে।

ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া এবারে ইহার ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিব। এই ইতিবৃত্ত লিখিত হয় নাই, সমগ্র রাজ্যটি প্রায় ৬ মাস কাল পর্য্যটন করিয়া রোজ্‌নামচায় বিবরণীমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথমে পথের কথা বলিব। *

ইং ১৮৮৮ অব্দের শেষ ভাগে আমি মাদ্রাজ নগরে উপনীত হই। এই
মহাভারতের সংস্কৃত মদ্র রাজ্য। সত্যবানের পিতা অশ্বপতি এখানে রাজত্ব করি
মাদ্রাজ রাজধানীতে আসিবার পূর্ব্বে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে যে অংশ ভ্রমণ
আসিয়াছিলাম, তথায় তেলুগু ভাষার প্রচলন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এবার দে
তেলুগু লোপ পাইয়া, তামিলের প্রচলন! পূর্ব্বেই তেলুগু শিখিয়া রাখিয়াছিলাম,
কিছু কিছু তামিল ও শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তামিলে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ
আমি দক্ষিণ পথে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে চড়িয়া ত্রিবাঙ্কুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।
রেলপার্শ্বে, বহু নগর ও নগরীতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিয়াছিলাম।
মধ্যে ৪টি মাত্র স্থানের উল্লেখ করিব। প্রথমটির নাম গুলবর্গা, ইহা মাদ্রাজের
কিন্তু হায়দ্রাবাদ নিজামের রাজ্যভুক্ত। এই ক্ষুদ্র নগর বড়ই মনোহর, বড়ই নয়
। এখানকার জল বায়ুও অতীব উৎকৃষ্ট। নগরটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং ধন
। কয়েকটি মনোমোহক মস্‌জিদ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আ
র গিয়াছিলাম, তখন মৌলবী চেরাগ্ আলি এই পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন
নিবাসী, শিক্ষিত, বাঙ্গালীভক্ত এবং সাধুচেতা ছিলেন। দ্বিতীয় নগরের নাম অ
তে Adoni কহা গিয়া থাকে, ইহা বৃটীস রাজ্যভুক্ত। এই প্রাচীন নগরে
এক মহাপ্রাচীন ও মহাবিশাল ভগ্ন দুর্গ দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহা হিন্দু
অধিকৃত ছিল, ক্রমে মুসলমানেরা দখল করেন, শেষে মহারাষ্ট্রগণ প্রবল হইয়া
হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকারে রাখিয়া
এখন বৃটীসসিংহের ইহা পদানত। তৃতীয় নগরীর নাম ত্রিচন্নপল্লী। মাদ্রাজীয়
ও চুরটের জন্য ইহা বিখ্যাত। সাউদ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেন্ট এখানে থাকেন।
যখন এখানে গিয়াছিলাম, তখন সমগ্র নগরীতে প্রায় ৩০ জন বাঙ্গালী ছিলেন।
প্রেসিডেন্সীর কোনও স্থানে একাধারে এত বাঙ্গালী আর কখন দেখা যায় নাই।
নগরী, সেই জগদ্বিখ্যাতা কাঞ্চি। উদ্ভটে আছে—

* পাঠকের কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমরা "রামরাজার মুলুক" আখ্যার অর্থ করিয়া দিতেছি। এই রাজ্য পরশুরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় এবং ইহার রাজারা যে কোনও নামই নামের সঙ্গে "রাম" শব্দ প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এই নাম ('রাম') ব্যবহার করিতে তিনি এই জন্যই হিন্দুস্থানী তীর্থযাত্রীরা রামরাজার মুলুক নাম রাখিয়াছে।—লেখক।

" পুষ্পেষু জাতি, নগরেষু কাঞ্চি "

এই সেই কাঞ্চি। বিদ্যাসুন্দরের সর্ব্বস্বধন সেই সুন্দর "সুন্দরের" এই জন্মভূমি। ইহা হইতেই রাজপুত্র "সুন্দর" ঐন্দ্রজালিক সুন্দর অশ্বে চড়িয়া,

"বর্দ্ধমান হ'তে কাঞ্চি ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥

কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, কাঞ্চির একটা লোকও বিদ্যাসুন্দর শুনে নাই। বর্দ্ধমানের বিদ্যা, হীরামালিনী প্রভৃতির কথা শুনাইলেই তাহারা উচ্চহাস্য করে এবং ভারতচন্দ্রকে উপন্যাস-কবি বলিয়া আখ্যাত করে। কাঞ্চিপুরের রাজপুত্র সুন্দর কখনও বাঙ্গালায় গিয়া ছিল একথা এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে না। শিক্ষিত লোকেরা ভারতচন্দ্রের "কল্পিত গল্প" শুনিতে ভাল বাসে; শতকরা একজনও এখনও এ গল্প জানে নাই।

কাঞ্চিনগরী দুই ভাগে বিভক্ত। এক ... ভাগের নাম শিব কাঞ্চি অপর ভাগের নাম বিষ্ণু
কাঞ্চি। এখানে লোকসংখ্যার মধ্যে ... ১৬র মধ্যে ১২ ব্রাহ্মণ, বাকি ৪র মধ্যে ২ অপর শ্রেণীয়
হিন্দু, ১ মুসলমান এবং ১ দেশীয় কাথ... লিক কৃশ্চান। উভয় অংশেই বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; এই ... সকল মন্দির প্রাচীন, সুদৃঢ়, বহুব্যয়ে নির্ম্মিত এবং বহু
প্রকার শিল্পকার্য্যে ... সুশোভিত। এখানকার পানীয় জল উৎকৃষ্ট নহে, বৎসরের মধ্যে
প্রায় ৮ মাস কাল জঘন্য থাকে। মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহা এক মহাতীর্থ; অনবরত অগণ্য
লোকের গমনাগমনে এই নগরের পরিষ্কারতা ও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকিতে পারেনা। এই
নগরী আর্কট বিভাগের অন্তর্ভুক্তা। এখানে একজন তহশীলদার ও একজন পুলিস ইনেশ-
পেক্টর থাকেন। পুরাকালে এই নগরী ইতিহাসপ্রসিদ্ধা ছিল। এক সময়ে ইহা পশ্চিমো-
ত্তরের কনোজ এবং মধ্যভারতের উজ্জয়িনীতুল্য গননীয়া হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণাবর্ত্তের
পণ্ডিত ও বিবেকীদিগের ইহা প্রসিদ্ধ আশ্রয়ভূমি ছিল। এক্ষণে সে সকল গুণ কিছুই নাই:
বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ যেমন লোভী এবং যজমানের খোষামোদ করিয়া অথবা তাহার উপর
অত্যাচার করিয়া যেমন উদর পূরণ করে, এখানকার ব্রাহ্মণেরাও ঠিক তাহাই। যেথা
যাও, ব্রাহ্মণের "জুলুম" সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান!

কয়েক দিবস পরে আমি তিনেভেলী রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। দক্ষিণ পথে,
ভারতবর্ষে, রেলের এই শেষ সীমা; ইহার পরে রেল চলে নাই। ইংরাজ রাজত্বেরও এই শেষ
সীমা। এই জেলার সীমার বাহিরে গেলেই ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের (ইংরাজ প্রভুত্বের নহে
সীমার বাহিরে যাওয়া যায়। এই জেলায় বহুসংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান বাস করে; বহু
গ্রাম "খৃষ্টানী গ্রাম" হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বার মাস আম্র পাওয়া যায় এবং শী
এখানে মোটেই নাই। নগরটি তাম্রপর্ণীনদীর তটে স্থাপিতা। জল বায়ু ভাল। রেল
ষ্টেশনের নিকটে, লোকাল বোর্ডের যত্নে ও ব্যয়ে, এক সুন্দর পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়া
ইহা এত প্রশস্ত ও সুন্দর যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সপরিবারে এখানে সুখে থাকিতে পারেন! ত

DAMAGE PAGES,

দুই এক দিবস এখানে অবস্থান করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, ত্রিবাঙ্কোরের পথে ৩টি পথিক হত হইয়াছে এবং কয়েক জন পথিকের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। (বলা বাহুল্য, তিনেভেলী হইতেই গলদশকটযোগে ত্রিবাঙ্কোর যাইতে হয়) পর দিবস প্রাতে আমি কলেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম, কথোপকথনে তিনি বলিলেন, "এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে। ইহা ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের দোষ"। এদিকে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্য বলেন ইহা "বৃটীশ শাসনের দোষ"। ফলতঃ যেখানে বৃটিশ এবং দেশীয় রাজ্য একত্র সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উভয় রাজ্যের সীমার অন্তভাগ মিলিয়াছে, সেইখানেই দস্যুতা, হত্যা, প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। কাহার সীমায় অপরাধ ঘটিল, তাহার নিরাকরণ অনেক সময় হইয়া উঠে না, সুতরাং অপরাধীও শাস্তি পায় না। যাহাহউক, কালেক্টর সাহেব আমাকে বলিলেন "আপনার ভয় নাই। বৃটিশ রাজত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপনার গাড়িতে আমি একজন কন্‌ষ্টেবল নিযুক্ত করিয়া দিব। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গাড়ী পৌছিলে, কন্‌ষ্টেবল ফিরিয়া আসিবে" আমি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলাম; বল [illegible] বাহুল্য, সাহেব আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অকটোবর মাসের প্রায় শেষ। সায়াহ্ণ সময়; মু[illegible] মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে; এমন সময়ে পান্থনিবাসে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, ত্রিবাঙ্কুরের ভাষা "মালয়লম্" [illegible] কেমন করিয়া তাহা বুঝিব? তাহারা কেমন করিয়া আমার ভাষা বুঝিবে? মালয়লম ভিন্ন অন্য ভাষা তাহারা জানেনা শিখেনা। চিন্তা করিতে করিতে স্রোত আর এক দিকে দৌড়িল। ভাবিলাম এই সময়ে যদি কোনও বাঙ্গালী কিম্বা হিন্দুস্থানী আমার সঙ্গে থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। অন্ততঃ আর কিছু হউক আর না হউক, একত্রে কথাবার্ত্তা করিতে করিতে যাইতাম এবং বিপদে সাহায্য পাইতাম। বলা বাহুল্য এ পথে বাঙ্গালী আইসেনা; এখন গড়ে ১০ বৎসরে একজন হিন্দুস্থানী আইসে। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী সাধুর খুব গমনাগমন ছিল, ত্রিশ বৎসর হইতে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে বৃষ্টি থামিল, উচ্চ বায়ুর শন্ শন্ [শ]ব্দ বন্ধ হইল, এবং ঠিক এই সময়ে "জয় রামজী কি জয়" কহিয়া দুই মনুষ্য মূর্ত্তি পান্থশালায় [আ]মার কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিলাম, ইহারা হিন্দুস্থানী। দেখিয়াই ভাবিলাম ইহা স্বপ্ন! এমন সময়ে হিন্দুস্থানী কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু তাহারা বাস্তবিকই হিন্দুস্থানী; রেল হইতে অবতরণ করিয়া কাদা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে, পান্থশালায় আসিয়াছে। ইহারা ত্রিবাঙ্কোরে কন্যাকুমারী মন্দিরে "মানসিক শোধিতে" যাইতেছে। ইহারা [illegible] লোক;—স্বামী ও স্ত্রী। উভয়েই বলিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ জাতীয়। একটি পুরুষ, অপরটি [illegible] ইহাদিগকে পাইয়া বিশেষ [আ]নন্দিত হইলাম, ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম এবং এক্ষণে নিরাপদে ত্রিবাঙ্কোর [যা]ইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

(অযোধ্যা হইতে এই পত্রখানি উর্ম্মিলা দেবী বনবাসী লক্ষ্মণকে লিখিয়াছিলেন)

অযোধ্যার রাজপুরী-প্রাসাদ-শিখরে,
আছে যে সুন্দর কক্ষ ঈশান-কোণেতে;
হেরে যেই কক্ষ, মনানন্দে, উর্দ্ধে বসি,
নিম্নতলে অন্তঃপুর-বাটিকার শোভা;
যাহার মালঞ্চ-দর্শী বাতায়ন দিয়া,
রজনী হাস্যার বাস—উষার বাসনা,
প্রবেশি, জাগায় নিত্য কক্ষবাসী জনে;
সে ঘরের গুপ্ত নাম কহিব কি ঋষি?
সে কক্ষের গুপ্তনাম কহিবে কি দাসী?
সে কক্ষের গুপ্তনাম চারু "চন্দ্রশালা।"
এ রহস্য কেহ নাহি জানে এ জগতে;
জানে দুইজন মাত্র—তুমি আর আমি।
বল দেখি, হে যোগীন্দ্র, আমি কোন্ জন?
বোঝ দেখি সর্ব্বময় এই প্রহেলিকা!
সত্যই এ প্রহেলিকা। সকলেই বলে,
জীব যথা ভুলে যায় জনম লভিয়া
পূর্ব্ব জনমের কথা, তপস্বী বিরাগী
তেমতি ভুলিয়া যায় সংসারের কথা,
যে মুহূর্ত্তে করে তুলে লয় কমণ্ডলু!
সেই লাগি হে তাপস! ভয় বাসি মনে
আমাদের কথা পাছে গিয়া থাক ভুলি!
তাই গো এ লিপিমুখে অবতরণিকা
সঙ্কেতের—অন্য অর্থ নাহি রঘুমণি।
এতদূর পাঠ করি, পেরে থাক যদি
চিনিতে অধীনী জনে, করি গো বিনতি,
আর কিছু ধৈর্য্য ধরি (ধীরচেতাঃ তুমি)
সমগ্র এ লিপিখানি পড়িও নৃমণি।
নতুবা—সদয়-হস্তে, খণ্ড খণ্ড করি,
পত্রিকার মৃতদেহ দিও ভাসাইয়া,
চিত্রকূট-পাদচুম্বি নির্ঝর-সলিলে!

*   *   *

যামিনীর অর্দ্ধ ভাগ ফুরায়ে গিয়াছে।
সেই "চন্দ্রশালা" কক্ষে এ ঘোর নিশীথে
আছি বসে একাকিনী, ভাবনা-মগনা।
পার্শ্বে মোর দত্তা সখী (বিবাহের কালে
এসেছিল যে আমার সহচরী হয়ে)
শুয়ে আছে; স্বপ্নঘোরে দেখিছে কত কি!
ঘুমঘোরে কহে শোন্ "উলু দেরে তোরা।"
"যতেক মিথিলা-বাসী উলু দেরে তোরা"
আমাদের উদ্বাহের সুখময়ী স্মৃতি
দত্তার চিত্তের মাঝে জড়ান' রহেছে;
কুহকী স্বপন আজি অসহায় পেয়ে
তাই গো সখীর সাথে করে কত ছলা!
শুনি আজি এ নিশীথে দত্তার এ বাণী,
পূর্ব্বের কাহিনী কত আমারও মনে
হইতেছে জাগরিত;—নিরখি সম্মুখে
ধূ ধূ করি লোলজিহ্বা হোমাগ্নির শিখা
জ্বলিতেছে! হবনীয় সামগ্রী যতেক
সাজান রহেছে সেই বিবাহ-চত্বরে!
জনক রাজার পূজ্য কুলের পুরোধা
এক পার্শ্বে উপবিষ্ট অজিন-উপরি!
সমাসীন সম্মুখে বশিষ্ঠ তপোনিধি,
বৃদ্ধ নৃপমণিদ্বয় উদার-প্রকৃতি,
আর সব জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বের মেলা!
উহারা কে; একাসনে, অবনত-মুখে,
নবীন যুবক আর বালিকা যুবতী।
পুরোধার সুমধুর আবৃত্তির ক্রমে,
কহিছে যুবক ও২ কম্পিত অধরে—
"অগ্নি সাক্ষী—আজি হ'তে মোরা জায়া পতি,
হইলাম একমন এক প্রাণে গাঁথা"।
হে যুবক? কি করিলে? হায় কি বলিলে?
কথাগুলি ফিরে লও, হে তরল মতি;
কথার গুরুত্ব কিছু বুঝে কি দেখিলে?
ভিত্তিতে চাহিয়ে দেখ, হেলিছে আকৃতি!

মুক্তাময়ী চান্দনীর নহে গো ও ছায়া—
শঙ্কর ও শঙ্করীর মূর্ত্তি জলময়ী,
এসেছেন আশিষিতে নব দম্পতিরে !
তোমার এ প্রতিজ্ঞার দরশক তাঁরা,
করিও না সত্য ভঙ্গ, হয়ে জ্ঞান হারা !
ধীরে পশি অন্য এক স্মৃতির আগারে,
হেরিতেছি অযোধ্যার অট্টালিকা চূড়ে,
এই “চন্দ্রশালা” গৃহে, ফুলের শয়নে,
সেই সে নবীন যুবা, বালিকা যুবতী !
বালিকা শুইয়া আছে ; শিয়রেতে বসি
চাহে যুবা তার পানে অনিমেষ-আঁখি !
আঁখি দুটি বাঁধা যেন সে মুখ-কিরণে;
সুধাংশুর মণ্ডলেতে দুইটি তারকা :
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভাব-মুগ্ধ যুবা
রাখিল আপন মুখ বালিকার মুখে !
সুদূর বিমানবাসী কুমুদের সখা,
ব্যবধান-বাধা যেন সহিতে না পারি,
বাপীজলে কুতূহলে ঝাঁপ দিল আসি !
অনুরাগ-বায়ু-ক্ষিপ্ত একটি কুসুম,
রাখি মুখ অন্য এক কুসুম-বদনে,
সুখ-ক্লান্ত হয়ে আর উঠিতে না চাহে !
তরুণ নিদাঘ আসি সোহাগ করিলে,
তরু-শিশু ফলগুলি লোহিত অধরে
করে যথা ঢল ঢল, হায় রে তেমতি
গেল ওই বালিকাটি আহ্লাদে গলিয়া !
ধীরে বালা বাহুযুগ বলয়িত করি,
বাঁধিল যুবার গলা প্রেমের শৃঙ্খলে ;
তমালে বেড়িল যেন স্বর্ণ-লতিকা !
বালিকার চিত্ত হ’ল যুবাচিত্তময়,
হইল বালিকা-ময় যুবার চেতনা !
কার মুখ, কার বাহু, কেহ নাহি জানে,
এমনিই দিশাহারা উভয়ের ধৃতি !
প্রেম-স্বর্ণকার যেন দুইটি আত্মারে,
করিয়াছে এক আত্মা গলায়ে পোড়ায়ে!
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল জ্বলিবে উপরে,
হায় এ পৃথিবী পরে, বিধির বিধানে,

এমনি রহিবে নিত্য সুখের প্রকৃতি !
আত্মার বিস্মৃতি যাহা তারি নাম সুখ,
সুখ যাহা তারি নাম আত্মার বিস্মৃতি !
এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব নর-হৃদয়ের
জানিত না, চাহিত না জানিতে কখন
চতুর্দ্দশ বসন্তের সে আধা যুবতী,
“কেন ভাল বাস ?” যদি সুধাইত যুবা,
গীত-মুগ্ধ স্পন্দ-হারা হরিণীর মত,
যুবার মুখের পানে রহিত গো চাহি !
সে কি গো কহিতে পারে কেন ভাল বাসে ?
কেন সে মুচকি হাসে কানন-কুসুম
সুধাইলে কুসুমেরে কহিতে কি পারে ?
কোন্ সে অদৃশ্য মূর্ত্তি টানি শত বাহু,
লয়ে যায় সরযূরে জাহ্নবী-সকাশে,
হায় গো জাহ্নবীপ্রাণা জানে কি সরযূ ?
সাগরের লতাগুলি কে জানে কি লাগি,
জোছনা-পরশে নাচে আপনা আপনি !

* * *

এক দিন দুইজনে চন্দ্রশালা গৃহে
আনন্দে দাঁড়ায়ে আছে বাতায়ন পাশে !
নিম্নতলে বাটিকাতে তরু ও লতিকা
কতই কতই সুখী !—কুসুমের আত্মা
ছাড়িয়ে কুসুম-দেহ, সৌরভ হইয়া,
দুলিছে তরুর শাখে আনন্দে অধীর !
হের রে সমীর নাচে করতালি দিয়া !
রজনী গন্ধার শ্বেত অলক দোলায়ে,
চুরি করি সরসীতে কুমুদীর হাসি,
বালকদম্বের কম রেণুকণা মাখি,
হের গো সমীর হাসে তালে তালে নাচি !
এলা লতিকার অঙ্গে কর বুলাইয়া,
মোদা-আঁখি সেফালিরে নাড়া চাড়া করি,
বকুলের পাত্রে ঢাকা মধুটুকু হরি,
নাচিয়া নাচিয়া গায় কুসুম-বিলাসী !
চম্পকের শিরে ভর দিয়ে অশরীরি,
চন্দ্রশালা-গৃহ-মাঝে পশিল রে আসি !
সহসা অজ্ঞাতসারে ছুটিয়া সুরভি,

তাহাদের অন্তরের অন্তর প্রদেশে,
একটি ঝাপটে যেন দিল মিলাইয়া,
মায়ামোহ ভালবাসা যত ভাব রাশি !
কি করিবে, কি হইল, কিছুই না জানে,
এমনি স্তম্ভিত হ’ল নবীন দম্পতি !
পশিল যুবার শ্বাস বালার মরমে,
বালার নিশ্বাস গেল যুবার অন্তরে,
সুখের কাননে তারা হারাইল দিশি !
চটুল সমীর ওই বালিকার সাথে,
আড়ালে লুকায়ে থাকি, অরিম্ভিল খেলা !
কিশোর-ললাট-চুম্বী ভ্রূ-যুগ পরশী,
তরল চীনাংশুপ্রায় বালার অলকে,
ইতি উতি কুতূহলে হেলায়ে দোলায়ে,
বার বার লয়ে গিয়ে যুবকের পাশে,
যুবার পুষ্পিতাননে দেয় শোয়াইয়া !
স্বপনের আবছায়া পড়ে গিয়া যেন,
সুপ্ত কোন দেবতার নয়ন-সরোজে !
মনানন্দে হাসে যুবা ; বালার অমনি
দুলে উঠে অবতংস, নাচে উপতারা !
একই শুকতি মাঝে দুইটি মুকুতা
লগ্ন বিজড়িত হয়ে যেন রে একটি !
এক শাখে এক বৃন্তে দুইটি কুসুম
ডাগর “একটি” যেন, দল জড়াইয়া !
হায় এ একত্বে যদি এতই গো সুখ
উহাদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !
ওগো ওরা বড় সুখী আছে দুইজনে।
তোমার কি ক্ষতি বল ? এক পাশে পড়ি
আছে দুটি ?—সুখ স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !
দেখিছ না ? উভয়ের আঁখির আকরে,
ঝলসিছে ইন্দ্রনীল, হীরা রাশি রাশি !
ভ্রূভঙ্গে ঝরিয়া পড়ে প্রবাল মুকুতা !
সংসার-বিভব-প্রার্থী নয় ও দম্পতি !
অবিবাদী জন ওরা—পায়ে পড়ি তব,
উহাদের সুখ স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !

আর এক দিন এই চন্দ্রশালা গৃহে
শুয়ে আছে দুইজনে নবীন দম্পতি।
দেয়ালের এক পাশে বৃহৎ আরসী
আছে রাখা, পেয়েছিলা মহারাজ যাহা
উপহার, পাঞ্চালের নৃপতির কাছে।
সুখিনী যামিনী যেই কর বাড়াইয়া,
পূরব সমুদ্র হ’তে তুলিয়া যতনে,
পূর্ণ-শশধর রত্নে ভূষিলা কবরী,
প্রতিবিম্ব তার আসি পড়িল অমনি,
এ চারু কক্ষের এই আয়ত মুকুরে !
করতালি দিয়া বালা উঠিল হাসিয়া
কহিল “হ চারুচন্দ্র ইচ্ছা করে তোমা,
চিরবন্দী করে রাখি এই সে মুকুরে” !
সম্বোধি যুবকে পুনঃ কহিল বালিকা
“কি সুন্দর ! হের নাথ মুকুর-ভিতরে” !
নয়নে দুরন্ত হাসি, আনন্দ অধরে,
টানি আনি বালিকারে দর্পণের আগে,
সহর্ষে কহিলা যুবা “আরসি-ভিতরে
চন্দ্রে চন্দ্রে কোলাকুলি দেখ ইন্দুমুখি”।
আপন বুকের কাছে টানিয়া যুবারে
কহিলা আনন্দময়ী “হে চতুরবর,
দেখ দেখ, দর্পণে চন্দ্রের ছড়াছড়ি !
আজি হ’তে এই কক্ষ নব অভিধান
পাইল গো—অযোধ্যার চারু চন্দ্রশালা”

* * *

হে সৌমিত্রি সব কথা ভুলে কি গিয়াছ ?
সে সুখ-উৎসবে ছিলে তুমিই দেবতা,
সে কম সরসে ছিলে চক্রবাক তুমি।
কঠোর হৃদয় যার, নিতান্ত তরল
স্মৃতিটি কি হয় তার ? সংসার-সৈকতে
এত দিন যেই খেলা খেলিনু দুজনে,
সে কি শুধু বারি-লেখা বালুকা-উপরি ?
মাটির পুতুল সব ওই যে কোণেতে,
কতই যে আদরের সামগ্রী উহারা
আছিল গো এক দিন, এবে যেন তারা
উপেক্ষা ও অবহেলা সহিতে না পারি,
স্পন্দহারা শূন্যনেত্রে কহিছে বিদ্রূপে,

"শাসকেরো শাস্তি আছে উর্ম্মিলা 'সুন্দরী' !
ময়ূরীরে ক্ষেপাইতে কতবার আমি,
রাখিতাম ময়ূরেরে অন্য ঘরে পুরি !
সকরুণ কেকাশব্দে ডাকিত শিখিনী ;
হাসিতাম মহাহ্লাদে বিদ্রূপের হাসি !
এবে পাখী কাল বুঝি, ছাদের প্রাঙ্গণে,
আমারেই লক্ষ্য করি, গ্রীবা ফুলাইয়া,
কহে থাকে মর্ম্ম-কথা তাণ্ডবের ছলে,
"শাসকেরো শাস্তি হয় উর্ম্মিলা সুন্দরী !"
সুন্দর রথের চক্র পদাঘাতে ভাঙি,
সুকল বীণার তার ছিন্ন ভিন্ন করি,
কুঠার-আঘাতে দলি দোহলী-অশোকে,
বল রাজঋষি কোন্ পৌরুষ লভিলে ?
কি ধর্ম্ম পালিলে বল প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া ?
তুমিই না সত্যবাদী ! বলে গিয়াছিলে
"ফিরিয়া আসিব উমু তিন দিন পরে ?"
অবোধ বালিকা-মন, ছলাকলাহীন,
যা শিখাতে তাই শিখি তোতার মতন !
সরসীর স্বচ্ছ বুক, পুলিন উপরে,
তরুলতা গুল্ম জীব—যা যেখানে দেখে—
আগ্রহে হৃদয়ে ধরে অসঙ্কোচে যথা,
তেমতি তোমার কথা বেদবাক্য মানি,
আথরের মালা গাথি ধরিতাম হৃদে !
অবোধে গো ঘৃণা করি তাই কি ছলিলে ?
এক দিন—দুই দিন—তিন দিন পরে
শুনিনু, ফিরেছে রথ কানন হইতে !
তাড়াতাড়ি দ্রুতপদে অর্দ্ধ বিবসনা,
মাণ্ডবী দিদির কাছে গেলাম ছুটিয়া।
সুধাইনু "বল্ দিদি কে এসেছে রথে ?"
"কে আর আসিবে বোন্ ? শূন্য রথ শুধু ;
ফিরিয়া এসেছে বৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথী।"
শুনি কথা শিরে যেন বাজিল অশনি !
কত কষ্টে লজ্জা দুই আঁখির জোয়ার
রোধিল, তবুও হোল ছল্ ছল্ আঁখি !
আশয়ে মাণ্ডবী দিদি, বুঝিয়ে সকলি
উৎসঙ্গে লইল মোরে ; "ছি বোন্" বলিয়া,
সোহাগ যতনে দিল অশ্রু মুছাইয়া !
স্বার্থপর অশ্রু, তুই থাক্‌রে পড়িয়া,
হৃদয়ের অধস্তল স্তরের তলেতে।
তোরই কি এত দুঃখ ? অতি বৃদ্ধ রাজা
পুত্রশোকে অভিতপ্ত, বিসর্জ্জিলা দেহ,
বৈতরিণী-সহোদরা সরযূর নীরে !
আজি এ শোকের গৃহে, শূন্য মরু স্থলে,
বিরহের সুখ-গাথা বিনায়ে বিনায়ে,
ভগ্ন হৃদে উচ্চৈঃস্বরে কি হবে গাহিয়া ?
বরং করিব আমি হাহাকার-ধ্বনি,
মহারাণীদের সহ আছাড়ি ভূতলে !
বরং বিবশা দেবী কৌশল্যার মত,
প্রিয় নৃপতির দেহ সাপটি দুভুজে
আটকিব শবাসনে ; করুণ চীৎকারে,
কাঁদাইয়া জ্ঞাতি বন্ধু, কুটুম্বের মেলা !
হায় গো সে ভীম দৃশ্য স্মরণ করিলে
এখনও দেহ হয় ভয়ে কণ্টকিত !
তোমরা যুগল ভ্রাতা আর জানকীর
নামের রুদ্রাক্ষ-মালা জপিতে জপিতে,
মুমূর্ষু রাজার প্রাণ হইল বাহির !
রোদন চীৎকার আর দীর্ঘ হা হুতাশ,
অকালিক বৈধব্যের সকরুণ রোল,
গতায়াত অর্থলোভী মহাপাত্রদের,
ভীম কোলাহল যত নাগরিকদের,
পুরোধার স্বস্ত্যয়ন গগণ বিদারী,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস আর ঘূর্ণিত ঝটিকা,
করিল এ আমাদের দীন প্রাসাদেরে,
জ্বলন্ত শ্মশান কিম্বা জীবন্ত সমাধি।
সত্য দেব, সেই দিন হইতে এ পুরী
হয়েছে সমাধি-স্থল ; আজি এ নিশীথে,
দীপ-আধারের এই সম্মুখে বসিয়া,
আমি যেন যোগাসীন স্তব্ধ অন্ধকারে !

* * *

এক দিন আশা-দীপ জ্বলিল আমার
হৃদয়ের অন্ধকারে ; শুনিনু চকিতে,
যাবেন ভরত রাজা ভেটিতে রাঘবে,
সাধিয়ে আনিতে পুনঃ তোমা সবাকারে।

কতই মন্ত্রণা আর কতই যুকতি
করিলাম "দত্তা" সহ ! আঁটিনু মানসে,
মোরা দুই জন সখী, ছদ্মবেশ ধরি,
"ভর্-থরি যোগী" সাজি, চমূসহ মিলি,
চিত্রকূটে গিয়া দেব হেরিব তোমারে।
সন্ন্যাসীর উপযোগী বেশভূষা যত
নানা যত্নে আহরিয়া, সুচতুরা সখী,
গুপ্তভাবে লুকাইয়া আইল রাখিয়া,
সরযূর তটস্থিত "যোগেশ্" মন্দিরে
মধ্যাহ্ন রজনী যবে, হয়েছে নিশুতি,
দত্তাসহ বাহিরিনু সভয়-অন্তরে
বোধ হ'ল মোর যেন—নির্জীব প্রকৃতি,
তরুলতা চারি ধারে, তারাও যেন গো,
স্কন্ধ-শাখা-বাহু-স্থিত তর্জ্জনী হেলায়ে,
"কোথা যাও" বলি তারা করিল ভ্রূকুটি
অত্যাচারী হত্যাকারী পাপিষ্ঠের মত
মোরা যেন ঘোর চোর !—এই ভাবে, ধীরে,
পশিলাম সশঙ্কিতে শঙ্কর-মন্দিরে
এক পাশে মন্দিরেতে প্রস্তর-আধারে
জ্বলিছে প্রদীপ-শিখা ; করিতে প্রণতি,
মাথা নোঙাইনু যেই, ব্যোমকেশজটা
নড়িল ; বিস্তারি ফণা, লোলজিহ্বঅহি,
ধাইল সরোষে যেন আমাদের পানে
ভীত হৃদয়ের কল্পা নহে সে কল্পনা
সত্যই শুনিনু দেব, বামদেশে উমা
কহিল সুস্পষ্ট স্বরে "একি রাজবধূ
আচার ! চোরের মত চাহ তেয়াগিতে
অযোধ্যা ? কলঙ্কে তর ডুবিবে জগৎ !
ভানু ও চন্দ্রের মত হবে কলঙ্কিত !"
সহসা বশিষ্ঠ দেব, রাঘব-পুরোধা,
কি জানি কেমনে তথা আসি উপস্থিত
"উর্ম্মিলে" !—আমাতে যেন নাহি আমি আর!
"ভয় নাই—চেয়ে দেখ"—এত বলি ঋষি,
আমার চক্ষের আগে ধরিলা অদ্ভুত
দীপ্তি-ছটা-উদ্গারিণী "মায়ার আরসী" !
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোর অশক্ত-নয়ন
মুকুরের রশ্মিজালে হইল গ্রথিত !
হায় দেব, কি দেখিনু ? কেমনে বলিব !
তোমার সুকান্ত মূর্ত্তি প্রেম-উদ্ভাসিত
দেখিনু সে মুকুরেতে ; পদপ্রান্তে তব,
দানবের কন্যা এক, ভুবনমোহিনী,
তোমার সরোজমুখে সতৃষ্ণ-নয়নে
চাহিতেছে ! প্রেমভিক্ষা যাচিছে রূপসী !
"আর কি দেখিতে চাও" ? জিজ্ঞাসিলা ঋষি—
"না—না" বলি, আমি দশ অঙ্গুলি বিক্ষেপে
ঝাপিনু বদন মম ; লজ্জা, ভয়, ঘৃণা,
আত্মার ধিক্কার আর অবসাদগ্লানি,
ক্ষণেকের তরে মোর হরিল চেতনা !
তার পর ? তার পর, ধীরে ধীরে, ধীরে,
ক্লান্ত শির প্রস্থাপিয়া দত্তার কাঁধেতে,
আবার ভবনে দেব আসিলাম ফিরি !
সে রাত্রে শপথ করি বলিতেছি দেব,
নিদ্রা আইল না চক্ষে, সে চিত্রের কথা
ভাবিতে ভাবিতে, হল অবসান নিশি।
বিহীন-মাধুরী-রস বালিকার প্রেম—
নাহি তাহে প্রাণ স্ফূর্ত্তি, নাহি নবীনতা ;
নিত্য-নব-রঙ্গিণী সে রূপসীর প্রেমে
তাই কি মজিলা দেব ? অথবা আমার
চিত্তভ্রান্ত ; গত রাত্রে, আকুলি ব্যাকুলি,
সে চিত্রের অবশেষ কেন না হেরিনু ?
শয্যা ত্যজি, উষা-কালে, মনের আবেগে,
ভ্রমিতে লাগিনু একা উদ্যানাভিতরে।
"কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে মাধবী-লতিকা
সহকার-তরু বিনে কভু নাহি বাঁচে" ?
এত বলি, রঙ্গ করি, এক লতিকারে,
তুমিই রোপিয়াছিলে শ্রীফলের মূলে !
দৈব ক্রমে, আন্ মনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হইলাম উপস্থিত সেই তরু-তলে।
কি দেখিনু ? দেখিলাম, হতশ্রী হইয়া,
ভূমিতলে লতিকাটি পড়িতেছে লুটি !
তার দুঃখ হেরি. মোর দুঃখ গেল চলি—
পোড়া অধরেতে হাসি আসিয়া জুটিল !

ভাবিনু "শ্রীফল তুমি প্রণয়-উদ্যানে!
কোন্ সে রূপসী পারে তোমারে ভুলাতে"?
মিথ্যা চিত্র; হিয়া মোর পূরিল আশ্বাসে।
সৃষ্টি ছাড়া তুমি দেব; জনপদ হীন
হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যানী!
সে স্থানেও কেবা আছে তোমার-মতন?
গাত্র-কণ্ডূয়ন যবে করে কুরঙ্গীর
কুরঙ্গ, কুরঙ্গে তার ফিরাও কি আঁখি?
যে সরসে রবি দেব সতৃষ্ণ-বদনে
চাহেন নলিনীপানে, বীতস্পৃহ ঋষি,
তাহারে কুনীর স্পর্শ কর না কি তুমি?
লইতে সমিৎকুশ যাও না কি তথা,
যথায় অযত্নসিদ্ধ আরণ্যআদরে
রাখে তরু ব্রততীরে ছাঁদি বাহু-পাশে?
জানকীর পদতলে বিঁধিলে অঙ্কুর,
বাম করে ধরি সেই চরণ সুঠাম,
ব্যস্ত যবে হন্ রাম সুখময় দুঃখে,
তুমি কি সলজ্জ হয়ে, থাক অধোমুখে?

* * *

গেল দিন, গেল মাস, দুটি বর্ষ গত,
মাধুরীর ভাব যবে ধরিল নিরাশা,
মুছিনু চক্ষের জল, দত্তারে পাঠায়ে,
সরযূ-মৃত্তিকা দেব গৃহে আনাইনু।
আমি গো রাজার বধূ; কুম্ভকার সাজি
গড়িলাম বিরহের মোহন বিগ্রহ!
সেই মূর্ত্তি লুকাইয়া রাখিনু যতনে
এই চন্দ্রশালা-গৃহে; নিশীথে দিবসে,
যখনই অবসর পাইত এ দাসী,
পূজিত গো বিগ্রহেরে আগ্রহ অন্তরে!
কহিতাম "হে বিরহ, শক্তিময় দেব,
কত শিক্ষা শিখিলাম তোমার নিকটে!
প্রেম-দর্শনের-সূত্র তুমিই শিখালে;
নিরাশার চন্দ্রাননে কত যে মাধুরী
তুমিই দেখায়ে দিলে, হায় রে দেখালে
তোমারই মূর্ত্তিভেদ আশা ও নিরাশা!
হৃদয়ের শত শত শোণিত-শীকর

ঢেলেছি চরণে তব; শান্তিছাগ-শিশু
কাটিয়াছি খড়্গাঘাতে তোমার মন্দিরে;
কত শত সুখ-মেষ দিয়াছি গো বলি!
নও কি প্রসন্ন তুমি দাসীর উপরে"?
আমার এ গুপ্ত পূজা, মন্থরা রূপসী
জানিতে পারিল দেব, না জানি কিরূপে!
এক দিন (মনে নাই কোন্ ব্যপদেশে)
প্রবেশি এ কক্ষে মম, অন্ধ মনে যেন,
সচঞ্চল তার সেই চরণআঘাতে
বিগ্রহের চারু মূর্ত্তি ভাঙিয়া ফেলিল!
মূর্ত্তি গেল গড়াগড়ি; ক্ষমিও গো নাথ,
ঝরিল একটি অশ্রু আঁখি হ'তে মম!
কিন্তু দাসী অপ্রতিভ হইল না কিছু।
কহিল "ভালই বধূ হইল তোমার;
বিরহ ঘুচিল—হবে মিলন এবার"।
হাসিয়া ফেলিনু আমি; মনে মনে তারে
কহিনু "চন্দন আর ফুল রাশি রাশি
পড়ুক্ সুমুখে তোর—তাই হোক্ দাসি"।

* * *

হে বাঞ্ছিত, তোমার সে দণ্ডক-কাননে,
যান্ নাকি ঋতুমণি ফুলধনু-সাথে,
শিশিরান্তে? মাতে নাকি বসন্ত-উৎসবে
জীবরাজ্য, তরুরাজ্য, আনন্দে অধীর,
নব-রসে বিপ্লাবিত একই আহ্লাদে?
যেন কোন যাদুকর মহামন্ত্র-বলে,
অসাড় প্রাণীর চিত্তে অমৃত চেতনা
ঢালি দেয়; সুকৌশলে দেয় জাগাইয়া
মুগ্ধময়ী ভাবগুলি, ঢুলু-ঢুলু-আঁখি!
হায় সে দুর্দমনীয় বন্যার প্লাবন,
বিশাল দুবাহু তুলি, কেমনে অবাধে
দেও ঠেলি? শঙ্করের অংশ কি হে তুমি?
কোন্ মন্ত্রে ব্যর্থ কর কুসুম-সায়কে?
হায় সে মধুর কালে, পুলিন-প্রদেশে,
নিবিড় করবী-কুঞ্জে ফুলশয্যা পাতি,
কোন এক নদীকন্যা নবীন ষোড়শী,
(যৌবন-লাবণ্যে মরি ঢল ঢল বপু!)

বাঁধে নিজ ভুজপাশে গন্ধর্ব্ব সখারে!
আরো কাছে, আরো কাছে, শিহরি আবেশে,
উভে টানি লয় উভে!—সে দৃশ্য কি, দেব,
তব চক্ষু জিতেন্দ্রিয় পায় না দেখিতে?
স্নানান্তে ঝরণা-পাশে আর্দ্র-কেশ-রাশি
বসিয়ে বন-দেবতা!—ভুলাইতে তারে,
কত না ললিত রাগ রাগিণী ঝঙ্কারি,
বন কদম্বের তলে, কয়র চারু বীণা,
গায় গো বাসন্ত গীতি গন্ধর্ব্ব কুহকী!
নর-চিত্ত-উন্মাদিনী সে ধ্বনি কি দেব,
তব কর্ণ জিতেন্দ্রিয় পায় না শুনিতে?
হায় যে বাসন্তী জ্যোৎস্না পরতে পরতে,
প্রবেশিয়া তরুরাজী-পল্লব-শ্যামলে,
সরাগ-কুসুম-লতা-পরাগ-কেশরে,
জড় পরমাণু দলে দেয় ঘটাইয়া
তুমুল পরশ-স্পৃহা, তাহার পরশ
পড়ে না কি দেহে তব আয়স-কবচে?
এই তন্ত্র, মহামন্ত্র, শুহে মহাগুরু,
দেও মোরে শিখাইয়া,—তা হ'লে আমিও
বসন্ত-উৎসব-দিনে, শ্রুত কীর্ত্তি যবে,
আপাদমস্তক, ঋতুপুষ্পআভরণা,
সুমিত্রা-জননী-পদে নমে সুহাসিনী,
যামিনীতে নিদ্রা যাব বিহীন-ভাবনা!

* * *

হে যোগীন্দ্র, আমার এ নীরস সম্ভাষে,
নহি গো সাহসী আমি, করিবারে তব
যোগভঙ্গ; ক্ষুব্ধ হয়ে শাপ দাও পাছে।
আর দুই চারি কথা সংক্ষেপে বিবরি,
করিব পত্রের শেষ রোষ-শূলপাণি!

* * *

ভ্রাতৃপ্রেম মধুময় বিদিত সংসারে;
কিন্তু দেব অন্যপ্রেম নাহি কি জগতে?
মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, নহে কি কিছুও?
হায় রে দাম্পত্য-প্রেমে নাহি কি মিষ্টতা?
মিটে না কি তাহে কভু প্রাণের পিয়াস?
ঘুচে না কি তাহে কভু শরীরের গ্লানি?

আনে না কি জ্যোৎস্না কভু? অকূল-পাথারে
হয় না কি, বল দেব তারণ-তরণী?
নাহি কি শকতি তার বাসন্ত হিল্লোল
বহাতে দারুণ শীতে? করিতে নিদাঘে
সুধাবৃষ্টি? বরিষায় ঝঙ্কারিতে পিকে?
ভেবে দেখ ক'টি হিয়া হয়ে গেল চুর!
সর্ব্বগ্রাসী ভ্রাতৃপ্রেম এমনি মধুর!

* * *

গুটিকত শুষ্কফুল লিপিমধ্যে পূরি,
পাঠাতেছি ঋষিবর তোমার সকাশে।
একদিন ফুলগুলি মালার আকারে
গ্রন্থিত ছিল গো সূত্রে। ভুবনমোহন,
নরদেবযক্ষলোকে রূপে অতুলন,
একটি সুন্দর যুবা, কণ্ঠেতে আমার
দিয়াছিল পরাইয়া অতুল যতনে!
কে সে যুবা? সৌম্যমূর্ত্তি! পার কি বলিতে?
আপনি গো আপনারে ভুলিবে কেমনে?
সেইদিন, অনশ্বর উজ্জ্বল অক্ষরে
উর্ম্মিলার স্মৃতিপটে আছে গো অঙ্কিত!
সেইদিন, নিশিমুখে, পালঙ্কে বসিয়া,
জাগিয়া দেখিতেছিনু সুখস্বপ্ন কত!
হেনকালে, ধীরি ধীরি, অস্ফুট চরণে,
দুই কর দিয়া তুমি পিছন হইতে
ঢাকিলে দু আঁখি মম! বামাস্বরে পুনঃ
সুধাইলে ছল করি "কে বল'ত আমি"?
জানি শুনি রঙ্গ করি দিলাম উত্তর—
"তুমি মোর দত্তা সখী, কেবা আর তুমি"?
হাসিয়া উঠিলে তুমি হাত সরাইয়া,
হাসির তরঙ্গে আমি গেলাম ভাসিয়া,
চারি চক্ষে হাসাহাসি কতই হইল!
শেষে নাথ! মোর কণ্ঠে বাহু জড়াইয়া,
প্রাণভরে প্রেমাদরে চুম্বিলে আমারে!
দুই পাখা বিস্তারিয়া, আপনা পাশরি,
নব আম্র কিশলয়ে চুম্বে যথা অলি!
তার পর, কত যত্ন কতই আদরে,
হে রসিক! কণ্ঠে মোর দিলে দোলাইয়া

জীবন-দুর্দ্দিনে ভেদি নিবিড় জলদে
পুষ্পদাম ; উৎপ্রেক্ষিয়া কহিলে কত কি !
কতই হরষে আমি ধরিলাম হৃদে
পুষ্পদাম ; হায় নাথ জানিতাম যদি,
ভুজঙ্গিনী হারাকারে বেষ্টেছে আমারে,
তা হ'লে উহারে দেব অন্তরঙ্গ ভাবি,
ভুলিয়াও কখন কি ধরিতাম হৃদে ?
সেই মালা, পরদিন, আনিল ডাকিয়া
বিরহের কালরাত্রি ; পরদিন তুমি,
ছলিয়া বালিকা-মন নাগরী-কৌশলে,
(হে বীর, অক্ষয় হোক্ বীর-কীর্ত্তি তব) !
গেলে চলি, বীরেশীরে অবীরা করিয়া !
হে ধার্ম্মিক ! বড় এরা বিশ্বাস-পালক
পুষ্পগুলি ; কাজ তব সেধেছে যতনে ;
ভাবি উপকার কত সাধিতেও পারে ;
তাড়াতাড়ি পাঠাতেছি তাই তব পাশে—
এরা তব স্নিগ্ধজন রীতি-ব্যবহারে !

*　　　*　　　*

শাস্ত্রে কহে "ছায়া যথা বস্তুঅনুগামী,
তেমতি অনুগামিনী পতিব্রতা নারী
স্বামির ; স্বামীই তার মতি আর গতি" !
হে স্বামি ! কেমনে তুমি নিজে গুরু হয়ে
না দিলে পালিতে ব্রতধর্ম্ম ? নারী-ব্রজে
যুগে যুগে ঘুষিবে অখ্যাতি অভাগীর !
সরোষে কহিবে তারা ভাল আকুঞ্চিয়া
"প্রাসাদের রাজভোগ তেয়াগি উর্ম্মিলা,
ধিক্ তারে !—প্রবেশিতে নারিল কাননে
পতি-সঙ্গে ; ধন্য সেই অসামান্যা সীতা" ।
হে ধর্ম্ম, তুমিই সাক্ষী, তোমার চরণ
কায়মনোবাক্যে যদি করে থাকি পূজা,
প্রক্ষালিও বিষদিগ্ধ এ ঘোর কলঙ্ক !
কহিও "যে বিহঙ্গিনী নহে উচ্চভাষী,
কলকণ্ঠ নহে সে কি ? স্থির শান্ত নদী
যায় না কি অবশেষে সাগর-সঙ্গমে ?
দেহ প্রাণ করে ক্ষয় স্বামি-মূর্ত্তি-ধ্যানে
যে নারী প্রাসাদে থাকি, রাজভোগ যত
করে তুচ্ছ, হায় সেই বিধবা সধবা,
দেহান্তে কি সুরলোকে, "পতিব্রতা-ধামে"
পায় না গো স্বর্ণাসন ? বেষ্টি তার গলা,
সুরবালা দেয় না কি নাগেশ্বর-মালা" ?

*　　　*　　　*

হে নাথ ! তোমার পাশে থাকিলে এ দাসী
কতই কতই সুখ ভুঞ্জিত সর্ব্বদা !
তুমিও পাইতে সুখ ; শুনি "সুখ"-কথা,
মুখ-ভার করিও না, করি গো বিনতি !
মৃগয়ার অন্তধ্যায় হতাম না কভু
দিবসেতে ; যাহা ইচ্ছা করিতে অবাধে !
তারা যথা ডুবে থাকে অদৃশ্য হইয়া
সূর্য্যালোকে, থাকিতাম একধারে পড়ি !
আবার যেমতি তারা যামিনী আইলে,
চন্দ্রের উৎসঙ্গে উঠি হাসে সারারাতি,
তুমি যদি বনকুঞ্জে আদর সোহাগে
টানিয়া লইতে মোরে—স্বামী-সোহাগিনী
হায় আমি !—একেবারে যেতাম গলিয়া !
লতার বিতান লঙ্ঘি ; পাদপ যুগল,
শাখে শাখে পত্রে পত্রে হয়ে বিজড়িত,
রোধে যথা বন-পথ, কর দিয়া তথা,
পত্র-অবচ্ছেদ-মাঝে বাতায়ন রচি,
যুগল-খদ্যোত-সম উধাও অধীর,
নিশীথে নিবিড় পথে ভ্রমিতাম দোঁহে !
যে ঘোর কাননে কভু পারে না পশিতে
রশ্মিজাল—তার মধ্যে অবকাশ রচি,
আনিতাম অকস্মাৎ পূর্ণ শশধরে !
পলাত আঁধার দৈত্য চকিতে সভয়ে !
সে কুঞ্জের বনদেবী, বহুকাল পরে
পেয়ে মুক্তি, আশিষিত আমা দোঁহাকারে !

*　　　*　　　*

সমীর বিচ্যুত লতা ভূমে লুটাইলে,
সযতনে তরু কাঁধে দিতাম জড়ায়ে !
তীর-তরু হেঁট হয়ে হেরিত বিস্ময়ে
সুন্দর নলিনী মুখ , রবিগত-প্রাণা
নলিনী, সঙ্কটাপন্না হোত গো আঁধারে !

দম্পতির দূতী হয়ে, পরম যতনে,
তরুর নিবিড়-শাখা দিতাম সরায়ে !
পথ পেয়ে, রবিদেব, রাখি একধারে
বিমান, অধীর হয়ে, পশিত হরষে
কমলের জলময় কেলি-কুঞ্জ-ধামে !
নাগরের বরকান্তি-রূপেতে ভাস্বর
হইত সে চারুকুঞ্জ ! আদর-হিল্লোলে
হেলে দুলে ফুল্ল হোত সুখী সরোজিনী !

*　　　*　　　*

জীর্ণতরু কোটরের বৃদ্ধ গৃধ্ররাজে
তুষিতাম মনোমত আহারীয় দিয়া !
শুক সারী ঝাঁকে ঝাঁকে আসি যে তরুতে
বসে নিত্য, তার তলে সদয়-মুষ্টিতে,
দাড়িম্বের কণা সুখে ! দিতাম ছড়ায়ে ।
কপোত কপোতবধূ যে তরু-শিখরে
বাঁধে নীড়, তার তলে, অঞ্চল ভরিয়া,
রাখি আসিতাম নিত্য নীবারের কণা !
এই ধর্ম্ম আচরণ হেরিয়া প্রকৃতি,
ফুল্লচিত্তে পুরস্কার দিতেন দাসীরে !
চীরধারী রাজবধূ-রাজবালা-পরে
হ'ত তাঁর কৃপাদৃষ্টি ; অলক্ষিত-ভাবে,
রাখিতেন লতা কিম্বা বিটপির শাখে,
বাসন্তী দুকূল আর রত্নময়ী সাড়ি !
ক্ষণকাল-তরে সুখে, চীর-বস্ত্র ছাড়ি,
পরিতাম রত্ন-ভূষা ; সহাস-বদনে,
দেখিতাম একজনে ; সেই একজন
অতৃপ্ত-আয়ত-চক্ষে চাহিয়া থাকিত !
নয়নের আড় আর করিতে নারিত !

*　　　*　　　*

গিরি-চূড়ে কতবার হেরিতাম দোঁহে
দীপ্তিময়ী বনৌষধী ! প্রমোদ-কাননে
দেবকন্যাগণ যেন জ্বালিয়া রেখেছে
দীপমালা, প্রকৃতির বিটপি-ঝালরে !
পুনঃ উপত্যকা-ভূমে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হেরিতাম সেইরূপ অরণ্য-তিমিরে
সুন্দর উৎকট দীপ্তি !—বনৌষধি-ভ্রমে
ধাইতাম সেই দিকে—অমনি চকিতে,
সশঙ্কিতে, বাহুযুগে জড়ায়ে আমারে
আটকিতে ! ত্রাস-ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠেতে
কহিতে "নহে গো প্রিয়ে হেরিতেছ যাহা
সঞ্জীবনী বনৌষধি—সাক্ষাৎ শমন
হের ওই লম্বমান অজাগর ফণী !
সাত নৃপতির ধন জিনিয়া অতুল,
উগ্দারিছে জ্যোতিশ্ছটা ভুজঙ্গম-মণি !
ফণি আর মণি মাঝে পার্থক্য করিতে
কে পারে ? এ শির হ'তে হরিতে তোমারে
কে পারে ? তুমিও মম ভুজঙ্গম-মণি" !
সে আশ্লেষে, সে সোহাগে, আদর-সাগরে,
ডুবিয়া যাইত মোর আশঙ্কা ও ভীতি !
অম্লান-বদনে আমি রহিতাম চাহি
অহি-পানে ; স্থিরপ্রভা জ্যোতির সহায়ে,
হেরিতাম রাক্ষসের চিত্রময় দেহে,
নাগবালাদের কত শিল্পময় কৃতি !

*　　　*　　　*

করবির কুঞ্জে পশি, শাখা দোলাইয়া,
ফেলিতাম ধরা-পরে প্রত্যেক কুসুমে !
প্রভাতে অরণ্য-বাসী, সেই পথ দিয়া
যেতে যেতে, পুষ্পলীলা হেরিত যদ্যপি,
কহিত "এ বনে থাকে কিন্নর কিন্নরী ;
তাহারাই প্রতি রাত্রে করে এই লীলা" !

*　　　*　　　*

কভু আচম্বিতে দোঁহে ত্রাস-রুদ্ধ-শ্বাসে
হেরিতাম কুঞ্জ এক চিত্ত-বিমোহন !
পুষ্পগুলি জ্বলে তথা মাণিক্যের মত ;
অলৌকিক গন্ধ তার প্রাণ-উন্মাদন !
একাধারে ধূপধূনা চারু দীপাবলী
জ্বালিয়া রেখেছে যেন প্রকৃতি সুন্দরী !
কুঞ্জমাঝে পুষ্পময় সুখের শয্যাতে,
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্ব-বধূ মগ্ন প্রেমালাপে !
সুধাত গন্ধর্ব্ব যবে ভাব-ভগ্ন-স্বরে
"ভাল কি বাসিস্ মোরে" ? হৃদয়-ভীতিরে
স্বভাব-সুলভ মম চাপল্যে ডুবায়ে,

কহিতাম "না গো" অতি ক্ষীণভগ্নস্বরে !
বাধিত তুমুলদ্বন্দ্ব দম্পতির মাঝে !
ত্রস্তভাবে পলাতাম মোরা জায়া-পতি !

* * *

কভু শুনিতাম মোরা, বাজিছে অদূরে
বন-বীণা ! বাজাইছে মোহিনী অপ্সরা
কি কৌশলে ! চিত্তহরা এমনি সে গীতি,
হেলেনা দোলে না তরু ;—মোহিত হইয়া,
শোনে গীতি ! পক্ষীসব অবাক উৎকর্ণ !
নিঃশঙ্ক নিস্পন্দ নেত্রে হরিণ হরিণী
ঘেঁষে ঘেঁষে বসে আসি আমাদের পাশে !
কলনাদী হংসকুল, সন্তরণ ছাড়ি,
শ্রেণী গাঁথি, পুলিণেতে দাঁড়ায় আসিয়া,
জড়কল্প, শ্বেত-শিলা বিরচিত যেন !
নৃত্যশীল ময়ূরের চারু বর্হরাশি,
ছাড়ি ঊর্দ্ধ চক্রভাব ধরিত সহসা
ঋজুতা, এমনি মরি অদ্ভুত সে গীতি !
শুনিতে শুনিতে মোর উন্মত্ত পরাণে
হ'ত সাধ, উচ্চকণ্ঠে, পরাণ ঢালিয়া
মিশাইতে গানে গান, রাগেতে রাগিণী !
পরিণাম অবিচারি, আপনা পাশরি,
আমরা দুজনে মিলি উঠিতাম গাহি !
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্, আক্রোশ-বিকৃত,
অদৃশ্য বীণার তার উঠিত গো বাজি !
শেষে ক্ষীণ অপ্রসন্ন নিরাশার সুরে
সমীর-সাগর-বক্ষে মিলাইয়া যেত !
কোকিল পঞ্চম আর ময়ূর প্যাখম,
লীলাময় গাত্রদোল তরুলতা সরে,
রাজহংস জলকেলি, আঁখির হিল্লোল
হরিণী, পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশ ধরিত !
স্বপ্নময় যেন ঘোর নিদ্রা-অবসানে !

* * *

সন্ধ্যাকাল ! বেলা যবে করে ঝিকিমিকি,
চক্রে চক্রে অন্ধকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
আসিয়া বসিত যবে তটিনী-উরসে,—
এলাইয়া কেশরাশি, কেশের তরঙ্গ
তটিনী-তরঙ্গে ঢালি, "নদী-কন্যা" সাজি,
থাকিতাম মধ্যজলে আকণ্ঠ ডুবিয়া !
বনাশ্রম-পানে তুমি প্রত্যাগম-কালে,
অবশ্য যাইতে সেই নদী-তট দিয়া !
অকস্মাৎ আচম্বিতে হেরিতে আমারে !
সুন্দর অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নদীকন্যা ভাবি,
একদৃষ্টে, স্তম্ভিত ও চিত্রিতের মত,
রহিতে তাকায়ে তুমি সেই মূর্ত্তি-পানে !
ধীরে ধীরে অন্ধকার-কুজ্‌ঝটির মাঝে,
কল্পনাসম্ভূত মূর্ত্তি মিলাইয়া যেত !
যেন কিছু আলাভোলা আন্‌মনা হয়ে,
পশিতে কুটীরে তুমি ! আর্দ্র-কেশ-বেশে
আমিও ক্ষণেক পরে যেতাম সত্বরে !
বিস্ময়ে সুধাতে "একি" ?—কহিতাম হাসি,
"আমি সেই নদীকন্যা, তব চিরদাসী" !
তার পরে, রুষি নদ, আনন্দের রোষে,
প্রসারি বাহুর শাখা, বেষ্টিত নদীরে !

* * *

ভাল কথা এল মনে ; রমণী-আনন
বিষাক্ত তোমার পক্ষে, কিন্তু তব পাশে
যায় যদি শান্তমূর্ত্তি পুরুষ সুধীর
বনাশ্রমে, তাহারেও উচিত সৎকারে
ভেটিতে কি রঘুমণি তব শাস্ত্রে মানা ?
পুণ্ডরীক নামে ঋষি—নিশ্চিত তাহারে
ভুলিয়া গিয়াছ দেব ; দুই একবার
মিথিলায়, বহুবার দেখিয়াছ তারে
অযোধ্যায়, কিন্তু দেব ছিল না তোমার
বন্ধুত্ব, তাহার সাথে—নিশ্চিত নৃমণি,
স্মরণ নাহিক তব তাহার আকৃতি !
গুরুপুত্র পূজাস্পদ তাতের আমার
এই পুণ্ডরীক দেব ; বহুকাল হ'তে
উদাসীন, বীতস্পৃহ সংসারের প্রতি !
তীর্থযাত্রা-উদ্দেশেতে যাইবেন তিনি
চিত্রকূটে ; বড় ইচ্ছা ভেটিতে তোমায়,
উচিত সৎকারে তারে তুষিও নৃমণি !
নবীন যুবক সেই পুণ্ডরীক ঋষি

কিন্তু তোমা হ'তে কনিষ্ঠ ; দিও না লজ্জা—
অর্ঘ্য-নীরে নিজে তার ধুইও না পদ !
ঘন ঘন চাহিও না তার মুখ-পানে !
হায় তপস্বীর ব্রতে নবীন সে ব্রতী—
বার বার করিও না তাহারে বিব্রত
কুটপ্রশ্নে ; রাত্রি হ'লে শোয়াইও তারে
নিজ পাশে, মহাযত্নে, অজিন-আসনে !
গভীর, গভীর রাত্রি !, বনজ অনিল
দোলায় ঈষৎ ওই শিরিষ-পল্লবে ;
বসিছে কুটজ-শাখে নিঃশব্দে নীরবে
সারি সারি আভাময়ী বন-খদ্যোতিকা !
ঘুমাও, ঘুমাও দেব ; বার বার কেন
উঠিছ চমকি তুমি ? পুণ্ডরীক ঋষি
সুখে নিদ্রা যাইতেছে তোমার পারশে !
তুমি কেন আজি অনিদ্র ? শরীর তব
হয়েছে কি আজি অসুস্থ ? চমকি কেন
চাহিতেছ বার বার পুণ্ডরীক-পানে ?
বিস্ময়ে তাকায়ে কেন চাহিছ নৃমণি ?
অঘটন ভাবিও না তপো-বিভাবসু !
উষ্ণতর বহিতেছে পথিকের শ্বাস
পথক্লেশে ; স্বপ্নে হেরি মিথিলা-নগরী,
দুরু দুরু কাঁপে অই পথিকের হিয়া ;
তাপসের সুখ-খিন্ন সুকর-অঙ্গুলি
যেন কোন প্রিয়দত্ত সামগ্রীর ভ্রমে
পর্শিছে ললাট তব ; চারু ওষ্ঠ-যুগ
সদ্য-বিকশিত-দল কুসুমের মত
ব্যবহিত ; যেন তারা করিছে প্রতীক্ষা
নিশির-শিশির-বৃষ্টি, প্রাণময়ী সুধা !
ওকি ! ওকি ! ধড়মড়ি সহসা কেন গো
শয্যা ত্যজি লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলে ?
জাগ্রতে কি দুঃস্বপন হেরিলে নৃমণি ?
শূন্য স্বচ্ছ আকাশের চন্দ্রাতপ হ'তে
পড়িল কি ভুজঙ্গিনী তোমার উরসে ?
পর্ব্বত-ফটিল-বাসী বৃশ্চিক দুর্ম্মতি
দংশিল কি তব অঙ্গুষ্ঠে ? রোষাগ্নি কেন
জ্বলে চক্ষে ? আঁখিদ্বয় আয়ত বিস্ফারি
কটমট চাহ কেন অতিথির পানে ?
নহে ও তাপস !—ওযে ছদ্মবেশী নারী !
হে পুরুষ ! তাহে তব কিবা বল ক্ষতি ?
হে নায়ক ! নহেক ও খোটি পর নারী !
গাঢ়তর—গাঢ়তর—ঘোর আলিঙ্গনে
বাঁধ ওরে ; অদর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহে,
কণ্ঠে গণ্ডে ওষ্ঠযুগে দাও গো ঢালিয়া
তপ্তোষ্ণ চুম্বন শত—সুধা রাশি রাশি !
গৃহ ছাড়ি—পুরী ছাড়ি—ছদ্মবেশ ধরি,
এসেছে উর্ম্মিলা আজি নাথের সকাশে !

* * *

হে কল্পনা, এত দূরে পৃষ্ঠে মোরে আনি,
বন-অশ্বিনীর মত, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি,
ফেলিলে, আঘাত বড় লাগিয়াছে বুকে !
তাপস বালক যথা বৈহায়সী গতি
শিখি নব, দুঃসাহসে আত্মম্ভরী হয়ে,
শূন্য মার্গে উঠি দূরে, যায় গো পড়িয়া
রুক্ষ ধরণীর বক্ষে, আশা চূড় হ'তে
নিরাশার অন্ধকূপে গেলাম পড়িয়া !
হে বিধাতঃ কেন মোরে মানব করিয়া
সৃজিলে ? দেবতা যদি করিতে আমারে,
কল্পনাও দৈব-বলে সত্য হ'ত আজি !
অহো এই মর্ম্মভেদী নিরাশ-ঝঞ্ঝনা !

* * *

হে যামিনি, নিত্য তুমি অনিচ্ছু পোহাতে ;
আজি কিন্তু চিরপ্রথা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া,
চাহিছ পোহাতে শীঘ্র ! ম্লান শশধর
শশব্যস্তে পশিছেন পশ্চিম আকাশে !
অর্দ্ধস্ফুট কমলের সৌরভ আহরি
কক্ষমাঝে বিচরিছে যামান্ত-সমীর ;
আনন্দে মেলিছে আঁখি কুসুম যুবতী ;
নড়িচে নীড়ে বিহঙ্গ ; স্তুতি-আয়োজন
উষারাণী-বৈতালিক করিছে পাপিয়া !
সকলে আনন্দ মগ্ন ; আমি শুধু হায়
নিরানন্দ ! আয় পত্র, শেষ করি তোরে
নিরানন্দে, গুটিকত শেষ কথা কয়ে !

দূতী তুই, বিনিয়োগ করিছে উর্ম্মিলা
কি যে দশা উর্ম্মিলার কহিস্ তাঁহারে।—
"এইরূপে নিত্যদেব! যামিনী পোহালে
সৃষ্টি-ছাড়া-ভাগ্যধরী দুঃখিনী উর্ম্মিলা
ঘোর অন্ধকার হেরে উষার আননে!
সান্ধ্য তারা ঝলে তার অদৃষ্ট-আকাশে"!
রে পত্র কহিস্ তাঁরে "হিমানী-কুহেলী
উর্ম্মিলার শারদীয় মুখ-শশধরে
করিয়াছে মেঘাচ্ছন্ন!—বিপরীত বিধি"!
"যৌবন-বসন্তে বহি তপ্ত ঘূর্ণ বায়ু
করিতেছে জরাজীর্ণ শ্যামল পল্লবে"!
"মানস-সরসে যত সরোরুহ-দল
দিন দিন হিমক্লিষ্ট, পঙ্কিল, মলিন"!
আর কি কহিবি তাঁরে, বল্, বর্ণ-দূতি?
উর্ম্মিলার জানাবার কিবা আর আছে?
জানাস্ উর্ম্মিলা-হৃদে, চিন্তার দংশনে
এমনি দারুণ এবে হয়েছে যন্ত্রণা,
বিষাদ-কালিমা মাখা মুখ নিরখিলে,
নিষ্করুণা নিজে হায় উঠেরে শিহরি!
জানাস্ জানাস্ পত্র, উর্ম্মিলা-আনন
এমনি হয়েছে এবে অস্থি-চর্ম্ম-সার,
মাতৃক্রোড়ে, দূর হ'তে, উঠে শিশু কাঁদি,
আতঙ্কে মানসে তারে উপদেবী ভাবি!
জানাস্ জানাস্ পত্র, জানাস্ তাঁহারে,
কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, নিশীথে প্রভাতে,
অযোধ্যার রাজপুরি-পরেত ভূমিতে,
কভু চীরগ্রন্থি বাসে অর্দ্ধ বিবসনা,
আধা-বিমণ্ডনে কভু বিহ্বলা মোহিনী,
শ্লথ-বিলম্বিনী-জটা, জ্ঞানবুদ্ধিহারা,
আপনি আপন মনে শত প্রলাপিনী,
যেন কোন হারা-রত্ন অন্বেষণে রতা,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ছায়াদেহময়ী,
একটি রমণী-মূর্ত্তি ঘোরে অবিরত!

ঋগ্বেদের সময়।

জগতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে ঋগ্বেদই সে সকলের শীর্ষস্থানীয়। বেদ পর্য্যায়ের "ত্রয়ী", শব্দ দ্বারা ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদকেই বুঝাইত। অথর্ব্বের তখনও উৎপত্তি হয় নাই সুতরাং উক্ত তিন বেদে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু যজুর্ব্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ শুক্লযজুঃ বা বাজসনেয় সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে তাহাও নিন্দারূপে; সুতরাং শুক্ল যজুঃ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলনের পরে রচিত হয়। কালের করাল চক্রে মিশ্র, কাল্‌ডায়া, চীন আদি প্রাচীন দেশসমূহের প্রাচীন পুস্তকগুলি নিষ্পেষিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র এই দেববাঞ্ছিত ভারতবর্ষের অমূল্য রত্ন বেদই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুজাতিরও মর্য্যাদা প্রচারিত হইতেছে—তাহাদের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসই আজ পর্য্যন্ত এই অমূল্য ধনকে গৃহের অলঙ্কার করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনতা প্রযুক্ত বেদ দুর্ব্বোধ হইয়াছে এবং আমরা তজ্জন্য তাহা পাঠ করি না সত্য কিন্তু বেদের ধর্ম্ম ও বিষয় প্রতিপাদক মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ করিয়া সেই ত্রুটি পূর্ণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য মনীষিগণ বেদের মূল্য জানিয়া তাহা পাঠ করিতেছেন। তাঁহাদের পথানুসরণ করিয়া আমরাও যে বর্ত্তমান সময়ে বেদপাঠে অল্পবিস্তর মনোযোগী হইয়াছি এই উপকারের নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

সকল বেদেই ঋগ্বেদের অল্প বিস্তর ঋক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাম ও যজুঃ ঋগ্বেদের অনুচর বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলের সোমযাগ ও সোমস্তুতির অধিকাংশই সামবেদে স্থানলাভ করিয়াছে। বাজসনেয় সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক ঋগ্বেদের বিষয়। অথর্ব্ব বেদের পদ্যময় ভাগের একষষ্ঠাংশ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় চরণ-ব্যুহমতে ঋগ্বেদে ১০৫৮০ ঋক্, সামবেদে ৮০১৪, সাম, সব্রাহ্মণ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে ১৮০০ যজুঃবামন্ত্র, সশুক্রিয় বালখিল্য বাজসনেয় সংহিতায় ৩৮০০ মন্ত্র, ও তাহার ব্রাহ্মণে (শতপথ) ১৪২০০ মন্ত্র আর গোপথ ব্রাহ্মণ সহিত অথর্ব্ববেদে ১০০ পাঠক ও ১২০০০ মন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সময় অবধারণ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে, ইহাতে তদ্বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে কালভাগ নিম্নরূপে প্রদত্ত হইয়াছে—৬ প্রাণে ১ বিনাড়ী, ৬০ বিনাড়ীতে ১ নাড়ী, ৬০ নাড়ীতে ১ নক্ষত্র অহোরাত্র। এই প্রকার ৩০ সংখ্যায় ১, নক্ষত্র মাস; ৩০ সূর্য্যোদয়ে ১ সাবন মাস; সংক্রান্তি বা রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমনের নাম সৌর মাস এবং ৩০ তিথিতে ১ চান্দ্রমাস হয়। আমাদের প্রায় সকল কার্য্যেই চান্দ্রমাসই ব্যবহৃত হইত;* তবে যজ্ঞ কার্য্য ও বিবাহাদি এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন সৌরগণনা দ্বারা সম্পন্ন হইত; সুতরাং আমাদের সকল কার্য্যেই চন্দ্র সূর্য্যের এমনি সৌভ্রাত্র ভাব দৃষ্ট হয় যে, একের অভাবে অন্যের কার্য্য অচল হইয়া যায়। যজ্ঞ কার্য্য ঋতুদ্বারা পরিচালিত হইত, সূর্য্যদেবই ঋতুর সংঘটনের উপায়; সুতরাং চান্দ্র ও সৌর গণনার পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিবার অর্থাৎ পঞ্জিকা শুদ্ধ করিয়া যাগযজ্ঞের উপযোগী করিবার ইচ্ছা হিন্দুদিগের মনে কর্ম্ম কাণ্ডের প্রারম্ভ হইতেই জাগরূক ছিল। যে সময়ে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার পরিভ্রমণ করেন, তাহাকে চান্দ্রমাস বলে এবং নক্ষত্র সম্বন্ধে যে পথে তাহা সংঘটিত হয় তাহাকে নক্ষত্রচক্র বলে। এই নক্ষত্রচক্র ২৮ ভাগে বিভক্ত ছিল; সেই গুলিই আমাদের জ্যোতিষের অশ্বিণী ভরনী ইত্যাদি। চন্দ্র প্রতি দিন এক এক নক্ষত্ররূপ পান্থশালায় বাস করিয়া প্রায় ২৮ দিবসে প্রারম্ভ স্থান বা স্বীয় আবাসে গিয়া পৌঁছিতেন কিন্তু পৃথিবীর নিকট পৌঁছিতে তখনও তাঁহার দুই দিবস থাকিত। চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকিতে মাস পূর্ণ বা পূর্ণিমা হইত তাহা সেই নক্ষত্র হইতে স্বীয় নামকরণ গ্রহণ করিত।

নক্ষত্র	মাস	নক্ষত্র	মাস
রেবতী অশ্বিনী	আশ্বিন	পুনর্বসু পুষ্যা	পৌষ
ভরণী কৃত্তিকা	কার্ত্তিক	অশ্লেষা মঘা	মাঘ

* মাস অর্থে চান্দ্রমাসই বুঝাইয়া থাকে, যেমন পূর্ণিমার নাম পৌর্ণমাস। সকল দেশেই প্রথম চান্দ্রমাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রের বিচিত্র কলাক্ষয় ও কলাপূরণের দৃশ্য মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতেই ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে তাহার কালজ্ঞাপনোপযোগী ভাবটিও উদিত করিয়া দিয়াছিল। কোন কোন জাতির মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেবল চান্দ্রমাসই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

নক্ষত্র	মাস	নক্ষত্র	মাস
রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা	মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ	পূর্ব্বফাল্গুনী বা উত্তরফাল্গুনী	ফাল্গুন
হস্তা চিত্রা	চৈত্র	মূলা পূর্ব্বাষাঢ় উত্তরাষাঢ়	আষাঢ়
স্বাতী বিশাখা	বৈশাখ	শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা	শ্রাবণ
অনুরাধা জ্যেষ্ঠা	জ্যৈষ্ঠ	পূর্ব্বভাদ্রপদা উত্তর ভাদ্রপদা	ভাদ্র

নক্ষত্র হইতে মাসের নাম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত দেখা যায় অন্য কোন দেশে এপ্রকার নাই সুতরাং ইহা মৌলিকত্বার একটি নিদর্শন।

সূর্য্যদেব যে পথে পরিভ্রমণ করেন তাহার নাম রাশিচক্র। নক্ষত্রচক্রে পরিভ্রমণ কালে রাশিচক্রের সীমার বহির্গত সুদূর উত্তরস্থিত অভিজিন্নক্ষত্রেও বক্রগতি চন্দ্রদেবকে সময়ে সময়ে আসিতে হইত এই কারণেই নক্ষত্রচক্রে অভিজিতের নাম দৃষ্ট হয় কিন্তু পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তগ্রন্থে রাশিচক্র ও নক্ষত্রচক্রের সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার ভাব যখন জ্যোতিষী-গণের মনে উদিত হইল তখন অভিজিৎকে নিষ্কাষিত করিয়া নক্ষত্র সংখ্যা ২৭ করা হইল, সুতরাং আমাদের মতে যাহা নক্ষত্রচক্র ছিল তাহাই কালে রাশিচক্র হইয়া দাঁড়াইল। পাশ্চাত্য মতে ঠিক তাহা নহে; যে হেতু স্বাতী Arcturus আমাদের অনুসৃত রাশিচক্রের মধ্যস্থ হইলেও পাশ্চাত্য রাশিচক্রের বহির্গত। তবে সামঞ্জস্য কিসে হইল জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। আমরা বলি প্রতি নক্ষত্রের সমভাগবিষয়ে—রাশিচক্রকে ২৭ দিয়া ভাগ দিলে প্রতি নক্ষত্র ১৩ অংশ ২০ কলায় সমানরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, ২৮ দিয়া ভাগ দিলে তাহা হয় না। এই মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্যোতিষীগণের অভিপ্রায় ছিল; তাঁহারা নক্ষত্রচক্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিবার কখনও চেষ্টা করেন নাই। যদিস্যাৎ তাহা করিতেন হিন্দু জ্যোতিষের মৌলিকতা আমরা দেখিতে পাইতাম না এবং তাহা হইলে উপস্থিত বিষয়ে আমাদের হতাশ হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইত।

হিন্দুগণের জ্যোতিষের আর একটী মৌলিকতা—কালভেদে কোন একটী নক্ষত্রকে আদিরূপে গণনা করিয়া যজ্ঞারম্ভ ও বিষুবাদি সম্পাদন করা। যে সে নক্ষত্র ধরিয়া কার্য্য করিতে গেলে হিন্দুগণের সকল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইত। বসন্তকালে যজ্ঞারম্ভ করিতে হয়—"বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষাং যজেৎ"। এই বসন্ত সময়ে সূর্য্য দেব যে নক্ষত্রে প্রবেশ করিলে ক্রান্তিপাত হইত তাহাই সেই কালে প্রথম নক্ষত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত এবং তাহা হইতে একাদিক্রমে ২৭ নক্ষত্র গণিত হইত। যেমন সূর্য্য সিদ্ধান্তাদির সমসময়ে বাসন্তিক ক্রান্তি-পাতস্থ নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, পরাশরের সমসময়ে উক্ত নক্ষত্রের নাম ভরণী (ভরণীর ১১ অংশ), বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সমসময়ে উক্ত নক্ষত্রের নাম কৃত্তিকার আদি বা ভরণীর শেষ; ব্রাহ্মণাদির সময়ে উক্ত নক্ষত্রের নাম কৃত্তিকার যোগতারা ইত্যাদি। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ক্রমে প্রদর্শন করিব যে ক্রান্তিপাত রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রাতে ত ছিলই, হিন্দুদিগের আদিম অব-স্থায় যে তাহা পুনর্ব্বসুতে ছিল তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের সময়ে উক্ত নক্ষত্রের নামটি

উত্তরভাদ্রপদা কিন্তু আমাদের গণনা নিরয়ণ মতে হইয়া থাকে বলিয়া আমরা সহসা তাহা জানিতে পারি না, তবে অয়নাংশ দ্বারা তাহা অবগত হইতে পারা যায়। অপিচ এ সময়ে হিন্দুরাজাও নাই, হিন্দু জ্যোতিষীও নাই, যাগ যজ্ঞের বড় কেহ ধারও ধারে না, সকলেই সর্ব্বেসর্ব্বা। জ্যোতিষী পঞ্জিকাকারগণ যাহার যা ইচ্ছা তাই কালী কলমে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। বিবাহাদির সময়ে ও মার পূজার সময়ে লগ্ন ও সন্ধি লইয়া যে এত আগ্রহ তাহার কোন মূল্য নাই—তাহা কেবল বাগ্বিতণ্ডা ও বাহ্বাস্ফোটন, ঊর্দ্ধকেশসঞ্চালন ও ক্রোধের ক্রীড়াভূমি৭

বৎসরের দুইপ্রকার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম যজ্ঞারম্ভ বা বসন্ত ঋতু হইতে, দ্বিতীয় শিশির ঋতু বা উত্তরায়ণ হইতে। প্রথম মতে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা দেবতার ঋতু বা দেবযান ও শরৎ হেমন্ত শিশির পিতৃঋতু বা পিতৃযান, অর্থাৎ সূর্য্যদেব যখন উত্তরে গমনাগমন করেন তখন দেবঋতু এবং যখন দক্ষিণে গতায়াত করেন তখন পিতৃঋতু হয়। দ্বিতীয় মতে শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম উত্তরায়ণ এবং বর্ষা শরৎ হেমন্ত দক্ষিণায়ণ। নক্ষত্রের গণনা যেমন বসন্তের ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ হইত, মাসের গণনা সেই প্রকার শিশির বা উত্তরায়ণ হইতে আরম্ভ হইত। নক্ষত্রের নাম হইতে মাসের নামকরণ হইয়াছে এই কারণেও বৎসরের দুই প্রকার আরম্ভের আভাস পাওয়া যায়। যেমন কৃত্তিকাতে বসন্তের ক্রান্তিপাত হইল; তাহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ ১৮০ অংশ পরে কার্ত্তিকমাসের শেষে শারদীয় ক্রান্তিপাত হইল। যখন পূর্ণিমায় মাস পূর্ণ হইল তাহার ১৮০ অংশে সূর্য্যদেব অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং যে কালে মঘা পূর্ণ-মাসীতে উত্তরায়ণ হয় তখন সূর্য্যদেব যে মঘায় দক্ষিণায়ণ আরম্ভ করেন তাহার সন্দেহ নাই। বেদে লিখিত আছে ফাল্গুনী ও চিত্রা পূর্ণমাসীতে বৎসরের আরম্ভ হইত। সায়নাচার্য্য এই স্থলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে বসন্তের আরম্ভ ঐ সময়ে হইয়া থাকে কিন্তু এ স্থলে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন, যে হেতু তিনি স্বীয় সময়ের ঋতুর অবস্থান ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অথবা ফাল্গুনশ্চৈত্রোবসন্ত, মুখং বা এতৎসম্বৎসরস্য যৎফাল্গুনী পূর্ণমাস ইতি শ্রুতেঃ। এবং চ সৌরচান্দ্র ভেদভিন্নং বসন্ত দ্বয়মুপসংগৃহীতং ভবতি।' চিত্রাপূর্ণমাসোহপি বসন্তর্ত্তু মধ্যপাতি-ত্বাৎসম্বৎসরস্যমুখমেব।" বেদে বৎসরারম্ভের উক্ত প্রকার লিখন দেখিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষী-গণ স্বীয়সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অয়নের দোদুল্যমানাবস্থার কল্পনা করিয়া ফেলিলেন কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বেদের প্রতি অত বাধ্যতা স্বীকার করিবার আব-শ্যকতা কি? সুতরাং তাঁহারা নিরীহ ব্রাহ্মণগণকে জালকারী কপটী মিথ্যাবাদী ইত্যাদি মধুর ভাষায় তুষ্ট করিতে লাগিলেন।* যাহা হউক এস্থলে যে বৎসরারম্ভ দ্বারা শিশির ঋতু বুঝাইতেছে তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি।

নক্ষত্রোদয়ের সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন একটী নক্ষত্র ক্ষিতিজে (horizon) দৃষ্ট হইল; দর্শকের মস্তকোপরি (Zenith) আসিতে তাহার যে সময় লাগিল পুনর্ব্বার ক্ষিতিজে

* Bently's Essay on the Hindu Astronomy.

উপস্থিত হইতে অর্থাৎ অস্ত হইতে ও ঠিক সেই সময় অতিবাহিত হইবে। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, অস্ত হইতে উদয় হইতেও ঠিক সেই সময় লাগে। ইহার ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায় না; সুতরাং পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণনের সময়ও যা, নক্ষত্রোদয়ের সময়ও তাই। বিঘূর্ণনের সময় জানা থাকিলে নক্ষত্রের আংশিক গতি অনুপাত দ্বারা লব্ধ হইতে পারা যায়। ইংরাজি মতে নক্ষত্রের গতি মোটামোটী ৪ মিনিটে ১ অংশ; আমাদের মতে ২১৬০০ প্রাণে ৩৬০ অংশ অর্থাৎ এক প্রাণে এক কলা। ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ডিক গতি ও সূর্য্য-কেন্দ্রিক গতি খণ্ডন করিতে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহার সূর্য্য কেন্দ্রিক গতির মোটেই ধারণা নাই তিনি প্রত্যক্ষলব্ধ মেরুদণ্ডিক গতিতে তাহা প্রকাশ না করিয়া আর কি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার লিখন ভঙ্গীতে সূর্য্য-কেন্দ্রিক গতির ভাবই প্রকাশিত রহিয়াছে।

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তৎকুতোব্রজেৎ কমধ্বানং।
আবর্ত্তমান মুর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ॥ *

যদি পৃথিবী প্রাণ সময়ে এককলা পরিভ্রমণ করে তাহা হইলে পৃথিবী যায় কোথায় আর পথই বা কৈ? যদি পৃথিবী আবর্ত্তন করিতে থাকে, উচ্চ উচ্চ বস্তুগুলি (পাহাড়, পর্ব্বত, অট্টালিকা ইত্যাদি) পৃথিবীচ্যুত হইয়া যায় না কেন? যদি সূর্য্য কেন্দ্রিক মতের খণ্ডন না হইবে ত "কুতোব্রজেৎ কমধ্বানং" ইহা বলিবার অভিপ্রায় কি? এবং পরচরণে "আবর্ত্তমান মুর্ব্যাশ্চেৎ" লিখিয়া মেরুদণ্ডিক গতিরই পুনঃ আবৃত্তি করিবারই বা আবশ্যক কি? অতএব আর্য্যভট্ট উক্ত দুই মত প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণের তীব্র তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক সূর্য্যদেবের উদয়ে এ প্রকার হয়না। প্রতিদিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। সূর্য্যদেব প্রতিদিন অল্প অল্প বিলম্বে ও ত্বরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছান। এই রূপে বৎসরান্তে দেখা যায় যে নক্ষত্রটী সূর্য্যাপেক্ষা এক দিবস অধিক পরিভ্রমণ করিয়াছে। বৎসরান্তে সূর্য্যদেব যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন তাহা কালভেদে উক্ত সময়ের নক্ষত্র হইলেও ক্রান্তিপাত সম্বন্ধে চিরকাল তাহা সমান থাকে না। কোন দৈবীশক্তিবশাৎ ক্রান্তিপাত ক্রমে পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে সুতরাং সূর্য্যদেব প্রথমে ক্রান্তিপাতে আগমন করেন, তার পর সেই নক্ষত্রে উপস্থিত হইয়া ভারতীয় বৎসর পূর্ণ করেন এই কারণে কালক্রমে ঋতুরও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। সূর্য্যদেবের ক্রান্তিপাত হইতে ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হওয়ায় যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে আয়নিক বৎসর (tropical year) বলে। ইহা ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশ্রই ইহার প্রবর্ত্তক। ভারতীয় বৈদিকগ্রন্থে সময় সময়ের ঋতুর ব্যতিক্রম রূপকচ্ছলে প্রকাশিত রহিয়াছে; পাঠকবর্গ তাহা মনোযোগ দিয়া দৃষ্টি করিলে অনায়াসে সময় নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন।

---

* এ বিষয়ে প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে তাহা ভারতী ১৩০০ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

রোহিণীতে ক্রান্তিপাত।

ক্রান্তিপাত রোহিণীতে কোন সময়ে অবস্থান করিত বা তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল কি না, এই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ঋগ্বেদের এক স্থানে আছে যে পিতা যখন স্বীয় কন্যাতে উপগত হইলেন, পৃথিবীর নিকট শুক্রনিষিক্ত হওয়ায় তখন তাহা হইতে ব্রহ্ম ও ব্রতপালক বাস্তোষ্পতি উৎপন্ন হইলেন।

পিতাযৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্
ক্ষ্ময়ারেত সংজগ্মানো নিষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যো অজনয়ন্ ব্রহ্মদেবাঃ।
বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্॥ ৭ ঋ ১০ মণ্ডল ৬১ সুক্ত

ইহা দ্বারা রূপকচ্ছলে নক্ষত্রাবস্থান প্রকটিত করিতেছে, তবে প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিয়া সে সময়ে আমাদের ঋষিগণের কল্পনাস্রোত সেই মুখে ধাবিত হওয়ায় আমরা ইহা অশ্লীল বলিয়া থাকি। ঐ ঋকটী লক্ষ্য করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণও শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতির স্বীয় দুহিতৃগমনের বিষয়, পুরাণাদিতে ব্রহ্মার স্বীয় কন্যাগমন, ও রামায়ণে ইন্দ্রের গুরুপত্নী অহল্যাগমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং প্রজাপতি ও ইন্দ্র আমাদের নিকট অতি জঘন্য প্রকৃতির ও দুষ্কর্ম্মান্বিত লোক বলিয়া বিখ্যাত আছেন কিন্তু আমরা সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমাদের এই মিথ্যা ধারণার অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব। এখন উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয় হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে ব্রাহ্মণকারগণ বহুকালাগত ঐ ঋকটী দ্বারা কি বুঝিয়াছিলেন। বন্ধনীতে শত পথ ব্রাহ্মণের অংশ লিখিত হইল।

"প্রজাপতি বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়ৎ (অভিদধ্যৌ) দিবমিত্যন্যে আহুরুষসমিত্যন্যে (দিবং বা উষসংবা) তাং ঋশ্যোভুত্বা রোহিতং ভুতামভ্যৈৎ ("মিথুন্যেনয়া স্যাং" ইতি তাং সং বভূব) তং দেবা অপশ্যন্ (তদ্ বৈদেবানাং আগআস অকৃতং বৈ প্রজাপতিঃ করোতি" ইতি (য ইত্থং স্বাং দুহিতরং অস্মাকং স্বসারং করোতি ইতি) তে তমৈচ্ছন্ য এণমারিষ্যতি। এতমন্যোন্যস্মিন্নাবিন্দন্ তেষাং যৈব ঘোরতমা তমঃ আসন্ তা একধা সমভরন্। তাং সংভৃতা এষদেবহভবৎ। তদস্যৈতদ্‌ভুতবন্নাম ভবতি বৈ স যোহস্য এতদেবং নাম বেদ। তং দেবা অব্রুবন্ "অয়ং বৈ প্রজাপতিরকৃতমকর ইমং বিদ্ধ" ইতি স তথেত্যব্রবীৎ (তে হ দেবা উচুঃ "যোহয়ং দেবঃ পশূনামীষ্টে অতিসন্ধানং বা অয়ংচরতি য ইত্থং স্বাং দুহিতরং অস্মাকং স্বসারং করোতি বিধ্যেমং" ইতি তং রুদ্রোহভ্যায়ত্য বিব্যাধ) সবৈ বো বরং বৃণৈ ইতি বৃনীষ্ব ইতি সএতমেব বরং বৃনীত পশূনামাধিপত্যং তদস্যৈতৎ পশুমন্নাম পশুমান ভবতি যোহস্য এত দেবং নাম বেদ তমভ্যায়ত্যাবিধ্যৎ। স বিদ্ধ উর্দ্ধে উদপ্রাপতৎ [তস্য সামিরেতঃ প্রচস্কন্ধ তথাইদনূনং তদাস। তস্মাদেতৎ ঋষিনাভ্যনূক্তং "পিতাযৎ স্বাং ইত্যাদি" তদগ্নিমারুতমিত্যুকৃথং তস্মিং স্তদ্ ব্যাখ্যায়তে যথা তদ্‌দেবারেতঃ প্রাজনয়ন্ তেষাং যদা দেবানাং ক্রোধো ব্যৈৎ অথ প্রজাপতিং অভিষজ্যন তস্য তং শল্যং নিরকৃন্তন্। স বৈযজ্ঞ এব প্রজাপতিঃ]

ভাবার্থ—প্রজাপতি স্বীয় দুহিতা রোহিতরূপা উষা বা আকাশে সঙ্গত হইলেন। তাহা দেবতাগণ দেখিয়া পরস্পরে মন্ত্রণা করিলেন যে প্রজাপতিকে বধ করা উচিত, যেহেতু সে কুকর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের ক্রোধ সমবেত হইয়া ভুতবান নামক দেবতাকে উৎপন্ন করিল। তিনি দেবাজ্ঞায় প্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে পশুমান্ বা পশুর অধিপতি এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রজাপতিকে বিদ্ধ করায় সে উর্দ্ধে বা আকাশে অধিষ্ঠিত হইল। যজ্ঞই প্রজাপতি। এখন পাঠকবর্গ বেশ দেখিতে পাইলেন যে প্রজাপতির "অকৃত" কর্ম্মটী কোন দুষ্কর্ম্ম বা পরস্ত্রীহরণ ব্যাপার নহে, ইহাদ্বারা প্রকারান্তরে যজ্ঞের উপযুক্ত সময়ে মৃগশিরার উদয় বুঝাইতেছে। সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকস্থ নক্ষত্রগুলি সহজ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়। এ সময়কে আমরা উষা বলিয়া থাকি। অহল্যাও উষাবোধক। এই উষা সময়ে রোহিণী বা ব্রাহ্মনক্ষত্র দৃষ্ট হইত, তাহার পশ্চাৎ মৃগশিরা বা স্বয়ং প্রজাপতি অবস্থান করিতেছেন। রোহিণীর আকার মৃগের মস্তকের ন্যায়, এই কারণেই প্রজাপতির মৃগ রূপ ধারণ করিয়া মৃগীরূপা রোহিণীকে উপগত হইবার গল্প কল্পিত হইয়াছে কিন্তু এই রোহিণী পরবর্ত্তীকালে শকটাকার বা সমদ্বিভুজ ত্রিকোণের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সূর্য্যদেব যখন যজ্ঞারম্ভ সময়ে প্রজাপতিতে উদিত হইলেন তখন প্রজাপতি ও রোহিণী উভয়ে অন্তর্হিত হইল। ইহাতেই ঋষিকবির কল্পনা পৃথিবীর উপর প্রচুর শুক্ররূপে পরিণত হইয়াছে—তাঁহার কিরণছটাই শুক্র। সূর্য্যদেবই স্থল বিশেষে ইন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন।

স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রোভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভুত্বা অন্তরীক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতোদিবং ॥ ১৩
অথর্ব্ব ১৩ খণ্ড ৩ সূক্ত।

আবার প্রজাপতিও সূর্য্য ব্যতিরেকে আর কেহ নহেন যেহেতু এই বিশ্ব ও প্রজার তিনি পালনকারী

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধাজজান
ইমাচ বিশ্বাভুবনানি অস্য মহদ্দেবানামসুরত্ব মেকং। ১৯ ঋ (৩ মণ্ডল ৫৫ সুক্ত।

সুতরাং পুরাণাদিলিখিত ঘটনাগুলি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রতি আরোপিত হইলেও আমরা তাহার যে অর্থ বুঝিয়া থাকি সে অর্থের কোন মূল্য নাই, সূর্য্যদেবের ক্রান্তিপাতে অবস্থিতি স্বীকার করিয়া যদি তাহার অর্থ করা যায় তাহলে তাহার কেমন স্বাভাবিকতা প্রকাশ হয় এবং যাঁহারা জগত ও মানবজাতির প্রকাশক, তাঁহাদের প্রতিও অযথা অশ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় না।

রোহিণীর ধ্রুবক ৪৯ অংশ ৩০ কলা এবং উহার ব্যাপ্তিস্থান রাশিচক্রের ৫৩ অংশ ২০ কলা পর্য্যন্ত। মৃগশিরার ধ্রুবক ৬৩ অংশ ও তাহার ব্যাপ্তিস্থান ৬৬ অংশ ৪০ কলা অবধি। বৈদিক প্রজাপতি বা মৃগশিরার (orion) ধ্রুবক ৬৭ ও ৭০ অংশের মধ্যে। ক্রান্তিপাতের

পূর্ব্বে অগ্রসরণ প্রযুক্ত সূর্য্যদেব প্রজাপতিকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে রোহিণী অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন এই কারণেও প্রজাপতির আচরণ অকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরাণে লিখিয়া থাকে যে দক্ষপ্রজাপতি চন্দ্রদেবকে তাঁহার নক্ষত্ররূপা ২৭ কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু রোহিণীই চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়া ছিলেন, আবার মৃগশিরা চান্দ্র নক্ষত্র সুতরাং ইহা দ্বারাও যজ্ঞারম্ভ সময়ে চন্দ্রদেবের রোহিণী অভিমুখে অগ্রসরণ বা তাহার প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রকাশিত করিতেছে, অতএব প্রজাপতির প্রাগুক্ত আচরণ দ্বারা ক্রান্তিপাতের অবস্থান ব্যতিরেকে আর কিছুই বুঝায় না। উক্ত ঋক্ রচনা সময়ে যে ক্রান্তিপাত রোহিণীতে ছিল তাহা বলিতেছি না কিন্তু তৎকালিক প্রচলিত ঋতুর অবস্থান সম্বন্ধে ক্রমে ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল বলিয়াই, ঋষিগণ তাহা প্রজাপতির দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব কালক্রমে যখন রোহিণীতেই ক্রান্তিপাত সংঘটিত হইত, সেই সময়েই চন্দ্রের রোহিণীপ্রিয়তা মতটীও প্রচলিত হইয়া যায় সুতরাং ক্রান্তিপাতের রোহিণীতে অবস্থানের খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব (৫০ × ৭২) প্রায় ৩৬০০ বৎসর হইল। আমার বোধ হয় ইহুদীগণ বাইবেলে যে লুট (Lot) ও তাহার দুই কন্যার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রজাপতির আখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ঘটনার কি বিচিত্রতাই আরোপিত হইয়াছে!

মৃগশিরায় ক্রান্তিপাত।

"শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সম্বৎসর। ইদমদ্যাব্যখ্যত"—সম্বৎসর বস্তুর প্রকাশক শ্বান বা কুকুরকে আদিরূপে প্রচার করিলেন। প্রথম দৃষ্টে ইহা কি বিসদৃশ ও অর্থহীন বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু যখন মন নিবিষ্ট করিয়া দেখি তখন জানিতে পারি যে ঋষিগণ নিতান্ত বর্ব্বর চাষীর ন্যায় ক্ষেত্ররক্ষক কুকুরের স্তুতি করেন নাই, তাঁহারা বেদে যাহা নিহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজ জগতের ভাষাতত্ত্বের এবং বেদের সময় অবধারণের ভূরি ভূরি সাহায্য করিতেছে।

বর্ত্তমান কালে "শ্বা"র স্থান "মৃগব্যাধ" "লুব্ধক" অধিকার করিয়াছে কিন্তু মিশ্র ও গ্রীশদেশে তাহাকে আজো Sirius, Dogstar বা কুকুর নক্ষত্র বলে। আমাদের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত দেখা যায় যে মৃতের আত্মাকে যমলোকের কুকুরগণ পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যায়। স্বর্গের কুকুর সরমা হইতে সারমেয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইটী কুকুর যমলোকের দ্বার রক্ষা করিতেছে—"যৌ তৌ শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথী রক্ষী" ইহারাই পাশ্চাত্য জ্যোতিষের Canis major ও Canis minor; এই গল্পের মূল ঋগ্বেদে অথর্ব্ব বেদে শত পথ ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহারা যমলোকের পথপ্রদর্শন করিতেছে ইহাতে এই বুঝায় যে তাহারাই ঋগ্বেদের রচনা সময়ে পিত্রায়ণ আরম্ভ করিত। বর্ত্তমানকালে আমরা পিতৃগণকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে জলপ্রদান করিয়া থাকি। এত সময় থাকিতে হঠাৎ উক্ত সময়েই জলপ্রদান বা বৈশ্বদেব শ্রাদ্ধের আবশ্যক কি?

ইহার উত্তর—যেহেতু ইহার মূল আমরা ঋগ্বেদেই প্রাপ্ত হইতেছি। ঋগ্বেদ রচনা সময়ে সূর্য্য-দেবের দক্ষিণায়ণ অর্থাৎ যমলোকের পথ উক্ত সময়েই আরম্ভ হইত। কালে ঋতুর কত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিন্তু বৈদিককালে পিতৃদেবের যে সময় অভ্যর্চ্চনা হইত আমরা বর্ত্তমান সময়েও তাহাই অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছি। এই রীতি যে কখন লুপ্ত হইবে তাহা বোধ হয় না—ইহা হিন্দুর শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অপিচ ইহাই চিরকাল বেদের প্রাচীনতা প্রখ্যাপিত করিতে থাকিবে। ভাদ্র পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইলে জানা যায় যে তখন সূর্য্যদেব উত্তর ফল্গুনীতে অবস্থান করিতেছিলেন; বসন্ত মৃগশিরা বা আদ্রায় আরম্ভ হইতেছিল—ইহার নিকটেই কুকুরগুলিও অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব তাহারা যে যম পথ প্রদর্শন করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এবং উত্তরায়ণ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হইতেছিল সুতরাং সম্বৎসরের আদি যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোন কালে ছিল তাহা ইহা দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে।

আমাদের যজ্ঞসূত্র গ্রহণ বা প্রথম সংস্কারকালে আমরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া থাকি—যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতেঃ যৎসহজং পুরস্তাৎ। স্বয়ং সূত্রগ্রহণ করি অথচ বলিয়া থাকি ইহাই পুরাকালে প্রজাপতির পবিত্র যজ্ঞোপযোগী উপবীত ছিল। ইহা যে পূর্ব্বকালের স্মৃতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—এই স্মৃতিই আমাদের ঋগ্বেদ রচনা কালের নিকট উপস্থিত করিতেছে। উপবীত সূত্র বামস্কন্ধ হইতে লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠ ও নাভী পরিবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তের নিম্নে ধারণ করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে বৈশ্বদেব শ্রাদ্ধে এইভাবে আমরা উত্তরীয়ও ধারণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য Orionএর উপবীত নীবীত বা কটিবন্ধে পরিণত হইয়াছে। পারশিকগণও উপবীত কটিতেই ধারণ করেন সুতরাং এই তিন আর্য্যজাতির প্রজাপতির যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে এ প্রকার সাম্যতা—কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ হইতে পারে না—এই কারণই এক মূল হইতে উৎপন্ন হওয়া।

প্রজাপতিকে আমরা সচরাচর কালকেতু বলিয়া থাকি। কালকেতু Orionএর সহিত তুলিত হইয়াছে, তবে গ্রীসীয় কিরাতের কটিবন্ধ ছিল—ইহার যজ্ঞোপবীত আছে। মধ্যস্থ তিনটি তারাই Orionএর কটিবন্ধ কিন্তু অমর সিংহ তাহাদিগকে মৃগশিরা নক্ষত্রের মস্তকস্থ ইল্ললা বা ইন্বকা বলিয়াছেন—

মৃগশীর্ষং মৃগশিরস্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী।
ইল্ললা তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ॥

অতএব প্রজাপতির যজ্ঞোপবীত ধারণ, তাঁহার কালকেতুরূপ এবং মৃগশিরার আগ্রহায়নিত্ব ভাব একাধারে, বেদরচনা সময়ে যে সূর্য্যদেবের বাসন্তিক ক্রান্তিপাত উক্ত নক্ষত্রে ছিল তাহাই প্রকাশিত করিতেছে। যে হেতু প্রজাপতি যজ্ঞরূপ উপবীত ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ যজ্ঞা-রম্ভ সময়ে উদিত হইতেছেন। দ্বিতীয় তিনি কালকেতু অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভ সময়ের প্রকাশক, তৃতীয় মৃগশিরাই আগ্রহায়ণী অর্থাৎ বৎসরের আদিনক্ষত্র। সুতরাং জানা যাইতেছে যে ঋগ্বেদ

রচনা সময়ে যজ্ঞারম্ভকালে সূর্য্যদেবের ক্রান্তিপাত মৃগশিরা বা প্রজাপতি নক্ষত্রে ছিল। অত-এব নিরংশ স্থান হইতে তাহার প্রায় (৬৭ × ৭২) ৪৮২৪ বৎসর হইল অর্থাৎ বেদে কর্ম্মকাণ্ডের প্রচলন ও দেবোদ্দেশে মন্ত্রাদি রচনা যে কাল হইতে আরম্ভ হয় তাহা খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব প্রায় ৪৫৪০ বৎসর হইল। বেদ যে উক্ত প্রাচীনতার দাবী করে তাহার প্রমাণ ও দেখাইতেছে; অতএব বৃথা অনুমানের সাহায্য লইবার আবশ্যক কি?

পুনর্ব্বসুতে ক্রান্তিপাত।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ আপনাকে দেব এবং পারসিকগণ স্বীয়কে অসুর বলিয়া থাকেন। পার-সিকগণ দেবগণকে মারিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা অহুরমজদের উপাসনা করিতেছেন ইহাতেই জানা যায় যে তাঁহারা দেবগণের বিপক্ষবাদী ছিলেন। পুরাণ দ্বারা জানা যায় যে দেব ও অসুর উভয়ে এক পিতার সন্তান, তবে মাতা বিভিন্না; দেবমাতার নাম অদিতি, দৈত্যমাতার নাম দিতি। ইহা বহুকালের ঘটনা; বেদে ইহার স্মৃতিমাত্র রহিয়া গিয়াছে—যখন দেবগণ অসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন তখনও সেই স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে; তাঁহারা অসুরের আচরণে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই কিন্তু তাঁহারা ও অসুরগণ যে কোন কালে এক ছিলেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন—"মহদ্দেবা নাম-সুরত্ব মেকং" পারসিকগণ একত্র বাসকালে দেবগণের প্রতি বহুবিধ অহিতাচরণ করিয়াছেন—"মিথ্র, দেবের প্রতি বজ্র (vazra) নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহারা দেবনাশক বেরেথ্রঘ্নকে উপা-সনা করিতেছেন"। দেবগণের বৃত্রঘ্নও ইন্দ্র একই দেবতা কিন্তু পারসিকগণ ইন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত। পারসিকগণ দক্ষিণায়ণ হইতে বৎসরের আরম্ভ করেন, কিন্তু দেবগণ উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। ইহাতেও পারসিকগণ দেবতাদের বিপরীত পথের অনুসরণ করিয়া-ছেন। তাঁহারা আজো পিতৃপক্ষ হইতে তাঁহাদের বৎসর আরম্ভ করিয়া থাকেন। আমরা এইমাত্র প্রদর্শন করিয়াছি যে, ঋগ্বেদরচনা সময়ে পিতৃপক্ষে দক্ষিনায়ণ আরম্ভ হইত সুতরাং পারসিকগণ তাহা বেদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদের দেবগণ জেন্দ অবস্তায় গিয়া অসুররূপ ধারণ করিয়াছে এবং দেবগণের অনিষ্টাচরণে মনোযোগী হইয়াছে। ক্রমে পার-সিকগণ এমন প্রবল হইয়া উঠিলেন যে দেবগণকে নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে হইল—তাঁহাদের শাপে বর হইল, তাঁহারাই আসিয়া ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিলেন।

হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন দেবগণ অদিতির পুত্র। নক্ষত্রগণের মধ্যে পুনর্ব্বসুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি। যখন যজ্ঞারম্ভ উক্ত নক্ষত্রে সংঘটিত হইত তখন হয়তো দেবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা এতগুলি নক্ষত্র থাকিতে পুনর্ব্বসুরই কেন আদিত্য নক্ষত্র সংজ্ঞা হইল? প্রত্যুত নক্ষত্রাবস্থানের ক্রমিক সমাবেশদ্বারা পুনর্ব্বসুরই দেবনক্ষত্র হইবার অধিকার উৎপাদন করিয়া দিতেছে যেহেতু বেদবিরচণ সময়ে দেবগণ মৃগশিরা বা আদ্রায় যজ্ঞারম্ভ করিতেন

তাঁহাদের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে তাহা পুনর্বসুতে সম্পন্ন হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই—সেই সময়কেই তাঁহারা আপনাদের জন্মসময় ধরিয়াছেন, অতএব পুনর্বসুর আদিত্য নক্ষত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যথার্থ ঘটনারই সমর্থন করিতেছে সুতরাং সূর্য্যদেবের বাসন্তিক-ক্রান্তিপাত যখন পুনর্বসুতে ছিল, তখন দেবগণ জন্মগ্রহণ করায় পুনর্বসুও আদিত্য নক্ষত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব দেবগণ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বপ্রায় (৯৩×৭২—২৮৪)৬৪১২ বৎসর অন্ততঃ ৬০০০ বৎসর হইল ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রমাণদ্বারাও আমরা এত উর্দ্ধে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার পূর্ব্বেও যে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব বাইবেলের প্রচারিত সৃষ্টি-বিষয়ক মত এই স্থানেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ষোড়শ অধ্যায়।

পলাশির যুদ্ধ।

পীড়িত সেনাদলকে কাটোয়া-দুর্গে সুরক্ষিত করিয়া, অবশিষ্ট বৃটীশ-বাহিনী ২২শে জুন সায়ংকালে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া মীরজাফরের সঙ্কেতানুসারে দলে দলে পলাশির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পলাশি সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে ;—পাছে নবাব সেনা পলাশি অধিকার করিয়া লয়, সেই আশঙ্কায় ইংরাজেরা বৃষ্টি বাদল মাথায় করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিল ; এবং অক্লান্ত সমর-যাত্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে রাত্রি একটার সময়ে পলাশির আম্রবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল।*

সিরাজদ্দৌলা মানকরা ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; এবং ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত তাহার পূর্ব্বদিকে,—তেজনগরের উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তরাংশে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শিবিরের দক্ষিণে অল্লোচ্চ মৃৎপ্রাচীর ; তাহার দক্ষিণে মৃত্তিকাস্তূপ এবং দুইটি পুরাতন সরোবর। সিরাজসেনার বাম্মোত্তমে বহুদূর পর্য্যন্ত বনভূমি প্রতিশব্দিত হইতেছিল ;—ক্লাইব বুঝিলেন যে, শত্রু অতি নিকটে। সে রজনীতে বৃটীশবাহিনী যথাসম্ভব নিদ্রালাভ করিল, কিন্তু সেনাপতি আর নিদ্রার অবসর

* The whole army reached Plassey-grove, after a very fatiguing march, and through a whole night's rain.—Ive's Journal.

পাইলেন না ;—কেবল নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, "কি হয় কি হয় রণে, জয় পরাজয় !"*

সিরাজদ্দৌলাও নিদ্রার অবসর পাইলেন না ;—একাকী নির্জ্জন পটমণ্ডপে বসিয়া প্রহর-গণনা করিতেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল ! তিনি চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণবদনে একাকী স্তিমিতালোকে বসিয়া রহিয়াছেন, সুচতুর তস্কর অবসর বুঝিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতেই ফর্‌শী উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল ! সিরাজ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরিচরবর্গও কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। সিরাজ মর্ম্ম-পীড়িত কণ্ঠে অলক্ষিতে বলিয়া উঠিলেন, "হায় ! না মরিতেই ইহারা আমাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছে !" †

সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সিরাজদ্দৌলা পাণদোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।‡ তাঁহার পরমশত্রু সমসাময়িক ইংরাজলেখকেরাও বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বের কথা যাহাই হউক, আলিবর্দ্দীর নিকট ধর্ম্মশপথ করিবার পর সিরাজ আর সুরাপাত্র গ্রহণ করেন নাই।§ পলাশির পটমণ্ডপে তিনি যখন একাকী চিন্তামগ্ন, সেই সময়ের চিত্রপট উদ্ঘাটন করিবার জন্য কেবল তাঁহার স্বদেশীয় কবিই লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

"ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান ;
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ ;
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ? নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধাহাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনী-সমবেণী দুলিতেছে পাছে ;
চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক্ চরণ,
উড়ুক্ কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।"¶

* The soldier slept, but few of the officers, and least of all the Commander.—Orme, ii, 172.

† Scrafton's Reflections.—এই ঘটনা প্রকারান্তরে ষ্টুয়ার্টেও বর্ণিত আছে, অন্যান্য ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে।

‡ He used to drink, but he gave up this habit in accordance with a promise which he made to Aliverdi on his death-bed.—H. Beveridge, C. S.

§ I have before mentioned Surajah Dowla, as given to hard-drinking ; but Allyvherdi, in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excesses, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxcating liquor ; which he ever after *strictly observed.*—Scrafton.

¶ পলাশির যুদ্ধ কাব্য।

বর্ণনা-লালিত্যে এই সরস কবিতা বাঙ্গালীর নিকট সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে! রঙ্গমঞ্চে "উজ্জ্বলিত দীপাবলিতেজে" বারবিলাসিনী-সাহায্যে এই সুলিখিত চিত্রপঠ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়া, কত লোকের নৈতিক অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে! যাহা সিরাজদ্দৌলার কলঙ্করটনার জন্য কল্পনা-সাহায্যে কত সন্তর্পণে রচিত হইয়াছিল, তাহা যে আমাদিগেরই আধুনিক উদ্যান-বিহারী কুবেরসন্তানদিগের অবিকল ছায়াচিত্র, তাহাও স্পষ্ট-তর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

ষ্টুয়ার্ট গোলাম হোসেনের পদানুসরণ করিয়া নবাবগঞ্জের যুদ্ধশিবিরে কামাসক্ত শওকত-জঙ্গের যে অসাধুচিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, ইহা কি তাহারই প্রতিবিম্ব নহে? 'পলাশির যুদ্ধকাব্য' রচনা করিবার পূর্ব্বে কবি বোধ হয় ষ্টুয়ার্ট পাঠ করিয়াছিলেন। প্রমাণ :—

"—সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
কিন্তু পরিণামে হায়! লভিনু কি ফল?
সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চ-মিথুন দুর্ব্বল,
ব্যাধ-কবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে।"*

ষ্টুয়ার্ট ভিন্ন আর কোন ইংরাজি ইতিহাসে এইরূপ সুললিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার কপাল! ষ্টুয়ার্ট পড়িয়াও তাঁহার স্বদেশের কবি 'নবাবগঞ্জের শওকতজঙ্গের চিত্রপটখানি পলাশির সিরাজদ্দৌলার চিত্রপট বলিয়া' জনসমাজে প্রচার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না! "কবির পথ" কি এতই "নিষ্কণ্টক"?

সে কালের ইংরাজ বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার নামে কত অলীক কলঙ্করটনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নাই। অবসর পাইলে একালের প্রতিভাশালী বিশ্বকর্ম্মাগণ এখনও কত নূতন নূতন রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, "পলাশির যুদ্ধকাব্যই" তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, যাহা সিরাজদ্দৌলার শত্রুদলও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না,—একালের লোকে তাহারও অভাবপূরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। লোকে বলে, নবাব সরফরাজ খাঁ অশান্তহৃদয়ে জগৎশেঠের পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গিরিয়ার যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন;—কবি সেই জনশ্রুতি লতাপল্লবে সুশোভিত করিয়া, সিরাজদ্দৌলার স্কন্ধে আরোপ করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন :—

"——কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার

* পলাশির যুদ্ধ কাব্য।

মধ্যাহ্ন ভাস্কর-সম, ভূভারত জুড়ে
প্রজ্জ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।"

যিনি আশৈশব শিবিরে শিবিরে অসিহস্তে জীবন যাপন করিয়া, অন্যায়-কৌশলে পলাশি-সমরে রণপরাজিত হইয়াছিলেন, কবি তাঁহাকে কাপুরুষ সাজাইবার জন্য "হুগলীর সমরে" "দাঁতে তৃণ লয়ে" "সভয়ে" সমর ত্যাগ করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন!* মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্র ইংরাজের পক্ষাবলম্বী বলিয়া নবাব মীর কাশিমের আদেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় "মঙ্গীর দুর্গে" কারারুদ্ধ থাকিয়া ইংরাজ-কৃপায় মুক্তিলাভ করেন।† কবি সময়-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া, সিরাজদ্দৌলাকেই তাহার জন্য অপরাধী সাজাইয়া, "কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে" শুনিয়াছেন বলিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন!‡ যে দেশের কবি-কাহিনী ইতিহাস-রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে সিরাজ-কালিমা যে উত্তরোত্তর দুরপনেয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

"পলাশির যুদ্ধ-কাব্যের" এই সকল কাল্পনিক সিরাজ-কলঙ্ক প্রদর্শন করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। সাহিত্য-সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় দয়া করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"নবীন বাবুর উত্তর এক লাইনও নয়। পলাশির যুদ্ধ-কাব্য, ইতিহাস নয়; আপনাকে ইহাই লিখিতে অনুমতি করিয়াছেন।" নবীন বাবুর 'পলাশির যুদ্ধ' যে 'ইতিহাস নয়', তাহা সকলে জানে না! তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য-সেবক যে সর্ব্বথা স্বকপোল-কল্পিত অযথা-কলঙ্কে সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঙ্কিত করিয়া কাব্যরসের অবতারণা

* ইতিহাসের হুগলীর সমর-কাহিনী অন্যরূপ। সিরাজ তাহাতে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি "দাঁতে তৃণ লয়ে" "সভয়ে" সমরত্যাগ করা দূরে থাকুক,—ইংরাজেরা তাঁহার অগোচরে গোপনে তস্করের ন্যায় হুগলী লুণ্ঠন করায়, তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্যই দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণ করেন। ক্লাইব তাঁহার গতিরোধ করিতে গিয়া তাঁহার দুই জন সেনানায়ক এবং সেক্রেটারী পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন; নিশা-রণে শত্রুসংহার করিতে গিয়া স্বয়ং ক্লাইব সসৈন্যে হেটমুণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "কবির পথ" অবশ্যই "নিষ্কণ্টক"; ইতিহাসের পথ সেরূপ হইলেই ভাল হইত।

† ইংরাজি ইতিহাস ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ "ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতেও" (১২৩—১২৬ পৃষ্ঠা) এই ঘটনা আনু-পূর্ব্বিক বর্ণিত রহিয়াছে। "ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের" চারিবৎসর পরে "পলাশির যুদ্ধকাব্য" প্রকাশিত হয়। অথচ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক এবং তাঁহার "বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিত" কোন একজন বন্ধু মহাশয় চারি বৎসরের মধ্যেও "ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের" ন্যায় "বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত" গ্রন্থখানি একবার মাত্রও পাঠ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। অহো! স্বদেশের ইতি হাসের অপরিসীম সৌভাগ্য।

‡ পলাশির যুদ্ধকাব্য-পরিশিষ্ট।

করিবেন, তাঁহা সহসা ধারণা করিতে সাহস না পাইয়া, অনেকেই তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ কাব্যকে' ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি "সান্যাল এণ্ড কোম্পানী" পলাশির যুদ্ধ কাব্যের যে "বিদ্যালয়ের পাঠ্যসংস্করণ' প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও ইহাকে 'ইতিহাস' বলিয়া পরিচিত ও বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিত হইয়াছে !!* "কবির পথ নিষ্কণ্টক" হইলেও, ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। যে হতভাগ্য নরপতি তরুণ জীবনে অন্যায় কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া অকালে দেহবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস লইয়া কাব্য রচনা করিলে "পলাশির যুদ্ধ কাব্য" অধিকতর মর্ম্মস্পর্শ করিত। 'কবি আত্মকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বরং ভাল হইত,—তাহা হইলে, তাঁহার কল্পনা পদে পদে "মেকলিয়" ছাঁচে ঢালা হইত না। ইংরাজ-লিখিত পলাশির যুদ্ধও কাব্য,—ইতিহাস নহে। কবি তাহাকেই অন্ধের যষ্টির ন্যায় প্রবল আগ্রহে আঁকড়িয়া না ধরিলে, হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার প্রেতাত্মা অনেক অলীক আক্রমণের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত।

রজনী প্রভাত হইল। যে প্রভাতে ভারতগগনে বৃটীশ-সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই প্রভাতে,—"১১৭০ হিজরী ৫ সাওয়াল রোজ পঞ্জসোম্বা"† (বৃহস্পতিবারে) পলাশিপ্রান্তরে ইংরাজ বাঙ্গালী শক্তিপরীক্ষার জন্য একে একে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল।

ইংরাজেরা যে আম্রবনে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "লক্ষবাগ",—লোকে বলে তাহা লক্ষ বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। এই আম্রকাননের পশ্চিমোত্তর কোণে মৃগয়ামঞ্চ, ক্লাইব তাহার পার্শ্বে, লক্ষবাগের উত্তরে,—উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যূহরচনা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা প্রত্যূষেই মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, এবং রায় দুর্ল্লভকে শিবির হইতে অগ্রসর হইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহরচনা করিয়া শ্রেণীসম্বদ্ধ-বলাকাপ্রবাহের ন্যায় ধীর মন্থরগতিতে আম্রবন বেষ্টন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইংরাজদিগের মনে হইল যে, এই চক্রব্যূহ যদি আম্রবন বেষ্টন করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করে, তবেই সর্ব্বনাশ!‡ ক্লাইবের গোরাপল্টন চারি দলে বিভক্ত হইয়া মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্রাণ্ট, মেজর কূট, এবং কাপ্তান গপের অধীনে অস্ত্রধারণ করিল;—মধ্যস্থলে 'গোরা লোগ', বামে দক্ষিণে 'কালা আদমীরা' ছয়টি কামান সম্মুখে করিয়া সারি বাধিয়া দণ্ডায়মান হইল। মীরমদনের সিপাহী-সেনা সম্মুখস্থ সরোবর-তীরে সমবেত হইয়াছিল; এক পার্শ্বে ফরাসীবীর সিনফ্রে, এক পার্শ্বে বাঙ্গালীবীর মোহনলাল, মধ্যস্থলে বাঙ্গালী সেনাপতি মীরমদন সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিলেন।

সিরাজ-বাহিনীর আস্তরণাবৃত রণহস্তী, সুশিক্ষিত অশ্বসেনা এবং সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্র যখন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইংরাজেরা ভাবিলেন—সিরাজব্যূহ দুর্ভেদ্য !*

বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে মীরমদন সরোবরতীরে কামানে অগ্নিসংযোগ করিলেন;—প্রথম গোলাতেই ইংরাজপক্ষে একজন হত এবং একজন আহত হইল। তাহার পর মুহুর্মুহু কামান চলিতে লাগিল; মুহুর্মুহু ইংরাজসেনা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এই ভাবে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিয়াছিল;—এই আধ ঘণ্টায় ১০ জন গোরা এবং ২০ জন কালা সিপাহী মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিল† ইংরাজের কামান নীরব ছিল না; তাহার প্রচণ্ড পীড়নে নবাবসেনাও ধরাশায়ী হইতেছিল; কিন্তু তাহাতে নবাবের গোলন্দাজদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তাহারা অক্ষত দেহে বিপুল বিক্রমে ইংরাজ সেনাদলের মধ্যে মিনিটে মিনিটে গোলা প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টাতেই ক্লাইবের সমরসাধ মিটিল;—আধ ঘণ্টাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রতি মিনিটে একটি করিয়া হত ও কতকগুলি আহত হইতে থাকিলে, তাঁহার তিন সহস্র সিপাহী অধিকক্ষণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিবার অবসর পাইবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ক্লাইবকে সসৈন্যে হটিতে হইল।‡ ইংরাজসেনার দুইটি কামান বাহিরে থাকিল, আর চারিটি কামান লইয়া তাহারা আম্রবনের মধ্যে লুকাইয়া গেল; ক্লাইবের আদেশে সকলেই বৃক্ষান্তরালে বসিয়া পড়িল। নবাবের তোপমঞ্চগুলি ৪ হাত উচ্চ; সুতরাং মীরমদনের গোলা ইংরাজ-সেনার মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল, কচিত বা বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হইতে লাগিল।

বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাকিয়াও ক্লাইবের আশঙ্কা দূর হইল না। নবাব সেনার ব্যূহ রচনায় এবং সমরকৌশলে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; তিনি উমাচরণকে ভৎসনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে কথা ছিল যে, একটা যৎসামান্য যুদ্ধাভিনয় হইলেই মনস্কামি—

---

* Not only has a complete poem like this a merit of its own superior to that of a mere compilation of fugitive pieces, but as it is also the history of Bengal of the period in verse, the introduction of such a book into our schools will be doubly beneficial to the students, and an encouragement to real talent and literature of Bengal.—Preface.

† মুতক্ষরীণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্কলিত ইতিহাসে) লিখিত আছে যে, পলাশির যুদ্ধ ১৭ই জুন সংঘটিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ইহা সম্পূর্ণ অমূলক, অথবা লিপিকরপ্রমাদের নিদর্শনমাত্র।

‡ At daybreak of the 23rd, the Nabob's army was perceived marching out of their lines towards the grove, which we were in possession of; their intention seemed to be to surround us,—Ive's Journal.

* What with the number of elephants, all covered with scarlet cloth embroidery, their horse, with their drawn swords glistening in the sun, their heavy cannon, drawn by vast trains of oxen, and their standards flying,—they made a grand and formidable appearance.—Scrafton,

† Orme, vol. ii, 175.

‡ We soon found such a shower of balls pouring upon us from their fifty pieces of cannon * * * that we retired under cover of the bank,—Scrafton's Reflections.

পূর্ণ হইবে ; সিরাজসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন করিবে না। এখন যে তাহার সকল কথাই বিপরীত হইতেছে ?”* উমাচরণ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, “যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা মীরমদন এবং মোহনলালের সেনাদল ; তাহারাই কেবল প্রভুভক্ত। তাহাদিগকে কায়ক্লেশে পরাজয় করিতে পারিলেই হয়, অন্যান্য সেনানায়কগণ কেহই অস্ত্র চালনা করিবেন না।”†

মীর মদন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিপুল বিক্রমে গোলা চালান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মীরজাফরের চক্রব্যূহ যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না ! ‡ কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্ল্লভ যেখানে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন সেই খানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রণকৌতুক দর্শন করিতে লাগিলেন।§ বেলা ১১ টার সময়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে ক্লাইব সমরসভার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, স্থির হইল যে,—সমুদয় দিন আম্রবনে লুকাইয়া কোন রূপে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ¶ মহাবীর পালাশীবিজেতা যে এইরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়াই সমরজয় করেন সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।||

ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার আষাঢ়ের নবমেঘে মধ্যাহ্নেই পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিল, মীরমদনের অনেক বারুদ ভিজিয়া গেল, তাহার কামানগুলি কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি পুনরায় বিপুলবিক্রমে শত্রুদলনের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় ইংরাজের একটী গোলা আসিয়া তাহার উরুস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

---

* “সাবেদজঙ্গনে (ক্লাইব) আমিনচাঁদসে বাদগুমান্ হো কর্ গোসা ফরমায়া, আওর কহা কে এসাহি ওয়াদা থা কে থাফিফ্ লড়াইমে বদয়ায় দিলি হাসিল্ হো যায় গা, আওর শাহী ফৌজভি সিরাজুদ্দৌলাসে মনহেরেফ্ হেয় ; ওয়া সব্ তেরি বাতেঁ বরখেলাফ্ পায়ি জাতি হেঁয়।”—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

† Stewart's History of Bengal,

‡ As soon as their rear was out of the camp, failing in their plan to surround us, they halted.—Ive's Journal.

§ মীর মহম্মদ জাফর খাঁ ওগয়রহ, যো বায়েস্ ইস্ কোস্তথুন্ কে হুয়ে থে, জিস্ তরফুকে মোক্‌রর থে, ওঁহা খড়ে তামাসা দেখ্ রহে থে !— মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

¶ At 11 o'clock Colonel Clive consulted his officers at the drum-head ; and it was resolved to maintain the cannonade during the day but at midnight to attack the Nabob's camp.—Orme, vol. ii. 175.

|| The battle being attended with so little bloodshed, arose from two causes ; first,—the army was sheltered by so high a bank that the heavy artillary of the enemy could not possibly make them much mischief. The other was,—that Suraja Dowla had not confidence in his army, nor his army any confidence in him, and therefore, they did not do their duty.—Clive's Evidence.

বাঙ্গালী সেনাপতি সম্মুখসমরে বীরের ন্যায় পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া দৈববিড়ম্বনায় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মোহন লাল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, মীর মদনকে সকলে ধরাধরি করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে উপনীত করিলেন। তিনি বেশী কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, শত্রুসেনা আম্রবনে পলায়ন করিয়াছে তথাপি নবাবের প্রধান সেনাপতিগণ কেহই যুদ্ধ করিতেছে না, সসৈন্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।* মীরমদনের বীরবাহু অবসন্ন হইয়া পড়িল,—সিরাজদ্দৌলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! একমাত্র মীরমদনের ভরসা পাইয়াই সিরাজদ্দৌলা শত্রুদলের কুটিল কৌশলে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই ; তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে সিরাজের বল ভরসা অকস্মাৎ তিরোহিত হইয়া গেল।

সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া আর একবার মীরজাফরকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরাজফর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কালহরণ করিয়া, অবশেষে ধীরে প্রিয়পুত্র মীরণ এবং পাত্রমিত্রদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া সতর্কপদবিক্ষেপে সিরাজের পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। † মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলা হয় ত তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন, কিন্তু পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজ তাঁহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, “যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি ভিন্ন এই রাজমুকুট রক্ষণ করে এমন আর কেহ নাই, মাতামহ জীবিত নাই তুমিই এখন তাঁহার স্থান পূর্ণ কর। মীরজাফর ! আলিবর্দ্দির পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম এবং জীবনরক্ষার সহায়তা কর।” মীরজাফর সসম্ভ্রমে যথারীতি রাজমুকুটকে কুর্ণিশ করিয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া বিশ্বস্তভাবে বলিতে লাগিলেন, “অবশ্যই শত্রুজয় করিব, কিন্তু আজ দিবা অবসান হইয়াছে, সিপাহীরা প্রভাত হইতে রণশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আজ সেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক,—প্রভাতে আবার যুদ্ধ করিলেই হইবে।” সিরাজ বলিলেন নিশারণে ইংরাজসেনা শিবির আক্রমন করিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে ? মীরজাফর সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন আমরা রহিয়াছি কেন ? ‡ সিরাজের মতিভ্রম হইল, তিনি মীরজাফরের মৌখিক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেনাদলকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদেশ করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ মোহনলাল তখন বিপুল বিক্রমে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তিনি সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন যে “আর দুই চারি দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইবে, এখন কি শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার সময় ? পদমাত্র

---

* He was immediately carried to the Nawab ; and having uttered a few words, expressive of his own loyalty, and the want of it in others, died in his presence.—Stewart.

† মুতক্ষরীণ।

‡ Stewart's History of Bengal.

পশ্চাৎগামী হইলে সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সর্ব্বনাশসংঘটন করিবে,—ফিরিব না, যুদ্ধ করিব।"* এ সংবাদে মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি বিবিধ বিধানে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি করিয়া পুনরায় সংবাদ পাঠাইলেন যে, "ক্ষান্ত হও, শিবিরে প্রত্যাগমন কর।" রোষে ক্ষোভে মোহনলালের নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি আর কি করিবেন? তিনি একজন পঞ্চ হাজারী মন্‌সবদার মাত্র, সমরক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না! যথা সম্ভব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরজাফরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন:—"মীরমদন গতাশু হইয়াছেন, আর লুকাইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন; ইচ্ছা হয় এখনই অথবা রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে শিবির আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"†

পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।‡
(২৩শে জুন ১৭৫৭)

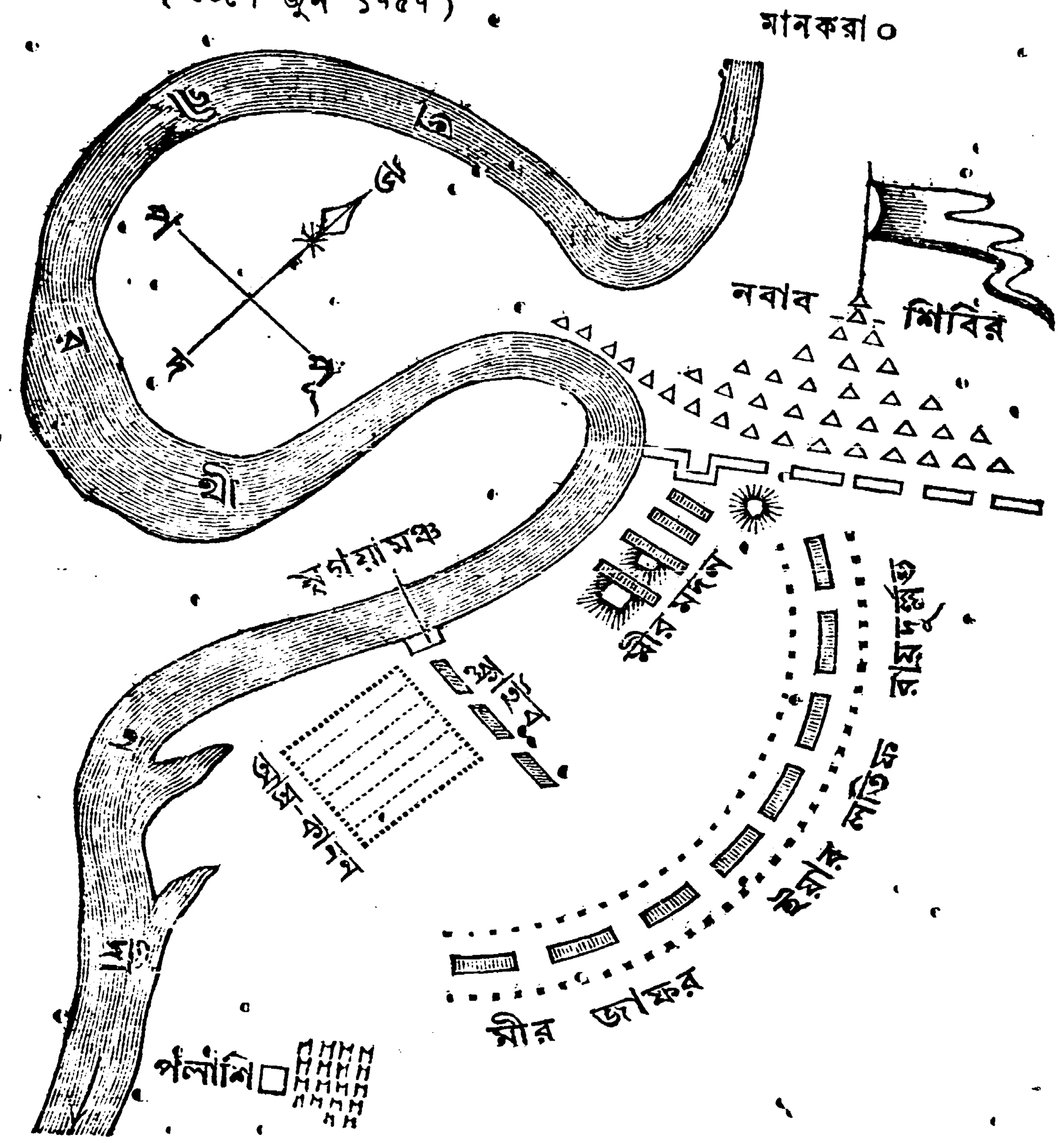

মোহনলালকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ইংরাজসেনা আম্রবন হইতে বাহির

* মুতক্ষরীণ।

† Orme, vol. ii. 175.

‡ এ চিত্রটি ভুলক্রমে গত সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছিল।

হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে মৃগয়ামঞ্চের কক্ষমধ্যে বেশপরিবর্ত্তন করিতেছিলেন; কেহ কেহ বলেন যে, তিনি সে সময়ে নিরাপদে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন; মেজর কিলপ্যাট্রিক আম্রবনে সেনাচালনা করিতেছিলেন!* ইংরাজসেনা পুনরায় উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদে ক্লাইব দ্রুতপদে সেনাদলে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কিলপ্যাট্রিক এরূপ অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া সেই অপরাধে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন!† পরে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিয়া মেজর সাহেবের দৃষ্টান্তানুসরণ করতঃ ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে অনেকেই পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু ফরাসীবীর সিনফ্রেঁ এবং বাঙ্গালীবীর মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন;—তাঁহাদের সেনাদল হটিল না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,—তাহারা অকুতোভয়ে অমিতবিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল!

এদিকে কতকগুলি সিপাহীসেনাকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া, সুচতুর রায় দুর্ল্লভ সিরাজদ্দৌলাকেও পলায়ন করিবার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। সিরাজ সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে, যখন দিবাঅবসান-তখন সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন যে বিপুল সেনাপ্রবাহের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতেছে; এরূপ অবস্থায় পলাশিতে পরাজিত না হইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে গমন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।‡ রাজবল্লভও সেই মত পোষণ করিলেন; সুতরাং সিরাজদ্দৌলা আর ইতস্ততঃ না করিয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যহারে গজারোহণে যুদ্ধভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন!§

মীরজাফর সময় পাইয়া ইংরাজদলে যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু শত্রুমিত্র চিনিতে না পারিয়া তাঁহার উপরও গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না!¶ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে মোহনলাল এবং সিনফ্রেঁ বিশ্বাসঘাতক নবাবসেনানায়কদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ

* Some say he was asleep; which is not improbable, considering how little rest he had for so many hours before; but this is no imputation either against his courage or conduct.—Orme, vol. ii. 176.

† Ibid.

‡ সিরাজদ্দৌলানে যব্ লস্করকা ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ থোক্‌মন্ হো থহ্‌স্ তালা আদুসে, কেঁওকে বহুত কম্‌লোগোঁকে আপ্‌না দোস্ত জান্‌তা থা,***কৈ ঘড়িভড় রোজ বাকী রহাথা কে খোদভি ভাগ্ নিক্‌লা।—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

§ অর্ম্মি সিরাজদ্দৌলাকে 'উষ্ট্রারোহণ' করাইয়াছেন; মেকলে তাহার উপর রং চড়াইয়া 'দ্রুতগামী' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। স্ক্র্যাফটন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে "সিরাজ গজারোহণেই পলায়ন করিয়াছিলেন।"

¶ Orme, vol. ii. 176.

করিতে বাধ্য হইলেন। তখন নবাবের পরিত্যক্ত জনশূন্য পটমণ্ডপের দিকে ইংরাজসেনা মহাদম্ভে অগ্রসর হইয়া পলাশি যুদ্ধের শেষ চিত্রপট উদঘাটন করিল।*

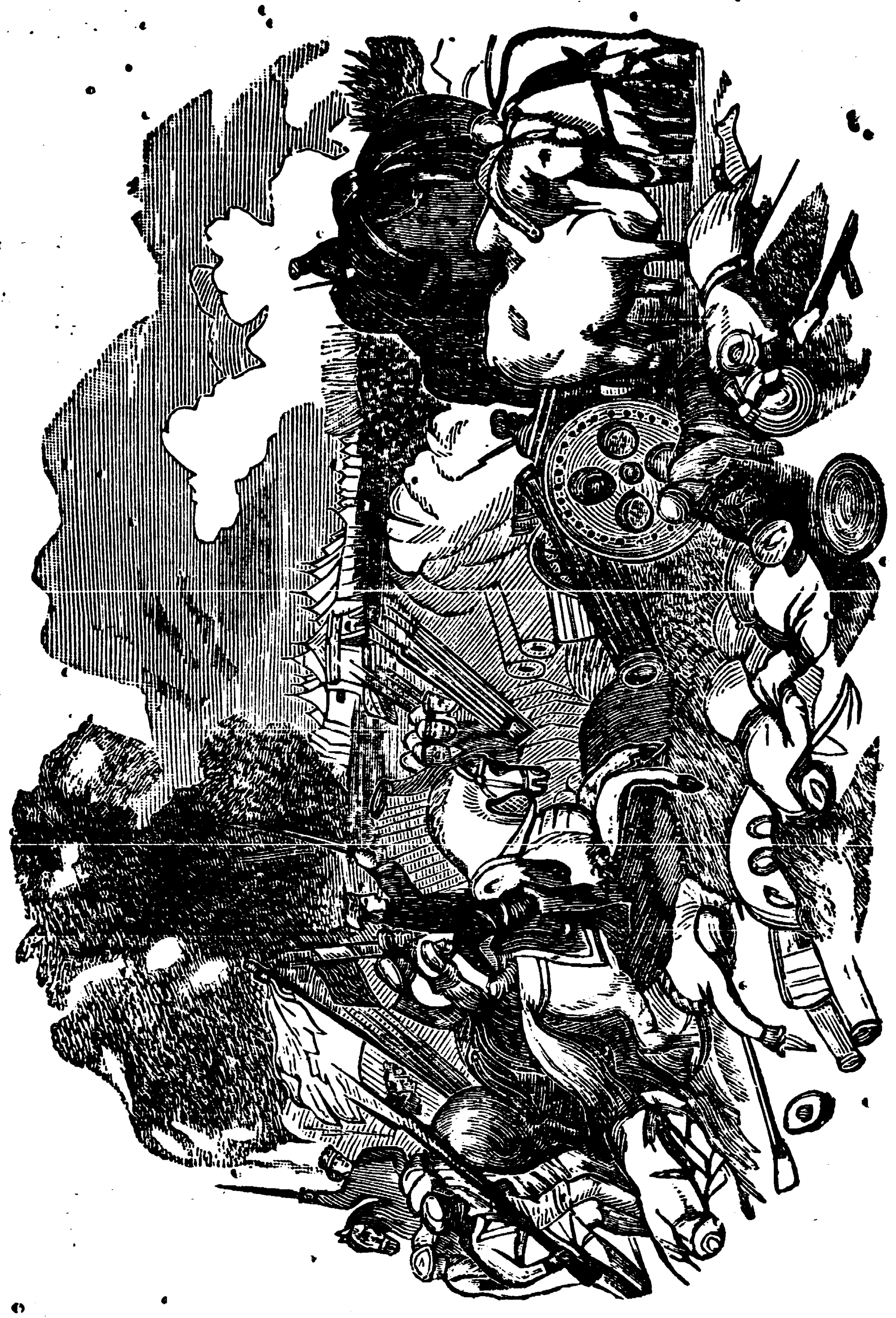

পরিণাম ফল বড়ই উজ্জ্বল বলিয়া পলাশির যুদ্ধ এখন বৃটীশবাহিনীর মহাযুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে সেনাদল পলাশিসমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের পতাকা-শীর্ষে এখনও পলাশির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।† যুদ্ধভূমি ভাগীরথীগর্ভে বিলীন হইয়াছে

লক্ষবাগের শেষ আম্রবৃক্ষটিও সমূলে উৎখাত হইয়া বিলাতে চালান হইয়া গিয়াছে ;‡ মহেশ-পুরের কুঠির সাহেবেরা নাকি সেই আম্রকাষ্ঠে একটি সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন কেবল স্থাননির্দ্দেশের জন্য একটি আধুনিক জয়স্তম্ভে লিখিত আছে :—

PLASSEY

ERECTED BY THE BENGAL GOVERNMENT, 1883.

এই স্বল্পাক্ষর ফলকলিপি ভিন্ন আরও একটি নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে ; তাহা একজন প্রভুভক্ত মুসলমান জমাদারের সমাধিস্তূপ। মুসলমান বীর সম্মুখসংগ্রামে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার জন্য প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করিয়া অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে বাঙ্গালী কৃষাণ কৃষাণীরা তাহার উপর ভক্তিভরে ফুল ফল তণ্ডুলকণা "সিন্নি" প্রদান করিয়া এখনও সেই পুরাকাহিনী সঞ্জীবিত রাখিয়াছে !

দগ্ধ কচু।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

গাড়িতে বসিয়া গালে হাত দিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম "ভগবান! এ Narrow Escapeই বটে। কোথায় মনে করিয়াছিলাম শ্বশুর বাড়িতে আসিয়া শালি-শালাজদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিব, কোথায় এ অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব অননুভবনীয় ঘটনা। এই বয়সে অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, অনেক পাঠ করিলাম। কিন্তু এমন adventure কার ভাগ্যে ঘটিয়াছে ?

আবার সুরেশ সমাজপতির বাটিতে যাইতেছি ভাবিয়া খুব আহ্লাদ হইল। আহা, আমার সেই ব্যারামের সময়ে ভায়ারা ও সাক্ষাৎ দেবী তুল্যা মাতৃ ঠাকুরাণী (তা, না হইবে কেন? কেমন পিতার কন্যা!) আমাকে কতই না যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঋণ ইহ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না! আমাকে ও স্বদলবলে রাঙ্গাদিদিকে পাইয়া তাঁহারা কতই না আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন। আর প্রকাশ ভায়ার বাটিতে ও কাশিয়াবাগানের বাটিতে নিমন্ত্রণ হইবেই হইবে। আর যদি সুবিধা করে উঠ্তে পারি তা হ'লে, চুঁচুড়ায় গিয়া মা হিরণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। হাঁ—সেই কাশিয়াবাগানের বাটিতে সেই নিমন্ত্রণ তাহা ইহ জন্মে ভুলিবার নহে! Indeed, that dinner marks an epoch in the history of my life"—

---

* The Great battles of the British Army নামক পুস্তকে যে পুরাতন চিত্রপট আছে তাহাই প্রদত্ত হইল। এই চিত্রপট অবশ্যই কাল্পনিক।

† Praise was more particularly given to the 39th Regiment which still bears on its banners the name of "Plassy" and tbe motto, *Primus in Indis*—Great battles of the British Army, p. 169.

‡ H. Beveridge, C. S.

গাড়িতে উঠিয়া এই সব সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলাম। কাহারও মুখে কথাটি নাই! সকলেরই মুখ ম্লান, শুষ্ক,—শরীর ভয়ে কণ্টকিত।

এইরূপে যখন আধঘণ্টা অতিবাহিত হইল, আর গাড়ি আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত রাস্তা, কত ষ্ট্রীট পার হইয়াছে, তখন আমাদের মৃতপ্রায় সাহস পুনর্জীবিত হইল। তখন আমি মুখ ফুটিয়া বলিলাম "কি বাঁচনটাই বাঁচা গেচে"!

প্রভা ঠাকুরঝি মৃদুস্বরে বলিল "মেঘনাদ বাবু, তোমাদেরি শাপে শাপে আমাদের এই শাস্তি হ'ল। কেস্থর আর দগ্ধকচুর এই পরিণাম"!

পণ্ডিত মহাশয় (পণ্ডিত মহাশয় ভাগ্যবিপাকে আমার গাড়িতেই ছিলেন) সহাস্যে বলিলেন "যাহোক ঠাকুরজামাই, দস্যুদের খুব রম্ভাপ্রদর্শন করা গিয়েছে। তুমি একবার উচ্চকণ্ঠে গাও—

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিত বহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগত পাপম্
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।
ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপিকরালং.
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশহরে"।—

সহসা গাড়িগুলি খাড়া হইল। কোঁচবক্স হইতে হরনাথ দাদা বলিতে লাগিলেন "হাঁ—এই 1317 Brindaban Basu's lane সাহিত্য প্রেসই বটে"।

আমরা সকলে গাড়ি হইতে নামিলাম। হরনাথ দাদা পথপ্রদর্শক হইয়া বলিতে লাগিলেন "ইদিক্ দিয়ে এস, ইদিক্ দিয়ে এস—দোয়ারি চাকর বল্‌চে কর্ত্তাগিন্নিরা এই খিড়্‌কির দোয়ার দিয়ে উপরে গিয়েছেন—তা বেশ হয়েচে। সদর দোওরের দিকে সাহিত্য প্রেসের কর্ম্মচারীরা থাকে—উদিক দিয়ে যাওয়া হয়নি ভালই হয়েচে। ধীরে ধীরে—কি ঘোর অন্ধকার—দেখ, মেঘনাদ ভায়া, সাবধান, প'ড়ে যেও না। রাঙ্গাদিদি, তুমি আমার হাত ধর। তোমরা অমন পাগলের মত তাকাচ্চ কেন?—ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গিয়েচে বুঝি?—তা, এত কাণ্ডকারখানার পর মাথা ঠিক থাকবেই বা কেমন ক'রে!—আর দেখ মেজবৌ, তুমি এদের বাড়িতে এসে অমন ক'রে চাণক্যশ্লোকগুলো আর গীতগোবিন্দ আওড়ো না—এরা মনে কোরবে এমন বেহায়া স্ত্রীলোক জগতে নেই—একেতো সুরেশসমাজপতির অমনিতেই ধারণা আছে যে ডায়মনকাটা দলের গল্পটা সত্যিই বুঝি!—হাঁ এই সিঁড়ি—ঘোর অন্ধকার সাবধানে পা ফেলো—ওপরে ঐ শোন কর্ত্তা বাতের বেদনায় কাতরাচ্চেন—তোমরা ওপরে গিয়ে কর্ত্তার কাছে বিশ্রাম কর—আমি বাহিরে সুরেশভায়ার কাছে গিয়ে একচিলেম তামাক খাই—আর এই রক্তমাখা জামাটি ছাড়ি, আর এই Henri martiniটা তুলে রাখি—আর শালাবাবুদেরও Emerald Theatre থেকে ডাকিয়ে পাঠাই—ওঃ পিট চচ্চড় কর্‌চে, গায়ে কি বেদনা—আমি আধঘণ্টা বাদে আবার আস্‌ব—একেই বলে Narrow Escape"।

এই বলিয়া হরনাথ দাদা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি রাঙ্গাদিদি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়ে কর্ত্তার সবিষাদ কাৎরাণি শুনিয়া মনে করিতে লাগিলাম "এই পীড়িত অবস্থায় বুড়ার কপালে এত কর্ম্মভোগও ছিল। কোথায় নিজগৃহে, সুখে পালঙ্কে শুইয়া আরাম করিতেছিলেন, কোথায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই তিন ক্রোশ গাড়িতে হড়্‌ হড়্‌ করিয়া কলিকাতায় পরের বাসায় আগমন। বাতের ব্যারাম আর চাগাবে না!—কিন্তু বলিহারি বীরপণা হরনাথ দাদার—সব্বাইকে উদ্ধার ক'রে এনেচেন—কারুর মাথার চুলগাছি পর্য্যন্ত খসেনি। আর ডাকাতগুলো যদি আমাদের মধ্যে কাউকেও হত্যা কর্‌তো তা হ'লে কি ভয়ানকই হোতো। ওঃ মনে কর্‌লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! কি Narrow Escape! কি Narrow Escape"!

স্বদলবলে রাঙ্গাদিদির সহিত যখন আমি উপরে উঠিলাম তখন দেখিলাম ঘরের একটি দূর কোণে মিট মিট করিয়া পিল্‌সুজে আলো জ্বলিতেছে। একটি পালঙ্কে শুইয়া কর্ত্তা কাৎরাইতেছেন—আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত—ও আমার অর্দ্ধাঙ্গী পার তলায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

যাইবামাত্র প্রভাঠাকুরঝি চীৎকার স্বরে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল "ওমা, আঁর দেখা হবে তা ভাবিনি"।

আমার প্রথম শালি সক্রন্দনে বলিলেন "বাবার কষ্ট দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়"।

পণ্ডিত মহাশয় শাশুড়ির কাণের কাছে বলিলেন "মাগো কি রক্ষাটাই পাওয়া গেছে! একেই বলে ভবিতব্যতা"!

আমার প্রথম শালাজ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন "হাঁ ঠাকুরোণ—দিন যায় না ক্ষেণ যায়"!

আমি কর্ত্তাকে বলিলাম "কি Narrow Escapeটাই হয়েছে। যদি হরনাথ দাদা না থাকৃতেন"—

আমার কথা শুনিয়া সচকিতে কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন ও বিহ্বলনেত্রে আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন! আমি মনে মনে বলিলাম "এঁর তো দেখ্‌চি half distracted state আহা সমস্তরাত্রিজাগরণ—এই ঘোর দুশ্চিন্তা—এই গাড়ির হড়্‌হড়ানি! একেবারে যে চৈতন্যশূন্য হন নাই—এই আশ্চর্য্য"!

আমার শ্বশুর মহাশয় আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দিকে একবার তাকাইয়া আর একবার তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার দিকে তাকাইয়া আমাকে সস্নেহে বলিলেন "কেন বাবাজি?—কে তোমাদের খবর দিলে যে আমার হটাৎ শক্ত ব্যারাম হয়েছে। হাঁ, আজ বাতটা কিছু বৃদ্ধি হয়েচে বটে। তা, সে বেশী কিছু নয়—ঐ Mill factoryর সাহেবটা সমস্ত রাত্তির বন্দুকের আওয়াজ করেচে—ছুঁচো ভারি পাজি, রাত্রেও পাখী মারে—কোন দিন একটা মানুষ খুন্ না ক'রে বসে!—তা তোমরা এত ভোর রাত্রে সকলে মিলে আমাকে দেখ্‌তে এসেচ; কাজটা ভাল হয় নাই। কে তোমাদের খবর দিলে যে আমার ভারি অসুখ? ওই বুড়ো ঝিটে বুঝি?—মাগি ভারি হাউড়ে"

আমি কর্ত্তার কথাগুলা শুনিয়া অবাক্ হতবুদ্ধি হইলাম। ভাবিলাম "কর্ত্তা পাগল হইয়াছেন কি আমরাই পাগল হইয়াছি" আর চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম!

কিন্তু তখন স্ত্রীলোকগুলি অর্দ্ধক্রন্দনে অর্দ্ধহাস্যে অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিয়াছে! আমার বড় শালাজ অনঙ্গদেবীকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিতেছিলেন "ছোট্ ঠাকুরঝি তোকে যদি না দেখ্‌তে পেতাম্—তা হ'লে কি এ প্রাণ রাখ্‌তাম্। সমস্ত রাত্তির তোর জন্যে প্রাণ ধড়্‌ফড়্ কোরেচে।" অনঙ্গ দেবী স্নেহকারিণীর ক্রোড় হইতে নামিয়া—"মরণ আর কি বৌদিদি—তোরা পাগল হয়েচিস্—সকলের সম্মুখে এমন ক'রে কোলে তুল্‌তে লজ্জা করে না!" এই কথাগুলি অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে সকঙ্কণ মুষ্ট্যাঘাত করিল।

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিতেছিলেন "সার্থক জামাই করেছিলে বাছা!—হরনাথ যদি না থাকৃত তা হ'লে কি কারুর প্রাণ রক্ষে হ'ত!"

প্রথম শালি বলিতেছিলেন "ধন্যি বন্দুক্ ধর্‌তে শিখেছিল!"

চতুর্থী শালি বলিতেছিলেন "হরনাথ বাবু বীর ব'লে বীর!—একা পাঁচটে ডাকাতকে খুন্ কর্‌লে। সাবাস্ যা হোক্—"

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে প্রভা ঠাকুরঝির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া জনান্তিকে বলিতেছিলেন—

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে"

তৃতীয়া শালি কর্ত্তাকে বলিল "বাবা—দাদাদের বিডন্ ষ্ট্রীট্ থেকে ডেকে পাঠাও। এত ক্ষণ বোধ করি থিয়েটর্ ভেঙে গিয়েচে—"

দ্বিতীয়া শালি বলিল "দূর্ বোকা—একি তোর পাঁড়া গাঁ—যে বাবা লোক পাঠাবেন আর অমনি সে লোক দাদাদের ধরে নিয়ে আস্‌বে। এ যে কল্‌কাতা সহর!—এখানে কে কার খবর রাখে?"

প্রথম শালি বলিলেন "বাবা—ভোর হয়ে এসেছে—এখন্ কি আর ডাকাতেরা

আছে?—যদি ফিরে এসে লুটপাট্ ক'রে থাকে তবে এতক্ষণ যা নেবার নিয়ে চলে গিয়ে থাকবে—চল বাড়ি ফিরে যাই।"

পণ্ডিত মহাশয় জনান্তিকে বলিলেন "না ঠাকুরঝি, তা কখন কি হয়? সুরেশ বাবুরা কি মনে কর্‌বেন?"

প্রভাঠাকুরঝি বলিল "এই তিন ক্রোশ কল্‌কাতায় আস্‌তে গাড়ির হড়্‌হড়ানিতে আমাদেরি পিঠ চচ্চড় কর্‌চে। বাবাতো বুড়োমানুষ; বাতে অস্থির হয়েচেন; আজ কি উনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন্"?

তখন কর্ত্তা "হো হো হো—হা হা হা" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন আর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "মেঘনাদ—practical joke, practical joke, এসব হরনাথের দুষ্টামি—হো হো হো—হা হা হা কল্‌কাতা কোথায়?—আমরা তো নিজের গ্রামেই বাড়িতে ব'সে আছি—হো হো হো হা হা হা—দম্ আটকে প্রাণ বেরোলো দেখ্‌চি—আমার এ জামাইটি অদ্বিতীয় joker!—পাছে ধরা পড়ে তাই সদর ফটক দিয়ে তোমাদের না এনে এই মহলের পেছন দিকের দোর দিয়ে এনেচে বুঝি?—হো হো হো, তাই তোমরা এ অন্ধকারে টের পাওনি!—হাঃ! হাঃ! হাঃ"—

আমি তখন চারিদিকে তাকাইয়া দেখি—সেই বাড়ি, সেই কর্ত্তার গৃহ, সেই টেবলের উপর সেই বৃহৎ আরসী, সেই দেয়ালের গায়ে দুইটি, বড় বড় শৃঙ্গ সুশোভিত হরিণের মুখ কোথায় বা ডাকাতি, কোথায় বা কলিকাতা, কোথায় বা সুরেশ সমাজপতির বাড়ি! এমনও বে—ওকুফ্ কেউ বনে গা!

হতবুদ্ধি রাঙ্গাদিদি "আঃ কপাল!—এমন নাকাল"! বলিয়া গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

আমার শালিদের মধ্যে দুই তিনজন সক্রোধে বলিল "কোথায় সে চোর? তার নাক কেটে নেব—ওমা শ্বশুর বাড়িতে এসে এমন দৌরাত্ম্যি! এমন ধাষ্টমো! এমন বদমায়েসি"!

কিন্তু কর্ত্তা হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি কিছুতেই থামে না! আমার শাশুড়িঠাকুরাণী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অনঙ্গদেবী হাসিতে হাসিতে, "ও'বৌ—ভাল ক'রে নীচে গিয়ে হাসি" এই কথাগুলি অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিয়া, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল।

পণ্ডিতমহাশয় আমার কাণে চুপি চুপি বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আমি সে শঠশিরোমণিকে তো আগেই বলেছিলাম—

ত্বমসি শঠবিকটঃ
ত্বমসি অতি কপটঃ
ত্বমসি মম ভবজলধিনক্রঃ"—

আমিই কেবল হাসিলাম না। আমার ইচ্ছা হইল, আমি নিজের গালে নিজেই আচ্ছা করিয়া চপেটাঘাত করি।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

তখন রাঙ্গাদিদিও হাসিতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন "আমাদ্দের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েচে। পরকে কচু খাওয়াতে গেলে নিজেই কচু খেতে হয়। এ কচু খাওয়া চিরকাল মনে থাকবে"।

প্রভাঠাকুরঝি সহাস্যে বলিলেন "এ কচু ব'লে কচু!—এ দগ্ধ কচুর চেয়ে অধম কচু"! আমার কবিতা-প্রিয় শালিটি বলিল "এ যে সত্যিসত্যিই হোলো—

"ঝোলে কচু, টকে কচু, কচু মূলোর সুক্ত,
কচুর ঘণ্ট, বিউলির ডাল, তাও কচু-যুক্ত''!

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "এখন চল; সকলে ও মহলে যাওয়া যাক—দেখা যাক, এ ঘর পোড়া হনুমান ঘরে আগুন কেমন করে দিয়েছিল। ওমা—আমরা জানেলা দিয়ে দেখলাম চারদিকে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলচে!—কে জান'ত এ সত্যিকার আগুন নয়''!

বুড়ো ঝি দুঃখিত স্বরে বলিল "ওমা—আগুণে আমার এ সাদা মাথার চুল খানিকটে পুড়ে গিয়েচে।—এ কোন্‌দিশি রঙ্গ গা"!

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে মৃদুস্বরে বলিলেন "দূর বুড়ি এ রত্নাবলীর ভোজবাজির আগুণ, এ সাগরিকার আগুন!"

আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী সগর্ব্বে সহাস্যে রাঙ্গাদিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "না ছোট খুড়ি—আমার জামাই ঘর পোড়া হনুমান কেন হ'তে যাবে!—ও অত বুদ্ধি রাখে; ও নিশ্চিত কোন্ দিন হাইকোর্টের জজ হবে। আহা প্রভার ভাগ্যে আমার জামাই বেঁচে থাক!"

আমার প্রথম শালি বলিলেন "অমনি জিলিপির প্যাঁচ!—হ্যাঁ উনি আবার একটা প্রমদা বাঁড়ুয্যে, একদা গুরুদাস বাঁড়ুয্যে হবেন!—মা, তোমার জামাই পুলিসের দারোগা হবে"!

কর্ত্তা মহাহাস্যে হাসিয়া উঠিলেন। এই অচিন্তনীয় রঙ্গরহস্যময় বিপ্লবের সময়ে শ্বশুর শাশুড়ি বধূদিগের সমাজের কঠোর শাসন অনুমোদিত লজ্জাশীলতার ভাব কতকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আমার শালিদিগের মত আমার শালাজেরাও উচ্চহাস্য করিতেছিল।

কর্ত্তা সহাস্যে বলিলেন "বাহিরের আলমারিতে আমার যে double barelled Henri Martini ছিল, বাবাজি দেখ্‌চি তাই নিয়ে সমস্ত রাত্রি মিথ্যে আওয়াজ করেছিলেন। কিন্তু তোমরা যে বল্‌চ অনেকগুলো ডাকাত ছিল। এ রহস্যটা আমি বুঝে উঠতে পাচ্চিনে"—

আমার তৃতীয়া শালিটি মুখ ঘুরাইয়া বলিল "বাবা, তুমি বোঝ না—হরনাথ বাবু কি কম্—ও একা একশো"!

আমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম। কর্ত্তা সহাস্যে আবার বলিলেন "আর একটা কথা বুঝতে পাচ্চিনে—হরনাথ এ তিনখানা গাড়ি কোত্থেকে যোগাড় করলে?—এ গাঁয়ের গাড়ির আড্ডায় ভাড়াটে গাড়ি আন্‌তে বা কাকে পাঠিয়েছিল?—আর চৌবে দরোয়ানটা আর সাধু চাকরটাকে তোমরা কেন ডাকলে না?—কি বল্‌চ? ওদের সিদ্ধি খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল?—হা, হা, হা—এ রহস্যের যে অন্ত নাই, সীমা নাই—ন ভূতম্ ন ভবিষ্যতি—আর তিনখানা গাড়ি হাঁকিয়ে সত্যিসত্যিই কি কল্‌কাতা প্রদক্ষিণ ক'রে এল?—হা—হা—হা!"

নূতন ঝি বলিল "ও জামাইবাবুর কিছুই অসাধ্যি ক্রিয়ে নেই!—আমার বোধ হয় আমাদের গাড়ি চড়িয়ে মগ্‌রা বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়েছিলেন"!—আমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম।

কমল ঝি বলিল "তোমরা সকলে হাস্‌চো—আমার কিন্তু এ হাসিটে আদপে ভাল লাগচে না!—চোর জামাইবাবুর সঙ্গীরা আমার হাতের বালা কেড়ে নিয়েচে। ছোট জামাইবাবু, তুমি চোরের ওপোর বাটপাড়ি করো আমার বালা এনে দাও"।

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে সদলবলে উঠিয়া বলিলেন "চল্ তাই হবে—এখন চল্ ও মহলে যাই—একেই বলে দিন দুপুরে ডাকাতি"!

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তা কর্ত্রীকে সেই স্থানেই রাখিয়া আমি, রাঙ্গাদিদি, তাঁহার জয়াবিজয়াগণ, আর তিন দাসী—আমরা সকলে একত্রে—রাঙ্গাদিদির মহলের দিকে ছুটিলাম। (ক্রমশঃ)

এক না দুই?

জগৎ এক না দুই। এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া দার্শনিকেরা বহুকাল হইতে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আছেন। কোন কালে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। কখন হইবে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মীমাংসার কোন উপায় হইবে, লেখকের সেরূপ অনুচিত স্পর্দ্ধা নাই; তবে পাঁচ জন পণ্ডিতে যে পাঁচ রকম উত্তর দিয়া থাকেন তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে মাত্র।

প্রথমে প্রশ্নের অর্থ বুঝা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ পদার্থের সংখ্যা করিয়া উঠে মনুষ্যের মনের এরূপ শক্তি নাই। বস্তুতই যে সকল জ্ঞানগোচর বা অনুভবগোচর সামগ্রী জগতের উপাদান, তাহাদের সংখ্যার কোন উপায় নাই। সংখ্যা করিতে উপস্থিত হইলেই মনুষ্যকে দিশাহারা হইতে হয়। অথচ জগৎ লইয়া যখন কারবার তখন উহাদের সহিত একরকম পরিচয় না রাখিলেও চলে না। প্রত্যেকের সহিত পৃথক করিয়া পরিচয় যেখানে অসম্ভব

সেখানে বাধ্য হইয়া একটি শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। গোটাকতক লক্ষণ ধরিয়া সেই লক্ষণের হিসাবে সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। এই রূপে সংখ্যাতীত পদার্থ সংখ্যেয় শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট হয়। আবার পঞ্চাশটা শ্রেণীকে কোন একটা বিশেষ লক্ষণ ধরিয়া আর একটা বিস্তৃতের শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হয়। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানগোচর পদার্থ সমুদই স্থানলাভ করে। যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অবকাশ বা উপায় নাই, সে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়াছে জানিলে তাহার অন্তরে একটা লক্ষণ জানা থাকিল। শ্রেণী কয়টার লক্ষণ মনে ধরিয়া রাখিতে পারিলে সমগ্র জগৎটারই একরকম পূর্ণ পরিচয় জানা থাকিল। এইরূপে মানসিক ব্যায়ামের লাঘব ঘটে; এবং দুরন্ত জীবনসমরে কোনরূপে মানসিক শ্রমের লাঘব ঘটিলেই তজ্জনিত আরাম ও আনন্দ স্বতই উপস্থিত হয়। এই জন্য মনুষ্যের মন অসংখ্যকে সংখ্যেয়ের মধ্যে ফেলিবার জন্য, জাগতিক পদার্থ নিচয়কে জগতের উপাদানগুলিকে কয়েকটা পরিচিত শ্রেণীর মধ্যে আনিবার জন্য ব্যাকুল।

এই রূপে মানসিক শ্রম সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে সমুদয় জাগতিক পদার্থকে পূরিবার চেষ্টা বহুকাল হইতে দেখা যাইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত গোটা-কতক শ্রেণীতে দাঁড়াইতে হইবে। সেই সংখ্যা যতই কম হয়, ততই সুবিধা। এখন প্রশ্ন এই, কোথায় গিয়া থামিবে, দশে না পাঁচে না দুইয়ে না একে ? কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে। সমস্ত জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সেই দুইটার মধ্যে আর কোন সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই, সেই দুইটা পরস্পর হইতে এত তফাত, যে তাহাদিগকে আর একের ভিতর, এক শ্রেণীর ভিতর, এক পর্য্যায়ের ভিতর আনা চলে না। আবার কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে থামিব কেন ? একটু অভিনিবেশ করিলে সেই দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য সাম্য, বা সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব বাহির করা যাইতে পারে। সুতরাং দুইকেও টানিয়া একের ভিতর ফেলিতে পারা যায়। অথবা তোমরা যাহাকে যাহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিক পদার্থ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে একই, উভয়ের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। যা কিছু পার্থক্য, তাহা আকৃতিগত বা রূপগত। একই জিনিষ বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান।

এইরূপে দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বিষম কোলাহল করেন। কেহ বলেন দুই, কেহ বলেন এক। কোলাহল তীব্র ও গগনভেদী। কখনও ইহার নিবৃত্তি হইবে বোধ হয় না।

কথা হইতেছে জ্ঞানগোচর পদার্থ লইয়া, জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়ব উপাদান উপকরণ লইয়া। এখন জগতের উপাদান কি ? জগতের উপকরণ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, জল বায়ু আকাশ, রূপ, রস শব্দ; ভাবনা ইচ্ছা চিন্তা ইত্যাদি। এ সকলেই জগতের উপাদান। সূর্য্য চন্দ্রাদিও যেমন জগতে বর্ত্তমান, রূপরসাদি বা হর্ষবিষাদাদিও তেমনি জগতে বর্ত্তমান। সকলেই আমাদের জ্ঞানের গোচর বা অনুভবগম্য। এ সকলকে লইয়াই এই বিশাল বিচিত্র জগৎ। একটি দূরস্থ তারকা, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা, আইজাক নিউটন ও ক্ষুদ্র কীটাণু,

হাওয়ার্ডের মানবপ্রেম ও ক্লাইবের জুয়াচুরি, সকলই জগতের উপাদান ও উপকরণ, কাহাকেও ছাড়িতে পারি না।

প্রথম দৃষ্টিতেই এই সকল পদার্থের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য, আসিয়া পড়ে, যাহা ধরিয়া দুইটা বিস্তৃত শ্রেণীর মধ্যে সবগুলাকে ফেলা চলিতে পারে। চন্দ্রসূর্য্য ও ক্ষুদ্র বালুকণা অনেকাংশে একজাতীয় সামগ্রী; অনেক প্রভেদ থাকিলেও একটা সহজবোধ্য সাদৃশ্য লইয়া ইহারা জ্ঞানগোচর হয়। আর ক্লাইবের জুয়াচুরি ও হাওয়ার্ডের প্রেম যেন ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ, উহারা যেন আর একটা স্বতন্ত্র জগতের উপাদান।

সুতরাং জগতের পানে চাহিবামাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই দুই শ্রেণীর পদার্থ দেখা দেয়। এক শ্রেণীর পদার্থকে আমরা জড় পদার্থ ও অন্য শ্রেণীর পদার্থকে চিৎপদার্থ অভিধান দিই। জড় যেন চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই, কোন সাদৃশ্য নাই। জগৎ যেন দুইটা,—একটা জড়জগৎ, একটা চিৎ-জগৎ বা মনোজগৎ। উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমেই দেখা যায়, জড়জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত জগৎ। অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি কতিপয় শারীরিক যন্ত্রযোগে আমরা জড়জগতের সহিত কারবার চালাইয়া থাকি; এই সকল যন্ত্রগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় আখ্যা দিয়া থাকি, এবং আমরা জানি এই ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের জড়জগৎসম্বন্ধীয় সমুদয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ঐ জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করিয়া দাও; আর ঐ জগতের কোন সংবাদ তুমি পাইবে না। তোমার নিজের শরীরটাও ঠিক এই অর্থে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, সুতরাং জড়জগতের অন্তর্বর্ত্তী; অথবা যে সকল যন্ত্রের যোগে বাহ্যজগতের জ্ঞান আমার নিকট পৌঁছে তাহারাও আমার শরীরের অথবা জড়জতের অন্তর্গত। চন্দ্রসূর্য্যকে ও জলবায়ুকে যে হিসাবে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বলা যায়, ভাবনা, ইচ্ছা, চিন্তা, হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি সামগ্রীকে ঠিক সেই হিসাবে ইন্দ্রিয়গোচর বলা যায় না। চন্দ্রসূর্য্য ও জলবায়ু রূপরসাদিযুক্ত; আর আমার ভাবনা ইচ্ছা কি বিষাদাদি রূপরসাদিবর্জ্জিত; সুতরাং তাহারা জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত নহে!

এইখানেই একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়; এমন পদার্থ কি থাকিতে পারে না যাহা রূপ রসাদি বর্জ্জিত অথচ তাহা জড়পদার্থের মধ্যে গণ্য ? এইত আজকাল পণ্ডিতেরা আকাশ বা ঈথর নামক একটা জড়পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাও আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা রূপ-রস-গন্ধাদি বর্জ্জিত; তবে কি সেই আকাশকে জড়পদার্থ না বলিয়া চিৎপদার্থের মধ্যে ফেলিব, না তাহার জন্য একটা না জড় না চিৎ একটা মাঝামাঝি তৃতীয় জগতের প্রতিষ্ঠা করিব।

ইহার উত্তর এই। এই ঈথর বা আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু ইহার বিবিধ গতি উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ। যেমন স্থির বায়ু আমাদের সহজে স্পর্শগোচর

হয় না, কিন্তু চলন্ত বায়ু আমাদের স্পর্শবোধ জন্মায়, সেইরূপ স্থির আকাশই আমাদের অনুভবগম্য নহে, কিন্তু আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের অনেকেই আমাদের অনুভবগম্য। আকাশে যে সব ছোট ঢেউ উঠে, তাহা আমাদের দৃষ্টিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন ; সেই ঢেউগুলি আমরা দেখি না, কিন্তু ঢেউগুলির ধাক্কা চোখে না পড়িলেও আমরা অন্য জিনিষ দেখিতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে ঢেউগুলির ধাক্কা অনুভবের নামই দৃষ্টি ; তবে সেই ধাক্কাগুলির সাহায্যে আমরা দূরস্থ অপর পদার্থের অস্তিত্ব স্থির করিয়া লই, সে আমাদের একটা অনুমানের বা কল্পনার বা সৃষ্টিক্ষমতার বাহাদুরী। আবার সেই ঈথরের যখন টান পড়ে, তখন যে বিবিধ ক্রিয়া অনুভবগোচর ও ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাদিগকে তাড়িত ব্যাপার অভিধান দিই, আবার সেই ঈথরের যখন ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত জন্মে, তখন বিবিধ ক্রিয়া অনুভবে আইসে, তাহাদিগকে চৌম্বক ব্যাপার বলিয়া থাকি। সেই ঈথরে যখন বড় বড় ঢেউ চলিতে থাকে, উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে ধরিতে পারি না বটে, কিন্তু সম্প্রতি কৌশলক্রমে সেই বড় বড় ঢেউগুলিকেই রূপান্তরিত করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে কিরূপে বলিব। ঈথর যদি ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, তবে বায়ু বা জল বা মাটি বা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর কিরূপে ? মাটি ও জল ও বায়ু ইহারা ত স্বয়ং আমাদের জ্ঞানগোচর নহে, আমরা উহাদের গতিই অনুভব করিয়া থাকি। বায়ু যখন বহিতে থাকে, তখন আমরা উহার ধাক্কা খাই, বায়ুর কণাগুলি যখন কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয় তখনই আমরা শব্দ শুনি ; বায়ুর, জলের বা মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যখন দুলিতে দুলিতে আমাদের চর্ম্মের উপর ধাক্কা দেয়, তখন আমরা উহাদের শীতোষ্ণতা বুঝিয়া থাকি, আবার এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলির কম্পন যখন ঈথরে সংক্রান্ত হইয়া দূর হইতে আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয়, তখন আমরা দূরে ঐ সকল কণিকার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। সময়ে সময়ে এমনও হয়, ঈথরের ঢেউগুলি আসিতে আসিতে ঘুরিয়া একমুখ হইতে অন্যমুখে চলিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা যেস্থানে উহাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি কল্পনা করি, সেখানে হয় ত উহাদের অস্তিত্বও নাই, অবস্থিতিও নাই। উদাহরণ—প্রতিবিম্ব ও মরীচিকা। কোন কোন জড়পদার্থ মুখ্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে ; উহাদের গতি, উহাদের প্রবাহ, স্রোত, কম্পন, আন্দোলন, ঘূর্ণন প্রভৃতিই মুখ্যতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর। তবে যে সেই সকল গতির, প্রবাহের, কম্পনের, ঘূর্ণীর সাহায্যে আমরা উহাদের স্থিতি ও অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করি, সে একটা আমাদের বাহাদুরী এই, অন্য কিছু নহে। সুতরাং ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুৎ যদি জড়পদার্থ হয়; আকাশ বা ঈথরও সেই অর্থে জড়পদার্থ। কোন জড়পদার্থই মুখ্যতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, সকলেই বিভিন্নরূপ গতিক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে।

সুতরাং জড়পদার্থ ছাড়িয়া আর একটা নূতন পদার্থ জগতে উপস্থিত হইল ; ইহার নাম

গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে সম্বন্ধ কি ? যতদূর দেখা যায়, একৃকে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। গতিহীন জড়পদার্থ আছে কি না আমরা জানি না, থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে আলোচনা মস্তিষ্কের নিষ্ফল অপচয়মাত্র। সেরূপ জড়পদার্থ কোন কালে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে না বা জ্ঞানগোচর হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে ; তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বাতুলের প্রলাপ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর।

সুতরাং গতি ছাড়িয়া জড় নাই ; এবং জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় করিয়াই গতি। এবং আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গতিরই সহিত গৌণতঃ জড়ের সহিত। যদি একটা জড়জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা গতিজগৎ মানিবে না কেন ?

যাই হউক, জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ। এমন কি যাহা জড় তাহাই গতিহীন ; অথবা যাহা গতিহীন তাহাই জড়, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় ভুলের সম্ভাবনা নাই।

জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গেলে জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি ? না যাহা গতিশীল। গতি কি ? না স্থান পরিবর্ত্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কি, না, উহা এইক্ষণে এখানে ছিল ; পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এইক্ষণ ও পরক্ষণ, এখানে ও ওখানে, ইহার মধ্যে দুইটা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা পরিবর্ত্তনকে আমরা কালগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। আর একটাকে দেশগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। অর্থাৎ কালমধ্যে দেশগত যে পরিবর্ত্তন অনুভবগম্য হয়, তাহারই নাম গতি। আমরা জড়দ্রব্য অনুভব করি না ; আমরা উহার গতি অনুভব করিয়া থাকি। গতির অনুভব কি ? না একটা পরিবর্ত্তনের অনুভব। পরিবর্ত্তনটা কিরূপ ? ইহা বাক্য দ্বারা, ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না, তবে মনে মনে অনুভব করিয়া থাকি। আমিত অনুভব করি, তুমিও অনুভব কর। তবে এই পরিবর্ত্তনের একটা নাম দেওয়া যায়। সেই নামোল্লেখেই তুমি বুঝিতে পারিবে, পরিবর্ত্তনটা কিরূপ। একটা পরিবর্ত্তন দেশগত ; এখানে ছিল, ওখানে আসিয়াছে। আর একটা পরিবর্ত্তন কালগত ; এখানে ছিল তখন ; ওখানে আসিয়াছে এইক্ষণ। দুইটা পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেশের পরিবর্ত্তন কালের সহব্যাপী। একই ক্ষণে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিতি কল্পনায় আসে না। এখানে ছিল, ওখানে গেল ; উভয় ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। তাই কালক্রমে দেশগত পরিবর্ত্তন ; ইহাই গতি। এই গতি জড়পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম বা প্রধান লক্ষণ ; কেননা গতি ছাড়িয়া জড় নাই, গতিহীন জড় জ্ঞানগম্য নহে। দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি জড়ের লক্ষণ। জড় দেশ ব্যাপিয়া আছে ও কাল ব্যাপিয়া আছে। এখানে আছে আবার হয়ত ওখানে আছে। এইক্ষণে আছে আবার পরক্ষণে থাকিবে। এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকে জড়ের লক্ষণ বলিয়া থাকে। আর এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিগত যে পরিবর্ত্তন আমরা অনুভব করি, তাহাকেই আমরা গতি আখ্যা দিই।

সুতরাং আমাদের জ্ঞানগোচর জগতের একাংশ জড়জগৎ ও গতিজগৎ। কেহ

'জড়জগৎ ও গতিজগৎ' না বলিয়া হয় ত 'জড়জগৎ বা গতিজগৎ' বলিবেন। সে তর্কে এখন কাজ নাই। এই জগতের লক্ষণ দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি। কিন্তু জ্ঞানগোচর জগতের আর একটা বৃহৎ অংশ আছে, তাহা এই জগতের সামিল নহে। আমার চিন্তা, আমার বাসনা, আমার হর্ষ ও বিষাদ সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর, অস্তিত্ববান্ সামগ্রী। বরং চন্দ্রসূর্য্য, ক্ষিত্যপ্ তেজ ছাড়িয়া আমি দুই দণ্ড থাকিতে পারি, কিন্তু ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য নাই। ঘোর সুষুপ্তি কালে যখন চন্দ্রসূর্য্য ক্ষিত্যপ্ তেজ অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়, তখনও হর্ষ বিষাদ আশা ভয় স্মৃতি ও বাসনার ছায়া আমার সম্মুখে নৃত্য করে। ইহারা অস্তিত্ববান্; কিন্তু ইহারাও কি জড়পদার্থ? ইহাদের গতি আমরা বুঝি না; ইহাদের দেশব্যাপ্তি আমাদের ধারণায় আইসে না। ইহাদের রূপ নাই, রস গন্ধ স্পর্শও নাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আকার আয়তন স্থিতি গতিও নাই। মোট কথায় ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, অথচ কালব্যাপ্তি আছে। ভয় এই ছিল, এই নাই; আশা তখনও ছিল, এখন আর নাই। বাসনা লুপ্ত হইয়াছে। স্মৃতি ক্রমে বিস্মৃতিতে ডুবিতেছে। ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, কিন্তু কালব্যাপ্তি আছে। সুতরাং দেশ-কাল-ব্যাপ্তিযুক্ত গতিযুক্ত জড়জগৎ ছাড়া কালব্যাপ্তিমাত্রবিহিত গতিহীন আর একটা চিৎ-জগৎ বা মনোজগৎ আছে।

সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর হইল, জগৎ দুইটা, অথবা জ্ঞানময় জগতের দুইটা ভাগ; একটা জড়জগৎ, গতিজগৎ, বাহ্যজগৎ; দেশকালব্যাপ্তি ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ; রূপরসগন্ধস্পর্শাদি ইহার গৌণ লক্ষণ; অথবা ইহারা উল্লিখিত গতিরই ইন্দ্রিয়লব্ধ ফল। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় জগৎ বর্ত্তমান,—মনোজগৎ, চিৎজগৎ বা অন্তর্জগৎ; কেবল কালব্যাপ্তি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দেশব্যাপকতা নাই, গতি নাই। রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়লব্ধ ধর্ম্ম নাই, আছে কেবল কালব্যাপ্তি; ইহার অন্যান্য ধর্ম্ম ভাষায় প্রকাশ্য নহে; তবে অনুভবগম্য বটে।

সুতরাং জগৎ দুইটা; অথবা একই জগতের দুইটা স্বতন্ত্র ভাগ। এই হইল এক সম্প্রদায় পণ্ডিতের উক্তি। এই দুই ভাগকে আর মিলাইয়া একটা ভাগের মধ্যে ফেলিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সাদৃশ্য নাই, ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। এই হইল এক সম্প্রদায় পণ্ডিতের দ্বৈতবাদ।

এই খানে জড়বাদী আসিয়া দাঁড়ান। তিনি জড়বাদী কিন্তু অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, বাহ্বা, জড়জগৎই জগৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্। গতি জড়ের ধর্ম্ম। গতির বিভিন্নমূর্ত্তি। কখন স্রোত, কখন ঢেউ, কখন ঘূর্ণী। গতির বিবিধ মূর্ত্তি অনুসারে তাড়িতক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া আলোক ক্রিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যের শরীর জড় পদার্থ সন্দেহ নাই। মনুষ্যের শরীর জীবন্ত পদার্থ; জীবন কি; কতকগুলি বিভিন্ন গতির সমষ্টি মাত্র। জীবনের গতির ব্যাপার জটিল বটে, কেন এমন হয় ঠিক্ বুঝিতে পারি না; কিন্তু কোন্ গতিই বা বুঝি। আতা ফল মাটিতে পড়ে, কেন পড়ে বুঝি কি ?

অম্লজানকণিকা উদজানকণিকার প্রতি ধাবিত হয়; কেন হয় কেহ বলিতে পার কি ?

অঙ্গার ও অম্লজান ও উদজানকণিকা আর পাঁচটা কণিকার প্রতি দৌড়িয়া বিচিত্র রকমে জীবনী ক্রিয়ার উৎপাদন করে; ইহাও আর অধিক আশ্চর্য্য হইল কি ?

কথাটার উত্তর দেওয়া কঠিন। মনুষ্য শরীরের সমগ্রভাবে ও প্রত্যেক অংশে যে জীবনী ক্রিয়ার বিকাশ দেখি ক্ষুদ্র জৈবনিক প্রোটোপ্লাজমে তাহাই দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই জীবনী ক্রিয়া সজাতীয়। শর্করাদ্রবে মিছিরির দানা ক্রমে বড় হইয়া জমে; ঘটনাটা অতদূর জটিল না হউক, ভিন্ন জাতীয় কে বলিল ? অভিব্যক্তিবাদ কে না মানে ? যে আজিও মানে না সে নির্ব্বোধ। নির্জ্জীব ও সজীবে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে স্বীকার করিলে অভিব্যক্তিবাদ উল্টাইয়া যাইবে।

আর একটা কথা। জীবন গতি হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু চৈতন্য ? ইচ্ছা ? বুদ্ধি ? হর্ষ ? বিষাদ ? ইহারা কি ?

উত্তর মনুষ্যের শরীর জড়পদার্থ। মিছিরির দানা যেমন জড়পদার্থ; সেই জাতীয় জড় পদার্থ। আর মস্তিষ্ক মনুষ্য শরীরের অন্তর্গত জড়পদার্থ। যেখানে মস্তিষ্ক, সেই খানে ইচ্ছা ভাবনা, হর্ষ বিষাদ। যেখানে মস্তিষ্ক নাই, সেখানে উহাদেরও অস্তিত্ব নাই। অঙ্গারকণিকা গতিযুক্ত হইলে তাপ জন্মে, মস্তিষ্ককণিকা গতিযুক্ত হইলে হর্ষ বিষাদের উৎপত্তি হয়। সুতরাং হর্ষ বিষাদ একরূপ গতি, অথবা জড়পদার্থের অবস্থাবিশেষে গতিবিশেষে উৎপন্ন ধর্ম্ম।

অর্থাৎ অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ বলিয়া পৃথক্ জগৎ কল্পনা করিবার দরকার নাই। মস্তিষ্কের আশ্রয় ব্যতীত মানসিকভাবের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় নাই। সুতরাং ফস্ফরস্ যেমন আলোক উদ্গীরণ করে, মস্তিষ্করূপী পদার্থ সেইরূপ চিন্তা উদ্গীরণ করে। উভয়েরই মূলে জড় ও জড়ের গতি।

এই হইল জড়বাদীর অদ্বৈতবাদ। জগৎ একটা, উহা জড়জগৎ; গতি উহার ধর্ম্ম। গতির ফলে বিবিধ জ্ঞানগম্য ঘটনা, তাড়িত, চৌম্বক, রাসায়নিক, জৈব, মানসিক। জড়বাদীর মধ্যেও যে দ্বৈতবাদ প্রচলিত নাই, এমন নহে। ইঁহারা জড় ও গতি স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন। জড় এক রকম জিনিষ, গতি অন্যরূপ জিনিষ। এক অন্যের আশ্রয় স্বরূপ হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উভয়ে বিভিন্নজাতীয় পদার্থ। গতির মূলে জড় বিদ্যমান; কিন্তু গতি যাহা, জড় ঠিক্ তাহা নহে।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা আসিয়া এই উভয়টাকে আর একটু ঘনাইয়া তোলে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা প্রায় একশত বৎসর হইল প্রমাণ করিয়াছে, জড়পদার্থের সৃষ্টিও নাই ধ্বংসও নাই, আবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসরমাত্র হইল শক্তি নামক একটার অস্তিত্ব গণিতবিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং দেখা গিয়াছে এই শক্তির এ সৃষ্টি নাই, ধ্বংসও নাই। এই শক্তি জিনিষটা কি, যিনি পদার্থ বিদ্যা অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাকে বুঝান শক্ত। গতিবলে শক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু গতি আর শক্তি ঠিক্ এক নহে। গতির পদার্থবিদ্যার ইংরাজি নাম motion; শক্তির নাম energy। আবার পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে বল নামে আর একটা শব্দ

পাওয়া যায়, যাহার ইংরাজি force। সাধারণ দর্শনশাস্ত্রব্যবসায়ী পদার্থবিদ্যার motion, energy ও force বা গতি, শক্তি ও বল, এই তিনটাকে লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া ফেলেন। বড় বড় পণ্ডিতের দর্শনশাস্ত্রঘটিত গ্রন্থে দেখা যায় force এবং energy দুই শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হইতেছে ; এবং পদার্থবিদ্যা একের সম্বন্ধে যাহা বলেন, অপরের স্কন্ধে তাহার আরোপ হইতেছে। 'উদোর পিণ্ডি' ইত্যাদি বচনের এই স্থলে ঠিক্ সার্থকতা। যাহাই হউক, পদার্থবিদ্যোক্ত বল ও পদার্থবিদ্যোক্ত শক্তি ঠিক্ এক পদার্থ নহে। প্রভেদ কি তাহা এস্থলে বুঝাইবার দরকার নাই। বস্তুতঃ পদার্থবিদ্যার বল একটা শব্দমাত্র, একটা নামমাত্র, একটা অভিধান বা সংজ্ঞামাত্র ! উহার কোনরূপ জ্ঞানগোচর বা অনুভবগোচর অস্তিত্ব নাই। শক্তি একটা অস্তিত্ববান সামগ্রী, ইহার বেচাকেনা চলে, ইহা লইয়া কারবার চলে, ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ চলে, ইহা ঠিক জড়পদার্থের মতই খরচ করা বা সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে। জড়পদার্থের যেমন ধ্বংস নাই, ইহারও সেইরূপ ধ্বংস নাই। অথচ ইহা জড়পদার্থ নহে ; জড়পদার্থ ইহার আশ্রয় বা অবলম্বন হইতে পারে, কিন্তু উভয় স্বতন্ত্র প্রকৃতিক পদার্থ। সুতরাং জড়ের যেমন অস্তিত্ব আছে, শক্তিরও সেইরূপ অস্তিত্ব আছে। শক্তি এক জড়দ্রব্য হইতে অন্য জড়দ্রব্যে যায়। সেইরূপস্থলে আমরা গতি অনুভব করি। বস্তুতঃ গতি বলিয়া পদার্থ নাই। পদার্থ যদি থাকে তাহা শক্তি ; গতি, দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে শক্তিসঞ্চারের ফলমাত্র। আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাও সেই শক্তি মাত্র। শক্তি যখন বহিঃস্থ জড়দ্রব্য হইতে আসিয়া আমাদের শরীরের অংশবিশেষে প্রবেশ করে, তখনই আমরা রূপরসগন্ধাদিযোগে জড়ের অস্তিত্ব স্থির করি।

বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যা স্থির করিয়াছে জড় ও শক্তি উভয়ই অনশ্বর। ইহাদের সৃষ্টিও আমরা দেখি না ও ধ্বংশও আমরা দেখি না। ইহাদিগকে লইয়া জড়বাদীর দ্বৈতবাদ। জগতের দুইটা ভাগ। একটা জড়, আর একটা শক্তি, তৃতীয় পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই। শক্তিযোগে জড়পদার্থে গতি উৎপন্ন হয়। সেই গতিবশে সমুদয় জাগতিক ক্রিয়া।

একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি আসিয়া দাঁড়ায়। সেই আপত্তির সম্মুখে জড়বাদ ও জড়বাদীর দ্বৈতবাদ উভয়ই সমূলে ধ্বংস পায়।

প্রথম কথা এই। জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। ধ্বংস নাই কে বলিল ? হর্বট স্পেন্সার বলেন জড়ের ধ্বংস বা শক্তির ধ্বংস আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না ; সুতরাং জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তিরও ধ্বংস নাই। হর্বট স্পেন্সার কল্পনায় আনিতে পারেন না ; কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে, রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লাবোয়াশিয়ের পূর্ব্বে, জড়ের ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় আসিত ; এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, হেলমহোলৎজের পূর্ব্বে, শক্তির ধ্বংসও সকলেরই কল্পনায় আসিত। উহাদের অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য লাবোয়াশিয়ের এবং হেলমহোলৎজের জন্মগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল। এমন কি, হর্বট স্পেন্সার শক্তির নশ্বরতা কল্পনায় আনিতে পারেন না, কিন্তু তিনিই স্বরচিত First Principle নামক বিখ্যাত

গ্রন্থে পদার্থবিদ্যাবিদের Conservation of energyর সহিত স্বকল্পিত Persistence of forceকে এমন ভাবে জড়াইয়াছেন, যে শক্তি পদার্থের তাৎপর্য্যই তাঁহার কতদূর হৃদ্গত হইয়াছে তাহাতে সংশয় জন্মে। প্রকৃতপক্ষে জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই, আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কতদিনের ; আমাদের ভূয়োদৃষ্টি কতদূর ব্যাপিয়া আছে ? আমরা বিশাল জগতের যে সঙ্কীর্ণ প্রদেশ এই কয়টা দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি, সেই অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা লইয়া অতদূর লম্বা কথাটা বলিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। সুতরাং জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনশ্বর, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা। জড় কোথায় ? জড়বাদী সচরাচর বলিয়া থাকেন, জড় শক্তির আশ্রয়। কিন্তু জড় শক্তির আশ্রয় তাহার প্রমাণ কি ? শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ; আমাদের রূপরসস্পর্শাদি অনুভূতির উৎপত্তি হয়। শক্তির সঞ্চারে গতি উৎপন্ন হয়। শক্তি লইয়া আমাদের কারবার, গতি লইয়া আমাদের কারবার। শক্তি আমাদের অনুভবগোচর ; শক্তিসঞ্চারের ফল গতি আমাদের জ্ঞানগম্য, আমাদের প্রত্যক্ষ। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি শক্তির প্রকার ভেদ ; ইহারাই আমাদের জ্ঞানগম্য। ইহাদিগকেই আমরা জানি ; ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি ; কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। শক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। শক্তিময় জগৎ। শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ উপাদান। সমুদয় পদার্থবিদ্যা শক্তির এই আনাগোনা সম্বন্ধের বিচার করে। কাল্পনিক জড়ের সহিত আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। জড়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া সমগ্র পদার্থবিদ্যার আলোচনা আজকাল অসম্ভব নহে'।

ফলে আধুনিক পদার্থবিদ্যার আলোচনায় স্পষ্টই দেখা যায়, জগতের মধ্যে গতিবিধি ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার জন্য জড়পদার্থ নামক একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিষের কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। তবে পদার্থবিদ্যার মধ্যে যে জড়ের উল্লেখ দেখা যায়, উহা একটা গণিতবিদ্গণের কল্পিত সংজ্ঞামাত্র; উহার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব প্রমাণহীন। জড়ের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র হইলে জড়বাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িল।

জড় অস্তিত্বহীন হইলেও শক্তির অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে দেখা যায় শক্তিই বা কোথায় ? আলোক, তাপ, শব্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট দৃষ্টি, স্পর্শ ও শ্রুতিমাত্র। আমরা যে ব্যাপারকে শক্তির আনাগোনা আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা কেবল আমাদের কতকগুলি অনুভূতিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আমাদের প্রত্যক্ষ ; অনুভূতির মূলে, অনুভূতির কারণ স্বরূপে আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা আমাদের অনুমান, তাহা আমাদের মানসিক ব্যায়াম, তাহা আমাদের মনেরই খেলা বা খেয়াল।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে কি না জানি না। কিন্তু ইহাতে শক্তিবাদ বা জড়বাদ শূন্যে মিশিয়া যায়। ইহাকে আত্মবাদ বা চৈতন্যবাদ বলিতে পার। জড়বাদের সহিত ইহার মৌলিক প্রকৃতিগত বিরোধ।

যাঁহারা এই প্রকৃতিগত বিরোধের সমন্বয় বা মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। এই দ্বৈতবাদ কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে।

যাহাকে আমরা বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ; দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি তাহার উপাধি। আর যাহাকে আমরা অন্তর্জ্জগৎ বা মনোজগৎ অভিধান দিই ; অনুভূতি, চেষ্টা, ইচ্ছা, ভয় যাহার অন্তর্গত, কালব্যাপ্তি তাহার লক্ষণ।

জগৎ প্রকৃতই এই দুইটা। একটা বাহ্যজগৎ, একটা অন্তর্জ্জগৎ। এই উভয় জগৎই এক অর্থে আমার পরিচিত বটে ; কিন্তু আমার এই পরিচয় বস্তুতঃ উভয় জগতের বাহ্য আকারের সহিত, উহার পরিচ্ছদের সহিত ; উহার অভ্যন্তরের প্রকৃত মূর্ত্তি কখন আমার লক্ষিত হয় না।

এমন একটা সত্তা বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রকৃত রূপ বা প্রকৃত মূর্ত্তি আমার জানিবার কোন উপায় নাই ; তাহা একটা বিশেষ বাহ্যমূর্ত্তি লইয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া থাকি। যেটা উহার আসল রূপ সেটা আমাদের অগোচর, সেটা আমাদের অজ্ঞেয়। আর অনুভূতি, প্রত্যয়, হর্ষ বিষাদাদিও আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু। উহারা বাহ্যজগৎ হইতে স্বতন্ত্র ; অথচ বাহ্যজগতের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ থাকিলেও উহাদের সহিত আমার নিজের সম্বন্ধ আরও নিকট ; উহারা আমার আত্মার বিভূতি। এই আত্মা কেমন তাহা জানি না ; কিন্তু এই আত্মা আমার নিকট যে রূপ লইয়া উপস্থিত হয়, তাহাই আমার অন্তর্জ্জগৎ।

বাহ্যজগতের মূলে একটা কিছু আছে ; যাহার স্বরূপ অজ্ঞেয় ; তাহার নাম দিতে পার জড়। অন্তর্জ্জগতের মূলেও অজ্ঞেয়স্বরূপ একটা কিছু বর্ত্তমান, যাহার নাম দিতে পার আত্মা। আত্মার অস্তিত্ব কেহ লোপ করিতে চাহে না ; জড়ের অস্তিত্ব ও যেন অবলোপের চেষ্টা করিও না। এত বড় বাহ্যজগৎ, ইহাকে একেবারে উড়াইলে চলিবে কেন? বস্তুতঃ উভয়ই বর্ত্তমান ; উভয়ের মধ্যে ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ। আত্মা ভোক্তা ; জড় ভোগ্য। সাংখ্যদিগের ইহাই বোধ হয় পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। আর পুরুষের প্রকৃতিভোগব্যাপার লইয়া জড়জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের কারবার, এই দেনা লেনা, আনা গোনা, চলাফেরা। পুরুষ অজ্ঞেয়, প্রকৃতিও অজ্ঞেয়। তবে প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখীন হইলে জড়জগৎ তাহার প্রত্যক্ষ রূপ লইয়া অন্তর্জ্জগতের নিকট দণ্ডায়মান হয়। কেন দণ্ডায়মান হয় কেন এমন দেখায় এ সকল প্রশ্নের উত্তর নাই।

এই দ্বৈতবাদকে মাজিয়া ঘসিয়া অদ্বৈতবাদে পরিণত করা না চলে এমন নহে। জগৎ একটাই ; একেরই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। একটা মূর্ত্তি বাহ্যজগৎ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি অন্তর্জ্জগৎ।

একই সত্তার এক রূপ জড় ; অন্যরূপ চিৎ। একটা বক্ররেখার যেমন এক পিঠ কুব্জ, অন্য পিঠ ন্যুব্জ, এক পার্শ হইতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্য পার্শ্ব হইতে অন্যরূপ দেখায়, কতকটা সেইরূপ। উভয়ের এই সম্বন্ধ প্রকৃতিগত, এ সম্বন্ধ আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। এই জন্য ইহাকে ছাড়িয়া উহার অস্তিত্ব নাই। জড়ছাড়া চিৎ নাই ; আবার অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে বলিতে হইবে চিৎছাড়াও জড় নাই। মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যদি চৈতন্যযুক্ত হয়, তবে অঙ্গারকণা ও জলকণাও কেন চৈতন্যহীন হইবে? কেননা, অঙ্গারকণা ও জলকণা লইয়াই ত কীটাণুদেহ ও মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত ; প্রকৃতিগত বিভেদ কিছুই নাই। অঙ্গারকণাকে চৈতন্যযুক্ত বলিতে আপত্তি করিও না ; চৈতন্যশব্দের প্রয়োগে যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, চিৎ-পদার্থ অথবা এইরূপ আর একটা নাম ব্যবহার করিলে সে আপত্তি কাটিয়া যাইবে। ফলে যেমন পূর্ব্ব থাকিলেই পশ্চিম থাকিবে, ঊর্দ্ধ থাকিলেই অধঃ থাকিবে, ন্যুব্জতা থাকিলেই কুব্জতা থাকিবে ; সেইরূপ জড় থাকিলেই চিৎ থাকিবে। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা পদার্থতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করেন, তাঁহারা কতকটা এইরূপ অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী। উদাহরণ হর্বার্ট স্পেন্সার ও লয়েড মরগান।

অধ্যাপক হক্সলী এক স্থলে বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ জড়বাদ যেমন অসিদ্ধ, বিশুদ্ধ আত্মবাদ ও তেমনি অসিদ্ধ। হর্বার্ট স্পেন্সারও বলেন তাহাই ; জগৎ এক, তাহার দুইরূপ ; ক ও খ সেই দুইরূপের সংজ্ঞা বা লক্ষণ বা পরিচয়। টেলিগ্রাফের তারে একই সঙ্কেত দুই রকমে পাঠান চলে ; যন্ত্রের কাঁটা একবার হেলিলে বলিতে পার 'ক', দুইবার হেলিলে বলিতে পার 'খ'। অথবা মোর্সের প্রণালী অনুসারে একবার টক্ করিলে বলিবে 'ক' ও দুইবার টক্ করিলে বলিবে 'খ'। সঙ্কেতের প্রণালীগত তারতম্য যাহাই হউক, সংবাদটা একই। সেইরূপ জগৎ একই ; সেই জগতের সংবাদ আমাদের নিকট দুই বিভিন্ন প্রণালীক্রমে আসিয়া থাকে। একটা প্রণালী 'ক' জড়জগৎ, আর একটা প্রণালী 'খ' আত্মজগৎ।

জড়জগতের তরফে এইমতে ওকালতি আরম্ভ করিলে উহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে অত্যন্ত পাষণ্ড বিচারকেরও মায়া জন্মিতে পারে। কিন্তু তথাপি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ নামক আমার প্রত্যয় কয়েকটা ছাড়িয়া এই অসীম জগতে আর যে কি আছে তাহা ত কোন মতেই ঠাওর পাইতেছি না। রূপরসাদির অস্তিত্বে আমি সন্দিহান নহি, উহারা আমারই প্রত্যক্ষ বস্তু ; কিন্তু উহারা আমার অন্তর্জ্জগতেরই উপাদান। উহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কি আছে তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে? রূপ দেখিতেছি, ইহা সত্য কথা ; কিন্তু কাহার রূপ দেখিতেছি এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? গাছের রূপ দেখিতেছি, চাঁদের রূপ দেখিতেছি, তারার রূপ দেখিতেছি, এ সবই আমার মন-গড়া কথা। আগুণে হাত দিলে হাত পুড়িতেছে ; তার যাতনাটা সত্যঘটনা ; আর সেই যাতনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ স্পর্শ, একটা বিশেষ রূপের একত্রযোগে একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে ইহাও প্রকৃত কথা। কিন্তু

সেই যাতনার কারণ স্বরূপে, সেই স্পর্শের, সেই রূপের, সেই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে, আমা হইতে স্বতন্ত্র একটা কারণ আমার বাহিরে বর্ত্তমান আছে, [illegible]কিরূপে স্বীকার করিব বুঝিতে পারি না। অবশ্য যখন আমার ঐ বিশেষ রূপের অনুভূতি হয়, তার সঙ্গেই ঐ স্পর্শেরও অনুভূতি ঘটে; এবং ঐ স্পর্শ ও রূপ যখন একত্র প্রতীয়মান হয়, তখন ঐ প্রতীতিকে আমি অগ্নি আখ্যা দিয়া থাকি। এমন কি যখনই অগ্নি অভিধেয় প্রতীতির সহিত আমার হস্তস্পর্শরূপ চেষ্টা বা মানসিক ব্যাপারের এক যোগ হয়, তখন একটা উৎকট যাতনাও অনুভূত হয়। এই কয়েকটা অনুভূতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কেন ঘটিল, সে স্বতন্ত্রকথা; কিন্তু এই অন্যোন্য সম্বন্ধনিবদ্ধ প্রত্যয়গুলি ছাড়িয়া আর যে কি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিল তাহা কোন মতেই বুঝি না। বিশুদ্ধ জড়বাদ অসিদ্ধ সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মবাদ কেন অসিদ্ধ হইবে তাহা বুঝা গেল না।

আসল কথা এই, সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক দুইটা প্রতীতি বিশালকায় বিস্তার করিয়া আমাদের সমক্ষে পৈশাচিক মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান হয়। আমরা জড়ের অস্তিত্ব এমন কি শক্তির অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু এই দেশ ও কাল আমাদের নিকট যেন একটা কি বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে ম্রিয়মান করিয়া রাখে। আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমাদের পূর্ব্বে ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল. আমাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আমাদের আত্মাকে অবসন্ন করিয়া কি এক বিভীষিকা দেখায়। আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদেরই সৃষ্ট বিভীষিকাদর্শনে আমরা আকুল হইতেছি, আমাদেরই মনঃকল্পিত পিশাচমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে, একখানা দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে দর্পণের সম্মুখস্থ দূরতম প্রদেশ তাহার অন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য লইয়া দর্পণের পৃষ্ঠভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়; বস্তুতঃ সেই সেই ছায়াদেশের অস্তিত্ব যে আমাদের চিত্তভ্রান্তিমাত্র, তাহা স্থির করিতে আমাদের কোন আপত্তি হয় না; কিন্তু আমার দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও অধে যে দেশ বর্ত্তমান দেখি, উহাও যে ঐরূপ আমাদের মনঃকল্পিত ভ্রান্তি-মাত্র তাহা বলিতে গেলেই একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমরা নিমেষমধ্যে যুগব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন করিতে পারি, সেখানে সেই যুগব্যাপী-কাল আমাদের ভ্রান্তি বলিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের জাগ্রতবস্থায় পরিচিত কালকেও মনঃকল্পিত মনে করিতে গেলেই আমরা একবারে শিহরিয়া উঠি।

বস্তুতই দেশ ও কাল দুইটা প্রকাণ্ড কল্পনা বা প্রকাণ্ড দৃষ্টি। আমার প্রত্যয়গুলিকে আমার অনুভূতিগুলিকে আমি দুইটা পদ্ধতিতে সাজাইয়া থাকি, একটা সজ্জার নাম দেশ, আর একটা সজ্জার নাম কাল। কেন সাজাই তাহা স্বতন্ত্র কথা, কোন না কোন রকমে না সাজাইলে আমি সে অনুভূতিগুলির পরিচয় পাই না। সেই জন্য কোন না কোন রকমে সাজাইতে আমরা বাধ্য। আমরা দুইরকমে সাজাইয়া থাকি। আমাদের রূপরসগন্ধাদি

অনুভূতি ও প্রত্যয়গুলিকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই ও এইরূপে সজ্জিত করিয়া যে জগৎ নির্ম্মাণ [illegible] তা[illegible]জগৎ বা বাহ্যজগৎ আখ্যা দিয়া থাকি। আর তদতিরিক্ত চিন্তা ইচ্ছা হর্ষবিষাদাদি সমুদয় ব্যাপারকে কালে সাজাই ও তদ্দ্বারা একটা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম অন্তর্জগৎ বলিয়া থাকি। প্রত্যুত দুইটা জগৎই আমারই নির্ম্মিত, এমন কি এই দুইটা জগতের সমষ্টিকে "আমি" সংজ্ঞা দিলে বিশেষ কি দোষ হয় খুঁজিয়া পাই না।

আমার অনুভূতি প্রত্যয় এবং চিন্তাবুদ্ধিহর্ষাদির সমন্বয়ে "আমি" নির্ম্মিত বলিতে গেলেই একটা খটকা উপস্থিত হয়। কেননা, সহজেই বোধ হয়, এই সকলের ছাড়াও আমার অন্তর্গত আর একটা পদার্থ আছে, তাহার সেন এখনও হিসাব লওয়া হয় নাই। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চিন্তা করি, আমি ভয় পাই, এসব সত্য; কিন্তু ইহা যেন সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি জানি আমি দেখি, আমি জানি আমি শুনি, আমি জানি আমি চিন্তা করি এইরূপ বলিলে সত্যটা যেন কতক সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন শ্রবণ, দর্শন, চিন্তয়ন প্রভৃতি ব্যাপারের অন্তস্তলে যেন কি একটা কিছু অবস্থান করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ব্যাপারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছে ও সেই সকল খণ্ড ব্যাপারগুলির বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিয়া বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। এই কি একটা কিছুর ইংরাজি নাম Consciousness, বাঙ্গলা দার্শনিক সাহিত্যের গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন দেখাইয়াছেন, ইহার সংস্কৃত দর্শনসম্মত নাম সংবিৎ। সংবিৎ যেন ভিতরে থাকিয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিতেছে, এই অন্তবর্ত্তী সংবিৎ না থাকিলে এই সম্বন্ধবন্ধন এই একতাবন্ধন ঘটিত না। আমি দেখি ও আমি শুনি উভয় ব্যাপার পরস্পর অসম্বদ্ধ। যে আমি দেখিয়া থাকে ও যে আমি শুনিয়া থাকে, উভয় 'আমি'র মধ্যে ঐক্যসম্পাদন সম্বিতের কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে এই সংবিৎই আমি; এই সম্বিৎই আত্মা। ইংরাজ দার্শনিক হামিণ্টন বলেন, এই সম্বিৎ যাহার আছে সেই আত্মা। বেদান্ত বোধ করি বলেন, এই সম্বিৎই আত্মা। দার্শনিক হিউম এবং বৈজ্ঞানিক হকসলী বোধ করি এস্থলে বেদান্তেরই সমর্থন করিবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই কথাটা আমাদের প্রাচীন দার্শনিকের মাথায় আসিয়া থাকিলেও আমাদিগকে হিউমের কাছে ও হকসলীর কাছে নূতন করিয়া শুনিতে হয়। যাহাই হউক, আমিই বল, আর আত্মাই বল, আর সংবিৎই বল, ইহা ছাড়িয়া আর অপরের অস্তিত্ব নাই। সংবিৎ বা আত্মা নীল ও পীত, আলো ও আঁধার পৃথক দেখে, ভয় পায় বা আশা করে, হর্ষে উৎফুল্ল হয় বা বিষাদে অবসন্ন হয়। সে সেই সংবিতেরই বা আত্মারই খেলা। সূর্য্য দেখে, চন্দ্র দেখে, আর আতাফল ভূমিতে পড়িতে দেখে এবং চন্দ্র সূর্য্য আতাফল আর পৃথিবী সকলেই একটা নির্দ্দিষ্ট দেশকালগত নিয়মে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অতুল প্রীতি অনুভব করে, সে সংবিতেরই বা আত্মারই খেয়াল। আমরা তাহার হিসাব কিরূপে দিব? জড় বল, আর গতি বল, আর শক্তি বল আর প্রত্যয় অনুভূতি, আনন্দ যাহাই বল, সকলই এই আত্মারই ক্রীড়নক বা আত্মারই

স্বহস্ত নির্ম্মিত পুত্তলী বা সৃষ্টি। এইখানে অদ্বৈতবাদের পূর্ণ পরিণতি, পরাকাষ্ঠা, এইখানেই আসিয়া মানবমনকে নিরত থাকিতে হয়।

কিন্তু মানবমন এখানেও নিরত থাকিতে চাহে না ; এই অদ্বৈতবাদকেও নাড়িয়া আবার কোথা হইতে নূতন একটা দ্বৈতবাদের আনয়ন করে। আমি কোথাও বা নীল দেখি, কোথাও বা পীত দেখি, কোথাও বা আঁধার দেখি, কোথাও বা আলো দেখি, এবং এই নীলপীত আলো ও আঁধারের মধ্যে বিবিধ দেশকালগত সম্বন্ধ অনুভব করি। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকা বোধ করি কর্ত্তব্য। কিন্তু মন তাহাতে তৃপ্তিলাভ করে না। মন জিজ্ঞাসা করে, এখানেই বা কেন নীল ? এখানেই বা কেন পীত ? কেনই বা আঁধার আর কেনই বা আলো ? কেনই বা দেশ কেনই বা কাল ? কেনই বা সূর্য্য কেনই বা চন্দ্র ? কেনই বা হর্ষ কেনই বা বিষাদ ? কেন ধর্ম্ম, কেন অধর্ম্ম ? কেন জড় কেন চিৎ ? কেনই বা বিভেদ, কেনই বা সাদৃশ্য ? কেন এই বিবিধ সম্বন্ধ ? এইরূপ প্রশ্ন উদয় হয় অথচ এ কথাটা মনে হয় না, যদি এই আঁধার আলো, নীল, পীত, জড়চিৎ, বিভেদ সাদৃশ্য, এই পাঁচরকম সম্বন্ধানুভব না থাকিত, তাহা হইলে সংবিৎই বা কোথায় আর আত্মাই বা কোথায় ?

অদ্বৈতবাদীর মনে এই প্রশ্ন উঠে। পাঁচজনে পাঁচরকম উত্তর দেন। আত্মা নির্গুণ ; তাহাতে গুণের আবির্ভাব কেন ? সত্ত্ব, রজ, তমঃ, গুণের তিন প্রকার ভেদ ; তিন যখন একত্র মিলিয়া থাকে, তখন সাম্যাবস্থা ; তখন আত্মা গুণযুক্ত হইলেও নির্গুণ। বৈজ্ঞানিকেরা যেমন বলেন ধনতাড়িৎ ও ঋণতাড়িৎ পরস্পরে মিলিয়া থাকিলে তাড়িতের আবির্ভাব বুঝা যায় না ; সেইরূপ তিনটা গুণ একত্র মিলিয়া থাকিলে কোনগুণেরই অস্তিত্ব থাকে না। তিনটার মধ্যে কোনরূপ বিশ্লেষণ ঘটিলেই একটা কোনরূপে অন্যটা হইতে সরিয়া আসিলেই, নির্গুণ সগুণ হয়, নির্ব্বিকার বিকারযুক্ত হয়, আত্মা তখন সংবিতে পরিণত হইয়া আপনাকে নানা-ভাগে বিভক্ত দেখে, জড়ে গতিতে প্রভেদ, নীলে ও পীতে প্রভেদ, দেশে ও কালে প্রভেদ দেখে। উত্তরটা তৃপ্তিজনক হয় না। সাম্যাবস্থার বিকার ঘটে কেন ? বিকার ঘটায় কে ? কেন ঘটে, কে ঘটায় উত্তর দিতে না পারিলে স্থূল কথার উত্তর হইল না। প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না।

বৈদান্তিক বলেন এই সাম্যাবস্থার বিকার ঘটায়, এই জগতের সৃষ্টি ও আরম্ভ ঘটায়, অবিদ্যা বা মায়া। অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞান, মায়ার অর্থ খেয়াল, ভ্রান্তি, ভেল্‌কি। মূলে নির্ব্বিকার পরমাত্মা ; নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সৎপদার্থ। মায়া তাহাকে আচ্ছাদন করে, অবিদ্যা তাহাকে আচ্ছাদন করে ; ফলে জীবাত্মা, খণ্ডাত্মা, অনন্তপরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক হইয়া যায় ; জীবাত্মা, খণ্ডাত্মা, আপনাকে আপনি পৃথক করিয়া গুণমণ্ডিত, অলঙ্কৃত, উপাধিযুক্ত, বিবিধ বিভূতিবিশিষ্ট দেখিতে পায়। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী বা অবিদ্যাবাদী, ইংরাজী Agnostic বলেন, কেন এমন হয় জানি না ; এ তত্ত্ব অজ্ঞেয়। অবিদ্যাবাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদ যে উত্তর দেন শুনিতে পৃথক, কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে একইরকম। মায়াই অবিদ্যা ; মায়া অর্থে যদি ভ্রান্তি বলা যায় তাহা হইলেও সেই একই উত্তর দাঁড়ায়। যাহা দেখিতেছ তাহা ভ্রান্তি ; প্রকৃত কি তাহা জানি না। মায়া অর্থে খেয়াল বুঝ, তাহা হইলেও বড় স্পষ্ট হয় না। খেয়াল অর্থাৎ যাহার হিসাব নাই, যাহার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই ; যাহা গণনার, হিসাবের, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বাহিরে। খেয়াল ? কাহার খেয়াল ? মায়া ? কাহার মায়া ? পরমাত্মার ? অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদকে টানিয়া আনে ? পরমাত্মাতে মানুষ ধর্ম্ম, জীবধর্ম্ম অর্পণ করে। পরমাত্মার মায়া, পরমাত্মার খেয়াল, তদ্রচিত ইন্দ্রজাল, ভেলকি। পরমাত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, এক এবং সৎ, অদ্বিতীয়, নির্গুণ অথচ সগুণ, অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞানগোচর ; কেননা অক্লেশে বলিতেছি তাঁহার মায়া, তাঁহার খেয়াল, তাঁহার রচিত ইন্দ্রজাল, তাঁহার রচিত ভেলকি জাদু ! তিনি খণ্ডাত্মা জীবাত্মাকে ইন্দ্রজালে ফেলিয়া ভুলাইতেছেন। তিনি ঘুরাইতেছেন, জীবাত্মা খণ্ডাত্মা ঘুরিতেছে। তিনি সৎ, শুধু সৎ নহেন, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ, তিনি হর্ত্তা, কর্ত্তা, ধাতা, পরমেশ্বর, অদ্ভুত জাদুগির ; তাঁহাকে ভয় কর, তাঁহার প্রতি প্রেম কর। সখ্য, দাস্য, বাৎ-সল্য প্রভৃতি যত কিছু চিত্তবৃত্তি তাঁহার প্রতি অর্পণ করি। জড়বাদী তোমার সহিত আত্ম-বাদীর এইখানে সখ্য। জড়বাদী জগৎকে জড়ময় দেখে, জগৎকে যন্ত্রস্বরূপ দেখে। যন্ত্রের যন্ত্রী আবশ্যক, যন্ত্রের নির্ম্মাতা আবশ্যক। কুম্ভ থাকিলেই কুম্ভকার চাই ; কুম্ভকার বিনা কুম্ভের অস্তিত্ব জড়বাদী বুঝিতে পারে না। তাই তাহার চন্দ্রসূর্য্য নির্ম্মাণ করিতে তাহার অণু পরমাণু নির্ম্মাণ করিতে তাহার জড়জগৎ নির্ম্মিত, ব্যবস্থাপিত করিতে যন্ত্রী, নির্ম্মাতা, বিধা-তার প্রয়োজন। জড়বাদী তাই সগুণ মানুষধর্ম্মা, জীবধর্ম্মা ঈশ্বর কল্পনা করেন। আত্মবাদী অন্যপথে চলিয়া জাদুগির, কুহকী, মায়াময়, ঈশ্বর কল্পনা করেন। জড়বাদের সহিত আত্ম-বাদের সনাতন বিরোধ, উভয়ের এইখানে সম্মিলন, উভয়ের মধ্যে সখ্যবন্ধন, প্রীতিস্থাপন, কোলাকুলি। কুহকী, লীলাময়, অনন্তশক্তিশালী, অব্যয়, অপ্রমেয়, কর্ত্তা, ধাতা, সংহিতা ঈশ্বরের প্রসাদন জন্য উভয়েই ব্যগ্র। ঈশ্বরের প্রসাদন জন্য কর্ম্মসাধনে ব্যগ্র। কর্ম্ম ফললাভ করুক। কর্ম্মের জয় হউক।

কর্ম্মের জয় হউক। কর্ম্ম মানবাত্মার সৃষ্টি। মানবাত্মা অসাধ্যসাধনে পটু। মানবাত্মা অবিদ্যাকে বিদ্যায় পরিণত করিতে পারে, মানবাত্মা অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করে মানবাত্মা সৃষ্টিক্ষম, মানবাত্মা রচনাক্ষম মানবাত্মা কল্পনানিপুণ। মানবাত্মা সৃষ্টি করে, মানবাত্মা বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে, মানবাত্মা বিশ্বস্রষ্টারও সৃষ্টি করিয়াছে। আবার আপন সৃষ্টির সমক্ষে, আপন রচনার সমক্ষে আপনার মাহাত্ম্যকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, আপন কল্পনার সমক্ষে, আপনাকে অবনত রাখিয়াছে।

অবনতি ? নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বলিতে হয়, অবনতি। উন্নতিই হউক, আর অবনতিই হউক ; ধর্ম্মের জয় হউক, সৃষ্টির জয় হউক, মানবাত্মার জয় হউক।

ভানু।

আজ অনেক দিনের কথা,—আমি তখন গৌরীপুরের মজুমদারবাড়ী থাকিতাম। মজুমদারেরা সে অঞ্চলের একঘর বড় গৃহস্থ, জমিদারী মহাজনীতে খুব আয়, দশ বারখানি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম তাহাদের মুঠোর মধ্যে, মজুমদারের এক হাঁকে তখন দুইশত লাঠিয়াল এক দণ্ডে হাজির হইত। সেবার ঘোষেদের সহিত দাঙ্গায় খ্যাংড়ামারির মাঠে রতনখালির দারগার যে মৃতদেহ

পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও নাকি মজুমদারদের কীর্ত্তি—দারগাবাবু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া সরকারী তদন্তে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তাহাও নাকি ইংরাজ সরকারের মান বজায় রাখিবার জন্য। মজুমদারদের গোলাবাড়ী ও আড়তে সামান্য মুহুরিগিরি করিয়া অনেক লোক গুছাইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি ছোটকর্ত্তার সহধর্ম্মিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র (যদিও দূর সম্পর্কীয়) হইয়া, স্বয়ং বাবুদের বাড়ী থাকিয়া শীঘ্রই যে দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইব, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। গ্রামস্থ পাঠশালাটির উপর ছোটবাবুর বড় যত্ন ছিল,—আপাততঃ তাঁহাদের কোন "মোকামে" আমার উপযুক্ত পদ শূন্য নাই দেখিয়া, আমাকে পাঠশালায় ইংরাজি পড়াইতে দিয়াছিলেন।

সেদিন প্রাতঃকাল হইতে সমানে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—শ্রাবণের মেঘ সন্ধ্যার পূর্ব্বেও সমস্ত আকাশ ঘিরিয়া, হাস্যময়ী প্রকৃতিকে একটা নির্জীব ও উদাস ভাবের ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাবুদের পুষ্করিণীর তীরস্থ অশ্বত্থগাছে কতকগুলি বক তাহাদের নবজাত শাবকগুলি লইয়া, মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া অবিরাম চীৎকার করিতেছিল,—সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাহাদের কাকলীও যেন একটা মর্ম্মস্পর্শী আকুলতাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। পাঠশালায় বহুক্ষণ চীৎকার করিয়া, তাহার উপর আবার অনেক সময়েই নানা সমস্যাপূর্ণ ফোজদারী মোকদ্দমায়, একধারে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ, রায় প্রকাশ ও দণ্ডপ্রদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড়ই ক্লান্তি বোধ হইত,—গ্রামস্থ দুই একটি যুবক ও ছোটবাবুর সঙ্গে প্রায়ই নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম; সুস্নিগ্ধ সান্ধ্যবায়ুসেবনে ও হাস্যালাপে শীঘ্রই ক্লান্তি দূর হইত। কিন্তু সেদিন এক এক পস্‌লা বৃষ্টি আসিয়া পুরাতন শোকস্মৃতির ন্যায় হৃদয়টাকে দারুণ অবসাদগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং বন্ধুসমাগম ও সান্ধ্যভ্রমণের আশাও সুদূরবর্ত্তী দেখিয়া মানসিক নিরুৎসাহটা আরো ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। রামগিরি আশ্রমস্থ সমাধিমগ্ন যক্ষের বিরহ-বেদনা, এমন শারদীয়া পূর্ণিমা ও বাসন্তী নিশি থাকিতে, এই প্রকার একটা সৃষ্টিছাড়া বিষাদাপ্লুত মেঘাচ্ছন্ন দিনে, কেন উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই কবি ও তাঁহার নায়ক বিরহী যক্ষরাজই জানেন;—সেই সময়ে আমি বিরহরসাস্বাদনের মোটেই উপযোগী ছিলাম না, নচেৎ বাহ্য প্রকৃতির সহিত বিরহ-ব্যাপার ঘটিত, একটি নির্ভুল সিদ্ধান্ত খাড়া করিতাম।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ আসিয়াছেন কিনা খোঁজ লইয়া ছোটবাবু বাটীর মধ্যে গিয়াছিলেন; আমি একাকী চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া, নানা স্বতঃপ্রসূত অদ্ভুত চিন্তার দৌড় পরীক্ষা করিতেছিলাম।

"চোখে পড়ে, পড়ে গো
শুধু সেই ছায়া;
ভানু উঠে, বিধু ডোবে,
শুধু সেই মায়া—
"হো হো—ভানুদাদা মনটি সাদা,
গাঁজার পুঁটুলি কোমরে বাঁধা।"

আঃ জ্বালাতন করিল! বাদ্‌লার দিনেও ছেলেগুলোর কি বিশ্রাম নাই,—একটু জল ছাড়িয়াছে আর গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বারান্দার পার্শ্বে আসিয়া দেখি, ভানু পাগলা তাহার সেই গানটি গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, আর গ্রামের ছেলেগুলি ভানুকে খেপাইবার জন্য তাহাদের স্বরচিত অদ্ভুত অর্থহীন ছড়ায় সমস্বরে চীৎকার করিতেছে। বলাবাহুল্য আমার মূর্ত্তিদর্শনে "মাষ্টার মহাশয় রে" বলিয়া, সকলেই নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল। বাদলের দিনে অপর খেলার সুবিধা না পাইয়া, ভানুদাদাকে লইয়া আমোদ করা যে অগর্হিত কার্য্য, তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র সরলহৃদয়ে স্থান পায় নাই; বিশেষতঃ এই অবস্থায় তাহাদের মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, পরদিন পাঠশালায় এই কার্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ শাস্তিভোগ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইতে হইবে, এ কথাও তাহারা পূর্ব্বে ভাবে নাই। ভানু আজ আট দশ দিবস গৌরীপুরে আসিয়াছে, তাহার পরিচয় কেহ জানে না; তাহার গানের "ভানু" শব্দযুক্ত চরণটি বার বার আবৃত্তি করিত বলিয়া সকলে তাহাকে ভানু বলিত। অনেক লোক আছে, যাহারা সংসারের পথে চলিতে চলিতে, প্রকৃতির কঠোর বজ্রমুষ্টির প্রহারে দিশাহারা হইয়া, ঘুরপাক্ দিতে থাকে,—বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বলেন ভানু এই শ্রেণীর লোক। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মতটা কিছু স্বতন্ত্র,—ভানু এ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই, কিন্তু বাঁড়ুয্যে মহাশয়, ঠাকুরবাড়ীর বটতলায় বসিয়া স্তব্ধ দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত তাহার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিতে অমূল্যরত্ন নিহিত আছে,—ভানু সামান্য লোক নহে! অন্যতম বন্ধু ডাক্তার প্রমথ বাবু স্বীয় ব্যবসায়উদ্দেশ্যে অল্পদিন সেখানে অবস্থান করিয়াই, অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, মানবচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি বিরল; তিনি বলেন,—বাঁড়ুয্যে মহাশয় যে গ্রামের চৌকিদার কৃষ্ণ সর্দ্দারের সহবাস ত্যাগ করিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভানুর সহিত নিভৃতালাপে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার গূঢ় কারণ এই যে, কৃষ্ণসর্দ্দার অপেক্ষা ইনি ভানুকেই গঞ্জিকাসেবন কার্য্যের কার্য্যক্ষম সহচর মনে করিয়াছেন, এবং ভানুতে "কিছু আছে" বলিয়া যে একটা গুজব জাহির করিয়াছেন, তাহা কেবল গঞ্জিকাধূমবিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। ভানু কয়েক দিবস অবধিই বাবুদের ঠাকুরবাড়ীর বটতলায় ছিল, আজ বোধহয় অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, পরে গ্রাম্য বালকগণের উপদ্রবে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। তাহার ছিন্ন মলিন বস্ত্র পাণ্ডুর মুখ ও উচ্ছৃঙ্খল গতি সকলই ঔদাস্য ব্যঞ্জক;—পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য, মান, আশা, বিশ্বাস, সকলই যেন সে এক তীব্র ভ্রূকুটি ও বিকট হাস্যে পলকে রসাতলে পাঠাইতে প্রস্তুত। "চোখে পড়ে, পড়ে গো" এই গানটি ব্যতীত ভানুর নিকট অন্য কোন কথা কেহ শুনে নাই। কয়েকটি সামান্য শব্দ যোজনায় সঙ্গীতে কোন যাদুকরী শক্তি হইতে পারে কি না জানি না,—কিন্তু সে যখন তাহার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে, তানলয়হীন গানটি গাহিত, তখন বোধ হইত যেন তাহার শীর্ণ দেহের প্রত্যেক-ধমনী ও শিরা, এক অদ্ভুত শক্তিপ্রয়োগে, গানের প্রত্যেক অক্ষরটিকে অনুপ্রাণিত করিতেছে; সেটা মর্ম্মভেদী হাহাকার, কি অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ভাবহীন অর্থহীন বিকট চীৎকার, তাহা বলিতে পারি না। রাত্রেও তাহার বিশ্রাম নাই,—নিশীথের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, তাহার বেদনাপ্লুত গীতধ্বনি সুষুপ্তের কর্ণে প্রবেশ করিয়া এক বিভীষিকাময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিত।

ভানু বারান্দার একপার্শ্বে আশ্রয়গ্রহণ করিল; পরিচয়াদি জানিবার জন্য ইহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ঔদাস্যপূর্ণ নিস্তব্ধতা ব্যতীত অপর কোন উত্তর পাইলাম না। সন্ধ্যার সময় ছোটবাবু বাহিরে আসিলেন। বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যার সময় গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক আসিয়া বসিতেন; তাস, দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলা প্রায় রাত্রি এগারটা অবধি চলিত। চন্দ্রমাষ্টারের সহিত সেদিন দাবা খেলিতে বসিয়া, অবিনাশ বাবু উপর্য্যুপরি তিন বাজি হটিয়া, জয়াশায় সমস্ত রাত্রি দাবা খেলিয়াছিলেন; শেষফল কি হইয়াছিল জানি না,—তবে চন্দ্র মাষ্টার তাহার পরদিবস পাঠশালায় যাইতে পারেন নাই দেখিয়াছি, এবং শুনিয়াছি

অসাধারণ ক্রীড়াসক্তির জন্ম গৃহিণীর নিকট অবিনাশ বাবুর অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেদিন আমাদের নিয়মিত ক্রীড়কদের মধ্যে অনেকে অনুপস্থিত হইলেন,—বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে কখন অনুপস্থিত দেখি নাই,—তাম্রকুটধুমপান আশায় তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঘন ভৃত্যাহ্বানধ্বনি এবং "কচে বার" "ছে পঞ্জা" প্রভৃতি বিকট চীৎকারে বাবুদের সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হয় নাই, এমন দিন আমার মনে পড়ে না,—সেদিন তিনিও আসিলেন না। ছোটবাবু ও আমি কিছুক্ষণ বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, সন্ধ্যার পর ডাক্তার প্রমথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমথ বাবুর বিশ্বাস দাবাখেলায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে এমন লোক আমাদের মধ্যে নাই;—তিনি অবিনাশ বাবু ও চন্দ্র মাষ্টারের অহি-নকুল যুদ্ধে স্বীয় ক্রীড়াকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদানের উপযুক্ত অবসর প্রায়ই পাইতেন না। সেদিন সুযোগ বুঝিয়া আমাকে লইয়া দাবা খেলিতে বসিলেন।

আমি কোন ক্রীড়াতেই পারদর্শী ছিলাম না, ক্রীড়ায় অপরিপক্বতা নিবন্ধন সহযোগী ক্রীড়কের নিকট হইতে "অপরিণাম-দর্শী অর্ব্বাচীন" প্রভৃতি সুমিষ্ট তিরস্কার এবং প্রতি-যোগীগণের কৌতুকহাস্ত আমার মোটেই প্রীতিকর হইত না,—এজন্য ক্রীড়কবন্ধুগণের নিকট হইতে আমি যথাসম্ভব দূরে থাকিতাম। কিন্তু সেদিন ছোটবাবুকে আমাদের ক্রীড়া দর্শনেচ্ছু দেখিয়া, ডাক্তার বাবুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। অল্প সময় মধ্যে কয়েক বাজি হটিয়া গেলাম,—সেদিন আমাকে হটাইয়া ডাক্তার বাবুকে যে প্রকার প্রফুল্ল ও উৎসাহিত দেখিয়াছিলাম, সে প্রকার বোধ হয় আর কখন দেখি নাই;—বৃদ্ধ গ্যালভনি মৃত ভেকের পদকম্পন প্রত্যক্ষ করিয়া তাড়িৎ শক্তি আবিষ্কারে, যে হর্ষবিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধহয় খেলার শেষে ডাক্তার বাবুর কণ্ঠনিঃসৃত "মাৎ" শব্দটি অপেক্ষা অধিক আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ ছিল না। ছোটবাবু কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গেলেন, আমারও খেলা ভাল লাগিল না,—প্রমথ বাবু তখন আর এক বাজি "মাৎ" করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; নানা অনুরোধে খেলা ত্যাগ করাইতে কৃতকার্য্য না হইয়া, শেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া খেলা বন্ধ করা গেল। ভানু যে এ পর্য্যন্ত গৃহের একটি কোণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করি নাই; হঠাৎ তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল,—সে তখন তাহার অনতিবৃহৎ পুঁটুলি খুলিয়া কি বাহির করিতেছিল, সেই তৈলাক্ত শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্রখণ্ডের আবরণে কি পদার্থ ছিল, তাহা কেহ দেখে নাই; প্রমথ বাবু অনুমান করিলেন সেটি গাঁজা অহিফেণ ও তৎব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদিতে পূর্ণ, কিন্তু বেশ মনে আছে, বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিয়াছিলেন—ভানুর সেই পুঁটুলিতে এক অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তি পূজাই ভানুর জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য,—ভানু সেই পুঁটুলি লইয়াই সংসারত্যাগী উদাসীন।

হাতে কাজ না থাকিলে মানুষ অনেক সময়ে নানা প্রকারে উদ্দেশ্যহীন "ভুয়ো" কাজ করিয়া ফেলে;—শুনিয়াছি এক "অকেজো" পুরুষ, সময়ের গুরুভার বহন করিতে নাপারিয়া, তাহার সুস্থদেহ বৃদ্ধা জেঠাইমার সজ্ঞানে ৺ গঙ্গালাভের উপায়টা, অনেক আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। আপাততঃ কোন গুরুতর কাজ হাতে নাই দেখিয়া, আমরা ভানুর পরিচয়াদি জানিবার জন্য তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। দুই একটি প্রশ্নের পর, সে ধীরপদে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; বহু প্রশ্ন ও বিদ্রূপে ভানুর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে কখন চঞ্চলতার চিহ্ন দেখি নাই; বাহিরের কথাগুলা যেন তাহার জীর্ণ মেরজাইয়ের উপর ধাকা খাইয়া দশহাত দূরে আসিয়া মিলাইয়া যাইত;—সে ফরাসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; আমাদের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল; দীপের ক্ষীণালোকে

তাহার স্বাভাবিক ঔদাস্তপূর্ণ মুখমণ্ডলে, যেন এক উদ্যম ও সজীবতার ছায়া প্রতিফলিত দেখিলাম। ভানু বিস্ফারিত চক্ষে, তাহার স্বাভাবিক কঠোরস্বরে বলিতে লাগিল,—"তোমরা আমাকে গঞ্জিকা ও অহিফেণসেবী ঘোর উন্মাদ বলিয়া মনে করিয়াছ, তোমাদের অনুমানে যে কথঞ্চিৎ সত্যতা নাই একথা বলিতে পারি না। আমার ক্ষুদ্র জীবনের আদ্যোপান্ত কথা না শুনিলে, তোমরা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

আমি সবিস্ময়ে ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইলাম। ভানু বলিতে লাগিল,—তোমাদের নিকট আমার জন্মস্থান ও বংশসম্বন্ধে কোন কথা বলিব না; তবে জানিয়া রাখ আমি এক সদ্বংশজ কায়স্থ সন্তান। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব মিত্রমহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতাম; যাহা কিছু পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি ছিল, মিত্রমহাশয় সকলই রক্ষা করিতেন,—কথা ছিল আমি সাবালক হইলে সমস্তই পুনঃপ্রাপ্ত হইব। মিত্র মহাশয়ের এক কন্যা ছিল, তাহাকে আমি মানী বলিয়া ডাকিতাম,—তাহার প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা তোমাদের জানার কোন আবশ্যকতা নাই। আমার নিত্যপাঠাদি শেষ করিয়া, মিত্রমহাশয়ের আদেশে মানীকে পড়াইতাম। সে আমা অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট ছিল, কিন্তু তাহার অসঙ্কোচ ব্যবহার, হাস্যালাপ দেখিলে বোধ হইত সে আমার সমবয়স্ক খেলার সাথী। মিত্রমহাশয় মানীকে বড় ভালবাসিতেন, আদরও দিতেন, এজন্য গৃহিণী তাহাকে আঁটিতে পারিতেন না; কিন্তু আমার কথা সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করিত না। মানী তাহার কোঁকড়া কোঁকড়া খাট চুলগুলি নাচাইয়া দিবারাত্রি ছুটাছুটি করিত, তাহার ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকার যে কোন কোন বিষয়ে একটু লজ্জা বা কিছু ভয় থাকা আবশ্যক, সেটা তাহার মনেই হইত না,—কিন্তু তাহার সুবিশাল কালো চঞ্চল চক্ষু দুটি আমার চক্ষের সহিত মিলিত হইলেই সশঙ্কিতভাব ধারণ করিত। সে-অঞ্চলে মিত্র মহাশয়ের সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা ছিল,—ক্রমে শুনিলাম মিত্র মহাশয় মানীর সহিত আমার বিবাহ দিবার সংকল্প করিতেছেন;—আমার প্রতি তাঁহার কন্যার ভালবাসা বা ভাবীজামাতার সদ্গুণ দেখিয়া ঐ সংকল্প করিয়াছিলেন, কি আশু বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত আমার পৈত্রিক বিষয়টি তাঁহার হাত ছাড়া হইবে ভাবিয়া, তৎপ্রতিবিধানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহা আজও আমি জানি না,—তখন এ প্রশ্নটা মনেও উপস্থিত হয় নাই। হঠাৎ আত্মীয় বন্ধুহীন সংসার মহা সুখের আধার বলিয়া বোধ হইল;—হৃদয়টা তখন আমূল অতৃপ্ত বাসনায় পরিপূর্ণ, চখের সম্মুখে বাসনাপূরণোপযোগী কত পদার্থ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনকে দৃঢ় রশ্মির দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অশিক্ষিত ঘোড়ার ন্যায় পিছু হটিয়া, পা তুলিয়া বাগ্ মানিল না,—আর ফিরাইতে পারিলাম না। মানীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, গরিবের ঘরে অমন বড় মেয়ের কত দিন বিবাহ হইয়া যাইত,—বড়লোকের ঘর তাই কেহ কোন কথা বলে নাই। সে আমার নিকট আর বড় আসে না, যদি আসে তবে অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়; শুনিতে পাই এখন গৃহিণী ঠাকুরাণী, বিবাহিতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু দিন পরে শুনিলাম আমার বংশের একটা বিশেষ দোষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য মিত্রমহাশয় তাঁহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিবেন না,—একটি সুপাত্রেরও সন্ধান হইয়া গিয়াছে, আগামী ফাল্গুনেই তাহার সহিত মানীর বিবাহ হইবে।"

ভানু এখানে একটু থামিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; আমি এই অবসরে প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া, একটু অগ্রসর হইয়া বসিয়া বলিলাম,—"তারপর"।

ভানু বলিল, "তারপর একদিন রাত্রিশেষে সকলের অগোচরে মিত্রদের বাটী ত্যাগ করি-লাম। সেই স্মরণীয় দিনে, আমার হৃদয় যে একটা ভীষণ হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা

আর অপনীত হইল না। ঝটিকাক্রান্ত তরীর ন্যায় কিছুদিন লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, শেষে আমার মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শুনিলাম অল্প দিন হইল মহাসমারোহে মিত্রমহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—ছেলেটি দেখিতে বেশ, কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ে। যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ভীষণ অগ্নি জ্বলিতেছে, সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? আমি মাতুলালয়ে থাকিতে পারিলাম না। মিত্রদের বাড়ী যাইব বলিয়া বাহির হইলাম, কেন যাইতেছি এবং গমনের ফলই বা কি হইবে,—আমি এ সকল কথা একবার মনে ভাবি নাই,—বোধকরি ভাবিবার অবসর ছিল না। মিত্রবাড়ী আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না; শুনিলাম আমি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় মানী অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছিল এবং আমার বংশ সম্বন্ধে যে দোষের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় আমার সন্ধানে অনেক লোক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই আমার খোঁজ পায় নাই,—কন্যা অরক্ষণীয়া হইতে দেখিয়া মিত্রমহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যাকে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত পাত্রে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুনিলাম মানী আমার কথা আজও ভুলিতে পারে নাই, এখনও আমার জন্য মধ্যে মধ্যে কাঁদে। আমি সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; সে সাক্ষাৎ অতি ভয়ানক, তাহার প্রত্যেক স্মৃতিটি এক একটি অগ্নিশিখা হইয়া আমার হৃদয় নিশিদিন পোড়াইতেছে। আমাদের উভয়ের হৃদয়ে যে অলক্ষিতে কালসর্প প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহ জানিত না, তাহা হইলে বোধহয় সকলেই আমাদের সাক্ষাতের অন্তরায় হইত;—আমরা উভয়ে সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

ভানু এখানে একটু চুপ করিল, বোধ হইল সে যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, দীপের ক্ষীণালোকে তাহার পাংশুবর্ণ সুপ্রশস্ত ললাটে উজ্জ্বল ঘর্ম্মবিন্দু সকল স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; গরমের কোন কারণ ছিল না; তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, আমার গায়ের পিরাণটার বোতাম আঁটিয়া বলিলাম—"তারপর"; প্রমথ বাবুকে তখন একটু বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিলাম, যেন তাঁহার মনে একটু খট্‌কা লাগিয়াছে; তিনি তাকিয়া বালিসটার উপর মাথা রাখিয়া, অর্দ্ধশয়নাবস্থায় চোখ বুঁজিয়া ভানুর কথা শুনিতে লাগিলেন।

ভানু বলিল—"তার পর মানী মরিল, আমি মরিতে পারিলাম না;—আত্মহত্যা করিব বলিয়া উভয়েই আফিং খাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার মাত্রাটা কিছু কম হইয়াছিল, চিকিৎসকের কৌশলে আমি তার পর দিন সংজ্ঞালাভ করিলাম কিন্তু মানী বাঁচিল না।"

ডাক্তার বাবু এই সময়ে ত্বরিৎ উঠিয়া বসিলেন এবং তাকিয়াটি কোলের নিকট টানিয়া বিস্মিতভাবে ভানুর দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

ভানু আবার আরম্ভ করিল;—আমি যখন সংজ্ঞালাভ করিলাম তখন রাত্রি, শুশ্রূষাকারীগণের নিকট জানিলাম, এক অহোরাত্র অচৈতন্য পড়িয়াছিলাম, মানী তাহার পূর্ব্ব দিনের রাত্রিশেষেই এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন বাটীর পরিবারেরা সকলেই শোকে ও পরিশ্রমে অবসাদগ্রস্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; আমি অলক্ষিতভাবে মিত্রদের বাটী ত্যাগ করিলাম। বেশ মনে আছে সে সময়ে কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র আকাশপ্রান্তে উদিত হইতেছিল,—আমি উন্মাদের ন্যায় গ্রামের বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ মেঠো রাস্তা ধরিয়া দৌড়িতে লাগিলাম;—তখনও আমার অহিফেণের নেশার ঘোর ছিল,—বোধ হইল কে যেন আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; নবোদিত চন্দ্রের ক্ষীণালোকে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না, সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"যে তোমার অশান্তির মূল কারণ তাহাকে বিনাশ কর",—আমি সেই ছায়ামূর্ত্তি ধরিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, তরল অন্ধকার মধ্যে কি প্রকারে মিলাইয়া গেল দেখিতে পাইলাম না। ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া

চারিদিকে তাকাইলাম, নিকটে একটি গোরু শিশিরসিক্ত কোমল তৃণ আহার করিতেছে দেখিলাম, পথিপার্শ্বস্থ এক ঝোপ্ হইতে একটি শৃগাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং আমাকে দেখিয়া দুই চারিবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইতে তাকাইতে, সুবিস্তৃত প্রান্তরের অন্ধকার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। সেই দিন,—সেই রাত্রি হইতে আমি রীতিমত পাগল; আমি মানীর প্রেতাত্মার শান্তির জন্য, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার স্বামীর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি;—

ডাক্তার প্রমথ বাবু এই সময়ে ফরাস হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ভানু বিদ্যুৎ-বেগে তাঁহাকে ধরিয়া, তাহার মিরজাইয়ের মধ্য হইতে এক শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নিমেষ মধ্যে ডাক্তার বাবুর বক্ষে আমূল প্রবেশ করাইয়া দিল। এই সময়ে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল,—এক দমকা বাতাস আসিয়া, প্রদীপটা নিবাইয়া দিল; চেঁচামেচি শুনিয়া ছোট বাবু বাহিরে আসিলেন, ভানুকে অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া গেল না;—বৃষ্টির ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ ও ভেকের কোলাহলের মধ্যে যেন শুনা গেল, নদীর তীরে কে এক চিরপরিচিত স্বরে গাহিতেছে,—

"মনে পড়ে, পড়ে গো
শুধু সেই ছায়া,—"

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বর—ঐ

টোড়িভৈরবী—কাওয়ালী।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনি! (মা)
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরনি!
জনকজননী-জননি'!
নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণ তল
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্রতুষার কিরীটিনি!

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী!
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য!
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীয়ূষস্তন্যবাহিনি!

আ

||৪|| ম^{১} গ^{১} । [মগ^{১} মনো^{১} নোধো^{১} ধোঁ^{১} । প^{১} মগ^{১} ম^{১} প^{১} । নোধো^{৪} ।
অ য়ি [ভু ব ন ম ন্মো — মো হি নি

{—^{২} প^{১} মগ^{১}}]—^{৪} । ধো^{১} নো^{১} র্স^{২} । ধো^{১} নোর্স^{১} র্রো^{২} । ধনো^{১} র্সর্রো^{১}
{— অ য়ি }]— মা — — — — — — —

র্গো^{২} । —^{৪} । র্রো^{১} র্স^{১} নো^{১} ধো^{১} । প^{১} মগ^{১} ম^{১} প^{১} । নোধো^{৪} । —^{২} র্স^{১}
— — ভু ব ন ম নো — মো হি নি — অ

শেষ।

র^{১} । গো^{২} গো^{১} র^{১} । গো^{২} গো^{১} র^{১} । গো^{১} র^{১} গো^{১} ম^{১} । গো^{১} রো^{১}
য় নি র্ম্ম ল সূ র্য্য ক রো — জ্জ্ব ল ধ র

স^{২} । স^{১} র্সনো^{১} র্স^{১} র্সরো^{১} । নোর্স^{১} ধো^{১} প^{১} ধো^{১} । নো^{১} ধো^{১} —^{২} ।
ণি জ ন ক জ ন নী জ ন নি — —

ধো১ র্রো১ র্স২। নো১ পনো১ ধো১ ধো১। ধো২ ধো১ ধো১।
— — অয়ি ভু ব ন ম নী ল স্নি
(আ—প্র)
—১ নো১ ধো১ নো১। র্স২ র্রো১ নো১। র্স১ র্স১ র্স১ র্স১। ধো১ র্গো১
— ন্ধু জ ল ধৌ ত চ র ণ ত ল অ নি
র্র১ র্গো১। র্গো১ র্রো১ র্রো১ র্স১। ন২ র্স১ র্রো১। র্স১ ন১
ল বি ক — ম্পি ত শ্যা ম ল অ —
ধো১ প১। সধো২ ধো১ ধো১। ধো২ ধো১ ধো১। পধো১ নোর্স১
ঞ্চ ল অ ম্ব র চু ম্বি ত ভা —
র্স১ নো১। ধোপ১ নো১ ধো১ প১। স২ স১ স১। ধো২ নো১ র্স১। ধো১ নো১
ল হি মা — চ ল শু ভ্র তু ষা র কি রী —
ধো১ নো১। র্গো১ র্রো১ র্রো১ র্স১। নো১ পনো১ ধো১ ধো১।
— টি নি — অ য়ি ভু ব ন ম
(আ—প্র)
স১ স১ স১ স১। গো২ গো১ গো১। গো১ গো১ গোর১ গো১।
প্র থ ম প্র ভা ত উ দ য় ত ব
ম১ ম১ ম১ পম১। গো১ গো১ র১ গো১। —১ গো১ র১ গো১।
গ গ নে — প্র থ ম সা — ম র ব
র১ গো১ ম১ গো১। রোগো১ রো১ স২। নো১ স১ স১ স১। ধো২ ধো১
ত ব ত পো — ব নে প্র থ ম প্র চা রি
ধো১। প১ ধো১ প১ নো১। ধো১ ধো১ প২। গো২ ম১ ম১। —১ নো১ ধো১
ত ত ব ব ন ভ ব নে জ্ঞা ন ধ — র্ম্ম ক
প১। গো২ ম১ গো১। রোগো১ রো১ স২। [ধো১ ধো১ ধো১ নো১।
ত পু ণ্য কা — হি নী [চি র ক —
ধোনো১ র্সরো১ র্গো১ র্রো১। র্রো১ র্স১ র্স১ নো১। র্স২ র্স২। র্গো২ র্গো১ র্র১।
ল্যা — ণ ম য়ী — তু মি ধ ন্য দে শ বি
র্গো১ র্রো১ র্রো১ র্স১। ন১ র্স১ র্রো১ র্স১। র্স১ নো১ নো১ ধো১।][পধো১
দে — শে — বি ত রি ছ অ — ন্ন —][জা
নোর্স১ নো১ নো১। ধো১ ধো১ প১ মগ১। ম১ প১ প১ প১। পম১ প১
— হ্ন বী য মু না — বি গ লি ত ক রু
নোধো২।]স২ স১ ধো১। —১ ধো১ ধো২। ধো১ নো১ র্স১ ধো১। নো১ র্স১
ণা]পু ণ্য পী — যূ ষ স্ত — ন্য বা — হি
র্গো১ র্রো১। র্স১ নোর্স১ নো১ ধো১।
নী — ভু ব ন ম
(আ—প্র)

অবরোধ।

(১)

প্রায় পাঁচদিন হইল জগিয়ার জমিদার বাবুর বড় বাড়ীতে, হঠাৎ বহুস্ত্রীকণ্ঠের যে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠে, তাহাতে গ্রামের দীনদুঃখী ও অন্যান্য গৃহস্থেরা অবগত হইয়াছে যে জমিদার ভূধর বাবুর, শ্বশুরালয়স্থিতা একমাত্র কন্যা গৌরীর বৈধব্য ঘটিয়াছে। ঘটনাটি লোষ্ট্রবৎ গ্রামের সুস্থির মধুচক্রে নিপতিত হইয়া অশেষ গঞ্জনা, গুন্‌গুনা, রটনা, কল্পনা, ও জল্পনা এই পাঁচ দিন সমান জাগ্রত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা যেন সে দিন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নমুখে অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি মহেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাকু ছিলামটি নিঃশেষ করতঃ হুঁকাটিকে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিবার সময়, এই ঘটনাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বীয় পুত্র মুকুন্দমোহনকে বলিলেন—"টাকায় যদি সব হ'ত—তা হলে রাজা ব্যাটাদের আর ছেলে পিলে মর্‌তো না।"

এই অখণ্ডনীয় তথ্যের প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া মিতভাষী পুত্র মুকুন্দমোহন চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পুরোহিত ক্ষেত্তর রায় মহাশয়, তাম্রকূটধূমে সেই দিনপঞ্চপুরাতন ঘটনাটি পুনশ্চ রোমন্থন অভিপ্রায়ে, সেই চির-সজন জগিয়া-প্রথিত চক্রবর্ত্তী-রোয়াকে আসিয়া ভর করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়, দেয়ালে ঠেস দিয়া জানূপরি অঙ্গুলিবেষ্টনপূর্ব্বক যে নিবিড় আসন রচনা করিয়াছিলেন তাহা কিছুমাত্র ভঙ্গ না করিয়াই বলিলেন,—"তাই বল্‌ছিলাম্ ক্ষেত্তর দা', টাকায় যদি বরাত ফিরতো তা'হলে এত দিন বড়লোক ব্যাটারা কুইন-ভিক্‌টোরিও হ'য়ে উঠ্‌তো।"

ক্ষেত্তর রায় বেশ বুঝিতে পারিলেন চক্রবর্ত্তীর এই বিশেষ উৎপ্রেক্ষাটি, তাঁহার ধনী যজমান ভূধর বাবুর উপর কিঞ্চিৎ শ্লেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি ভূধর বাবুর পুরোহিত সেই জন্য ভূধর বাবুর পক্ষ হইতে এইরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন—"কি জান চক্রবর্ত্তী, গৌরীর বয়সটা হ'লো কাঁচা আর ছেলে পিলেও হয় নাই, এই দুঃখু আর কি; নয়ত হ'ক না বিধবা, তাতে আর দুঃখু কি, কত লোক যে বিধবা হ'চ্চে।"

চক্রবর্ত্তী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—"দুঃখু আর কি, বড়লোকদের দুঃখু আর কি, আমাদের মত রাত পোহালে ত আর উদরের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।" ফল কথা চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও উদরের ভাবনা ভাবিতে হয় না—এমন কি 'ছোট জমিদার' বলিয়া গ্রামে তাঁহার একটা বদনামও ছিল।

রায় মহাশয় কি একটা জবাব দিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময় তৎসম্পর্কিত একটা মহৎরহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িল। রায় মহাশয় যেখানেই যান, যাইবার সময় তদীয় পদযুগল

একজোড়া অভব্য ও বিপুল ধূলিমণ্ডিত চটিজুতায় আবৃত করিয়া যান। চক্রবর্ত্তী-আত্মজ মুকুন্দমোহন উক্ত পদদ্বয়কে অস্থ চটিজুতা-বিশ্লিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্যাঠা জুতো কোথা?"—ইহাতে পুরোহিত রায় মহাশয় চুপ করিয়া থাকাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"ন'পাড়ার খুড়ী মরেছে বুঝি—ক্ষেত্তর দা'।"

রায় মহাশয় 'না, না' বলিয়া বারম্বার আপত্তি করাতে ইহা সপ্রমাণ হইল যে চক্রবর্ত্তীর অনুমান ঠিক। ফল কথা এই—রায় মহাশয় পুরোহিত, কালাশৌচ প্রভৃতিতে তাঁহার যাজনায় অনধিকার হয়। ইহাতে লোকসান হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য তিনি দূরস্থ জ্ঞাতিদিগের অশৌচ কদাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেন না।

চক্রবর্ত্তী কিন্তু রায় মহাশয়ের শাঠ্যে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত হইয়া কলির ব্রাহ্মণের নিদারুণ অধোগতি সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য ব্যক্ত করিতে লাগিলেন—এবং ইহাও বলিলেন যে তাঁহার যে দু চার ঘর শিষ্য আছে অশৌচ অবস্থায় কদাপি তাহাদের যাজনা করেন না।

এইরূপ বক্তৃতাপরম্পরাসত্বেও নিদাঘ-অপরাহ্নের চিরায়মান তরুচ্ছায়াবৎ একটা অপ্রার্থিত ও অপরিত্যাজ্য অবসাদ সেই ধূম্রাকুল রোয়াককে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল যে আজ পাঁচদিন ধরিয়া তাহারা যে সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছে তাহা আজ সকলের অনিচ্ছাসত্বেও শনৈঃ শনৈঃ থিতাইয়া পড়িতেছে। গৌরী পাঁচ দিন বিধবা হইয়াছে।

কিন্তু সেই সময় তুমুল ক্রন্দনরোলের সহিত একটা বিদ্যুদ্-গতি সমাচার আসিয়া সকলের নম্র মেরুদণ্ডকে আগ্রহভরে সোজা করিয়া দিল। সংবাদ পৌছিল—গৌরীকে শ্বশুরপক্ষীয়েরা এই মাত্র বাপের বাড়ী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে"। তাহার পিত্রালয় আগমন সম্বন্ধে একটা রহস্য ছিল—সেই রহস্যটি স্মরণ করিয়া সকলে একেবারে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া গেল। কিন্তু পুরোহিত রায় মহাশয়ের অন্তরে অন্য কোন চিন্তাই প্রবেশ করিল না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"শ্রাদ্ধটা দেখছি তবে এখানেও ত হবে,—হায় হায় মর্দ্দানি ক'রে কেন জুতো জোড়াটা ছাড়লুম্—কে বা জানতো, তুমিও যেমন।" মনে মনে অনেকক্ষণ যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া তিনি মুখ ফুটিয়া অবশেষে চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন—"মহেশ দা' কাজটাত তোমাকেই করাতে হ'বে।" চক্রবর্ত্তী,—"আচ্ছা, হবে"—বলিয়া পুনশ্চ অভিনব বিস্ময়রসে তলাইয়া গেলেন। এমন সময়ে বড়বাড়ীর দরওয়ান আসিয়া নিবেদন করিল—"মুকুন্দ বাবুকো মহারাজ বোলাওয়ে।"

যে ছেলেটি এতক্ষণ রোয়াকের ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল সেই মুকুন্দ বাবু, মহেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। গ্রামবাসীরা আপনাদিগের অভ্যাগত কুটুম্বদিগকে, মুকুন্দকে দেখাইয়া সসম্ভ্রমে বলিত—উনি ইংরাজিতে চার পাশ। এখন মুকুন্দ আইনের পড়া দেখিতেছেন।

(২)

পাঁচ বৎসর হইতে চলিল, একাদিক্রমে একমাস কাল নহবৎ বসাইয়া ভূধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহা আড়ম্বরে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। সাত আটটা সানাইয়ের সুর একত্র হইয়া, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং যখন তখন সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মের মধ্যে গ্রামবাসিদিগের অন্তরে একটা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত মত্ত আনন্দের বারতা এক মাস ধরিয়া যেন কাটিয়া বসাইয়া দিয়াছিল। যাত্রা, বাইনাচ, তর্জ্জা পাঁচালী প্রভৃতিতে কেহ কখনও জন্মাবধি এমন বিব্রত হয় নাই। কিন্তু এ বিবাহে সুফল ফলে নাই।

কন্যার বিবাহের দুই বৎসর পর ভূধর বাবু একবার সপরিবারে ৺কালীঘাটে যান। সেই সময় ইচ্ছা করিয়া হাটখোলায় বেহাইবাড়ীতে দুই দিন অবস্থান করেন। পরমনিষ্ঠাবান ভূধর বাবু হাটখোলায় দুই দিন গঙ্গাস্নান করিয়া এবং বেহাই মহাশয়ের নিরতিশয় শিষ্টাচারে পরমাপ্যায়িত হইয়া অত্যন্ত পরিতোষলাভ করেন। তাঁহার বেহাই হাটখোলার একজন, শ্রেষ্ঠ মহাজন। তিনি পরম সামাজিক লোক। ভূধর বাবু ভাবিয়াছিলেন বেহাই মহাশয়ের আদরে আর কিছু দিন থাকিয়া সর্ব্বপাতকসংহন্ত্রীর পুণ্যসলিলে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপক্ষয় করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার জামাতার দুর্ব্যবহারে তাঁহাকে সে বাসনা অচিরাৎ পরিত্যাগ করিতে হইল।

কলিকাতায় থিয়েটারসমূহের সম্মুখের 'সীটে' যে সকল ফিন্‌ফিনে-জামা গায়ে, ফুরফুরে ওড়না কাঁধে, মাথায় টেরীর উপর সাদা মাড়োয়ারি টুপি পরা যুবকদল আতর এবং এসেন্সের গন্ধে ভাসিয়া বেড়ায়, ভূধর বাবুর জামাতা আলোককুমার তাঁহাদেরই একজন। তাহার পিতা সারাদিন হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া এবং প্রবল বিষয়বুদ্ধির জোরে যে সকল রজত খণ্ড উপার্জ্জন করিতেন শ্রীমান আলোককুমার সারা রাত্র ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন মদিরাঘোরে তাহার অনেকগুলির সদ্গতি করিতেন। বড়বাজারে যতগুলি গুপ্ত প্রমারার আড্ডা আছে আলোকের সকলগুলির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা। তদ্ভিন্ন সে পিতার নিকট প্রকাশ্যে টাকা লইয়া ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলিতে যাইত। তাহার পর সমস্ত থিয়েটারেই বার মাসের জন্য তাহার 'সীজ্‌ন' কার্ড কেনা ছিল। এই সকল কারণে রাত্রে তাহার বাড়ী থাকা প্রায় ঘটিত না। তাহার সেই ক্ষীণ উজ্জ্বলবর্ণ দেহখানি দেখিলে মনে হইত বুঝিবা ঘুণে ইহার ভিতরকার সব কখানি হাড় জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে—কোন্ দিন বাতাসের ঘায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সে দিন আলোককুমার আপনার 'প্রাইভেট-রুমে' বসিয়া একটি অখণ্ড মুরগীর কালিয়া দ্বারা সায়ংকালীন মন্দক্ষুধার আহুতি করিতেছিলেন। মাথার উপর শিকলে টাঙ্গান কেরোসিন আলো সমুজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। এমন সময়ে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভূধর বাবু প্রবেশ করিলেন।

সুসিদ্ধ কুক্কুটশাবক তখনও টেবিলের উপর রাজিতেছিল। তাহাকে সরাইবার আর অবকাশ ছিল না। তাহা দেখিয়া ভূধর বাবুর সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

বাবু ভূধর জানিতেন যে বয়োদোষে তাহার জামাতার কিছু চরিত্রভ্রংশ হইয়াছে।

কিন্তু কুক্কুট-শাবক-ভোজনোপযোগী চরিত্র-ভ্রংশ হওয়া সেই গ্রাম্য জমিদারের অনুধাবনার প্রায় অনধিগম্য ছিল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এ কিরে পাষণ্ড ?"

আলোক বলিল—"যাই হ'ক, তুমি ঘর থেকে বেরোও৭"

কন্যার নিকট মেলানি না লইয়াই ভুধর বাবু সেই রাত্রে যাত্রা করিলেন এবং বাটী আসিয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—"কন্যা বিধবা না হইলে এ বাটীতে আসিব না, স্বরূপ জানিবেন।" বৈবাহিক সমস্ত অবগত হইয়া পত্রের উত্তর দিলেন—"তাহাই হইবে।"

এই ঘটনার ৪ বৎসর পরে পুলিসে, কলিকাতার এক গোপনীয় প্রমারার আড্ডার পার্শে মুমূর্ষু আলোকের ভগ্নপঞ্জর দেহখানি কুড়াইয়া পাইল। হাঁসপাতালেই তাহার উন্মত্ত বাসনাদগ্ধ প্রাণটুকু উড়িয়া গেল। তাহার পিতা সংবাদ পাইয়া তাহার সৎকার করিলেন।

তখন আলোকের পিতার, অমঙ্গলরূপিনী পুত্রবধূর উপর নিদারুণ ক্রোধ উদয় হইল। তদ্দণ্ডেই তাহাকে চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। যে ঝি সঙ্গে যাইবে তাহার হাতে একটা ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স দিয়া বলিয়া দিলেন—"বেহাই মহাশয়কে এইটি দিয়া বলিও, মরিবার সময় জামাই তাঁহাকে এইটি দিয়া গিয়াছে।"

গৌরীকে রাখিয়া তাহার শ্বশুরালয়ের সকলে যখন ফিরিয়া গেল, শোকার্ত্ত ভূধর বাবু কিছু আগ্রহসহকারে জামাতার শেষ নিদর্শনটি দেখিবার জন্য বাক্সটি খুলিলেন—দেখিতে পাইলেন, বাক্সর ভিতর একটা গোটা রাঁধা মুরগী রহিয়াছে! এই তীব্র মর্ম্মান্তিক উপহাসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে থর থর করিতে লাগিল। কলিকাতায় বলিয়াই তাঁহার বেহাইয়ের তদ্দণ্ডে মুণ্ডপাত করিতে পারিলেন না। আইন-অধ্যয়ন-পর মুকুন্দমোহনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নালিস চলিতে পারে কি না।

মুকুন্দ বলিল—'হাঁ পারে, তবে ফলাফলের স্থিরতা নাই।' অবশেষে পাত্রমিত্র বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। কিন্তু রোদন-প্লাবিত অন্তঃপুরের মধ্যে এ সংবাদ পৌঁছিল না।

(৩)

রায় মহাশয়ের অশৌচ ব্যক্ত হইয়াই পড়িল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও দশ আনা ছ'নার হিসাবে তাঁহার বকল্মা লইলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধ বুঝি আর হয় না। গৌরীর মায়ের এ কয় দিন জ্ঞানই নাই। গৌরীর পিতা পুরোহিত রায় মহাশয়কে বলিলেন—তুমিই যা হয় কর, আমি আর দেখিতে পারিব না। অগত্যা রায় মহাশয় কম সম করিয়া বৃষোৎসর্গের আয়োজন করাইলেন।

শ্রাদ্ধবাসরে, পুরোহিত, চক্রবর্ত্তী এবং তস্য চার-পাশ-করা পুত্র, এই তিন জন জমিদার বাবুর অন্তঃপুরে উপনীত। গিয়া সকলে দেখিলেন পুরীর মধ্যে গৃহশ্রীকে পরাস্ত করিয়া শ্মশান-দৈত্য আপনার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। এবং সেই রাজত্বের কেন্দ্রস্থলে এক নিরলঙ্কৃতা নিরাভরণা পাষাণপ্রতিমা বসিয়া রহিয়াছে। মুখে বাক্য নাই; চক্ষে অশ্রু

নাই। সেই গৌরী! চক্রবর্ত্তী ও রায়মহাশয়ের ধমকানির জোরে এক জন দাসী গৌরীকে উঠাইয়া স্নান করিতে লইয়া গেল।

একেলা সমস্ত সামলাইতে পারিবেন না এই আশঙ্কা করিয়া মহেশ চক্রবর্ত্তী স্বীয় পুত্র ইংরাজিবিদ্যায় কৃতী মুকুন্দমোহনকে—তাহার বিষম আপত্তিসত্ত্বেও—সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু সেই লাজুক তরুণটি, পিতার কিছু সাহায্য করা দূরে থাকুক, ঘরের মধ্যে কোন্ খানটিতে বসিলে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারা যায় সেই তথ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় বর্ষাভিষেকবিধৌত কুসুমরাশির ন্যায় সদ্যস্নাতা গৌরীকে আনিয়া দাসী আসনে বসাইয়া দিল। শ্রাদ্ধমন্ত্র উত্থিত হইল।

এদিকে শ্রাদ্ধ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, সেই স্বর্লোকদুর্লভ রূপবতীর সম্মুখে, মুকুন্দের মস্তিষ্কের ভিতর ততই নিখিল কাব্যশাস্ত্রের ও তাবৎসৌন্দর্য্যতত্ত্বের অব্যক্ত ভাব সকল উদ্বেলিত ও আলোড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। কুমারের সেই তপঃপরায়ণা গিরিরাজতনয়া, বোধ হইল যেন,—তাহার অন্তরস্থিত কল্পনা-সমুজ্জ্বল তপোবনসীমান্ত পরিহার করিয়া পুরঃস্থিত সিক্তকেশদামবৃত চন্দ্রাননে লীন হইয়া গেল। গৌরীও যেন আজ কূলে কূলে তেমনি পূরিয়া উঠিয়াছে—যেন তেমনি একটা মেঘে এ কূল ও কূল ছায়া ফেলিয়া সমস্ত ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। এ সেই মুখ যাহার সহিত 'প্রভাতকল্পশশিনেব শর্ব্বরী'র তুলনা হইয়াছিল। যে মুখখানি 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত-লোলাপাঙ্গের' সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাহা যেন সে দিনকার শ্রাদ্ধমন্ত্রধ্বনিতে উজ্জয়িনীর আপানভূমি পরিহার করিয়া সেই মুগ্ধদৃষ্টি সুধাংশুবদনে মিশিয়া গেল। তাহার মনে হইল সেই সুদূরদ্বীপবাসিনী মিরাণ্ডা-কল্পমূর্ত্তি হঠাৎ যেন শরীরবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কত শকুন্তলা কত ডেসডিমোনা যেন নিমেষে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে গৌরীর কণ্ঠস্বর বড় অতুলনীয়। তাহা কেমন এক রকম, সজল সজল। ভিতরকার যেন অমৃতরাশি মন্থন করিয়া উঠিতেছে—নাসিকায় ও মুখে প্রহত হইয়া শব্দ তরঙ্গ যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। গৌরির গম্ভীরমধুর মন্ত্রউচ্চারণ শ্রবণ করিয়া মুকুন্দের সর্ব্বাঙ্গ বারম্বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কলিকাতার বাসার একটি প্রায়ান্ধকার ঘরে বসিয়া বেচারি দিবানিশি গুনগুন্‌স্বরে, সুতীব্র কল্পনাবলে যে ছায়ালোক সৃজন করিয়াছিল—এবং যাহা বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চারিখানি কাগজখণ্ড লাভ করিয়াছে—তাহা সে দিন, শ্রাদ্ধমন্ত্রের ক্ষীণ অস্ফুট আবৃত্তিতে, এবং আবর্ত্তিত ধূপগন্ধের সৌগন্ধে লক্ষধারে সহস্র কিরণে নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এত রূপ সে কোথাও দেখে নাই—এমন শব্দ সে জন্মাবধি শুনে নাই।

পিতা কতকগুলা চাল কলা লইয়া এবং পুত্র কাব্যশাস্ত্রের একটা মহাভাষ্য লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সে ভাষ্য জটিল এভিডেন্স অ্যাক্টের টিপ্পনীর মধ্যে অতি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়াই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

(৪)

রাণীর শোক আর কিছুতেই থামে না। রাণী রাজাকে বলিলেন, রাজা, আমার কন্যার সঙ্গে আমিও এয়োত্তি ঘুচাব। শাঁখা পরবো না, শাড়ী পরবো না, মাচ খাব না, আঁশ ছোঁব না, পরপুরুষের মুখ দেখবো না। রাজা বলিলেন আচ্ছা। আর বলিলেন,—শোন রাণী তোমায় এক সাতমহলা নিবান্ধবা পুরী দিব—দাসী দিব, ধন দিব, তুমি তার মধ্যে গিয়ে কন্যের সঙ্গে বৈধব্য পালন করগে।

ভূধর বাবুও এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন—তাঁহার যে স্বতন্ত্র বৈঠকখানা ও বাগান ছিল তাহার মধ্যে গৌরী ও তাহার মাতা বাস করিতে লাগিল। সে বাগানে কিম্বা বাটীতে একজনও পুরুষ চাকর কিম্বা মালি রহিল না। বাটীর মধ্যে মৎস্যের শুল্কমাত্রও আসিতে পাইত না। গৌরী ভূমিতে শয়ন করিত ও হবিষ্যান্ন আহার করিত। তাহার মাতা নিয়মিতরূপ প্রাতে এবং সায়াহ্নে জামাতার জন্য রোদন করিতেন, গৌরী সে সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

কিন্তু কিছুকাল এইরূপে বৈধব্যব্রত পালন করিয়া অন্তরে অন্তরে গৌরী বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সুরাবিভোর অন্যাসক্ত স্বামির অকিঞ্চিৎকর-স্মৃতিকে অবিশ্রাম বেদনাহীন বিলাপ-ধ্বনিতে জাগ্রত্‌রাখা তাহার পক্ষে সকল যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সে যন্ত্রণাও যথাচার সে বহন করিতেছিল। সে জানিত জগতের মধ্যে অমঙ্গলরূপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে পৃথিবীতে কেহ চাহে না—সে পৃথিবী হইতে লুক্কায়িত হইয়া কালভুজঙ্গের ন্যায় এক অসূর্য্যম্পশ্য বিবরে বাস করিবে। এই পুরুষসঙ্গবর্জ্জিত আনন্দলেশহীন কৃত্রিম শোককারাগারে তাহার অকল্যাণকর প্রাণটা কতকালে যে নিবিয়া যাইবে তাহারও স্থির ছিল না। কত ভাবে দিনের মধ্যে কতবার যে তাহার নিবিড় নয়নপল্লব ভিজিয়া উঠিত তাহা কেহ জানিতে পাইত না। পিতা তাহার ভাগ্যে ৺কালী সিংহের মহাভারত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল অবস্থায়, সকলে সমস্ত সাহিত্যের অধিকারী হয় না। ভীষ্মচরিত কোলে করিয়া, সে ভাবিত—হে বিধাতা জনসঞ্চারবিহীন কোন দূরান্তর মরুভূমির মধ্যে আমার পরম অকল্যানকর সমস্তটা মিশিয়া মরিয়া যাউক।

এদিকে ভূধর বাবু কন্যার বৈধব্যকে যতই নীরন্ধ্র অবরোধে অবরুদ্ধ করিতে লাগিলেন ততই চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধূমপান অবসরে ক্ষেত্তর রায়কে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বুঝলে ক্ষেত্তর দা' অতি শব্দটাই কিছু নয়!" এতৎসম্বন্ধে রোয়াকাসীন সকলেরই একমত—অতি শব্দটাই কিছু না। কিন্তু পুত্র মুকুন্দমোহনের মনে অন্যরূপ ভাব উদয় হইতে লাগিল। ভূধর বাবু কন্যার চারিদিকের বাঁধন যতই কসিতে লাগিলেন মুকুন্দমোহনের মনে ততই 'ফেয়ারি কুইনের' স্বপ্নমালা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্যোৎস্নারাত্রে যখনই সে ঐ বৈঠকখানার অনেক তফাতে দাঁড়াইয়া সেই চন্দ্রিকাবিধৌত হর্ম্ম্যের দিকে চাহিয়া দেখিত তখনি তাহার মনে হইত যেন এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দানব কোন্ অপ্সরাকন্যাকে কাড়িয়া

আনিয়া কোন্ মায়াময় পাষাণদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভাবিত, সেই ছায়াময়ী বিষাদপ্রতিমা হয়ত এই জ্যোৎস্নাউচ্ছ্বসিত অনন্তপত্রমর্ম্মরিত যামিনীতলে কোথাও আপনার রূপরাশি এলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। হয়ত বা সে এই অনন্ত অজস্র কিরণধারার সহিত আপনার অন্তঃসিঞ্চিত তাপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার ইচ্ছা হইত বর্ম্মাবৃত অশ্বারূঢ় দিগ্বিজয়ী মহাযোধের ন্যায় কোন নিস্পন্দ-নিশীথ রাত্রে দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া কর্ণভেদী তূর্য্যনিনাদে দিঙমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া পুরীর মধ্যের নিষ্ঠুর মায়াজাল নিমেষে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। দুয়ারে যে সকল দৈত্যেরা থানা দিয়া বসিয়া আছে তাহাদিগকে নিমেষে পরাস্ত করিবে—ইন্দ্রজালরুদ্ধ কুমারীর সমস্ত বন্ধ দ্রুত অসিধারে ছেদন করিবে—এবং তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া কোন অনুদ্দিষ্ট জ্যোৎস্না-লোকপ্রান্তে বিলীন হইয়া যাইবে—এমন স্বপ্নও সেই বাঙ্গালি-সন্তানের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিত। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে এই পিনালকোড্‌শাসিত নিরন্ন ও দরিদ্র ভারতবর্ষে সে দিগ্বিজয়ের কাল আর নাই।' অবশেষে সে প্রতিজ্ঞা করিল আর কিছু না পারুক সেই মায়াকুমারীর কর্ণকুহর আপনার অন্তরবিদীর্ণ তীক্ষ্ণ তূরীধ্বনিতে ভরিয়া দিবে।

মুকুন্দমোহন অনেকদিন ধরিয়া একখানি খাতায় গৌরীকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কথা লিখিল। সে অনেক অদ্ভুত চিত্র, অনেক অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন, অনেক ছবি, অনেক গান। হৃদয়মথিত তরল উজ্জ্বল বর্ণে প্রতি ছত্র লাবণ্যে ভরিয়া উঠিল। তাহাতে কত আক্ষেপ, কত আকাঙ্ক্ষা, কত প্রতীক্ষা, কত নিরাশা, কত ভয়, কত সঙ্কোচ, কত দুঃখ, কত যাতনা ব্যক্ত হইল এবং অব্যক্ত রহিল। বার বার লিখিল, বাব বার কাটিল, বার বার চক্ষে জল আসিল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পরে একখানি নূতন খাতায় মুক্তাবিনিন্দিত অক্ষরে চিত্রগুলি পুনরঙ্কিত করিয়া দিল। এই অপূর্ব্ব কাব্যের নাম দিল—গৌরী। অবশেষে একজন দাসীকে কিছু নগদ দিয়া তাহার হাতে খাতাখানি—তাহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট পাঠাইয়া দিল। দাসী গিয়া বলিল—মা ঠাকুরাণি, খাতাখানা বাগানে কুড়াইয়া পাইয়াছি। গৌরী খাতাখানা লইয়া গোপনে পড়িতে আরম্ভ করিল।

মুকুন্দ যতদূর সাধ্য সহজ করিয়া বাঙ্গালায় লিখিয়াছিল। কিন্তু গৌরীর চারুপাঠ অবধি বিদ্যায় প্রথম প্রথম তাহাও কিছু কঠিন মনে হইল—বিশেষতঃ দুই একটি চিত্র মুকুন্দ-মোহনের অজ্ঞাতসারে ইংরাজিবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অত্যুগ্র আগ্রহে একে একে সমস্ত বাধা পরাস্ত হইয়া পড়িল—তখন গৌরীর হৃদয়ে এমন একটি ছবির ছায়া পড়িল যাহা সে ইহজীবনে কখন দেখে নাই। তুলারাশির মধ্যে জ্বলদঙ্গারবৎ তাহার শ্রান্ত, শূন্য হৃদয়ে মুকুন্দমোহনের বহ্নিশিখাসম উত্তপ্ত ভাবরাশি সঞ্চারিত হইল। স্তরে স্তরে আগুণ ধরিয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের সময় মুকুন্দকে যে স্পষ্ট দেখিয়াছিল তাহা বড় স্পষ্ট মনে হইল না। কিন্তু ক্রমে

যেন মনে হইল 'হাঁ দেখিয়াছি'। বালককালে সে মুকুন্দকে অনেকবার দেখিয়াছিল। এই সকল আবছায়াস্মৃতি হইতে কল্পনাসাহায্যে গৌরী মনে মনে সেই পুরুষসঙ্গবর্জ্জিত পুরীর মধ্যে একটি সুন্দর পুরুষমূর্ত্তি রচনা করিয়া আপনার নিভৃত হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিল। সেই কল্পিত মূর্ত্তিকে বেড়িয়া কত মায়া, কত ছলনা, কত মান, কত অভিমান, কত বিরহ, কত মিলন নাচিয়া বেড়াইত। শ্মশানের অমঙ্গলরূপিনী যেন কোথাকার রাজশ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছে। মুকুন্দের কাব্যের সাহায্যে চারিদিকের অস্ফুট প্রকৃতিও যেন স্ফুটভাষিনী হইয়া উঠিল।

বর্ষার দিনে ঘন শ্যামল পত্ররাজির রন্ধ্র দিয়া গৌরী যেন দেখিতে পাইত মুকুন্দ তাহার প্রতীক্ষায় প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। যখন খুব জোরে ঝম্ ঝম্ করিয়া জল আসিত তখন গৌরীর মনে হইত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যেন মুকুন্দ তাহার দ্বারে আশ্রয় মাগিতেছে—যেন ডাকিতেছে—গৌরি দুয়ার খোল, দুয়ার খোল। সে দ্রুতচরণে নীচে নামিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিত—বৃষ্টির ঝাপটে কেবল সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইত। তখন মেঝেতে পড়িয়া সে মাটিতে বুক দিয়া কাঁদিত। এইরূপে বর্ষা কাটিয়া শরৎ আসিল।

(৫)

কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে মুকুন্দের মনে হইল—আজ আর সয় না।

সে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইল। পথে চলিতে চলিতে তাহার রোমিও জুলিয়েটের কথা মনে পড়িল। সুপ্রসন্ন শারদ জ্যোৎস্নায় নিখিল স্থাবর জঙ্গম নিস্তব্ধে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর হইতে ধ্বনিয়া উঠিল ঃ—

In such a night
Troilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul towards the Grecian tents
Where Cresida lay that night.
In such a night
Did Thisbe &c. &c.

তাহার মনে হইল—in such a night—ভিন্ন জগতে আর কখনো কোন তীব্র মর্ম্মভেদী বিরহ ও মিলনের ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। রোমিওর প্রখর আগ্রহ তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে খরতর বেগে ছুটিতে লাগিল। সেই আগ্রহে সে জুলিয়েটের কাননপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।

প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাতায়নতলে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল স্বপ্ন যেন সত্য হইয়াছে—বাতায়নে জুলিয়েটের উদয় হইয়াছে।

তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডসকলের মধ্য দিয়া অখণ্ড সুধাকর পৃথিবীকে অস্থায়ী ছায়ালোকে প্লাবিত করিতে করিতে চিত্রার্পিত আকাশ-পথ অতিবাহন করিতেছিল। সেই সময়ে করুণকণ্ঠে মুকুন্দ ডাকিল—গৌরি।

গৌরী চকিতনেত্রে নীচে চাহিয়া দেখিল—সেই !—যাহাকে সে এমন অনেক জ্যোৎস্না রাত্রে প্রতীক্ষা করিয়াছে। এমনি কণ্ঠে অনেকবার মর্ম্মরিত বায়ুহিল্লোলে কে তাহাকে অনেকবার ডাকিয়াছিল—গৌরি। অনেক প্রভাতে, অনেক নিশীথে অনেক শব্দের মধ্যে এমনি স্বরে কে যেন কোন্ মনের রাজ্য হইতে ডাকিয়াছে—গৌরি। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না—তথাপি 'যাই' বলিয়া চঞ্চল আনন্দভরে নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল।

সেই সময় জগতের এক গূঢ়রচনাশক্তি জুলিয়েটের ধাত্রীদ্বারা বাতায়নতলের নাটিকার এক অখ্যাত উপসংহার করিল।

একটা দাসী ছাদের উপর হইতে নীচে দেখিতে পাইল পুরুষমানুষের মত কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ভাবিল চোর, নিশ্চয় সিঁদ দিবে। চোরকে লক্ষ্য করিয়া উপর হইতে একখানা থান ইট ফেলিয়া দিল—এবং ছুটিয়া বড় বাড়ী সংবাদ দিতে চলিল। ঊর্দ্ধমুখ বাতায়নবদ্ধদৃষ্টি মুকুন্দমোহনের বুকে ইটখানা বিষম বাজিল। বুকের অস্থি চূর্ণ হইয়া হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সে গতজীবন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই সময় গৌরী আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। পাষাণপ্রতিমা অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল—সেই বটে !

এ দিকে কর্ত্তা চোর ধরিবার জন্ত লোকজন ও লাঠীসোঁটা লইয়া সেই দিকে আসিতেছিলেন। গৌরী দূর হইতে পিতার সাড়া পাইয়া—ভূতলে পড়িয়া গতজীবন মুকুন্দকে নিবিড় আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়া ধরিল।

সমুপাগত পিতা কাণ্ড দেখিয়া ক্রোধভরে অসতী কন্যার মস্তকে এমন সজোরে পদাঘাত করিলেন যে সে মস্তক ইহজন্মে আর ভূতল হইতে উঠিল না।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাষ্ট্র-বিপ্লব।

পলাশি হইতে প্রস্থান করিয়া, পরদিবস—শুক্রবার প্রাতঃকালে *—সিরাজদ্দৌলা

* ইংরাজেরা বলেন, সিরাজদ্দৌলা "দিবা দুই ঘটিকার" সময়ে পলাশি হইতে পলায়ন করিয়া "সেই রজনীতেই" রাজধানীর মহিলামণ্ডলীর বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরীণে লিখিত আছে,

মন্সুরগঞ্জের রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি বহুসহস্র-সিপাহীসুরক্ষিত সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বীরশূন্য মুরশিদাবাদের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন কেন? ইংরাজেরা বলেন,—একে কাপুরুষ, তাহাতে দুর্ব্বলচিত্ত; সুতরাং ইংরাজভয়েই সিরাজদ্দৌলা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন,—"পিপীলিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র কীট; তথাপি বহুসহস্র পিপীলিকার সমবেত শক্তির নিকট বনশার্দ্দূলকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়!"* বলা বাহুল্য, যে, এইরূপ পিপীলিকা-দংশনেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইল!

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে না করিতেই সিরাজদ্দৌলার পরাজয়-কাহিনী চারিদিকে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। লুণ্ঠনভয়ে, যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল! মোগলপ্রতাপ তখন ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছিল, মুসলমান আমীর ওমরাহেরা আত্মস্বার্থরক্ষার আশায় মহারাষ্ট্রসেনার নিকট, ফিরিঙ্গি বণিকের নিকট এবং পার্ব্বত্য পাঠান সেনার নিকট, বহুবৎসরের শাসনগৌরব পরিহার করিয়া একে একে রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছিলেন; ভারতবর্ষের স্বত্বসিংহাসন বালকের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত হইয়াছিল;—সুতরাং সিরাজদ্দৌলার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল! তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য পাত্রমিত্রগণকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শ্বশুর মহম্মদ ইরিচ খাঁ পর্য্যন্তও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।† তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকলেই প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কেহ কেহ ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে উত্তেজনা করিতেও ত্রুটি করিল না।‡ চারিদিকে আকুল আর্ত্তনাদের সূত্রপাত হইল।

এই সকল কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া, সিরাজদ্দৌলা সেনাসংগ্রহের জন্য ইরিচ খাঁকে পুনরায় উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ইরিচ খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া সিরাজদ্দৌলা বিহার-যাত্রার উপযোগী সেনা সংগ্রহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইরিচ খাঁ তাহাতেও অসম্মত হইয়া ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিলেন!

সিরাজদ্দৌলা ইহাতেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া স্বয়ং সেনাসংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুপ্ত ধনাগার উন্মুক্ত হইল;—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রথম রাত্রি, সেনাদলকে উত্তেজিত করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান চলিতে লাগিল।* রাজকোষ উন্মুক্ত পাইয়া, শরীর-রক্ষক সেনাদল যথেষ্ট অর্থমোষণ করিল, এবং প্রাণপণে সিংহাসন রক্ষা করিবে বলিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়া একে একে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।† সিরাজের সকল চেষ্টা বিফল হইল!

সায়াহ্নে আর রত্নদীপালোকে রাজধানী উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল না;—রাজবৈতালিকের সুললিত যন্ত্র-সংগীত আর বায়ুভরে দূর দূরান্তরে মোগলের গৌরব-গীতি বিঘোষিত করিল না;—পার্শ্বচরগণ আর নবাব-সিরাজদ্দৌলার আজ্ঞাপালনের অপেক্ষায় করজোড়ে কক্ষদ্বারে সম্মিলিত হইল না!‡ রাজপুরী জনসমাগমরহিত শ্মশান-সৈকতের ন্যায় হায়! হায়! করিতে লাগিল! সেই শ্মশানভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে মীরজাফরের বিজয়োন্মত্ত আগ্নেয়াস্ত্র ভীমকলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! সিরাজদ্দৌলা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,—মোগলের রাজ্যাভিনয়ের শেষ চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়াছে; জনহীন পাষাণ-প্রাসাদ যেন চিরবুভুক্ষিতের ন্যায় তাঁহাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে! তখন মাতামহের মমতানুলিপ্ত হিরাঝিলের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বলার্পিত মোগল-রাজসিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া, নবাব সিরাজদ্দৌলা পথের ফকিরের ন্যায় রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন! কেবল একজনমাত্র পুরাতন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফ-উন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।§

সিরাজ স্থলপথে ভগবানগোলায় উপনীত হইয়া তথা হইতে নৌকারোহণে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া, শৈশবের লীলাভূমি গোদাগাড়ীর ক্রোড়বাহিনী মহানন্দানদীর ভিতর দিয়া উজান বহিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।¶

মুতক্ষরীণ-লেখক সিরাজের পলায়ন-প্রণালীর দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"স্থলপথে পলায়ন করিলেই ভাল হইত; অর্থলোভেই হউক আর স্নেহ-

তিনি "সায়ংকাল পর্য্যন্তও" যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করিয়া আত্ম-সেনানায়কদিগের "বিশ্বাসঘাতকতায়" বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, এবং 'পরদিবস প্রাতঃকালে, অর্থাৎ "৬ মাহ সাওয়াল রোজ জুমাকো দো তিন ঘড়ি দিন চঢ়ে মনসুরগঞ্জ আ পহুঁছা।" শ্রীল শ্রীযুক্ত ড্রেক সাহেব বাহাদুরের পলায়নে ইংরাজ-গৌরব কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে;—সিরাজদ্দৌলার পলায়নে মুসলমানের নাম সেরূপ কলঙ্কিত হয় নাই! তাহাকে Honorable retreat বলিলেই সত্যের সম্মান সুরক্ষিত হয়।

* মুতক্ষরীণ।

† Even his wife's father, Mahammed Eeruch Khan, though the Nabab begged him to stay and collect troops, either to defend him where he was, or to accompany him in his retreat, refused, and hastened to his own house at the city of Moorshidabad.—Scott's History of Bengal, p. 369.

‡ Some advised him to deliver himself up to the English, which he imputed to treachery.—Orme ii. 179.

* When Shirajadaula arrived at the city, his palace was full of treasure; but with all that treasure, he could not purchase the confidence of his army; he was employed in lavishing considerable sums among his troops to engage them to another battle. —First Report, 1772.

† As a last resource, the Nabab opened the doors of his treasury, and distributed large sums to the soldiers; who received his bounty and deserted him with it to their homes.—Scott's History of Bengal, p. 369.

‡ Scrafton.

§ He was accompanied in his flight by his favourite concubine Latafunnissa. I am informed that this lady was originally a Hindu, and none other than the sister of Mohan Lal.—H. Beveridge. C. S. এ বিষয়ে অনেকের অন্যরূপ ধারণা আছে।

¶ Riyaz-us-salateen.

বশতই হউক, অনেকেই তাঁহার অনুগমন করিতে পারিত; এবং বহুজনবেষ্টিত সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে কারারুদ্ধ করিতে পারিত না।" কিন্তু সিরাজ কি উদ্দেশ্যে একাকী নৌকারোহণে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য-নির্ণয় করিলে মুতক্ষরীণের সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

কেবল প্রাণরক্ষার জন্যই পলায়ন করা আবশ্যক হইলে, ভগবানগোলা হইতে পদ্মাস্রোতে পূর্ব্বাভিমুখে তরণী ভাসাইয়া দিলেই অনায়াসে দূরাঞ্চলে উপনীত হইতে পারা যাইত। সিরাজদ্দৌলা যে আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া কেবল মোগলগৌরব রক্ষা করিবার জন্যই জনশূন্য রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পলায়ন প্রণালীই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।* কোনরূপে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিয়া মসিয় ল সাহেবের সেনাসহায়ে পাটনা পর্য্যন্ত গমন করা ও তথায় রামনারায়ণের সেনাবল লইয়া সিংহাসন রক্ষার আয়োজন করাই সিরাজদ্দৌলার উদ্দেশ্য ছিল। বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ যেরূপ সাহসী সুচতুর সেইরূপ অকৃত্রিম প্রভুভক্ত; সুতরাং কোনরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াই সিরাজদ্দৌলার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সরল পথে রাজমহল গমন করিবার চেষ্টা করিলে মীরজাফরের অনুচরবর্গ সহজেই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার অবসর পাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি মহানন্দার ভিতর দিয়া গোপনপথে দীনদরিদ্রের ন্যায় পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।†

রাজমহলের নিকট কালিন্দী নাম্নী জাহ্নবীর ক্ষুদ্র শাখা নিঃসৃত হইয়া পুরাতন গৌড় জনপদের উত্তরাংশ দিয়া মালদহের নিকট মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। নাজিরপুরের নিকট ইহার মোহানা ছিল, এখনও তথায় চিহ্ন রহিয়াছে। এই পথ নিরাপদ মনে করিয়া সিরাজদ্দৌলা কথঞ্চিৎ নিঃশঙ্কচিত্তেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা আর ক্ষণমাত্র 'হতইতিগজ' করিলে, রাজধানীতেই কারারুদ্ধ হইতেন। তিনি যে প্রভাতে মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, সেই প্রভাতে মীরজাফর এবং মীরণের সঙ্গে দাদপুরের বৃটীশ-শিবিরে পলাশি-বিজেতা কর্ণেল ক্লাইবের শুভসন্দর্শন হয়।‡ চতুর ক্লাইব মীরজাফরকে কালাতিপাতের অবসর না দিয়া অবিলম্বে মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজকোষ হস্তগত করিবার উপদেশ দান করেন।§

মীরজাফর রাজধানীতে শুভাগমন করিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে, শিকার হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে! তিনি আর কি করিবেন? অবিলম্বে হিরাঝিলের শূন্যরাজসিংহাসন

* It was his intention to escape to M. Law, and with him to Patna, the Governor of which province was a faithful servant of his family.—Orme ii. 179.

† While we were thus happy in our success, Suraja Dowla was travelling in disguise, like a miserable fugitive, towards Patna, where he hoped once more to appear in arms.—Scrafton.

‡ Scrafton.

§ (The Colonel) advised him to proceed *immediately* to the city, and not to suffer Suraja Dowla to escape, nor his treasures to be plundered.—Orme, ii. 178.

অধিকার করিয়া সিংহাসনাধিপতি সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য চারিদিকে লোক লস্কর প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাঊদ রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। মীর কাশিম তাঁহার অধীনে সেনাচালনা করিতেন। মীরকাশিম এবং মীর দাঊদের উপর সিরাজদ্দৌলার পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ হইবামাত্র তাঁহারা মুরশিদাবাদ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম নগর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। বেগমমণ্ডলীর রমণীগণ কারারুদ্ধ হইলেন; সিরাজের অজাতশ্মশ্রু কনিষ্ঠ সহোদর মিরজা মেহেন্দী আলি কারারুদ্ধ হইলেন; মহারাজ মোহনলাল কারারুদ্ধ হইলেন!—কিন্তু সিরাজদ্দৌলার আর কোনরূপ সন্ধান মিলিল না।

মহারাজ মোহনলাল অমিতপরাক্রমে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা করিতে গিয়া পলাশির যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি আহত কলেবরে সিরাজদ্দৌলার পার্শ্বরক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। রাজধানীতে আসিয়া সিরাজদ্দৌলার পলায়ন-সংবাদে মন্ত্রণাকুশল মোহনলাল সিরাজের গন্তব্যপথ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আর শত্রুশঙ্কুল মুরশিদাবাদে কালক্ষয় না করিয়া সিরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানগোলায় গমন করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবানগোলায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মীরজাফরের অনুচরবর্গ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল।* যিনি নিয়ত ছায়ার ন্যায় সিরাজদ্দৌলার পদানুসরণ করিয়া, কখন মন্ত্রণাকৌশলে কখন বা অপরাজিত বাহুবলে মোগলের সিংহাসনরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার অতুলনীয় রণকৌশল এবং অকৃত্রিম প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া বিদ্রোহীদল সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিত, তাঁহাকে মীরজাফর নিষ্কৃতিদান করিতে সাহস পাইলেন না। তিনি মোহনলালকে বিদ্রোহীসেনানায়ক মহারাজ রায় দুর্লভের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মোহনলালকে দীর্ঘকাল কারাক্লেশ বহন করিতে হইল না; রায় দুর্লভ তাঁহার ধন সম্পদ ও জীবন হরণ করিয়া মীরজাফরের আশঙ্কা নিবারণ করিলেন।†

রাজধানী শত্রুশূন্য হইল; তথাপি মীরজাফর মস্‌নদে উপবেশন করিতে সাহস পাইলেন না। সকলেই বুঝিল যে অতঃপর তিনিই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শূন্য সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন, তথাপি মীরজাফর সেই শূন্য সিংহাসন সম্মুখে করিয়া ক্লাইবের শুভাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্লাইব সহসা রাজধানীতে পদার্পণ না করিয়া নগরোপকণ্ঠে কালযাপন করিতেছিলেন; ২৯ জুন দুইশত গোরা এবং পাঁচশত কালা সিপাহী সমভিব্যাহারে ইংরাজ-সেনাপতি মনসুরগঞ্জে শুভাগমন করিলেন। ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "সে দিন

* মুতক্ষরীণ।

† The Dewan Moin Laal had before this been seized at Moorshidabad and his effects and life were taken by Doolubram.—Scotts' History of Bengal, p. 371.

যত লোক রাজপথপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ইংরাজনিধনে কৃতসংকল্প হইলে, কেবল লাঠি সোটা এবং লোষ্ট্রনিক্ষেপেই তৎকার্য্যসাধন করিতে পারিত!"*

মোগলরাজধানীর সুবাসিত প্রাসাদকক্ষে পদার্পণ করিয়াও ক্লাইবের দুশ্চিন্তা দূর হইল না;—কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে "তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে।"† এরূপ জনরবে বিশ্বাস স্থাপন করিবার কারণেরও অভাব ছিল না। সেকালে গুপ্তহত্যা সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আবার সিরাজদ্দৌলা ধরা না পড়ায় অনেকের মনে অনেকরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কে শত্রু কে মিত্র,—কে রাষ্ট্রবিপ্লবে আন্তরিক হর্ষযুক্ত, কে ক্লাইবের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে,—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় ক্লাইব এবং মীরজাফর, উভয়ে উভয়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আত্মপক্ষ সবল করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া পাত্রমিত্রগণের সাক্ষাতে দরবারকক্ষে মীরজাফরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহাকে মসনদে বসাইয়া দিয়া ‡ কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপ স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে 'নজর' প্রদান করিয়া মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন।§

রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইল, লঙ্কাভাগও সুসম্পন্ন হইল, কিন্তু সিরাজদ্দৌলার আর কোন সন্ধান মিলিল না! পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে সিপাহীসেনা ছুটিয়া চলিল।

যুদ্ধের উপক্রম বুঝিয়াই সিরাজদ্দৌলা মসিয় লকে রাজমহলের পথে মুরশিদাবাদে উপনীত হইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। রাজা রামনারায়ণ অর্থাদি প্রদান করিতে বিলম্ব করায় মসিয় ল সংবাদ পাইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন নাই।¶ তিনি যখন সসৈন্যে ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সিরাজদ্দৌলা তখন মহানন্দাস্রোত অতিক্রম করিতেছিলেন!

সিরাজদ্দৌলা মহানন্দাস্রোত অতিক্রম করিয়া কালিন্দীর জলপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইতেছিলেন,—তাঁহার নৌকা যখন বথরা বরহাল নামক পুরাতন পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল! নাজিরপুরের মোহানা অতিক্রম করিতে পারিলেই

* He entered the city with 200 Europeans, and 500 Sepoys,—the inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands; and if they had had an inclination to have destroyed the Europeans, they could have done it with sticks and stones.—Clive's Evidence.

† Orme, ii. 180.

‡ Col. Clive took Mir Jaffier's hand and led him to the Musnud.—Tarikh-i-Mansuri.

§ Scrafton.

¶ মুতক্ষরীণ।

বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু জলাভাবে নাজিরপুরের মোহানা শুষ্কপ্রায়;—আর নৌকা চলিল না।*

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরাজয়বার্ত্তা তখন পর্য্যন্তও দূর দূরান্তরে নীত হয় নাই; সেই ভরসায় সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং নদীতীরে অবতরণ করিলেন, নাবিকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীমুখের সন্ধান লইতে লাগিল, ইত্যবসরে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ মুসলমান মসজিদে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। এই মসজিদ দানশা নামক বিখ্যাত মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির, তাহা অদ্যাপি শাহপুর নামক গ্রামে ভগ্নাবস্থায় বিরাজ করিতেছে।† মসজিদের লোকে ক্ষুদ্র পল্লীতে সিরাজদ্দৌলার ন্যায় অতিথির নৌকা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল, পরে নাবিকগণের নিকট সন্ধান লইয়া তাহারা সকল সমাচার অবগত হইল। মীর দাউদ এবং মীরকাশিমের সেনাদল নিকটেই অবস্থান করিতেছিল, অর্থলোভে লোকে তাহাদিগকে সিরাজদ্দৌলার সন্ধান বলিয়া দিল। সিরাজ ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ করিবারও অবসর পাইলেন না, সপরিবারে মীরকাশিমের হস্তে বন্দী হইলেন।

ইংরাজেরা বলেন যে, সিরাজদ্দৌলা সম্পদের দিনে দানশা নামক মুসলমান ফকিরের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, বিপদের দিনে প্রতিহিংসাপরায়ণ দানশা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।‡ মহাত্মা বিভারিজ ইহা অবিশ্বাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই জনশ্রুতি সত্য হইতে পারে না, কারণ মুতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা স্বকৃত টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—ফকির আদৌ সিরাজদ্দৌলাকে চিনিত না, তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মে, নাবিকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে নবাবকে ধরাইয়া দেয়।"§ আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসলমান ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশার ন্যায় একজন বিখ্যাত

* আষাঢ়ের প্রথমে এখনও নাজিরপুরের মোহানায় নৌকা চলাচল করিতে পারে না। According to the Riyaz (p. 373) Sirajudowla was obliged to stop at Bahral as the Nazirpore mouth was found closed.—H. Beveridge, C. S. অর্ম্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া তথায় একজন ফকিরের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। এই বর্ণনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

† মালদহনিবাসী স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বহুক্লেশে এই মসজিদের ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া মসজিদের কয়েকখানি কারুকার্য্যখচিত পুরাতন ইষ্টক উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ বলেন সিরাজদ্দৌলা এই মসজিদের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন (Tarikh-i-mansuri) তিনি রাজমহলের নিকট কারারুদ্ধ হন। এই মসজিদ রাজমহলের নিকট না হউক, রাজমহল হইতে বহুদূরে নহে। রিয়াজ উস্‌সালাতিনের মতে কালিন্দীতীরেই সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

‡ Scrafton; Clive's Evidence &c.

§ But this can hardly be true if the translator of the Sayer be correct in saying that the fakir did not recognize the Nawab, and only learnt who he was from the boatmen, after his suspicions had been aroused by observing the richness of the stranger's slippers.—H. Beveridge, C. S.

মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দানশার সমাধিমন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে-সময়ে জীবিত ছিলেন না।*

সিরাজদ্দৌলা কালিন্দীতীরস্থ শাহাপুর গ্রামে দানশার সমাধি-মন্দিরের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রিয়াজ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত গোলাম হোসেন সোলমী মালদহের লোক, তাঁহার কথাই অধিকতর বিশ্বাস্য। কিন্তু দানশা বা তাঁহার বংশধরদিগের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একমাত্র হণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দানশা সিরাজদ্দৌলাকে ধরাইয়া দিয়া মীরজাফরের নিকট হইতে বহুমূল্য জায়গীর লাভ করিয়া স্বদেশে "সুভামার" খ্যাতিলাভ করেন; তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেই জায়গীর উপভোগ করিতেছেন।"† ঐ কথা সত্য হইলে মালদহের কালেক্টারীতে এই জায়গীরের সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু তথায় এরূপ জায়গীরের আদৌ কোন উল্লেখ নাই, মালদহের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় "সেরেস্তা তদন্ত" করিয়াও তাহার সন্ধান পান নাই।‡ দানশার অধিকারে অনেক নিস্করভূমি থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সমাধিবিচ্যুত পুরাতন ইষ্টকসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে এখন অল্প কয়েক বিঘা মাত্র নিস্কর ভূমি রহিয়াছে, তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা ঐ সকল নিস্কর ভূমি গৌড়াধিপতি হোসেনশাহ নামক পাঠান বাদশাহের নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়া দানশার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মীর কাশিম যখন সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করেন, সিরাজ তখন নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ; তিনি অনন্যোপায় হইয়া অর্থ বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মীরকাশিমের সেনাদল লুণ্ঠনলোভে উন্মত্তবৎ তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিল, স্বয়ং মীরকাশিমও অর্থলোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পাকেচক্রে লুৎফ উন্নিসা বেগমের বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিলেন! § মসিয় ল এই সময়ে ত্রিশমাইলমাত্র দূরে ছিলেন;—তিনি সিরাজের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই সিরাজের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল! ¶

---

* 'সিরাজদ্দৌলার সময়ে দানশার পৌত্র জীবিত ছিলেন। ইহারা সকলেই সে অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তারিখ ই-মনসুরী লেখক কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই; তিনি বলেন যে সিরাজ একজন দরবেশের দাড়ি গোঁপ মুড়াইয়া দিয়া অপমান করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়।

† Hunter's Statistical Accounts of Bengal, vol. vii. 84.

‡ H. Beveridge, C. S.

§ মুতক্ষরীণ।

¶ Monsr. Law and his party 'came down as far as Rajmehal to Surajuddaula's assistance, and were within three hour's march when he was taken.—Clive's letter to Court, 26 July, 1757.

মীর দাউদ মহোল্লাসে এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবামাত্র মীরজাফরের প্রবল উৎকণ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি ক্লাইবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া হিরাঝিলে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য যুবরাজ মীরণকে সসৈন্যে রাজমহলে পাঠাইয়া দিলেন।*

১৫ই সাওয়াল (৩রা জুন) আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে জীবন্মৃত কলেবরে সিরাজদ্দৌলা বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন।† আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তলের এই ভাগ্যবিবর্ত্তনের জীবন্ত চিত্র সম্মুখে দেখিয়া মুর্শিদাবাদের লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল;—মুসলমান ইতিহাসলেখক আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন;—

Be warned by example, O ye men of understanding, and view well the revolutions of fortune. Place not your reliance upon the world's success, for it is uncertain and inconstant, like a publick finger, who goes daily from house to house."‡

সিরাজদ্দৌলার বিকশিতকুসুমলোভনীয় সুকুমার দেহকান্তি আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মলিন হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগরিকদিগের সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মীরজাফরের সেনাদল কৃতঘ্নের ন্যায় সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া তাঁহার কত না দুর্গতি করিয়াছে, তাহা তাহারাও বুঝিতে পারিল। তাহারা দেখিল যে, তাহাদের মহাপাপে রাজাধিরাজ বন্দী হইলেন, কৃতঘ্ন রাজকর্ম্মচারী শূন্যসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার গুপ্তসংকল্পের প্রধান সহচরগণ মহোল্লাসে লঙ্কাভাগ করিয়া রাজকোষের ধনরত্ন কলিকাতায় চালান করিয়া দিলেন, অথচ মীরজাফরের সেনাদল রাজকোষের অর্থাভাব বলিয়া তাহাদের বেতন পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইল না! তখন তাহারা অধীরহৃদয়ে ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিল, কেহ কেহ সিরাজদ্দৌলার মুক্তিলাভের সদুপায় চিন্তা করিবার জন্য রাজপথে সমবেত হইতে লাগিল, মুর্শিদাবাদ টলমল করিয়া উঠিল! §

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সিরাজদ্দৌলার কি হইল?

সিরাজদ্দৌলার কি হইল? মহাসভার সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, কেবল পরদিবস মীরজাফরের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নিশীথে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে!" ¶ সমগ্র মুসলমান-ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ষ্টুয়ার্ট স্বপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দেশীয় লেখকেরা কেহই

---

* Advice of it reaching the Subah, he sent his son to take him prisoner and bring him to the city.—Scrafton.

† ১৫ সাওয়াল ১১৭০ হিজরীকো আপ্‌নে নৌকরুন্‌কি কয়েদ্‌মে মুরশিদাবাদ আয়া।—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)

‡ Scott's translation p. 372.

§ It is said that several Jammadars, as he passed their quarters, were so penetrated with grief and anger, as to prepare to rescue him, but were prevented by their superiors.—Scott's History of Bengal, p. 371.

¶ His Lordship knew nothing of it till next day.—Clive's Evidence.

ইহার জন্ত ক্লাইবের স্কন্ধে কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই!"* আমরা কিন্তু 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক বিখ্যাত দেশীয় ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে, "ইংরাজ সেনাপতি-দিগের এবং জগৎশেঠের উত্তেজনাবলেই সিরাজদ্দৌলা নিহত হইয়াছিলেন!" † ষ্টুয়ার্ট এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া, স্বপ্রণীত ইতিহাসে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ‡ অবশেষে এরূপ অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাত্মা বিভারিজ আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন! § আমাদের আক্ষেপ করা বৃথা। বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ যে আবশ্যক হইলে তিলে তাল করিয়া থাকেন, এবং গরজে পড়িলে পর্ব্বতকেও সর্ষপকণায় পরিণত করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! আমরা স্বাধীনভাবে স্বদেশের ইতিহাস চর্চ্চা করি না, সুতরাং তাঁহাদের কথাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদরলাভ করিতেছে!

ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ক্লাইবের কলঙ্কমোচনের জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। কিছুমাত্র সংস্রব না থাকিলে ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য এরূপ আগ্রহ কেন,—তাহা কিন্তু সবিশেষ কৌতুকাবহ। অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হওয়া বিচিত্র নহে,—বোধ হয় এই জন্যই তাঁহারা এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন!

যে সকল অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হইবার সম্ভাবনা, সেগুলি বড়ই গুরুতর। পলাশিক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াই মীরজাফর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু পরিণামদর্শী কর্ণেল ক্লাইব তাঁহাকে বিজয়োৎসবের অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য উত্তেজনা করেন। মীরজাফর রাজধানীতে উপনীত হইলেও, ক্লাইব সহসা রাজধানীতে পদার্পণ না করিয়া কয়েকদিবস নগরোপকণ্ঠেই কালযাপন করেন;—কেহ কেহ বলেন যে ইহার মধ্যেও ক্লাইবের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ¶ ক্লাইব যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহই এরূপ তর্ক করিতে পারেন না যে, তিনি

* In justice to the memory of Colonel Clive, I think it requisite to state, that *none of the native historians*, impute any participation in the death of Sirajuddowla to him.—Stewart.

† Siraj-ud-Dowla was put to death at the instigation of the English Chiefs and Jagat Seth.—Riyaz-us-Salateen.

‡ I am indebted to it (Riyaz) for the idea of this work, and for the general out-line.—Stewart.

§ I do not understand why Stewart says that no native writer charges Clive with complicity.—H. Beveridge, C. S.

¶ Clive purposely delayed entering Moorshidabad after the battle of Plassey—H. Beveridge, C. S.

অকারণে মীরজাফরকে উত্তেজনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসে যাহাই লিখিত হউক না কেন, পলাশির যুদ্ধ যে যুদ্ধাভিনয় মাত্র * ক্লাইবের মনে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলে নিশ্চয়ই ইংরাজের চিরশত্রু ফরাসিদলে যোগদান করিয়া ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন। তিনি আত্মপক্ষ সবুগ্র করিবার জন্যই যে সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, তাঁহার উত্তেজনাই যে সিরাজ-দ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের মূলকারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না! পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আবার দৃঢ়তর হইয়া উঠে। ক্লাইব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে,—যদিও কিছু-মাত্র আবশ্যক ছিল না, তথাপি মীরজাফর তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, সিপাহীদিগের ক্ষেপিয়া উঠিবার উপক্রম দেখিয়া সিংহাসন রক্ষার্থই সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা প্রয়োজন হইয়াছিল!" † ক্লাইবের কথার আভাসে বোধ হয়, তিনি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন নাই! ‡

যাঁহারা অন্ধকূপহত্যার জন্য সিরাজদ্দৌলাকেও অপরাধী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের একটি প্রধান তর্ক এই যে,—'স্বয়ং অন্ধকূপহত্যার আদেশ দেওয়ার প্রমাণ না থাকিলেও সিরাজদ্দৌলা যখন তজ্জন্য কাহাকেও তিরস্কার করেন নাই, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার দেখিয়াই মনে হয় যে তিনিও ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন।' § এরূপ তর্কপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে, ক্লাইবের পরবর্ত্তী ব্যবহার দেখিয়া কিরূপ সিদ্ধান্ত করিব? তিনিও ত সিরাজ-দ্দৌলার হত্যাপরাধের জন্য আকারে ইঙ্গিতে কোনরূপেই মীরজাফরকে কিছুমাত্র তিরস্কার করেন নাই; বরং প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না! ক্লাইবের বাক্য এবং কার্য্য সমালোচনা করিলে কি স্বভাবতই বিশ্বাস হয় না যে, তিনিও সিংহাসনরক্ষার্থ সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিয়া গিয়াছেন?

এই সকল ব্যবহারের সহিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিনের' সুস্পষ্ট অভিযোগ সম্মিলিত করিলে, কেমন করিয়া বলিব যে, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবের বীরচরিত্র কলঙ্কিত

* মুসলমান-ইতিহাস-লেখক মর্ম্মাহত হৃদয়ে লিখিয়া গিয়াছেন:—This is the battle in which India was lost for the Islam.—Tarikh-i-Mansuri.

† Meer Jaffier apologised for his conduct, by saying that he (Sirajadowla) had raised a mutiny among the troops.—First Report, 1772.

‡ Macaulay dexterously uses some expressions in Clive's report as a tribute from Mir Jaffar to the English character. The comment is a fair one, but Clive's words rather imply that he thought Mir Jaffar's excuses superfluous. He says that Mir Jaffar "thought it *necessary* to palliate the matter on motives of policy."—H. Beveridge, C. S.

§ Thornton's History of the British Empire, vol. I.

হয় নাই? তাঁহাকে পলাশিবিজেতা মহাবীর বলিয়া যাঁহারা জয়মাল্য সমর্পণ করিবার জন্য সগৌরবে জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই "রিয়াজ-উস্-সালাতিনের" অভিযোগের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই!

ইতিহাস-লেখকেরা সিরাজদ্দৌলাকে পরমপাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত নরাধম (অথচ) রণভীরু কাপুরুষ সাজাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব নিজে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন কিনা তাহা সবিশেষ সন্দেহের বিষয়। সিরাজদ্দৌলা কিরূপ প্রকৃতির তেজস্বী যুবক, তাঁহার হৃদয়নিহিত ইংরাজবিদ্বেষ কতদূর বদ্ধমূল, শত্রুসংহারে কত অদম্য হৃদয়বেগ,—ক্লাইব তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সিরাজের সহিত ফরাসি সেনার বাহুবল মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই শিহরিয়া উঠিতেন, এবং মসিয় লকে সিরাজদ্দৌলার দরবার হইতে তাড়িত করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশলজাল বিস্তার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার চক্রান্তেই মসিয় ল আজিমাবাদে তাড়িত হইয়াছিলেন। * গমনকালে মসিয় ল সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই, সিরাজদ্দৌলাও বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক বুঝিলেই তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করা হইবে। এ সকল কথা ইংরাজদিগের নিকট লুক্কায়িত ছিল না; সুতরাং সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলেই যে মসিয় লয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের সর্ব্বনাশ করিবেন, ক্লাইবের সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ ছিল না। এই জন্যই সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করা ক্লাইবের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্যই প্রথম সন্দর্শনের শিষ্টাচার শেষ না হইতেই তিনি মীরজাফরকে উত্তেজনা করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার উত্তেজনাক্রমে সিরাজ কারারুদ্ধ ও নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেও তদুপলক্ষে তিনি কোনরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই!

ক্লাইব ইতিপূর্ব্বে মাদ্রাজে সেনাচালনা করিবার সময়েও ঠিক এইরূপ একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মুসলমান সুবেদার নিজাম উল্-মোল্কের পরলোকগমনের পর দাক্ষিণাত্যে তুমুল অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। পরসাম্রাজ্যলিপ্সু রাজনীতিবিশারদ ফরাসি সেনাপতি ডুপ্লে বাহাদুর সেই অন্তর্বিপ্লবের ছিদ্রলাভ করিয়া কর্ণাটের নবাব এবং হায়দ্রাবাদের নিজামকে গৃহতাড়িত করিয়া চান্দা সাহেবকে কর্ণাটে এবং মীরজাফাকে হায়দ্রাবাদে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যে ফরাসিরাজশক্তি সুদৃঢ় করিবার আশায় ডুপ্লেফতেহাবাদ নামে নগর পত্তন করিয়া তথায় এক অত্যুচ্চ বিজয়স্তম্ভ গঠন করেন। ইংরাজেরা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য কর্ণাটের সিংহাসন-প্রার্থী মহম্মদ আলির পক্ষাবলম্বী হইয়া কর্ণেল ক্লাইবকেই সেনাচালনার ভার প্রদান করেন। ক্লাইব মহারাষ্ট্রবাহিনীর সহায়তা লাভ করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই ডুপ্লেফতেহাবাদের জয়স্তম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু চান্দা সাহেব জীবিত থাকিতে রণকোলাহল শান্তিলাভ

* Col. Clive was successful in this affair also.—Tarikh-i-Mansuri.

করিল না। ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রবাহিনীর সমবেত অধ্যবসায়ে হতভাগ্য চান্দা সাহেব অকস্মাৎ কারারুদ্ধ হইয়া গোপনে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন! ক্লাইবের নামে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন,—"ক্লাইব ইহার কিছুই জানিতেন না। বোধ হয় মহম্মদ আলির চক্রান্তেই চান্দা সাহেব নিহত হইয়াছিলেন।"* সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধও যে এইরূপে একাকী মীরজাফরের সপ্তদশবর্ষীয় হতভাগ্য পুত্র যুবরাজ মীরণের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

ক্লাইব যে কিছুই জানিতেন না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"সিরাজদ্দৌলাকে যে দিবস মুরশিদাবাদে আনয়ন করে সেই দিন—তৎক্ষণাৎ—কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দুর্ব্বৃত্ত মীরণ তাঁহাকে গোপনে নিহত করেন। মীরজাফর এবং ক্লাইব তখন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থান করিতেছিলেন,—সুতরাং পূর্ব্বতীরস্থিত মীরণের রাজপ্রাসাদে কখন্ কি হইয়া গেল, তাহা ক্লাইব অথবা মীরজাফর কেহই কিছুমাত্র জানিবার অবসর পাইলেন না!" কথাগুলি সত্য হইলে ইহা ক্লাইবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাধী না হইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাস-লেখকদিগের এই সকল কথা কতদূর সত্য তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এবং মীরণ পূর্ব্বতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—এ বিষয়ে ইতিহাসে কোনরূপ মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থান করিবার সময়েই রাজমহল হইতে সংবাদ আসিল যে সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদে চক্রান্তকারিগণ উৎফুল্ল হইতে পারেন, কিন্তু সিপাহীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং কিছু কিছু অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল! † ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া কালগণনা করিতেছিলেন, তাঁহারা সিরাজকে রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য যথোপযুক্ত শরীর রক্ষক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মীরণ ভিন্ন আর কে উপযুক্ত পাত্র? সুতরাং মীরণকেই রাজমহলে প্রেরণ করা হইল। অন্য লোকে হয়ত উৎকোচলোভে বা নাগরিক-ভয়ে সিরাজদ্দৌলাকে ছাড়িয়া দিতে পারে,—মীরজাফরের উত্তরাধিকারী মীরণের প্রতি সেরূপ সন্দেহের কারণ নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল গমন ও তথা হইতে সিরাজদ্দৌলাকে লইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে দুই দিবসের আবশ্যক; এই দুই দিবসের মধ্যেও কি এত বড় গুরুতর কথা আদৌ ক্লাইবের কর্ণগোচর হয় নাই?

* Chanda Shahib fell into hands of the Marhattas, and was put to death, at the instigation *probably* of his competitor Mahomet Ali.—Macaulay's Lord Clive.

† (When) news came to the city that Sirajadowla, was taken, the report excited murmurs amongst a great party of the army encamped around.—Orme, ii. 183.

সিরাজদ্দৌলা কবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিলেন সে বিষয় এখনও রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। ক্লাইব, স্ক্রাফটন এবং মুতক্ষরীণ-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলাকে যেমন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল অমনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া মীরণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন;—সুতরাং কাহারও কিছু জানিবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু ক্লাইব, স্ক্রাফটন এবং গোলাম হোসেন, এই তিন-জন সমসাময়িক দর্শক রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়াও তাঁহাদের এই উক্তি সমর্থন করিতে পারেন নাই। ক্লাইব বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ২রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন; * গোলাম হোসেন বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ৩রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন; † স্ক্রাফটন বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ৪ঠা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন! ‡ সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ অনৈক্য দেখিয়া সহজেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। সিরাজদ্দৌলার মুর্শিদাবাদে আগমন ও তাঁহার হত্যাকাণ্ড যে একদিনেই সংঘটিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই কেহ কিছু জানিবার অবসর পান নাই, এই কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ইঁহারা বিশেষ গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। সত্যগোপনের চেষ্টা করিতে গিয়াই কি এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই?

সিরাজদ্দৌলাকে যখন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল তখন তাঁহাকে পশ্চিমতীরবর্ত্তী হিরা-ঝিলের রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের নিকট উপনীত করাই সম্ভব, না তাঁহাকে পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মীরণের রাজবাটীতে আনয়ন করাই সম্ভব? যাঁহারা ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বলেন যে, সিরাজকে আদৌ পশ্চিমতীরে আনয়ন করা হয় নাই,—সুতরাং ক্লাইব তাঁহার আগমনসংবাদও জানিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সিরাজদ্দৌলাকে কোথায় আনয়ন করিয়াছিল, তাহার উপরেই প্রকৃত তর্ক নির্ভর করিতেছে। অর্ম্মিলিখিত আদিম ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে:—"কারারক্ষিগণ সিরাজদ্দৌলাকে নিশীথ সময়ে দস্যু তস্করের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ কলেবরে মীরজাফরের সম্মুখে উপনীত করিয়া দিল;—যে রাজপ্রাসাদে কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা অখণ্ডপ্রতাপে রাজগৌরব সম্ভোগ করিতেন, সেই রাজপ্রাসাদেই তাঁহাকে বন্দীবেশে প্রবেশ করিতে হইল! মীরজাফরও ইহা দেখিয়া বিগলিত হইলেন,—সিরাজ তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ জীবনভিক্ষা করিতে লাগিলেন, মীরজাফর সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রচার করিলেন!" §

* Clive's Evidence. † ১৫ সাওয়াল। মুতক্ষরীণ।

‡ Scrafton's Reflections.

§ In this manner, they brought him, about midnight, as a common felon, into the presence of Meer Jaffier; *in the very palace* which a few days before had been the seat of his own residence and despotic authority. It is said that Jaffier seemed to be moved with compassion, and well he might, for he owed all his former fortunes

সিরাজদ্দৌলা স্থানান্তরে নীত হইলেন বটে, কিন্তু মীরজাফর তাঁহার ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। এই সময়ে রাজকার্য্যোপলক্ষে পাত্রমিত্রগণ সকলেই হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন; মীরজাফর তাঁহাদের সকলেরই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভার মন্তব্য পুস্তকে প্রকাশ যে, সকলেই একবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার পরামর্শদান করেন। * কিন্তু অর্ম্মিলিখিত ইতিহাসে এই মন্ত্রণাসভার সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। অর্ম্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"যাঁহারা ইতি-পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেন এমন অনেক লোকে এখন সময় পাইয়া তাঁহার নামে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ আত্মস্বার্থ-রক্ষার জন্য নূতন নবাবকে নরহত্যার প্রশ্রয় দিতে সাহস পাইলেন না; অনেকে মীরজা-ফরকে বশীভূত রাখিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে জীবিত রাখাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন;—ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে সিরাজকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হউক। মীরণের মত তাহা নহে। সিরাজদ্দৌলা জীবিত থাকিলে সর্ব্বদাই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া মীরজাফরের সিংহাসন আপদসঙ্কুল হইবে বলিয়া যে সকল কূটনীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধারণা, তাঁহারা মীরণের পক্ষ সমর্থন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্যই পরামর্শদান করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শই অবশেষে কার্য্যে পরিণত হইল!" †

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে, এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, মীরজাফরের সপ্তদশ-বর্ষীয় হতভাগ্য পুত্র মীরণকে অপরাধী করিতে সাহস হয় না। মীরণের দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রই যদি সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের একমাত্র কারণ হইত, তবে মীরণ তাঁহাকে রাজমহলে অথবা

to the generosity and favour of Aliverdi, who died in firm reliance, that Jaffier would repay his bounties by attachment and fidelity to this his darling adoption, who himself, to Jaffier at least, was no criminal.—Orme, ii. 183.

* Meer Jaffier immediately held a council of his most intimate friends, about the disposal of Sirajadowla; *all agreed* it would be dangerous to grant him his life.—First Report, 1772.

† Most of the principal men in the Government were at this time in the Palace, * * * All these Jaffier consulted. Some, although they had before trembled at the frown of Serajadowla, now despised the meanness of his nature more than they had dreaded the malignancy of his despotism; others, for their own sakes, did not choose to encourage their new soverign in despotic acts of bloodshed; some were actuated by veneration for the memory of Aliverdi; others wished to preserve Sirajadowla, either as a resource to themselves, or as a restraint upon Meer Jaffier; all these proposed a strict but mild imprisonment. But the rest, who were more subtle courtiers, seconded the proposal of Meerun respecting the risks of revolt and revolution to which the Government of Jaffier would be continually exposed whilst Sirajadowla lived.—Orme, ii. 184.

পথিমধ্যে যে কোনস্থানে হত্যা করিলেই ত সকল গোলযোগের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিতেন। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য পাত্রমিত্র হইয়া মন্ত্রণা করিবার প্রয়োজন হইত না!

সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ, তাঁহাকে রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিবার প্রস্তাব যাঁহাদের নিকট সুপরিচিত, সেই ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব তখন মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য তাঁহার সহিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা,—তাঁহার কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় স্বয়ং মীরজাফর পর্য্যন্তও তটস্থ। তাঁহাকে কিছুমাত্র না জানাইয়া মীরজাফর কি এরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইয়াছিলেন?

মীরজাফর নিজে সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের তর্ক বিতর্কে কোন পক্ষেই সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই।* যাঁহারা তাঁহার পাপপথের সহচর তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্বার্থরক্ষার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি সিরাজদ্দৌলা নিহত হইলেন কেন? কাহার অনুরোধ প্রবল হইল?—যাঁহারা কূটনীতি-বিশারদ তাঁহাদের মতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কূটনীতি-বিশারদ কে? যাঁহার পরামর্শে বা ইঙ্গিতে মীরজাফরের আত্মহৃদয়ের স্নেহমমতা ভাসিয়া গিয়াছিল, অবশেষে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিরস্ত করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম গোপন করিবার জন্যই কি ইতিহাসলেখকেরা সপ্তদশবর্ষীয় মুসলমানশিশুর নামে রাজহত্যার দুরপনেয় কলঙ্ক নিক্ষেপ করেন নাই? আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সকলেই জানিতেন কিন্তু কেহই তাহা দন্তস্ফুট করিতে সাহস না পাইয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা পদবিদলিত করিয়া গিয়াছেন; সেই জন্য একমাত্র রিয়াজ-উস্-সালাতিনের অভিযোগ ভিন্ন ক্লাইবের নামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হত্যাপরাধের কিছুমাত্র প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না!

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লাইবের বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই বলিয়াই তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিতে পারা যায় না! তিনি ইচ্ছা করিলে যে অনায়াসেই সিরাজদ্দৌলার জীবনরক্ষা করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং প্রকারান্তরে মীরজাফরের কার্য্য সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন, যে সিংহাসন রক্ষার জন্যই এরূপ হত্যাকাণ্ড আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল! যাঁহার নিকট জালসন্ধিপত্র এবং উমাচরণকে প্রতারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, বরং "আবশ্যক হইলে আরও একশতবার সেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিত," তাঁহার নিকট যে সিংহাসন রক্ষার্থ সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বোধ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

যাহারা সাধারণ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য কোনরূপ গুপ্ত

* Jaffier himself gave no opinion.—Orme, ii. 184.

চক্রান্তে মিলিত হয়, তাহারা সভ্যসমাজের বিচারে একে অপরের কৃতকার্য্যের জন্য অপরাধী হইয়া থাকে। ইংরাজ বাঙ্গালী গুপ্তচক্রান্তে মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনরূপ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিয়া সমরজয় করেন। তাহার পর সিরাজদ্দৌলাকে রক্ষা করা বা তাঁহার জীবনদান করা দূরে থাকুক, একজন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য অপরকে উত্তেজিত করেন,সেই উত্তেজনায় সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়া ক্লাইবের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিহত হইয়া থাকিলেও ক্লাইবের কলঙ্কমোচন হয় না। সামরিক ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার প্রয়োজন না থাকিতে পারে,—স্বার্থই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে সকল কার্য্যই প্রশংসিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের নিকট ন্যায় অন্যায়ের মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে। সিরাজদ্দৌলা অন্যায়রূপে নিহত হইয়াছিলেন কি না একমাত্র ইতিহাসই তাহার বিচারক। যদি কখন এ দেশের ইতিহাস যথাযথরূপে সঙ্কলিত হইতে পারে, তবে সে ইতিহাস সভ্যজগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া দিবে,—ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই কূটনীতিবিশারদ মহাবীর, কিন্তু উভয়েই রাজবিদ্রোহী, উভয়েই বিশ্বাসঘাতক, উভয়েই রাজহন্তা!

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থিত বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের একাংশের নাম জাফরাগঞ্জ।* নবাব আলিবর্দ্দীর স্নেহানুপালিত মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ এই স্থানে বহুব্যয়ে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—সেই সূত্রে স্থানের নামও 'জাফরাগঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। একসময়ে জাফরাগঞ্জ এবং হিরাঝিলের সৌধশোভায় মুরশিদাবাদের নাগরিক-সৌন্দর্য্য সবিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পুরাতন ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, ভাগীরথীর উভয়কূলের পূর্ব্বশোভা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; তৎসঙ্গে জাফরাগঞ্জের নবাববাটীও কথঞ্চিৎ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু পলাশি এবং জাফরাগঞ্জ বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে;—পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়, জাফরাগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড!

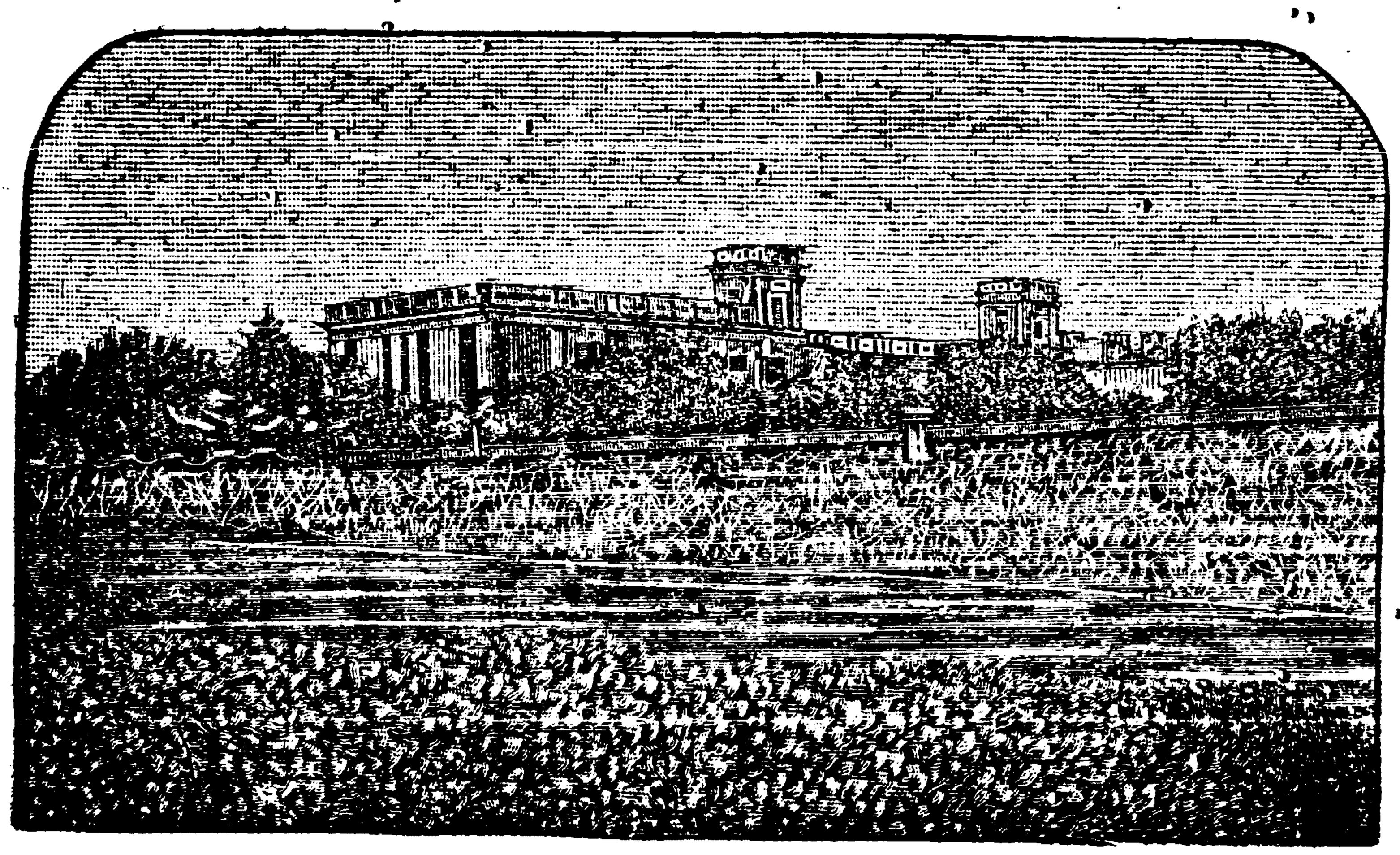

জাফরাগঞ্জ।

* Mir Jaffar lived at Jaffraganj, on the left bank, *i.e.* on Kasimbazar island, and the descendants of his son Miran still reside there.—H. Beveridge, c. s.

ঐই ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের পূর্ব্বজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তিনি হিরাঝিল অধিকার করায়, জাফরাগঞ্জ যুবরাজ মীরণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল;—সেই সময় হইতে মীরণের বংশধরগণ এই রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া আসিতেছেন!

মীরজাফরের মন্ত্রণাসভায় সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে, তাঁহাকে জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতল নিভৃত কক্ষে গোপনে কারারুদ্ধ করা হয়।* জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদ সিরাজদ্দৌলার অপরিচিত নহে;—পলাশি-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি মীরজাফরের মতিভ্রম দূর করিবার জন্য ইস্‌লামের গৌরবরক্ষার্থ আত্মগৌরব তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং শিবিকারোহণে মীরজাফরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার আগমন-সংবাদে জাফরাগঞ্জের সেনা এবং সেনানায়কগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কত আগ্রহের সহিত সসম্মানে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়াছিল! আজ সিরাজদ্দৌলা শৃঙ্খলিতচরণে সেই চিরপরিচিত তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইবার সময়ে, কেহ অভ্যাসবশতঃও অভিবাদন করিল না; সেই বিচিত্র অট্টালিকার প্রত্যেক কক্ষবাতায়ন হইতেই যেন প্রবলপ্রতিহিংসাতাড়িত বিকট অট্টহাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজদ্দৌলা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন; তথাপি সে সময়ে তাঁহার অধীর হৃদয়ে কত কি ভীষণচিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

একাকী অন্ধকার কারাকক্ষে নিপতিত হইয়া বোধ হয় জীবনের আশা আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল! শত্রুহস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াও যে এতদিন জীবিত রহিয়াছেন; ইহাতেই বোধ হয় সিরাজদ্দৌলা ভাবিয়াছিলেন যে, মীরজাফর হয়ত আত্মহৃদয়ের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিতে না পারিয়া কোনরূপে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া জীবনরক্ষা করিবেন।

সিরাজদ্দৌলাকে জীবনদান করিতে সাহস হইল না; রাজসিংহাসন নিরাপদ করিবার জন্য আত্মহৃদয়ের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিতে হইল; স্পষ্টতঃ না হউক, প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার জন্যই তাঁহাকে মীরণের তত্ত্বাধীনে জাফরাগঞ্জে কারারুদ্ধ হইতে হইল! কিন্তু হায়! যাহাকেই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করা হইল, সে-ই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল; কেহই সহজে সম্মত হইল না। সিরাজদ্দৌলার নামে ইতিহাসে যত কলঙ্ক স্থানলাভ করিয়াছে, মুরশিদাবাদের লোকে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। তাহারা জানিত সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা, ফিরিঙ্গীর শত্রু, আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তলী, সুকুমারকান্তি তরুণ যুবক, অশান্ত—যৌবনোন্মত্ত—উচ্ছৃঙ্খল—প্রবল প্রতাপান্বিত সুবাদার, সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে তাঁহার দোষের কথা

* A small enclosure is shewn as the scene of his fate; but the room or closet which once stood there, and in which he was confined and put to death, has disappeared.—H. Beveridge, c. s.

ভুলিয়া গিয়া ভাগ্যবিবর্ত্তনের কথা লইয়াই হাহাকার করিতেছিল।* এরূপ অবস্থায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান মাত্রেই যে তাঁহাকে হত্যা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।†

এ জগতে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্যও অবশেষে একজন দুরাত্মা অর্থলোভে শাণিত খরসান অস্ত্র গ্রহণ করিল! এই ব্যক্তির নাম মহম্মদী বেগ,—আবাল্য আলিবর্দ্দী এবং সিরাজদ্দৌলার স্নেহানুকম্পায় প্রতিপালিত হইয়া তাহার ঘৃণিত জীবন অবশেষে অর্থলোভে মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল।‡ সিরাজের মাতামহী একটি অনাথা মুসলমান বালিকাকে সন্ততিনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া মহম্মদী বেগের সহিত বিবাহ দিয়া দয়া প্রকাশে ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন § তদুপলক্ষে মহম্মদী বেগ সিরাজের সংসারে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিয়াছিল। হতভাগা সমস্ত পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া প্রভুহত্যার জন্য অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে, যাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার্থ ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকট দায়ী হইয়াও পাকে চক্রে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া অন্নদাতা রাজাধিরাজকে দস্যু তস্করের ন্যায় হত্যা করিবার জন্য নির্ম্মম হৃদয়ে কারারুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া স্নেহানুপালিত মহম্মদী বেগ যে প্রতিপালকের মস্তকে খড়্গাঘাত করিবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

উন্মুক্ত খরসান হস্তে দুর্দ্দান্ত মহম্মদী বেগ কারাকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা উন্মত্তবৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আশা বিলীন হইয়া গেল; মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এক অব্যক্ত আকুল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন:—

"কে? মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমি! তুমিই কি অবশেষে আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ? কেন? কেন? কেন? ইহারা কি আমাকে বহুবিস্তৃত জন্মভূমির নিভৃত নিকেতনে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিল না!"

* When the people beheld him in this situation, they forgot his vices, and recollected only the hardship of his present fortune, comparing it with the splendour they had seen him surrounded with from his infancy till now.—Scott's History of Bengal, p. 371.

† He ordered Serajedowla to be confined and put to death, but no person of rank would undertake the murder.—Scott's History of Bengal, p. 371.

‡ মুতক্ষরীণ।

§ At length, a wretch named Mahummady Beg, who from his infancy had been cherished by Mahubut Jung and Seraja-Dowla, from whose grandmother he had received a portion with his wife from charity, offered to execute the horrid deed.—Scott's History of Bengal, p. 372.

পরক্ষণেই সিরাজদ্দৌলার তেজস্বী হৃদয়ের আত্মগরিমা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি মহম্মদী বেগের নিকট আর কাতরোক্তি করিলেন না ;—তাহার মুখের ভীষণ সংকল্পের পাপকথায় কর্ণপাত করিলেন না ;—নিজেই বলিয়া উঠিলেন :—

"না—না—আমি বাঁচিতে পারি না! তাহা কদাচ হইতে পারে না! আর কোন অপরাধে না হউক,—হোসেনকুলী! তোমাকে যে স্বহস্তে নিধন করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এ জীবনের অবসান হউক!'*

পরে মহম্মদী বেগের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আইস—রহ—রহ—জল দাও—একবার অন্তিমের দেবতার নিকট এ জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া লই!" †

সিরাজদ্দৌলা নিরুদ্বেগে জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না ;—দুরাত্মা মহম্মদী বেগ ভগবানের পবিত্র নামের পুণ্যপ্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, সিরাজদ্দৌলার অন্তিম প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই, প্রচণ্ডবেগে তাঁহার স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিল! ‡ নিদারুণ প্রহার-যাতনায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলা রুধিরাক্ত কলেবরে কক্ষমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন ; মহম্মদী বেগ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার উপর উপর্য্যুপরি খড়্গাঘাত করিতে লাগিল!

"আর না—আর না—আর না—হোসেনকুলী! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক!!" § মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ;—সিরাজদ্দৌলার অমর আত্মা পাপপূর্ণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র কারাকক্ষ অতিক্রম করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিল। ¶

তাহার পর কি হইল? মুর্শিদাবাদের নরনারী এই রাজহত্যার আকস্মিক সংবাদে হাহাকার করিয়া উঠিল ; তাহাদিগের আকুল আর্ত্তনাদ মুসলমানের উচ্চ অবরোধবেষ্টিত বেগম-

* Stewart's History of Bengal.

† At length he recovered sufficiently to ask leave to make his ablutions, and to say his prayers.—Orme, ii. 184.

‡ মুতক্ষরীণ।

§ "Enough!—enough!—Hussein Cooly, thou art revenged."—Stewart.

¶ সিরাজদ্দৌলা এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে ইতিহাসলেখকেরা বোধ হয় তাঁহার প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। ষ্টুয়ার্ট সিরাজের অন্তিম উক্তি লইয়াও পরিহাসচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন :—"This is, perhaps, a solitary instance of a native of Hindoostan expressing a consciousness of guilt on his death-bed. Being absolute predestinarians they lay the fault to fate ; and, after a life spent in every species of atrocity, pass their last moments in tranquility."—Stewart.

মহলে প্রবিষ্ট হইয়া সিরাজজননী আমিনাবেগমের কর্ণগোচর হইল! বিদ্রোহীদল তখন বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া সিরাজের ক্ষতবিক্ষত শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে সংস্থাপন করিয়া, নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছিলেন। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল ; সিরাজজননী হাহাকার করিতে করিতে লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজপথে আসিয়া, ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া শববাহক হস্তি সহসা রাজপথে বসিয়া পড়িল ;—স্নেহময়ী জননী সন্তানের মাংসপিণ্ড বুকে ধরিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন!! মীরজাফরের অনুচর কদম হোসেন তখন নানারূপ তাড়না করিয়া সিরাজজননী আমিনা বেগমকে পুনরায় অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করিয়া, সিরাজের শবদেহ সমাধিনিহিত করিবার জন্য ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী আলিবর্দ্দীর সমাধিমন্দিরে উপনীত করিল। * এই ঐতিহাসিক সমাধিমন্দিরে আলিবর্দ্দী মহবৎজঙ্গের চরণতলে সিরাজের মাংসপিণ্ড নীরবে সমাধিনিহিত হইল ;—এই সমাধিমন্দিরই এখন সিরাজদ্দৌলার একমাত্র শেষ নিদর্শন! †

সমাপ্ত ‡

কাহাকে।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিদি সব শুনিয়া আমার উপরই, অসন্তুষ্ট হইলেন,—আমাকেই দোষ দিতে লাগলেন। তিনি বলিলেন,—"এখন বোঝা যাচ্ছে মিশ কয়ের সঙ্গে তার বিয়ের গুজব উঠেছে কেন, তোরই দোষে দেখছি তা ঘটেছে। সব কথা ত আগে আমাকে খুলে বলিস নি ; আমি কি করে জানব—ভিতরে ভিতরে তোদের এত কাণ্ড হয়েছে ; আমি ভাবছি—ভালয় ভালয় সব গোলযোগ মিটে গেল—বাঁচা গেল। মিটমাট যে শুধু তোর মনে মনে তাত আর বুঝিনি তখন ; সে বেচারাই বা কি ক'রে তা বুঝবে বল? প্রথমে ত তাকে স্পষ্ট

* মুতক্ষরীণ।

† The populace beheld the procession with awe and consternation, and the soldiery, having no longer the option of two lords, accepted the promises of Jaffier, and refrained from tumult.—Orme, ii, 184.

‡ চৈত্র সংখ্যায় 'উপসংহার' প্রকাশিত হইবে। 'সাধনা' ও 'ভারতীতে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। লেখকের বিনীত নিবেদন, যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অথবা সমালোচনার জন্য এই প্রবন্ধগুলির ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত সিরাজদ্দৌলাই অবলম্বন করেন।

করে বলে দিলি বিয়ে করবিনে; তার পরে সে তার জীবন মরণ মিনতি জানালে যখন, তখনও একটি কথা কইলিনে, মফঃস্বলে গিয়েও সাধ্যসাধনা করে চিঠি লিখলে, চিঠির এক লাইন উত্তর পর্য্যন্ত দিলিনে; এতে মানুষ কি ভাবে বল দেখি? তার ত মানুষের প্রাণ—না সে পাথর? এত উপেক্ষার পর তবুও যে সে আবার এ বাড়ীতে এসে তোর সঙ্গে দেখা করে, বিয়ে সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেছে,—এতে আমি ত তাকে খুবই ভাল বলি; তার ভদ্রতা সৌজন্যের পরিচয় এতে খুবই পাওয়া যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "তা হতে পারে—কিন্তু যে রকম করে সে মত জিজ্ঞাসা করেছেন তাতে ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কি?"

"ভালবাসার অভাব আমি ত এতে কিছুই দেখছিনে। হাজার ভালবাসলেও যদি জানা যায় সে আমাকে চায় না—তাহলে যার একটু আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—সে কি আর প্রেমের দোহাই দিয়ে কথা কইতে পারে?"

"কিন্তু তিনি যখন বল্লেন—এ বিয়ে না হলে আপনার কিরূপ ক্ষতি তাই বিবেচনা করেই বিয়ে করা না করা স্থির করুন—আমি ভালবাসি—বা না বিয়ে হলে আমার কষ্ট হবে—এরূপ ভাববেন না;—তখন কি আমি বলব নাকি—হাঁ আপনি ভাল বাসুন না বাসুন তাতে কিছু আসে যায় না, আমার মঙ্গলের জন্যই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত। তাঁরই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—আর আমার কিছুমাত্র নেই!"

"তুইই তার প্রতি অন্যায় করেছিস—তার মনে আঘাত দিয়েছিস সে জন্যে তুই যদি নিজের ভুল, নিজের দোষ স্বীকার করে, তার কষ্ট দূর করতে যেতিস—তাহলে তাতে কি ক'রে যে তোর আত্মসম্মানের হানি হোত তাত আমি বুঝতে পারিনে। তবে সত্যি যদি এড়াবার অভিপ্রায়েই সে তোকে অমন ক'রে বলে থাকে, তাহলেও তাকে সে কথা স্পষ্ট করে বলবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। এখন দাঁড়াচ্ছে এই,—তোর ইচ্ছা নেই ব'লেই সে বিয়ে ভাঙ্গতে বাধ্য হয়েছে; দোষটা সমস্ত এক তরফেরই।"

আমার দিকটি দিদির কিছুতে চোখে পড়িল না; তিনি কেবল দেখিতে লাগিলেন—আমিই তাঁহাকে অন্যায়রূপে উপেক্ষা করিয়া, অকারণে আমার নিজেরই সুখসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি! সুপাত্রে ন্যস্ত হওয়াই কন্যা-জীবনের চরম সৌভাগ্য,—পরম সার্থকতা। গুণবান স্বামীর সোহাগে যে সোহাগিনী—তাহার নিকট অন্য আকাঙ্ক্ষনীয় প্রার্থনীয় বিষয় আর কি আছে? স্বামীর সোহাগের ঘরে শত দুঃখও দুঃখের নহে—আর ইহার অভাবে তাহার জীবন জন্ম নিতান্তই দুঃখময় নিরর্থক বলিয়া অনুভূত। এই ভাব হইতেই ঘটকালী করিতেও স্ত্রীলোকের এত সুখ; তাহাতে এমন স্বতঃপ্রবৃত্তি। দিদি তাঁহার এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ দৃষ্টি দিয়া এখন কেবল এক পক্ষই দেখিতেছেন—তিনি আমার কিরূপ উপযুক্ত পাত্র, তিনি আমাকে কিরূপ ভাল বাসেন, তাঁহাকে বিবাহ করিলে আমি কিরূপ রূপবান গুণবান স্বামীর প্রেমে সুখী হইতে পারিতাম আর আমার মিথ্যা ছেলেমানষি সেণ্টিমেণ্টের চাপল্যে

তাঁহাকে এবং তাঁহার সেই অমূল্য প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কিরূপ ঈর্ষণীয় অবসর হারাইতেছি! এ অবস্থায় আমার সেণ্টিমেণ্টের গাম্ভীর্য্য কি করিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে প্রকাশ করি—কি করিয়া তাঁহাকে বোঝাই—তাঁহার ওরূপ করিয়া বলার পর আমার আর ভুলস্বীকারের পথ ছিল না, তখন দোষ স্বীকার করিলে আমার হীনতাই প্রকাশ পাইত। দিদির স্নেহ হইতেই যদিও এই কঠোরতার এই নির্ম্মমতার জন্ম,—কিন্তু আমি কি তখন সেই স্নেহ সেই মমতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম,—না তাহা করিলেও তাহাতে আমার ব্যথা লাগিত না? দিদির এই সহানুভূতিহীন দোষারোপে আমার প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া আসিতে লাগিল, অশ্রুজলে অবরুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃই ভাষার শক্তি ভাষার স্বর ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল।

আমাদের দুজনের বাক্‌বিতণ্ডা শেষ না হইতে হইতে ভগিনীপতি আসিয়া বিস্ময়ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"কুমু! What is this?" বলিয়া একখানা খোলা চিঠি দিদির কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন। দিদি নীরবে চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে দিলেন। অক্ষর দেখিয়াই বুঝিলাম—তাঁহার চিঠি।—পড়িয়া দেখিলাম—যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই; তাহাতে আমাদের বিবাহ ভঙ্গের কথা এবং আমার ইচ্ছা ক্রমেই এরূপ হইয়াছে তাঁহাকে যেন দোষী না করা হয়,—এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ।

চিঠি পড়া আমার তখনো শেষ হয় নাই—ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন—"Blackguard! rascal! scoundral! মিশ ককে বিয়ে করতে চায়—তাই এই সব excuse! I will bring a suit against him, I will—upon my honour!",

দিদি বলিলেন—"তা পার কই, যা বলেছে তাত আর মিথ্যা বলেনি; মণির কথাতেই ত বিয়ে ভেঙ্গেছে?"

"মণির কথাতেই বিয়ে ভেঙ্গেছে? you mean মণির ইচ্ছাতে? বিলাতের সেই engagement ব্যাপার নিয়ে? তুমিত বলেছিলে সে সব মিটমাট হয়ে গেছে! Is she mad, or what new freak of hers is this now?"

"আমি তাই ভেবেছিলুম—যে মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু এখন দেখছি ঠিক মেটেনি"

"Oh Frailty! thy name is woman! কথাটা দেখছি খুবই ঠিক! সামান্য অপরাধে এত কেন? এই ত তোমাদের শিক্ষার উদারতা? স্বাধীনতার ফল! I don't know what to do! I think I shall go mad'!"

এইরূপ তিরস্কার এইরূপ অপবাদ নীরবে আত্মসাৎ করিতে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল,—আমার দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে সত্য? কিন্তু সমস্ত অবস্থা জানিলে ভগিনীপতিও কি এ দোষ অমার্জ্জনীয় ভাবিতেন; তাঁহার পুরুষের দৃষ্টিতেও কি ইহার মার্জ্জনীয় দিক প্রকাশিত হইত না? কিন্তু কি করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলি? দিদিকে বলা আর তাঁহাকে বলা ত আর এক কথা নহে।—তথাপি আমি প্রাণপণে বল

সংগ্রহ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলাম—"আমি কি করব! তিনি যখন বল্লেন "বিবাহ না করলে আপনার ক্ষতি হবে কি না কেবল তাই বিবেচনা করেই স্থির করুন বিবাহ করবেন কি না—তখন আমি আর কি বলব? তিনি যদি এর চেয়ে একটুখানি কোমল ভাবে—একটুখানি হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা আমাকে জানাতেন—তাহলে, আমি কি অগ্রাহ্য করতে পারতুম?"

ভগিনীপতি ভ্রুকুটিবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি? 'আপনার ক্ষতি হবে কি না ভেবে বিবাহ স্থির করুন!' Is this a proposal! I see there is a trick in it!"

দিদি বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু আসল ব্যাপার আগে শোন! মফঃস্বলে যাবার আগে সে নিতান্তই অনুনয় বিনয় করে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল; এমন কি তার উপর তার জীবনমরণ নির্ভর এইরূপ জানিয়েছিল—তাপর মফঃস্বল থেকেও সাধ্যসাধনা করে চিঠি লেখে কিন্তু তারও উত্তর পর্য্যন্ত পায় নি; এর পরে মানুষ আবার কি ক'রে তবুও feeling দেখায় বল? তারও ত সহ্যের একটা সীমানা আছে; আমি বলি তুমি তাকে স্পষ্ট করে তার মনের ভাব জিজ্ঞাসা কর—যদি বাস্তবিক তার এড়াবার ভাব হয়—তাও বুঝবে—আর যদি উভয়তঃ ভুল বোঝার জন্য এরূপ ঘটে থাকে তাও সহজে মিটে যাবে—"

আমি আস্তে আস্তে সজলনেত্রে দিদিকে বলিলাম—"দিদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি তাঁর কাছে আর একথা পাড়তে বলো না; একি কেনা বেচা যে আপনার সুবিধা বুঝে ক্রমশঃ দর কমাতে হবে? যদি তিনি সত্যি ভাল বাসেন—ত তিনিই বলবেন। বারণ করো—তাঁকে কোন কথা বলতে"

ভগিনীপতি চিন্তিতচিত্তে গৃহে পাদচারণ করিতেছিলেন; আমার কথায় দিদি কোন কথা কহিবার আগেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"Well! আমি কি করব ঠিক বুঝতে পারছিনে! I am disgusted with the whole thing I must say, দেখা যাক সে আপনা হতে আর কিছু বলে কি না, এদিকে আমিও তার সম্বন্ধে যতটা পারি সব information নেব এখন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কাল টেনিসে আসতে বলেছি—বিলাতের ব্যাপারটাও তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে—তাহলে লোকটার ভাব অনেকটা ঠিক ধরতে পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে আর একটা,—কাল বার-লাইব্রেরিতে ঢুকব কি করে?"

দিদি বলিলেন—"আমি ভাবছি বাবার জন্যে—তাঁর কাণে কথাটা উঠলে তাঁর নাজানি কিরূপ কষ্ট হবে!"

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, এত ভাবনার মধ্যে সেই ভাবনাতেই আমাকে অধিক কাতর করিয়া তুলিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

চারিদিকেই অশান্তি অসুখ, নিরানন্দ ভাব। দিদি স্তব্ধ গম্ভীর, ভগিনীপতি অকারণক্রুদ্ধ,

ভৃত্যদিগের প্রতি অযথা ভর্ৎসনাপরায়ণ, দাসদাসীগণ শশব্যস্ত ত্রস্ত ভীত, এমন কি বাড়ীর গাছপালা ঘরদরজা প্রভৃতি অচেতন জড়পদার্থগুলা পর্য্যন্ত যেন, তাহাদের স্বাভাবিক প্রিয়-দর্শনতা শূন্য, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে কেমন যেন একটা স্তব্ধ অস্বস্তি বিষাদ বিকম্পিত। আমিই ইহার কারণ, আমার মনে কি অন্ধকার গুরুভার! এমন দিনে আবার পিসিমা তাঁহার কন্যা প্রমোদাকে লইয়া এখানে মধ্যাহ্নভোজনে আসিলেন। মনের ভার মনে চাপিয়া আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনে তৎপর হইলাম। প্রমোদা প্রশ্নের উপর প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল "কি হইয়াছে? এত রোগা কেন? এমন বিমর্ষ শুক্‌নো কেন? তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন বলিয়া বুঝি? শীঘ্রই আসিবেন সে জন্য এতটা কেন? বিবাহ ত হইবেই—একটু কি সবুর সয় না,"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আর সেকাল নাই, অন্যান্য অনেক আচার অনুষ্ঠানের ন্যায়—সখীদিগের নিকট মন খুলিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবার প্রথাও নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, একালের মেয়েদের মনের দুঃখ সহজে মুখে ফুটিতে চাহে না; বিশেষতঃ এমনতর দুঃখ, ইহা ত কিছু-তেই প্রকাশের নহে,—আমি মনের কথা মনে রাখিয়া কাষ্ঠ হাসি এবং বাকচাতুরীতে তাহাকে ক্রমশঃ নিরুত্তর করিলাম।

বেলা কাটিল, টেনিসের দল সমাগত হইলেন, বাহিরের ও বাড়ীর লোকে মিলিয়া আমরা সবশুদ্ধ দশজনে বাগানে সমবেত হইলাম। যদিও একটিমাত্র কোর্ট কিন্তু লোক অধিক না হওয়ায় তাহাতে খেলার তেমন অসুবিধা হইল না। পিশিমা খেলেন না—আমিও শারীরিক অবসন্নতার দোহাই দিয়া প্রথম হইতেই দর্শকশ্রেণীভুক্ত, অন্যেরা একদলের বিশ্রামে অপরদল খেলিতে লাগিলেন।

ডাক্তারও আসিয়াছিলেন খেলার অবসরে নিকটে আসিয়া বসিলেন,—স্বাভাবিক মৃদুস্বরে বলিলেন—"আপনাকে ভারী দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! আপনার দিদি বলছিলেন, আপনি ভারী careless, স্বাস্থ্যের দিকে আপনার মোটেই নজর নেই, নভেল পেলে খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যান!"

আমি বলিলাম "কই! আজকাল ত পড়াশুনা একরকম ছেড়ে দিয়েছি বল্লেই হয়।"

প্রমোদা আমার কাছে বসিয়াছিল—সে বলিল—"পড়াশুনা ছেড়েছে কি না জানি না, তবে খাওয়া দাওয়া যে ছেড়েছে তার সাক্ষী আমি দিতে পারি। ডাক্তার মশায় ওকে একটা ওষুধ দিন না।"

ডাক্তার বলিলেন "gladly! আজই একটা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দেব এখন, কিন্তু খাবেন ত?"

আমি গল্প করিতেছিলাম—কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল টেনিস খেলার দিকে, ডাক্তারের প্রশ্নে আমি একটু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ অতি মধুর, তাহাতে আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন ভরিয়া গেল, ব্যথিত অন্তরদেশ হইতে ধীরে ধীরে সুখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল, হৃদয়ের পাষাণভার দ্রব হইয়া অশ্রুতে উথলিয়া উঠিতে চাহিল,

কণ্ঠাগ্রে এই কথাগুলি আসিয়া আবার মিলাইয়া পড়িল—"আপনার ওষুধে কি আমার মনের অসুখ তাড়াতে পারবেন ?"

মনের কথা মনে, চোখের জল চোখে চাপিয়া অমনি নতমুখী হইলাম। এই সময় তাঁহার ডাক পড়িল "I say B,—come on, you are wanted here to make up a new set."

তিনি ইহাতে কোন উত্তর না করিয়া আমাকে বলিলেন "আরবারে আপনাকে যে টনিক দিয়েছিলুম—তাতে কি উপকার হয়েছিল ? কত দিন"—

ভগিনীপতি আবার ডাকিলেন—"I say come on—" চঞ্চল নিকটে আসিয়া বলিল "আপনি আসবেন না ? আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি—" তিনি একটু যেন থতমত খাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "Am I really making you all wait ? Oh it is too bad of me—"

বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন—প্রমোদা বলিল "ডাক্তার খুব ভাল লোক—না ?" আমি কোন উত্তর করিলাম না।

তীব্র রোগাবসানে দুর্ব্বল দেহমনে নবস্বাস্থ্যের সঞ্চারে আবার জগতের দিকে চাহিয়া, আত্মীয় স্বজনের স্নেহাদর অনুভব করিয়া যে অবসাদময় স্বপ্নময় সুখ তাহার আস্বাদ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই আমার তখনকার মনের অবস্থা অনুভব করিতে পারিবেন।

অনুবাদ মালা।

করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে।

(I prithee send me back my heart &c., Sir John Suckling.)

করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে
হৃদয় আমার ফিরিয়া দে।
আপন-হৃদয় নাহি দিবি যদি,
আমার, লইবি কি হিসাবে ?

থাক্, নাহি কাম, লবনা ফিরিয়া,
তাহা ত কেবল বৃথা হবে !
দুনয়নে তোর আছে দুটো চোর,
কতক্ষণ তারা বসে র'বে ?

একটি বক্ষে র'বে দুটি হিয়া,
তবু মিলে নাহি থাকিবে ?
হে প্রেম, কোথায় গুণপণা তব
বিচ্ছেদ যদি রাখিবে ?

প্রেমটা কিন্তু দুর্ব্বোধ এত,
কিছুই বুঝিতে পারিনে ওর।
যবে ভাবি আমি নিশ্চিত অতি,
অতি—সন্দেহ তখনি মোর !

তবে, বিদায় দুঃখ, বিদায় ভাবনা,
আর কভু নাহি কাঁদিব।
আমিও পেয়েছি হৃদয় তাহার
তাই মনে মনে মানিব।

প্রেম ও আশা।

(Moore's "Love and Hope.")

একদা প্রভাতে নিদাঘ-সিন্ধু-তীরে
আশা আর প্রেম শয়ন করিয়া ছিল।
দেখিতে দেখিতে উচ্চে উঠিলে রবি,
প্রেম আপনার নৌকা খুলিয়া দিল।
পড়িয়া রহিল একেলা বালিকা আশা,
হৃদয়ে ভরিয়া দুর্লভ ভালবাসা।

বলেছিল প্রেম—"আহা কি সিন্ধু আজি !
সূর্য্যকিরণে জ্বলিছে স্বর্ণপ্রায় !
যাই একবার, এখনি আসিব ফিরে,"
—বলে' হেসেছিল এমনি মধুর, হায়,—
ছলনা কেমন, আশা কি জানিত কভু ?
ভেবেছিল ত্বরা ফিরিবে হৃদয়-প্রভু !

সারাদিনমান বসিয়া রহিল আশা,
হৃদয়-সখার ভাবনা করিয়া সার।
বালুকা উপরে লিখিল তাহার নাম,—
জলে ধুয়ে যায়,—লিখিল অনেকবার।
এইরূপে ক্রমে দিবস কাটিয়া যায়।
সমুদ্র পরে সোনার গহনা গায়।

দেখা যায় ঐ—আসিছে নৌকা কার ;
ব্যাকুল বালিকা ছুটিল তাহার পানে,
সে যে মনোহর স্বর্ণতরণী খানি,
কে জানে কাহারে বক্ষে বহিয়া আনে !
লাগিল নৌকা ;—বিভব আরোহী তায় ;
আশা-হৃদয়ের প্রেম ত আসেনি হায় !

দ্বিতীয় নৌকা ;—বিমল বন্ধুতার,—
আসিল সেদিকে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালি।
ছুটিল কোমল শীতল আলোকছটা,
সাগর-বেলায় পুলক-প্রবাহ ঢালি।
কিন্তু প্রেমের অতুল আলোক ধার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তেমন কোথায় আর ?

ক্রমে ধীরে ধীরে গভীর অন্ধকার—
বাঁধিল শিকলে পৃথিবী, আকাশ, জল।
দেখা নাহি গেল তরণী দুটিও আর,
চূর্ণ হইল আশার সকল বল।
প্রভাত-স্বপ্ন আঁধারে হইল লীন ;
আর না ফিরিল প্রেম সে হৃদয়-হীন !

নাম-লেখা।

(One day I wrote her name &c. Edmund, Spenser.)

একদা তাহার সাথে সাগরের তীরে
বসিয়া, লিখিনু আমি নামটি তাহার
বালুকায় ; ঢেউগুলি আসি ধীরে ধীরে
মুছে দিয়ে গেল তাহা ; পুনঃ আর বার
লিখিলাম, পুনর্ব্বার গেল ধৌত হয়ে।
তখন কহিল প্রিয়া অনুযোগ-স্বরে,
"ও কি তুমি করিতেছ ? জলরাশি লয়ে
রচিবে কি অট্টালিকা ? যাহা ক্ষণতরে,
অমর হইবে তাহা বল কার বরে ?"
আমি কহিলাম—"প্রিয়া, তোমার আমার
এমন প্রণয়, কভু মরণের করে
নাহি যাবে ; তবে আমি গঙ্গা কবিতার
বহাইব ; তারি মাঝে করিয়া অমর,
রাখিব তোমারে, সখি, যুগযুগান্তর।"

রাম রাজার মুলুক।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

দুইজন হিন্দুস্থানীকে পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভরসা হইল, যেন আনন্দ ও উৎসাহের উৎস উথলিয়া উঠিল। ডান্টের দানবের ন্যায় নবীন তেজে, হজ্‌রৎ আলির তুর্কদেশীয় তুরঙ্গের ন্যায় মহা উৎসাহে এবং লাটিন কবি লিভি-বর্ণিত ট্রয়ের লম্বোদরের ন্যায় তীব্রপদে আমরা বিবিধ বিপণীতে গিয়া পথের যথাযোগ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। উপক্রমণিক কার্য্যাদি যথারীতি সমাপ্ত হইলে বলদশকটের বন্দোবস্ত জন্য "রাজার বাজার" নামক পল্লীতে যাইতে হইল। এই বাজারে বহুসংখ্যক নেপালী গুর্খা বাস করে। সুদূর ত্রিনেবেলী সহরে নেপালের লোকের বসতি হইয়াছে শুনিয়া এক নূতন ঐতিহাসিক চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম; অনুসন্ধানে জানিলাম টাঞ্জোরের পূর্ব্বতন রাজা নেপালে বিবাহ করিয়াছিলেন, মহারাণীর সঙ্গে যে সকল দাস, দাসী এবং কর্ম্মচারী আসিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে টাঞ্জোর হইতে ত্রিনেবেলী পর্য্যন্ত সমুদয় জেলায় বংশ বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। রাজার বাজারে শকট মিলিল না সুতরাং নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে শুনা গেল সহরের পশ্চিম পার্শ্বে বলদশকটাধিকারীদিগের বহুসংখ্যক কার্য্যালয় আছে, তথায় পথিকেরা টাকা দিলে টিকিট পাইয়া থাকে। ত্রিনেবেলীস্থিত এই সকল বলদশকট-কার্য্যালয়ের ইংরাজী নাম Transit Cart office. আমরা যে সময়ে ত্রিনেবেলী গিয়াছিলাম, তখন নগরীতে প্রায় ১৭টি কার্য্যালয় ছিল। একটা অফীশে গেলাম, অধিকারী বলিলেন "কোনও অফীশ হইতেই আপনারা একেবারে ত্রিবাঙ্কোরের গাড়ী বা টিকেট পাইবেন না; প্রথমে যে স্থানের জন্য টিকেট পাইবেন তথায় আমাদের শাখা কার্য্যালয় আছে, তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষ আপনাদিগকে দ্বিতীয় স্থানের টিকিট দিবেন, এইরূপে চারিবার টিকিট লইতে হইবে।" নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না, সুতরাং নিয়মানুসারে আমরা প্রথম স্থানের টিকিট খরিদ করিলাম, ঐ স্থানের নাম মরুণাপুরম্। ভাড়া প্রত্যেক আরোহীর জন্য দুই টাকা। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বলদশকটে আমি, দুইজন হিন্দুস্থানী, গাড়োয়ান এবং কালেক্টর সাহেবপ্রেরিত কনেষ্টবল এই কয়েক জনে আরোহণ করিয়া পরমেশ্বরের পদারবিন্দ স্মরণ করতঃ সেই মজার রাম রাজার মুলুক ভ্রমণে রওয়ানা হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে শকটচালক তাপ্তী নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড ময়দানে গাড়ী থামাইয়া দিল, এখানে বৃটীশ পুলিসের ইনেস্পেক্টর প্রত্যেক গাড়োয়ানের নাম, গাড়ির অধিকারীর নাম, টিকিটের নম্বর, আরোহীদিগের নাম ও বাসস্থান ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া গাড়ির সংখ্যা করিতে লাগিলেন। অনেক বিলম্ব হইল, তথাচ গাড়ী ছাড়িল না। ইনেস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম "শকটগুলি আটক করিয়া রাখিয়াছেন কেন?" ইনেস্পেক্টর উত্তর করিলেন "মহাশয়! এখানকার

নিয়ম এই যে, অন্ততঃ বারখানা গাড়ী একত্র না হইলে রাত্রে আমরা গাড়ী চালাইতে দিই না, যদি বারখানা গাড়ী একত্র না হয় তাহা হইলে সে রাত্রি গাড়ী চালান বন্ধ থাকে। পথিকের সুবিধা ও নিরাপদের জন্য এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দিবসের জন্য এই নিয়ম নাই, দিবসে একখানা গাড়ীও একাকী যাইতে পারে অথবা পথিক ইচ্ছা করিলে পদব্রজেও যাইতে পারেন, কিন্তু রাত্রে বলদশকটে যাইতে হইলে অন্ততঃ বারখানা গাড়ী একত্রিত হওয়া আবশ্যক।" বলা বাহুল্য, বারখানি গাড়ী প্রায়ই নিত্য হইয়া থাকে, এক একটা অফীশের অধিকারীর প্রায় ২৫ খানা গাড়ী থাকে। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে ২১ খানা গাড়ী সমবেত হইল, রাত্রি ১২টার সময় আমরা রওয়ানা হইলাম। কার্ত্তিক মাস, পূর্ণিমা রাত্রি, তাপ্তী নদীর উপরিস্থিত সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া যখন শকট চলিতে লাগিল, তখন নদীর জলে পূর্ণচন্দ্রের যে শোভা দেখিলাম তাহা মহাকবির মহাকাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে। একবিংশ বলদশকটের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে, ৪২টা বলদের পদশব্দে, গাড়োয়ানদিগের কিম্ভূতকিমাকার তামীল গীতের দানবীয় সুরে, বলদের পৃষ্ঠদেশে অনবরতঃ বেত্রাঘাতের আওয়াজে রাত্রে আমাদের কাহারও নিদ্রা হইল না। পরদিবস প্রভাতে ৬ ঘটিকার সময় এক মহারণ্যের মধ্যস্থিত নির্জ্জন রাস্তায় শকট থামিল। শকটবান বলিল, এখানে বলদ বদ্‌লাইতে হইবে; কনেষ্টবলও বিদায়গ্রহণ করিল, দিন হইয়াছে বলিয়া আমরা আর তাহাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া আসিলাম না। ত্রিবাঙ্কোর হইতে কয়েকখানা গাড়ী ত্রিনেবেলী অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিল, কনেষ্টবলজী তাহাদেরই একখানা গাড়ীতে বসিয়া সহরে ফিরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এদেশের গরুর গাড়ী সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের লোকের ধারণা অতি কমই আছে; এখানকার বলদশকট অনেক অশ্বযান অপেক্ষা সুদৃশ্য এবং আরামদায়ক। শকটে দিব্য ছাদ এবং জানালা আছে এবং এক এক খানা গাড়ীতে ৬ জন আরোহী আরামের সহিত বসিয়া যাইতে পারে। কেবল দুই জন আরোহী হইলে, আরোহীরা উত্তমরূপে দেহ বিস্তার পূর্ব্বক পাল্কীস্থিত আরোহীর ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। প্রভাতে যেখানে গাড়ী থামিল, তাহা একটা প্রশস্ত রাস্তা। একটা প্রাচীন মহারণ্য কাটিয়া ত্রিবাঙ্কুর হইতে ত্রিনেবেলী পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা যে রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এই রাস্তা সেই শতক্রোশব্যাপী বর্ত্মের অংশ বিশেষ। দুই পার্শ্বেই মহারণ্য, কোলের মানুষ দেখা যায় না; গাড়ীর ছাদে চড়িয়া দেখিলাম বড় বড় পর্ব্বতের চূড়া মহারণ্য ভেদ করিয়া বিমান-পথে আপনাদের মহোচ্চতা দেখাইতেছে। আমি ছাদ হইতে অবতরণ করিলে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি গাড়ীর ছাদে উঠিল, উঠিয়াই আশ্চর্য্যসহকারে চীৎকার করিয়া বলিল "বাবুজী! বাবুজী! ইয়ে বুলন্দ্ ডুংগর হ্যায়"। পারস্য ভাষায় বুলন্দ্ শব্দের অর্থ অতি উচ্চ এবং মাড়োয়াড়ী ভাষায় ডুংগর শব্দের অর্থ পাহাড়। পারস্য এবং মাড়োয়াড়ী ভাষা কোথা হইতে শিখিল জিজ্ঞাসা করায় বীরনারী উত্তর দিল "আমি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যা কিন্তু আমার পিতা ব্যবসা

উপলক্ষে রাজপুতানায় বাস করিতেন, তথায় আমার জন্ম হয়, আমার ভাষা সেই জন্য হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী হইয়া গিয়াছে। আমার পিতা মৌলবী রাখিয়া আমাকে উর্দ্দু ও পারস্য শিখাইয়াছিলেন।" একটী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক সঙ্গে পাইয়াছি জানিতে পারিয়া আরও আনন্দিত হইলাম। স্ত্রীলোকটির বয়স ৩৫ বৎসরের কম নহে, খুব সাহসী, খুব তেজস্বিনী, হৃষ্টা পুষ্টা এবং রাজপুতানার অনেক আদর্শ বীরনারীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। যাহা হউক, দিবা প্রায় একটার সময় আমরা মরুণাপুরম্ নামক গ্রামে শকটাধিকারীদিগের শাখা কার্য্যালয়ে পৌছিলাম। সে দিন এবং সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। গ্রামটি বৃটীশ অধিকারভুক্ত, তখন সেন্সসের কর্ম্মচারীরা সেন্সসের কাগজাদি লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিল, আমরা ইঁহাদেরই একজনের আতিথ্যগ্রহণ করিলাম। গ্রামটিতে মুসলমান বা খৃষ্টান নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন হিন্দুর বসতি। গ্রামের মধ্যভাগে এক সুবিস্তৃত, সুগভীর ও মনোহর প্রাচীন সরোবর আছে, ইহার জল অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ও নির্ম্মল। এই সরোবর বা দিঘিটি গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, ইহার এদিকে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বসতি, অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাস করে। সরোবরের পার্শ্বে এক মহাবিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্র, এত বড় শ্মশানভূমি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এই মহা ভয়ঙ্কর শ্মশানের মধ্যস্থানে এক অত্যুচ্চ গোলাকার পর্ণকুটিরে এক অতি ভয়ঙ্করী "শ্মশানে কালী"র প্রতিমা দেখিতে পাইলাম, এই প্রাচীনা মূর্ত্তি উচ্চতায় একটা বড় তালগাছের অর্দ্ধেক হইতে কম হইবে না। মনুষ্যের কল্পনায় ভয়ের যতদূর ধারণা হইতে পারে, এই মূর্ত্তিতে তাহা বর্ত্তমান, যেন জীবন্ত "ভয়" কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলকে গ্রাস করিবার জন্য এই শ্মশান ক্ষেত্রে বর্ত্তমান। শ্মশানের কোথাও মৃতদেহ জ্বলিতেছে, কোথাও শিবাকুলের ভীষণ শব্দ শুনা যাইতেছে, কোথাও নরমাংসলোলুপ গৃধ্রগণের পরস্পরে সংগ্রাম হইতেছে, কোথাও সারমেয়গণ দলে দলে আসিয়া অভস্মীভূত নরমুণ্ডকে দন্তদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, এবং কোথাও বা রক্ত, মাংস, অস্থি, নরকপাল প্রভৃতি স্থানে স্থানে পতিত হইয়া পথিকের মনে মানবের শেষ দশা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্মশানের স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ পলাশ, কৃষ্ণচুড়া, অশ্বত্থ এবং জবাফুলের বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম ; বোধ হইল যেন ভয় ও ভক্তির একত্রে সমাবেশ হইয়াছে, যেন সমুদয় স্থানটা "উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে"। কোনও কোনও স্থানে বৃক্ষতলে ব্যাঘ্রাসন প্রসরণ করিয়া বিভীষণমূর্ত্তি কাপালিক বসিয়া আছেন, কোথাও বা বিপুলবপু "ব্রহ্মচারী বাবা" পঞ্চতপের অগ্নি জ্বালিয়া মৃতদেহের পৃষ্ঠে উপবেশন করতঃ শব সাধনা করিতেছেন, কোথাও বা অঘোরী সাধু নরকপালে সুরা রাখিয়া তাহা পান করিতেছে এবং কোথাও বা পশুপক্ষী বলি দিবার জন্য "পারিয়া" জাতীয় ঘাতকবর সুতীক্ষ্ণ লম্বাকৃতি তরবারী লইয়া "জয় মা জয় মা" রবে শ্মশানভূমিকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। এ সকল দেখিলে "কপালকুণ্ডলার" কাপালিকের ক্রিয়াদি মনে পড়ে। এ দিকে নগ্নদেহা, গলদেশে নরমুণ্ড-

মালা-শোভিতা, ভয়ঙ্করতর হইতে ভয়ঙ্করতমা মহাকালীর মূর্ত্তির সম্মুখে নগ্নদেহা "পারিয়া" যুবতীরা পূজার দ্রব্য এবং তালবৃক্ষের মদিরা (তাড়ি) লইয়া ভয় ও ভক্তি সহকারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। "শ্মশানে কালী" নগ্নদেহা এবং তাহার বর্ণ এতদূর কাল যে মসি হইতে কাল বলিয়া বোধ হয় ; পারিয়া যুবতারাও তদপেক্ষা নগ্না এবং তদপেক্ষা কাল ; সুতরাং এখানে আরও উত্তমরূপে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল, যেন ভয়ের সম্মুখে ভয় আসিয়া দেখা দিল। সুরাপানে প্রমত্তা, কৃষ্ণবর্ণা, স্থূলদেহা পারিয়া যুবতীরা পূজার দ্রব্যাদি রাখিয়া গ্রাম্যপূজার গীত গাহিতে লাগিল, বৃদ্ধেরা নাচিতে লাগিল, বালিকারা "মাদোল" বাজাইতে লাগিল। সে অদ্ভুত সুর, অপূর্ব্ব নৃত্য বর্ণনার অতিরিক্ত। অনার্য্যের পূর্ণ আদর্শ এখানে বর্ত্তমান! শুনিলাম, পূর্ব্বে এই মহাকালীর পীঠস্থানে প্রতি মাসে নরবলি হইত, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহা আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সুবিধা পাইলে গোপনে গোপনে এখনও পারিয়াগণ নরবলি দিয়া থাকে। আমাদের এই গ্রামে পৌছিবার দ্বাদশ দিবস পূর্ব্বে এক নরবলি হইয়া গিয়াছিল, পুলীশ তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত তাহাও স্বচক্ষে দেখিলাম। যাহা হউক এই ভয়ঙ্কর গ্রামে ভয়ে ভয়ে রাত্রি যাপন করিয়া আমরা পরদিন প্রভাতে শকটে চড়িয়া দ্বিতীয় স্থানে রওয়ানা হইলাম, এই দ্বিতীয় স্থানের নাম "তোতাতৃ"। পথে বড় বড় অরণ্য এবং বড় বড় পর্ব্বত ভিন্ন আর কিছুই দেখিলাম না, সুতরাং এ পথের বিবরণ না দেওয়াই ভাল। ক্রমে যতই দক্ষিণে যাইতেছি, ততই মুসলমানের সংখ্যা কম দেখিতে পাইতেছি ; কারণ এই যে, এই সুদূর অনার্য্য দেশে মুসলমানেরা আইসে নাই এবং তাহাদের প্রভুত্বও এখানে বিস্তৃত হয় নাই, এজন্য এদেশের ভাষায়, পরিচ্ছদে, ব্যবহারে মুসলমানত্ব মোটেই নাই। আমরা তোতাতৃ গ্রামে পৌছিয়া আবার বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। তোতাতৃ বৃটীশ অধিকার-ভূক্ত, গ্রামটি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সুন্দর, তিন দিকে পর্ব্বত, প্রাকৃতিক শোভা মনোহারিণী এবং মিউনিশিপালিটির বন্দোবস্ত বিশেষ প্রশংসাজনক। এ গ্রামেও নিরবচ্ছিন্ন হিন্দুর বসতি, একজনও মুসলমান নাই। হিন্দুস্থানীরা এই গ্রামটিকে "বড় নারায়ণ" নামে আখ্যাত করে, এই গ্রামটি হিন্দুর এক তীর্থক্ষেত্র। তামিল ভাষায় "তোতা" শব্দের অর্থ নারায়ণ এবং 'তৃ' শব্দের অর্থ "জলে ভাসা"। প্রবাদ আছে, নারায়ণ তোতাতৃর নিকটস্থ সমুদ্রে বটপত্রে জলে ভাসিয়াছিলেন, সেই জন্য এই গ্রামের তোতাতৃ নাম হইয়াছে। এই গ্রামে নারায়ণের মূর্ত্তি এবং এক প্রকাণ্ড প্রাচীন মন্দির আছে ; এত বড় উচ্চ মন্দির অনেক স্থানে আছে বটে কিন্তু এত বড় প্রশস্ত মন্দির অনেক স্থানে দেখা যায় না। তোতাতৃর মন্দিরের অভ্যন্তরে এক বৃহৎ ও গভীর কূপ আছে ; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা জলের কূপ নহে, তৈলের খনি। ভারতবর্ষে আমি কেবল এই স্থানে তৈলের কূপ দেখিয়াছি। এই কূপ হইতে সতত তৈল নির্গত হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে এই কূপ এখানে বর্ত্তমান। এই তৈল কেরোসিন তেল নহে, ইহা তিলতৈলের ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট ; ইহাকে খাদ্য দ্রব্যে ব্যবহার করা যায় না, তোতাতৃর হিন্দুরা বাঙ্গালীর ন্যায় দেহে মর্দ্দন

করিয়া থাকে। শুনা গেল, বড় বড় রোগে এই তৈল ঔষধরূপে ব্যবহার হয়; আমাদের হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি এক বোতল তৈল লইয়া আসিয়াছিলেন, এই তৈলের সাহায্যে অনেকের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়াছিল। এই তৈলের কূপে স্নান করিবার জন্য অনেক রোগী আনক দূরদেশ হইতে আসিয়া থাকে। নারায়ণের প্রসাদী "ভাত" তোতাতৃর বাজারে বিক্রয় হয়, শূদ্রে বিক্রয় করিলেও ব্রাহ্মণে খরিদ করিয়া তাহা ভক্ষণ করে। পর দিবস আমরা তোতাতৃ হইতে প্রভাত কালেই শকটযোগে রওনা হইয়া প্রায় বেলা ২টার সময় একটা ক্ষুদ্র গ্রামে পৌছিলাম, এই গ্রামটি বৃটীশ অধিকারের শেষ গ্রাম; ইহা হইতে আরও কয়েক ক্রোশ যাইলে বৃটীশ অধিকার শেষ হয়, কিন্তু পর্ব্বত ও পতিত ভূমি ভিন্ন ইংরাজের সেখানে আর কোনও গ্রাম নাই। এই গ্রামে কেবল নীচ জাতীয় হিন্দু এবং নীচ জাতীয় খৃষ্টানের বসতি, খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, আমরা দধি, গুড় এবং চিপিটক (চিঁড়া) খরিদ করিয়া ফলাহার করিলাম। এ গ্রামে বিশ্রাম করা হইল না, বেলা ৩টার সময় বলদশকটে আরোহণ করিয়া আমরা আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবারে যে পথ দিয়া যাইতে হইতেছে তাহার নাম Neutral Zone Road। এই পথটা ঠিক বৃটীশ এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সীমার মধ্যস্থিত। এই পথ অতীব ভয়ঙ্কর, দস্যুদিগের এই পথে খুব আধিপত্য; আমাদের দুর্দ্দশার কথা পরে লিখিব।

শনি।

দূরত্ব, ভগণ, ইত্যাদি।—শনি যদিও বৃহস্পতি অপেক্ষা আকারে ছোট, তথাপি তাঁহার তুল্য সৌরজগতের অঙ্গীভূত সুশোভন, সুদর্শন, চিত্তরঞ্জন গ্রহ আর নাই। সূর্য্য হইতে ইহার মধ্যম দূরত্ব ৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ ১৫ হাজার মাইল, অর্থাৎ বৃহস্পতির দূরত্বের দ্বিগুণ। শনিকক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব ·০৫৬; অতএব শনি যখন অপহৈলিকে থাকেন, অর্থাৎ উচ্চস্থ হন,* তখন তাঁহার দূরত্ব ৯৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৬ হাজার মাইল, আর যখন পরিহৈলিকে আসেন অর্থাৎ নীচস্থ হন † তখন ৮৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৪ হাজার মাইল হয়।

শনি সূর্য্যপরিতঃ ১০৭৫৯·২২ দিনে অর্থাৎ ২৯ বৎসর ১৬৭·২২ দিনে একবার পরিভ্রমণ করেন। যখন ডিসেম্বর ও জানুআরি মাসে শনি, সূর্য্য হইতে ৬ রাশি অন্তরে থাকেন, তখন শনি অত্যন্ত নিকটস্থ দেখান, তখন পৃথিবী হইতে তাঁহার দূরত্ব ৭৪ কোটি ২২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল হয়, কিন্তু সূর্য্য আর শনি যখন এক রাশিস্থ হন তখন পৃথ্বী সম্বন্ধে শনির দূরত্ব ৮৪ কোটি ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার মাইল হয়।

---

* কক্ষার যে বিন্দুটি সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটস্থ তাহাকে অনুহৈলিক বা নীচ বলে;
† " " " অত্যন্ত দূরস্থ " পরিহৈলিক বা উচ্চ বলে।
হেলি = Helos সূর্য্য।

সূর্য্য হইতে শনি যে দিবস ছয় রাশি অন্তরে থাকেন, তদন্তর ৩৭৮ দিন পরে আবার ষড়্ভান্তরিত হন। ১৮৮৪,২৩ জানুআরিতে শনি সূর্য্যের ষড়্ভান্তর হইয়াছিল, তাহার পর ১৮৮৯,৫ ফেব্রুআরিতে; ১৮৯০,১৮ ফেব্রুআরিতে; ১৮৯১,৪ মার্চে; ১৮৯২,১৬ মার্চে; ১৮৯৩, ২৯ মার্চে; ১৯৯৪,১১ এপ্রেলে; ১৮৯৫, ২৩ এপ্রেলে; ১৮৯৬, ৫ মেএ; ১৮৯৭, ১৭ মে তারিখে হইয়াছিল।

শনি বিম্বের ব্যাস ইত্যাদি। শনিমণ্ডলের নিরক্ষ দেশীয় ব্যাস ৭০,৯৩০ মাইল, কেন্দ্রগত ব্যাস ৬২,৮৪০ মাইল। বিম্বের চাপাত্মক ব্যাস ১৬·২"। শনিমণ্ডল বাদামে; কেন্দ্রদ্বয় অত্যন্ত চাপা; গোলত্বের অপচিতি ১/১০ এর অধিক। শনিপিণ্ড ভূপিণ্ড অপেক্ষা ৬৪৫ গুণে অধিক, শনির সামগ্রী পৃথিবীর সামগ্রীর ৯৪,৩৮৪ গুণ এবং উহার সান্দ্রত্ব ভূসান্দ্রত্বের ৪/৩১। সমস্ত সৌরজগতের মধ্যে এত কম সান্দ্রত্ব কোথাও দেখা যায় না। শনির অনন্যসদৃশ সহচর, অপূর্ব্ব উপাঙ্গ, তাহাদের অনুপম বিন্যাস এবং এই অত্যল্প সান্দ্রত্ব ইহার মধ্যে কোনটিই আকস্মিক নহে,—সমস্তই আধিভৌতিক ব্যাপার সম্ভূত,—সমস্তই গ্রহ-জীবনের তরুণাবস্থাব্যঞ্জক।

মেখলা। বৃহস্পতির ন্যায় শনির মেখলা আছে। নিরক্ষ প্রদেশে একটি শুক্ল পীতাভ সুবিস্তৃত মেখলা আছে। এ মেখলাটী গ্রহের চিরস্থায়ী লক্ষণ। কতিপয় গাঢ় মেখলাও আছে, এগুলি ধূসরাভ বা হরিতাভ। মেখলাগুলি নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তর নহে। অধ্যাপক আসাফ হল ১৮৭৬এর প্রারম্ভ অবধি ১৮৭৭এর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শনির নিরক্ষ প্রদেশস্থিত একটি শুক্ল চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই শুক্লচিহ্নটির ব্যাস পরিমাণে ২" হইতে ৩" অর্থাৎ প্রায় ১২০০০ মাইল। চিহ্নটি প্রথমতঃ গোলাকার অত্যুজ্জল শুক্লাভ ছিল। বোধ হয় অভ্যন্তর হইতে প্রদীপ্ত পদার্থরাশি বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চিহ্নটি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্ব দিকে সরিয়াছিল। শনিমণ্ডলে এরূপ চিহ্ন অতি অল্প। লেখাপড়ার মধ্যে ১২টির অধিক দেখা যায় না।

আক্ষ্যাবর্ত্তন। উক্ত শুক্ল চিহ্নের গতি দেখিয়া অবধারিত হইয়াছে যে শনি ১০ঘ ১৪ মিনিটে একবার স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তিত হন। হারসেলের মতে আক্ষ্যাবর্ত্তন কাল ১০ঘ, ১৬ মি। ইনি শনির শতাধিক আবর্ত্তন দেখিয়া এই কাল স্থির করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। শনি কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ২° ২৯′ ৩৯·"৫০ পরিমাণে অবনত। অতএব শনিলোকে যদি ঋতু থাকে তবে তাহা পার্থিব ঋতুর মত। শনি যখন পূর্ব্ব ফল্গুনিতে আসেন তখন তাঁহার বসন্ত আরম্ভ হয়।

শনির বলয়। গালিলিও তেজস্বী দূরবীক্ষণ ও অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে সৌর-লাঞ্ছন, চান্দ্রগিরি, শৌক্রকলা, বার্হস্পত্য উপগ্রহ প্রভৃতি সৌর-সাম্রাজ্যের বিবিধ বিষয়ের,

আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অমোঘ আয়াসজনিত যথোচিত উৎসাহ-পূর্ব্বক শনিমণ্ডলে দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেন। নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে মনে মনে যেন "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং" বলিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন যে শনি ত্রিপুত্তলিক, তিনগ্রহাত্মক; মধ্যস্থলে বিরাজিত গোলাভাস শনিমণ্ডলের বামে এক গ্রহ দক্ষিণে এক গ্রহ। তিন বিগ্রহ পরস্পর সংলগ্ন এবং এক রেখাস্থিত। মধ্য মূর্ত্তি বৃহত্তর। তিনের সাপেক্ষিক গতির পরিবর্ত্তন নাই। একাল পর্য্যন্ত তিনি এরূপ বিস্ময়কর ত্রিগ্রহ নভোমণ্ডলের কুত্রাপি দর্শন করেন নাই; ব্যাপার অতিদুরবগাহ দেখিয়া তিনি চিন্তাকুল হইলেন।

এই অদ্ভুত বিগ্রহের তথ্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া ১৬১০ জুলাই মাসে পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। যখন দেখিলেন যে অল্পকায় পদার্থদ্বয় ক্রমশঃ অপচিত এবং দুইবৎসর মধ্যে তিরোহিত হইল এবং কেবল মধ্যগ্রহ বৃহস্পতিমণ্ডলের ন্যায় উপাঙ্গবিহীন হইয়া রহিল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। এখন তাঁহার চিত্তোদ্বেগের নূতন কারণ জন্মিল। যাহারা তাঁহার আবিষ্কারে অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, যাহারা তাঁহার মত-বিরোধী ছিল, সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তবাদীদিগের সহিত অদ্য তাঁহাকে আবার বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিনি শনির ত্রিমূর্ত্তিত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহাকেই বলিতে হইল যে পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিদ্বয় ক্রমে ক্রমে লয় পাইয়াছে। এই সুযোগ পাইয়া প্রতিপক্ষেরা বলিবে যে গালিলিওর সমস্ত আবিষ্কারই ইন্দ্রজাল। এই সঙ্কটে পড়িয়া তিনি জনৈক আত্মীয়কে ১৬১২,৪ ডিসেম্বরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি আছে, পত্রার্থ এই,—

"এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ছোট তারা দুইটী কি সৌরা-লাঞ্ছনবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল? দুইটী অন্তর্হিত হইল—না অকস্মাৎ পলায়ন করিল? শনি কি স্বীয় শিশুদ্বয়কে গ্রাস করিল? এই প্রত্যক্ষীভূত বিষয় কি মায়া, বা দূরবীক্ষণ আমাকে প্রবঞ্চনা করিল? যাহাদিগকে আমি ঐ মূর্ত্তিত্রয় দেখাইয়াছিলাম তাহারাও কি প্রতারিত হইল? যাহারা সুগভীর চিন্ত-শক্তি প্রভাবে এই নবাবিষ্কারের অসারত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, এবং পার্শ্বস্থ গ্রহদ্বয়ের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ শশবিষাণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের ছিন্নমূল আশালতাকে এক্ষণে পুনরুজ্জীবিতা করিবার সময় আসিল। এরূপ অদৃষ্ট—অশ্রুত-পূর্ব্ব, এরূপ অচিন্তিত-পূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার দেখি না। কালের স্বল্পতা, ঘটনার অনপেক্ষিতি নিজের মতিমান্দ্য এবং ভ্রমের ভয় এ সমস্ত আমাকে আকুলীকৃত করিয়াছে।" গালিলিও এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, প্রবাদ আছে তিনি শনিকে আর পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

গালিলিও বস্তুতঃ ভ্রমে পতিত হন নাই। পর্য্যবেক্ষণের প্রারম্ভে পদার্থত্রয় যথাস্থানেই ছিল, পরে বাম এবং দক্ষিণ উপাঙ্গ সত্যসত্যই অপচিত এবং তিরোহিত হইয়াছিল, কিন্তু সে তিরোধান কিয়ৎকালের জন্য; মূর্ত্তিত্রয় পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। কালসহকারে

পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শনিমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ভাব উপলব্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অনেকেই মনে করিতে লাগিলেন যে, শনি মণ্ডলের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে এক একটি হাতল আছে; সে হাতল দুইটি মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হয়; অদৃশ্য যে কেন হয় তাহার কারণ কেহ দর্শাইতে পারেন নাই। অবশেষে প্রায় ৫০ বৎসর পরে হুইগেন্‌স্ প্রকাশ করিলেন যে শনি মণ্ডল একটি পাতলা চওড়া বলয়দ্বারা বেষ্টিত। বলয়টি ক্রান্তিবৃত্তে অবনত, কিন্তু উহার কোন স্থান শনি মণ্ডলে ঠেকে নাই।

ক্রমে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বিষয়ে যত উৎকর্ষতা লাভ হইতে লাগিল ততই শনি—বলয়ের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ১৬৭৬ অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ কাম্বিনি বলয়ের দক্ষিণ ভাগে একটি শ্যামচিহ্ন দেখিয়াছিলেন, বহুদিন পরে মারল্ডি বলয়ের উত্তর ভাগে সদৃশচিহ্ন লক্ষ করিয়াছিলেন। অনন্তর উইলিয়ম হার্সেন উভয় চিহ্ন মাপ করিয়া উভয়ের সৌসাদৃশ্য পাইলেন। এখন সপ্রমাণ হইল যে, বলয় একটি নহে দুইটি, একটির ভিতর আর একটি, এবং উভয়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ গোলাকার ব্যবধান। এই দুই বলয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের উল্লেখ হইল তদ্ব্যতীত উক্ত বলয়ের প্রত্যেকে আরও অনেক অনায়ত ব্যবধান লক্ষিত হইয়াছে। এই বলয় দুইটি অস্বচ্ছ, এবং ইহাদিগের ছায়া শনিমণ্ডলে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

১৮৫০ অব্দে আমেরিকায় বণ্ড ও ইংলণ্ডে দাস্ স্বতন্ত্রভাবে তৃতীয় বলয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ বলয়টি দ্বিতীয় বলয় ও শনিমণ্ডলের মধ্যস্থিত। এটি শ্যাম ও শনিমণ্ডল বা পূর্ব্বোক্ত বলয় দুইটির মত আলোক প্রতিফলক নহে। ইহা এত স্বচ্ছ যে ইহার ভিতর দিয়া শনিমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়। বলয়গুলি যখন আমাদের দিকে চওড়াভাবে থাকে অর্থাৎ যখন বলয়ের ব্যবধান বেশ দেখা যায়, তখন শ্যাম বলয়টি নীললোহিত আভা ধারণ করে, সুতরাং পার্শ্বস্থ উজ্জ্বল বলয়ের সহিত বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে অথচ এ উজ্জ্বল বলয়টির ভিতরের দিক বাহিরের দিক অপেক্ষা গাঢ় শ্যাম।

শ্যাম বলয়টি এতকাল পর্য্যন্ত কেন অদৃষ্ট ছিল তাহার বিশিষ্ট কারণ বলা যায় না; অনেকে মনে করেন যে, এ বলয়টি হালে সংঘটিত হইয়াছে, এবং দুইশত বৎসরের মধ্যে ইহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই শ্যামবলয়ের আবিষ্কার, আর উজ্জ্বল বলয়দ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ভাগরেখা দর্শনে বোধ হয় বলয়গুলি জললবসংঘাত মেঘবৎ ক্ষোদিষ্ঠ উপগ্রহমালা। উপগ্রহগুলি গায়ে গায়ে এমনই লেগে আছে যে, তাহাদের ভিতর দিয়া নজর চলে না। তৃতীয় বলয়ের স্বচ্ছতার কারণ এই বোধ হয় যে, এ বলয়ে উপগ্রহগণ তত ঘন ঘন ভাবে গাঁথা নহে, তাহাদের মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। প্রকৃটর বলেন যে, শ্যামবলয়ের উপগ্রহগুলি দ্বিতীয় উজ্জ্বল বলয়ের অঙ্গীভূত ছিল; আকর্ষণ বা উপদ্রব বিশেষ দ্বারা সেগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বলয়ের ক্রমবিস্তারের কারণ এই যে, তাহাদের উপকরণীভূত গ্রহগণ কেবল স্বস্ব আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত আছে; অতএব ক্রম-বিস্তারের ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না। বলয় পাতলা হইবার কারণ এই যে, শনির মধ্যমণ্ডলের

উদ্‌গত পদার্থদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক উপগ্রহ শনিমণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশের ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

যদি ক্ষুদ্রের সহিত মহতের তুলনা করিলে মহতের অবমাননা না হয় তবে শনিমণ্ডলকে নরমস্তক এবং তদীয় বলয়কে সামলা নামক উষ্ণীষ মনে করা যাইতে পারে, স্যামলাটির এক এক পেঁচ এক এক বলয়।

বলয়ের পরিমাণ।

বহিস্থ উজ্জ্বল বলয়ের বহিঃ ব্যাস চাপমানে	৪০″·০৯৫	মাইলমানে	১,৬৬,৭৫০
,, ,, আন্তর ব্যাস ,,	৩৫″·২৮৯	,,	১,৪৬,৬৪০
উক্ত বলয়ের চওড়া	২″·৪০৩	,,	·৯৫৫৫
আন্তর উজ্জ্বল বলয়ের বহিঃ ব্যাস	৩৪·৪৭৫	,,	১,৪৩,৩৮০
আন্তর উজ্জ্বল বলয়ের আন্তর ব্যাস চাপমানে	২৬″·৬৬৮	মাইল মানে	১,১০,৯১০
উক্ত বলয়ের চওড়া ″	৩″·৯০৩	,,	১৬,২৩০
উক্ত উভয় বলয়ের ব্যবধান ″	০″·৪০৮	,,	১,৭০০
বলয় হইতে মণ্ডলের অন্তর ″	৪″·৩৩৯	,,	১৮,০৪৫
মণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশীয় ব্যাস ″	১৭″·০৬৫	,,	৭০,৯৩০

বলয়ের বেধ ১০০ মাইলের অনেক কম।

শনির অবস্থান ভেদে বলয়ের দৃশ্যভেদ। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত যেমন ক্রান্তিবৃত্তে ২৩°২৭′ পরিমাণে অবনত, তেমনই শনিবলয় তদীয় কক্ষে ২৮°১০′ পরিমাণে অবনত। সূর্য্য হইতে শনিমণ্ডল যেমন দেখায়, পৃথিবী হইতে প্রায় তেমনই দেখায়। রবিপরিতঃ পৃথিবীর ভ্রমণকালে তদীয় অক্ষ এবং নিরক্ষবৃত্ত যেমন সতত সমভাবে অর্থাৎ সমান্তরভাবে থাকে, তদ্রূপ শনিবলয়াবলির অক্ষ এবং ক্ষেত্র অন্তরীক্ষের এক দিকে সমান্তরভাবে চলিতে থাকে। যেমন আমাদের বর্ষমধ্যে দুইবার পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত সূর্য্যের অধোভাগে আইসে, তেমনই শনির বর্ষকাল ২৯½ বৎসর মধ্যে তদীয় বলয়ের ক্ষেত্র দুইবার দর্শকের দৃকসূত্রে এরূপভাবে উপনীত হয় যে, কেবল উহার কিনারামাত্র দেখা যায়, উর্দ্ধ বা অধোভাগের কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং বলয়ের সপাটত্ব এবং অস্থূলত্ব প্রযুক্ত উহা শনিমণ্ডলের মধ্যগত এবং উভয়পার্শ্বে পরিবর্দ্ধিত সূক্ষ্ম উজ্জ্বল রজতসূত্রবৎ প্রতিভাত হয়; যেমন একখণ্ড করতাল দৃক্‌সূত্রগত জল সমতলক্ষেত্রে ধরিলে তাহার কেবল কিনারা দেখা যায় সুতরাং সমস্ত করতালের ছবি এক রেখামাত্রে পরিণত হয়।

শনি যখন রাশিচক্রের ২৬২°তে অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়া ধনুতে থাকেন, তখন তাহার বলয়ের উপর বা উত্তর পার্শ্ব দেখা যায়, এবং উহা ২৮° পরিমাণে অবনত দেখায়; অস্মৎ সম্বন্ধে বলয়ের এই পরম অবনতি। অনন্তর তথা হইতে কক্ষের ৯০° অতিক্রম করিয়া যখন ৩৫২°এ

অর্থাৎ রেবতী মীনে উপনীত হন, তখন তাহার বলয় পূর্ব্ববর্ণিত উজ্জ্বল রেখাবৎ প্রতিভাত হয়, এ রেখা অত্যন্ত তেজস্বী দূরবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না। পুনঃ যখন ৯০° ভ্রমণ করিয়া ৮২°এ অর্থাৎ পুনর্ব্বসু মিথুনে আসেন, তখন তদীয় বলয় প্রথমোক্তভাবে অর্থাৎ ২৮° পরিমাণে অবনত দৃষ্ট হয়, এবার অধোভাগ বা দক্ষিণ পার্শ্ব দেখা যায়। ফের যখন আর এক পাদ অগ্রসর হইয়া ১৭২° অর্থাৎ হস্তা কন্যায় আসেন, তখন পুনর্ব্বার বলয়ের কিনারা পৃথ্বীর এবং রবির দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

অতএব শনিকক্ষার প্রতীপ বিন্দুদ্বয়ে বলয়ের কেবল কিনারা মাত্র দেখা যায় এবং উক্ত বিন্দুদ্বয়ের অর্দ্ধপথে আর এক যুগল প্রতীপ বিন্দুতে বলয় ২৮° পরম পরিমাণে অবনত দেখায়। শনির ভগনকাল ২৯½ বৎসর, সুতরাং স্থান চতুষ্টয়ে বলয়ের উক্ত দ্বিবিধদৃশ্য সাত বৎসর চারি মাস অন্তর ঘটে।

১৮৭০এ শনি বিছা ও ধনুর মধ্যে ছিলেন। এই সময় বলয় যত চওড়া দেখা সম্ভব, তত চওড়াই দেখা গিয়াছিল এবং উহার উর্দ্ধ বা উত্তর ভাগ আমাদের দিকে ফিরে ছিল। এই ঘটনা আবার ১৮৯৯এ ঘটিবে।

১৮৭৮এ (৭ ফেব্রুয়ারিতে) বলয়ের কিনারামাত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সমস্ত বলয়ের পরিলেখ এক আলোক-রেখায় পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় শনি কুম্ভ ও মীনের মধ্যেছিলেন।

১৮৮৫তে গ্রহ বৃষে ছিলেন, তখন বলয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব নয়নগোচর হইয়াছিল এবং উহা ২৮° পরিমাণে ঝুঁকিয়াছিল।

১৮৯২এ বলয়ের কিনারা ফের আমাদের দিকে ফিরে ছিল এবং শনি তখন সিংহে ছিলেন।

পৃথিবীর গতি নিবন্ধন বলয়ের কিনারা যখন রবির দিকে ফিরে, ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর দিকে ফিরিতে পারে না সুতরাং সময়ের অনেকটা এদিক ওদিক হয়।

পৃথিবী হইতে দেখিলে বলয়াবলি রেখাবৎ বা পটলচেরা বা তাকিয়া বালিসের দীর্ঘচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিবিধ আকারের বৃত্তাভাস দেখায়। শনিমণ্ডলের অক্ষসূচিত অন্তরীক্ষের কোন স্থান হইতে নেত্রপাত করিলে বলয়ের যথাযথ চিত্রের ভাব পাওয়া যায়।

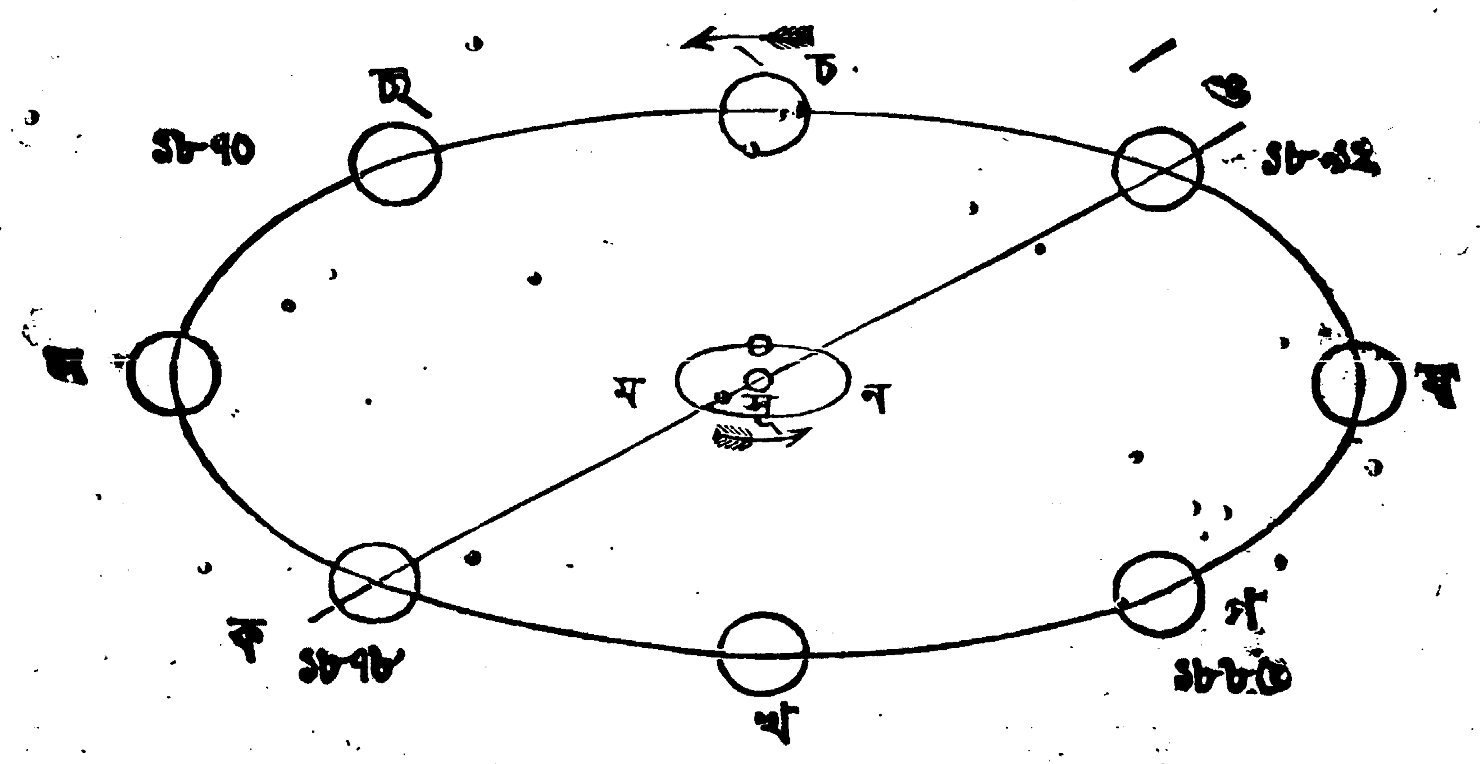

এই চিত্রে সূ সূর্য্য, ম ন ভূকক্ষা, ক খ গ ঘ ইত্যাদি শনির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান। শনি যখন

ক ঙ তে থাকেন তখন বলয়ের ক্ষেত্র রবিমণ্ডল দিয়া যায়, অতএব বলয়ের কেবল উপান্তমাত্র দৃষ্ট হয়। শনি খএ আসিলে বলয় বৃত্তাভাস দেখায় এবং গএ আসিলে বৃত্তাভাসে হ্রস্বব্যাস দীর্ঘব্যাসের অর্দ্ধমাত্র দেখায়; ইহার পর হ্রস্বব্যাস কমিতে থাকে এবং গ্রহ ঙ তে আসিলে বলয় পুনঃ রেখারূপে প্রতিভাত হয়। শনি যখন সূর্য্য হইতে পাদান্তরে থাকেন অর্থাৎ শনি ও সূর্য্যের চাপাত্মক ব্যবধান যখন ৯০° হয়, তখন শনির ছায়ার কিয়দংশ বলয়ের উপর পতিত হইতে দেখা যায়, এবং স্থলবিশেষে বলয়ের ছায়া শনিমণ্ডলেও পড়ে। এবম্ভূত ছায়া পতনের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, শনিমণ্ডল এবং তদীয় বলয় উভয়ই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয়।

বলয়াবলির অদর্শনের কারণ। শনির বলয়াবলি পৃথিবী হইতে না দেখিতে পাইবার কারণ এই যে বলয়ের যে অংশ পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে, হয় তো সেই অংশ সূর্য্য-আলোকে আলোকিত হয় না, অথবা আলোকিত হইলেও অংশের স্বল্পত্ব প্রযুক্ত তাহার চাপাত্মক পরিমাণ নেত্রগোচর হয় না। প্রথমতঃ যখন বলয়াবলির ক্ষেত্র রবিমণ্ডল দিয়া যায় তখন বলয়ের উপান্তমাত্র আলোকিত হয়, এবং তদীয় পরিলেখ অতিসূক্ষ্ম রেখায় পরিণত হওয়ায় অতি তেজস্বী দূরবীক্ষণ ভিন্ন তাহা দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যখন বলয়-ক্ষেত্র পৃথিবী দিয়া যায়, তখনও সদৃশ কারণবশতঃ সাধারণ দূরবীক্ষণে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ যখন রবি ও পৃথ্বী বলয়ের বিপরীত দিকে থাকেন অর্থাৎ যখন বলয় ক্ষেত্র বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্য দিয়া যায় তখন বলয়ের অনালোকিত পীঠ পৃথিবীর দিকে থাকে সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ট হয়।

যে বৎসর শনির বলয়াবলির ক্ষেত্র ভূকক্ষা কাটিয়া যায়, সে বৎসর সামান্যতঃ উক্তরূপ অদর্শন দুইবার ঘটে। ইহার ছেদ্যক।

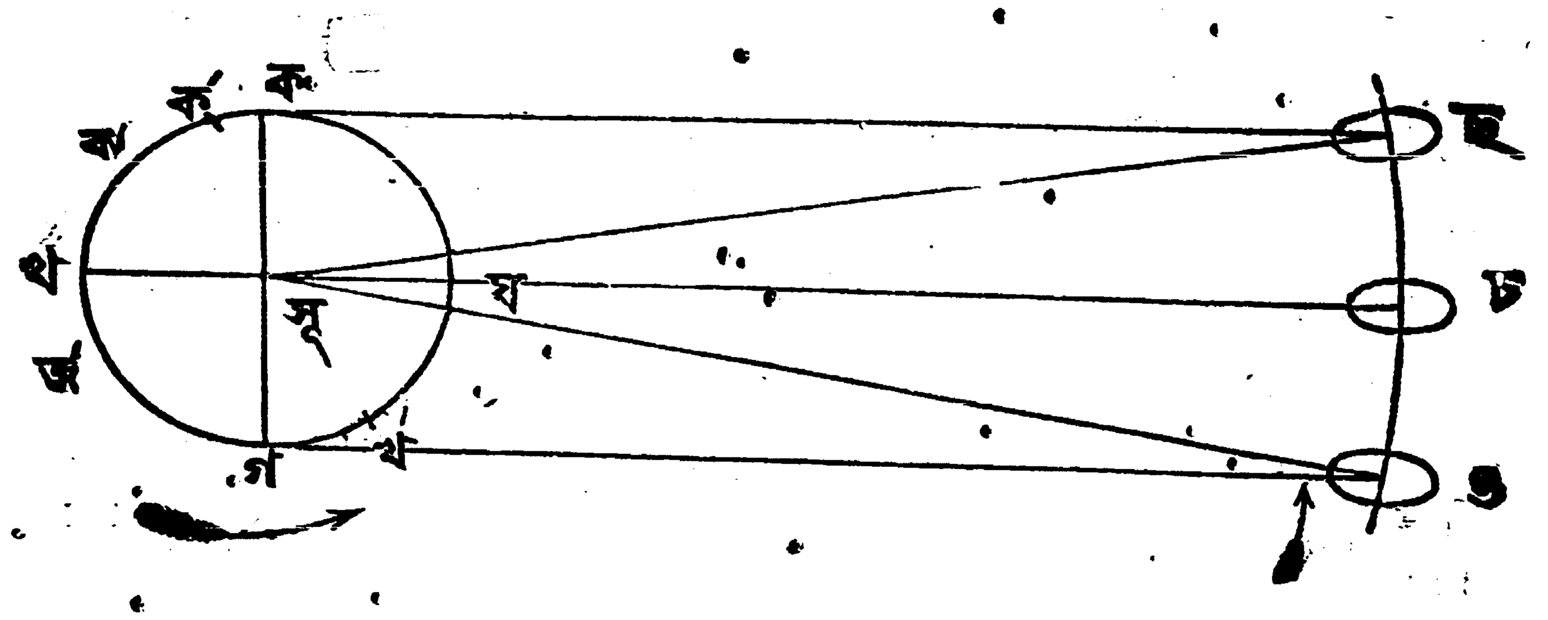

এই চিত্রে সূ সূর্য্য, ক খ গঘ ভূকক্ষা, ঙ চ ছ শনিকক্ষার অংশ। শনি যখন চএতে তখন বলয় ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত করিলে রবিমণ্ডল দিয়া যাইবে। ক ছ ও গ ঙ সূ চএর সমান্তর করিয়া টান, এবং এই রেখাদ্বয় ভূকক্ষাকে ক গ বিন্দুতে যথাক্রমে স্পর্শ করিবে। বলয়াবলি শনি-কক্ষায় সমান্তরভাবে আবর্ত্তিত হয়, অতএব শনি যাবৎ কাল ঙ ও ছএর মধ্যে থাকেন

তাবৎকাল বলয়ক্ষেত্র ভূকক্ষা কাটিতে পারে। এখন সূর্য্য হইতে পৃথিবীর অন্তরকে যদি ১ ধর, তবে সূর্য্য হইতে শনির অন্তর ৯·৫৪, অর্থাৎ

$$
\begin{aligned}
&\text{সূগ : সূঙ :: ১ : ৯·৫৪;}\\
&\angle\text{সূঙগ} = \angle\text{ঙসূচ};\\
&\text{জ্যা ঙসূচ} = \tfrac{১}{৯·৫৪} = ·১০৪৮২২;\\
&\therefore \text{ঙসূচ} = ৬^\circ\ ১',\\
&\text{এবং ঙসূছ} = ১২^\circ\ ২'।
\end{aligned}
$$

শনির এক ভভ্রম হইতে অর্থাৎ, ৩৬০° যাইতে ১০৭৫৯ দিন লাগে, অতএব ১২°.২′ যাইতে প্রায় ৩৫৯ দিন, ৬ দিন কম এক বৎসর লাগে; তবেই বলয়ের একবার এরূপ অদর্শন ঘটিলে আবার তদ্রূপ অদর্শন ঘটিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

অদর্শনের সংখ্যা ও স্থিতিকাল। শনি যখন ঙ তে উপনীত হন, তখন পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে বলয়ের অদর্শনের সংখ্যা ও স্থিতিকাল নিরূপিত হয়। শনি যখন ঙ তে, পৃথিবী তখন যদি কএ থাকেন তবে পৃথিবী খগ পাদের স্থান বিশেষ জএ আসিলে বলয়ক্ষেত্র গঙ র সমান্তর ভাবে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর উপর দিয়া যাইবে। এই স্থানে বলয়ের দর্শনাভাব ঘটিবে। এই দর্শনাভাব তাবৎ কাল থাকিবে যাবৎ না পৃথিবী গএ আসেন, কারণ এই সময়ে বলয়ের যে পীঠে আলোক পড়ে, সে পীঠ দেখা যাইবে না। বলয়ের অদর্শন প্রায় দুইমাস কাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহার পর বলয় যখন চ পার হইয়া যাইবে তখন বলয়ের যে আলোকিত পীঠ তাহা দেখা যাইবে। পৃথিবী যখন গ হইতে ঘ দিয়া কএ উপনীত হন, তখন বলয় ক্ষেত্র সূচ হইতে ছক এ আসিবে এবং পৃথিবী ক উত্তীর্ণ হইবার ৬ দিন পূর্ব্বে ক পার হইয়া যাইবে? এ স্থলে কেবল একবার দুইমাসব্যাপী অদর্শন ঘটিবে।

মনে কর ক ক′ ভূকক্ষার এমনই এক অংশ যে ক হইতে ক′ যাইতে পৃথিবীর ৬ দিন লাগে। এখন শনি যে ক্ষণে ঙ তে উপনীত হইলেন সেই ক্ষণে যদি পৃথিবী ক′ এ থাকেন তবে শনিবলয়ের ক্ষেত্র গঙর সমান্তর থাকিয়া অগ্রসর হইতে হইতে খগ পাদের স্থান বিশেষ ধর ঝএ পৃথিবীর সহিত সমাগত হইবে; তাহার পর পৃথিবী ঝ ক ঘ দিয়া গ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে (শনির গতি দিক্ সম্বন্ধে) বলয়ক্ষেত্রের পশ্চাৎ থাকিবেন; অবশেষে শনি যেই ঙ ছ চাপ ছাড়াইবার উপক্রম করিবেন, অমনই শনি আর পৃথিবী এক রেখাস্থ হইবেন। এরূপ অবস্থায় দুইবার অদর্শন ঘটিবে। পৃথিবী যদি ক′ খ গ চাপের কোন স্থানে থাকেন এবং শনি যদি ঙতে থাকেন তবে এস্থলেও পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীকে খ গ পাদের কোন না কোন স্থানে অগ্রগামী শনিবলয়ের ক্ষেত্রে পড়িতে হইবে, এবং কক্ষার্দ্ধ গ ঘ ক এর কোন না কোন স্থানে উক্ত ক্ষেত্র দিয়া যাইবেন, এবং পুনঃ ক খ পাদের কোন না কোন স্থানে বলয় ক্ষেত্রে পড়িতে হইবে; এরূপ অবস্থায় তিন বার অদর্শন হয়। আবার

ধর পৃথিবী যদি গ এ থাকেন, আর শনি ঙতে, তবে তন্মুহূর্ত্তে পৃথিবীর গতি ঠিক ঙর দিকে হওয়াতে বলয়ের ক্ষেত্র ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর গতি অচিরেই গ ঙ রেখা হইতে বক্রীভূত হইবে এবং শনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন, পৃথিবী অতি শীঘ্রই ততটুকু পুনরাদান করিয়া গ ঘ পাদের প্রথম অংশেই বলয়ক্ষেত্রের সমাগম লাভ করিবেন। এবং শনি ছএ উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ক অতিক্রম করিয়া ক খ পাদে উক্তক্ষেত্রে পুনঃ পতিত হইবেন এইরূপ ঘটনা বিন্দুবিশেষ খ' পর্য্যন্ত ঘটিবে। যদি এমন ধরা যায় যে খ'এ প্রথমেই পৃথিবী ছিলেন, তাহা হইলে দুইবার অদর্শন ঘটিবে ;—একবার কেবল ক্ষণকালের জন্য, আর একবার বলয়ক্ষেত্র অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর সহিত সমাগত হইলে শেষ স্থল,—শনি যখন ঙতে পৃথিবী তখন যদি খ ঘ র্ক চাপের কোন স্থানে থাকেন, তাহা হইলে একবার মাত্র সমাগম হইবে, অর্থাৎ ক খ গ বৃত্তার্দ্ধে, তখন পৃথিবী খ ক পর্য্যন্ত যাইতে বলয়ক্ষেত্রের অগ্রে থাকিবে।

অদর্শনের আসন্নকালে বলয়ের রূপ। এই সময়ে বলয়াবলিতে নানারূপ বিষমতা লক্ষিত হয়। মণ্ডলের উভয় পার্শ্ব হইতে আলোক বহির্গত হওয়ায় বলয়াবলি আলোকমালাবৎ প্রতিভাত হয়। বোধ হয় বলয়ের সর্ব্বাঙ্গ সমস্থূল নহে, এবং তজ্জন্য যখন কেবল কিনারামাত্র নয়নগোচর হয় তখন বলয়ের যে যে স্থল পুরু তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়, আর যে যে স্থল পাতলা তাহা দেখা যায় না। সুতরাং আলোক-রেখার অখণ্ডভাবের অভাব হয়। আরও অনুমান হয় সমস্ত বলয় এক ক্ষেত্রস্থ নহে। কারণ বলয় যখন আলোক-রেখায় পরিণত হয়, তখন উহার উর্দ্ধ ও অধোভাগে অস্পষ্ট মেঘপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হয় ; কিন্তু বলয়ের ক্ষেত্র হইতে এতদূরে বাষ্পবৎ পদার্থ রাশির অস্তিত্ব অসম্ভব অতএব সেগুলি বলয়ের অঙ্গীভূত ক্ষোদিষ্ঠ উপগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস হয়।

শনিবলয়ের সংস্থিতি। যে নিয়ম বা শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র ভূপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া শনির চারিদিকে তদীয় বলয় ঘুরিতেছে। আবর্ত্তনকাল ১০ঘ, ৩২মি, ১৫সে। বলয়ের যেরূপ পরিমাণ এবং শনিমণ্ডলের মধ্যাকর্ষণের যেরূপ বল তাহাতে বলয়ের মধ্যে কোন উপগ্রহ কল্পনা করিলে উহা উক্ত কালমধ্যে ভ্রামিত হইবে। পৃথিবী একচন্দ্রা, শনি বহুচন্দ্রক, শনির বলয় চাঁদ-মালা ; বস্তুতঃ বলয়াবলি তিন চারিটি পাতলা চওড়া চক্র। শনিমণ্ডলে চক্রগুলি সংলগ্ন নহে। চক্রগুলি নিরেট নহে, নিরেট হইলে শনির আকর্ষণে চূর্ণীকৃত হইত, এবং অসম কেন্দ্রবিমুখ বলপ্রযুক্ত চক্রের বাহিরের কিনারা ভাঙ্গিয়া কোন দিকে চলিয়া যাইত, এবং ভিতরের দিক শনিমণ্ডলে পতিত হইত। অতএব বলয় নিরেট নহে, বলয় দ্রবপদার্থও নহে। দ্রব হইলে বিবিধ বিক্ষোভজনক বলদ্বারা তরঙ্গায়িত হইয়া ভঙ্গ হইত। মাক্সবেল্লের সিদ্ধান্ত এই যে, বলয় বাষ্প আবরিত হউক, বা না হউক সসার হউক বা দ্রব হউক, উহা সমুদ্রের বালির ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কণা সমূহ ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরিতেছে। সৌর-জগতের গ্রহ ও উপগ্রহগণের যেমন গতি এই

ক্ষুদ্র কণাগুলির তেমনই গতি, এই মাত্র ভেদ যে কণাগুলির মধ্যে মধ্যে পরস্পরের আঘাত জনিত নূতন নূতন চক্রের সৃষ্টি হয় এবং চক্রের বিস্তৃতি বাড়ে।

শনিমণ্ডলে সূর্য্যগ্রহণ। প্রকটর লিখিয়াছেন শনিমণ্ডলের উত্তর, দক্ষিণ, ১৫° অক্ষাংশে জলবিষুব সংক্রান্তির পর আমাদের ১ বৎসর ২৯ দিন পর্য্যন্ত একটিও সূর্য্যগ্রহণ হয় না, তাহার পর ২২৭ দিন পর্য্যন্ত প্রাতে এবং অপরাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হয়, এবং ১২৯ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিন পূর্ণগ্রাস থাকে। তাহার পর ২ বৎসর ১৮০ দিন পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নকালে গ্রহণ দৃষ্ট হয়। ৩০° অক্ষাংশে জলবিষুব সংক্রান্তির পর ২ বৎসর ৭০ দিন গ্রহণ হয় না, ১ বৎসর ৪২ দিন প্রাতে ও অপরাহ্নে গ্রহণ হয়। ১ বৎসর ১৭০ দিন পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রাস ; ২ বৎসর ২৫৫ দিন মধ্যাহ্নকালে গ্রহণ হয়। ৪৫° অক্ষাংশে ৩ বৎসর ১৩০ দিন গ্রহণ হয় না, ১ বৎসর ৭৩ দিন প্রাতে এবং সায়ংকালে গ্রহণ হয়, ২ বৎসর ৩৫০ দিন পূর্ণ গ্রহণ হয় এবং ইহা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত থাকে তাহার পর আবার শনির ৩ মাস অর্থাৎ আমাদের ৫ বৎসর ৩৪৭ দিন আর গ্রহণ হয় না।

শনিমণ্ডল হইতে শনির বলয় দর্শন। শনিমণ্ডলের যে উপরিভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যদি তাহাই মণ্ডলের বাস্তব উপরিভাগ হয় এবং তাহাই যদি মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের বাসস্থান হয়, তাহা হইলেও শনিলোকের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বলয়াবলি দর্শন করিলে তদীয় নভোমণ্ডলে যে অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্যাবলির বিবরণ পাঠ করা যায় সে সমস্ত কেবল মনঃকল্পিত তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

শনিমণ্ডলের অধিকাংশ হইতেই বলয় দেখা যায় না। তন্মণ্ডলের নিরক্ষবৃত্ত ও ৬৬° ২৫′ উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যগত স্থান হইতে বহির্ব্বলয়ের বহিরুপান্ত মূলে দেখা যায় না। উক্ত বলয়ের ভিতর কিনারা ৬২° ২৫′ হইতে নজর হয় ; ভিতরের বলয়ের বাহির কিনারা ৬২° ১৬′ হইতে দেখা যায়, এবং উহার ভিতর কিনারা ৫১° ১৩′ হইতে দৃষ্ট হয় ; এবং শ্যামবলয়ের ভিতর দিক ৪০° ১৫′ হইতে নয়নগোচর হয়। শনিবর্ষের যে ছয়মাস বলয়াবলি সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে, সে ছয় মাস তদীয় ক্ষিতিজের অত্যূর্দ্ধভাগে বলয়ের যে অংশ থাকে তাহার বিস্তারের অধিকাংশ নেত্রায়ত্ত হয় না। বাকি ছয় মাস বলয় মূলে আলোকিত হয় না। পরমোজ্জ্বল আলোক মেখলার উপরি ভাগ দিয়া প্রকাণ্ড ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় ছায়াসূত্রের ছায়া রাত্রিকালে সগৌরবে কাল নির্দ্দেশ করিতে করিতে চলে, এরূপ ব্যাপার সকল কেবল কপোল কল্পিত।

শনির উপগ্রহ। বিবিধ বলয়োপেত অনুপম শিরোভূষণ সামলা ধারণ করিয়া শনৈশ্চরের ঐশ্বর্য্যাভিলাসের তৃপ্তি হয় নাই। তিনি পিতৃ প্রসাদে অনুচর স্বরূপ অপূর্ব্ব চন্দ্রাষ্টক দ্বারা পরিবৃত থাকেন। সাবিত্র পরিবার মধ্যে তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান নাই। তাঁহার অধিকৃত গগণের পরিসর ৫০ লক্ষ্য মাইল। এই সুবিশাল শনি-সম্রাজ্য দূরত্ব প্রযুক্ত আমাদিগের নেত্র সম্বন্ধে এক চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা আবরিত হয়। শনির আট উপগ্রহ, ইহাদিগকে দূরত্ব অনুসারে ১, ২, ৩; ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।

উপগ্রহগণের তালিকা।

আবিষ্কারের তারিখ	সংখ্যা	নাম।	শনি হইতে দূরত্ব।	ভগণকাল দি,	ঘ,	মি,	আবিষ্কর্তার নাম।
১৭৮৭ সেপ্টে	১	মিমাস্	১,১৬,৭৫০	০	২২	৩৭	হরসেল।
১৭৮৭,১৯ অগ	২	এনসিলেডুস্	১,৪৯,৮১০	১	৮	৫৩	ঐ
১৬৬৪, মার্চ্চ	৩	তেথিস্	১,৮৫,৪৯০	১	২১	৪৫	কাসিনি
১৬৮৪, মার্চ্চ	৪	ডিওনে	২,৩৭,৪৯০	২	১৭	৪৫	ঐ
১৬৭২,২৩ ডিসে	৫	হ্রেয়া	৩,৩১,৮৫০	৪	১২	৩০	ঐ
১৬৫৫,২৫ মার্চ্চ	৬	তিতান	৭৬৯২৮০	১৫	২২	৪৫	হুয়গেনস্
১৮৪৮, সেপ্ট	৭	হাইপেরিঅন	৯,৩০,৪১০	২১	৭	৬৫	লাস্সেল ও বণ্ড
১৬৭১ অক্টর	৮	ইএপিতুস্	২২৩৫৭৩০	৭৯	৮	০	কাসিনি

শনির নিরক্ষবৃত্তে ঐ আট উপগ্রহের কক্ষার অবনতি ও তাহাদিগের পাতের ভোগ নিম্নে দেখান যাইতেছে।

নাম	কক্ষার অবনতি		পাতের ভোগ		নাম	কক্ষার অবনতি		পাতের ভোগ	
মিমাস্	২৮°	১০′	১৬৭°	৪৩′	হ্রেয়া	২৮°	১১′	১৬৬°	৩৪′
এনসিলেডুস্	২৮°	১০′	১৬৭°	৪৩′	তিতান	২৭°	৩৪′	১৬৭°	৫৬′
তেথিস্	২৮°	১০′	১৬৭°	৫৮′	হাইপেরিঅন	২৮°	±	১৬৭°	±
ডিওনে	২৮°	১০′	১৬৭°	৩৮′	ইএপেতুস্	২৮°	৪৪′	১৪২°	৫৩′

উপগ্রহদিগের সবিশেষ বৃত্তান্ত। তিতান বার্হস্পত্য চন্দ্র চতুষ্টয় অপেক্ষা বড়, এবং মঙ্গল অপেক্ষা অধিক ছোট নহে। বৃহস্পতির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম সে উপগ্রহ ইএপেতুস প্রায় তাহারই মত বড়; এবং ইহার কক্ষাও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ভভ্রম কালও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইএপেতুস্ অপেক্ষা হ্রেয়া কম উজ্জ্বল, এবং হ্রেয়া অপেক্ষা তেথিস্ ও ডিওনে কম উজ্জ্বল। হ্রেয়ার ব্যাস প্রায় ২০০০ মাইল, তেথিস ও ডিওনের ব্যাস প্রায় ১৫০০ মাইল। মিমাস ও এন্‌সিলেডুসের অনুজ্জ্বলত্ব দেখিয়া বোধ হয় উহাদের ব্যাস ১০০০ মাইল। হাইপেরিঅন এতই মন্দ প্রভ যে উহার ব্যাস ৮০০ মাইলের অধিক ধরা যায় না।

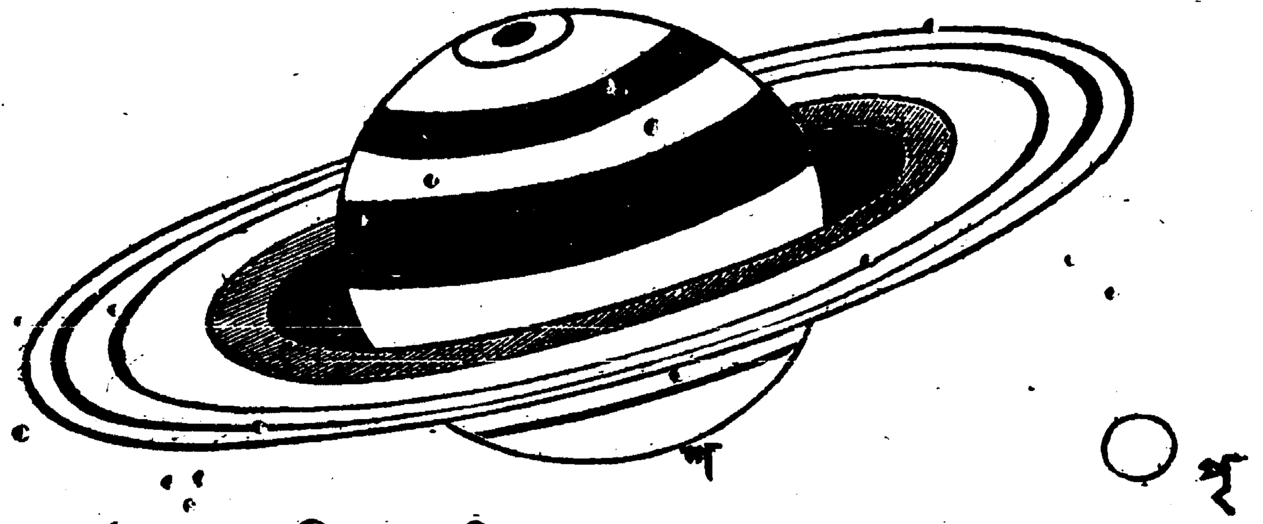

শনি ও পৃথ্বীর সাপেক্ষিক পরিমাণ।

কর্কউডের নিয়ম। শনির প্রথম চারি উপগ্রহের গতি একটি নিয়ম বিশেষে আবদ্ধ। এই নিয়মের কার্য্য এমন ভাবে সম্পন্ন হয় যে উহা উপগ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ সম্ভূত বলিয়া অনুমান হয়। বৃহস্পতির তিন উপগ্রহ এইরূপ এক নিয়মের বশবর্ত্তী

তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সৌরজগতের সাধারণ বিষয়ের বিচারস্থলে যে প্রথা অবলম্বন করেন তদপেক্ষা ইহা অতি গূঢ়তর। এই নিয়মের ব্যাখ্যাস্থলে উপগ্রহগণের দৈনিক গতিরপ্রয়োজন করে।

উপগ্রহ।	দৈনিক গতি।
১	৩৮২°·২০
২	২৬২°·৭৪
৩	১৯০°·৭০
৪	১৩১°·৪০

নিয়ম এই যে,—

৫ (১ম এর গতি) + (৩য় এর গতি) + ৪ (৪র্থ এর গতি) = ১০ (২য় এর গতি)

৫ × ১ম এর = ১৯১১°·০

৩য় এর = ১৯০°·৭   ২য় এর ২৬২·৭৪

৪ × ৪র্থ এর = ৫২৫°·৬   ১০

২৬২৭°·৩ = ২৬২৭·৪ আসন্ন।

নিয়ম যে ঠিক তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এ নিয়মের ভৌতিক কারণ যে কি তাহা অদ্যাপি অবিজ্ঞাত রহিয়াছে।

শনির সান্দ্রত্ব। পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে যে বৃহস্পতি মণ্ডলের অভ্যন্তরে অদ্যাপি প্রভূত তাপ আছে, এবং তজ্জন্য তন্মণ্ডলের সান্দ্রতা এত অল্প। এ যুক্তি শনি সম্বন্ধে দৃঢ়তর রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শনি মণ্ডল এতই লঘু যে ইহাকে পৃথিবীর বায়ুপটলের উপকরণীভূত সসারপদার্থময় জ্ঞান করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। শনির উপগ্রহ সহকারে তদীয় সূর্য্য সাপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর সামগ্রীর সহিত শনির সামগ্রীর তুলনা করা যায়। শনির অপেক্ষা পৃথিবীর সান্দ্রত্ব আটগুণ; ব্যাপারটি সামান্য নহে। শনি জল অপেক্ষাও হাল্‌কা। শনি পরিমিত একটা প্রকাণ্ড জলময় গোল শনি অপেক্ষাও ভারী। আকারে এবং ভারে শনি সমান গোল যদি কল্পিত মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হয় তবে উহা পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ডুবিবে না, উহা ভাসিতে থাকিবে এবং উহার শিকি ভাগ জাগিয়া থাকিবে। অতএব যন্ত্র সাহায্যে নিরীক্ষণ করিয়া যাহাকে আমরা শনি মণ্ডলের পৃষ্ঠজ্ঞান করি, তাহা কোন রূপেই নিরেট হওয়া সম্ভাব্য নহে, উহা উত্তপ্ত অভ্যন্তরের মেঘময় আবরণ। সহজেই মনে হয় বৃস্পতির ন্যায় এ মণ্ডলের বিশালতা প্রযুক্ত অদ্যাপি ইহার তাপের অপচিত হয় নাই। এখানে একটি বিরোধাভাস লক্ষিত হইতেছে। বৃহস্পতি এবং শনি উভয়েই পৃথিবী অপেক্ষা কম সান্দ্র, তন্মধ্যে বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি আরও কম সান্দ্র। বৃহস্পতির এক ঘন মাইল ওজনে শনির

এক ঘন মাইলের দ্বিগুণ, ইহাতে করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে যে বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি অধিক তপ্ত ; কিন্তু বৃহস্পতি বৃহত্তর সুতরাং ইহা শনি অপেক্ষা উষ্ণতর হওয়া উচিত ছিল। যাবৎ না জ্যোতিষ্কগণের উপকরণীভূত ভৌতিক পদার্থের তথ্য লাভ হয় তাবৎ এবম্ভূত বিরোধ ভঞ্জনের প্রয়াস বৃথা। শনি হাল্‌কা হইলেও মণ্ডলের বিপুলতা জন্য পৃথিবী অপেক্ষা আট গুণে ভারি।

শনি হইতে ভুলোক দর্শন। এত সুদূর অবস্থিত শনিলোক হইতে মৃন্ময়ী একটি আলোক বিন্দুবৎ প্রতিভাত হন। ইনি রবির সহচরীর ন্যায় চাপাত্মক ৬° মাত্র অন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু যখন বার্হস্পত্যেরা পৃথ্বীকে কণামাত্রে দেখেন তখন শানেয় গণ বসুমতীর অস্তিত্ব অনুভূত করিতে পারেন কি না তাহা সংশয়ের বিষয়। স্বীকার করুন তাঁহাদের দর্শন শক্তি অত্যন্ত প্রখরা, তাহা হইলেও তাঁহাদের পক্ষে প্রতি পঞ্চদশ বর্ষে ভূম্যাদিত্য যোগ কালেও পৃথিবীকে দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। যাহা হউক যে সকল লোক হইতে আমাদের এই মৃৎকণাটী লক্ষিত হইতে পারে শনি সে সকল লোকের অন্ত্যসীমায় অবস্থিত। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শনির উর্দ্ধ আকাশের লোক সম্বন্ধে আমাদের অস্তিত্ব নাই। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শানেয়েরা যদি আমাদের এই ক্ষুদ্র বাটুলটী আবিষ্কার করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহারা অস্মৎ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিবেন, কারণ তত্রত্য মহামহোপাধ্যায়েরা ভূলোককে জঘন্য দগ্ধীভূত জন শূন্য মরুভূমি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

আক্ষ্যাবর্ত্তন, Axial rotation.
আধিভৌতিক, Physical.
আবর্ত্তিত হন, Rotates.
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, Winter Solistice.
উপাঙ্গ, Appendage.
কিনারা; Edge.
কেন্দ্রগত ব্যাস, Polar diameter.
কেন্দ্র বিমুখ, Centrifugal.
গোলত্বের অপচিতি, Ellipticity.
গ্রহজীবন, Planetary life.
চান্দ্রগিরি, Lunar mountain.
চাপা, Flat.
ছায়াসুত, Saturn.
ছেদ্যক, Illustralion. figure.
জলবিষুব সংক্রান্তি, Autumhal Equinox.
নিরক্ষবৃত্তীয়, Equatorial.
পরিলেখ, Projection.
পীঠ, Side.
পূর্ব্বফল্গুনি, Delta Leonis.
প্রতীপ, Opposite.
বাদামে, Oval.
ভৌতিক কারণ, Physical cause.
মেখলা, Belt.
বলয়, Ring.
বেধ, Depth.
শৌক্রকলা, Phases of Venus.
ষড়ন্তান্তর, Opposition.
সান্দ্রত্ব, Density.
সামগ্রী, Mass.
সৌরলাঞ্ছন, Solar spots.
হাতল, Handle.

চীনের প্রতিযোগী পরীক্ষা।

অতি প্রাচীন কালে যে সকল দেশ হইতে অজ্ঞান তিমির বিদূরীত হইয়া সেখানে সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রথম অরুণালোক বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল চীন দেশ তন্মধ্যে প্রধান। সেই প্রাচীন সভ্য চীন এখনও প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে সুসভ্য রাজ্য বলিয়া পরিগণিত অথচ এমন রক্ষণশীল সমাজ আর কোন দেশে নাই, ভাল হউক আর মন্দ হউক, অনুকরণের প্রতি আর কোন দেশের লোকের এমন বীতরাগ লক্ষিত হয় না। পূর্ব্ব পুরুষের প্রবর্ত্তিত পথে অক্ষুন্নভাবে পদচারণ করাই এ দেশের ব্যবস্থা সুতরাং চীনের বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাস হইতে প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এই সভ্যতা প্রচুর পরিমাণে চীনের শিক্ষাপ্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে এবং তত্রত্য প্রতিযোগী পরীক্ষাই শিক্ষার উন্নতির পরিচায়ক। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন চীনপ্রবাসী চীনের এই প্রতিযোগী পরীক্ষার বিবরণ একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের বঙ্গীয় পাঠকের নিকট তাহা প্রীতিকর হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনদেশে প্রতিযোগী পরীক্ষা প্রচলিত আছে। চীনেদের বিশ্বাস যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া যাহারা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী, কি শাসনক্ষমতা পরিচালনা, কি বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, সকল বিষয়েই এই শ্রেণীর লোকের দক্ষতা দেখা যায়।

চীনে শিক্ষার আদর অত্যন্ত অধিক। সাধারণ শ্রমজীবীগণ পুত্রপৌত্রদিগকে অতি যৎসামান্য লেখাপড়া শিখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে বটে, কিন্তু এই বিস্তৃত দেশের প্রত্যেক অংশেই এমন সকল পরিবার দেখা যায়, যাহারা বংশানুক্রমে সুশিক্ষিত, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতেই পদস্থ রাজকর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়া থাকে; এই সকল লোক কখন কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে যোগদান করে না। অর্থশালী পিতামাতা পুত্রের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে, এবং যাহারা শিক্ষক রাখিয়া বালকবর্গের শিক্ষাদানে অসমর্থ তাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রতিভাসম্পন্ন বালকদিগকে গ্রাম্যপাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেয়। কিন্তু যে সকল বংশ পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত, বিদ্যাবুদ্ধিতে কেহই তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারে না।

চীনদেশের উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ প্রাচীন ভাষার উপরই নির্ভর করে; প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান চীনের উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থসমূহ তাহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের সহিত বহুসংখ্যক টিকাটিপ্পনী সংযুক্ত হইয়াছে। প্রায় সকল দেশেই ভাষার উপর তত্তৎ দেশপ্রবাসী বৈদেশীকের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বদেশের ভাষা সম্বন্ধেই একথা অবিসংবাদিরূপে সত্য; কিন্তু চীনে ভিন্ন দেশবাসী

বিভিন্ন ভাষা প্রবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত বিরল বলিয়া এই দেশের ভাষার উপর বিভিন্ন দেশের প্রভাব লক্ষিত হয় না, কিন্তু তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক চীনভাষার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রথম শিক্ষার্থীগণের সম্মুখে প্রাথমিক পাঠ্যরূপে যাহা প্রদান করা হয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া না দিলে তাহারা তাহার একবর্ণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। রীতিমত ভাষাশিক্ষা হইলে ছাত্রগণকে গদ্য ও পদ্য রচনা অভ্যাস করিতে হয়, গদ্যরচনায় কোন প্রকার আধুনিক শব্দপ্রয়োগ নিষিদ্ধ, কবিতা রচনাতেও প্রাচীন কবিদিগের রচনার অনুকরণ অবশ্যকর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন ছন্দ, শব্দবিন্যাস প্রভৃতিতেও প্রাচীন রীতি অবলম্বনীয়; বলা বাহুল্য, ইহা আধুনিক শব্দযোজনা এবং ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন।

বর্ত্তমান কালে য়ুরোপখণ্ডে যে প্রকার উচ্চ শিক্ষার নিয়ম প্রচলিত আছে, চীনদেশে প্রবর্ত্তিত উচ্চ শিক্ষার নিয়মের সহিত তাহার প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, অথচ য়ুরোপের শিক্ষা সৌকর্য্যের নিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে শিক্ষা বিষয়ে চীনদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কিরূপ উন্নত। অনেকের বিশ্বাস চীনের শিক্ষা প্রণালী দূষিত, এইরূপ শিক্ষাচর্চ্চায় বুদ্ধিবৃত্তি বিকৃত করিয়া দেয়, এবং স্মরণশক্তির অত্যধিক পরিচালনে অন্যান্য মানসিকশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা চীনের কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে উচ্চশিক্ষায় ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতই পরিমার্জ্জিত হয়; ইহারা সুতার্কিক, যুক্তিযুক্তরূপে আলাপ করিতে অভ্যস্ত, এবং ইহারা অকারণে এক প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইয়া প্রগল্‌ভতার পরিচয় দেয় না। তবে একথা সত্য যে শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির ন্যায় ইহারা এককালে বহুবিষয়ের আলোচনায় অনভ্যস্ত, সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে বহুমুখীজ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে ইহারা য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় অনন্যসাধারণ বহুবিষয় শিক্ষা করে না।

চীনের পরীক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে এদেশের রাজনৈতিক বিভাগের উল্লেখ করা আবশ্যক। চীন ও তাহার শাসনান্তর্গত প্রদেশসমূহ দ্বাবিংশতি প্রদেশে বিভক্ত, এক একপ্রদেশে এক একজন স্বস্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা আছেন; এক একটি প্রদেশ আবার দ্বাদশটি জেলায় বিভক্ত, এই সকল জেলার অধিবাসীসংখ্যা সমান নহে—এক একটি জেলায় দশ লক্ষ হইতে বিশ লক্ষ পর্য্যন্ত লোক বাস করে; আবার প্রত্যেক জেলায় দুইটি হইতে আটটি পর্য্যন্ত উপবিভাগ আছে, প্রত্যেক উপবিভাগের পরিমাণফল প্রায় ত্রিশবর্গ মাইল। সকল জেলাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রধান নগর, এবং বিভিন্ন শাসনকর্ত্তা। উপবিভাগগুলির প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস।

চীন দেশে যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভে অভিলাষী, তাহাদিগকে প্রথমে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসীর নিকট হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে হয়, এই প্রশংসাপত্রে লিখিত থাকে যে এই ছাত্রের স্বভাব সৎ, সে কখন কোন অপরাধে দণ্ডিত হয় নাই, তাহার ঊর্দ্ধতন তিন

পুরুষের মধ্যে কেহ নাপিতের ব্যবসায় করে নাই, নাটক অভিনয় করে নাই কিম্বা কোন নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই। এই প্রকার প্রশংসাপত্র সংগ্রহ হইলে সে তাহার নিজের জেলায়—নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের জেলা ভিন্ন অন্য কোন জেলায় তাহার পরীক্ষা প্রদানের অধিকার নাই। এই পরীক্ষায় কত ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং ইহা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিনও নহে, কিন্তু এ পরীক্ষায় কোন উপাধি প্রদত্ত হয় না, তবে ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে নিম্নতম জাতীয় প্রতিযোগী পরীক্ষা প্রদানের অধিকার জন্মে, এবং এই প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ছাত্রজীবনে প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা প্রদানের পর প্রতি তিনবৎসরে দুইবার করিয়া প্রত্যেক জেলায় ছাত্রগণ প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে। এই পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন, কারণ এই পরীক্ষাতে প্রত্যেক জেলায় সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন মাত্র ছাত্রকেই উত্তীর্ণ করা হয়; অতি বৃহৎ জেলায় ২৫টি এবং ক্ষুদ্রতম জেলায় সাত আটটি মাত্র উত্তীর্ণ ছাত্রকে প্রাথমিক উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরীক্ষা বিশেষ কঠিন হইলেও বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ছাত্রগণ দুই একবারের চেষ্টাতেই ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে। অনেকে প্রথমবারেই কৃতকার্য্য হয়।

প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে শরৎকালে উচ্চতর উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হয়, ইহা একই সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরে আরম্ভ ও শেষ হইয়া থাকে; প্রথম উপাধি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্রগণই এই পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী; প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কত বর্ষ পরে এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, সকলেই সুবিধা অনুসারে ইহাতে উপস্থিত হইতে পারে। সমস্ত প্রদেশের প্রায় সাত আট হাজার ছাত্র এই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়, কিন্তু সমগ্র দেশে এই উচ্চতর উপাধির সংখ্যা ১০.৮০টির অধিক নহে। এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে কেহই সাধারণ্যে নিন্দিত হয় না, অনেক পরীক্ষার্থীই পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতি তিনবৎসর অন্তর নির্দ্দিষ্টকালে পরীক্ষামন্দিরে উপস্থিত হয়। চীনসম্রাট অনেক সময় এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোন কোন অশীতিপর বৃদ্ধকে অনুগ্রহস্বরূপ উপাধি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্রাটের এই অনুগ্রহ দান তিন চারি জন মাত্র সৌভাগ্যবান্ বৃদ্ধের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে, এবং যে কোন অশীতিপর বৃদ্ধ এই অনুগ্রহের অধিকারী নহেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যদি বিবেচনা করেন যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও অমুক অমুক বৃদ্ধের প্রশ্নোত্তর সন্তোষজনক হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের জন্য সম্রাটের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। এই সকল অশীতিপর বৃদ্ধ জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া উপাধিলাভ দ্বারা যে কোন পার্থিব স্বার্থসাধনে সমর্থ হন না একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু চীন দেশে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে অসাধারণ সম্মানের অধিকারী, তাহাকেই তাঁহারা তাঁহাদের আজীবনের কঠোর সাধনার যথাযোগ্য পুরস্কার বলিয়া মনে করেন; এই উচ্চতর উপাধি পরীক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক

তিনবৎসর অন্তর বসন্তকালে পিকিন নগরে চীনের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা গৃহীত হয়। চীন সাম্রাজ্যের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি মাত্রেই এই পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী। দূরতম প্রদেশের ছাত্রবর্গ বিবিধক্লেশ এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে না, তথাপি দরিদ্র ছাত্রগণ দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে রাজধানীতে সমাগত হইয়া যাহাতে এই পরীক্ষা প্রদান করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বৃত্তি সংস্থাপিত আছে। প্রায় আট সহস্র ছাত্র তিন বৎসর অন্তর এই শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া থাকে, প্রত্যেক ২০ জন ছাত্রের মধ্যে গড়ে একজন মাত্র, অর্থাৎ শতকরা পাঁচজন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চীন দেশে অল্প আয়াসে উচ্চ শিক্ষার সম্মান লাভ করা যায় না, এবং অতি অল্প সংখ্যক অধিবাসীই এই সম্মান লাভে কৃতকার্য্য হয়। যাঁহারা এই শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন তাঁহাদের পুরস্কারও সামান্য নহে; শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই চীনে উচ্চ-রাজকার্য্যে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, এবং এই পরীক্ষায় যাঁহারা বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করেন তাঁহারা 'হ্যান্‌লিন' অর্থাৎ 'সাহিত্য সমিতির' সদস্য নিযুক্ত হন। ইহা চীন দেশে অত্যন্ত গৌরবের পদ, এই পদ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে।

শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াও যাঁহারা উচ্চতম স্থান অধিকার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে পিকিনস্থিত গবর্ণমেণ্ট আফিসে কোন পদে নিযুক্ত করা হয়, কেহ কেহ বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হন, কিন্তু তাঁহারা প্রথমেই এই পদ প্রাপ্ত হন না, প্রাদেশিক প্রধান নগরীতে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করিয়া শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এবং কোন শাসনকর্ত্তার পদ শূন্য হইলে তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হন। এজন্য কাহাকেও অল্পদিন, কাহাকেও বা দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়। এই সকল লোকের মধ্যে যাঁহারা শুধু পুস্তক লইয়াই কালাতিপাত করেন, তাঁহারা অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম, তাঁহারা উচ্চপদ এবং প্রভূত রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন, এমন কি ইহাতে চীন সাম্রাজ্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠতম পদলাভেরও সম্ভাবনা থাকে।

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের ন্যায় উচ্চতর উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের কোন বিশিষ্ট রাজকীয় পদলাভের অধিকার নাই; এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমাগত তিনবার চেষ্টা করিয়াও নয় বৎসরে যদি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়; যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাঁহাদিগের বাল্যকালের সুখস্বপ্ন এখানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তাঁহারা কোন ঘটিরাম হাকিমের মন্ত্রদাতারূপে নিযুক্ত হন।

কিন্তু চীনের উপাধিধারী ব্যক্তিগণের একটি অতি বৃহৎ অধিকার আছে, এই সকল ব্যক্তি কোন কারণে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন না, চীনের দণ্ডবিধি আইন অনুসারে এই দেশে বেত্রাঘাত দণ্ডের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে ইহা বড় সামান্য অধিকার নহে; এই দেশে অতি সামান্য কারণেই সাধারণের পিঠে বেত পড়িয়া থাকে, এমন কি কোন মোকর্দ্দমার কোন সাক্ষী বিচারালয়ে কোন কথা গোপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু কোন উপাধিধারী ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সে কথা সম্রাটের গোচর করেন, এবং সম্রাটের বিশেষ আদেশক্রমে সেই ব্যক্তির পিঠেও চাবুক পড়িতে পারে; এমন কি অপরাধ গুরুতর হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সম্রাটের সম্মতি ব্যতীতও তাহার উপাধি কাড়িয়া লইতে পারেন।

চীনে পরীক্ষা গ্রহণের প্রণালী অতি আশ্চর্য্য এবং অন্য কোথাও এরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে কিনা সন্দেহ। পিকিননগরে কিরূপ প্রণালীতে শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয়, আমরা এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশ করিতেছি।

পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম, বাসস্থান, যোগ্যতার পরিচয় এবং তাহার শারীরিক গঠনের বিবরণসহ একখানি আবেদনপত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হয়, তিনখানি অতি দীর্ঘ এবং সুন্দররূপে ভাঁজ করা কাগজের বহির্দ্দেশে এই সকল বিবরণ লিখিত থাকে। পরে এই কাগজ পরীক্ষামন্দিরে পরীক্ষার্থীর হস্তে প্রদত্ত হয় এবং তাহারই ভিতর পরীক্ষার্থীগণের রচনা লিখিবার নিয়ম। আমাদের দেশের ন্যায় তিন চারি ঘণ্টা পরীক্ষামন্দিরে কাটাইয়াই চীন পরীক্ষার্থীগণ নিস্কৃতি পায় না, পরীক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেখানে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়। এই তিনদিন তিন রাত্রি তাহারা সেই গৃহে বন্দী, সুতরাং লেখাপড়ার সরঞ্জাম ছাড়াও তাহাদিগকে নিজের শয়ন ভোজনের আয়োজন করিয়া লইতে হয়; পরীক্ষার্থীগণ এখানে দ্বিতীয় দিবসে রাজ-সরকার হইতে মুষ্টিমেয় চাউল পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় দিবসের জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই, বিশেষতঃ এই রাজদত্ত চাউলের যেরূপ আকার, তাহাতে যে সকলে তাহা পরিপাক করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্প, অতএব রাজার আতিথ্যে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়াই অন্ততঃ প্রত্যেক বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থীই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এমন কি কোন কোন পরীক্ষার্থী একটি ছোট উনন এবং কিছু কয়লা পর্য্যন্ত সঙ্গে লয়, ইহাতে ইচ্ছামত চা খাইবার বিশেষ সুবিধা, কিন্তু দেশলায়ের বাক্স ও বাতি লইতে ভুল হওয়া প্রার্থনীয় নহে; তামাকখোরেরা চুরুট ও পাইপ সঙ্গে লইতে পারেন, এতদ্ভিন্ন শয়নোপযোগী বিছানা, লেপ বালিশ প্রভৃতি লওয়াও কর্ত্তব্য। পরীক্ষার্থীকে এই সকল বোঝা স্বয়ং ঘাড়ে লইয়া পরিক্ষামন্দিরে নিজের স্থানটিতে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়, কারণ এখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। আমাদের দেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুর্ব্বল যুবকগণের নিকট

এই সকল লটবহর ঘাড়ে করিয়া বহিয়া যাওয়াও এক বিষম পরীক্ষা বলিয়া অনুমান হইবে।

পরীক্ষামন্দির একপ্রকার মন্দির বিশেষই, চারিদিকের প্রাচীর এত উচ্চ যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য, কুঠুরীগুলি সংকীর্ণ এবং ক্ষুদ্র, এক একটি কক্ষের পরিসর ৬ ফিটের অধিক নহে, তাহাদের তিনদিকে প্রাচীর অবশিষ্ট একদিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার এবং তদনুরূপ গবাক্ষ। প্রত্যেক কক্ষদ্বারের সম্মুখে এক একখানি তক্তা ইষ্টকস্তূপের উপর পতিত থাকে, ইহাই পরীক্ষার্থীর বসিবার আসন, তাহার সম্মুখে আর একখানি তক্তা অপেক্ষাকৃত উঁচু করিয়া গাঁথা, তাহাতে টেবিলের কাজ হয়। পরীক্ষার্থীগণ এই দুখণ্ড তক্তা টানিয়া একত্র করিয়া রাত্রে তাহার উপর শয়ন করে। পরীক্ষামন্দিরের মধ্যস্থলে একটি সমুচ্চ বেদী থাকে, পরীক্ষাকালে পরিদর্শকগণ সেই বেদীর উপর বসিয়া পাহারা দেন, পরীক্ষামন্দিরের পশ্চাতে একটি গুপ্ত গৃহ আছে, পরীক্ষার কয়দিন পরীক্ষকগণ এই গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরীক্ষার্থীদিগের কাগজপত্র পরীক্ষা করেন। এই সময় তাঁহাদের বহির্গমন নিষেধ, এমন কি পরীক্ষাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হওয়ারও নিয়ম নাই।

পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীগণের স্ব স্ব আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে একদিন লাগে। কেহ যদি কোন পাঠ্যপুস্তকের কোন ক্ষুদ্র সংস্করণ আনিয়া অবৈধ উপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করে এই সন্দেহে পরীক্ষাগৃহে প্রবেশকালে ছাত্রবর্গের কাপড়চোপড় অনুসন্ধান করা হয়। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার্থীদিগের 'হাজিরা ডাকা' হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নাম ও পরিচয়জ্ঞাপক এক একখানি কাগজ বিতরিত হইয়া থাকে, এই কাগজেই পরীক্ষার্থীদিগের রচনা লিখিবার নিয়ম। এই কাগজের উপর পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষাগৃহের নম্বর এবং রাজকীয় মোহর অঙ্কিত থাকে। এই কাগজ বিতরণের অল্পকাল পরে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে এক একখানি ক্ষুদ্র প্রশ্নপত্রিকা প্রদত্ত হয়,—ইহাতে রচনার প্রশ্ন ছাপা থাকে, প্রশ্নের কতকগুলি পদ্য কতকগুলি গদ্য; পরীক্ষার্থীগণ দিবসের যখন ইচ্ছা এই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে, কেহ প্রশ্ন পাইয়াই লিখিতে আরম্ভ করে, অনেকে খাইয়া, ঘুমাইয়া, বিশ্রামান্তে উত্তর লিখিতে বসে। তৃতীয় দিনের মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কাগজ ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর ছুটি। যদি কেহ অসাবধানতাবশতঃ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে এই নাম নম্বরবিশিষ্ট মোহরাঙ্কিত কাগজখানি হারাইয়া ফেলে, কিম্বা তৃতীয় দিবসে উত্তরের কাগজগুলি প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে সে পরীক্ষাদানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পরীক্ষার তিনদিন বিভিন্নবিষয়ে শুধু রচনাই লিখিতে হয়, এবং তিনদিনই নূতন নূতন বিময়ে প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই রচনার বিষয় নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ই প্রধান। চীনের পরীক্ষাপ্রণালী অনেক দেশের পরীক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা কঠোর, যাহারা দুর্ব্বল, কিম্বা রুগ্ন, তাহারা অনেক সময়ই এই গুরুতর শ্রম সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং পরীক্ষা দিতে

আসিয়া অনেকেই পীড়িত হয়, মৃত্যুসংখ্যাও নিতান্ত বিরল নহে; তথাপি য়ুরোপের অনেক সবলকায়, কষ্টসহ পরীক্ষার্থী অপেক্ষা চীনের ক্ষীণকায় ছাত্রগণ পরীক্ষাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য কঠোরতর পরিশ্রম করিয়া থাকে।

পরীক্ষকগণ যাহাতে কোন প্রকার পক্ষপাত প্রকাশ করিতে না পারেন এজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়; পরীক্ষকের সংখ্যা আট দশজন, অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষককে গড়ে সাত আট শত পরীক্ষার্থীর কাগজ দেখিতে হয়; এই সকল পরীক্ষকের উপর একজন প্রধান পরীক্ষক ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন, পিকিনের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী প্রধান পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, উচ্চপদমর্য্যাদাশালী ভিন্ন তাঁহার প্রভূত জ্ঞানশালীও হওয়া আবশ্যক, চীন সম্রাট স্বয়ং এই পদে লোক নির্ব্বাচন করেন। পরীক্ষার্থীগণের নাম পারদর্শীতানুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের অনেকের ন্যায় চীনের বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর বিশ্বাস যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রচুর পরিমাণে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। যতদূর সতর্কতা অবলম্বনীয়, তাহা অবলম্বন করা সত্ত্বেও চীনে শতকরা তিন চারিজন ছাত্র অবৈধ উপায়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উপাধি লাভ করে; তন্মধ্যে দুইটি উপায় প্রধান; প্রথম, কেহ কেহ পরিদর্শকের সহিত যোগ দিয়া পরীক্ষা মন্দিরের বহির্দ্দেশ হইতে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ক রচনা লিখাইয়া আনে; দ্বিতীয়, কোন সহযোগী পরীক্ষার্থীর লিখিত রচনা চাহিয়া লইয়া নকল করিয়া দেয়। কোন কোন প্রতিভা সম্পন্ন দরিদ্র পরীক্ষার্থী কোন ধনবান ছাত্রের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া অনেক সময়ই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কেহ একাই ক্ষিপ্রহস্তে দুই সেঠ রচনা লিখিয়া তাহার এক সেঠ অন্যকে প্রদান করে। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, একজন পরীক্ষার্থীর নাম করিয়া আর একজন পরীক্ষা দিয়া আসিল, প্রকৃত পরীক্ষার্থী হয়ত সে অঞ্চলেই নাই! কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যক্তি ভিন্ন ও বিশেষ স্বার্থ না থাকিলে কেহ এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে না, কারণ প্রতারণা ধরা পড়িলে অতি কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হয়! বিশেষতঃ যাঁহারা এই সকল দুরূহ প্রশ্নের উত্তর করিতে সক্ষম, তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে এরূপ হীন প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে কদাচিৎ দেখা যায়; কিন্তু সকল দেশেই অর্থ অনর্থের মূল, অনেক দুষ্টবুদ্ধি চৈন লক্ষপতির সন্তান প্রচুর অর্থব্যয় পূর্ব্বক, কৌশলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার এমন সকল ফন্দি আবিষ্কার করে, যে তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে অতি বুদ্ধিমান এবং সুচতুর পরীক্ষককেও বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

চীন দেশে উপাধি ক্রয় করাও সম্ভব নহে; প্রধান পরীক্ষক অতিরিক্ত অর্থগৃধ্নু হইলে তাঁহাকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সহজ নহে, কারণ এরূপ উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ অর্থলোভের অতীত, বিশেষতঃ এই চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

যদি কোন পরীক্ষক কোন প্রকার পক্ষপাতের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হয়, এখানে ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পিকিননগরে এইরূপ একটি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। চীন সম্রাটের জনৈক প্রধান অমাত্য এই সময় প্রধান পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এই যুবক বুদ্ধিমান, সুচতুর এবং বিবিধপ্রকার গুণে বিভূষিত; একদিন অমাত্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের মধ্যে উচ্চস্থান। প্রদান করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে উক্ত অমাত্য মহাশয় স্ত্রীর অনুরোধে কর্ত্তব্য জ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পক্ষপাত

সহকারে সেই যুবকটিকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিলেন ! ব্যাপারটি প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনাপারম্পর্য্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই যুবকটি অতি সুন্দর অভিনয় করিতে পারিতেন, পরীক্ষার এক মাস পরে পিকিনের কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়গৃহে এক সখের থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় ; আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি চীন দেশে কোন অভিনেতার পৌত্র পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী নহে, অতএব এরূপ অবস্থায় অভিনেতাগণ যদিও আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয় না, তথাপি চীন দেশে নাটক অভিনয় যে গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, ইহা সহজেই অনুমান হইতে পারে ; কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় যশস্বীব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক কার্য্য অতি অল্পই আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত আমোদপ্রিয় যুবক এই নিমন্ত্রণের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চীন দেশে রমণীর অভিনয় পুরুষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, রমণীগণ অভিনয় কার্য্যে যোগদান করেন না ; এই যুবক অতি দক্ষতার সহিত নাটকস্থ নায়িকার অভিনয় সম্পন্ন করেন ; তাঁহারি অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যুবকের পরিচিত জনৈক দর্শক কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট একজন দর্শককে বলিলেন যে এই যুবক কেবল একজন সুদক্ষ অভিনেতা নহেন, গত সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন ; ক্রমে একজন রাজকর্ম্মচারীর কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিল, এবং অবশেষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুবকের এই গর্হিত অনুষ্ঠানের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। যুবক সম্বন্ধে নানা প্রকার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, এবং তিনি কিরূপে পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থানলাভ করিলেন তাহাও গোপন রহিল না। কর্ত্তব্যচ্যুতি অপরাধে সম্রাটের পূর্ব্ব কথিত অমাত্য প্রধান পরীক্ষক মহাশয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন ; এই ব্যক্তি সম্রাটের অতি দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন প্রকার লঘুদণ্ড বিধান পূর্ব্বক তাঁহাকে সেবারের মত ছাড়িয়া দিবার জন্য সম্রাটের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু সম্রাটের আর একজন প্রধান কর্ম্মচারী সম্রাটকে জ্ঞাত করিলেন যে, এরূপ গুরুতর অপরাধে দণ্ডের পরিমাণ লঘু করিলে দেশে নীতি ও কর্ত্তব্যের সম্মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই হতভাগ্য পরীক্ষককে পিকিনের সাধারণ বধ্যভূমিতে দর্শকবর্গের সম্মুখে, প্রকাশ্যভাবেই বধ করা হইল।

যে সকল পরীক্ষার্থী উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা করে, তাহাদের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহাও লঘু নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে সাংহাই প্রদেশের একজন ভদ্রলোক কোন কোন পরীক্ষার্থীর প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশের অনুরোধ করিয়া প্রধান পরীক্ষক মহাশয়ের নিকট পনের হাজার টাকার একখানি চেক পাঠাইয়াছিলেন ; প্রধান পরীক্ষক এই ব্যক্তির কু-অভিপ্রায়ের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর করায়, যথারীতি বিচারের পর সেই উৎকোচ প্রেরকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কোন নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেও চীনে অতি গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে, এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইহাদের এই যে প্রবল অনুরাগ, তাহা বহুশতাব্দীর অচঞ্চল সভ্যতার স্বাস্থ্যকর প্রভাবের ফল।

কাটরার মস্‌জীদ ।

জাহানকোষা তোপ ।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান্-রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবচিহ্ন সমস্তই ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী কালের অনন্ত গর্ভে তাহারা চিরদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। দুই শত বৎসর অতীত হইতে না হইতে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী তিন চারি ক্রোশব্যাপী নগরের অধিকাংশ এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত। তাহার বিরাট-সৌধমালা অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে। দিল্লী, আগরা, এমন কি প্রাচীনতম গৌড় পর্য্যন্ত ভগ্ন-অট্টালিকাস্তূপ বক্ষে করিয়া আপনাপন পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাহাদের বহু পরে নির্ম্মিত মুরশিদাবাদ শ্রীহীন, চিহ্নহীন, গৌরবহীন হইয়া ধ্বংসের শেষ আঘাত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুর্শিদাবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনার মঙ্গলঘটকে ভাগীরথী-বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া যেন আর আসিবেন না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রত্নরাজিমণ্ডিত মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, গজদন্ত-নির্ম্মিত সিংহাসন শতখণ্ডে বিভক্ত, পরিধানের বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র শতগ্রন্থিযুক্ত, বাদলার মালা বালকের ক্রীড়নক হইয়াছে। * সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় চিত্রকে যেন মলিনতার ছায়া দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ন্যায় এত শীঘ্র অধঃপতন আর কোন স্থানের ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের কত অট্টালিকার নাম শুনা যাইত, চেহেল-সেতুন, এম্‌তাজ্‌মহাল্, মহালসরা, আর কত নাম করিব। এই সমস্ত এক্ষণে কালগর্ভে শায়িত। কোন কোনটীর স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। কোন কোনটীর স্থানের চিহ্নমাত্রও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না! দুই একটী সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত ইহার পূর্ব্বপরিচয়ের আর কিছুই নাই। যাঁহারা মুর্শিদাবাদের নিজামতী আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই নূতন নূতন অট্টালিকায় ও উদ্যানে মুর্শিদাবাদকে পরিশোভিত করিতে চেষ্টা করেন। তদ্ভিন্ন নবাবের কর্ম্মচারী ও জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধনাঢ্যবর্গের সৌন্দর্য্যময়ী সৌধমালা ভারতসম্রাটের রাজধানী দিল্লী নগরীর সহিতও সময়ে সময়ে স্পর্দ্ধা করিত। জানি না, ভাগ্যলক্ষ্মী কেন মুর্শিদাবাদের প্রতি এরূপ বিরূপ হইলেন। রাজসম্মান সকলের ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না। তাই বলিয়া একেবারে যে তাহার শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবে, ইহাও বড় আক্ষেপের বিষয়। দিল্লী আগরার যাহা আছে, তাহাতে এক্ষণেও তাহাদিগকে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়,

* গজদন্তের দ্রব্যাদি মুর্শিদাবাদ-শিল্পের নিদর্শন।

কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, মুর্শিদাবাদকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে।

মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হয়। পূর্ব্বে ইহাকে মুক্সুদাবাদ বলিত। মুক্সুদাবাদ একটী সামান্য নগরমাত্র ছিল, মুর্শিদ কুলি খাঁ ইহাতে রাজধানীর ও রাজকার্য্যের উপযোগী অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন। কেল্লা, দরবারগৃহ, এবং অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; কেবল তাঁহার নির্ম্মিত এক বিরাট মস্‌জীদ অদ্যাপি তাঁহার নাম প্রচার করিতেছে! মস্‌জীদটী ধ্বংসমুখে পতিত, দুই চারি বৎসরের মধ্যে তাহাও লয়প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের সহিত মুর্শিদ কুলীর নামের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিবে। যদি কেহ মুর্শিদাবাদ-স্থাপয়িতার শেষ গৌরবচিহ্ন দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে ধ্বংসমুখে পতিত সেই বিরাট মস্‌জীদ একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিবেন। দেখিবেন যে, ধ্বংসপ্রায় সেই ভগ্নস্তূপ আজিও মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ। কিন্তু কাল বোধ হয়, অধিক দিন মুর্শিদ কুলী খাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভকে ধরণীবক্ষে অবস্থান করিতে দিবে না।

মুর্শিদাবাদের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে এই বৃহৎ মস্‌জীদ অবস্থিত। যে স্থানে মস্‌জীদ নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কাটরা কহে। কাটরা-মস্‌জীদ নির্ম্মাণের সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, আমরা প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায়, এবং শীঘ্র শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে জানিয়া, তিনি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দেন। তথায় একটী মস্‌জীদ, কাটরা বা গঞ্জ স্থাপিত করিবার কথাও থাকে। উক্ত কাটরা হইতে এক্ষণে স্থানটীর নাম কাটরা হইয়াছে। মোরাদ ফরাস নামে একজন সামান্য অথচ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সেই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। নগরের পূর্ব্বদিকে খাসতালুকের অন্তর্গত একটী স্থান সেই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলে, মোরাদ নিকটবর্ত্তী হিন্দুমন্দির সকল ভূমিসাৎ করিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা উক্ত কার্য্য আরম্ভ করে। জমীদার ও অন্যান্য হিন্দুগণ যে কোন পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া আপনাদিগের মন্দির রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু কোন প্রকার অনুনয় বা উৎকোচ কার্য্যকর হয় নাই; মুর্শিদাবাদ হইতে তিন চারি দিনের পথে কোথাও একটীমাত্র মন্দিরও অবস্থিতি করিতে পারে নাই। দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত হিন্দু-মন্দির সকল ভাঙ্গিবার প্রস্তাব হইলে, সেই সেই স্থানের অধিবাসীগণ অর্থ দিয়া সে সকল মন্দির রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুদিগের ভৃত্যবর্গকে সমাধি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। যাহাদিগের প্রভুরা অর্থ প্রদান করিতেন, তাহারা নিষ্কৃতি পাইত। সকলকে মোরাদ ফরাসের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। কাটরা বা একটী গঞ্জ স্থাপন করিয়া তাহার আয় সমাধি-সংস্কারের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

ভগ্ন মন্দিরের উপকরণ লইয়া কাটরা মস্‌জীদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের মতে অনেকে সন্দিহান হইয়া থাকেন। * একেবারে মিথ্যা না হইলেও ইহার অধিকাংশ অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, মোরাদকে এক বৎসরের মধ্যে মস্‌জীদ নির্ম্মাণের আদেশ দিলে, মোরাদ জাফর খাঁর নিকট হইতে অনুমতি লয় যে, তাহার কার্য্যে নবাব যেন কোনরূপ বাধা প্রদান না করেন। এই এক বৎসরের মধ্যে এই বৃহৎ মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করা যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং মোরাদ এক বৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিতে গেলে কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। এই জন্য নিকটবর্ত্তী মন্দিরাদি ভঙ্গ করিয়া থাকিবে। কেবল মন্দির বলিয়া কেন, নিকটস্থ অন্যান্য ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদিরও উক্ত দশা হইবার সম্ভাবনা। মুর্শিদ কুলী খাঁ হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মন্দিরভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা না হইতেও পারে। কারণ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ-প্রথার তিনি নিজে কোনরূপ আদেশ প্রদান করেন নাই, এবং এক বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকাণ্ড মস্‌জীদ ও সমাধি নির্ম্মাণ অসম্ভব বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি বাধ্য হইয়া মোরাদের অত্যাচারের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু মোরাদ ফরাসের অত্যাচার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ মুর্শিদ কুলীর জামাতা ও তাঁহার পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীন মোরাদ ফরাসের অত্যাচারের জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। †

হিজরী ১১৩৭ অব্দে ‡ মস্‌জীদনির্ম্মাণ শেষ হয়। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জীদের অনুকরণে

---

* "তারিখ বাঙ্গালা" গ্রন্থে প্রথমে এই মন্দিরভঙ্গ ব্যাপারের কথা লিখিত হয়। গ্ল্যাডউইন সাহেবকৃত তাহার ইংরাজী অনুবাদ হইতে ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি মন্দিরভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রিয়াজুস্ সালাটীনের অধিকাংশ "তারিখ বাঙ্গালা" হইতে গৃহীত হইলেও তাহাতে মন্দিরভঙ্গের কথা নাই। মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুরের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ ফজ্‌লে রব্বী খাঁ বাহাদুর মন্দিরভঙ্গের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না। বেভারিজ সাহেব উক্ত বিবরণকে অযৌক্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রচলিত ইতিহাসে ৪ দিনের পথের সমস্ত হিন্দুমন্দির ভগ্ন হওয়ার কথা লিখিত আছে, অথচ মুর্শিদাবাদ হইতে ১॥ ক্রোশ দূরে কিরীটেশ্বরীর মন্দির সমভাবে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। "The tale in its original form, is even more preposterous, for in Gladwin's translation of the Mahamadan narrative, and in Stewart, the prohibitory distance is given as four days." (Calcutta Review, October 1892).

কিন্তু মুর্শিদাবাদের তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থস্থান কিরীটেশ্বরীর সহিত বাঙ্গালার রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী বঙ্গাধিকারী কাননগোগণের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, মোরাদের ন্যায় একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী তাহা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। উক্ত মন্দিরভঙ্গের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও "তারিখ বাঙ্গলা"র লিখিত বিষয় যে একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা একথা সাহস করিয়া বলা যায় না।

† Riyazu-s-salatin p. 292.

‡ ইংরাজি ১৭২৩।২৪

ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মস্‌জীদের সঙ্গে মিনার, চৌবাচ্চা ও ইন্দারা প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। মুর্শিদ কুলী খাঁ মস্‌জীদ নির্ম্মাণের পর একবৎসরের কিছু অধিককাল জীবিত ছিলেন। হিঃ ১১৩৯ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার আদেশে মস্‌জীদের প্রবেশদ্বারের সোপানাবলীর নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া তথায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি বিনয়সহকারে বলিয়াছিলেন যে, উপাসকদিগের পদধূলি যেন তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হয়। সাধুদিগের পদধূলি পরজগতে তাঁহার কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারে বলিয়া তিনি এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ যেরূপ আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, তাহাতে তাঁহারপক্ষে এরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ বড় বিচিত্র নহে।

কাটরার মস্‌জীদ এক্ষণে ভগ্নদশায় উপস্থিত, তথাপি ইহার বিরাট গৌরবের নিদর্শন এখনও অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমরা ইহার বর্ত্তমান অবস্থার একটী চিত্র প্রদান করিতেছি। মস্‌জীদের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে সদর রাস্তা, রাস্তা হইতে মস্‌জীদের দক্ষিণপার্শ্বের একটী পথ দিয়া মস্‌জীদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। মস্‌জীদ পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। প্রবেশদ্বারে উঠিতে হইলে চৌদ্দটী বৃহৎ সোপান অতিক্রমের প্রয়োজন। এই সোপানাবলীর নিম্নে, একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা ইতিহাসখ্যাত মুর্শিদ কুলী খাঁ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। যাঁহার শাসনে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি সোপানাবলীর নিম্নস্থ অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে শায়িত রহিয়াছেন। উত্তরদিকে একটীমাত্র দ্বার, সেই দ্বার প্রায়ই রুদ্ধ থাকে। সময়ে সময়ে ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত হয় মাত্র। দ্বারের পরেই একটী ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার পশ্চাতে সমাধি-প্রকোষ্ঠ, সেই ক্ষুদ্র গৃহ ও সমাধি-প্রকোষ্ঠের মধ্যে আর একটী দ্বার, এ দ্বারের কোন কপাট নাই। কষ্ঠী-প্রস্তর-গঠিত চৌকাঠ দ্বারা দ্বারটী নির্ম্মিত। প্রকোষ্ঠ মধ্যে শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত সমাধি নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত মালাশোভিত হইয়া আছে। লোকে আপনাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য সমাধির উপর এই সমস্ত মালা নিক্ষেপ করিয়া যায়। এই অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে একটী মাত্র দীপ আপনার ক্ষীণশিখা বিস্তার করিয়া থাকে। সমাধির তত্ত্বাবধারণের জন্য একটী লোক নিযুক্ত আছে। সোপানাবলীর উপরে একটী প্রকাণ্ড তোরণদ্বার, তোরণদ্বারের উপর দ্বিতল নহবতখানা, তোরণদ্বারের পূর্ব্বসীমা অর্থাৎ সোপানাবলীর অব্যবহিত পূর হইতে আরম্ভ করিয়া মস্‌জীদের পশ্চাদ্‌ভাগ পর্য্যন্ত একটী বিশাল চত্বর। চত্বরটী সমচতুরস্র, দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১১০ হস্তেরও অধিক হইবে। মস্‌জীদ, তোরণ, সমস্তই এই চত্বরে অবস্থিত। তোরণ পার হইয়া প্রায় ৮০ হাত পরে মস্‌জীদ, মস্‌জীদ ও তোরণের মধ্যস্থিত বিশাল প্রাঙ্গণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কেবল তোরণ হইতে মস্‌জীদে যাইবার কৃষ্ণপ্রস্তরমণ্ডিত পথটী আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। চত্বরের পশ্চিমদিকে পঞ্চগম্বুজবিশিষ্ট বিরাট মস্‌জীদ অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়া কালের আঘাত সহ্য করিতেছে। মস্‌জীদের ভিত বসিয়া

যাওয়ায় খিলান করা গম্বুজগুলি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গম্বুজ পাঁচটী ব্যতীত চারি কোণে চারিটী ক্ষুদ্র মিনার ছিল, তাহার দুই একটী এখন বর্ত্তমান আছে। মস্‌জীদটী ইষ্টকনির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ইষ্টক জমাইয়া একরূপে এই বিশাল পঞ্চগম্বুজের খিলান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মস্‌জীদটী দৈর্ঘ্যে ৮৬.৮৭ হাত হইবে, এবং প্রস্থে ২৬ হাতেরও অধিক। গম্বুজগুলির ধাতুনির্ম্মিত চূড়া আজিও তাহাদের পতনোন্মুখ মস্তকে শোভা পাইতেছে। মসজীদের প্রবেশদ্বারে প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত চৌকাঠ। দ্বারের উপর একখণ্ড কষ্ঠীপ্রস্তরে ফারসীভাষায় এইরূপ লিখিত আছে, “আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব, যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাহার মস্তকে ধূলিবৃষ্টি হউক।” ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর কন্যা পরীবিবির সমাধিমন্দিরেও ঐরূপ লিখিত আছে। মস্‌জিদের মধ্যস্থলে পশ্চিমদিকের ভিত্তিতে ফল্‌সী-লেখা। ইহার উত্তরদক্ষিণ পার্শ্বের জানালা দুইটী আজিও বাঙ্গলার পূর্ব্বশিল্পের পরিচয় দিতেছে। অনেকগুলি গম্বুজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উপর হইতে ক্রমাগত ইষ্টকখণ্ড পতিত হইতেছে। এই মস্‌জিদমধ্যে প্রবেশ করিতে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কেবল কপোত ও মধুমক্ষিকাগণ আপনাদিগের উপযুক্ত আবাসস্থান বিবেচনায় মসজীদ্‌টীকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, এবং নীরব ও নির্জ্জন স্থানে সময়ে সময়ে আপনাদিগের কণ্ঠস্বরে আপনারাই মুগ্ধ হইয়া থাকে। চত্বরের চারিপার্শ্বে মুসাফীর ও কারীদিগের (কোরাণ পাঠার্থী) জন্য বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। এখনও তাহাদের ভগ্নাবশেষ নয়নপথে পতিত হইয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর বিশাল কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। মস্‌জীদের পশ্চাদভাগে উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে দুইটী অত্যুচ্চ অষ্টকোণ মিনার গগনস্পর্শ করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উত্তরপশ্চিমের মিনারে যাইবার সুবিধা নাই, তাহার চারিদিক ভীষণ জঙ্গলে আবৃত। দক্ষিণপশ্চিমের মিনারে উঠিতে পারা যায়, সর্পগতিতে ৬৭টি সোপান অতিক্রম করিয়া মিনারের চূড়াতলে উঠিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আলোক ও বায়ু প্রবেশের দ্বারও আছে। মিনারটী প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ হইবে, চূড়াতল হইতে ভূমি পর্য্যন্ত অংশ প্রায় ৩০ হস্ত। এই চূড়াতলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মুর্শিদাবাদ নগরের এক সুন্দর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। পূর্ব্বে আরও সুন্দর বোধ হইত, এক্ষণে বৃক্ষাদির সংখ্যা অধিক হওয়ায়, মুর্শিদাবাদের সুন্দর চিত্রকে অনেকটা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এক্ষণে যাহা আছে, তাহাও বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বিস্মৃতির ছায়াময় স্তর হইতে অনেক দিনের স্মৃতির অস্ফুট আলোকের ন্যায় সেই বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল পত্ররাশির মধ্যে মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান প্রাসাদগুলির ছবি বড়ই সুন্দর বোধ হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই মনোরম চিত্র দেখিতে ইচ্ছা হয়। মুর্শিদ কুলী খাঁর শেষ বিরাট-কীর্ত্তি অচিরকাল মধ্যেই ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। যাহা হইতে মুর্শিদাবাদের নাম ও গৌরব, যিনি মুর্শিদাবাদকে বাঙ্গলার রাজধানী করিয়া সমগ্র জগতে তাহার গৌরব-গাথা প্রচার করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ হইতে যদি তাঁহার শেষ চিহ্ন চিরদিনের জন্য লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। জানি না কাটরার মস্‌জীদসংস্কার আর হইবে কি না? যদিও অনেক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা বটে, তথাপি মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতার শেষচিহ্ন সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেবল তাঁহার সমাধিটীর মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইয়া থাকে।

কাটরা মস্‌জীদ হইতে পশ্চিমদিকে কিছুদূরে আর একটী মস্‌জীদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে ফৌতিমস্‌জীদ কহে। মুর্শিদের দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ উক্ত মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিতে করিতে আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত যুদ্ধার্থে গিরিয়া প্রান্তরে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। তদবধি মস্‌জীদটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। ইহা কাটরার পঞ্চগম্বুজ-মস্‌জীদের অনুকরণে নির্ম্মিত হইতেছিল। ইহার পাঁচটী গম্বুজের মধ্যে দুইটী আজিও বর্ত্তমান আছে। সেই অসম্পূর্ণ মস্‌জীদও ভগ্নদশায় পতিত, বিশেষতঃ এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

কাটরার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে দুইটী অশ্বত্থতরু, অথবা একটী অশ্বত্থতরুর দুইটী কাণ্ড সংলগ্ন হইয়া এক বিশাল কামান অবস্থিতি করিতেছে। এই কামানের নাম জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী। এই স্থানে মুর্শিদ কুলীখাঁর কামানাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত আছে। সেই জন্য এই স্থানটীকে আজিও সাধারণে তোপখানা কহিয়া থাকে। এই তোপখানার উত্তর দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী সর্পগতিতে আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া আপন মনে বহিয়া যাইতেছে। জাহানকোষা অনেক দিন পর্য্যন্ত ধরণীবক্ষে স্বীয় বিশাল বপুঃ বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, ইহার পার্শ্বে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়া জাহানকোষাকে ভূতল হইতে কতকটা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে। কামানটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ হাত হইবে, বেড় ৩ হাতের অধিক, মুখের বেড়টী ১ হাতের উপর। অগ্নিসংযোগ-ছিদ্রের ব্যাস ১॥ ইঞ্চ হইবে। কামানের গাত্রে ফারসীভাষায় খোদিত ৯ খণ্ড পিত্তলফলক আছে। ৩ খণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট, অবশিষ্ট কয়েকখানিও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিত্তলফলকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ইস্‌লাম খাঁর গুণবর্ণনা ও কামানের নির্ম্মাণাদ্দাদি খোদিত আছে। এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাজাহানের রাজত্বকালে, ও ইস্‌লাম খাঁর বাঙ্গলা-শাসনের সময়, জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা সেরমহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন * কর্ম্মকারকর্ত্তৃক ১০৪৭ হিঃ ১১ই জমাদিয়স্‌সানি মাসে নির্ম্মিত হয়। ওজনে ২১২ মণ—২৮ সের ধর্রুদ লাগিয়া থাকে।

জাহানকোষাকে এক্ষণে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সিন্দূরাদি লেপন করিয়া পূজা করিয়া থাকে। ঢাকায় ইহা অপেক্ষা আরও একটী বিশাল তোপ ছিল, তাহা এক্ষণে নদীগর্ভে পতিত। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানেও বৃহৎ তোপের কথা শুনা গিয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার শিল্পাদির দিন দিন যেরূপ অবনতি হইতেছে, তাহাতে লোকে ইহার পূর্ব্বশিল্পের কথা প্রবাদবাক্য বলিয়া মনে করিবে।

* এই জনার্দ্দনকে বেভারিজ প্রভৃতি জনার্জ্জন বলিয়া লিখিয়াছেন। পিত্তলফলকের লেখা এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়াছে, ভাল করিয়া পড়িবার সুবিধা নাই, কিন্তু উহা জনার্দ্দন হইবারই সম্ভাবনা।

হিন্দুয়ানী ও সমুদ্রযাত্রা।

মহাভারত ও রামায়ণের ভৌগলিকেরা পৃথিবীকে কুমেরু ও সুমেরু এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন; পৌরাণিকেরা সমুদ্রের তরঙ্গের গতির অনুসরণ করিয়া ধরণীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করেন; ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া একের নাম "প্রাচীন পৃথিবী," অপরের নাম "নূতন পৃথিবী" রাখিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের বিশ্লেষণস্থলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা 'পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' এই দুই নাম রাখেন; কিন্তু তাহার সহিত ভৌগলিকের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই সকল ভাগ ও বিভাগের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষ, একটাকায় সার্দ্ধ দুই আনা মাত্র; সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার সহিত তুলনায় হিন্দুর সংখ্যাও প্রায় সার্দ্ধ দুই আনা হয়। এই অল্পসংখ্যক হিন্দুও ঠিক 'হিন্দু' কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ; পরশুরামের নিক্ষত্রিয় আহবের অবসান হইলে ভারতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ছিল না; বহুবর্ষ পরে যে সকল পতিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ভুলিয়া গিয়া ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল রাজাদের জন্মকোষ্ঠি অনুসন্ধান করিলে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালে কোনও প্রধান "ক্ষত্রিয়" রাজা হিন্দু আচার রক্ষা করিতে পারেন নাই, সকলকেই মুসলমানের সহিত মিলিতে ও মিশিতে হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে প্রায় সকলকেই মুসলমান সম্রাটের নিকট আপনাপন ভগ্নি বা কন্যাকে উপঢৌকন পাঠাইতে হইয়াছিল। উদয়পুর, ঢোলপুর প্রভৃতির রাণারা "কন্যা" উপঢৌকন পাঠান নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাও মুসলমান সংস্রব হইতে রক্ষা পান নাই। ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ বলা যায়। পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা সমুদ্রতটে মালাবার উপকূলে বাস করেন, তাঁহাদের শূদ্রাণীর সহিত বিবাহ হয়, এবং অপত্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোকনস্থ ও দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা এবং তামিল ও তেলুগু দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের হস্তের জল ব্যবহার করেন না, কিন্তু বাজারে যে "ভাত" বিক্রয় হয়, তাহা খরিদ করিয়া মুসলমানের গোশকটে ব্রাহ্মণেরা রাখিয়া দেন এবং ক্ষুধা হইলে পথিমধ্যে গাড়ী থামাইয়া গাড়ীতে বসিয়াই অন্ন

ভক্ষণ করেন। বিকাণির, যশলমীর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণের বাটীতে পানীয় জল মুসলমান ভিস্তী কর্ত্তৃক আনীত হয়; পঞ্জাবের হিন্দুর পাকশালায় মুর্গী একটা নিত্য তরকারী মাত্র; কাটিঝড়ের সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একপাত্রে আহার করেন; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সকল শাস্ত্রের বিরোধী হইলেও অবধ্য; উড়িষ্যায় জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে একত্রে বসিয়া ভোজন করে; বৃন্দাবনে "মাথা মুড়াইলেই" অর্থাৎ ন্যাড়া হইলেই মহাবৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ গুরু বলিয়া গৃহীত হয়;—তাহাতেই বলিতেছি শাস্ত্র ধরিয়া বিচার করিলে, যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের পনের আনা অহিন্দু বলিয়া গণ্য হয়েন। 'অহিন্দুর' সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, ইহা আমার ইচ্ছা নহে; হিন্দুজাতির মহত্ত্ব, শুদ্ধতা, সমৃদ্ধি, সুযশ ও বৈভবকে আমি আমার নিজের গৌরব বলিয়া বিবেচনা করি।

শিক্ষা, পরীক্ষা বা ভ্রমণ জন্য অনেক বাঙ্গালী সমুদ্রযাত্রা করেন, ইহাদের সংখ্যা এক কোটিতে গড়ে দেড় জন মাত্র; ব্যবসার জন্য কোনও বাঙ্গালী সমুদ্রপারে যাইয়া বাস করেন নাই। সমুদ্রযাত্রা, হিন্দুর মতে একটা প্রধান "অনাচার"; বৃদ্ধ হিন্দু 'আচার' 'আচার' করিয়া চীৎকার করেন, কিন্তু আচার শব্দের প্রকৃত অর্থ গোঁড়া হিন্দুর এখনও শিক্ষা হয় নাই। আমি বিধবা বিবাহের উৎসাহ দিলাম, সুতরাং আমি আর হিন্দু নহি! সমুদ্রযাত্রার আমি পক্ষপাতী, সুতরাং আমি অহিন্দু! ইংরাজি হোটেলের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিলাম, খোদাবক্স গো-মাংস পাক করিতেছিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে বিলাতী মশালা মিশ্রিত ঐ "অনুচ্চারণীয় মাংসের" গন্ধ আসিয়া আমার নাকে প্রবেশ করিল, অমনি আমি অহিন্দু হইয়া গেলাম! সুতরাং দেখিতেছি, হিন্দুর "অহিন্দু" হইবার—"পতিত" হইবার—উপায়টা লক্ষভাগে বিভক্ত, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা বাড়িবার একটা উপায়ও দেখিতেছি না। আজি যদি একজন মুসলমান খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে, দুইদিন পরে "কল্‌মা" পড়িয়া সে আবার মুসলমান হইতে পারে; একজন খৃষ্টান মুসলমান হইলে, গির্জ্জায় 'তোবা' করিয়া আবার খৃষ্টশিষ্য বলিয়া গৃহীত হইবে, কিন্তু একজন হিন্দু-সন্তান সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাহাকে আবার হিন্দু সমাজে লওয়া হয় কি? ইহাতে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে—না কমিতেছে? সবক্তাগীন ও আলপ্তাগীন যখন ভারতে আইসেন, মুসলমান ঐতিহাসিক মোজঃফর হোসেন বলেন, তখন "এদেশে ৬৫ ক্রোড় কাফেরের (হিন্দুর) বাস ছিল"। এখন তাহারা কোথায়? তুর্ক বা তাতার হইতে মুসলমান আসিয়া ভারতে বাস করেন নাই, এই "কাফের" জাতিই এক্ষণে ভারতভূমিতে ১৪ কোটি মুসলমান! জন্মকোষ্ঠি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পীরু সেখের আদিপুরুষ ভৈরব ভট্টাচার্য্য!! ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানের দেশ; হিন্দুর মতে ভারতের বাহিরে হিন্দু থাকিতে পারে না; সুতরাং ভারত লইয়াই হিন্দুত্ব; ভারত এখন ইংরাজের, সুতরাং হিন্দুর নিজের কিছুই নাই। পৃথিবীর সহিত তুলনায় ভারত অতি ক্ষুদ্র দেশ, সমগ্র ধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য! গোঁড়ারা পদে পদে হিন্দুকে "অহিন্দু" বা

"পতিত" করিতেছেন, সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে? এদিকে বিধবা-বিবাহ বন্ধ; লক্ষ লক্ষ বাল-বিধবাকে বলপূর্ব্বক কয়েদিনী করিয়া রাখিয়াছ, সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বাড়িবে কেমন করিয়া? যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রবন্ধ লেখেন, আচার আচার করিয়া বৃথা চীৎকার করেন, তাঁহারা এই সকল মৌলিক কথা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ধর্ম্মধ্বজীগণ হিন্দুর হিন্দুত্ব বা মহত্ব রক্ষা করিতেছেন না, হিন্দু সমাজের শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। যেরূপে শনৈঃ শনৈঃ হিন্দুজাতির লোপ হইতেছে, আশঙ্কা হয় দুইশতাব্দী বা তিনশতাব্দী পরে হিন্দুর সংখ্যা জৈনের সংখ্যার ন্যায় হীন হইয়া পড়িবে। সহস্র বর্ষ পরে, হিন্দুজাতির চিহ্ন থাকিবে কি না অনেকে তাহা সন্দেহ করেন। দেখিতেছ না, ৮৬ বর্ষকাল মধ্যে ভারতে প্রায় এককোটি দেশীয় খ্রীষ্টান! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হিন্দুসেনা মহাহবে যোগ দিয়াছিল; রামায়ণে দেখিতে পাই কাবুল হইতে তিব্বত এবং কুমারীকা হইতে অমরকণ্ট পর্য্যন্ত হিন্দুতে "ভরা" ছিল; জিজ্ঞাসা করি, এ সকল হিন্দু কোথায় গেল? হিন্দুর অনেক পরে বৌদ্ধদিগের জন্ম, বৌদ্ধদিগের অনেক পরে খৃষ্টানের প্রাদুর্ভাব, খৃষ্টানের অনেক পরে মুসলমানের অভ্যুদয়; দেখিতে দেখিতে সমগ্র পৃথিবী বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানে ছাইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর সংখ্যা, শক্তি ও সামর্থ্য ইহাদের সহিত তুলনায় হস্তীসম্মুখে পিপীলিকামাত্র! সমগ্র পৃথিবী খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের দ্বারা শাসিত হয়; হিন্দুর নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার এককাঠা জমিও নাই; রিক্তহস্তে, গোলামী অবস্থায়, কুসংস্কারের কূপে পড়িয়া, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হিন্দুর অহঙ্কারকে যেন অর্থশূন্য প্রলাপ অথবা পাগলের পাগলামী বলিয়া বোধ হয়। উন্নতির যে বিরোধী, পরিবর্ত্তনের যে বিরোধী, অর্থশূন্য "আচার" লইয়া প্রাচীন পাগল ফৈরেসিকদিগের ন্যায় যে উন্মত্ত, কপটতায় যাহার ধর্ম্মপ্রচার, স্বার্থপরতায় যাহার স্বধর্ম্মপালন এবং অজ্ঞানতা যাহার প্রিয় সহচর, কেমন করিয়া সে আবার সভ্য সমাজে "উন্নত" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে স্থির বিশ্বাস, দুই সহস্র বৎসর কাল খৃষ্টীয় রাজত্ব স্থায়ী হইলে, ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই অন্যতম আমেরিকা হইয়া উঠিবে, হিন্দুজাতির নাম পর্য্যন্তও যদি লোপ হয় তাহা হইলে আজি কালিকার "অহিন্দুত্ব ভরা" কপটাচারী ও ধর্ম্মধ্বজী হিন্দু-আন্দোলকদিগের দোষেই হইবে। দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি, বৃদ্ধ হিন্দুর শ্রাদ্ধের দিবস অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; হিন্দুর রক্ষার উপায় নাই বলিলেই হয়।

হিন্দুসমাজকে একটি বৃহৎ শরীরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এই মহাবিপুল বপুমধ্যে ব্রাহ্মণ মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য জঙ্ঘা, কায়স্থাদি কায়া এবং শূদ্র পদ। মস্তক খারাপ হইলে মনুষ্য পাগল ও অকর্ম্মণ্য হয়, হিন্দুসমাজের মস্তক (ব্রাহ্মণ) এক্ষণে ক্ষিপ্তাবস্থায় পতিত, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণে লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণের দিব্যমূর্ত্তি, অতুলনীয় মুখশ্রী, উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষঃ, আধ্যাত্মিক জ্যোতি, জ্ঞানালোকভরা-

নয়ন এবং সাধুজনোচিত পাদবিক্ষেপ দেখিয়া সহস্র হস্ত দূর হইতে ব্রাহ্মণসন্তানকে চিনিয়া লওয়া যায়।" রামায়ণে একথাও লিখিত আছে, "বিভীষণ বলিলেন, যদি আমি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে এই মহাপাপের জন্য আমি যেন কলির ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করি।" হিন্দু সমাজের এই ক্ষিপ্ত নেতারা কেবল হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অনিষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সমগ্র ভারত এবং ভারতীয় জাতিকে রসাতলে পাঠাইতেছেন। যাহা কিছু উন্নতির পোষক, যাহা কিছু পরিবর্ত্তনের উৎসাহদাতা যাহা কিছু সমাজের কল্যাণকর, গোঁড়ার দল তাহারই ঘোরতর প্রতিবাদী। মানবশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে যথারীতি না চালাইলে যেমন শরীর সুস্থ, সুন্দর ও সবল হয় না, জাতিবিশেষ কূপবদ্ধ ভেকের ন্যায় একই নির্দ্দিষ্ট সীমায় অবস্থান করিলে তাহার উন্নতি হইতে পারে না; এই জন্য বিদেশগমন—সমুদ্রযাত্রা—ভারতের এবং হিন্দুসমাজের কল্যাণকর কিন্তু গোঁড়া হিন্দু তাহারও প্রতিবাদী। গোঁড়া হিন্দুর এই আপত্তির মূল বোধ হয় বৃদ্ধ মনু; মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে মনু লিখিতেছেন "দ্বিজগণ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন; অন্নক্লিষ্ট শূদ্র যথা তথা বাস করিতে পারে।" বোধায়ণের চতুর্দ্দশ সূত্রে দেখিতে পাই, "যে ব্রাহ্মণ বঙ্গ এবং কলিঙ্গ ভূমিতে পদার্পণ করিবেন, তাঁহাকে পুনষ্টোম যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে তিনি গৃহীত হইবার যোগ্য হইতেন। বিষ্ণুস্মৃতির ৮৪ অধ্যায়ে "তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে।" ভাগবৎ পুরাণের দশম স্কন্দে, ৭৪ অধ্যায়ে, ৮ম শ্লোকে দেখা যায় "চেদিদিগের নরপতি শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মপুত্রের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে দেখিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, এবং অত্যন্ত অপমানব্যঞ্জক কটূক্তি করিয়া বলিলেন হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কল্যবানের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মর্ষি দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া দ্বারকা নগর স্থাপন করিয়াছ। তুমি এবং তোমার সহচর ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্যের কথা।" এ সকল পৌরাণিক কথা, হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মধ্বজী প্রচারকদিগের পক্ষে অবশ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু গোঁড়া মহাশয়ের বোধ হয় একথা জানা নাই যে, বেদশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অকাট্য বিধি ও দৃষ্টান্ত নিহিত আছে। ঋগ্বেদে (১—১১৬—৩) আমরা দেখিতে পাই "অশ্বিনীবান্ধব তুগ্র, নিকটস্থ দ্বীপবাসী বৈরীগণ কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট হইয়া, আপন পুত্র ভূজ্যকে সৈন্যসহকারে যুদ্ধে পাঠাইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় সমুদ্রে মহাতরঙ্গ উঠিল, ভূজ্য ভীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে অশ্বিনীগণ! আমার তরণী সমূহ সমুদ্রবক্ষে কাঁপিতেছে, তোমরা আমাকে রক্ষা কর; হে অশ্বিনীগণ! আমার তরণীতে একশত দাঁড় আছে, তোমরা এই দাঁড়সকলকে মহাশক্তি দান কর।" ইত্যাদি। ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে, "ব্রাহ্মণের পক্ষে দুইবার সমুদ্রযাত্রা প্রায়শ্চিত্তাধীন নহে।" মনুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ২৫৮ শ্লোকে, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমুদ্রযাত্রীগণ সমাজে পুনঃগৃহীত হইতে পারেন, ইহার বিধি আছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ১২০ শ্লোকে লিখিত আছে "সমুদ্রযাত্রাকালে, তরণীতে

বেদপাঠ করিও না।" উষায়ণেরও এই মত। মিঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে লিখিয়াছেন "In Baudhayana I. 1-2 we find a whole chapter devoted to this question. There he says that the Northern people are allowed to do five things which, if done by those in the South, would bring them under the ban of religions prohibition; and in mentioning sea-voyage as one of them he remarks, that the Northerns were allowed to do so, because these were immemorial customs with them and as such had the force of law." শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, "গো, সুবর্ণ প্রভৃতির সহিত ব্রাহ্মণকে তরণী দান করিও, তাহা হইলে এই পাপরূপী-সংসার সমুদ্র হইতে তুমি পুণ্য-তরণী যোগে অবাধে পার হইতে পারিবে।" কোলব্রুক বলিতেছেন "Why is the gift mentioned, if it was not to be used by the receiver?"

মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ আছে। ভাগবৎপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে, ২৪ ভাগের ৫৫ শ্লোকে সমুদ্রবক্ষস্থিতা তরণীতে দাঁড়াইয়া বিষ্ণুর বক্তৃতার বিবরণী পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। কথা সরিৎসাগরের ২৫০ পৃষ্ঠায় শক্তিদেবের উত্তর দ্বীপে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী পড়া যায়। রত্নাবলীতে সূত্রধরের মুখে আমরা সিংহলযাত্রা এবং সমুদ্রে জাহাজ মগ্নের কথা শুনিতে পাই; কালিদাসের শকুন্তলার ৫ম অঙ্কে ধনবৃদ্ধি সওদাগরের সমুদ্রে মৃত্যুর কথা কে না জানে? মাঘ কবির শিশুপালবধে তৃতীয় অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে সমুদ্রযাত্রী বৈশ্যগণ "সম্যাত্রিক" নামে অভিহিত হইয়াছে। হিয়ং সাং বলেন "আমি ব্রাহ্মণের সহিত সমুদ্রযাত্রা করিতেছিলাম।" এই সকল প্রমাণের পরেও কি সমুদ্রযাত্রা "অহিন্দুর কর্ম্ম" বলিয়া বিবেচিত হইবে? কলির শাস্ত্রকার পরাশরকে সমুদ্রযাত্রার বিরোধী বলিয়া বোধ হয় না। বিরোধী হইলেও, কে তাহা মানিবে? শাস্ত্র অনুসারে সময়, কি সময় অনুসারে শাস্ত্র?

এখনকার কালে ভারতবর্ষের নিকটস্থ দ্বীপসমূহে যাঁহারা পরিব্রজন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সিংহলের জাফ্‌নানগরে বারশত বৎসরের ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও বর্ত্তমান; কলম্বো নগরে ৬টি হিন্দুমন্দিরে এখনও রীতিমত পূজা হয়, পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ; কনিংহাম সাহেবের মতে ইহাদের একটা মন্দির দেড় সহস্র বৎসর হইতেও প্রাচীন। কান্দিনগরীতে অনেক গৌড়ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায়। সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, শ্যাম এবং মালাক্কাতে অনেক হিন্দুমন্দির দৃষ্ট হয়। কোচিন-চায়না, পিনাঙ্গ, কেবলম্বুর, জাবা, বালী, বোর্ণিও, ব্রহ্মদেশ, টাঙ্গো, মান্দালা এবং অন্যান্য স্থানে অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নিবাস আছে, এই সকল স্থানে হিন্দুমন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুর কেন বিতৃষ্ণা জন্মিল তাহার নির্ণয় করা বড় দুষ্কর। ব্যবসা, বহুদর্শন, জাতীয় ধনবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য সমুদ্রযাত্রা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা বিদেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের পক্ষেও নানাকারণে সমুদ্রযাত্রা প্রয়োজনীয়।

পরিহাস্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তখনও গৃহস্থলীনিপুণা দেবাঙ্গনাগণ আকাশের দীপাবলী সম্পূর্ণ নিভাইয়া দেয় নাই—শুক তারা পূর্ব্বগগনে নিশাসীমন্তিনীর ললাটে টিপটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; তখনও ভাঙ্গা চাঁদ মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনের শেষ আশার মত পশ্চিম গগণ আলিঙ্গন করিয়া ঝুলিয়া আছে—মূর্চ্ছিত পাণ্ডুরবর্ণ জ্যোৎস্না পৃথিবীকে শেষ বিদায় দিতে পারে নাই; তখনও নীলাকাশে কিরণ-লহরীর আবেগময় নৃত্য একেবারে থামিয়া যায় নাই; যাদুকরী নিশা তখনও আপনার মন্ত্রঃপূত কুহক-ডোরে বোনা জালখানি ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ গুটাইয়া লয় নাই—তরল লঘু নিঃশব্দতায় পৃথিবী সমাচ্ছন্ন।

মলিনাপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তস্থ একটী বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ হইল। কিরণ আর তার ছোট বোন ঊষা, হাতে ফুলের সাজি লইয়া বোসেদের বাগানে ফুল তুলিতে ছুটিয়াছে, সঙ্গে তাহাদের দিদিমা বাহির হইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে দাঁড়াইতে আসিতেছেন, অমনি সেই সঙ্গে বাড়ীর ঠাকুরের জন্যও কিছু ফুল লইয়া যাইবেন ইচ্ছা। ঊষার আজ কাল ফুলের বিশেষ দরকার—তার ব্রত আছে। ব্রততে যদি ভাল ফুলই না পাওয়া যায়, তবে তাহা করিয়া কোন ফল নাই। আবার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙ্গিলেই সর্ব্বনাশ! গ্রামের আর আর মেয়েরা সব ফুল তুলিয়া লইয়া যায়, গাছে একটীও রাখে না। তাহা হইলে ঊষার সমস্ত দিন আর খাওয়া দাওয়া হয় না—মনটী ভার করিয়া বসিয়া থাকে। মা এসে কত সাধেন, দিদিমা কত ভুলাবার চেষ্টা করেন, বাবা কত বুঝান, অভিমানিনী মেয়ের কিছুতেই মন ফিরে না—সে মোচড়ান মনকে আর কেহই সাধ্যসাধনায় সোজা করিতে পারে না। "কেন তোমরা আমায় রা'ত থাকৃতে উঠিয়ে দাও নাই? আমি রোজ বলি একদিনও আমার কথা শোনা হয় না অ্যাঁ।" বলিতে বলিতে বড় বড় ছুটী চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়—রাগের ঝোঁকে এক রাশ মাটী খুঁড়িয়া ফেলে। কতদিন এইরূপ করিয়া মানিনী মেয়ের অর্দ্ধ উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে। যে দিন ঊষা সকালে উঠিয়া ফুলের মুখ দেখিতে না পায়, সে দিন তার ভাতের মুখ দেখাও এক রকম জোটে না।

কি জানি কেন, মেয়েটী বড় ফুল ভালবাসে। আজ কাল ব্রত আছে বলিয়া নয়, যখন ব্রত থাকে না, তখনও একটা না একটা উপলক্ষ করিয়া সে ফুল তুলিতে যায়। "মালা গেঁথে প'রব, পুঁতুলের বিয়ে হবে তাতে অনেক ফুল চাই, বোঁটা দিয়ে কাপড় ছোপাব" ইত্যাদি সেই সব উপলক্ষের মধ্যে কয়েকটী। মোট কথা ফুল চাইই, নচেৎ বাড়ীতে ঊষাকে লইয়া তুমুল বিপ্লব বাধিয়া যায়। এই সব দেখিয়া শুনিয়া দিদিমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি রোজ ঊষা আর তার দাদা কিরণকে ভোরে ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিবেন, তাহারা যত পারে ফুল তুলিয়া আনিবে। তাই আজও তিনি তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়াছেন।

ঊষা কিরণ সাজি হাতে দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে দিদিমা বলিতেছেন—"ও কিরণ ও ঊষা—লক্ষ্মী বাপ আমার, মা আমার, অত ছুটে যেও না; এখনও ঘোর ঘোর র'য়েছে, পথ ঘাট ভাল দেখা যাচ্চে না—কোন্ সাপের ঘাড়ে পা দিবি, পায়ে কাঁটা ভুঁকে যাবে, একটু আস্তে আস্তে চল্ না; এখনও কেউ আসে নি।" দিদিমার কথা বুঝি পথ হারাইয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল—অন্ততঃ ঊষা কিরণের কাণে আসিয়া পৌছিল না। তাহারা এক নিশ্বাসে বোসেদের বাগানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঊষার পায়ে ঝম ঝম করিয়া মল বাজিতেছিল; বাগানের ফুলরাজি বুঝি সে মলের সাড়া পাইয়া প্রাণের আবেগে তুলিয়া উঠিল; যাহারা অর্দ্ধেক ফুটিয়াছিল তাহারা সম্পূর্ণ ফুটিয়া গেল; সহস্র যোজন দূরস্থ নক্ষত্রের জ্যোতিঃকণা সে শব্দের পুলকে উজ্জ্বলতররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে প্রবেশ করিয়াই ঊষার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এতফুল! ফুলে বাগান আলো করিয়া আছে! শেফালিকা তলায় অজস্র শিশিরসিক্ত শেফালিকার মেলা বসিয়া গেছে! ঊষা যে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না; দুই হাতে সে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না; আরও দুখানি হাত থাকিলে ঊষার আজ বড় উপকারে আসিত। এমন সময়ে দিদিমা জবা তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঊষা আনন্দভরে বলিয়া উঠিল "দিদিমা, আজ দেখ না কত ফুল!—দাদা, তুমি আগে শিউলিগাছটা নাড়া দিয়ে ফুলগুলি কুড়িয়ে আন, আমি এ সব তুলব।" সুধাকণ্ঠে বীণা বাজিল, দোয়েল কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে? সেও গাহিল; অলিকুল ঝঙ্কারিয়া উঠিল; বুলবুল সে তানে সুর মিলাইল—শূন্য-পথে সুরের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল, একটী অব্যক্ত রাগিণীর শিখা ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধপানে উঠিতে লাগিল। প্রকৃতিদেবী মহেশ্বরের পূজার আয়োজন করিয়া বুঝি ঊষা কিরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, শিশুদের অমিয় কণ্ঠস্বর না হইলে পূজার প্রাণ থাকে না, পূজা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে; যেমন ঊষা কথা কহিল, অমনি প্রকৃতির প্রাণতন্ত্রীতে আঘাত পড়িল—প্রকৃতিনাথের আরতি আরম্ভ হইল। তরুগণ প্রেমভরে চামর ঢুলাইতে লাগিল, সমীরণ সঙ্গীতের সুর বহিয়া চরাচরকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিল।

ঊষা প্রভাতসমীরের মত মৃদু মৃদু ছুটিয়া, একে একে প্রায় সমুদায় ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিল। তখন দুপ্ দাপ্, ঝম ঝম শব্দ করিয়া পাড়ার আর তিনটী মেয়ে, চারু, মিনা, ভাণ্ড, ফুল তুলিতে বাগানে আসিল। হঠাৎ হাসিমাখা মুখ ক'খানি বিষাদ-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারু, ঊষার সই; হইলে কি হয়, আজ সইয়ের এই দুর্ব্ব্যবহার তাহার কাছে আদৌ ভাল লাগিল না। তাহার বুকের মধ্যে তখন সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইয়াছিল। সে আজই ঊষার পুতুলের বিবাহ ফিরাইয়া দিবে, আর পারে ত সইয়ের সম্বন্ধেও আজ হইতে জবাব দিবে। যাহা হউক তাহা আর করিতে হইল না, কারণ ঊষা তাহাদের দেখিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "ও সই, শীগ্রি আয় ভাই, আজও আর ওপাড়ার, নির, ননী, সর, কম, একটীও ফুল পাবে না। আগে আগে সব ফুল তুলে নিয়ে যেত, এ ক'দিন খুব জব্দ

হচ্ছে। দাদা, তুমি শিউলি ফুল এনে, ভাণ্ড, মিনা, সইকে দাও ত; আজ আমাদের অনেক ফুল হ'য়েছে।" তার পর সে নিজের সাজি হইতে ফুল লইয়া তাহাদের সকলকে দিল। উষা নিজের হাতে পরকে তুলিয়া দিতে বড় ভাল বাসে, কিন্তু পরের কাছ হইতে কোন দিন চাহিতে হইলেই তাহার বুকে শেল বিঁধিতে থাকে।

কিরণ সাজি ভরিয়া ফুল কুড়াইল, চারুদের অর্দ্ধেক দিল, বাকী উষার জন্য রাখিল। দিদিমা বলিলেন "আয় আর কেন? গাছে দুএকটা ফুল থাকুক, চাটুয্যে ম'শায় যে কিছুই পাবেন না; আজ কপালে গালাগাল আছে দেখচি।" (চাটুয্যে ম'শায় উষা কিরণের সম্পর্কে ঠাকুর্দ্দা হন, তিনি যে দিন ফুল না পান, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া পিতৃপিতামহের উচ্ছন্ন করিয়া আসেন।)

তাহারা একে একে বাগান হইতে বাহির হইল। তখন আকাশের মহাসভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বগগনের হেম আভা অরুণ আগমনের শুভসংবাদ জগতে ঘোষণা করিয়া দিতেছে; মেঘেরা দিনপতিকে অভিবাদন করিবার জন্য শশব্যস্তে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইতেছে।

উষা চারুকে বলিল "সই আজ ভাই আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিস্, অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী গেছে।" চারু "তা দোবো" বলিয়া ভাণ্ড, মিনার সঙ্গে আপনাদের বাড়ী চলিয়া গেল।

কিরণ এবং উষা বাড়ীতে আসিল। উষা তাড়াতাড়ি ব্রতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া, বালিকা-হৃদয়ের অকপট সরল ভক্তিতে দেবতার নিকট কত উচ্চ বর প্রার্থনা করিল। সে শুভ্র শোভন হৃদয়ের আকিঞ্চন আবাহনে কোন্ দেবতার সিংহাসন টলিয়া না যায়? উষা পূজা সাঙ্গ করিয়া, সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম করিল—সে দিনকার ফুল তোলা, ব্রতকার্য্য এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বালক বালিকা দুটীর সঙ্গে পাঠককে আর একটু বিশেষভাবে পরিচয় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; তাই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে সেই সম্বন্ধেই দু চারিটী কথা বলিব।

কিরণ এবং উষা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ দত্ত মহাশয়ের দুটী আদরের ছেলে মেয়ে। দত্ত মহাশয়ের আরও তিনটী সন্তান ছিল, তাহারা সকলে বড় বড় হইয়া মারা গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সে শোকের আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন; অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদেন; বাহিরে কিছুই প্রকাশ করেন না, পাছে তাঁর উষা-কিরণ মনে ব্যথা পায়। তাঁহার আজকাল একটী গুরুতর পীড়া দাঁড়াইয়া গেছে—সর্ব্বদা মন হু হু করে। ডাক্তার কবিরাজেরা উহা পাগলের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়াছেন। দত্ত মহাশয় নিজে বীরের মত এই বিপদ ঝঞ্ঝায় দাঁড়াইয়া আছেন—প্রাণকে অভিভূত হইতে দেন না; তবে মাঝে মাঝে

গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া যায়। যাই হ'ক তাঁহারা উভয়ে প্রাণের সে অগ্নিশিখা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দেন না—পাছে তাঁহাদের স্নেহের ধন উষা কিরণ ঐ উত্তাপে ঝলসিয়া যায়। প্রাণের যত প্রীতি মমতা এখন এই দুটী স্নেহপুত্তলিকে জড়াইয়া আছে; তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহারা আজকাল সব ভুলিয়াছেন। উষা কিরণ যখন যা চায়, তাঁহারা তখনি তাহা তাহাদিগকে দেন; একটু মাথা ধরিলে উষার মা পাগলিনীর মত চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ান। আহা! তাঁর হৃদয় যে সন্তানবিয়োগ-ব্যথার বিষদহন ভাল করিয়া জানে, গৃহদগ্ধা গাভীর প্রাণ যে সিন্দূর রঙ্গের মেঘ দেখিলেই চমকিয়া উঠে।

কিরণের বয়স ৯ বৎসর—উষা বোধ হয় এই সাতে পড়িয়াছে। উষা বড় খোঁটেল মেয়ে, যখন যে জিনিষের জন্য খোঁট ধরে, সেটী না পেলেই নয়, কেউ তার খোঁট থামাইতে পারে না। কেবল কিরণ আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তার সব খোঁট সে ভুলিয়া যায়, সে দাদার কথা কখনও অগ্রাহ্য করে না—মেয়েটী দাদাগতপ্রাণা! সে অনুক্ষণ ছায়াটীর মত দাদার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। তবে কিরণ যখন পাঠশালায় যায় তখন তাহার বড় বিপদ হয়, সে তখন দাদার কাছে থাকিতে পায় না। সে প্রথম প্রথম দাদার সঙ্গে পাঠশালায় গিয়া সারাদিন চোরের মত চুপটী করিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু গুরু-মহাশয় তাহার সম্মুখে একদিন তাহার দাদাকে মারিয়াছিলেন, সে তাহা দেখিয়া বড় কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। সে কান্না কিছুতেই থামে না, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া সারাদিন উষা কাঁদিল—চোক ফুলিয়া গেল। তাহার দাদাকে যে কেহ আবার মারিতে পারে, মারা দূরের কথা—কেউ যে বকিতে পারে তাহা তাহার বিশ্বাস ছিল না। যাই হউক সেই দিন হইতে সে আর পাঠশালে যায় না। দাদা পাঠশালে যাইবার সময় সে দাদার সঙ্গে খানিক দূর পর্য্যন্ত যায়; যখন কিরণ বলে "উষা আর আসিস্ নে, বাড়ী ফিরে যা" তখন সে বলে "আচ্ছা দাদা আর যাব না, আমি এইখানে দাঁড়াই তুমি যাও।" কিরণ চলিয়া যায়। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে দাদাকে যতক্ষণ দেখা যায় দেখিতে থাকে। কিরণ এক একবার পিছন ফিরিয়া দেখে, উষা সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। পরে সে যখন অদৃশ্য হইয়া যায়, উষা ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহার প্রাণের অনেকখানি জায়গা শূন্য হইয়া যায়। তার প্রাণ ছটফট করিতে থাকে, আজ আবার যদি দাদাকে মারে! বাড়ী ফিরিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া শুইয়া থাকে, মায়ের চুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে, আঙ্গুল দিয়া বার বার মায়ের নীচের ঠোঁটটিকে উপরের ঠোঁট হইতে পৃথক করিয়া দেয়। মা মেয়েকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকল জ্বালা ভুলিয়া যান—কতবার চাঁদ মুখে চুমা খান।

বেলা পড়িয়া আসিলে, বাহিরে যদি একটু কিছুর শব্দ হয়, অমনি উষা ঝম ঝম করিয়া বাড়ীর দরজায় গিয়া হাজির হয়—ঐ বুঝি দাদা আসচে! হয়ত গিয়া দেখে তাহাদের গৌড়-মণি বিড়াল দেওয়াল হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

অবশেষে দাদা পাঠশাল হইতে আসে, উষা হাতে স্বর্গ পায়। তাড়াতাড়ি দাদার হাত হইতে বইগুলি লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করে "দাদা, আজ তোমায় কেউ মারে নি?" দাদা "না" বলিলে তবে সে প্রাণে প্রাণ পায়। মা কিরণ উষাকে কিছু খাইতে দেন, তাহারা দুইজনে খাইয়া খানিকক্ষণ খেলা করে।

যখন বেলা ঝিকিমিকি হইয়া আসে, সূর্য্যদেব পাটে বসেন, পিয়ারা গাছের, আম গাছের বড় ঘরের ছায়াতে উঠান ভরিয়া যায়, তেঁতুল গাছের অগ্রভাগ গলিত সোণার কিরণে ঝিকমিক করিয়া উঠে, পুকুরের ধারে 'ডাক' পাখী ডাকিতে আরম্ভ করে, গৃহে গৃহে বউ-ঝিদিগের জল আনিতে যাইবার সাড়া পড়িয়া যায়; যখন উঠানে ঝিঙ্গাফুল ফুটিয়া হলুদ-বর্ণে চারিদিক হাসাইয়া দেবাঙ্গনাদিগের পদপল্লবের প্রতীক্ষা করিতে থাকে,—তখন উষা কিরণ উঠানে ভাত খাইতে বসে। খাওয়া শেষ হইলে দৌড়িয়া গিয়া চারু, মিনা, ভাগুকে ডাকিয়া আনে, উঠানে বিছানা করিয়া সবে একত্র হইয়া বসে, দিদিমা তাহাদের গল্প শুনান। যখন গল্প বেশ জমিয়া আসে, তখন চাঁদ আর থাকিতে না পারিয়া উষাদের সঙ্গে গল্প শুনিবার জন্য তাঁহার অসংখ্য তারা-সঙ্গিনীদের সঙ্গে লইয়া আকাশের গায়ে আসন পাতিয়া বসে; কতবার প্রাণের আবেগে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া উষাদের দলে মিশিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তা আর হয় না, আপনার হৃদয়খানিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারূপে গলাইয়া উষাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়।

গল্প শেষ হইলে দিদিমা আলো লইয়া চারু, মিনা, ভাগুকে তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসেন, কিরণ উষা ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

কিরণ উষা—দুটী ভাই বোন—তারা যেন একবৃন্তে দুটী ফুল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে কালের স্রোতে আজ প্রায় দশবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। উষা আর বালিকা নাই, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; সে শৈশবের সুবর্ণ রেখা পার হইয়া যৌবনের বনভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে; তাহার শুভ্র জীবনদর্পণে আজ আমরা অনেকগুলি কালো ছায়া গুণিতে পারি, সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে আজ অনেক ধাপ উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

আজ উষার মা, বাপ, দিদিমা কেহই এ পৃথিবীতে নাই, কালের অলঙ্ঘ্য শাসনে তাঁহারা একে একে মৃত্যুর অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের সাধের সংসার অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া গেছে।

আজ তাঁহার বাড়ীতে এমন একজন কেহ নাই যাহার কাছে উষা কিরণ আসিয়া দাঁড়ায়। কিরণ আর বাড়িতে আসে না—কাহার কাছেই বা আসিবে? প্রতিবেশী বন্ধুদের উপর বাড়ীর ভার অর্পণ করিয়া সে আজ কাল বিদেশেই পড়িয়া থাকে। তবে তাহাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, তাই তাহারা কিরণকে মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতে অনুরোধ

করে। সেও দু একবার আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীতে আসিলেই তাহার হৃদয়ে দুঃখের স্মৃতি নূতন করিয়া জাগিয়া দংশন করে, তাহার মায়ের পাণ্ডুর স্নেহপূর্ণ মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া যায়, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। তাই সে আজকাল বাড়ী আসা একেবারেই বন্ধ করিয়াছে।

উষার মা বাপ খুব সমারোহে উষার বিবাহ দিয়াছিলেন। একমাত্র সাধের মেয়ে, নয়নের কৌমুদী-স্বরূপিনী উষা, তাহার বিবাহে যাহা যাহা করা উচিত তাঁহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। উষাকে চিরকালই তাঁহারা অভিমানিনী বলিয়া জানিতেন—তাই পাছে মেয়ের মনে কোন কষ্ট হয় বলিয়া উষা যখন শ্বশুরবাড়ী যাইত, তাঁহারা তাহার সঙ্গে একজন ঝি পাঠাইয়া দিতেন; তা ছাড়া দু একদিন অন্তর লোক 'তত্ত্ব' লইয়া গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিত। দত্ত মহাশয় ইচ্ছা করিলে তাঁহার মেয়েকে খুব ধনবানের গৃহে সমর্পণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের দিকে তত লক্ষ্য ছিল না; ছেলেটী সচ্চরিত্র হয়, একটু লেখাপড়া জানে, তিনি ইহাই চান। তাই উষাকে তিনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারে একটী সচ্চরিত্র যুবার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

হায়! আজ উষার বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব লইবার কেহ নাই! সাধের পিতৃমাতৃগৃহে এমন একটী লোক নাই যাহার কাছে গিয়া দু একদিন সেখানে থাকিতে পারে! আগে বাপ মার কাছ হইতে লোক আসিতে একটু বিলম্ব হইলে, উষা তাঁহাদের উপর কত অভিমান করিত, এখন আর অভিমান করিবার লোক নাই! সে মনের কথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখে, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলে না, বিরলে বসিয়া অশ্রুজলে হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাণ করে, প্রাণের প্রাণে প্রতিদিন শতবার করিয়া মরিয়া যায়। সে বাপের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখে! মাগো! মানুষ কেমন করিয়া স্নেহ প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়!

কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে, এখনও সে দিক হইতে একটী স্নিগ্ধ তারকার কনককিরণ আসিয়া তাহার প্রাণ মধুময় করিয়া দেয়—সে তাহার দাদা। কিরণও কিন্তু আজকাল উষাকে আর তেমন চিঠিপত্র দেয় না। উষা দাদাকে কতবার কাতরভাবে অনুনয় করিয়া লেখে "দাদা মাঝে মাঝে আমায় এক একখানি চিঠি দিতে ভুলো না।" হয়ত দুএকখানি চিঠি বেশ আসে—তারপর আবার যে কে সেই।

আজকাল উষা আপনার সকল অভিমানগুলিকে হৃদয় হইতে একে একে বিসর্জ্জন দিয়াছে। আদরিণী মেয়ের একদিন তাহারা ভূষণস্বরূপ ছিল, দুঃখিনী উষার কি আর সে সব সাজে?

তবুও মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্ত্বে দাদার উপর তাহার অভিমান আসিয়া পড়ে। মানব-মনের রহস্য কে বুঝিতে পারে? কখন্ কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে কি তরঙ্গের তুফান ছুটে কিছুই বুঝা যায় না। এক একদিন উষা নির্জ্জনে বসিয়া দাদার কথা ভাবে—"উঃ দাদা কি নিষ্ঠুর! আমি দাদার জন্য এত কাঁদিয়া মরি, দাদার কি আমার জন্য একটুও

মন কাঁদে না ?" গরিব বোন দেখিয়া দাদা আমায় গ্রাহ্য করে না, কেমন করিয়া দাদা এত সহজে ছেলেবেলার স্নেহ ভালবাসা একেবারে ভুলিয়া গেল ?" তখন উষার হৃদয়ে সোণার শৈশবের একখানি মোহন ছবি ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে ; তাহার প্রাণ অজ্ঞাতসারে সেই বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি-সুরভিত ফুলবাগানের স্নিগ্ধ ছায়া-নিকুঞ্জে ছুটিয়া গিয়া বসে, সেখানে দাদার সঙ্গে, শৈশব সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কত কথা বলে, সে জীবন-স্রোতের উজান বহিয়া অনেকদূর চলিয়া যায় ; সেই মূর্চ্ছিত চন্দ্রিকাকিরণ, সেই নক্ষত্রবালার মৃদুহাস্য, সেই আকাশের মহাসভা, সেই প্রভাতসমীরণ, ভ্রমরগুঞ্জন, ফুলের বাস, সেই সোণালী-রবিকর মিলিয়া দগ্ধহৃদয়ের নীচে একখানি স্নেহের নীড় রচনা করিয়া দেয়। সে জানিত শৈশবের সেই স্নেহনির্ঝর একই ভাবে মধুর সঙ্গীতে, জীবনে চিরদিন বহিতে থাকিবে। কিন্তু কৈ ! এখন উষা আর সে নির্ঝরের বাঁশী শুনিতে পায় না। কিরণ তাঁর সব আশা ভাঙ্গিয়া দিতে বসিয়াছে। পরক্ষণেই আবার উষার হৃদয় হইতে সব অভিমান মুছিয়া যায়, —মনে পড়ে আহা ! দাদা কত কষ্টে পড়া শুনা করিতেছে, আজ বাবা থাকিলে কি দাদাকে এমন কষ্ট করিয়া পড়া শুনা করিতে হইত ? না জানি দাদা কত ভাবে, নীরবে কত ক্লেশ সহ্য করে ! কেমন করিয়া সব সময় আমায় চিঠি লিখিবে ? না দাদা, তোমার ছোট বোন উষার কথায় মনে কিছু দুঃখ করিও না।—এমন সময় হয়ত ঠাকুরঝি আসিয়া ডাকে, "বউ জল আনতে যাবে চল।" উষার চিন্তাস্রোত হঠাৎ এইখানে থামিয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উষার স্বামীর নাম প্রভাত চন্দ্র ঘোষ। তিনি আজ দুই বৎসর হইল বি, এল, পাশ করিয়াছেন—এক্ষণে ঢাকাতে ওকালতি করেন। প্রভাত বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্র, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই বেশ পশার করিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁর স্বভাবচরিত্র অতিশয় অমায়িক তাই লোকে শীঘ্রই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার বাড়ীতে এতদিন বড় কষ্ট ছিল, উষার বিশেষ কষ্ট হইত তিনি বুঝিতেন, কিন্তু কি করিবেন ? আজকাল কমলার কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে, এখন তিনি বাড়ীতে প্রতিমাসে উপযুক্ত খরচ পাঠান। অল্পদিন হইল তিনি উষাকে নিজের কাছে লইয়া আসিয়াছেন।

উষা এখন গৃহের কর্ত্রী, তাহার আর কোন দুঃখ নাই ; কিন্তু জানি না ইহাতে তাহার কতদূর মন উঠিয়াছে, আজকাল দাদার কষ্টের কথা আরও বেশী করিয়া তাহার মনে পড়ে। সে একদিন স্বামীকে দাদার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল—দাদার বড় কষ্ট হইতেছে, যদি ঢাকায় আসিয়া পড়া শুনা করে তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হয় ; সে দাদাকে কাছে পাইয়া বড় সুখী হয়। সে বরাবর তাই ভাবিয়া আসিয়াছিল যদি দয়াময়ী কখনও দিন দেন—দাদাকে কাছে রাখিবে—তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকে এ তাহার আদৌ ইচ্ছা নয়।

প্রভাত বাবু বলিয়াছিলেন—এ ত বেশ কথা, আমিই ত তোমায় আগে সে কথা বলিয়াছিলাম, কিরণকে সে সম্বন্ধে পত্রও দিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের উত্তর দেয় নাই। তুমি নিজে তাহাকে একখানি পত্র দাও, বেশ করিয়া লিখো, যেন আসিতে অন্যথা না করে।

উষা কিছুদিন হইল দাদাকে সে সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছে, অনেক করিয়া লিখিয়াছে—"দাদা তুমি এখানে আসিতে কোন মতে অন্যথা করিও না। যদি তোমার উষার প্রতি একটুও ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে আমার অনুরোধ রাখিবে।" আজ সে তাহার সেই পত্রের উত্তর পাইল। কিরণ লিখিয়াছে—"স্নেহের উষা, আমার এখানে কোন কষ্ট হইতেছে না, হইলে আমি তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই যাইতাম, তুমি ত উষা আমার পর নও। তোমরা কেমন আছ লিখিবে।" উষা এই পত্র পাইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল, সে তখনই আবার দাদাকে পত্র লিখিল—"দাদা, তুমি যদি এখানে একান্ত আসিতে অনিচ্ছুক হও, তবে জোর করিয়া তোমায় আনিতে পারি না। স্নেহ যদি তোমায় এখানে আসিতে না বলে, আমার কথায় আসিও না। তুমি যেখানেই থাক, সুখে আছ শুনিলেই উষার সুখ। তবে আমি মনে করিতাম আমার কাছে না থাকিলে তুমি কোথাও সুখে থাক না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিরণ আজকাল হুগলিতে থাকে—সেখানকার কলেজে পড়ে। ছেলে পড়াইয়া কষ্টে স্বষ্টে আপনার খরচ চালায়। সে উষার শেষ পত্রের কি উত্তর দিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিরণের এ এক চরিত্রের মহৎ দুর্ব্বলতা, সে কোন বিষয়ে শীঘ্র একটা স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না। কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে অনেকদিন চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে উষার আর কোন পত্রাদি আসিল না। কিরণ মনে করিল উষা রাগ করিয়া চিঠি দিতেছে না, তা আমার সেখানে যাইতেই বা আপত্তি কি ?—পড়াশুনার অনেক সুবিধাই হইবে। অতএব উষার কাছে যাওয়াই অবশেষে স্থিরীকৃত হইল।

কিরণ কলেজ হইতে নাম কাটাইল, আপনার একটীমাত্র পোর্টমেণ্ট সঙ্গে লইয়া ঢাকায় আসিয়া পৌছিল। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া উষারা যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বেশ সুন্দর স্থান, সম্মুখে একটী ফুলের বাগান, দুই সারি ঝাউ গাছ—খুব খালি জায়গা রহিয়াছে। সে বরাবর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গেল—দেখে কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে ! বাহিরের ঘরে কয়েকটি বাবুতে কি পরামর্শ করিতেছেন, সম্মুখে একজন সাহেব। আর পার্শ্বে প্রভাত বাবু বিষণ্নমুখে বসিয়া আছেন। কিরণের প্রাণ উড়িয়া গেল—ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহাঁরা ডাক্তার, উষার নিশ্চয়ই ব্যায়রাম হইয়াছে তাই এতদিন কোন চিঠিপত্র পাই নাই। কিরণ ঘরে ঢুকিতেই প্রভাত বাবু দৌড়িয়া কিরণের

গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বিষাদব্যথিত স্বরে বলিলেন—"ভাই কিরণ, উষা বুঝি আমার ফাঁকি দিয়ে চলে যায়!"

শোকে, খেদে, আত্মগ্লানিতে কিরণের প্রাণ একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। হৃদয়ে বিষাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ হইলেও বুঝি প্রাণে এত বাজিত না। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল। প্রভাত বাবু উষাকে দেখাইবার জন্য তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন, কিরণ অদৃষ্টচালিতের ন্যায় সঙ্গে-সঙ্গে চলিল; পা আর উঠে না, স্নেহের উষার আজ কি দশা দেখিতে সে আসিল? যদি এত দিন উষার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আসে নাই, তবে আজ আসিল কেন?

অবশেষে কিরণ উষার ঘরে প্রবেশ করিল। উষার সেবা করিবার লোক জনের কিছু অভাব ছিল না, কিন্তু ডাক্তারেরা ঘরে অধিক লোক রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—তাই কেবল দুইজনমাত্র লোক উষার কাছে বসিয়া আছে।

কিরণ দেখিল উষা আর সে উষা নাই। সে লাবণ্যময়ী প্রতিমার আজ একি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! কোমল দেহ-লতাখানি মূর্চ্ছিতা জ্যোৎস্না-লেখার মত বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া গেছে—সে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদাম নাই! ঠোঁট দুখানি শুকাইয়া গেছে! নয়নের সে স্নিগ্ধ জ্যোতি নাই! আছে কেবল মুখের প্রীতিমাখান সরল মধুরিমা,—রোগ শোক তাহার কিছুই করিতে পারে নাই।

কিরণ, নিষ্ঠুর! ভুল করিয়াছিলে! এ ভুলের আর সংশোধন হইবে না! উষার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতল স্নেহের পরিমাণ বুঝিতে পার নাই! ছোট বোনের কোমল হৃদয় দলন করিবার পরিণাম এতদূর গড়াইবে জানিতে না! উষা তোমার সঙ্গে এই ভাবে দেখা করিতে চায় নাই!

কিরণ ভাবিল সে পারিবে না, উষার কাছে গিয়া সে বসিতে পারিবে না। এমন সময় প্রভাত বাবু সজলনয়নে ডাকিলেন—"উষা দেখ তোমার দাদা এসেছে।" কিরণ উষার মাথার কাছে আসিল, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতেছিল।

উষার মুখের উপর দিয়া একটী বিদ্যুতের রেখা চমকিয়া গেল; ধীরে ধীরে চক্ষুদুটী খুলিয়া দেখিল—তার দাদা! 'দাদা' বলিয়া হাতদুখানি তুলিল, কিরণ একটু মাথা ঝুঁকাইল, দুটী হাত আপনাপনি কিরণের গলা জড়াইয়া ধরিল। কিরণ চমকিয়া উঠিল, উঃ! কি ভয়ানক উত্তাপ! সে ক্ষীণ দেহলতিকা না জানি কেমন করিয়া সে উত্তাপ সহ্য করিতেছে! উষা নির্নিমেষ নেত্রে, দাদার মুখপানে তাকাইয়া রহিল—যেমন করিয়া একদিন দাদাকে পাঠশালায় বিদায় দিবার সময় তাকাইয়া থাকিত, তেমনি করিয়া তাকাইয়া রহিল, দুটী চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া গণ্ডস্থলে পড়িল। দাদার গলা ধরিয়া হৃদয়ের কত কথা বলিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছিল—হায়! উষা, তোমার আর সে সাধ্য নাই! কতক্ষণ পরে আপনাপনি হাত দুখানি কিরণের গলা হইতে খুলিয়া পড়িল—উষা আবার চক্ষু মুদিল।

প্রভাত বাবু ইতিমধ্যে বাহিরে ডাক্তারদের কাছে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া কিরণকে ডাকিয়া বলিলেন—"কিরণ, ডাক্তারেরা বলিয়া গেলেন আজ যদি রাতটা কাটে তবেই আশা। আর এই সব ঔষধ লিখিয়া দিলেন—নির্দ্দেশ মত সেবন করাইতে হইবে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ একজন লোককে ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন।

তৎপরে প্রভাত বাবু কিরণকে লইয়া খাইতে বসিলেন; কিরণ একবার ভাতে হাত করিয়া উঠিল, প্রভাত বাবুও নাম মাত্র আহারে বসিলেন।

ঔষধ আসিলে রীতিমত ঔষধ খাওয়ান চলিতে লাগিল—কিন্তু রোগের কিছুই উপশম দেখা গেল না। কিরণের আর হাত পা আসিতেছিল না—এই অল্পক্ষণের মধ্যে কে তাহার সকল বল হরণ করিয়া লইল? প্রভাত বাবু একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যা হইল, আবার ডাক্তার আসিয়া উষাকে দেখিলেন; বলিয়া গেলেন আজ রাতটা না কাটিলে কিছুই বলা যায় না। আর ঔষধপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

ক্রমে যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—উষার চক্ষুদুটী একেবারে বসিয়া গেল—রাঙ্গা ঠোঁটদুখানি কালীবর্ণ হইল। সকলেই দেখিয়া বুঝিল উষার চন্দ্রমুখে মৃত্যুর তমসাছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে—আর অধিক বিলম্ব নাই।

তখন নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে—জ্যোৎস্নারাশি জগতের কূলে কূলে উছলিয়া পড়িতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর—জগৎ ঘুমন্ত নীরব।

উষা একবার ঠোঁটদুখানি খুলিল—বুঝি উষা শেষ বিদায়ের সময় বলিতে যাইতেছিল 'দাদা'—আর বলা হইল না, দুইবার হিক্কা উঠিল—প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় ধামে উড়িয়া গেল—স্বর্গের মেয়ে স্বর্গে জননীর কাছে ফিরিয়া গেল। বাতাস ঝাউগাছের উপর দিয়া হুহু শব্দে বহিয়া গেল, আকাশের কোলে নক্ষত্রকুল কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি, চাকরেরা 'হায় কি হইল' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভাত বাবু বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; কিরণ উষার মুখপানে চাহিয়া পাষাণের মত বসিয়া রহিল। একদিনের ইতস্ততের জন্য অদৃষ্টের এ নিদারুণ পরিহাসে অশ্রুহীন বেদনাভার বুকে চাপিয়া রহিল।

হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র।

মুদ্রাযন্ত্রের এত যে বহুল প্রচার হইয়াছে, তথাপি বোধ হয় হস্তলিপির সমাদর একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেকালে কি হইত জানি না; কিন্তু একালে মুদ্রাযন্ত্রের সরল পন্থা বর্ত্তমান থাকিতেও যে হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র সম্পাদিত ও পরিচালিত হইতেছে, আজ তাহারই একটি উদাহরণ উপহার দিতেছি।

সাময়িক-সাহিত্য সমালোচনার ভারগ্রহণ করিয়া সম্পাদকগণ নানাবিধ সাময়িক সাহিত্য উপহার পাইয়া থাকেন; কিন্তু আমি যে সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা করিব, তাহা তাঁহাদের নিকট কখনও উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। ফল্গুনদীর অন্তঃসলিলা পুণ্যধারার মত, নীরবে লোকলোচনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে উদীয়মান সাহিত্য-সেবকদিগের যত্নে যে সাময়িক সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে, তাহারই একখণ্ড সহসা আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা বর্ষীয়ানদিগের নিকট কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে; অপিচ স্থলবিশেষে সমূহ শিক্ষাপ্রদ।

সমালোচ্য সাময়িক সাহিত্যের নাম "উৎসাহ"—তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৩, পৌষ ও মাঘ,—এ, দাস সম্পাদিত এবং আদ্যোপান্ত সুগঠিত অক্ষরসম্বদ্ধ হস্তলিপি মাত্র। একজন সম্পন্ন গৃহস্থের দুইটিমাত্র পুত্র; জ্যেষ্ঠ বি, এ পরীক্ষার্থী সহসা পরলোক-গমন করায়, শোকাকুল জনকজননী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী কনিষ্ঠ পুত্রের বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করিয়া দিয়াছেন;—পুত্র পিতামাতার অগোচরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে গোপনে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তিন বৎসর ধরিয়া হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র সম্পাদন ও প্রচার করিয়া আসিতেছেন! এ, দাস অবশ্যই কাল্পনিক নাম। তিনি যিনিই হউন, অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। "উৎসাহ" যে কেবল নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহেরই পরিচায়ক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সাময়িক পত্রিকার মূল্য নাই; গ্রাহকের অত্যাচারে ইহা কখনও উঠিয়া যাইবারও আশঙ্কা নাই; আর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ না থাকিলেও শুদ্ধ কৌতূহলবশতই পাঠকদিগকে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইবে;—এ হিসাবে আমাদের হস্তলিখিত সহযোগী সবিশেষ সৌভাগ্যশালী।

পত্রিকায় মূল্য নাই, কিন্তু পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে গত বর্ষে যে সকল হেঁয়ালি নাট্য প্রকাশিত (?) হইয়াছিল, তাহার সদুত্তর দিয়া একজন পাঠক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "নদী পুরস্কার" পাইয়াছেন;—এবার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দিবার বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছে!

ইহাতে যথারীতি লেখকগণের নাম প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু কোন্ প্রবন্ধ কাহার লিখিত তাহা সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই। লেখকেরা কেহ সম্প্রতি কলেজ ছাড়িয়াছেন, কেহ সবেমাত্র প্রবেশিকাদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন;—কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ পরিহাসরসিক, কেহ সমালোচক, কেহ বা গভীরগবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক! আমাদের সহযোগীলেখক স্নেহাস্পদ দীনেন্দ্রকুমার রায় ভারতী, সাহিত্য, দাসী প্রভৃতি মুদ্রিত সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই পরিশ্রান্ত নহেন; তিনি এই হস্তলিখিত সাময়িক-পত্রেরও একজন রীতিমত লেখক! অন্যান্য লেখকদিগের নাম সাহিত্যসমাজে বোধ হয় এখনও অপরিচিত।

গ্রাহকের অত্যাচার নাই, কিন্তু তথাপি অনিবার্য্য কারণবশতঃ কখন কখন দুই মাসের কাগজ একসঙ্গে এক মলাটে বাহির হইয়া থাকে; সমালোচ্য সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।

এই সংখ্যায় কিন্তু গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। প্রকটিত প্রবন্ধগুলির নামঃ—

"নববর্ষ"—একটি মাইকেলী চতুর্দ্দশপদী কবিতা; বোধ হয় পৌষে ইংরাজি নববর্ষারম্ভে লিখিত। "মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন?"—ইহা একটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ধর্ম্মনৈতিক সুদীর্ঘ বক্তৃতা, বেশ সুলিখিত, সুখপাঠ্য, ইংরাজি উদ্ধৃতাংশপূর্ণ! "বিন্দু"—পোনের খানি স্বল্পাক্ষর পত্রে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প, বিয়োগান্ত খণ্ডকাব্যবিশেষ; যাঁহারা এই শ্রেণীর গল্প রচনা করেন, তাঁহাদের লেখা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। শেষ পত্রের শেষ ছত্রে "তোমাদের আদরের বিন্দু" জীবনবিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে স্বহস্তে লিখিতেছেঃ—"তোমরা আমার জন্য আনন্দাশ্রু ফেলিও;—কেননা এ পত্র পাইবার পূর্ব্বেই, আমি স্বামীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস বক্ষে লইয়া আনন্দধামে উপনীত হইব।" পরবর্ত্তী প্রবন্ধের নাম "বঙ্গভাষার ইতিহাস"—একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য দীর্ঘ প্রবন্ধের একাংশ, ইহাতে শাক্ত কবি মুকুন্দরামের কাব্যসমালোচনা নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে "ভারতী" হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"হেঁয়ালি নাট্য" বেশ সুকৌশলে রচিত; গতমাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "বাগান"। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত "প্রথম পদ্মের প্রতি" ইতি শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত, করিবার উপযুক্ত।

"তুমি বুঝি ফুটে আছ অয়ি!
শরতের প্রথম নলিনি!
এ বিজন জগতের পাশে—
মলিন, কাতর মুখখানি!

* * *

যৌবনের অশান্ত প্রভাতে
রবি দেয় আশার কিরণ;
তার পরে চিরনিশা এসে
ঢেকে ফেলে কোমল জীবন।"

"রাসিয়ানতত্ত্ব" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; রুষ কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে তাহাদের "আকার ও পরিচ্ছদ; পানাহার; গৃহাদি; চরিত্র ও ব্যবহার; আমোদ প্রমোদ; ব্যবসায়; বিভাগ ও সংখ্যা; এবং শিক্ষা" সংক্রান্ত অনেক কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

উপন্যাস না থাকিলে কেবল যে আমাদিগেরই পত্রিকা হতাদরপ্রাপ্ত হয় তাহা নহে; ইহাতেও "আমার প্রথম চাকুরী" নামে একটি উপন্যাস সূচিত হইয়াছে। এইরূপ হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র যে এই নূতন তাহা নহে;—বোধ হয় ইহারও একাধিক সহযোগী আছে। সমালোচ্য সংখ্যায় তদ্রূপ "বিষাদ" নামক সহযোগীর একটি কবিতার উত্তরে "উৎসাহে" দুইটি কবিতা প্রকটিত হইয়াছে। একসহযোগী অপর সহযোগীকে যথাকথঞ্চিৎ উপহাস করিতেও ত্রুটি করেন নাই! "স্ত্রীস্বাধীনতা" একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুকরণে "হাসি ও গল্পে" শীর্ষক "দাড়ীবিভ্রাট" নামক একটি "রহস্য-কবিতা" লিখিত হইয়াছে।

"হারাধন কর্ম্মকার করে লোহার কাজ,
গড়্‌তে পারে বেড়ী, কড়া, ঘোড়াগাড়ীর সাজ;
হারাধন বেঁটে,
রংটা মেটে,
হাতগুলা যেন কেঠে
মুখে বেজায় দাড়ি!
মাপ্‌তে গেলে হবে বোধ হয় হাত তিন চারি।"

ছন্দোবন্ধে, পদলালিত্যবিস্তারে, হাস্যরসোদ্দীপনায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা; কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁহাকে গুপ্তশরে পরাস্ত করিবার জন্য যে আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে, ইহাতে বন্ধুর পক্ষে অনেক আশঙ্কার কথা। হারাধন বেচারার দাড়িতে এক বোল্‌তা প্রবেশ করে, হারাধন তাহা বাহির করিতে না পারিয়া কলিকাতায় চিকিৎসার্থ উপস্থিত। সিম্‌সন্ সাহেব বলিলেন,—এ "বিউবোনিক প্লেগ," তৎপর

"চরক সুশ্রুত, নিদান আদি পুস্তকাদি থেকে,
দাড়ীং মধ্যে বোল্‌তা অস্তি—এই শ্লোক হেঁকে,
বল্লেন বিজয় রত্ন,
নিশ্চয়ই এটা ব্রধ্ন!"

* * *

"কালী বাবু দেখে শুনে বল্লেন ব্যাধি শক্ত;
জিরো নম্বরের চস্‌মা লও, সাফ্ হবে রক্ত!"

ইত্যাদি ইত্যাদি সাময়িক ও ব্যক্তিগত শ্লেষাত্মক রহস্য কবিতা।

"আমাদের ধর্ম্মজীবন," "ভাঙ্গা ও গড়া" এই দুটি ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত গবেষণার পর "রাজনৈতিক আলোচনা।" ইহাতে দ্বাদশ রাষ্ট্রীয় সমিতির এবং হিতবাদীর মানহানি-মোকদ্দমার আলোচনা আছে।

এই হস্তলিখিত সাময়িক সাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম কেন? যাঁহারা ইহার লেখক, পাঠক, পরিচালক, তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষানুশীলনে যেরূপ আগ্রহ এবং অনুরাগের পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বোধ হয় ইঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই একদিন সাহিত্যসমাজে অধিকতর সুপরিচিত হইবেন; সেদিন এই ক্ষুদ্র সমালোচনা হয় ত বঙ্গ-সাহিত্য সেবকের পূর্ব্বজীবনের রহস্যভেদ করিতে সক্ষম হইবে।

চস্‌মা।

আজকাল চস্‌মাপরাটা খুব প্রবল হইয়াছে। পথে, হাটে, ঘাটে, মাঠে যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই অজাতশ্মশ্রু চস্‌মিতচক্ষু বালকের দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কোন গ্রামবাসী কলিকাতায় প্রথম আগমন করিলে যে কয়টী আশ্চর্য্য দ্রব্যের তালিকা তাহার মনোমধ্যে গাঁথিয়া লয় বোধ করি এতাদৃশ চস্‌মার জনতা ও তাহার মধ্যে একটী হইয়া পড়ে। চত্বারিংশ বৎসরের ঊর্দ্ধতনবয়স্ক প্রৌঢ়ের চাল্‌সে ধরাই চিরন্তন প্রথা ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলময়ী কুরুণার হাপায় পড়িয়া ষোল সতের বৎসরেই চাল্‌সে ধরিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বালকদিগের ঈদৃশ দাম্ভিকতা দেখিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের শিরোব্যথা উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা অবসর পাইলেই ইহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষানুসারিণী ফ্যাশন্ সুন্দরীর লীলাবিশেষ মনে করিয়া বালকদিগের উপর বিশেষ ঝাল ঝাড়িয়া থাকেন।

বালকেরাও চস্‌মা আঁটিয়া আপনাদিগকে সক্রেটিস্ বা নিউটন অপেক্ষা কোন প্রকারে হেয় জীব মনে করে না; চস্‌মাটী তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া যখন তাহারা পার্থিব সংসারের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করে, তখন তাহাদিগকে এই বিশাল জ্ঞানরাজ্যের একমাত্র অধিকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ বা চস্‌মাকে শারীরিক সৌন্দর্য্য বা মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির একটা প্রধান উপকরণ বলিয়া মনে করে। হায়! কি আত্মবিড়ম্বনা! আমাদের বিবেচনায় বোধ হয় যে তাহারা অকালে অমূল্য চক্ষুরত্ন হারাইয়া ভবিষ্যজীবনের শান্তিময় পথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়াছে, এবং তাহাদের কল্পিত সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে বীভৎস বিতিকিচ্ছিতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুসুমসুকুমার বালকের তেজোদ্দীপ্ত চক্ষুর নিকট চস্‌মাসমন্বিত নয়নযুগল অতি সামান্য ছার পদার্থ।

কিন্তু সত্যের মান্য রক্ষা করিতে গেলে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে, দেশের যুবকগণের মধ্যে চস্‌মাব্যবহার বৃদ্ধি, সেই দেশের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির সবিশেষ পরিচায়ক। জার্ম্মেনী ও আমেরিকা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। জার্ম্মেনী জ্ঞানগরিমায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, এবং সেইখানে শতকরা ৫০ জনেরও অধিক বালক চস্‌মা পরিয়া থাকে। তবে আমেরিকায় নিকটদৃষ্টি কমাইবার জন্য তত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নূতন নিয়ম প্রচলন করাতে চস্‌মাপরাটা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও যে যে প্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার কিছু প্রাবল্য আছে সেই স্থানেই চস্‌মারও প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

অনেক বয়স্ক ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন, ফ্যাশনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া বালকেরা চস্‌মা পরিয়া থাকে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। যাহারা চস্‌মা পরে, বাস্তবিকই তাহাদের নিকটদৃষ্টি নামক চক্ষুব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। নীরোগ

চক্ষুর উপরে কোনরূপ শাশী-খড়খড়ী লাগাইলেই সেই ব্যক্তির গমনশক্তির বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হইবে, এবং তজ্জন্য পথিমধ্যে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত তাহার চক্ষুর ভিতরে একপ্রকার টনটনানি কষ্ট ও অনর্গল অশ্রুপতন হইতে থাকিবে। ব্যাধিগ্রস্ত না হইলে চক্ষুর উপরে সমস্তদিন চস্‌মা লাগাইয়া রাখা অতীব কষ্টদায়ক। তবে যাঁহারা তীক্ষ্ণ রৌদ্রালোকে রঞ্জিতকাচযুক্ত চস্‌মা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোনরূপ দৃষ্টিদোষ না থাকিতে পারে।

দৃষ্টিশক্তির দোষ জন্মিলে চস্‌মা প্রায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। যে কোন বালকেরই হউক, খানিকটা নিকটদৃষ্টি রোগ জন্মাইবামাত্র দূরদর্শনোপযুক্ত চস্‌মা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কোনরূপ পাঠ করিবার সময় তাহাদিগের চস্‌মা খুলিয়া পড়া ভাল। চস্‌মা ব্যবহার না করিলে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ও নানাপ্রকার ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক দূরস্থ পদার্থ দর্শন করিতে হয়। তাহা বিশেষ ক্ষতিকারক ও তাহাতে নিকটদৃষ্টি রোগ ক্রমশঃ আরও বাড়িয়া যায়। এতদ্ভিন্ন দূরস্থিত পরিচিত লোক তাহাদিগের গোচরীভূত না হওয়াতে অনেক সময়ে পথিমধ্যে অপ্রস্তুত হইতে হয়। যে চস্‌মাটী ব্যবহার করিবে, তাহা তোমার তদানীন্তন দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এজন্য পরিচিত বিখ্যাত চস্‌মা-বিক্রেতাগণের নিকট হইতে, উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়া, চস্‌মা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টিশক্তির অনুপযুক্ত হইলে অন্যপ্রকার চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে।

হে চস্‌মিত বালক! তোমার এই নিকটদৃষ্টি রোগটীকে অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব্যাপার মনে করিও না। চস্‌মা পরিলেই যে তোমার এই খুঁৎটুকু সারিয়া গেল; কদাচ ইহা তোমার মনে স্থান দিও না। এই ক্ষুদ্র রোগটীর সঙ্গে সঙ্গে Retina, Choroid, Vitreous Humour, প্রভৃতি চক্ষুযন্ত্রের সমস্ত উপকরণেরই কিছু কিছু দোষ জন্মিয়া থাকে এবং সেই কোন একটী দূষিত অংশ হইতে ভবিষ্যতে তোমার দৃষ্টিশক্তির সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। কয়েকটী নিকটদৃষ্টিযুক্ত বালককে কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে শুনা গিয়াছে। অতএব তোমার অজ্ঞাতসারে যতটুকু দোষ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা আর বাড়াইতে না দেওয়ার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কখনই এরূপ বালকদিগের চস্‌মা ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। আদৌ ছিল না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে গেলে, নিকটদৃষ্টি-রোগের কারণগুলি তখন ছিল কি না ইহাই অনুসন্ধান করিতে হয়। সুতরাং এই কারণগুলি কি কি, অগ্রে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি পুরাকালে বিদ্যমান ছিল কি না, দেখিয়া লওয়া যাইবে।

১। অতিরিক্ত বিদ্যাচর্চ্চা—পূর্ব্বে এত অধিক সংখ্যক বালক যে লেখাপড়া করিত না ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশের তালিকা দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে প্রতি বৎসর অগণ্য ছাত্র নানাবিধ পাশ করিতেছে,

এইটী অবশ্য আমাদের দেশের পক্ষে সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সুলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী কুলক্ষণ আসিতেছে ইহাই দুঃখের বিষয়।

২। অতিরিক্ত পুস্তক পাঠ—একটী বার বৎসরের ছেলের তেরখানি বই ও ছাব্বিশ খানি মানের বই। এই সমস্তই ঐ দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্র বালকটীকে কোনপ্রকারে কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। এইরূপে চক্ষুদ্বয় নিকটস্থ দ্রব্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় দূরদর্শনের পক্ষে ক্রমে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয় ও গৃহে অভিভাবক মহাশয় উভয়েই স্থির করিলেন, ছেলেটী অনতিবিলম্বে জ্ঞানরাজ্য দখল করিয়া বসিবে। কিন্তু তাহার চক্ষুদ্বয় দু-চার বৎসরেই ছেলেটীকে অগ্রে দখল করিয়া তাহাকে সর্ব্বকার্য্যের বাহির করিয়া দিল। পূর্ব্বকালে কখনই, ছাত্রগণের জন্য এতগুলি বই ও মানের বই ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণ যে আমাদের অপেক্ষা কম শিখিতেন তাহাও ত বোধ হয় না।

৩। রাত্রি জাগিয়া পাঠ—কোন কোন বালক প্রায় প্রত্যহ বা অন্ততঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েক মাস, রাত্রি ১২ কি ১টা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে অনেক সময় দেখা যায়, যে তাহারা দিবসের মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টাকাল গল্পগুজব করিয়া বৃথায় নষ্ট করিয়া থাকে, এবং রাত্রি জাগিয়া সেইটুকু পোষাইয়া লয়। বলাবাহুল্য এই কার্য্যে চক্ষু দেহ ও মন সকলেরই ক্ষতি হইয়া থাকে। বিখ্যাত ডাক্তার সাণ্ডার্স বলেন, সমস্ত চাক্ষুষ কার্য্য যতদূর সম্ভব দিবালোকে করা উচিত। পূর্ব্বকালে এত রাত্রি জাগিয়া পড়িবার ধূম ছিল না।

৪। ক্ষীণালোকে বা অত্যুজ্জল আলোকে পাঠ—বালকটী প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে বসিল। পড়িতে পড়িতে বা অঙ্ক কসিতে কসিতে, প্রদীপটী স্তিমিতপ্রভ হইয়া আসিল। কিন্তু অভিনিবিষ্টচিত্ত বালকের সেটী আর ইন্দ্রিয়গোচর হইল না, এবং তাহার মস্তক সুদর্শনের নিমিত্ত ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে লাগিল। কোন কোন সঙ্গতিপন্ন বালকের সম্মুখে তীব্র গ্যাসালোক বা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিয়া থাকে, তাহার তেজোময় রশ্মি পুস্তকের শুভ্রপত্রে প্রতিফলিত হইয়া, তাহার চক্ষুর উপর ঝক্‌ঝক্ করে, এবং এইরূপে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করিয়া থাকে। সেজ প্রভৃতির কম্পমান আলোকও দৃষ্টিপক্ষে অতিশয় ক্ষতিকারক।

৫। তক্তাপোষ বা ভূমির উপর বসিয়া পড়া—এইরূপ করিলে, মুদ্রাঙ্কন দৃষ্টিগোচর করিবার নিমিত্ত মস্তককে অনেকটা অবনত করিতে হয়। তাহাতে চক্ষুর মধ্যে শোণিতপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে, এবং ইহাতে দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন সেরূপে বসাতে বালকেরা প্রায়ই কুব্জাকৃতি হইয়া থাকে।

৬। বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট বালকদিগের জন্য সমোচ্চ টেবিলের ব্যবস্থা—দীর্ঘাকৃতি বালকগুলির পক্ষে হয়ত টেবিলটী নীচু বোধ হয় এবং তাহাকে কার্য্য করিবার সময় মস্তক অবনত করিতে হয়। কিন্তু হ্রস্বকায় বালকের পক্ষে হয়ত টেবিলটী তাহার চিবুকস্পর্শ করিয়া থাকে, এবং বই পড়িতে তাহাকে বিশেষ মুস্কিলে পড়িতে হয়। অত নিকটে চক্ষু রাখিয়া পড়া দৃষ্টিশক্তির পক্ষে প্রভূত ক্ষতিকারক।

৭। কদর্য্য বিদ্যালয়-গৃহ—আজকাল লোকে অন্য কোন কাজ না পাইলে বিদ্যালয় খুলিয়া থাকে। কাজে কাজেই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা কম ভাড়া দিয়া একটী বাড়ী লইতে হয়। বাড়ীটিও তেমনি জুটিয়া থাকে। গৃহগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, যে আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ যত্নপূর্ব্বক নিষিদ্ধ। সেই অন্ধকূপের মধ্যে দুর্ভাগ্য ছাত্রগুলি ৪।৫ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া বহুকষ্টে পুস্তক পাঠ করে। পূর্ব্বকালে বিদ্যালয়গুলি যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের জন্য খোলা হইত, এবং বোধ হয় বাড়ীটিও অর্থাভাবে এমন কদর্য্য হইত না।

৮। পুস্তকগুলির জঘন্য ছাপা—প্রকাশক মহাশয়গণ রাতারাতি বড়লোক হইবার অভিপ্রায়ে ভাঙ্গা, পচা, ক্ষুদ্রাকৃতি টাইপদ্বারা যেন তেন প্রকারেণ বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক প্রচার করিয়া ফেলেন। বালকদিগকেও বাধ্য হইয়া তাহাই পড়িতে হয়। পুস্তকের কাগজগুলি লইয়া ঘুড়ি বা ব্লটিং পেপার প্রস্তুত করা বোধ হয় নিতান্ত অসম্ভব হয় না। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যেরূপ জঘন্য কাগজ ও জঘন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপা দেখা যায়, বোধ করি অন্যত্র সেরূপ হইলে প্রকাশক মহাশয়কে পথ দেখিতে হইত।

৯। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব—বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে ৫।৭টী পরীক্ষা। কাজে কাজেই পরীক্ষার উত্তেজনায় ছেলেরা অষ্টপ্রহর লেখাপড়া করে। গুরুজনেরাও গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন, ছেলেটী দিনরাত পড়াশুনা করে। কিন্তু দিনরাত পড়াশুনা করিতে গেলে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দিনরাত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মাংসপেশীগুলি বসিয়া বসিয়া ক্ষীণ হইয়া আসে ও রক্তপ্রবাহ বসিয়া বসিয়া আর চলিতে চাহে না। এইরূপে চক্ষুযন্ত্রে পুষ্টিদাতা শোণিতের আর তেমন গতিবিধি থাকে না এবং চক্ষুদুটী ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে। ভবিষ্যতে ছেলেটী একটী মহাদিগ্‌গজ পণ্ডিত হইলেও মনুষ্যত্ববিহীন গড্ডলিকামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আগেকার ছেলেরা ডন্ ফেলিত, মুগুর ভাঁজিত, গাছে চড়িত ও সাঁতার দিত। অধুনা তাহারা সভ্য হইয়া বেশী লেখাপড়া শিখিয়া শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, অসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ মনে করে।

যে কয়েকটী কারণ দেখান হইল, সেইগুলিই আমার বিবেচনায় প্রধান বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত কারণগুলি যতদিন বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন চস্‌মিত চক্ষুর আমদানি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। অবশেষে ব্যাপারটী বাস্তবিক অত্যন্ত বিসদৃশ ও শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

তবে উপায় কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল বালকের নিকটদৃষ্টি রোগ জন্মিয়াছে তাহাদের চস্‌মাধারণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই ও থাকা উচিত নহে। কোনরূপ ঔষধ সেবনদ্বারা এই রোগের নিরাকরণ হয় না। তবে যাহাতে ইহা বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিবিধান করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য। আমেরিকা দেশে এই রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অধুনা তন্নিবারণের কঠিন নিয়মাবলী প্রচলিত হওয়াতে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সেই সকল উপায় প্রচলন করিতে জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। তাহা হইলে বোধ হয় ২০।২৫ বৎসর পরে আর এতাদৃশ চস্‌মাধারীর জনতা থাকিবে না। উপায়গুলি কি কি, দেখা যাউক।

ছাত্রদিগকে যতদূর সম্ভব দিবালোকে পাঠ করাইতে হইবে। ডাক্তার সাণ্ডার্স বলেন, কৃত্রিম আলোক যতই সুগঠিত ও মূল্যবান হউক না কেন, কখনই সূর্য্যালোক তুল্য সমব্যাপী ও পাঠোপযোগী হয় না। দুই এক ঘণ্টা রাত্রে পড়িবার জন্য স্থিরশিখা নাতিপ্রখর আলোক বামপার্শ্বে বা পশ্চাতে উপরিভাগে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। আজকাল নবাবিষ্কৃত কেরোসিন তৈল অতিশয় ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে দর্শনশক্তির ক্ষতিকারক বলিয়া থাকেন। পুঁথিগত বিদ্যা কমাইতে হইবে। কেবল পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্যান্য প্রণালীতে বিদ্যাভ্যাস করান নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় ভিন্ন শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়কেও বিদ্যাশিক্ষার উপায় স্বরূপ করা যায়। বিদ্যালয়ে সুদক্ষ শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ে সুন্দর শ্রুতিসুখকর বক্তৃতা দান করিলে, এবং ছাত্রগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা ও উত্তর ও বাদানুবাদ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারে। বিদ্যালয় গৃহ প্রশস্ত ও সুগঠিত হইবে, প্রত্যেক গৃহে বায়ুসঞ্চার ও আলোক প্রবেশের যথেষ্ট উপায় থাকিবে। পাঠ্যপুস্তকগুলি শুভ্রবর্ণ মোটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। টেবিলগুলি প্রত্যেক ছাত্রের উচ্চতা অবলম্বনে বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট করিতে হইবে। ইহা, অনেকের নিকট অনাবশ্যক ও হাস্যকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমেরিকা দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। বসিবার বেঞ্চ বা চৌকিতে পশ্চাতে অবলম্বন রাখা প্রয়োজন; ইহাতে বালকগণ সরলভাবে বসিতে পারিবে। সমতল টেবিল অপেক্ষা ঢালু টেবিল বা ডেস্ক অনেক ভাল এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব চক্ষু হইতে নিম্নে রাখিতে হইবে। অথচ বালকটী দর্শনের নিমিত্ত কখনও মস্তক অবনত করিবে না। বেঞ্চ যত উচ্চ করিলে উপবিষ্ট বালকটীর পদতল ঠিক ভূমিতে সংলগ্ন হয়, ভূমি হইতে ঠিক তত উচ্চ করা কর্ত্তব্য। ভূমিতলে পাঠ করা অন্যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহাই করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শরীর আমাদের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ও শ্রমপটু ছিল। তজ্জন্য ভূমিতলে পাঠের অপকারটুকু তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। টেবিল ক্রয় করা সকলের আর্থিক অবস্থায় সম্ভবপর হয় না সত্য বটে, কিন্তু একটী কাষ্ঠখণ্ড ও কয়েকটী ইষ্টক সাজাইয়া এক প্রকার চলনসই টেবিল বানান নিতান্ত সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। যাহাতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশী প্রত্যহ সমানভাবে পরিচালিত হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক বল ও শ্রমনিপুণতার উপর যে মানসিক শ্রমশীলতা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, ইহা দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসীগণ অনেকেই বিস্মৃত রহিয়াছেন। দেহের অপরাপর অঙ্গের উৎকর্ষসাধন হইলে তৎসঙ্গে দর্শনাঙ্গও উৎকর্ষলাভ করিতে বাধ্য হইবে। কুস্তি কর, ব্যায়াম কর, সাঁতার দাও, পদব্রজে ভ্রমণ

কর। অপরের নিকট হইতে একটা ঘুসি গ্রহণ করিয়া উদারচিত্তে দুইটা ঘুসি প্রদান করিতে শিখ। দেখিবে, তাহাতে যে শরীরসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইবে, স্বর্ণময় হীরকমণ্ডিত চস্‌মা লাগাইলে তাহার শতাংশও হইবে না। দেখিবে, তোমার মন প্রফুল্ল থাকিবে, রাত্রে সুনিদ্রা হইবে, খাদ্যের সুপরিপাক হইবে, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে পারিবে।

অতৃপ্তি।

জননী প্রকৃতি, আমি বড় গো তৃষিত,
কোথা তব রূপ, গান, গন্ধের ভাণ্ডার?
সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে পিয়াও অমৃত,
করে' দাও মনে চিরবসন্ত সঞ্চার।
প্রতিদিন তপনের উদয়াস্ত কালে
মেঘের সর্ব্বাঙ্গমাখা স্বর্ণবর্ণছটা;
নিদাঘসন্ধ্যার নবজলদের ঘটা;
বিহঙ্গের কলগীতি পুষ্পিত রসালে;
রজনীতে চন্দ্রোদয় বারিধি হৃদয়ে;
গিরিশিরে স্ফুটনবমল্লিকা-আঘ্রাণ;
—যা শোভা সৌরভ সুখ তোমার আলয়ে,
সব দিয়ে ছেয়ে দাও আমার এ প্রাণ;—
আমার প্রতিভাবধূ উন্মাদিনী হয়ে
আসিয়া করুক মোরে আলিঙ্গন দান!

সিরাজদ্দৌলা।

উপসংহার।

The story of the rise and progress of the British power in India possesses peculiar fascination to all classes of readers. It is a romance sparkling with incidents of the most varied character. Whilst it lays bare the defects in the character of the native races, which made their subjugation possible, it indicates the trusting and faithful nature, the

impressionable character, the passionate appreciation of great qualities, which formed alike the strength and weakness of those races,—their strength after they had been conquered, their weakness during the struggle. It was those qualities which set repeatedly whole divisions of the race in opposition to other divisions—the conquered and the willing co-operators to the sections still remaining to be subdued. * * * In the combination of astuteness with simplicity, of fearlessness of death and conspicuous personal daring with inferiority on the field of battle, in the gentleness, the submission, the devotion to their leader which characterised so many of the children of the soil, (the student) will not fail to recognise a character which demands the affection, *even the esteem*, of the European race which, chiefly by means of the defects and virtues I have alluded to, now exercises overlordship in Hindustan.—Col. Malleson's Decisive Battles of India.

কেবল ঘটনাবিবৃতির জন্য যে সকল ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলার অন্যায় উৎপীড়নেই তাঁহার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। কার্য্য কারণ সমালোচনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস সঙ্কলন করিলে, তাহাতে সকলকেই লিখিতে হইবে,—এই হতভাগ্য নরপতির অযথা কলঙ্কিত তরুণজীবনের অত্যাচার অবিচার উপলক্ষমাত্র, আমাদের চরিত্রহীনতাই মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূলকারণ।

আরঙ্গজীবের শেষদশায় ভারতবর্ষে যে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে মোগলের রাজসিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছিল; অন্তর্বিপ্লবের ছিদ্রলাভ করিয়া ফরাসী এবং ইংরাজ, এই দুই পরাক্রান্ত বিদেশীয় বণিকসমিতি দেশীয় লোকের সহায়তায় ভারতবর্ষে আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া অকালে দেহবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও মোগলের সিংহাসন অটল রহিত না!

আমাদের অধ্যবসায়ে, আমাদের বাহুবলে, আমাদের সহায়তা লাভ করিয়া, ইংরাজ-বণিক এদেশে আত্মপ্রতিভা বিস্তার করিবার অবসরলাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে বৃটীশরাজশক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরাই তাহার প্রধান সহায়; আমাদের দেশের মন্ত্রণাকুশল অমাত্য ওমরাহগণ রাজবিদ্রোহে মিলিত না হইলে—আমাদের দেশের অকুতোভয় সিপাহীসেনা আত্মশোণিত সম্প্রদানে শত সমরক্ষেত্রে বৃটীশবিজয়বৈজয়ন্তী বহন না করিলে—একপ্রদেশের লোক সহায় হইয়া অন্য প্রদেশের পরাজয়সাধনে অগ্রসর না হইলে—এ দেশে বৃটীশরাজশক্তি সুসংস্থাপিত হইত কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা রণপরাজিত বিপন্ন শক্রর ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া বৃটীশবণিকের শাসনক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই নাই ;—বন্ধুবেশে সহচররূপে পরস্পরের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায় সংযুক্ত বাহুবলে মোগলশাসন উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যেমন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ অন্যদিকে আবার সেই চরিত্রের সরলতাও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। আর ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নবজীবনের সুখশান্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের পথ যতই নিন্দার্হ হউক, গরলে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে, নব্যভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইংরাজবণিকের সহায়তা না করিলে, এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত কি না তাহাতে কিন্তু সমূহ সন্দেহ! আমাদিগের জাতীয়চরিত্রে দুর্ব্বলতা না থাকিলে এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত না।

আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা না থাকিলে, বোধ হয় ইংরাজবণিক চিরদিন মালগুদামের খাতাপত্র লইয়াই জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেন ; কখন বা কোন মুসলমান নবাবের নির্যাতনভয়ে আমাদিগেরই বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয়গ্রহণ করিতেন! আমাদের জাতীয়চরিত্রে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধনা, গুপ্তপ্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অধ্যবসায়, স্বার্থসাধনের জন্য অকুতোভয়তা, অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনেও অকাতরতা, অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস করিবার জন্য সরলতা—এতগুলি সদ্‌গুণ না থাকিলে, মোগল পাঠান, মরহাট্টা শিখ, রোহিলা জাঠ, পিণ্ডারী ঠগ, বহুবিধ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর অমিত বিক্রমের গতিরোধ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর আত্মবলে ভরতসাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন না।

আমরা চরিত্রদোষে দুর্ব্বল,—আমরাই আবার চরিত্রগুণে বলীয়ান ; আমাদিগের দুর্ব্বলতা এবং সবলতাই ভারতবর্ষে বৃটীশ-শাসনশক্তির ভিত্তিভূমি। এই সকল কারণে, ইংরাজ লেখকদিগের পক্ষে আমাদের নিন্দাবাদ করা শোভা পায় না ; আমাদিগকে রণপরাজিত কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাসরচনা করিলে ইংরাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে না!

এখন আর সে দিন নাই! মোগল পাঠান "ক্রীড়াপটে" বিরাজ করিতেছে ;—আমাদের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের গৌরববর্দ্ধনের জন্য আমরা, এই দুই মহাজাতি এক অখণ্ড রাজতন্ত্রের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, বাহুতে বাহুবন্ধন করিয়া গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি! এই বাহুবন্ধন সুদৃঢ় হউক—এই চিরসাহচর্য্য প্রীতিপ্রদ হউক—এই অভিনব সম্বন্ধ চিরপুরাতন হউক—ইহাই এখন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সমবেত প্রার্থনা। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের এই শুভসম্মিলন দিনে, ইংরাজ বাঙ্গালী সত্যের সম্মানরক্ষার্থ—সরলভাবে আত্মাপরাধ স্বীকার করিতে সম্মত হইলে, জেতৃ বিজিত সকলকেই বলিতে হইবে,—"Sherajaddaulah was more *unfortunate* than *wicked!*"

বাঙ্গালায় আকের চাষ।

[illegible] ভারতবর্ষ [illegible] ও [illegible] ইহার বোট্যানিকাল্ নাম স্যাকারাম্ অফিসিনারম্।

[illegible] বাঙ্গলায় ইহাকে আক্ ও কুশর ; হিন্দিতে [illegible] আঝালি ও চাকু ; উড়িষ্যায় আখু ; কুমাউনে [illegible] লিতে কারম্বু কহে। ইহার চিনিকে সংস্কৃত [illegible] কর, আরব্যেতে শকর ও গ্রীকে শর্ক্করণ্ট কহে। [illegible] ভারতবর্ষ হইতে [illegible] র সিসিলি দ্বীপে নীত হয় ও সিসিলি হইতে [illegible] র ব্যাপৃত হয়।

[illegible] ত্রই আকের চাষ অধিক হয়। কিছুদিন হইতে [illegible] কমিয়া আসিতেছে ; তন্মধ্যে এই তিনটি [illegible] (১) [illegible] হওয়া, (২) বন্যায় ও নানাপ্রকার রোগে আক নষ্ট [illegible] (৩) [illegible] না হওয়ায় জলপ্রাপ্তির অনিশ্চিততা।

[illegible] পুরি, বোম্বাই ও খড়ি এই কয় জাতীয় আকের [illegible] দৃষ্ট হয়। [illegible] শ্রেষ্ঠ কারণ দীর্ঘে ইহা সকল আক্ অপেক্ষা [illegible] অংশও অধিক। জমিতে জল দাঁড়াইলে ইহা [illegible] হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলাতে এই আকের চাষ [illegible] ছোট, নিকৃষ্ট ও কঠিন। বীরভূম, বাঁকুড়া ও [illegible] আকের চাষ অধিক পরিমাণে হয়। কাজলি বেগুনে [illegible] পুরি, হরিদ্রা বর্ণের, ইহার রস পাতলা ও [illegible] ইহা সামসাড়ার মতন বড়, রসাল ও নরম এবং [illegible] অংশ অধিক। প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে ধম্মা রোগে বোম্বাই [illegible] এই আকের চাষ কোন কোন জেলায় অতি অল্পস্থানেই [illegible] শক্ত। ইহাতে জল সেচনের কোনও আবশ্যক [illegible] যদিও রস বড় কম কিন্তু চিনির অংশ অধিক। [illegible] হয়।

গত বৎসর বাঙ্গালায় [illegible] একর জমি (এক একরে তিন বিঘার অপেক্ষা কিছু অধিক) আবাদ হয় তন্মধ্যে ১০৩০৬০০ একর জমিতে আকের চাষ হইয়াছিল।

বাঙ্গলায় নিম্নলিখিত নিয়মে চাষ করিলে অধিক লাভ পাওয়া যায়।

শস্যপর্য্যায়। আক চাষে জমির তেজ কমিয়া যায় ; তজ্জন্য প্রত্যেক বৎসর এক

REPAIRED DOCUMENT

জমিতে ইহার চাষ করা উচিত নয়। আলু, আশুধান্ত কিম্বা গম উঠাইয়া ... সেই জমিতে আক দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্ষায় যে জমি পতিত থাকে, তাহাতে ইহা ভাল হয়। আলুর পর সেই জমিতে আক দিলে জমির আর কোন পাট করিতে হয় না, কেবল ২।৩ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি চৌরস করিয়া দিলেই চলে।

জমি। নদী কিম্বা খালের ধারের উচ্চ পলি জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ... সংযুক্ত জমিও এই চাষের পক্ষে ভাল। জল সেচ্ করিবার সুবিধাজনক জমিতে ইহার চাষ করা উচিত। ক্ষেত্রে জল জমিলে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয় তজ্জন্য জল বাহির হইবার জন্য ভাল জুলি রাখা উচিত।

জমি প্রস্তুত। মাঘ মাসের প্রথম হইতে বৈশাখ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সচরাচর আক পাতিবার সময়। চৈত্র বৈশাখ মাসে আক বসান অপেক্ষা মাঘ ফাল্গুন মাসে বসান ভাল; কারণ তাহাতে ফসল ভাল হয় ও বাজারেও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে এরূপ শীঘ্র চাষে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বর্ষা খাওয়া পতিত জমিতে যদি আক পাতা হয়, তাহা হইলে শ্রাবণ মাসে হাল দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। আর যদি ভাদুই ফসলের পর আক পাতা হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে হাল দেওয়া আরম্ভ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না জমি আক পাতিবার উপযোগী হয় ততদিন হাল দিতে হয়। আক চাষের জন্য গভীর খনন ও ধূলার মতন মাটী প্রস্তুত করা আবশ্যক।

"মূলার ভুঁই তুলা।
আকের ভুঁই ধূলা।"

যাহাতে গভীর খনন ব্যতীত নীচের মাটী উল্টাইয়া তাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ লাগিতে পায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আক পাতিবার পূর্ব্বে জমিতে অন্তর ৮।৯ বার হাল দিতে হয়। যখন জমি ৮ ইঞ্চি গভীর হইয়া গুঁড়াইয়া ধূলার মত হয়, তখন আক পাতিবার জন্য মই দিয়া চৌরস করিতে হয়।

সার। নিম্নলিখিত সার সকল আক-চাষের উপযুক্ত।

প্রত্যেক বিঘায় যত পরিমাণে আবশ্যক (৮০ হস্ত লম্বা ও ৮০ হস্ত প্রস্থ বিঘার মাপ)

(১)	হাড়ের গুঁড়া	...	...	৪ মণ
	ও			
	রেড়ির খোল	...	...	৮ মণ
(২)	হাড়ের গুঁড়া	...	...	৪ ,,
	ও			
	গোবর	...	...	২০০ ,,

প্রত্যেক বিঘায় যত পরিমাণে আবশ্যক (৮০ হস্ত লম্বা ও ৮০ হস্ত প্রস্থ বিঘার মাপ)

(৩)	গোবর	...	...	২০০ মণ
	ও			
	রেড়ির খোল	...	...	৮ ,,
(৪)	গোবর	...	...	২০০ ,,
	ও			
	সুপার	...	...	২ ,,
(৫)	রেড়ির খোল	...	...	৮ ,,
	ও			
	সুপার	...	...	২ ,,

আক পাতিবার এক মাস পূর্ব্বে জমীতে হাল দিবার সময় গোবর দিতে হয়। হাড়ের গুঁড়া কিম্বা সুপার দিতে হইলে অর্দ্ধেক আক পাতিবার সময় কিম্বা হাল দিবার সময় এবং অপর অর্দ্ধেক বর্ষা আরম্ভ হইলে দিতে হয়। যদি রেড়ির খোল দিতে হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক বর্ষার প্রারম্ভে এবং অপর অর্দ্ধেক ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে, গাছ বাহির হইলে, ... হয়।

আক পাতিবার নিয়ম। সাঁমসাড়া ও বোম্বে প্রভৃতি মোটা আক এইরূপে ... হয়—চারি ফিট অন্তর এক ফুট প্রশস্ত লম্বা ২ জুলি কাটিয়া প্রথমে জমীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। পরে আক বসাইবার জন্য ২ ফিট কাটিতে হয়। তৎপরে ঐ ... অন্তর রেখাগুলির উপর সমান অন্তর করিয়া তিনটি ডগা বসাইতে হয়।

... আকের ন্যায় সরু আক সকল গভীর জুলিতে বসান ভাল। তজ্জন্য উপরোক্ত আক বসাইবার রেখাগুলি ১½ ফিট অন্তর এবং ৩ ইঞ্চি কিম্বা ৩½ ইঞ্চি গভীর হওয়া আবশ্যক। এবং ঐ জুলির মধ্যে ১ ফুট অন্তর ৪টি ডগা বসাইতে হয়।

উপরোক্ত প্রণালীদ্বয় অপেক্ষা মুরীচদ্বীপের আকপাতা প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ... নিম্নলিখিতরূপে আক পাতা হইয়া থাকে। আক বসাইবার জন্য উপরোক্তরূপে ... নিয়া সেই রেখাগুলির উপর ১½ ফিট অন্তর ৯ ইঞ্চি গভীর ও ২½ ফিট ব্যাস ... কতকগুলি গর্ত্ত কাটিতে হয়। পরে কোদালির দ্বারা জুলি কাটিয়া ঐ গর্ত্তগুলি ... সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। ঐ জুলিকাটার মাটী সমুদয় এইরূপ ভাবে আইলের মতন করিয়া রাখিতে হয় যেন আকের গোড়ায় মাটী দিবার সময় সহজেই ঐ মাটী লওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক গর্ত্তে ত্রিকোণাকৃতি করিয়া তিনগাছি ডগা বসাইতে হয়। ডগা বসাইবার পর ১ ইঞ্চি পরিমিত মাটীর দ্বারা ঐ ডগা সকলকে ঢাকিয়া দিতে হয়। যদি

REPAIRED DOCUMENT

মাটি শুষ্ক থাকে, কলসি বা অন্য পাত্রের দ্বারা জল সেচ করিতে হয়। আইলের ... দুই পার্শ্বে যে মাটী থাকে, তাহা এক মাস অন্তর দুইবারে গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে ... বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জমি সমতল করা আবশ্যক। আষাঢ় মাসে প্রথম মা... হয়; এবং তাহার ছয় সপ্তাহ পরে সারের সহিত দ্বিতীয় বার মাটী ধরাইতে হয়।

মরীচ দ্বীপের প্রণালীতে চাষ করিলে আক শক্ত ও মোটা হয়; এবং ... কিন্তু ক্ষেত্রে জল জমিয়া ফসল নষ্ট হইবারও সর্ব্বদা ভয় আছে; তজ্জন্য এরূপ ... না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

ডগার পরিমাণ। এক বিঘা জমির জন্য ৩ কাহন ডগার আবশ্যক ... অবস্থানুসারে ৩ কিম্বা ৩½ কাহন ডগা বসাইতে হয় এবং তাহার মধ্যে যে সকল ... যায় তাহাদিগকে তুলিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন ডগা বসাইতে হয়; ... কিছু ডগা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

আক বসাইবার পর জমির পাট। আক পাতিবার পর যদি বৃষ্টি না ... তাহা হইলে প্রথমে ৫ দিন অন্তর কলসির দ্বারা জুলিতে জল দিতে হয়। আক পাতিবার ... ১৫ দিন পরে গজা বাহির হয়। এই সময়ে জমি শুকাইলে জুলির মধ্যস্থিত স্থান ... কোদালির দ্বারা আল্‌গা করিয়া দিতে হয় ও ১৫।২০ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। ... ফাল্গুন মাসে আক পাতা হয়, তাহা হইলে প্রথম সেচ ও কোদ্‌লান জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ করিতে ... ইহার পরেই বর্ষা আরম্ভ হয়, কাজেই সেচ বন্ধ দিতে হয়। যদি পৌষ মাসের ... পাতা হয়, তাহা হইলে বর্ষা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত উপরিলিখিতরূপে সেচ দিতে ও কোদ্‌লা... হয়। যদি প্রথম কোদলাইবার ৭।৮ দিন পরে গজা বাহির না হয়, তাহা হইলে ... নূতন ডগা বসাইতে হয়। যখন সমস্ত গজা জমির উপরে বাহির হয়, তখন ... ধরাইতে হয়। মাটী ধরাইবার পূর্ব্বে এবং পরে সমুদয় ঘাস তুলিয়া ফেলিতে হয়। ... গুলি বড় হইলেই এক এক ঝাড়ে ৫।৬টি আক রাখিয়া তাহার নীচের শুষ্ক ... বাঁধিয়া দিতে হয়। তিন সপ্তাহ বা এক মাস অন্তর এই রকম বাঁধা আষাঢ় মাস ... করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত দিতে হয়।

আক কাটা। পাতিবার সময় অনুসারে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আক কাটিতে হয়। যখন আক কাটিবার উপযুক্ত হয়, তখন গোড়া ঘেঁসাইয়া ... দ্বারা কাটিতে হয়। পুনরায় ডগা রাখিবার জন্য প্রায় ১ ফুট লম্বা ডগা কাটিয়া ... হয়। আক কাটিয়া লইলে জমিতে যে গোড়া থাকে, ভালরূপ সার দিলে ২।৩ ... ফসল পাওয়া যায়। খুড়ি আক এইরূপে চাষ করিলে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ডগা রক্ষা। শীতল স্থানে গর্ত্ত খুদিয়া কাদা করিয়া ঐ ডগাগুলি তাহার মধ্যে অল্প হেলাইয়া বসাইতে হয় এবং তাহার উপর খড় ও পাতার দ্বারা ঢাকা দিতে ... যাহাতে ডগা সকল শুষ্ক হইয়া না যায়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে গোবরমিশ্রিত পচা জল ...

... ঢালিয়া দিতে হয়। তৎপরে যখন ঐ সকল রোপণের উপযুক্ত হয়, তখন ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুঁতিতে হয়।

আক মাড়া। আক কাটিলেই যাহাতে তাহার রস শুকাইয়া না যায় তজ্জন্য ... দিবসেই মাড়িয়া তাহার রস বাহির করিতে হয়। বাঙ্গলায় তিনপ্রকার দেশী আক-... কল প্রচলিত আছে। প্রথম, "চর্‌কি" কল; ইহাতে দুইজন দুই পাশে বসিয়া ঘুরা-... থাকে, তৃতীয় একজন আক খাওয়ায়, চতুর্থ একজন মাড়া আক বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় মাড়িবার জন্য উক্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে দেয়। দ্বিতীয় কল, বিহিয়ার কলের ন্যায়। ইহাতে তিনজন লোকের আবশ্যক। একজন বলদ তাড়ায়, একজন আক খাওয়ায়, আর একজন প্রথম কলের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সাহায্য করে। তৃতীয়, ঘানিকল। ইহাতে ...নির গায়ে এক খণ্ড কাষ্ঠ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতে আক মাড়া হয়।

দেশীয় কোন কলেই আকমাড়া ভাল হয় না, আকে রস রহিয়া যায়, তজ্জন্য বিহিয়ার ...ই আক মাড়ার উপযোগী। ইহার গঠনপ্রণালী সরল। ইহাকে অনায়াসে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ইহার দ্বারা যে পরিমাণে কার্য্য হয়, তাহার তুলনায় ইহার মূল্য অতি অল্প। ইহাতে উপরিস্থিত লৌহদণ্ডের মধ্যে আক দিতে হয়, ... ঐ লৌহদণ্ডের নিম্নে একটি পরিষ্কার পাত্র রাখিয়া রস লইতে হয়। দুইটি সাধারণ ...দের দ্বারা অনায়াসে এই কলের কার্য্য চালান যায়। ইহাতে এক যোড়া বলদ ও দুটি ... যার আবশ্যক। একজন লোক বলদ তাড়ায় ও অপর একজন আক খাওয়ায়। সাহাবাদ জেলাস্থ বিহিয়ার টম্‌সন্ ও মিলেন্‌ কোম্পানীর নিকট এই কল পাওয়া যায়। দুইটি লৌহ দণ্ড বিশিষ্ট কলের মূল্য ৮০৲ এবং তিনটি লৌহদণ্ড বিশিষ্ট কলের মূল্য ১০০৲।

গুড় প্রস্তুত। বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশেই গুড় জ্বাল দিবার জন্য মাটীর পাত্র ব্যবহার হয়। কেবল বীরভূমে লোহার পাত্রে গুড় প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু সে পাত্রও ... হওয়া উচিত সেরূপ নহে। আঁক মাড়িবার পরেই জ্বাল দেওয়া উচিত। বিহিয়ার ... মিলেন্ কোম্পানীকৃত গুড় প্রস্তুত করিবার লৌহকটাহই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। নিম্ন-লিখিত নিয়মানুসারে এই লৌহকটাহ ব্যবহার করিতে হয়।

জমিতে ৩ ফিট গভীর ও ৩৫ ফিট ব্যাস পরিমিত একটি গর্ত্ত কাটিতে হয়। জ্বাল দিবার জন্য ৫ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি উচ্চ একটি গর্ত্ত রাখিয়া জমির উপরে ২½ ফিট উচ্চ একটি ...র দেয়াল দিতে হয়, এবং তাহার উপর কড়া বসাইতে হয়। তাহার পর ঐ মাটীর দেয়ালে ও কড়ার মধ্যস্থিত ফাঁক সকল দিয়া যেন ধূম বাহির হইতে না পারে, তজ্জন্য মাটী দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্ব দিকে বা বাতাসের বিপরীত দিকে ধূম বাহির হইবার ... ঐ দেয়ালে একটি গর্ত্ত করিয়া পথ রাখিতে হয়। এবং দূরে ঐ ধূম বহিয়া লইবার ...হার সহিত একটি মাটীর নলও রাখিতে পারা যায়।

জ্বাল দিবার পূর্ব্বে তাহাতে যেন গাঁজাল না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

REPAIRED DOCUMENT

[illegible] রস [illegible] ততক্ষণ অধিক জাল [illegible] তাহার পর জাল কম করিয়া দিতে হয়।

পাঁচবার উৎলাইয়া উঠিয়া যখন রস গাঢ় হয়, তখন চুলা হইতে কড়া নামাইয়া [illegible] একটি বিড়ের উপর বসাইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহা বসিয়া যায় ততক্ষণ তাড়ু [illegible] নাড়িতে হয়।

গুড় পরিষ্কার করিতে হইলে, যখন রস প্রথম গাঁজলায়, তখন গাদ কাটিয়া [illegible] এক ছটাক রেড়ীর তৈল কিম্বা তাহা না পাইলে ১ সের জলে ৪ ছটাক দুধ [illegible] ফুটবার সময় রসে দিলে পরিষ্কার হয়।

যে সমুদয় স্থানে উপরোক্ত লৌহকটাহ পাওয়া যায় না, সেই সেই স্থানে নি[illegible] রূপে গুড় প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু তাহাতে গুড় ভাল হয় না।

আকমাড়া কলের নিকট ১০ ফিট লম্বা ৪ ফিট প্রস্থ ও ৫ ফিট গভীর একটি জুলি কাটিতে হয়। ইহার উপর বাঁশের বা কাটের ফ্রেম বসাইয়া মাটী দিয়া লেপিয়া দিতে [illegible], এবং ইহার উপর দুই সারি হাঁড়ি বসাইতে হয়। এই জুলিটিকে "বান" কহে। এই বানের দুই মুখ খোলা রাখিতে হয়। কারণ এক মুখ দিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ দেওয়া হয় ও অপর মুখ দিয়া ছাই কাড়া হয়। সাধারণতঃ একেবারে একটি বানে ১২টি হাঁড়ি বসান যাইতে [illegible] রস ফুটিয়া ফুটিয়া যেমন গাঢ় হইতে থাকে, এক হাঁড়ি হইতে লইয়া আর এক হাঁড়িতে [illegible] হয়। এইরূপে ক্রমে সেই গুড় বানের মুখের দিকের দুই হাঁড়িতে লইয়া আসিতে হয়। আকের দোষে, বা আকমাড়ার দোষে, বা রস ফুটাইতে বিলম্ব হওয়ায় যদি রস টকিয়া [illegible] তাহা হইলে রস গাঢ় হইয়া আসিলে কিঞ্চিৎ চুণের জল মিশাইতে হয়।

আকের পোকা। উই পোকার দ্বারা আকের অধিক অনিষ্ট হয়। ইহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিতে হয়ঃ—

(১) হলুদের জল। (২) কেরাসিন তৈল মিশ্রিত জল। (৩) ফটকিরির জল।

উইপোকা ধরিলে জমিতে ক্রমাগত সেচ দিতে হয়, এবং কোদালের দ্বারা খুঁড়িয়া পোকার বাসা বাহির করিয়া জমির দূরে ফেলিয়া দিতে হয়।

আয় ও ব্যয়। প্রত্যেক বিঘা আবাদে কিরূপ ব্যয় ও আয় হইতে পারে, তাহার একটি মোটামুটি হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

চাষের খরচ।

৯ বার লাঙ্গল	...	...	৩।৶০	
সার	...	...	১০॥০	
আকের ডগা	...	...	১০৲	
মোট মজুর খরচ	...	...	২৯।০	
				৫৩৶০

[illegible] খরচ।

[illegible] কাটিবার [illegible] ছাড়াইবার খরচ			৫৲	
[illegible] বাহির করিবা[illegible] ও জাল দিবার খরচ			৮৲	
				১৩৲
[illegible] জ্বালানি কাষ্ঠ	...	...	।০	
([illegible] পাতা সকল ও রস বাহির [illegible] আক [illegible] জ্বালান হয়।)				
কল ও কড়ার ভাড়া	...	...	৪৲	
জমির খাজানা	...	...	৪৲	
				৮।০
		মোট	...	৭৪।৶০
উৎপন্ন।				
[illegible] ২৪ মণ [illegible]	...	...	৯৬৲	
ডগা বিক্রয়	...	...	১৪৲	
				১১০৲
		মোট	...	১৮৪।৶০

[illegible] খরচ হইল ৭৪।৶০ ও আয় ১১০৲; কাজে কাজেই [illegible] বিঘা প্রতি লাভ হয়।

ভূত না চোর?

(১)

[illegible] ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে দিল্লী সহরে আসিয়া বা[illegible] [illegible] আমরা দিল্লীরই অধিবাসী। বাঙ্গালী বলিয়া [illegible] আমাদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের পরিমাণ [illegible] [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আদিবাস [illegible] [illegible], তাহাও জ্ঞাত নহি। বাস্তবিক, আমা[illegible] [illegible] বাঙ্গালিনী না হইলে, এতদিন আমি মাতৃভাষার [illegible] [illegible] না বিশেষ সন্দেহ।

আমাদে[illegible] ভাল থাকিলেও, পিতা ও পিতামহের [illegible] [illegible] আমার পিতামহের আমলে আমাদের এই [illegible] [illegible] দিল্লী সহরের [illegible] আমার [illegible] চরিত্রও নির্দ্দোষ ছিল না,—কিন্তু তাঁহার [illegible]

REPAIRED DOCUMENT

শেষদশায় তিনি বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া যান; তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি স্ত্রীর ... বিক্রয় করিয়া বহুকষ্টে বাড়ীখানি উদ্ধার করি। এখন অনেক উমেদারীর পর জজ্ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।

মহল্লা "মোসাক্ চৌকে" আমাদের বসতি। দিল্লীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত ...। আমাদের বাড়ীটি সেকেলে ধরণের, চকমিলান প্রকাণ্ড তিনতালা অট্টালিকা,—... ঘর। আমরা স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী, দুইটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আমরা অত বড় বাড়ী ... কি করিব? অনেক দিন হইতে মনে করিতেছিলাম, যদি ভাড়াটিয়া পাই, তবে ... উপরের ঘরগুলি ভাড়া দিই। তেতালার ভাল ঘরগুলি এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রে ছাদ ... মুক্তবায়ুর মহাসুখ অন্যের জন্য ছাড়িয়া দিতে যে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বাড়ীর ভিতর দিয়া না যাইয়া, বাহির হইতেও তেতালার উপর পৌঁছান যায়। রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের সদর দরজা, তাহার বাম দিকেই একটু গলির মত আছে। সেই গলিতে সিঁড়ির দরজা আছে, তাহা দিয়া পরে পরে দোতালায় এবং তেতালায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির যে দরজা দোতালায় খুলিয়াছে, সেইটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া ... আর আমাদের সঙ্গে তেতালার কোনই সম্বন্ধ রহিল না। নীচেতালায় আমার ... মহাশয়ের "দফ্তরখানা" ছিল—কর্ম্মচারী, লোকজনে সদা পূর্ণ থাকিত; সেই জন্য ছেলেদের বাহিরে যাইতে হইলে এই সিঁড়ির দরজার মুখে পাল্কী আসিয়া লাগিত;— এইটাই যেন আমাদের খিড়কী দরজার মত ছিল।

আমি যে উপর তালাটি ভাড়া দিব, তাহা অনেক দিন হইতে অনেক লোকের ... বলিয়া বেড়াইয়াছি। কয়েকটা লোক চাহিয়াও ছিল, কিন্তু কোনটাই মনের মত হয় বলিয়া দেওয়া হয় নাই। হয় অতি অল্প ভাড়া দিতে চায়, নয়ত মুসলমান, নয়ত কোনও বাধা থাকে। একদিন রবিবারে অপরাহ্নে বৈঠকখানা ঘরে চেয়ারে বসিয়া ত... খাইতেছি, মৌলবী সাহেব তক্তপোষের উপর ছেলেদের লইয়া সুর করিয়া করিয়া "...ঙ্গে রফ্তন্ কুনদ্জানে পাক্" ইত্যাদি গোলেস্তাঁ পড়াইতেছেন, এমন সময় একটী ফি... সাহেব আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহেব দেখিয়া থ... খাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিলাম, নিজে তক্তপোষে বসিলাম।

সাহেব বলিলেন—"বাবু, আপনার নাম সেরেস্তাদার বাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ"।

"আপনি তেতালার মহল ভাড়া দিবেন?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"কত ভাড়া? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম—"আপনি লইবেন? বেশ ত! আগে দেখুন কেমন ঘর দুয়ার। পছন্দ যদি হয় তাহার পর সে কথা হইবে।"

[illegible]

REPAIRED DOCUMENT

পড়িতে পারেন, তবে আপনার কিছুই ভাড়া লাগিবে না।" এ প্রস্তাবে সাহেব পরম আহ্লাদিত হইয়া সম্মত হইলেন এবং আমাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—তাঁহার পত্নী আমার "লেডির"—([illegible] শৈলবালা লেডি! ভারি হাসির কথা) "ক্যাপিট্যাল্ কম্পানিয়ন" (উত্তম সঙ্গিনী) [illegible] এবং অনেক প্রকার উলটুলের কাজ [illegible] ভাবিলাম, আমার স্ত্রী সেই ম্লেচ্ছানীকে চৌকাঠের [illegible] করিতে দিলে ত! সাহেব বলিলেন—'বাবু, তবে আমি পরশু বৈকালে জিনিষপত্র ও মেম সাহেবকে লইয়া আসিব। কাল আপনি ঘরগুলা পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন।' বলিয়া তিনি আমার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাহেব সপরিবারে জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন বটে; কিন্তু বলিলেন—"বাবু আমি গাজীপুর হইতে পত্র পাইয়াছি আমার শ্যালক বড় পীড়িত। আমরা আজই রাত্রে সেখানে চলিলাম। জিনিষপত্র সব চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। বোধ হয় দুই সপ্তাহের এদিকে ফিরিতে পারিব না।" বলিয়া সাহেব ও মেম খিড়কীর সিঁড়িদরজায় চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(২)

সন্ধ্যা বেলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকাল সকাল শয়ন করা আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। যখন রাত্রি নয়টা বাজে, তখন আমাদের বাড়ীটি অন্ধকার হয়, এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। রাত্রি চারিটা বাজিলেই সকলকার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, ছেলেরা বিছানায় থাকিয়াই "শুক্রো সিপাসো মিন্নতোইজ্জৎ খোদা এরা" করিয়া পারসী শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকে। আমরা স্ত্রী পুরুষে সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। বেশ আলো হইলে তবে সকলে শয্যাত্যাগ করি।

সাহেব যেদিন গাজীপুর গেলেন, তাহার তিন চারিদিন পরে অনেক রাত্রে (বোধ হয় বারটা হইবে—বারটাই আমাদের "অনেক রাত্রি") হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধ হইল যেন উপরে দুব্ দুব্ করিয়া কি শব্দ হইতেছে। কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলাম, শব্দ আর [illegible]
কিছু [illegible] কাণ খাড়া করিয়া [illegible]
শুনিলাম [illegible] ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তাহার [illegible]
ঘুম [illegible]